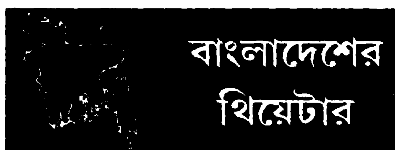

বাংলাদেশের
থিয়েটার

বাংলাদেশের থিয়েটার

মুখবন্ধ

রামেন্দু মজুমদার

সম্পাদনা

নৃপেন্দ্র সাহা



করুণা প্রকাশনী ॥ কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : ২০০০

প্রচ্ছদের গ্রাফিক্স : অরবিন্দ পাল

করুণা প্রকাশনীর পক্ষে ১৮এ টেমার লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে
বামাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, বর্ণসংস্থাপনে রেজ ডট কম
৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯
এবং শিবদুর্গা প্রেস, ৩০ শিবনারায়ণ দাস লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬ থেকে কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীমতী পুতুল বায়

সূচি

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের নবনাট্যচর্চা দেশটির স্বাধীনতার সমবয়সি। তিন দশকের প্রান্তে দাঁড়িয়ে তাই স্বাভাবিকভাবেই পেছন ফিরে তাকানো যায়। নাট্যচর্চার নানাদিক নিয়ে একটা মূল্যায়নও নাট্যামোদীদের কৌতূহল মেটাতে সহায়ক হবে। এবং সেটা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে যখন তা করা হয় বাংলা সংস্কৃতির অপর পীঠস্থান কলকাতা থেকে।

নৃপেন্দ্র সাহা বাংলাদেশের নবনাট্যচর্চার শুরু থেকে আগ্রহী পর্যবেক্ষক। তিনি অনেকবার বাংলাদেশে এসেছেন নানা উপলক্ষে—কখনো সেমিনারে যোগ দিতে, কখনো নাট্যোৎসবে, কখনো সংবর্ধিত হতে, কখনো গবেষণার উপাদান সংগ্রহ করতে। বাংলাদেশের নাটক দেখেছেন প্রচুর—বাংলাদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে। তাঁর অভিজ্ঞতা কেবল রাজধানী ঢাকাতে সীমাবদ্ধ নয়, তিনি দেশের নানাপ্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন, নাট্যকর্মীদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছেন। সম্পাদক হিসাবে নৃপেন্দ্র সাহার একজন গুণগ্রাহী আমি। এমন নিষ্ঠা ও কৃতিত্বের সাথে নাট্যপত্র সম্পাদনা করতে আমি খুব কম লোককেই দেখেছি। নাট্যপত্রিকা ও অন্যান্য নাট্যগ্রন্থ বা স্মরণিকার একজন নগণ্য সম্পাদক হিসাবে আমি তাঁর শ্রমের পরিধিটা সহজেই আঁচ করতে পারি। তাই বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছরের পরিচিতিমূলক একটি গ্রন্থ যখন তিনি সম্পাদনা করেন, তখন তাঁর চেয়ে যোগ্যতর কেউ হতে পারতেন কিনা, আমার জানা নেই।

সম্পাদকের নিজের লেখা ও কয়েকটি আমন্ত্রিত নিবন্ধ ছাড়া অন্য সব নিবন্ধই বাংলাদেশে বা ভারতে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার থেকে সংকলিত। প্রকাশনার কালও বিস্তৃত। তাই সব নিবন্ধেই একেবারে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত আলোচিত বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যাবে না। কিন্তু একটা ব্যাপক ধারণা পাওয়া যাবে।

নিবন্ধগুলো যেভাবে তিনি ভাগ করেছেন, তা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। নাট্যের সন্ধানে, যবনিকা উত্তোলন, ইতিহাসের আলোকে, মুক্তিযুদ্ধের দর্পণে, নাট্যের নানামুখ, স্বাতন্ত্র্য অর্জনের লক্ষ্যে, পথিকৃৎ পরিক্রমা, নাট্যচর্চা নানাপ্রান্তে, আলোচনায় সমালোচনায়, বাংলাদেশের চোখে পশ্চিমবাংলা, পশ্চিমবাংলার চোখে বাংলাদেশ—এ সব নামকরণের মধ্যেই তাঁর সৃজনশীলতার পরিচয় মেলে। ইতিহাসের আলোকে বিভাগে পঁচিশ বছরের নাট্যসাহিত্যের ধারা সম্পর্কে বিশ্বজিৎ ঘোষের লেখাটির একটি পরিপূরক লেখা যদি নাট্য প্রযোজনার ধারা সম্পর্কে থাকত, তবে পরিচিতিটা পূর্ণাঙ্গ হত।

বাংলাদেশের নবনাট্যচর্চার একটা বড়ো অর্জন দর্শক সৃষ্টি। নাট্যদলগুলো নিরবচ্ছিন্ন শ্রম ও নিষ্ঠা দিয়ে এ দর্শক গড়ে তুলেছেন। সত্তরের দশকে যখন একটি নাটকের ১২ টি প্রদর্শনী হলেই নাটকটি ভালো চলেছে বলে ধরে নেওয়া হত, সেখানে এখন শততম অভিনয় বেশ কয়েকটি নাটকের হয়েছে—এমনকী ৪০০ তম অভিনয়ও একটি নাটক অতিক্রম করেছে। আদিতে এ দর্শক ছিল রুচিশীল মধ্যবিত্ত, এখন তার গণ্ডি উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের দিকে প্রসারিত হয়েছে।

বাংলাদেশের নাট্যকার ও নাট্যকর্মীদের সমাজ সচেতনতা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। মৌলিক নাটকগুলির মধ্যে সমসাময়িক সমাজ ও জীবন নিয়ে রচিত নাটকের সংখ্যা সর্বাধিক। রূপান্তরিত বা অনূদিত নাটকের ক্ষেত্রেও এমন সব নাটককেই বাছাই করা হয়, যা আমাদের সমাজের জন্যে প্রাসঙ্গিক। আমাদের ভালো থিয়েটার হল নেই, সংলাপ বলতে হয় চেঁচিয়ে, কারিগরি সুযোগ সুবিধা অনুপস্থিত, কিন্তু বিষয় বৈচিত্র্য বা প্রযোজনা বৈচিত্র্য আমাদের নাটকে কম নয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশে। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নাটক ছিল এক বড়ো হাতিয়ার। এ সংগ্রাম কেবল মঞ্চের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বিভিন্ন গণআন্দোলনে নাট্যকর্মীরা নেমে এসেছেন পথে, প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন, মানুষকে

উজ্জীবিত করেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে। সরকার নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমে যখন মিথ্যার হুতাশন, তখন মঞ্চ থেকে উচ্চারিত হয়েছে সত্য, নাট্যকর্মীদের এ সাহসী ভূমিকার জন্যেও নাটক সাধারণ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইন্সটিটিউট (আই টি আই)-র সুবাদে বাংলাদেশের নাটক আজ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতি লাভ করেছে, বিশেষ মর্যাদার সাথে আজ উচ্চারিত বাংলাদেশের নাম। অর্থনৈতিক কারণে নাট্যকর্মীরা পেশাদারি না হতে পারলেও পেশাদারি দক্ষতার সাথে নাটক প্রযোজিত হচ্ছে—বিদেশিদের এটা সার্বজনীন স্বীকৃতি।

সৃজনে আজ নতুন মাত্রা অর্জন করতে আগ্রহী বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গন। দর্শকের প্রত্যাশা বাড়ছে, তার সাথে তাল মিলিয়ে নতুন নতুন সাফল্যের শীর্ষ স্পর্শ করতে হবে নাট্যদলগুলিকে। প্রতিষ্ঠিত দলগুলির পাশাপাশি নতুন নতুন দলের মাঝেও দেখা যাচ্ছে আলোর ঝলকানি। মহাভারতের এক নগণ্য চরিত্র একলব্যকে নিয়ে রচিত হয়েছে 'নিত্যপুরাণ'-এর মতো গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন নাটক।

পথনাটক ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে বাংলাদেশে মঞ্চনাটকের সাথে হাত ধরাধরি করে। গ্রাম থিয়েটার ও মুক্তনাটক আন্দোলনও একসময় বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

নানা কারণে যদিও এখন মঞ্চনাটকের দর্শক কমে গিয়েছে, এ অবস্থা সাময়িক বলেই আমাদের ধারণা। নতুন জাতীয় নাট্যশালা অভিনয়ের জন্যে খুলে দিলে এবং মহিলা সমিতি ও গাইড হাউস মঞ্চ দুটির সংস্কার শেষ হলে, আবার দর্শক ফিরে আসবে—সন্দেহ নেই।

নৃপেন্দ্র সাহা তাঁর এই গ্রন্থের মুখবন্ধ লেখার জন্যে অনুরোধ করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। তার জন্যে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। বাংলাদেশের নাটক নিয়ে তিনি আরো কাজ করবেন, তাঁর কাছে এটা আমাদের প্রত্যাশা। বাংলাদেশের নাট্যচর্চাকে পশ্চিমবঙ্গে পরিচিত করার ক্ষেত্রে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার জন্যে ধন্যবাদ।

সকল প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে বাংলাদেশের নাটক আগের মতোই সাহসী পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে এ আমার স্থির বিশ্বাস।

রামেন্দু মজুমদার

ভূমিকা

বাংলা থিয়েটারের ধারায় বাংলাদেশের থিয়েটার বলে যে একটা পৃথক অধ্যায় লিখতে হবে সে কথা ১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন ও বিভাজিত হওয়ার আগে আমরা কেউ কোনোদিন ভাবিনি ; কিন্তু ১৯৪৭ সালে যখন প্রকৃতই ঘটনাটা ঘটল, অবিভক্ত বাংলার ১৯টা জেলা নিয়ে পূর্বপাকিস্তান গড়ে উঠল, তখন ভাবা গিয়েছিল বাংলা থিয়েটারের ইতিবৃত্ত রচনাকালে পূর্ববঙ্গের নাট্যচর্চা শীর্ষক পৃথক অধ্যায় সংযুক্ত করলেই চলবে, কিন্তু আমাদের সে ভাবনাও যে আংশিক সত্য তা প্রমাণিত হল ১৯৭১-এ। যখন পূর্ববঙ্গ তথা পূর্বপাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্যুত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটালো বিশ্বের রাষ্ট্রব্যবস্থায়, তখনই স্বাধীন বাংলাদেশের গর্ভে বীজ বপন করা হয়ে গিয়েছিল যে কলকাতার থিয়েটারের ঔরসে বাংলাদেশের নিজস্ব থিয়েটারের একটা পৃথক ভূমণ্ডল গড়ে উঠবে। এবং সেই স্বাধীন বাংলাদেশের থিয়েটার নিয়ে একটা পৃথক অধ্যায় নয়, কয়েক শো পৃষ্ঠার পৃথক বই-ই বের করতে হবে। কারণ তার জন্মের তিন দশকের মধ্যে সে আজ বিশ্বনাট্যের সভাস্থলে স্বরাট, স্বপ্রভু।

বাংলাদেশের থিয়েটারের এই সামগ্রিক রূপরেখা ফুটিয়ে তোলার জন্যই আমাদের এই বিপুলাকার নিবেদন 'বাংলাদেশের থিয়েটার' নামক সংকলন।

বাংলাদেশের থিয়েটার গ্রন্থের সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব নেওয়ার পর আত্মপক্ষ সমর্থনে দু-একটি কথা এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন। আমার ছাত্র নাট্য ও চলচ্চিত্র গবেষক বিশ্ব রায়ের একান্ত অনুরোধেই এ দায়িত্ব যখন স্বীকার করে নিই, তখন এ কথা আমার খেয়ালে ছিল যে এ বাংলার নাট্যব্যক্তিত্বদের একাংশ আমাকে বাংলাদেশের থিয়েটারের মুখপাত্র বলে কটাক্ষ করলেও আমার কিছু যায় আসে না ; কারণ একজন নাট্যসাংবাদিক ও সংগঠক হিসেবে এ বাংলা ও বাংলা, প্রতিবেশী পাকিস্তান এবং তথা সমগ্র বিশ্বের ভালো থিয়েটারেরই আমি একজন গুণমুগ্ধ দর্শক তথা প্রচারক; সুতবাং আমাদের বাংলা থিয়েটারের পাশ্চাত্য ধারণার দুশো সাত বছরের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের মাত্র তিন দশকের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত ফসল যদি সমগ্র বাংলা থিয়েটারের পূর্বতন ঐতিহ্য স্বীকার করে পায়ের তলায় নিজের জমির সন্ধান দেয়, তবে একজন নাট্য প্রেমিক সমালোচকের মনের আকাশে বাংলাদেশের থিয়েটারের শেকড় ও ডানার সংযুক্তি সুনিশ্চিতভাবে স্থান করে নেবে এ বাংলার তরুণ প্রজন্মকে পথের সন্ধান দিতে, এ আর নতুন কথা কী।

নতুন কথা এইটাই বাংলাদেশের থিয়েটারের স্বাতন্ত্র্য অর্জনের লক্ষ্যই আমাদের শিখিয়েছে যে আমাদের বাংলা থিয়েটারের বয়স মাত্র দুশো সাত বছর নয়, বাংলা থিয়েটারের বয়স বাংলা ভাষা সৃষ্টির সমকালীন ; চর্যাপদের সমসাময়িক, হাজার বছর :

এই আবিষ্কারের আনন্দেই 'নাট্যের সন্ধানে' থেকে 'যবনিকা উত্তোলন', 'ইতিহাসের আলোকে', 'মুক্তিযুদ্ধের দর্পণে', 'নাট্যের নানামুখ', 'স্বাতন্ত্র্য অর্জনের লক্ষ্যে', 'পথিকৃৎ পরিক্রমা', 'নাট্যচর্চা নানাপ্রান্তে', 'আলোচনায় সমালোচনায়', 'বাংলাদেশের চোখে পশ্চিমবাংলা', 'পশ্চিমবাংলার চোখে বাংলাদেশ' শীর্ষক এগারোটি অধ্যায়ে বিভিন্ন পর্যায়ে লিখিত মোট একচল্লিশটি নতুন পুরাতন নিবন্ধে 'বাংলাদেশের থিয়েটার' সংকলনের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের নাট্যচর্চার সামগ্রিক রূপরেখাকে তুলে ধরা হয়েছে।

আমাদের স্থির বিশ্বাস আমাদের পশ্চিমবাংলার নাট্যকর্মীরা প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের থিয়েটার সম্পর্কে আলোচ্য সংকলন থেকে একটা সামগ্রিক ছবি যেমন পাবেন, তেমনই বাংলাদেশের থিয়েটারের নানান সন্ধি-অভিসন্ধির প্রকৃতি এবং প্রবণতা চমৎকারভাবে বুঝে নিতে পারবেন। কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ যেমন সঠিক কারণেই বাংলাদেশের সাহিত্য স্নাতক, স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পঠনপাঠনের বিষয় করেছেন, তেমনই আমাদের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগও বিবেচনায় আনতে পারেন যে বাংলাদেশের থিয়েটারকে স্নাতক-স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য একটা ঐচ্ছিক বিষয় রূপে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

অতএব সূচনায় 'নাট্যের সন্ধানে' বেরোলে সেই মহান নাট্যকারের উক্তিই আমাদের প্রেরণা হয়ে ওঠে যে এই বিশ্বজগৎই এক বিরাট রঙ্গশালা। বাংলাদেশের প্রবীণ কথাকার ও নাট্যকার শওকত ওসমান 'মঞ্চের অন্দরে সমাজের অভ্যন্তরে' নিবন্ধে সেই চিরন্তন সত্যেরই উদ্ঘাটন করেছেন, এই নিবন্ধটিকে মুখবন্ধরূপে বিবেচনায় রেখে আমরা যদি বাংলা থিয়েটারের 'যবনিকা উত্তোলন' করি তাহলে দেখব যে রুশ ভারতবিদ্ লিয়েবেদেফের উদ্যোগে আমাদের আধুনিক নাট্যচর্চার দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়, সেই রুশি নাট্যসূচনাকারী লিয়েবেদেফ সম্পর্কে আমাদের এ বাংলা ও বাংলা দু-বাংলার মধ্যে ও বাংলার সত্যানুসন্ধানই সবচেয়ে পরিশ্রমী ও শ্রদ্ধাযুক্ত। লিয়েবেদেফ বিষয়ে সুপণ্ডিত হায়াৎ মামুদের গবেষণাই আমাদের আলোকিত করেছে সর্বাধিক। তাঁর অনুসন্ধানেই লিয়েবেদেফের মানস ভূগোল পরিক্রমায় আমরা সঠিকভাবেই নিরাবেগে গ্রহণ করতে পারি এই সত্য যে নিতান্তই বাংলা ভাষাকে আয়ত্ত করার প্রচেষ্টাতেই নাটকের বঙ্গীকরণের সূত্রে মঞ্চায়নের দিকে পদক্ষেপ করেন, একজন আকাঁড়া ভারতবিদের পক্ষে এইটুকু উদ্যোগই যদি আমাদের আধুনিক নাট্যচর্চার পথ উন্মুক্ত করে দেয় তবে সে সত্যকে আমাদের মেনে নিতে অসুবিধা কী। আর লিয়েবেদেফকে যে দু-দশজন বাঙালি পথিকৃৎ নাট্যকার ও মঞ্চপ্রয়োগশিল্পীর সম্মান দিতে অনাগ্রহী, তাঁদের সম্পর্কে আমাদের অনেকের মতোই মফিদুল হক দ্বিমত পোষণ করে 'লিয়েবেদেফ : পুনর্মূল্যায়ন' নিবন্ধে সঠিকভাবেই বলেন, লিয়েবেদেফের থিয়েটার ছিল বেঙ্গলি থিয়েটার অর্থাৎ ইংলিশ থিয়েটারের পাশাপাশি তা ছিল স্থানীয় ঐতিহ্যের সরব আত্মপ্রকাশ। নাট্যগৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জায় ছিল বাঙালিআনার প্রকাশ। মঞ্চায়নে বাংলা যাত্রাপালার অনেক বৈশিষ্ট্য স্থান পেয়েছিল। লিয়েবেদেফের সঙ্গে বাঙালি জনগোষ্ঠীর নিবিড় যোগাযোগের একটা ভিত্তি আমরা খুঁজে পাই। ইনি ছিলেন প্রাক-উপনিবেশিক বাংলার মানস জগতের সঙ্গে প্রতীচ্যের অ-উপনিবেশিক ধ্যানধারণার সংশ্লেষণকারী নাট্যব্যক্তিত্ব। এঁকে পথিকৃতের মর্যাদা না দেওয়া ঔপনিবেশিক মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ।

'ইতিহাসের আলোকে' অধ্যায়ে মুনতাসীর মামুন লিয়েবেদেফের থিয়েটার প্রবর্তনার ঐতিহ্য ধরেই ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের মাটিতে উনিশ শতকে আধুনিক থিয়েটার চর্চার তথ্যানুসন্ধান করেছেন, যার পেছনে হয়তো কলকাতার থিয়েটারের আদলটা অস্বীকার করা যায় না। মুনতাসীর সঠিকভাবেই জানিয়েছেন কলকাতায় থিয়েটারের শুরু বাগান বাড়িতে এবং তা থেকে থিয়েটারের মুক্তি পেতে সময় লেগেছিল প্রায় চল্লিশ বছর। বাংলাদেশের থিয়েটার শুরু হয়েছিল প্রধানত মধ্যশ্রেণির আগ্রহে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের থিয়েটার এমন কিছু করতে পারেনি ওই সময়ে যা কলকাতা থেকে একেবারেই ভিন্ন।

১৯৭১-এ বাংলাদেশ জন্মের আগে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ সময়কালের পূর্ববঙ্গ তথা পূর্বপাকিস্তানের নাট্যচর্চার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে প্রাবন্ধিক আহমেদ সানি আমাদের জানিয়েছেন এই ৪৭-৭১ কালপর্বে রচিত অধিকাংশ নাটকেই ধরা পড়েছে তৎকালীন বাঙালি জাতির সংগ্রামমুখর জীবনপ্রবাহ। ৫২-র ভাষা আন্দোলন, ৫৪-র ষড়যন্ত্র, পাকিস্তানের সামরিক আইন, ৬২-র ছাত্র আন্দোলন, ৬৪-র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ৬৯-র গণঅভ্যুত্থান এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে এ সময়কার নাট্যচর্চায় পাশ্চাত্য শিল্পরীতির অনুসরণ প্রধান হলেও বাংলার নিজস্ব নাট্যআঙ্গিক নির্মাণের প্রাচ্য ঐতিহ্য অনুসন্ধান সূচিত হয়ে গিয়েছিল জসীমউদ্দীন, ইব্রাহিম খাঁ, বজলুর রশীদ এবং সাইদ আহ্‌মদের নাট্যরচনার প্রয়াসে। এবং এর থেকেই প্রেরণা পেয়েছিল বাংলাদেশের থিয়েটার নির্মাণের উত্তরকালের অগ্রণী নেতৃবৃন্দ। বিশ্বজিৎ ঘোষের সযত্ন রচিত নিবন্ধে ১৯৭১-৯৫ কালসীমার বাংলাদেশের ২৫ বছরের নাট্যসাহিত্যের ধারার যথার্থ বিশ্লেষণ আমাদের আলোকিত করবে যে কীভাবে পাশ্চাত্য আঙ্গিকে বিশ্বনাট্যচর্চার সঙ্গী থাকার সমান্তরালভাবে বাংলাদেশের নাট্যকার ও প্রয়োগশিল্পীরা মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রেরণা থেকে স্বাধীন বাংলা নাট্যরীতির উদ্ভাবনে সমর্থ হয়ে উঠেছিলেন পরস্পর হাত ধরাধরি করে। প্রতিবাদ প্রতিরোধী চেতনার দৃষ্টিভঙ্গিতে স্থিতনিষ্ঠ থেকেই মামুনুর রশীদ, সৈয়দ শামসুল হক, মমতাজউদ্দীন আহমেদ, সেলিম

আল দীনদের অবদানের সঠিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রয়োজন ছিল নাট্যপ্রয়োগ রীতির স্বাতন্ত্র্য অর্জনের মূল্যায়নমূলক নিবন্ধ, যার কথা মুখবন্ধে শ্রীরামেন্দু মজুমদার বলেছেন, সে অভাব আংশিক পূরণ হবে 'স্বাতন্ত্র্য অর্জনের লক্ষ্যে' অধ্যায়ে।

'মুক্তিযুদ্ধের দর্পণে' অধ্যায়ে সংকলিত নিবন্ধ কয়টি বাংলাদেশের মুখ্য নাট্যনির্মাতাদের মুক্তিযুদ্ধে সংলগ্ন থাকার প্রেক্ষিতে তাঁদের স্বকীয় অভিজ্ঞতার আলোকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের থিয়েটারের স্বকীয়তা অর্জনের অভিমুখটি বুঝে নিতে আমাদের সুবিধা হবে। এ কথা ঠিক সৈয়দ শামসুল হক যেমন বলেছেন 'বাংলাদেশের নাট্যচর্চা মুক্তিযুদ্ধের ফসল নয়, মুক্তিযুদ্ধ যা করেছে— বীজটিকে উপ্ত এবং বৃক্ষের দিকে বর্ধিত হবার মাটি দিয়েছে', তেমনি মামুনুর রশীদও মনে করেন 'মুক্তিযুদ্ধ আমাদের নিজেদের দিকে তাকাবার একটা বড়ো সুযোগ এনে দেয়। . . .যুদ্ধকালীন অবস্থায় অনেক নাট্যকর্মীর সুযোগ ঘটে কলকাতার নাটক, নাট্যসংগঠন, নাট্যকার, অভিনেতা অভিনেত্রী ও কুশলীদের সাথে পরিচিত হবার। এ ঘটনাটি আমাদের নাট্যইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ সময়ই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কর্মের অবসরে, বেতার নাটকের মহড়ায়, 'পশ্চিমের সিঁড়ি'র মহড়ায় কলকাতার নাটক দেখার পর পথ হাঁটতে হাঁটতে সবাই ভাবতে শুরু করে দেশে ফিরে একটা কিছু করতে হবে। মঞ্চ করতে হবে—যেখানে নাটক হবে নিয়মিত।' এইভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা স্বাধীন বাংলাদেশি থিয়েটার প্রবর্তনের পথ খুলে দেয়। এই মুক্তিযুদ্ধকেই আবার বাংলাদেশের থিয়েটার নির্মাণের প্রধান ভরকেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করেন ড. ইনামুল হক তাঁর 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আমাদের সংস্কৃতি প্রসঙ্গে কিছু কথা' নিবন্ধে। এ বিবেচনা অত্যন্ত সঠিক। এবং এই সঠিক বিবেচনা থেকেই বাংলাদেশের থিয়েটারে যখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রতিবাদ প্রতিরোধের নাটক রচিত হতে লাগল, তখন নাট্যবিদ্ তাত্ত্বিক অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বিশ্বনাট্য রচনার মানদণ্ডে এই প্রতিবাদী নাট্যরচনা ও নির্মাণের একটি যথাযোগ্য অবস্থান নির্দেশ করেন তার নিবন্ধ 'নাটক : প্রতিবাদ প্রতিরোধের'। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের বিশিষ্টতম নাট্যনির্দেশক অভিনেতা আলী যাকের দেখেন 'স্বাধীনতা যুদ্ধে লক্ষ প্রাণ বিসর্জন, অসংখ্য মা-বোনের সম্মানহানি হলে যে বৃত্তটি ভেদ করে বৃহত্তর জীবন বোধের পথে পা বাড়িয়েছি বলে ভেবেছিলাম, সে বৃত্তটি যেমনকার তেমনি আছে। কারণ উপনিবেশবাদী অস্ত্রবাজদের পরিহার করতে পারলেও তাদের সৃষ্ট শাসনকর্তাদের চক্রভেদ করা সম্ভব হয়নি।' 'উপনিবেশবাদ, আমলাতন্ত্র ও শিল্পকর্ম' এই তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রমাণ। জিয়া হায়দার বাংলাদেশের নাট্যচর্চার মডেলটি কতখানি পাশ্চাত্যের বামপন্থী গ্রুপ থিয়েটার চর্চার আদর্শে সঞ্চালিত তার বিচার করেছেন মুক্তিযুদ্ধ ফেরত বাঙালিদের নিয়মিত নাট্যচর্চার সাত বছরের মাথায়। প্রবন্ধটি আজ বাংলাদেশের থিয়েটার আন্দোলনের তিরিশ বছর পরেও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েনি।

বাংলাদেশের থিয়েটার আন্দোলনের তিরিশ বছরের পর তার 'নাট্যচর্চার নানামুখ' আজ আমাদের ভাবনার জগতে আলোড়ন তোলে। তার মধ্যে ঐতিহ্য সচেতন বাংলাদেশের বাঙালিরা যাত্রা, লোকনাট্যের মাধ্যমটিকে যে ভোলেননি, তার বড়ো প্রমাণ প্রবীণ যাত্রাশিল্পী অমলেন্দু বিশ্বাসের বক্ষ্যমাণ নিবন্ধ। স্বাধীনতার পর আমাদের এ বাংলায় যাত্রা মাধ্যমটির শিল্প ও বৈষয়িক দিক থেকে যে উন্নতি ও অধোগতি প্রায় সমান্তরালভাবে হয়েছে, বাংলাদেশের চিত্রটি তার থেকে খুব আলাদা নয়। লেখকের প্রয়াণের পর বাংলাদেশের যাত্রার অধোগতি এখন দুরপনেয় অশ্লীলতার দ্বারা আক্রান্ত। ঐতিহ্যের এই একটি মাধ্যমের দুর্দশার পাশে বাংলাদেশের থিয়েটারের দুটি প্রধান ধমনী হল পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী ও আধুনিক নাটকের অনুবাদ রূপান্তর ; আর দ্বিতীয়টি হল রবীন্দ্রনাট্য প্রয়োগে দক্ষতা অর্জন। এ বিষয়ে প্রয়োগশিল্পী আতাউর রহমানের অনুসন্ধানী আলোয় বাংলাদেশের সামর্থ্যের স্বরূপ আমরা বুঝে নিতে পারব। নাট্যের নানামুখের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল শিশুকিশোর নাট্যচর্চার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সংবেদনশীল সুস্থ সাংস্কৃতিক বোধের উত্তরাধিকারী করে তোলা। সে দিকে বাংলাদেশের থিয়েটারে প্রযত্ন কতদূর ও কোন মাত্রায় গিয়ে পৌঁছেছে তার বিবরণ পাই

আবদুল্লাহ আল হারুনের নিবন্ধ 'বাংলাদেশের শিশুনাট্যচর্চা'-য়।

এর পাশে নাট্য আন্দোলনের বার্তা প্রচার ও নথিভুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে নিয়ে নাট্যপত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রচিত হয়ে চলেছে বাংলাদেশের থিয়েটার আন্দোলনের তিন দশক ধরে। প্রথম যে নাট্যপত্র 'থিয়েটার' প্রকাশিত হয় ১৯৭২-এ রামেন্দু মজুমদারের সম্পাদনায়, সেটি এখনও পর্যন্ত সজীব রয়েছে সমগ্র বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনের স্বরূপ ধারণ করে। এই সময়ের মধ্যে আরো কয়েকটি নাট্যপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে ; তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শান্তনু বিশ্বাস সম্পাদিত 'প্রসেনিয়াম', চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'থিয়েটার ফ্রন্ট' অভিজিৎ সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'ফ্রন্টলাইন থিয়েটার', গ্রাম থিয়েটার আন্দোলনের মুখপত্র 'নাট্যকলা', নাগরিকের মুখপত্র 'নাট্যপত্র', নাগরিক নাট্যাঙ্গন উদ্যোগে ড. ইনামুল হক সম্পাদিত 'শুধু নাটক' জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ প্রকাশিত 'থিয়েটার স্টাডিজ', হাসান শাহরিয়ার সম্পাদিত 'থিয়েটারওয়ালা', প্রাচী রোকেয়া সম্পাদিত পাক্ষিক ট্যাবলয়েড 'নটনন্দন', তিলক বড়ুয়া রুবেল সম্পাদিত 'মঞ্চসন্ত' প্রভৃতি। এইসব নাট্য পত্রপত্রিকার মধ্যে 'শুধু নাটক', 'থিয়েটারওয়ালা' নিয়মিত, বাকিগুলির কয়েকটি উঠে গেছে, দু-একটি অনিয়মিত। আর সব কিছুর মধ্যে 'থিয়েটার' এখনও সজীব, স্বাস্থ্যবান। আমরা সেই 'থিয়েটার' পত্রিকার বিগত ২৩ বৎসরের ২৩টি নির্বাচিত সম্পাদকীয় সংকলন করলাম যার মাধ্যমে বাংলাদেশের থিয়েটার আন্দোলনের বিভিন্ন উত্থানপতন ও মোড়ফেরার ওপর সম্পাদকের স্থিতধী বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্যের আলোকে বাংলাদেশের থিয়েটারকে বুঝে নেওয়া যায়।

মুক্তমঞ্চের নাট্যচর্চাও বাংলাদেশের থিয়েটারের একটি বড়ো শক্তি। সেই সম্পর্কে গ্রাম থিয়েটার আন্দোলনের গবেষক কর্মী সাজেদুল আউয়ালের নিবন্ধ 'খোলা নাটক' তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে আমাদের আলোকিত করবে। এই প্রসঙ্গেই লুৎফর রহমানের নিবন্ধ 'বাংলাদেশে কমিউনিটি থিয়েটার চর্চা প্রসঙ্গে'-র নির্বাচনও বাংলাদেশের নাট্যচর্চার একটি প্রান্তিক দিককে উদ্ঘাটন করবে। এ বিভাগের অন্তিম নিবন্ধ রামেন্দু মজুমদারের লিখিত 'আই টি আই ও বাংলাদেশ'। তিরিশ বছর বয়সি বাংলাদেশি থিয়েটার আজ বিশ্বনাট্যচর্চার জগতে কী ভাবে মর্যাদার আসন লাভ করেছে, তার সম্পর্কে আলোকপাত এ নিবন্ধে।

বাংলাদেশের নাট্যচর্চার জগতে এমন কয়েকজন প্রতিভাবান মানুষ আজ কাজ করছেন, যাঁদের নেতৃত্বে আজ বাংলাদেশ বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসকেই আমাদের পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করছে। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে আধুনিক প্রসেনিয়াম থিয়েটারে আমাদের দীক্ষাগুরু লিয়েবেদেফের বেঙ্গলি থিয়েটারের উদ্যোগকে সূচনায় রেখে আমরা এতকাল হিসেব করে এসেছি ১৭৯৫ থেকে এই ২০০২ সাল পর্যন্ত আমাদের বাংলা থিয়েটারের বয়স ২০৭। কিন্তু গত দুই দশক ধরে বাংলাদেশের থিয়েটারের একটা বড়ো অংশের হিসেবে আমাদের থিয়েটারের বয়স বিবেচিত হওয়া উচিত চর্যাপদের যুগ থেকে। বাংলাভাষার জন্মকালের প্রায় সমবয়সি আমাদের বাঙালির নাট্যচর্চার বয়স। বস্তুত তাই। সংস্কৃত নাট্যচর্চা ছিল রাজসভার নাট্যচর্চার অঙ্গ। আর আমাদের জনসভার নাট্যচর্চা ছিল লোকনাট্যচর্চার নানা আঙ্গিকে সমৃদ্ধ। বিশ্বনাট্য অঙ্গনে স্বভূমির রঙ্গনাট্য নিয়েই আমাদের দাঁড়াতে হবে। এই চেতনায় আমাদের যাঁরা উদ্বুদ্ধ করেন তাঁরা হলেন সেলিম আল দীন, নাসিরউদ্দীন ইউসুফ, সৈয়দ জামিল আহমেদ, আফসার আহমেদ, এস. এম. সোলায়মান, লুৎফর রহমান, তৌফিক হাসান ময়না, মাসুম রেজা, সাইদুর রহমান লিপন প্রভৃতি। এই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আমরা তাই 'স্বাতন্ত্র্য অর্জনের লক্ষ্যে' অধ্যায়ে মূলত দুটি বিষয়ের ওপর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এক, বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাটমণ্ডপের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জাতীয় নাট্যশালা কী হতে পারে বা কী হওয়া উচিত তার সমাধান খোঁজা। দুই, লোকনাট্যের আঙ্গিককে কীভাবে আজকের নগর ও গ্রামজীবনের একান্ত আবশ্যিক নাট্যআঙ্গিকরূপে ব্যবহার করে বাংলার নিজস্ব নাট্যভাষায় অভিব্যক্ত হওয়া যেতে পারে

তার ওপর আলোকপাত। আলোচ্য অধ্যায়ের প্রথম দুটি নিবন্ধের রচয়িতা বহুদেশদর্শী সুপণ্ডিত গবেষক সৈয়দ জামিল আহমেদ ও গোলাম সারোয়ার। জামিলের পরিশ্রমী গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদেরও ভাবতে হবে। আর লোকআঙ্গিক নিয়ে মমতাজউদ্দীন আহমদ, সেলিম আল দীন ও আফসার আহমেদ এ বিষয়ে অনেক লেখালেখি করেছেন ; আমরা সেইসব নিবন্ধাদির মধ্য থেকে তিনটি অতি প্রাঞ্জল সহজ নিবন্ধ এখানে সংকলন করলাম বাংলাদেশের থিয়েটারের স্বাতন্ত্র্য অর্জনের বৈশিষ্ট্য কোথায় তা নিরূপণের জন্য।

বাংলাদেশের থিয়েটারের অঙ্গনে আজ প্রায় শ তিনেক নাট্যগোষ্ঠী কর্মরত। আমরা তার মধ্য থেকে পথিকৃৎ নাট্যগোষ্ঠী চারটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতিমূলক আলোচনা সংকলনভুক্ত করলাম। যা থেকে পাঠকরা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবহওয়ায় নাট্যদলগুলির গড়ে ওঠার পটভূমি সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করতে পারবেন। আলোচকরা সবাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব।

কেন্দ্রীয় চারটি দলের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় সাধনের পরই বাংলাদেশের ৬৫টি জেলার মধ্যে অতি উল্লেখযোগ্য নাট্যকেন্দ্র হিসেবে নির্বাচিত চারটি জেলার ওপর আলোচনা সন্নিবদ্ধ করলাম। এ ক্ষেত্রেও আলোচকবৃন্দ ওই সব জেলাকেন্দ্রের অন্যতম বরেণ্য নাট্যকর্মী।

আলোচ্য গ্রন্থের নবম অধ্যায় 'আলোচনায় সমালোচনায়' বিভাগে আমরা নির্বাচন করেছি সেই লেখা তিনটি যার মাধ্যমে বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নাট্যবিদ্‌ বা নাট্য সমালোচকদের বিচারে বাংলাদেশের নাট্যচর্চার সাফল্য ও ব্যর্থতা কিংবা প্রতিশ্রুতি ও প্রবণতার মধ্যেকার ফারাকটুকু বুঝে নেওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নাট্যকর্মী কামালউদ্দীন কবির, নাট্যসাংবাদিক আহমেদ আবিদ ও নাট্যকর্মী অনন্ত হিরা—এই ত্রয়ী ব্যক্তির লেখায় আমরা চিহ্নিত করতে পারব বাংলাদেশের নাট্যআন্দোলনের সাফল্য ও ব্যর্থতাকে।

অন্তিম অধ্যায়ে দুটি হল ওদের চোখে আমরা, আমাদের চোখে ওরা অর্থাৎ 'বাংলাদেশের চোখে পশ্চিমবাংলা' ও 'পশ্চিমবাংলার চোখে বাংলাদেশ'। বাংলাদেশের চোখে পশ্চিমবাংলা বলতে বাংলাদেশের নাট্যকর্মীর চোখে পশ্চিমবাংলার নাট্যচর্চার একটা সামগ্রিক বিচার কিংবা কোনো খণ্ডাংশের অভিজ্ঞতা নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন। এ বিভাগে রাহমান চৌধুরী তাঁর পঠনপাঠন ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'পশ্চিমবঙ্গের গণনাট্য নবনাট্য গ্রুপ থিয়েটার ও উৎপল দত্ত' শীর্ষক নিবন্ধে নিজস্ব মূল্যায়ন উপস্থাপিত করেছেন। আর 'রাজনীতি ও থার্ড থিয়েটার' নিবন্ধে বাংলাদেশের থিয়েটারের বিশিষ্ট নাট্য-ব্যক্তিত্ব কামালউদ্দীন নীলু তাঁর স্বকীয় মূল্যায়ন উপস্থিত করেছেন, যার পেছনে জনাব কামালউদ্দীনের পাশ্চাত্য থিয়েটারের ব্যাপক অভিজ্ঞতা কিছুটা স্পষ্টবাদী হতে তাঁকে সাহায্য করেছে।

এই অধ্যায়ের পরে গ্রন্থের অন্তিম অধ্যায়ে বাংলাদেশের থিয়েটার নিয়ে এ বাংলার নাট্যকর্মীদের মধ্যে কথঞ্চিৎ যে আহ্লাদ, সেই আহ্লাদের সঠিক কারণ সহ চারটি নিবন্ধ আমরা পেশ করেছি। বাংলাদেশের থিয়েটারের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত অস্তিত্ব সম্পর্কে এ বাংলাকে প্রথম অবহিত করেন 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকার প্রতিনিধি নাট্যকার নিখিলরঞ্জন দাস ১৯৮৩ সালে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর নিবন্ধে। সেই লেখার প্রেক্ষিতে এ বাংলায় বাংলাদেশের থিয়েটার সম্পর্কে যে আগ্রহ জাগে, তাকে সমৃদ্ধ করেছেন এ বাংলার বিশিষ্ট সমালোচক অরুণ সেন। অধ্যাপক সেনকে অনেকে একবগ্গা বললেও তিনি যে বেঠিক কিছু বলেন তা আমরা মনে করি না। তাঁর লেখা নিবন্ধ 'দুই বাংলার থিয়েটার : সেলিম আল দীন ও ঊষা গাঙ্গুলি'। বাংলাদেশের থিয়েটারের সেলিম আল দীন ও ঢাকা থিয়েটার সম্পর্কে অধ্যাপক সেনের বহু লেখালেখির মধ্যে এই লেখাটি নির্বাচন করার বড়ো কারণ ঊষা গাঙ্গুলি অবাঙালি উৎস থেকে এলেও তিনি আজ বাঙালি, এবং বাংলাদেশের থিয়েটারের একটি উজ্জ্বল রত্নকে তিনি যদি এ বাংলায় বা এ দেশে বাংলা বা হিন্দিতে মঞ্চস্থ করেন তবে তা হবে আদান-প্রদান নীতির এক সুদৃঢ় যোগসূত্র। ঊষা গাঙ্গুলি আজও সেলিম করেননি, বা পারলেন না, তবে তার আগে তরুণ নির্দেশক কৌশিক সেন সেলিমে হাত দেওয়ায়, আমরা খুশি। এ লেখা নির্বাচনের সঠিক

সংকেত পাঠক নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন। বাংলাদেশের থিয়েটার সম্পর্কে অরুণ সেনের অনেক আগে থেকেই এ বাংলার আশিস গোস্বামী অনুরক্ত, ও বাংলার থিয়েটার নিয়ে অনেক কাজও করেছেন; সুতরাং তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'বাংলাদেশের নাট্যচর্চাক্রম' নিবন্ধটি বাংলাদেশের থিয়েটার সম্পর্কে আমাদের সঠিক বিচারকে অনেকটাই তিনি উপস্থিত করেছেন আমরা পাঠককে আশ্বাস দিতে পারি। আর শেষ লেখা সম্পাদকের নিজের দেখা বাংলাদেশের থিয়েটারের সম্পর্কে এক উপলব্ধিমূলক বিচার। বিশ্বনাট্যচর্চার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সিকি শতাব্দীর অর্জন কীভাবে তাদের আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নাট্যনির্মাণ জাতীয় সত্তার মানবিক প্রকাশকে আন্তর্জাতিক জগতের নাট্যনন্দনের ভাষায় সর্বমানবিক হয়ে নাড়া দিয়ে আমাদের অভিভূত করতে পারে তার প্রতিবেদন এই শেষ লেখা। একটা জাতি এগিয়ে যায় তখনই যখন সে তার অন্তরকে নিজের ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে। বাংলাদেশে তার মাতৃভাষার সম্মান অর্জনের জন্য যে কাজটা আজ থেকে ৫০ বৎসর আগে শুরু করেছিল, সেই একুশের প্রেরণা থেকেই আজ সে নাট্যনির্মাণের নিজস্ব ভাষায় কথা বলে বলেই বিশ্বের নাট্য দরবারে আজ তার এত আদর।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এ গ্রন্থের সংকলিত সকল লেখকদের তাঁদের লেখা প্রকাশের অনুমতি দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ জানাই সেইসব লেখকদের যাঁরা আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এই গ্রন্থের জন্যই লেখা দিয়েছেন তাঁদের। আজ থেকে প্রায় দুবছর আগে লেখা দিয়েও প্রকাশের জন্য যাঁরা তাগাদা দেননি, তাদের ধৈর্যের প্রশংসা করি।

শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি সদ্য প্রয়াত সেই প্রকাশক সুনীল দত্তের, জাতীয় সাহিত্য পরিষদের হয়ে যিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন ২০০১ সালের বইমেলায় এ গ্রন্থ প্রকাশের; তাঁর সম্পাদিত 'নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর' গ্রন্থের সাদৃশ্যে এ গ্রন্থের তখন নামকরণ হয়েছিল 'বাংলাদেশের থিয়েটার আন্দোলনের ৩০ বছর', পরবর্তীতে শ্রী দত্ত শারীরিক ও বৈষয়িক দিক থেকে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ায় এ বইয়ের প্রকাশনা যখন প্রায় অনিশ্চিত, ঠিক সেই সময় এই ২০০২ -এর বইমেলার প্রাক্কালে আমাদের পশ্চিমবাংলার বিশিষ্ট ও বরিষ্ঠ প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং-এর সুধাংশুশেখর দে এক কথায় সুনীল দত্তের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব নিয়ে আমাদের এ বাংলা এবং ও বাংলা— দুই বাংলার নাট্যআন্দোলনের সকলকর্মীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়ে উঠেছেন; সেই সুধাংশুশেখরের উদ্দেশে আমাদের অতিপ্রশংসা বলাইবাহুল্য—কিছু অতিরিক্ত নয়। আমাদের বন্ধু 'অনুষ্টুপ' সম্পাদক অনিল আচার্যের ভাষায় সুধাংশু হলেন আমাদের বইমেলার রাজা বাহাদুর। এই রাজা বাহাদুরকে আমাদের নাট্যর গণমানুষের শ্রেণিতে নামাতে পেরেছি বলে আমরা গর্বিত। ডিটিপি কম্পোজিংয়ে ইমেজ-এর অরূপ পাল, দীপক কুণ্ডু ও লেজার গ্রাফিক্সের চন্দন রায়ের বিরক্তিহীন সশ্রম সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানাই বাংলাদেশের নাট্যনেতৃত্ব আমাদের গ্রন্থের মুখবন্ধকার শ্রীরামেন্দু মজুমদারকে। বাংলাদেশের আলোকচিত্র শিল্পী শাকুর মজিদ তাঁর তোলা একগুচ্ছ ছবি আমাদের ব্যবহার করতে দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটি নির্মাণে নেপথ্য থেকে সহযোগিতার জন্য সবিশেষ কৃতজ্ঞতা ও হার্দিক অভিনন্দন জানাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভারতস্থ উপরাষ্ট্রদূত জনাব মহম্মদ তৌহিদ হোসেনকে।

তাঁর সঙ্গে আমাদের আত্মীয় সম্পর্ক, তাঁর প্রিয়পত্নী, আমার ভগিনী জাহান আরা সিদ্দিকী, আমাদের সম্পর্কের মধ্যে সেতুবন্ধস্বরূপ। এই সুযোগে জাহান আরাকেও জানাই সবিশেষ কৃতজ্ঞতা।

কলকাতা

নৃপেন্দ্র সাহা

নটনন্দন

নাটকের কাগজ

সাম্প্রদায়িকতাকে মানবতার অস্ত্র দিয়ে প্রতিরোধ করার দৃঢ় প্রত্যয়



থিয়েটার প্রবর্তিত পদক

এবার পেলেন মামুনুর রশীদ ও খালেদ খান

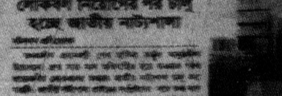




প্রসঙ্গ : ফেডারেশন লাইব্রেরী

২৫ জানুয়ারি নাট্যকর্মীদের নৌ-বিহার

শুরু হয়েছে উন্মুক্ত নাট্যকর্মশালা



লোকবল নিয়োগের পর চালু হচ্ছে জাতীয় নাট্যশালা



দ্বিতীয় বারের মতো শর্ত ভঙ্গ করলো অনুদানপ্রাপ্ত ১৫টি নাট্যদল

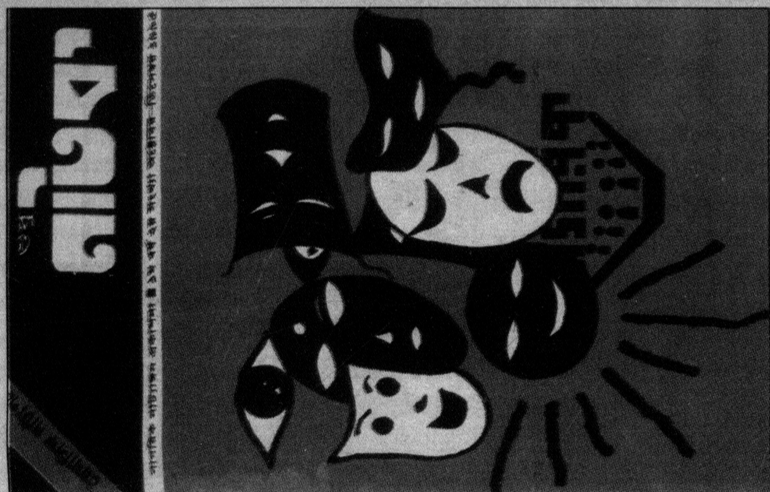
মহিলা সমিতি মিলনায়তনের জীর্ণদশা

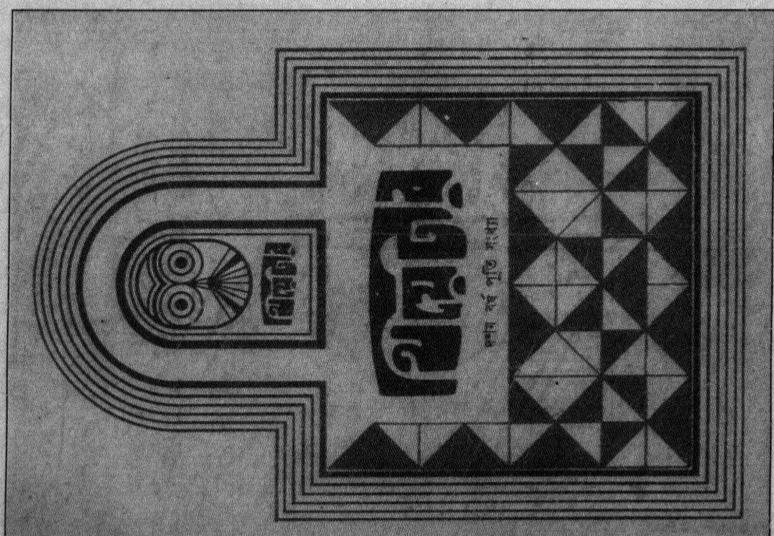
যে কোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশংকা

যাত্রাদলে লাভের চেয়ে লোকসান বেশী

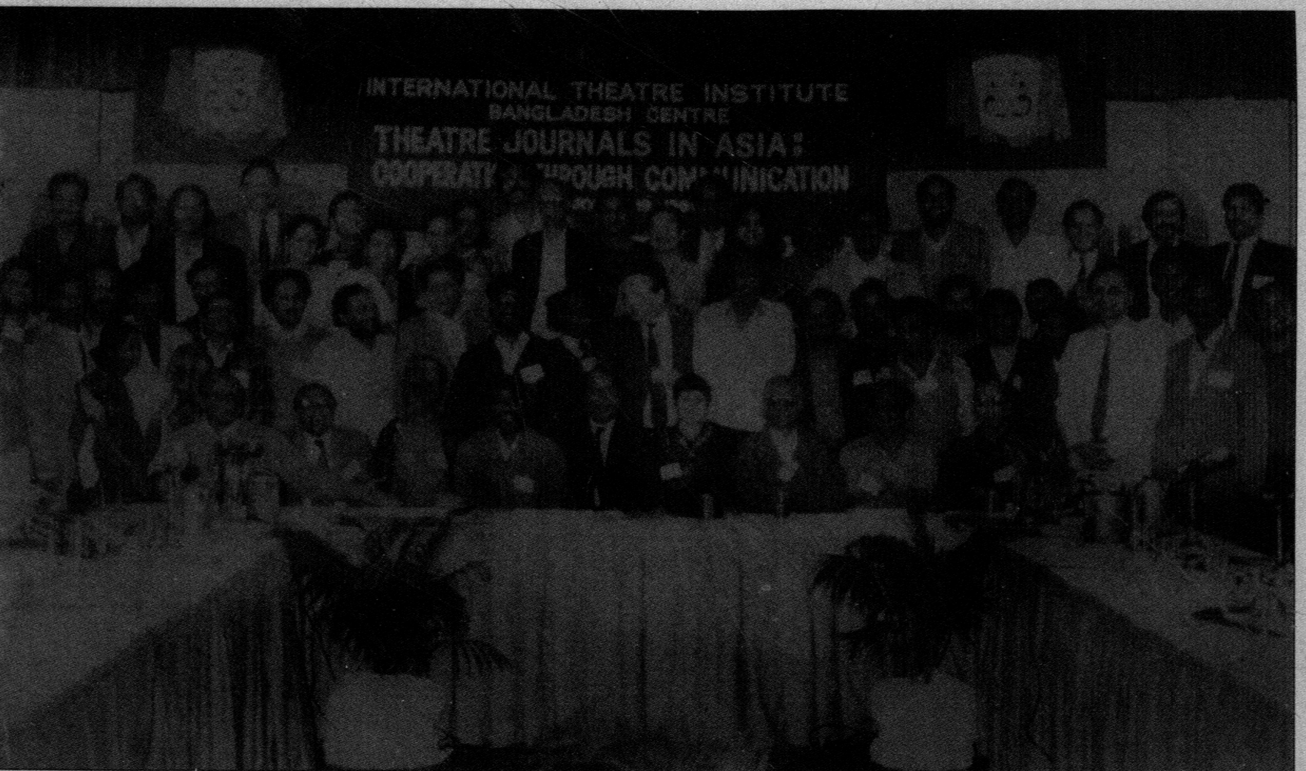
চট্টগ্রামের নাট্য মিলনায়তন ১

চিত্র ১





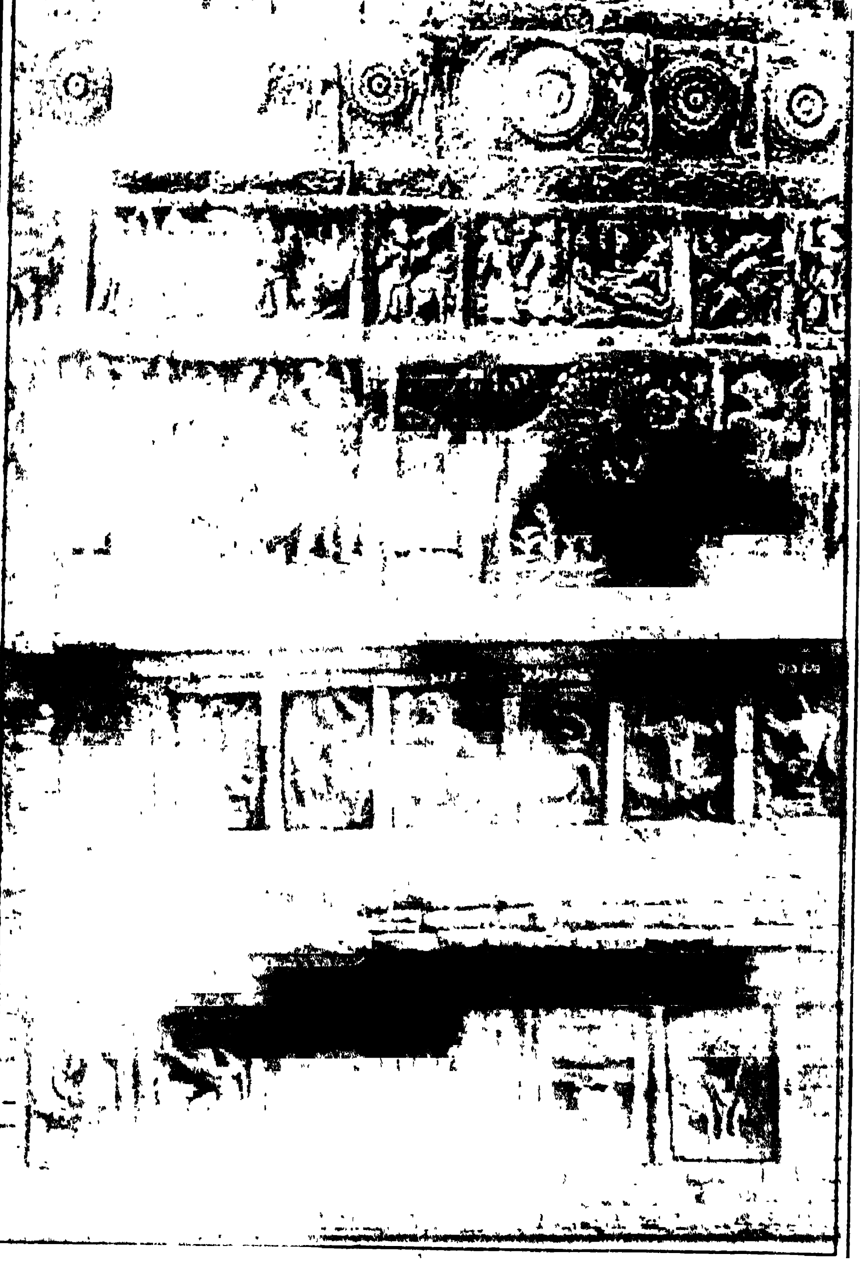
চিত্র ২


INTERNATIONAL THEATRE INSTITUTE
BANGLADESH CENTRE
THEATRE JOURNALS IN ASIA:

চিত্র ৩

চিত্র ৪

নাট্যের
সন্ধানে



মঞ্চের অন্দরে সমাজের অভ্যন্তরে

শওকত ওসমান

আমি চাটগাঁ শহরে এক ভদ্রলোকের অতিথি ছিলাম অনেককাল পূর্বে। ছোটো টিলার উপর দোতলা বাড়ি। ছাদটি মনোরম। প্রাকৃতিক দৃশ্যমণ্ডিত এবং অনেকদূর পর্যন্ত চোখ মেলে দিলে দৃষ্টির কোনো ব্যাঘাত ঘটত না। সোজাসুজি দেখা যেত আর এক ছাদ টিলার উপর। প্রকৃতির রাজ্যে বাস করলেও ওই গৃহস্বামী ছাদে বাগান তৈরি করেছিলেন। তার মধ্যে খানকয় বেতের চেয়ার ও একটি নাতি-উচ্চ বেতের টেবিল পাতা। ছাদের কোণে ছিল শেল্‌ফের মতো খাঁচা। ক্যানারি জাতীয় পাখি বোঝাই। তাদের কিচিরমিচির শোনা যেত রাত্রি স্তব্ধতায় অথবা খুব সকালে। ওই ছাদে হামেহাল নানাদৃশ্যের অবতারণা ঘটত। কখনও গৃহস্বামী একা ছাদে হাঁটছেন অথবা গাছপালার খবরদারিতে ব্যস্ত। হাতে ঝারি। কখনও এক সঙ্গীর সাথে সিগারেট ফুঁকছেন। কোনো কোনো সন্ধ্যায় চার-পাঁচজনের আড্ডা নারীপুরুষ-সমন্বিত। রাত্রে ছাদে আলোর ব্যবস্থা ছিল। একদিন দেখা গেল, দুই তরুণ-তরুণী ঘন সান্নিধ্যে আলাপরত। এমনতর নানাদৃশ্য চোখে পড়ত। একটি কথাও অবিশ্যি শোনা যেত না।

আলোকপাতের ব্যবস্থা আছে। কুশীলব আছে। দৃশ্যের পরিবর্তন আছে। সব মিলিয়ে নাট্যমঞ্চের আবহ। তবু ওই ছাদখানা মঞ্চ, এমন প্রশ্ন কেউ সহজে মেনে নেবে না।

গণ্ডি বাড়িয়ে সামাজিক পূজাপার্বণ, উৎসবের কথা ধরা যাক। সেখানে কোনো ব্যক্তিই ভূমিকাহীন থাকে না। বিবাহ উৎসবের ক্ষেত্রে কন্যাপক্ষ, বরপক্ষ, পাত্রীর পিতা, মোল্লা, পুরোহিত এবং নিমন্ত্রিত আত্মীয়-স্বজন সকলের নিজ নিজ ভূমিকা আছে। সময়ও সেখানে থিয়েটারের মতো নির্দিষ্ট বইকি! হয়তো টিকিট কিনতে হয় না কাউকে। তা-ও বলা চলে না। নিমন্ত্রিতদের পত্র দেওয়া হয়। দৃশ্যাবলি মজুদ। তবু বিবাহ উৎসব নাটক-অভিনয়ের পর্যায়ে পড়ে না। অথচ মিল প্রচুর।

রসিক ব্যক্তি যিনি সংসারকে সার বা শ্রেষ্ঠ সং বলেছিলেন, তাঁর কথার পিছনে হয়তো পরাবিদ্যাগত (মেটাফিজিক্যাল) নৈরাশ্য লুকিয়ে ছিল। কিন্তু মঞ্চের ইঙ্গিত দিতে তিনি ভোলেননি।

খুনের বিচারে ফাঁসির দণ্ডাদেশের পরে কী পূর্বে একটা আদালত জুড়ে কম নাটক অভিনীত হয় না। খুনি, তার আত্মীয়-স্বজন, নিহতের শুভানুধ্যায়ীবৃন্দ, দুপক্ষের উকিল ব্যারিস্টার, সাক্ষী, বিচারক— এবম্বিধ সব মিলিয়ে মানবিক আচরণের এক প্রচণ্ড ঘূর্ণী-আবর্ত। কিন্তু আদালত থিয়েটার নয়, যদিও সাদৃশ্য অনস্বীকার্য।

উভয়ের গরমিল আছে বইকি।

ক্ষেত্র অন্যত্র।

দৈনন্দিন জীবনের প্রবাহ বাস্তব। তা আদৌ কৃত্রিম নয়। মঞ্চের ঘটনা বিপরীত এবং একান্ত পূর্ব-পরিকল্পিত। শিল্পের তাগিদ সেখানে মূল নিয়ন্ত্রক।

নাট্যকার এবং পরিচালক পাশাপাশি পুতুলের রশি হাতে উপবিষ্ট। জীবনের প্রবাহ ক্রমাগত ধাবমান। ছাদনাতলার পর বিবাহের মুলতুবি ঘটে না। অপ্রত্যাশিত সেখানে কিছু পৌঁছে যেতে পারে। কন্যাপক্ষে বরপক্ষে দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল উৎসবের শামিয়ানার নীচে। শাস্ত্রকারগণ বলেছেন, অপর নাম লীলা। তার হেরফের অদলবদল, বিন্যাস অনন্ত নিরবচ্ছিন্নতায় বাঁধা। মঞ্চের ঘটনা পূর্বনিয়ন্ত্রিত। তার প্রারম্ভ পরিসমাপ্তি একই খাতে সীমাবদ্ধ। মঞ্চে নিহত সৈনিক আবার বেঁচে ওঠে, প্রাত্যহিকতায় যা অসম্ভব। হুগলি নদীর বুভুক্ষু বুক রঙ্গমঞ্চ হলে সহজাত অভিনয়-নৈপুণ্যের

প্রতিমা কেয়া চক্রবর্তীকে অকালে হারানোর ব্যথাতুর প্রশ্ন কোনো কালে উঠত না। বিদ্যাসাগরের চটি অভিনেতা শিবে গ্রহণ করেছিলেন, চার্মিক প্রহার তবু চার্মিং। বাস্তব জীবনের চটির এমন কদর কেউ দিয়েছে— কোনো প্রহৃত জন, আজও জানা নেই। মঞ্চ কল্পনার ইমারত। বাস্তব জীবনে বড়ো জোর দিবাস্বপ্ন দেখা চলে। তা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তেমন সংক্রমণ যদি ব্যাপক হয় এবং ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ যৌথভাবে কোনো এক শ্রেণী আত্মরক্ষার উদ্দেশে অপর শ্রেণীকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। পীব-পুরুত ভণ্ড পলিটিশিয়ান এস্টাবলিশ্‌মেন্টের ভেল্কি দেখানোর জন্যে ভাড়াটিয়া গোলাম রূপে নিয়োজিত।

মঞ্চের ক্রিয়াকলাপের বিশেষ উদ্দেশ্য তার ফলশ্রুতি দর্শকদের চোখে তুলে ধরা। উত্তম পরিচ্ছদগর্বী ব্যক্তি ডাঁটে রাস্তার উপর হাঁটে অপরকে দেখানোর জন্যে। সে জবরদস্তি খাটাতে পারে না। মঞ্চে জবরদস্তি আছে, দেমাক অনুপস্থিত। এই সব ক্রমান্বয়ে সজ্জিত দৃশ্যাবলি উপলক্ষমাত্র। গৌণ উদ্দেশ্য সমগ্রতার স্পর্শদান। সেদিক থেকে দৃশ্যমাত্রেই প্রতীক। এবং প্রতীকের অর্থ তার অবয়বে থাকে না। মঞ্চমায়ার তাৎপর্য এখানে নিহিত। সমাজের ঘটনায় এই মায়া গরহাজির, শঙ্করাচার্যের দোহাই সত্ত্বেও।

অবশ্যি মঞ্চের ক্রিয়াবলি সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন নয়। নাটকের বিষয়বস্তু, ফর্ম, এমনকী মঞ্চসজ্জা অভিনয়-পদ্ধতি কালের মেজাজেই গঠিত হয়। 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' যোগেশের আর্তনাদ এক যুগের স্মারক হিসেবে স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র রাখেন। য়ুরোপের শিল্পবিপ্লবের প্লাবনধারা এ দেশের ভিটেমাটিও স্পর্শ করে। কৃষি-ভিত্তিক সমাজের যৌথ পরিবার স্বভাবতই ধাক্কা খায়। পুরাতন কাঠামো বজায় রাখা দায়। ব্যক্তিতান্ত্রিকের অনু-বেদ (সেনসিবিলিটি) কলাগাছের মতো ঘন-সান্নিধ্য যৌথ পরিবারের শিকড়গ্রাহী হতে নারাজ। পুরাতন আবরণে ফাট ধরে। যুগ-সন্ধিক্ষণের নাগরিক যোগেশ আর্তনাদ করে। কালের রথচক্র থামানো তার সাধ্যাতীত, সে জানে না। আবার ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বেগবান প্রসার-মুহূর্তে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বীর নায়ক খুঁজে পান ইতিহাসে এবং শালপ্রাংশু অটল ব্যক্তিত্বের প্রতিমা খাড়া করেন, সেখানে ভিলেন হিরোর একদম বিপরীত নয়, বরং ব্যক্তিত্বের দিক থেকে সহধর্মী। এমন ইতঃক্ষিপ্ত নয়, বহু বিন্যস্ত উদাহরণ বিশদ দেওয়া যায় নাটক ও সমাজের সম্পর্কের ব্যাপারে।

পশ্চিমবঙ্গেই, এখন দেখা যায়, বহু নাটকের মঞ্চায়ন, রাজরোষের জন্যে যা দুদশক পূর্বে চিন্তা করা কঠিন ছিল। এক জাতীয় নাটকের জনপ্রিয়তা প্রচুর বেড়েছে, কায়েমি স্বার্থ বা এস্টাবলিশ্‌মেন্ট বিরোধী। আবার সমর্থ গোষ্ঠীরও আগাছা সংখ্যায় কম নয়। নিছক অবসর বিনোদনের নাটক হয়তো থাকতে পারে। কিন্তু যেখানে সমাজে প্রত্যেক শ্রেণি নিজ নিজ চৌহদ্দিসচেতন হয়ে ওঠে বা পোলারাইজেশানের মন্থনে পড়ে যায়, সেখানে নিছক অবসর বিনোদন পরোক্ষভাবে প্রতিক্রিয়ার ঢাক হয়ে পড়ে। হয়তো ছদ্মবেশ সহজে ধরা পড়ে না।

য়ুরোপেও দেখা যায় বিবর্তনের ধারা সামাজিক মেজাজের সমান্তরাল। ধর্মীয় প্যাশন প্লে কোণঠাসা হয়ে গেল, রাষ্ট্র হল চার্চের দাপট-মুক্ত। ক্রমশ সেক্যুলার জায়গা নিল পূত-পবিত্রতার এবং জনপূজ্য না বলে বলা যায় জন-শ্রদ্ধেয় হয়ে পড়ল। সামাজিক ক্রমবিকাশের এই ধারা, প্রায় শাশ্বত। কিন্তু অতীত মুছে যায় না, ছদ্মবেশে উদিত হয়। পুরাণের যুগ বিগত। কিন্তু সাহিত্যে, কাব্যে, শিল্পকলায় তার উপস্থিতি অবিসম্বাদিত। নিষ্ঠাবান সজ্জনের উপমায় যুধিষ্ঠির হাজির হন। বিষ্ণু দে কুরুক্ষেত্র-উত্তর যদুবংশের পটে ভারতীয় অবক্ষয়ের ছবি আঁকেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লোকান্তরিত কবি কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সৈনিককে মৈনাক হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। অতীত সমাজ আর থাকে না। তার পটস্মৃতি কিন্তু অনির্বাণ। ঐতিহ্যের এমন সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য। কারণ— 'কোথা যাব?'— এই প্রশ্নের সঙ্গে আর এক জিজ্ঞাসা স্বতঃই জড়িত থাকে, 'কোথা থেকে এলাম?'

সমাজের খপ্পর রঙ্গমঞ্চ এড়াতে অক্ষম। পেছনে যদি সামাজিক স্যাংশান না থাকে সব ভণ্ডুল হয়ে যায়। রঙ্গমঞ্চ নিজেই কৃত্রিম। সেখানে যারা হাসে, কাঁদে, কথা বলে, তারা কেউ বাস্তব চরিত্র নয়। তারা অন্য ভূমিকার বাহনমাত্র। মঞ্চের সম্রাট পরদিন বাজার সরকার। মঞ্চে স্বৈরিণী, ব্যক্তিগত জীবনে আদর্শ গৃহিণী বা কুমারী। সেখানে মৃত্যু মৃত্যু নয়। অভিনয় শেষে যে যার মেকআপ তুলে কিছু পূর্বে মৃত বা জখম অভিনেতা অভিনেত্রী ও অন্যান্যরা বহাল তবিয়তে বাড়ি ফিরে যায়। সবই যুক্তিবিরোধী, ইররাশনাল ব্যাপার। তবু যুক্তিবাদী দর্শক সেখানে ছুটে যায়। তারও এই সব কৃত্রিমতার পেছনে অজানিত-জানিত সমর্থন আছে। সামাজিক মানবগোষ্ঠীর ব্যষ্টি বা ইউনিট হিসেবে ইররাশনালিটির পক্ষে তার স্যাংশান অগ্রিম প্রদত্ত। বিদেশি এক মনীষী লিখেছেন যে থিয়েটার দর্শকেরাই অতীত কালের আদিম জনগোষ্ঠী।

চত্বরে অংশগ্রহণকারী অবস্থান এবং ঐন্দ্রজালিক গুহার মুখে এক পাথরের বেদির উপর আসীন। ফাবাক স্পষ্ট। যেন এ যুগের অডিটোরিয়াম এবং রঙ্গমঞ্চ। সামাজিক সমর্থন না থাকলে ঐন্দ্রজালিকের কাণ্ডকারখানা বন্ধ হয়ে যায়। অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাস তার এক প্রধান শর্ত। গ্রামাঞ্চলে চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ব্যাধি-নিরাময় উপলক্ষে 'ভূত নামানো' হত। তার প্রক্রিয়া-উপাচারের জঙ্গলে প্রবেশ এখানে নিষ্প্রয়োজন। এখন আর সেসব দেখা যায় না। হয়তো কোথাও কোথাও থাকতে পারে। অবশ্যি ধাতু পরিবর্তন দ্বারা সোনা তৈরি সক্ষম সাধুদের প্রতারণার কাহিনি এখনও সংবাদপত্রে কালেভদ্রে প্রকাশিত হয়। এখানে মোদ্দা কথা, অলৌকিকতায় বিশ্বাস। সামাজিক সমর্থন ছাড়া বুজরুকি দেখানোর সুযোগ থাকে না। অনেক সামাজিক বা ধর্মীয় উৎসব টিকে থাকে, বিশ্বাসের মূল শিথিল হওয়া সত্ত্বেও। কিন্তু তার মধ্যে অতীতের স্পিরিট বা মর্মতেজ অনুপস্থিত। বর্তমান যুগে পূজা উৎসবে তাই ক্রিয়াচার অপেক্ষা সামাজিক দিকই প্রধান হয়ে ওঠে। সামাজিক সমর্থন নির্মূল হয়ে গেলে পূজা-উৎসবও যাদুঘর বা গবেষকের বিষয়ে পরিণত হবে। প্রাচীন গ্রিসে রোমে পূজা-পৌত্তলিকতা ছিল। আজ আর নেই। মধপ্রাচ্যে আরব দেশে সমাজ-বিপ্লবের ভেতর দিয়ে এমন পরিবর্তন ঘটেছে। নানাকারণে বিশ্বাসের মূল ঢিলে হয়ে গিয়েছিল। বাঙালির 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' প্রবাদ এখন বাত কা বাত। ভেতরে ফাঁকা। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূজারী ব্রাহ্মণ হরিহরকে কাল পূর্বেই হরণ করে নিয়েছিল। অতঃপর অস্তিত্ব সংগ্রামের তাড়নায় কাশীধামে উপনীত অপু এবং সর্বজয়ার সম্মুখে হরির ঈশ্বর তার প্রাণ চিরতরে হরণ করল। দ্বিতীয় ঘটনা ঘটনার জের মাত্র। যজমানের পশার ধীরে ধীরে এযুগে অন্তর্হিত।

মঞ্চের মিথ্যার পেছনে সামাজিক অনুমোদন স্বভাবতই থাকে। তাই আধুনিক যুক্তিবাদী দর্শক সেখানে জড়ো হয় পকেটের আসক্তি ত্যাগ করে। একদিকে যা সে দিয়ে দিয়েছে, তাই-ই যেন সে আবার ফেরত পাওয়ার প্রত্যাশী। প্রাচীন ঐন্দ্রজালিকের প্রস্তরবেদিরই আদল বর্তমান যুগের রঙ্গ-মঞ্চ। অডিটোরিয়াম আর এক এলাকা। ফারাক স্পষ্ট। এই ঐন্দ্রজালিক মণ্ডপে বসে দর্শক জীবনের দৃশ্য অবলোকন করে। অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞায় অনুকরণ কোনো ব্যক্তির অনুকরণ নয়। মঞ্চে অনুকৃত হয় জীবন এবং অ্যাক্শান। অ্যাক্শান অর্থ অস্তিত্বের নানা টানাপোড়েনজাত বুননি। কিন্তু সেখানে কেউ বাস্তব জীবনযাপনকারী নয়। পেশাদার অভিনেতারও অন্য ভূমিকা আছে নাগরিক হিসেবে। সে জনক, ভ্রাতা, স্বামী, রাজনৈতিক পার্টির সদস্য— এমনতর নানা তার দায়িত্ব এবং সেখানে সে অভিনয় করে না আদৌ। বড়ো জোর, ভণ্ডামি করতে পারে। অথচ মঞ্চে তার দায়িত্ব সীমিত, সীমাবদ্ধ। নাট্যকার পরিচালক কর্তৃক পূর্বেই নির্দেশিত। মঞ্চ মরীচিকার মধ্যে দর্শক আবার নতুন করে সংশ্লিষ্ট ওতপ্রোতভাবে। সে-ও জীবনের কোনো এক খণ্ডের দর্শক। তার নিজস্ব চিন্তা ভাবনা উদ্দীপিত হয় এই আসরে। সে কিন্তু স্থাণু। একক চেয়ারে আসীন। স্বভাবতই টেন্শান সৃষ্টি হয়। এই মানসিক পর্যায় তাকে বিভিন্ন দৃশ্যের ভেতর দিয়ে চালনা করে। সে যেন স্বপ্নদ্রষ্টা এবং

বিছানায় শায়িত। নির্জ্ঞান-অবচেতন মনের জানালাগুলো তখন খোলা। নির্জ্ঞান নিজে অনড়, অথচ দৃশ্য সচল। সেখানে কিছুই অবাস্তব মনে হয় না। তাই স্বপ্নে যেমন সে কাঁদে, হাসে, কী নানা ধরনের সুখ বা দুঃখ ভোগ করে, মঞ্চে তেমনই মরীচিকার উৎস। দর্শকের যৌথ-গোষ্ঠীমানস পূর্বেই এমন মিথ্যে স্যাংশানদাতা। এবার একান্ত ব্যক্তিমানুষ হিসেবে সে যেন আত্মসমীক্ষার মুখোমুখি এবং নিজের মনের কষ্টিপাথরে যাচাইয়ে সে ব্যক্তিমানব হয়ে ওঠে।

সমাজের ফাংশান অনেক বেশি জটিল। শৃঙ্খলার দিকে দৃষ্টি অপরিহার্য। এক কাতারে না আনতে পারলে প্যারেড হয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রস্তুতি শৃঙ্খলার ভেতর দিয়ে আসে। সামাজিক দলবদ্ধ জীবনে ফ্রি-ফর-অল বা স্বেচ্ছাচারিতার জায়গা নেই। সমাজে থাকতে গেলে তাই প্রত্যেককেই ব্যক্তিসত্তার অংশবিশেষ বিসর্জন দিতে হয়। কিন্তু বিসর্জন দিতে দিতে যদি সব চলে যায়, তখন সে আর মানুষ নয়, হয় দলাপাকানো পিণ্ড অথবা পুতুল যার অদৃষ্ট অদৃশ্য অন্য কারো হাতের সুতোর উপর নির্ভরশীল। এমন ক্রীড়নকেরা সমাজ-প্রগতির আদৌ সহায়ক নয়, বরং নানা অনর্থের খোঁট। তাই সমাজের দায়িত্ব থাকে যেন ব্যক্তির সত্তা পুরোপুরি ধ্বংস না হয়ে যায়। কিন্তু শ্রেণিবিভক্ত সমাজে নানাস্বার্থের টাকু ঘোরে। বিভিন্ন ভাবধারার সংঘাত সেখানে অনিবার্য এবং মাৎস্যন্যায় অতীব প্রকট। ব্যক্তি গড়ে তোলার দায়িত্ব আদর্শে থাকে, বাস্তবে গায়েব। সুস্থ সামাজিক জীবন রচনায় তাই শূন্যে সূক্ষ্ম তারের উপর হাঁটার মতো কঠিন খেলা, প্রধান শর্ত হয়ে পড়ে। ব্যক্তি মানুষকে সামাজিক মানুষরূপে গড়ে তোলার দায়িত্ব অপরিহার্য, তেমনই তাকে ব্যক্তিমানুষ রূপে নির্মাণের দায়িত্বও ততোধিক। একক তারের উপর দ্বৈততার এই খেলা সমাজে পুরোপুরি সফল হয় না। সামাজিক সংহতি রক্ষায় ব্যক্তিত্ব থেঁতলে যায়। আবার ব্যক্তিত্ব বাঁচাতে গেলে সংহতি মারা যায়। বিপদ দুই দিক থেকে। মেলানোর দায়িত্ব খুব সহজ নয়। সুষ্ঠু বাঁচার তাগিদেই সমাজে আর্ট বা শিল্পের আবির্ভাব।

পূর্ণতার এষণা শিল্পই প্রদানে সক্ষম। পরিবেশ-জাত ভবিষ্যৎ-প্রত্যাশা সেখানে সঞ্চালক শক্তি বা মোটিভেটিং ফোর্স। মানুষের কল্পনাশক্তির উৎসও এইখানে নিহিত। চেনাজানা প্রত্যয় কিংবা সামগ্রী থেকে নতুন কিছু নির্মাণক্ষমতার অপর নাম কল্পনা। ইতিহাসের জটিল-কুটিল সড়ক ধরে কল্পনা জগতেরও নিজস্ব ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে হাজার হাজার বছর ব্যাপী। তাই আধুনিক কালের শিল্পকারিগরদের পরিবেশ এবং শিল্পের ঐতিহ্য— দুয়ের ওপরই নির্ভর করতে হয়। এই পথেই অভাবনীয় কিছু হাজির হয়। সাম্প্রতিক উদাহরণ : ফিল্ম বা ছায়াছবি। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির আবহে পেন্টিং, সংগীত, কাব্য, নৃত্য, উপন্যাস, গল্প, নাটক, স্থাপত্য, ভাস্কর্য— সবই ওই পৃথিবীর নবতম আর্ট-ফর্মের ছায়ার নীচে যৌথ নটবিহারী।

মঞ্চে আধুনিককালে সময়ের গণ্ডি অল্প। তারই মধ্যে থিয়েটার দর্শকের নব জন্মলাভ ঘটে। মঞ্চের কার্যকলাপের পেছনে রয়েছে তার পূর্বতন স্যাংশান যৌথজীবনের শরিক হিসাবে। কিন্তু তার তৎকালীন ভূমিকা ব্যক্তি মানবের। মঞ্চমায়ার ভেতর দিয়ে বিচ্ছিন্ন সম্পর্কের মুখোমুখি হয় সে পুনর্বার। ছিন্ন শিকলের হারানো আংটা আবার সে ফিরে পায়। সমাজের যৌথ জীবনের সঙ্গে সংগীত খুঁজে না পেলে, ব্যক্তির পক্ষে শুধু একাকিত্ব তার বিকাশের অন্তরায়। শিল্পের সেতু তাকে এই গড়খাই পরিখা পার করে দেয়। নতুন সামঞ্জস্য সাধনের সুযোগ পায় দর্শক বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে। অ্যারিস্টটল যাকে ক্যাথারসিস বা বিশুদ্ধ চিত্তমোক্ষণ বলেছিলেন, তার বহু ভাষ্যের সঙ্গে ঐ কথাও যোগ করা যেতে পারে। শিল্পের বিকাশে যৌথ গোষ্ঠী উৎসবই ছিল প্রধান উৎস। আবেষ্টনীর চাপে নৃত্য সংগীত কাব্য অভিনয় আদি আজ স্বতন্ত্র নামের দাবিদার। আদিম যুগে তারা ছিল একই বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখা। কালে কালে প্রত্যেক ডালের ঝুরিউদ্‌গত স্বতন্ত্র বৃক্ষের উৎপত্তি। মূল লক্ষ্যে আজও সব শিল্প এক। সড়ক কেবল আলাদা হয়ে গেছে। প্রতি ক্ষেত্রেই শিল্পমায়ার হাতছানি

মানুষকে যৌথজীবনের আসরে টেনে নিয়ে যায়। এই প্রক্রিয়া সমাজ-জীবনে সংহতি এবং ব্যক্তির সঙ্গে পরিবেশের সঙ্গে সংগতি স্থাপনেব এক বিরাট হাতিয়ার। পূর্বে উল্লিখিত, সামঞ্জস্য সাধনের জন্যে সমাজের দাপট থাকে। কিন্তু তার কার্যকারিতা সব সময় সুফলপ্রদ নয়। সংহতির দিকে ঝোঁক পড়লে ব্যক্তিসত্তা চিড় খায়। ব্যক্তিসত্তার প্রশ্রয় দিলে সংহতি বিনষ্ট হয়। অথচ সমাজকল্যাণ ও প্রগতির উদ্দেশ্য অপরিহার্য। এমন দায়িত্বের কার্যকর দোসর শিল্প। এই পরিপ্রেক্ষিতে নাটক, মঞ্চ ইত্যাদি অপরিহার্যতা সর্বৈব আধুনিক জীবনে— যাব চত্বরে বর্তমান অস্তিত্বের জটিলতা আদিমকাল অপেক্ষা ঢের বেশি গ্রন্থিল এবং আবর্ত-স্পন্দিত। সমাজের চাপ আসে বাইরে থেকে। ভেতরের চাপের উপাচার সমাজ সাজিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তা পুরোপুরি কার্যকর হওয়ার জন্যে ব্যক্তিসত্তার প্রশ্ন থেকেই যায়।

বিস্ময়কর এই ধাঁধা। সমাজ পুরোপুরি সক্ষম নয়, অথচ, একই ক্ষেত্রে শিল্প পারঙ্গম। হ্যাঁ, ঘটনা প্রায় তা-ই। আর তাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত জলজ্যান্ত অতি বাস্তব হত্যা, খুন, মৃত্যুতাণ্ডব— নানাবিধ লোমহর্ষক ঘটনা সকালে চায়ের সঙ্গে বেশ মেজাজি আরামে গলাধঃকরণ অব্যাহত থাকে। অথচ, সবুজ ধোঁয়া নিকাশের উদ্দেশে বিশেষভাবে তৈরি শরৎচন্দ্রের গাঁজার দু'চিলিম জাত হতাশ-প্রেমিক দেবদাসেব জন্যে বহু তরুণ চোখের জলে বালিশ ভেজায়। পার্বতী, চন্দ্রাবতী, চুণীলালরা চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে। এরা নিছক কল্পনার সৃষ্টি। কিন্তু পরিণাম ভিন্নতর। সংবাদপত্রের বাস্তব কোনো কালে সেখানে পৌঁছুতে পারে না।



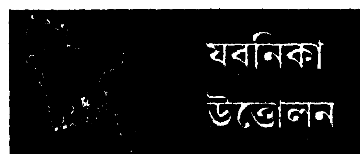
ক



খ



গ


যবনিকা
উত্তোলন

Calcutta, Monday, the 21st of March, 1796.

BENGALLIE THEATRE,

of Mr Lebedeff

No. 25,

DOOMTOOLAH.

THE DISGUISE,

A Comedy, in three Acts,

Written by M. JODDRELL, ESQ.

TRANSLATED

ACT I. Entirely Bengalese.—ACT II, Scene the First, into Moors,—the Second Scene into Bengalese, and the Third (and last) Scene of this Act, will be delivored in English.—ACT III. translated entirely into Bengalese.

In the original, the Scenes are laid out in Spain; but in the translation, the Scenes are changed to this Country;—the Places spoken of, instead of being Madrid and Seville, are Calcutta and Lucknow; and the Names of the Persons in the Drama, are changed from European Names, to proper Names of this Country; as follows:

লিয়েবেদেফের মানস-ভূগোল

হায়াৎ মামুদ

গেরাসিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদেফের অস্থির, স্বপ্নতাড়িত ও উদ্দীপনাময় সমগ্র জীবন যদি পর্যালোচনা করি তাহলে স্বভাবতই মনে হয়, তিনি সর্বাংশে য়োরোপীয় অষ্টাদশ শতকের যুগলক্ষণাক্রান্ত পুরুষ। তিনটি বিপ্লবের সূতিকাগৃহ, এ সেই যুগ যা পরবর্তী মনুষ্যসভ্যতাকে একটি নির্দিষ্ট অবয়ব দান কবতে চেয়েছে; এ সেই 'আলোকিত যুগ' যখন য়োরোপীয় ভূখণ্ডের মানুষ মনুষ্যজীবন ও সমাজে যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করেছে, সর্বৈব প্রকার জাগতিক অনুসন্ধানে (দেশজয়, বাণিজ্যপ্রসার, শিল্পবিপ্লব, বিজ্ঞানচর্চা ও শিল্পসাধনা) আত্মনিয়োগ করেছে।

লিয়েবেদেফ 'শিক্ষিত' না হয়েও যে 'আলোকিত' মানুষ হতে পেরেছিলেন তার কারণ যুগের হাওয়া। তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক ও গুণগ্রাহী কাউন্ট রাজু মোফ্স্কির পক্ষপুটের নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে অনির্দিষ্টে ছুটেছিলেন কোন লাভের আশায়? লিয়েবেদেফের ভবঘুরে জীবনেব পিছনে কোন চালিকাশক্তি কাজ করেছিল? এমন ভাবলে অযৌক্তিক হবে না সেই elan vital-এর নাম নিজের পুরুষকারে বিশ্বাস ও অজানিতকে আবিষ্কারের অন্তর্গত তাড়না—উভয়ই অষ্টাদশ শতকী চারিত্র্য। তাঁর এষণা যদি শুধুমাত্র তাঁর বৃত্তি অর্থাৎ সংগীতেব জগতে সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে একরৈখিক চরিত্র হিসেবে তাঁর বিচাব সাধারণ অথচ সৃষ্টিশীল একজন স্বাভাবিক মানুষের মানদণ্ডে হত। তাঁর অসাধাবণত্ব এখানেই যে তাঁর মেধা বহু-আয়তনিক ও শাবল্যময়। লিয়েবেদেফ্-বিশেষজ্ঞদের এই মত আমি একেবারেই মানতে রাজি নই যে ভারতবর্ষে তিনি এসেছিলেন প্রধানত জ্ঞানান্বেষণের তাড়নায়। আমাব নিকট এর চেয়ে অনেক বেশি বিশ্বাস্য ও যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয় তাঁর নিজেরই সত্যভাষণ যা তিনি তাঁর 'মেমোরেন্ডাম'-এ বলেছেন : 'not without an honest view of improving my Finances'. যদিও এই উক্তি তাঁর কলকাতা আগমন প্রসঙ্গে, তবুও তা ভারতবর্ষ— যেখানে ধুলোমুঠি সোনামুঠিতে রূপান্তরিত হয়, সেই এলদোরাদো যাত্রার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে আমার স্থির বিশ্বাস। এই তাঁর মর্ত্যসীমা · তাঁর জাগতিক বিষয়বুদ্ধি ভারতবর্ষে আসার আদি প্ররোচক। এই সীমা চূর্ণ হয় তাঁর অবচেতনের স্বপ্ন জয়ী হলে অর্থোপার্জন নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর ও দূরপ্রসারী চিন্তা এক নতুন পৃথিবীর মনোজগৎ আবিষ্কার।

একি আশ্চর্য নয় যে তিনি সংগীতজ্ঞ হয়েও ভারতবর্ষীর সংগীতের প্রতি কোনো আত্মিক দুর্বলতা বা তার জন্য কোনো অনুসন্ধিৎসা অনুভব করেননি, তিনি ঝুঁকে ছিলেন ভারতবর্ষের ধর্ম, সংস্কৃতি ও লোকাচার, গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিকে? এর কারণ একটিই হতে পারে এবং তা এই যে, তিনি বুঝেছিলেন— এদেশের সংগীতকলা এতখানিই বিমূর্ত ও আধ্যাত্মিক যে তার কাছে যেতে হলে একেবারে মূল থেকে শুরু করতে হবে আর সেই মূল যেখানে প্রোথিত তার নাম ভারতবর্ষীয় জীবনবীক্ষা ও দর্শনচিন্তা যা আবার সংস্কৃত না জানা পর্যন্ত দুয়ার বন্ধ রাখে। অষ্টাদশ শতকে সংস্কৃত এমন কোনো 'জীবন্ত' ভাষা ছিল না যে ব্যবহারিক প্রয়োজনের দাবিতে তিনি তা শিখতে যাবেন। তাঁর প্রথাসিদ্ধ বিদ্যালাভ ঘটেনি, একাডেমিক মানুষ তিনি ছিলেন না যে কোনো বিশেষজ্ঞ হওয়ার স্বপ্ন তাকে সংস্কৃতশিক্ষায় প্রেরণা দেবে। মাদ্রাজে সংস্কৃত শিখতে পারেননি বলে তাঁর আক্ষেপ ছিল, কলকাতাতেও প্রথম দুবছর শিক্ষক খুঁজেছেন, আমরা জানি। কিন্তু এত অতৃপ্তি কীসের জন্যে? সংস্কৃত শিখলে তাঁর লাভ কী? ভাষা নয়, ভারতীয় সংগীতই হয়তো তাঁর লক্ষ্য। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো যুক্তি আমি খুঁজে পাই না। কিন্তু একবার যখন সংস্কৃত শিখতে শুরু করলেন

তখন তাঁর নিজের প্রকৃতিগত বহুভাষিক প্রবণতা (ইংরেজি, ফরাসি ও সম্ভবত জার্মানও তিনি জানতেন) তাঁকে ভাষাচর্চার দিকে ঠেলে দিল। সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানে তিনি ক্রমশ আকৃষ্ট হন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিকে। আর বাংলা ভাষাকে আয়ত্ত করার প্রচেষ্টাতেই নাটক অনুবাদ, এবং অনূদিত গ্রন্থ যেহেতু নাটক, অতএব তার মঞ্চায়ন সম্ভব হলে তো সর্বোত্তম— এই তাঁর মানসিক যুক্তিপাবম্পর্য বলে আমার বিশ্বাস।

তাঁর জীবনের যতটুকু ছবি আমাদের কাছে স্পষ্ট তাতে তাঁর মনের গড়ন এই ক'টি মূল প্রবণতা নিয়ে তৈরি বলে মনে করি : adventurism, দৃঢ় মনোবল ও কষ্টসহিষ্ণুতা, শিল্পকলাপ্রবণ সুকুমার অনুভূতি ও জ্ঞানপিপাসা।

স্বদেশ থেকে বেরিয়েই প্রথম আট বৎসব লিয়েবেদেফ কাটিয়েছিলেন য়োবোপে— অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ইংলন্ড, জর্মনি ও ইতালিতে। ইংলন্ডে তিনি একাধিকবার গিয়েছিলেন এবং ভারতবর্ষে যাত্রার পূর্বে শেষ অবস্থিতি তাঁর লন্ডনেই। ইংলন্ডে তখন বাণিজ্য-অর্থনীতির স্বর্ণযুগ শুরু হয়েছে। তার ক্রমসম্প্রসরমান নৌ-বাণিজ্য এবং ফরাসি স্বার্থের চূড়ান্ত পরাজয় বহির্বিশ্বেব বত্নভাণ্ডাব তখন ইংলন্ডের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে 'On the 1770s and 1780s.. East India affairs were closed to the center of national attention than they had been since the late seventeenth century.' বাংলার দেওয়ানি লাভের (১৭৬৫) পর থেকে 'বণিকের মানদণ্ড' ক্রমশ 'রাজদণ্ডে' রূপান্তরিত হওয়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং লন্ডনের কোষাগার সমৃদ্ধতর হয়ে উঠছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামান্য একটা কেরাণির চাকরির জন্য ইংরেজসন্তান তখন পাগল : 'It was reported that a junior appointment as a writer (i.e. as a clerk) had a market value of 1500 and 2000. লিয়েবেদেফ্ যখন ইংলন্ডে তখন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিলেতের মনোভাব এই। এই সত্য আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন, কারণ আমার মতে তৎকালীন ইংলন্ডীয় ধারণাই লিয়েবেদেফকে ভারতমুখী করার জন্য মূলত দায়ি।

কিন্তু যে লোক ভাগ্যান্বেষণে সাত সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার সাহস ও নিষ্ঠা দেখাতে পারেন তিনি ভারতবর্ষে এসে লক্ষ্যচ্যুত হন কী কবে? চিদ্‌বৃত্তিতে বিত্তলোভী 'adventur' যিনি, তাঁর হৃদয়েব পরিবর্তন কীসে ঘটে যার ফলে লক্ষ্মী ছেড়ে সরস্বতীর বন্দনায় তাঁকে ছুটতে হয়?

লিয়েবেদেফ পশ্চিম য়োরোপ থেকে আসেননি, এসেছিলেন স্লাভ জগৎ থেকে এ ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়। ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার বিচারে স্লাভ মানসিকতা য়োরোপের অবশিষ্টাংশ হতে একান্ত ভিন্ন। পশ্চিম য়োরোপ তাদের সভ্যতা ও সামাজিক বিকাশের ধারায় যেভাবে দ্রুত জাগতিক উন্নতি, আধ্যাত্মিক মুক্তি ও আধুনিকীকরণের পথে পা বাড়িয়েছিল স্লাভ্ জাতির ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। স্লাভদের তিনটি গোষ্ঠীর (পূর্বী, পশ্চিমী ও দক্ষিণী স্লাভ) মধ্যে রাশিয়ার (পূর্বী) ক্ষেত্রে তো এ কথা আরো বেশি প্রযোজ্য। কৃষিভিত্তিক সমাজকাঠামো, সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো এবং 'প্রাচ্য' অর্থোডক্স চার্চের গোঁড়া কড়া অনুশাসন ইত্যাদির সমীকরণে স্লাভ জাতি য়োরোপের মধ্যেও ভৌগোলিক সহাবস্থান সত্ত্বেও সে দূবে অবস্থান করেছে। খ্রিস্টান জগতের স্লাভ ও অ-স্লাভ দুনিয়া ঐতিহাসিক সত্য। এথনিক্ গ্রুপ হিসেবে য়োরোপের অন্যান্য জাতির চেয়ে স্লাভ্‌রা বাহ্যিক অবয়বে স্বতন্ত্র, মানসিক প্রবণতাতেও তেমনি ভিন্ন। তারা বিশালদেহী ও শক্তিশালী, কিন্তু তুলনামূলকভাবে শ্রমবিমুখ এবং একগুঁয়ে ও সরল। তাদের মনের গড়ন একরৈখিক। অন্যদের অপেক্ষা তারা অনেক বেশি আবেগপ্রবণ ও উদার, মস্তিষ্কের চেয়ে হৃদয়ের অধিক আজ্ঞাবহ। জড় ও প্রাণিজগৎ সম্বন্ধে যে বিপুল ও সর্বগ্রাসী কৌতূহল রেনেসাঁসের ভিতর দিয়ে য়োরোপ নবসভ্যতার সূচনা করে, তার ফসল অন্যদের মতো স্লাব জগৎ, বিশেষত রাশিয়া ঘবে তুলতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবেই বাকি য়োরোপ থেকে সে পিছিয়ে পড়েছে। অন্য য়োবোপীয়দের তুলনায় তার

মনের গড়ন আদিম : সে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে সত্য আবিষ্কারের কষ্ট স্বীকারের চেয়ে 'সত্য' বলে প্রচলিত ধারণাকে আঁকড়ে ধরে থাকার পক্ষপাতী, ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক অনুশাসনের ও পুরোহিতদের পদতলে সে নিবেদিতপ্রাণ। তার মনে শিকড় ধর্মভীরুতার মধ্যে সুপ্রোথিত, এবং তার দুরপনেয় বিশ্বাস ও নির্ভরতা পারলৌকিকে। উপরন্তু আছে তার অন্তর্গত সন্ন্যাসপ্রবণতা ও মিস্টিসিজ্‌ম্।

এ দেশে এসে লিয়েবেদেফ্ দেখতে পেয়েছিলেন যে ভারতীয় জনগণও স্বভাবে অলস ও ধর্মভীরু, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী ও পুরোহিতে সমর্পিতপ্রাণ। রাশিয়ার সাধারণ মানুষের মতো এরাও এক অচলায়তনের মধ্যে বসবাস করে, শক্তি ও শক্তের কাছে ভয়ে বা ভক্তিতে শুধু আনত হতেই জানে, বিদ্রোহে রুখে দাঁড়াতে শেখেনি, ইহজগতের চেয়ে পরলোক ভারতবাসীর নিকট সমভাবে মূল্যবান। রুশ মানসিকতায় গির্জা, মঠ ও তীর্থস্থানে অচলা ভক্তি অবিকল ভারতবর্ষীয় দেব-দ্বিজে ভক্তির সমতুল্য, এবং পুণ্যার্জনের সর্বোত্তম পন্থা বলে বিবেচিত। এ দেশের জনগণ রুশিদের মতোই সরল, অনাড়ম্বর, অসহায় ও অদৃষ্টবাদী। লিয়েবেদেফ্ যে সচেতনভাবে এসব পর্যবেক্ষণ ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছিলেন, তা বলা যাবে না; কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এই সাদৃশ্যের রূপ তাঁর দৈশিক স্মৃতির পাশাপাশি অবচেতনে ক্রমে ক্রমে সংরক্ষিত হচ্ছিল। বুদ্ধি বা বিচারশক্তির প্রয়োগে সাদৃশ্য-অন্বেষণ নয় বা প্রতিতুলনার মালমশলা খুঁজে পাওয়া নয়, তিনি তাঁর 'বোধে'র মধ্যে অনুভব করেছিলেন রুশ-মানসের প্রতিবিম্ব এক ভারতীয় মানস। মেধাগত নয়, বোধগত অনুভববেদ্যতায় মুদ্রিত এই সাদৃশ্যছবিই তাঁকে অত্যন্ত গভীরে ভারতমুখী করে তুলেছিল।

'স্লাভ' মানসের সন্তান হওয়ায় এ দেশের সম্পদলুণ্ঠনের স্বাভাবিক 'পশ্চিমি' প্রবণতা তাঁর মনোজগতে প্রকৃতিগতভাবেই অনুপস্থিত ছিল, এ কথাও মনে রাখতে হবে। ভারতীয় ঐশ্বর্য-লুণ্ঠনের ঐতিহ্যগত স্মৃতিপরম্পরা পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি বা ইংরেজদের মনে যে superiority complex তৈরি করেছিল, এই রুশ আগন্তুক তা থেকে মুক্ত ছিলেন। তাঁর সমকালীন ইংরেজদের সুদূরপ্রসারী ভারতচর্চা যেখানে কূটনৈতিক সাম্রাজ্যবিস্তারের সহযোগী বুদ্ধিবৃত্তিগত অনুসন্ধান (ইন্টেলেক্‌চুয়াল কোয়েস্ট), সেখানে গেরাসিম্ স্তেপানভিচ্ লিয়েবেদেফের ভারতানুসন্ধান সে অর্থে উদ্দেশ্যনিরপেক্ষ, একান্তই ব্যক্তিগত, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা থেকে উদ্ভূত।

আমার বক্তব্য, তাঁর ভারতপ্রেমের পশ্চাতে মননজিজ্ঞাসা (ইন্টেলেকচুয়াল বা একাডেমিক কোয়েস্ট) যত না কার্যকর ছিল তদপেক্ষা অধিক ছিল চিত্তবৃত্তির আহ্বান, ইংরেজদের মতো তাঁর কোনো 'উদ্দেশ্য ছিল না— না বাণিজ্যিক, না রাষ্ট্রিক-কূটনৈতিক; তিনি তাঁর ভারতবর্ষীয় জীবনের ঋণ প্রেম দিয়ে শুধবার সামান্য চেষ্টা করেছেন মাত্র। তাঁ হাতে উইলিয়াম জোন্সের বিস্তৃত ভাষা ও সংস্কৃতি-জ্ঞানের আয়ুধ যে ছিল না, তা তো সত্যিই; এ কেবলই সেই চিরন্তনী রুশ বিনতি, 'humility', যার হাত ধরে তিনি ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির কাছে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। ভারতপথিক বিদেশিদের মধ্যে তিনিই সম্ভবত একমাত্র 'the Fool', ইংরেজ বা জর্মন ওরিয়েন্টালিস্টদের নিকট তাঁর মূল্য স্বভাবতই নামমাত্র, কিন্তু আমাদের কাছে শুধু ঐ অসহায় প্রেমের জন্যই তিনি নমস্য। সিদ্ধিলাভ অপেক্ষা সাধনার জন্যই তিনি আমাদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন, ভিনদেশি ভারতবিদ্যা পথিক-সমাজে অনন্য ব্যতিক্রম হিসাবে চিহ্নিত হন ভালোবাসার জন্য দুঃখভোগের কারণে।

লিয়েবেদেফ : পুনর্মূল্যায়ন

মফিদুল হক

গেরাসিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদেফকে নিয়ে গোটা বাঙালি জনসমাজ, এমনকী ইউরোপীয় ও রুশি গবেষকদেরও যদি আমরা বিবেচনায় নেই, তবে সবচেয়ে পবিশ্রমী, ব্যাপক ও তথ্যসমৃদ্ধ কাজ করেছেন ধীমান অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ। ঢাকা, কলকাতা, মস্কো, সাংক্‌ৎ পিতের্বুর্গ বা লেনিনগ্রাদ এবং লন্ডনের বিভিন্ন পাঠাগার ও মহাফেজখানা ঘেঁটে লিয়েবেদেফ-জীবনেব একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তিনি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃত তাঁর এই পি.এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ পরে যখন আরো বিস্তারিত আকারে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয় (১৯৮৫), তখন স্বভাববিনয়ী অধ্যাপক লেখেন : 'লিয়েবেদেফের সম্পূর্ণ জীবনচিত্র যা আমি এখানে রচনা করেছি তাতেও অনেক ছিদ্র হয়তো চোখে পড়বে কিন্তু নতুনতর তথ্যপ্রাপ্তি ব্যতিরেকে তা ভরাট কবা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, তবে মেরামতের যোগ্য কোনো ফাঁক বা গহ্বর সেখানে নেই বলেই আমার ধারণা।' বিপুল পরিশ্রমে বহু নতুন তথ্য উন্মোচন ও পুরাতন বিভ্রান্তি মোচনের মাধ্যমে যে কাজ সমাপন করেছিলেন অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ, সে বিষয়ে তাঁর আস্থার প্রকাশ এখানে ঘটেছে। এই আস্থা যে অতি-সঙ্গত, সেটা গ্রন্থপাঠে যে কারোরই প্রতীয়মান হবে।

কিন্তু তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যবিচার দুই ভিন্ন বিষয়। আর এটাও তো দেখা যাচ্ছে তথ্য যত বেশি আমাদের হাতে আসে, বিচারের ক্ষেত্রে ভিন্নতাও তত বেড়ে যায়। ঐতিহাসিক ঘটনা বিচাবে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সত্যের ওপর আলোকপাতে সহায়ক হিসেবে সবসময়ে কাম্য এবং বাংলা নাট্যধারায় লিয়েবেদেফ-এর ভূমিকা নিয়ে যে বিতর্ক এখনো অব্যাহত রয়েছে, সে-ক্ষেত্রে নানামুখী বিচারকে আমরা সবসময়ে স্বাগত জানাব।

লিয়েবেদেফ-এর বাংলা নাট্যপ্রয়াস, যার দুটি মঞ্চায়ন ঘটেছিল, তৃতীয় মঞ্চায়নের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলেও দুর্ঘটনায় (?) থিয়েটার হল পুড়ে যাওয়ায় যা আর ঘটে ওঠেনি, এর বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্যের ওপরই আমরা আলোকপাত করব। সেক্ষেত্রে লিয়েবেদেফ সম্পর্কে মূল্যায়নের প্রবল একটি ধারার সঙ্গে আমাদের মতের ফারাকটি তুলে ধবাই বর্তমান আলোচনার মূল লক্ষ্য। সাম্প্রতিক এক প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় অভিনেতা ও নাট্যবিশারদ কুমার রায় লিখেছিলেন, 'আসলে মানুষটি (লিয়েবেদেফ) থিয়েটারের মানুষ ছিলেন না। বেঙ্গলি থিয়েটার-এর প্রতিষ্ঠা ও 'কাল্পনিক সংবদল'-এর অভিনয় একেবারেই একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। আকস্মিক ঘটনাও অনেক সময়ে ইতিহাস তৈরি করে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।' তবে এক কারণে লিয়েবেদেফকে সম্মাননা জানানো যেতে পারে, বলেছেন কুমার রায়। তাঁর ভাষায় : 'এই রুশি সংগীতরসিক, ভ্রমণপিপাসু এবং ভাষাশিক্ষায় আগ্রহী মানুষটিব প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাতে পারি অন্য একটি কারণে।.... বাংলা ভাষায় থিয়েটারের জন্য পশ্চিমী নাট্যসাহিত্যের অনুবাদ বা ভাবানুবাদের প্রাথমিক কাজটি তিনি করেছিলেন, এ কথা স্বীকার করে নেওয়ায় কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু যে পথিকৃতের সম্মাননা জানিয়ে তাঁর নাট্য-প্রয়াসকে আজ ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে, বাস্তব প্রমাণ অনুসারে তাকে অলীক, মিথ বলেই মেনে নিতে হয়।'

হায়াৎ মামুদ তাঁর সাম্প্রতিক এক নিবন্ধে লিখেছেন : 'বিদেশী একজন মানুষ, ভবঘুরে এক সংগীতশিল্পী, নেহাতই আকস্মিকভাবে একটা কাণ্ড করে বসেছিলেন। তিনি থিয়েটারের লোক ছিলেন না। দেশে ফিরে গিয়েও থিয়েটার, অভিনয় ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামাননি। পয়সা কামানোর

ধান্দায় এমন একটা ব্যাপারে তিনি হাত দিয়েছিলেন, তাও তো টিকে থাকতে পারেননি প্রতিযোগিতায়, শেষ অবধি অর্থ নাশ করে, কপর্দকহীনভাবেই প্রায়, ভারত ছেড়ে চলে গেলেন।' তবুও তাঁকে বাংলা নাটকের 'জনক' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন হায়াৎ মামুদ 'সত্যের দাবিতেই'। কিন্তু তাঁর মূল অবদান হিসেবে গণ্য করেছেন রুশ দেশে ভারতবিদ্যার পথিকৃৎ হিসেবে।

এইসব বিবেচনার বিপরীতে আমরা তৎকালীন সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় লিয়েবেদেফের নাট্য-চিন্তা ও নাট্য-প্রয়াসের তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা নেব। তিনি মঞ্চে নাটক উপস্থাপন করেছিলেন, যে নাটক ছিল বাংলা নাটক, তা পয়সার ধান্দাতেই করুন আর বাংলা শেখার অবলম্বন ভেবেই করুন; তাতে কিছু যায়-আসে না। একটি নাটক মঞ্চায়নের সঙ্গে জড়িত থাকে অনেক প্রশ্ন, নাটক নির্বাচন থেকে পাত্রপাত্রীদের সম্মিলিত প্রয়াস সংগঠন করে তার উপস্থাপন পর্যন্ত হাজারো প্রশ্নের জবাব দিতে-দিতেই মঞ্চকর্তাকে এগোতে হয়। এই সমুদয় জিজ্ঞাসার মীমাংসা লিয়েবেদেফ করেছিলেন কোন্ উপায়ে, তার বিবেচনা তাই খুবই জরুরি। তবে তৎকালীন উপনিবেশিক বাস্তবতার নিরিখেই এই বিচার সম্পন্ন করা দরকার।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর ময়দানে ক্লাইভের বাহিনীর কাছে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাগজে-কলমে কোম্পানির শাসন শুরু হলেও উপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ, যার ব্যাপ্তি কেবল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিকও বটে, রাত পোহালেই তার সূচনা হয় না। রবার্ট ক্লাইভ যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে নিজে নবাব হননি, মুর্শিদাবাদের নবাব রূপে অধিষ্ঠিত করেন মীরজাফরকে। কোম্পানি সন্তুষ্ট ছিল তাঁর কাছ থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ও ভেট লাভ করে। সেই সাথে কলকাতাকে কেন্দ্র করে চলে কোম্পানির বাণিজ্যিক ও সামরিক শক্তিসঞ্চয় এবং ক্রমেই তাঁরা নিজেদের অবস্থান সংহত করতে থাকেন। এর আগেই আমরা দেখেছি কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ, কুঠিবাড়ি, গুদাম, ফ্যাক্টরি, ইংরেজ বসতি, স্কুল, গির্জা এবং একটি থিয়েটার হল। বস্তুত এই থিয়েটার হল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পলাশী যুদ্ধেরও আগে, ১৭৫৩ সালে। চার বছর পর সিরাজউদ্দৌল্লার আক্রমণের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে ওল্ড প্লে হাউসের জায়গায় ১৭৭৫ সালে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যালকাটা প্লে হাউস। নামে প্লে হাউস হলেও এটা ছিল প্রকৃত অর্থে সেটেলমেন্ট বা বসতির টাউন হল সদৃশ প্রতিষ্ঠান। গুরুত্বপূর্ণ সভা, বল-নাচ, উৎসব, সঙ্গী-তানুষ্ঠান— এসবের আয়োজন ছাড়াও শীতের তিন মাস এখানে মঞ্চস্থ হত নাটক। সেই নাটক ছিল সর্বাংশে ইউরোপীয়দের দ্বারা মঞ্চস্থ ইউরোপীয়দের জন্য নাটক। দূর ভারতে নাটক করার মতো 'থিয়েটারের লোক'-এর অভাব সহজেই অনুমেয়। স্ত্রী চরিত্রগুলো অভিনীত হত কোম্পানির সাহেবদের দ্বারাই। এইসব নাটকের মান সম্পর্কে এলিজা ফে লিখেছিলেন; 'মজা পাওয়ার জন্য বেশ দেখা যেত এমনই ছিল ট্রাজেডিগুলো'।

'নেটিভদের' তুলনায় ইংরেজ সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের যেসব প্রতীক তৎকালীন কলকাতায় ছিল তার অন্যতম এই ইংলিশ থিয়েটার হল। আরও কিছুকাল পরে প্রতিষ্ঠিত ইংলিশ ক্লাবগুলোর প্রবেশপথে যেমন লেখা থাকত 'কুকুর ও ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ', তেমনি এই থিয়েটার হলে ভারতীয়দের কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না। এমন কী ভারতীয় রাজা-মহারাজাদেরও নয়।

রাইটার্স বিল্ডিং-এর পাশে এই থিয়েটার নির্মিত হয়েছিল মান্যগণ্য সকল ইংরেজের চাঁদায়। গভর্নর-জেনারেল, বিচারপতি, ব্যবসায়ী সবাই মিলে গড়ে তুলেছিলেন এই থিয়েটার। অ্যাসিস্টান্ট সার্জন ফ্রান্সিস র‍্যান্ডেল ছিলেন নাটকপাগল যুবক। উইলিয়ম হিকি লিখেছেন, ১৭৮৩ সালের দিকে প্রায় দেউলিয়া হয়ে যাওয়া এই থিয়েটারকে উদ্ধার করেন র‍্যান্ডেল।

ইংরেজ বসতির এমনি চেহারার পাশাপাশি বর্ধিষ্ণু কলকাতা শহরে গড়ে উঠছিল নব্য-ধনিক বেনিয়া মুৎসুদ্দিদের একটা শ্রেণি। আকস্মিক প্রচুর বিত্তের অধিকারী হয়েছিলেন এঁরা। এঁদের

পাশাপাশি ছিলেন পুরানো ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। মধ্যযুগের শেষাশেষি বাংলায় যেসব শিল্প-সম্ভাবনার অঙ্কুরোদ্গম ঘটেছিল, গঙ্গাতীর জুড়ে যে নগরায়ণ ঘটছিল, তাব প্রতিভূ ছিলেন এঁরা। ফলে শহর কলকাতায় মোটামুটি বড়ো আকাবেব বাঙালি বিত্তশালী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বিকশিত হতে শুরু করেছিল। এই শ্রেণির সাংস্কৃতিক চেতনায় ঘাটতির দিক যাই থাকুক, তার অবলম্বন ছিল বাঙালি সংস্কৃতির নানামুখী প্রকাশ। সংস্কৃতি তার একান্তই বাঙালি, সাহেবিয়ানার কোনো প্রভাব বা পরিচয় তাতে ছিল না। শহর কলকাতায ইংরেজ বসতি তখনও পৃথক সত্তা। শিক্ষায় ইংরেজিয়ানা সূচিত হয়নি, আদালতের ভাষা তখনই ফার্সি, ইংরেজের উপস্থিতি সংখ্যা বিচারেও খুব নগণ্য। এই সময়কাল তাই যাত্রা, আখড়াই, কবিগান, তরজা, পাঁচালি, ঝুমুর, কথকতা ইত্যাদির প্রবল বিকাশের কাল, যদিও কাগজে-কলমে শুরু হয়ে গেছে উপনিবেশিক শাসন।

এই পটভূমিকাতেই ১৭৮৭ সালে কলকাতায় এসে উপস্থিত গেরাসিম লিয়েবেদেফ, ভবঘুরে রুশ যুবক, সংগীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী, ইংরেজি জানেন ভালো, ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়েও রয়েছে আগ্রহ। তিনি ইউরোপীয় বটে তবে উপনিবেশিক গোত্রভুক্ত নন। তদুপবি তিনি হচ্ছেন পূর্ব ইউরোপীয়, স্লাভ জনগোষ্ঠীর সদস্য, মূল ইউরোপীয় ভূখণ্ডে কিছুটা ব্রাত্য, প্রাচ্য-মানসের অনেকটা কাছাকাছি। লিয়েবেদেফ-এর চেতনায় ছিল শিল্পী ও বিজ্ঞানীর সমন্বয়, 'অগ্রসর সভ্যতার' কোনো বড়াই তাঁর ছিল না। বরং ছিল ভাবতীয় তথা বাঙালি সংস্কৃতি বিষয়ে মুগ্ধতা। ভারতবর্ষ এবং ভারতস্থ ইংরেজ উপনিবেশবাদীদের সম্পর্কে লিয়েবেদেফের মূল্যায়নের জন্য ১৭৯৭ সালের জুলাই মাসে কলকাতা থেকে লন্ডনস্থ রুশ রাষ্ট্রদূত কাউন্ট সেমিওন ভরনৎসোফ-এর কাছে প্রেরিত তাঁর পত্র থেকে আমরা উদ্ধৃতি দিতে পারি। তাতে লিয়েবেদেফ লিখেছিলেন : 'কোম্পানির এ সকল কশাই, যাহাদের ভিতরে অনেকেই হীন অধম ব্যক্তি এবং যাহারা মিথ্যা কথা কহে ও অধঃস্তন কর্মচারীদের সম্মুখে এহেন সদম্ভ আচরণ করে যে বহু দেশেই তাহারা ঈশ্বর ও মনুষ্য কর্তৃক ঘৃণিত হইবার যোগ্য। ইহাদের অবস্থা এত নাজুক, যেন চটক পক্ষীর সম্মুখে কুক্কুটের কণ্ঠ আস্ফালন ও শেষাবধি আরশোলার ন্যায় তাহাকে গলাধঃকরণের ইচ্ছা, আর ইহাকেই তাহারা গৌরব জ্ঞান করে। কিন্তু এসব কিসের কারণে? আমি তো এতটুকু জানি যে উহারা সংস্কৃত আলেখ্যমালার দীপ্তি ভালোমত অনুধাবনে অক্ষম এবং হিন্দুস্থানী ভাষার মুক্তাসদৃশ শব্দরাজি ওষ্ঠ দ্বারা খুঁটিতে পারে, গলাধঃকরণ করিতে পারে না।' আমরা যদি স্মরণ করি যে, এই পত্র রচিত হয়েছিল ইংরেজদের শত্রুতায় লিয়েবেদেফের থিয়েটার ও ভাগ্য ভস্মীভূত হওয়ার পটভূমিকায়, সেক্ষেত্রে হয়তো তিক্ত ইংরেজ-বিদ্বেষের একটা কারণ আমরা খুঁজেও পাই, তাহলেও কিন্তু ভারতীয় তথা বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ এতটুকু ম্লান হয়ে যায় না।

এর অল্প কিছুকাল আগে ৮ মে পাদ্রি সাম্বরস্কিকে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে বাঙালি সহকর্মীদের প্রতিও তিক্ততাব প্রকাশ ঘটেছিল। সেসব সত্ত্বেও ঐ পত্রে দেখি, তিনি লিখেছেন : 'আমি প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে হিন্দুস্থানের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক শ্রীভারতচন্দ্র রায় রচিত বীরত্বব্যঞ্জক কাব্য তবজমা করিয়াছিলাম, ইনি বিভিন্ন সমায়তন সর্গে বিভক্ত করতঃ ইহা এত সুমিষ্ট ভাষায়, চমৎকাররূপে, প্রাঞ্জল ও যথাযথভাবে লিখিয়াছেন যে বহু ব্যক্তি ভাষা-পরীক্ষায় পারঙ্গমতা প্রদর্শন-মানসে তাহা মুখস্থ করিয়া থাকেন।'

ঐ পত্রে তিনি চড়ক উৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন সমাজবিজ্ঞানীর আশ্চর্য নিরাসক্তি নিয়ে। যে কোনো বিদেশি, বিশেষভাবে তিনি যদি হন অষ্টাদশ শতকী ইউরোপাগত, যে আচরণকে গণ্য করবেন অসভ্যজনোচিত রূপে, সেই উৎসবের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিয়েবেদেফ লিখেছিলেন : 'দুঃখের কথা শেষ কবিয়া এবারে বাবো মাহিনাব অন্তর্গত চৈত্র মাসের ৩১ তাবিখে পালিত উৎসব, অর্থাৎ সংবৎসরের শোভাযাত্রা, চড়ক নামে পরিচিত হিন্দুস্থানের একটি অনুষ্ঠান বিষয়ে বর্ণনা করি।...

পূর্ববর্তী তিনদিন এবং উক্ত দিবসে দেহ চিরিয়া যায় এভাবে পঞ্জরে রশি পেঁচাইয়া লৌহশলাকা দ্বারা জিহ্বা ছিদ্র করিয়া ঢাক ঢোল ঘণ্টা ঝুমঝুমি ও ঝিনুকের বাদ্য সহযোগে লোকজন দলবদ্ধভাবে শহর ও অন্যান্য গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার নাচ ও অঙ্গভঙ্গী করতঃ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায় যাহা যোরোপীয়দের নিকট নির্বোধ ও বর্বরোচিত কর্ম বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে এবং ৩১ চৈত্রের তিন ঘটিকায় নিজেকে ঝুলাইয়া ঘুরপাক খাইতে থাকে, তখন এমন প্রায়ঃশই ঘটে যে, ছিটকাইয়া পড়িবার ফলে হস্তপদাদি ভাঙ্গিয়া যায়, কাহারও বা স্কন্ধদেশ মচকাইয়া যায়, কেহ বা পঞ্জর ভাঙ্গিয়া মৃত্যুবরণ করে এবং এতদূর পর্যন্ত আসিয়া সন্ন্যাসীগণ উৎসব শেষ করেন।'

এই দৃষ্টিভঙ্গি স্লাভ লিয়েবেদেফ-এর, যার সঙ্গে উপনিবেশিক ইংরেজের দৃষ্টিভঙ্গির রয়েছে বিপুল ফারাক। মাদ্রাজে দু'বছর কাটিয়ে কলকাতা এসেছিলেন লিযেবেদেফ, কেননা সেখানে 'ব্রাহ্মণদের বিদ্যা' শেখাতে পারে, এমন ইংরেজি-জানা ভারতীয়ের দেখা তিনি পাননি। আর কলকাতা তো অনেক প্রাণবন্ত প্রসারিত শহর, এখানে নিশ্চয় আত্মিক ও আর্থিক ইচ্ছাপূরণের সুযোগ হবে অনেক বেশি। কলকাতায় বিভিন্ন কনসার্ট করে ও সংগীতপেশা অবলম্বন করে লিযেবেদেফ যে অর্থ আয় করেছিলেন, তা সচ্ছলতার চাইতেও বেশি বলে অনুমিত হয়।

কলকাতা আসার বছর দুয়েক পর শ্রীগোলকনাথ দাস-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে এবং সংস্কৃত ও বাংলাভাষায় তাঁর দীক্ষাগ্রহণ শুরু হয়। বাঙালি এই স্কুল-শিক্ষককে লিয়েবেদেফ বলেছেন 'আমার ভাষাবিদ', যিনি ছিলেন ব্যাকরণে দক্ষ এবং সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। এছাড়া ছিল তাঁর প্রয়োজনীয় ইংরেজি-জ্ঞান, বিদেশিকে ভাষা শিক্ষা দানের মতো পর্যাপ্ত জ্ঞান।

ঐতিহাসিক কে এম আশরাফের জার্মান পত্নী সমাজবিজ্ঞানী শ্রীমতী পি এম কেম্প গোলকনাথ দাস ও তাঁর মতো অন্যদের প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে, লিয়েবেদেফ-এর বর্ণনায় পরবর্তীকালের অর্থাৎ আরো বিশ ত্রিশ বছর পরের মধ্যবিত্তের দুটি ধারার কোনো ইঙ্গিত নেই, যে দুই ধারার একদিকে ছিল ইংরেজিয়ানায় দীক্ষিত মধ্যশ্রেণি এবং ছিল আংশিকভাবে পশ্চিমিকৃত দোদুল্যমান ব্রিটিশ-বিরোধী বিদ্রোহীগণ, প্রথম বাংলা সংবাদপত্রাদি ঘিরে যাঁরা সংগঠিত হয়েছিল। কিন্তু ভিন্নরকম এক দ্বন্দ্বের পরিচয় লিয়েবেদেফের লেখায় খুঁজে পেয়েছিলেন শ্রীমতী কেম্প। তাঁর ভাষায় : 'একই সঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা বিষয়ে আগ্রহী ভারতীয়দের সম্পর্কে তথ্য মেলে ধরেন, উদাহরণতঃ যে ভারতীয়রা বহিঃস্থ উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা ছাড়াই এই শিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। তিনি এমন সব লোকের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন যাঁরা চাকুরি বা ব্যবসা কোনটাতেই নিয়োজিত ছিল না কিন্তু আপন তাগিদেই শিখেছিল ইংরেজি। একই সঙ্গে লিয়েবেদেফ-এর ভেতরে সঞ্চয় করেছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অপার ভালোবাসা।'

এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, কলকাতায় লিয়েবেদেফ-এর কর্মকাণ্ডের বিবরণীর জন্য আমাদের অনেক বেশি নির্ভর করতে হয়েছে লিয়েবেদেফ-এর নিজের রচনা, পত্রিকায় প্রদত্ত বিজ্ঞাপন, কোম্পানির সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্র, মামলার বিভিন্ন নোটিশ ইত্যাদির ওপর, সমকালীন আর কোনো বিবরণ বা বর্ণনা আমরা পাই না বললেই চলে। লিয়েবেদেফ সংক্রান্ত প্রথম ভারতীয় রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাঁর কলকাতা ত্যাগের চুরাশি বছর পর প্রকাশিত উইলিয়ম কেরির 'গুড ওল্ড ডেজ অব অনারেবল জন কোম্পানি' গ্রন্থে। তবু প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণের সঙ্গে অনুমানের যোগসাধনে একটা ছবি আমরা গড়ে নিতে পারি। এ ক্ষেত্রে যে মূল প্রতিপাদ্যে বর্তমান লেখক উপনীত হতে প্রয়াসী এবং যে জন্য এমন দীর্ঘ অবতরণিকা, তা হল গেরাসিম লিয়েবেদেফকে ঘিরে কলকাতায় যে নব্য বিকশিত বাঙালি সমাজ সক্রিয় হয়েছিল, যে-বাঙালি ছিল পরবর্তীকালে উপনিবেশিকতা প্রভাবিত মধ্যশ্রেণি যা শিক্ষিত শ্রেণি থেকে পৃথক তাদেরই যৌথ শ্রম ও মেধার ফসল প্রথম বাংলা থিয়েটার, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংশ্লেষণে নির্মিত বেঙ্গলি থিয়েটার। এই কৃতিত্বের বড়ো অংশ নিঃসন্দেহে

লিয়েবেদেফ-এর। কিন্তু এখানে একই সঙ্গে উচ্চারণ করা দরকার পণ্ডিত গোলকনাথ দাস এবং অন্যান্য নাম না-জানা বাঙালি শিল্পীর কথা।

যে কলকাতায় লিয়েবেদেফ-এর কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছিল এবং যে সমাজবিজ্ঞানীয় ও ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসা তাঁর ভেতরে ছিল, তার প্রকাশ তাঁর 'পক্ষপাতশূন্য পর্যবেক্ষণ' গ্রন্থেও রয়েছে। সেই বিবেচনায় বলা যায়, তৎকালীন শিল্প-সাহিত্য ধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল নিবিড়। যে দুটি নাটক অনুবাদের জন্য বেছে নিয়েছিলেন লিয়েবেদেফ, সেটা ছিল সচেতন সিদ্ধান্ত। যদিও তিনি একবার লিখেছিলেন নাট্যদ্বয় অনুবাদ সম্পন্ন হবার পর তিনি পণ্ডিতদের কাছে এটা পাঠ করে শোনান এবং গোলকনাথ দাস মঞ্চায়নের পরামর্শ দেন। সেই থেকে অনেকে সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে অনুবাদের কাজটি তিনি করেছিলেন নিছক ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে এবং মঞ্চায়নের কোনো ভাবনা ব্যতিরেকেই। কিন্তু এমন দুটি নাটক যে লিয়েবেদেফ বেছে নিলেন, তাঁর পেছনের সচেতনতা সম্পর্কে আমরা সবাই তো অবহিত। এ দেশের মানুষেরা ভাঁড়ামি ও অনুকরণকে খুব পছন্দ করে, গভীর কথাও বলতে হয় হাসি-তামাশার ভেতর দিয়ে, এমন উপলব্ধি থেকেই তো লিয়েবেদেফ বেছে নিয়েছিলেন অখ্যাত নাট্যকার জডরেলের 'দা ডিসগাইজ' এবং মলিয়েরের 'লাভ ইজ দা বেস্ট ডক্টর'। অন্যত্র তিনি তো এমনও লিখেছেন যে, আমি থিয়েটার বানাতে শুরু করলাম এবং আমার ভাষাবিদ গোলককে লাগালাম আমার জন্য এতদ্দেশীয় অভিনেতা-অভিনেত্রী যোগাড় করে দিতে। বাঙালি-মানস অনুধাবনের প্রচেষ্টা থেকে সেই মানসোপযোগী যে দুটি নাটক নির্বাচন করেছিলেন লিয়েবেদেফ, সেই সিদ্ধান্তে তিনি যে খুব ভুল করেননি, আজও বাংলা মঞ্চে মলিয়েরের অব্যাহত জনপ্রিয়তা দেখে আমরা তো সেটা ভালোই বুঝতে পারি।

কিন্তু নাট্যদ্বয়ের অনুবাদক লিয়েবেদেফ হলেও সেটা প্রাথমিক অনুবাদমাত্র, অনুবাদের মঞ্চরূপটি যে গোলকনাথ দাসের সঙ্গে যুগ্মভাবে সমাধা করা হয়েছিল, সেটা অনুমানের শক্ত ভিত্তি রয়েছে। 'দা ডিসগাইজ' নাটকের বাংলা রূপান্তর করা হয়েছে 'কাল্পনিক সংবদল'। কমেডি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে কাল্পনিক এবং ডিসগাইজকে পরিচ্ছদ পরিবর্তন অর্থে সংবদল লেখার মধ্যে গভীর ভাষাগত ব্যুৎপত্তির পরিচয় মেলে। একই ব্যুৎপত্তি কিন্তু অনুবাদের প্রথম বা দ্বিতীয় খসড়াতে নেই। 'দা ডিসগাইজ' নাটকের তৃতীয় অভিনয়কালে রুশি ভাষায় বিজ্ঞাপনের খসড়া রচনাকালে তার যে বাংলা দাঁড় করিয়েছিলেন লিয়েবেদেফ সেটা ছিল এইরূপ : '.... অত্যন্ত গৌরবের সহিত অদ্যাবধি চিষ্টীত আছেন বিজ্ঞ করিতে কিবল দেসি এসিয়ার বাসীন্দা সকলকে কলিকাতার এবং বাহির গ্রামের উপস্থীত হইতে এক নতন উপাদয় কাব্য দেখিবার কারণ— লেখা হইয়াছে বাঙালি এবং হিন্দুস্থানী জবানেতে— ইহাতে দেখিয়ারদিগকে তুষ্ট করা জাইবেক উত্তম বাঙ্গালী গান ও বেলাতি নানা জন্ত্রের সহিত— নাচের ঘরের পর্দা সকল বিলক্ষন রূপে চিত্র হইয়াছে এবং সমস্ত সাজান গিয়াছে।'

'দি ডিসগাইজ'-এর বঙ্গানুবাদের দুটি পাণ্ডুলিপির সন্ধান হায়াৎ মামুদ পেয়েছিলেন। এতে কোনো সংশোধন-পরিমার্জনার চিহ্ন নেই। অর্থাৎ এই পাণ্ডুলিপি গোলকনাথ দাসের হস্তস্পৃষ্ট নয়। পাদ্রি সাম্বরিস্কিকে তিনি লিখেছিলেন যে বাংলা শব্দের নীচে আমি রুশিতে উচ্চারণ ও শব্দের ভাবার্থ লিখে নেই— তেমনি অনুবাদেরই পরিচয় মেলে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে। এই অনুবাদ নিঃসন্দেহে লিয়েবেদেফ-এর, কেননা এর পদবিন্যাস বাংলা নয়, অথচ সামান্য যত্নেই তা সংশোধন করা সম্ভব। কয়েকটি সংলাপের উদাহরণ দেওয়া যাক :

'ভাল আমার প্রাণ বন্ধুহ। আমি পরম আহ্লাদীত হইয়াছে তোমার দেখে— কারণ আমার কিছু নিবেদন আচে তোমার নিকটে।'

'আওর কথা কয় না, কারণ রব না শুনিতে।'

খুব সহজেই অনুমান করা যায় অভিনয়ে যে সংলাপ উচ্চারিত হয়েছিল তা যথাযথভাবে

পদবিন্যস্তরূপেই হয়েছিল। কেননা গোলকনাথ দাস ছিলেন এর সঙ্গে যুক্ত। আর বাঙালি অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মহড়ায় সংলাপ উচ্চাবণকালে স্বাভাবিকভাবেই তো সংশোধন করে নেবেন অনেক সিনট্যাক্স, কেননা এমনি ভুল সংলাপ আয়ত্ত করাটা প্রায় অসম্ভব।

তা ছাড়া লিয়েবেদেফ-এর জবানিতে জানা যায়, নাটকের মহড়াই এমন সাড়া জাগিয়েছিল যে, তাঁর থিয়েটার বাড়িতে ভিড়ের অন্ত ছিল না। তাঁর ভাষায় · 'শহরে কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল এবং সংবাদ জানিতে উৎসাহী ব্যক্তিগণ এত আসিতে লাগিলেন যে তাহাদের পায়েব ধূলায় মেঘ পর্যন্ত আড়াল হইয়া গেল।' বেঙ্গলি থিয়েটার-এর মহড়া দর্শনে যাঁরা উৎসাহিত হয়েছিলেন তাঁরা নিশ্চয ইংরেজ ছিলেন না। ভাষাব বড়ো রকম গলদ থাকলে তাঁদের দৃষ্টি তা এড়াত না। মঞ্চ-পাণ্ডুলিপির পরিচয় না পেলেও পাত্রপাত্রীর নাম রূপান্তবে যে মুন্সিয়ানাব ছাপ দেখি, সেটাও আমাদের অবাক করে। ডন লুইস/ডন আন্তোনিও বাংলা রূপান্তরে হয়েছেন ভোলানাথ বাবু, ঘটনাস্থল শহর কলকাতা থেকে লখনৌ-এ পরিবর্তনের পরও তাঁর নাম পাল্টায়নি। সম্ভবত ভোলানাথ নাম মাহাত্ম্যেব কারণে। ভৃত্য বার্নার্ডো নাম ভাঁড়িয়ে হয়েছিল ডন স্টিলেটো ডিনিয়াদোস, বাংলায় ভৃত্য রামসন্তোষ, ছদ্মবেশ ধাবণ করে হয় শ্রী লোহারাম সিং। দুই খুনি কারভা ও ভেলাসকো এক পাণ্ডুলিপিতে ছিল কাটন ও লুটন, অত্যন্ত সুন্দব মৌলিক নাম, পরে হয়ে ওঠে পাঁচকড়ি ও তিনকড়ি, যথাযোগ্য বর্ণিল নামই বটে। নায়িকা ক্লারা পুরুষবেশ ধারণের পর হয় ডন পেড্রো, বাংলায় সুখময় হযে ওঠে মোহনচাঁদ বাবু। সার্থক রূপান্তরের যে পরিচয এখানে মেলে বিপুল প্রশংসিত মঞ্চায়নে তার প্রতিফলন থাকবে বলে অনুমান করা যায়। তাই মস্কো ও সাংক্ৎ পিতের্বুর্গ-এ প্রাপ্ত 'দা ডিসগাইজ'-এর পাণ্ডুলিপিদ্বয় যে মহড়ার পাণ্ডুলিপি নয়, সেটা নির্দ্বিধায় বলা যায়। মঞ্চায়নকালে নাটক যে রূপ ধারণ করেছিল, সেটা তাই লিয়েবেদেফ-গোলকনাথ-এর রূপান্তর হওয়াই ছিল স্বাভাবিক।

আমরা যদি দৃষ্টিপাত করি লিয়েবেদেফ-এর থিয়েটার ও নাট্য প্রযোজনার দিকে, তবে যে মূল বৈশিষ্ট্যগুলো সহজেই চোখে পড়ে, আমাদের তা বিস্মিত না করে পারে না। এবং লিয়েবেদেফ ও বাংলার যাত্রা তথা নাট্যশিল্পীদের মধ্যে এক ফলপ্রসূ ও অমিতসম্ভবা যোগাযোগের ইঙ্গিত সেখানে মেলে।

লিয়েবেদেফ-এর থিয়েটার-এব নাম ছিল বেঙ্গলি থিয়েটার অর্থাৎ ইংলিশ থিয়েটারের পাশাপাশি তা ছিল স্থানীয় ঐতিহ্যের সবব আত্মপ্রকাশ। বহুল প্রচলিত তথ্য এই যে থিয়েটার হল সাজানো হয়েছিল 'বেঙ্গলি স্টাইল'-এ। ইংরেজদের থিয়েটারের জ-; যে-ক্ষেত্রে সিন-পেইন্টার আনা হত ইংলন্ড থেকে, তার পাশাপাশি লিয়েবেদেফ-এর থিয়েটারে স্থানীয় শিল্পীরা দেশজ রীতিতেই করলেন এই কাজ। নাট্যগৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জায়ও ছিল বাঙালিআনাব প্রকাশ। নাটকের আগে ছিল সঙ্গীতেব নান্দীমুখ। প্রাচ্যদেশীয় সংগীত সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান-অর্জনকারী লিয়েবেদেফ 'হিন্দুস্থানী' সুরে বাদন রচনা কবেছিলেন এবং তা পরিবেশিত হয়েছিল স্বাদেশিক ও বৈদেশিক বাদ্যযন্ত্র সহযোগ ও সহাবস্থানে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের মিলনে সৃষ্ট এই বাদনেব সুর বৈশিষ্ট্য আমাদের জানা নেই, তবে জানি যে এর নাম ছিল ইন্ডিয়ান সেবেনাদ। লিয়েবেদেফ-এর নাট্য মঞ্চায়নে বাংলা যাত্রা-পালার অনেক বৈশিষ্ট্য স্থান পেয়েছিল। নাটকের মাঝখানে পরিবেশিত হয়েছিল গান এবং এই গান এসেছিল বিদ্যাসুন্দর যাত্রা থেকে। তৎকালীন কলকাতায় বিদ্যাসুন্দরের জনপ্রিয়তা ছিল ঈর্ষণীয়। এমনি সংগীত পরিবেশন একান্তই প্রাচ্যদেশীয় রীতি। যাত্রায় কাহিনি উপস্থাপনার ফাঁকে ফাঁকে সংগীত পরিবেশনের ধারা তো আজও অব্যাহত রযেছে। এই বাঙালি বীতি লিয়েবেদেফ-এর প্রযোজনাতে স্বীকৃত হযেছিল। যাত্রার আরেকটি বৈশিষ্ট্যও এখানে স্থান পেয়েছিল। কাহিনির মাঝে মাঝে সংয়ের আবির্ভাব সেকালের যাত্রায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এই সং লিয়েবেদেফের নাটকেও ছিল।

লিয়েবেদেফ-এর নাটকের জন্য অভিনেতা-অভিনেত্রী সংগৃহীত হয়েছিল যাত্রা কিংবা ঝুমুর কিংবা কীর্তনিয়ার দল থেকে। দশজন পুরুষ ও তিনজন মহিলা অভিনেত্রী সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন গোলকনাথ দাস। পরবর্তীকালে নানা ষড়যন্ত্রে বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত লিয়েবেদেফ এক পত্রে লিখেছিলেন, 'আমার বহুবিধ পরিশ্রমের মধ্যেও আমি নিরুৎসাহী, ভণ্ড ও বন্য প্রকৃতির বাঙালিদের হাস্যরসাত্মক অভিনয় শিক্ষা দিয়াছি' এবং এই উক্তি থেকে কেউ কেউ মনে করেন, অভিনয়ে অদক্ষ এই শিল্পীরা এসেছিলন বারবনিতা পল্লি থেকে। তাই যদি হয়ে থাকে, তবে জানতে আগ্রহ হয় অভিনেতারা এসেছিলেন কোথা থেকে? লিয়েবেদেফ-এর ক্ষোভ তো কেবল অভিনেত্রীদের নিয়ে নয়। তা ছাড়া তৎকালীন যাত্রায় মেয়েদের অভিনয়ে অংশগ্রহণ ছিল স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ এবং কলকাতার সংস্কৃতিতে যাত্রার ছিল প্রবল উপস্থিতি। তদুপরি গোলকনাথ দাস যে তাঁকে স্থানীয় নটনটী সংগ্রহ করে দিতে চেয়েছিলেন, সে উল্লেখ তো লিয়েবেদেফ আগেই করেছিলেন। এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে ষড়যন্ত্রমূলক নানা সমস্যায় জর্জরিত ও বিপর্যস্ত লিয়েবেদেফ পাদ্রি সাম্বরস্কিকে লেখা পত্রে ঐ ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন ১৭৯৭ সালে। অপরদিকে নাটক মঞ্চায়নের অব্যহিত পরের কোনো লেখায় তেমনি বিড়ম্বনার উল্লেখ মেলে না। বরং আমরা জানতে পারি তিন মাসে নাটক তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা। জানি বিপুল প্রশংসা লাভের কথা। একমাত্র যে সমালোচনার ইঙ্গিত তিনি রেখেছিলেন সেটা মনে হয় অনুবাদ বিষয়ে পণ্ডিতদের অভিমত।

ক্যালকাটা থিয়েটার-এ ভারতীয়দের কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না। আরো দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল এই বিধান। পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হোয়েলার প্লেস থিয়েটার, চৌরঙ্গি থিয়েটারেও ছিল এমনি সংরক্ষিত প্রবেশাধিকার। পক্ষান্তরে দেশি-বিদেশি সবাই সমভাবে হাজির হয়েছিলেন বেঙ্গলি থিয়েটারে এবং যে তৃতীয় রজনী অভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল সে বিজ্ঞাপনে 'শুধু স্থানীয় লোকদের জন্য এই নাটক হবে' বলে উল্লেখ ছিল। থিয়েটার হল পরিচালনার জন্য পাশাপাশি বাংলা ও ইংরেজি নাটক মঞ্চায়নের পরিকল্পনাও ছিল লিয়েবেদেফ-এর।

লিয়েবেদেফ-এর সঙ্গে স্থানীয় বাঙালি সম্প্রদায়ের গভীর যোগের প্রতিফলন আমরা দেখি তাঁর নাট্যপ্রয়াসে। এই যোগাযোগের আরো কিছু প্রত্যক্ষ পরিচয়ও আমরা তুলে ধরতে পারি। কলকাতায় এসে লিয়েবেদেফ প্রথম উঠেছিলেন ১নং লালবাজারে। এরপর যান রানিমুডি (?) গলি। তারপর থাকেন টেরিটিবাজার, কসাইটোলা, মেরি জান গলি (Mirajanie Gully) এবং আবারও কসাইটোলায়, তবে এবার কুপার্স লেনে। এই সমস্ত বাড়িবদলই ঘটেছে লালবাজার এলাকার আশেপাশে। একদা সাহেবপাড়া লালবাজার ইতিমধ্যে পরিণত হয়েছিল মিশ্রপাড়ায়। লালবাজার ঘেঁষেই ছিল চিৎপুর, একান্তই বাঙালি পাড়া। কোম্পানির পক্ষে লালবাজারের এক দ্বিতল বাড়িতে বসতেন বিচারক। ভারতীয়দের ছোটোখাটো মামলা কিংবা দুর্বল সামর্থ্যের ব্যক্তিদের বিবাদের তাৎক্ষণিক রায় প্রদান করতেন তিনি। কলকাতায় আনুষ্ঠানিকভাবে পুলিশ নিয়োগ তখনো শুরু হয়নি। কিন্তু পুলিশি দায়িত্বও কিছুটা পালন করতেন এই বিচারক। ফলে লালবাজারে দরিদ্র শ্রেণির মানুষের বেশ ভিড় ছিল। তাই লিয়েবেদেফ যখন কলকাতায় এসে এখানে ওঠেন তখন এর পূর্ব-মাহাত্ম্য আর ছিল না। ১৭৯৫ সালে ওলন্দাজ শিল্পী ফ্রাসোয়া বালথাজার সলবিন্স কলকাতার চাকর-বাকর পর্যায়ের সিরিজে লালবাজারের রাস্তার চমৎকার ছবি এঁকেছিলেন। তাতে সাধারণ ভারতীয়দের বিশেষ আধিক্য রয়েছে। কসাইটোলার নামেই এর পরিচয় মিলে। লালবাজার থেকে ধর্মতলার পথে ছিল মেরি জান গলি। সাহেবপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন না লিয়েবেদেফ। এইসব মিশ্র অথবা বাঙালি পাড়ায় থাকতেন বিধায় তার সঙ্গে স্থানীয় জনগণের নিত্যকার যোগাযোগ কল্পনা করে নেওয়া যায়।

তাছাড়া ভাষাশিক্ষায় যে প্রবল আগ্রহ ছিল লিয়েবেদেফ-এর সেটাও নিশ্চয় তাঁকে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। কেননা সেটা তো বইপত্রের যুগ ছিল না, ভাষা শিখতে হলে

পণ্ডিতদেব সহায়তা ছাড়া তার অন্য অবলম্বন হতে পারে সাধারণজনের মুখের ভাষা ও ভাবভঙ্গি অনুসরণ। লিয়েবেদেফ-এব সঙ্গে বাঙালি জনগোষ্ঠীর নিবিড় যোগাযোগের একটা ভিত্তি আমরা এখানে খুঁজে পাই। তাঁর গ্রন্থ 'পক্ষপাতশূন্য পর্যবেক্ষণ'-ও সাক্ষ্য দেয় ভারতীয় জনজীবন বিষয়ে তার সম্যক জ্ঞানেব। এই পরিচয়ের ছাপ যে তাঁর নাট্যপ্রয়াসে মিলবে তাতে তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই।

ক্যালকাটা থিয়েটাব নির্মিত হয়েছিল গোটা ইংরেজ সমাজের মিলিত উদ্যোগ ও চাঁদায়। এই থিয়েটার ছিল 'নেটিভদের' প্রতি-তুলনায় ইংরেজ আভিজাত্য ও জাত্যভিমানের প্রতীক। এর বিপরীতে সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে ডোমটোলায় বাঙালি ধাঁচে থিয়েটার হল গড়লেন লিয়েবেদেফ, বাংলা নাটক বাঙালিদেব দ্বাবা বাঙালিদের সামনে পরিবেশনের উদ্দেশ্যে। পাল্কি বেহারারা নিজেরাই যদি সাজানো-গোছানো পাল্কি বানিয়ে তাতে চড়ে জমিদারদের পাশাপাশি পথ চলতে শুরু করে তবে যে বিস্ময় ও ক্রোধের সৃষ্টি হবে লিয়েবেদেফ-এর বেঙ্গলি থিয়েটারও ইংরেজ মহলে তেমনি প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করল। ক্রুদ্ধ ইংরেজদেব ষড়যন্ত্রেব ফলে অচিরেই আগুনে পুড়ে গেল বেঙ্গলি থিয়েটার, সত্য-মিথ্যা নানা ধবনের মামলায় অতিষ্ঠ ও সর্বস্বান্ত হয়ে ভাবত-ত্যাগে বাধ্য হলেন লিয়েবেদেফ।

লিয়েবেদেফ-এব নাট্যপ্রচেষ্টার তিবিশ-পঁয়ত্রিশ বছব পর আবার বাঙালিদের থিযেটাব গড়ার অঙ্কুরোদগম আমরা দেখি। ইতিমধ্যে সামাজিক ক্ষেত্রে কতক বড়ো ধরনের পরিবর্তন ঘটে গিযেছিল। স্বাধীনভাবে ইংরেজি-শিক্ষা গ্রহণ ও পশ্চিমি জ্ঞান আহরণে সচেষ্ট যে শ্রেণিটি ছিল লিযেবেদেফকে ঘিরে— যাঁদের সঠিকভাবে শনাক্ত করেছিলেন শ্রীমতী কেম্প, তাঁদের স্থলে বিকশিত হতে লাগল নতুন এক ইংরেজি-শিক্ষিত নাগবিক গোষ্ঠী, স্বদেশ ও স্বদেশীয সংস্কৃতির সঙ্গে যাদের যোগাযোগ খুব শিথিল। বিকশিত হচ্ছিল এক নব্য-ধনিক শ্রেণি, গ্রামের সঙ্গে যোগ যাদেব বিশেষ নেই, লোকসংস্কৃতিব প্রতি যাঁবা বিমুখ।

১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং ব্রিটিশ বাণিজ্যিক তৎপরতার প্রসার এই নতুন শ্রেণির বিকাশের পথ করে দিয়েছিল। ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের ভাবত-বিষয়ে অবহিত করার জন্য। ১৮১৭ সালে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয হিন্দু কলেজ। ১৮২৩ সালে স্থাপিত হয় জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন। গড়ে উঠছিল নতুন এক উপনিবেশিক মানসিকতা। নব্যবাবুবা সচেষ্ট হয়েছিলেন ইংরেজি নাটক করতে। কিংবা বড়ো জোর ইংবেজ আদলে বাংলা নাটক কবতে। যাত্রা তাদের কাছে হল অপাঙক্তেয়, যে ভারতচন্দ্রের প্রশংসায় উচ্চকণ্ঠ ছিলেন লিয়েবেদেফ তাঁকে নব্য-কালচাবের বাবুদের মনে হযেছিল অশ্লীল। জায়মান কলকাতা শহরে অষ্টাদশ শতকে লোকসংস্কৃতির যে স্থান ছিল তা ক্রমে ক্রমে দখল করে ফেলল নব্য এক বাবু কালচার। এই উপনিবেশিক মানসিকতা যে কত জোরদার হয়ে উঠেছিল, বাঙালি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি কতটা আচ্ছন্ন করেছিল, তার সামান্য একটা উদাহরণ আমরা তুলে ধরতে পারি। নব্য কালচারের নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন লোকায়ত শব্দের অর্থ পালটে দিয়েছিল। কীর্তনের একটি বিশেষ রীতি হিসেবে প্রচলিত ছিল খেউড়। অশ্লীলতার দোষে দোষী হয়ে খেউড ক্রমশ খিস্তির সমার্থক গালাগালির পর্যায়ে উপনীত হল। অথচ ভারতচন্দ্রেই আমরা দেখতে পাই বিদ্যা আব প্রেমিক সুন্দরকে আরো কিছুদিন আটকে রাখার জন্য প্রলোভন দেখাচ্ছে খেউড় শোনাবে বলে। সে বলছে—

নদে শান্তিপুর থেকে খেঁড় আনাইব
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড় শুনাইব।

এখানে বিদ্যা নিঃসন্দেহে খেউড় রীতিব গান শোনাতে চেয়েছিল, অশ্লীল গীতিকাব্যের ইঙ্গিত দেযনি।

অষ্টাদশ শতকের শেষাশেষি কলকাতার নব্য-ধনিকরা কোন সংস্কৃতি অবলম্বন করেছিল সেটা বোঝার জন্য মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবকে আমরা বিবেচনায় নিতে পারি। উইলিয়ম হেস্টিংস যখন কোম্পানির কেরানি ছিলেন তখন নবকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর মুনশি বা ফারসি ভাষার শিক্ষক। পরে হেস্টিংস গভর্নর-জেনারেল হলে নবকৃষ্ণ পান বিশাল তালুকদারি। নবাবদের সঙ্গে ফারসিতে যোগাযোগ রক্ষা ও ইংরেজ স্বার্থরক্ষার অবলম্বন হয়ে তিনি বিপুল বিত্ত আহরণ করেন। সেই সুবাদেই ক্লাইভ তাঁর জন্য 'মহারাজা বাহাদুর' খেতাবের ব্যবস্থা করেন। দেশীয় এই মহারাজার জীবনাচার ও সংস্কৃতির বর্ণনা দিয়েছেন সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষ। তিনি লিখেছেন : 'সারাজীবন ইংরেজদের সাহচর্যে থেকেও এবং হেস্টিংস ক্লাইভের সঙ্গী হয়েও মহারাজা নবকৃষ্ণ তাঁর বেহারা-কামানো মাথার কেশ-শিখাটি পর্যন্ত কাটতে পারেন নি। ধুঁতি পরে, কাঁধে গামছা নিয়ে তিনি রোজ গঙ্গাস্নান করতে যেতেন,— কান্ত খানসামা মাথায় ছাতি ধরে যেত। যখন তিনি রাজকাজে যেতেন, তখন জোড় পড়ে, মাথায় খিড়কিদার পাগড়ি বেঁধে, লপেটা-পাদুকা পরে, ঝালরদার পালকি চড়ে যেতেন।'

নবকৃষ্ণ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ আরো লিখেছেন : 'নবকৃষ্ণ কলকাতা শহরে সেকেলে জমিদারি-তালুকদারি কালচারটাকেই আবার নতুন করে প্রবর্তন করলেন। শান্তিপুর ভাটপাড়া নবদ্বীপের ভট্টাচার্য-গোঁসাই বৈরাগীর কালচার কলকাতার গঙ্গাসাগরে মিলিত হল। এই মহামিলনের প্রধান ভগীরথ হলেন নবকৃষ্ণ।.... মহারাজা নবকৃষ্ণ হরু ঠাকুর, নিতাই বৈষ্ণব প্রভৃতি কবিয়ালদের যথেষ্ট সাহায্য করতেন ও প্রচুর উৎসাহ দিতেন। তাঁকেই কলকাতার আখড়াই ও কবি-কালচারের প্রধান প্রবর্তক বললে ভুল হয় না।'

বস্তুত মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবকে নতুন করে এই সংস্কৃতি কলকাতায় প্রবর্তন করতে হয়নি। এই সংস্কৃতি ব্যতীত ভিন্ন কোনো সংস্কৃতির পরিচয় নবকৃষ্ণের ছিল না। উপনিবেশিকতা প্রভাবিত নগর সংস্কৃতি তখন ডালপালা মেলতে শুরু করেনি। বাঙালি সংস্কৃতির চেহারা ছিল এক ও অভিন্ন।

লিয়েবেদেফ-এর কলকাতাবাসের সময়কালে এই বাঙালি সংস্কৃতিধারা শহরে বড়োভাবে বিরাজ করছিল। বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে মিলনে তাই তিনি একটি সার্থক নাট্যপ্রবাহ সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু সেই সুযোগ তাঁকে দেয়নি প্রতিদ্বন্দ্বী উপনিবেশিক ইংরেজ সমাজ। লিয়েবেদেফ ও তাঁর নাট্যশালা উৎখাতের পরপরই অবসান ঘটে প্রাক্-উপনিবেশিক সংস্কৃতির। শহর কলকাতায় অবহেলিত ও অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে ওঠে যাত্রা, কবিগান, আখড়াই বা ঝুমুর গানের সংস্কৃতি। তাই দেখা যায়, ১৮৩১ সালে আরেক নব্য ধনিক যখন নাটক করতে অভিপ্রায়ী হন তখন তিনি বেছে নেন উত্তর রামচরিতের ইংরেজি অনুবাদ।

ফলে লিয়েবেদেফ পরবর্তী একটা বড়ো সময় আমরা কোনো নাটকের সন্ধান পাই না। সেই বন্ধ্যা যুগের পর সূচিত হয় আরেক ধরনের নিষ্ফলা যুগের। কেননা শহর কলকাতার মানস তখন উপনিবেশিক সংকরতা আচ্ছন্ন। এই ঐতিহাসিক যুগান্তরের কারণেই লিয়েবেদেফ-এর প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা দৃশ্যগোচর হয় না।

লিয়েবেদেফ ছিলেন প্রাক্-উপনিবেশিক বাংলার মানস জগতের সঙ্গে প্রতীচ্যের অ-উপনিবেশিক ধ্যান-ধারণার সংশ্লেষণকারী নাট্যব্যক্তিত্ব। উপনিবেশিকতা-আক্রান্ত সমাজ-মানস তাঁকে দীর্ঘকাল বুঝতে পারেনি। আজও যে পারছে সেটা নিশ্চিত বলা যায় না। সর্বোপরি লিয়েবেদেফ-এর নাট্য-প্রয়াসের সঙ্গে বাংলার কতক প্রতিভাবান যাত্রা-পালাকারগণ যুক্ত ছিলেন। আজকের দিনে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হবে এই গোটা পরিমণ্ডলবাসীর প্রতি। একা লিয়েবেদেফকে নয়।

ইতিহাসের
আলোকে

NIL DURPAN

OR

THE INDIGO PLANTING MIRROR

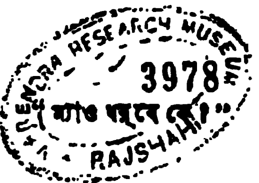
BY

DINABANDHU MITRA

TRANSLATED FROM THE BENGALI
BY A NATIVE



ক



শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রণীত।

"শত্রোরপি গুণাবাচ্যা দোষাবাচ্যা গুরোরপি।
——————" বিরাট পর্ব্ব।

বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম
লাইব্রেরী
সন ১২৬৯ সাল = ১৮৬২

ঢাকা নূতনযন্ত্রে মুদ্রিত।

খ

উনিশ শতকে বাংলাদেশের থিয়েটার

মুনতাসীর মামুন

১৭৯৫ সনে রুশ নাগরিক গেরাসিম স্তেপানোভিচ লিয়েবেদেফ (১৭৪৯-১৮১৮) কলকাতার ডুমতলায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি নাট্যশালা। বাংলা থিয়েটারের শুরু সে থেকে। এর ছত্রিশ বছর পর ১৮৩১ সনে বাঙালি প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং তারপর ১৮৩৫ ও ১৮৫৭ সনে নবীনচন্দ্র বসু ও সাতুবাবুর বাসায় নাটক মঞ্চায়নের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নাট্যশালা। এর পর আরো অনেক নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতায়, যার অধিকাংশের উদ্যোক্তা ছিলেন জমিদার বা উচ্চবর্গের সদস্যরা। উচ্চবর্গের হাত থেকে মধ্যশ্রেণীর হাতে থিয়েটারের কর্তৃত্ব আসে ১৮৭২ সনে, যখন অমৃতলাল, অর্ধেন্দুশেখর প্রমুখ ব্যক্তির উদ্যোগে স্থাপিত হয় 'ন্যাশনাল থিয়েটার'। থিয়েটারকে তাঁরা জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। টিকিটের হার ধার্য করা হয়েছিল এক টাকা ও আট আনা। পেশাদারি বাংলা থিয়েটারের শুরু তখন থেকেই। অবশ্য প্রবেশমূল্যের উল্লেখ এর আগেও পাওয়া যায়, কিন্তু তা ছিল শৌখিন নাট্যগোষ্ঠীর শৌখিন প্রবেশমূল্য, শ্রমের সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল না। তবে প্রবেশমূল্যের অন্য আর একটি দিক ছিল, তা হল, টিকিট কেটে যে-কেউ তখন নাটক দেখার অধিকার অর্জন করেছিলেন।

পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ বাংলাদেশে থিয়েটারের যাত্রা শুরু কবে থেকে হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। বিভিন্ন তথ্যের সাহায্যে অনুমান করে নিতে পারি উনিশ শতকের ষাটের দশকে শুরু হয়েছিল এর যাত্রা। তবে সন-তারিখ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করার আগে বাংলাদেশের থিয়েটারের ধারাগুলি আলোচনা করা দরকার।

বাংলাদেশে থিয়েটারের মোটামুটি চারটি ধারা লক্ষণীয়—

১ ইংরেজদের থিয়েটার

২. শৌখিন নাট্যগোষ্ঠীর থিয়েটার

৩. গ্রুপ থিয়েটার

৪. পেশাদারি থিয়েটার।

প্রথমটি ছিল জন-জীবন বিচ্ছিন্ন। যদিও এ ধারাটিই ছিল প্রাচীন, তবে অনুমান করা যায় উনিশ শতকের শেষার্ধের দিকে এটি গিয়েছিল লুপ্ত হয়ে। বাকিগুলি ছিল প্রায় সমসাময়িক, অবিচ্ছিন্ন ও জন-জীবন সংলগ্ন।

ইংরেজদের থিয়েটার

উনিশ শতকে বাংলাদেশের ছোটো শহরগুলিতে মোটামুটি সবার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন হয়েই ইংরেজ সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীরা বসবাস করত। তারা যে অঞ্চলগুলিতে বসবাস করত সে অঞ্চলটিকে বলা হত 'স্টেশন' এবং বাকি অংশটুকু শহর। এর একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছিল তৎকালীন ঢাকার একটি ইংরেজি পত্রিকা— 'The station is purely of European origin. It is that section of a town or city which is exclusively given up to European dwellings; the 'city' is the section inhabited by the natives and in which all the principal bazar are located.'¹

'স্টেশনে' বা ঢাকার ক্ষেত্রে শহরে বসবাসরত ইংরেজদের বিনোদনের উপায় ছিল পোলো

খেলা, ঘোড়দৌড় এবং পিগস্টিকিং অর্থাৎ দলবেঁধে বন্য শূকব শিকার করা। কিন্তু এগুলি সীমাবদ্ধ ছিল একেবারে উচ্চপদস্থ কর্মচাবীদের মধ্যে। সাধারণ ইংরেজ সৈন্য বা কর্মচারীদের বিনোদনের তেমন কোনো উপায় ছিল না। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বসবাসরত ইংরেজরা শুরু করেছিল থিয়েটার।

ইংরেজদের এ ধবনের প্রচেষ্টার শুরু ১৮৫৭ সনে, ঢাকায় অবস্থানবত নৌ-সেনাদের উদ্যোগে। সারা ভাবত জুড়ে ১৮৫৭ সনে বিদ্রোহের প্রেক্ষিতে ঢাকায় ইংরেজদের অবস্থান জোরদার করতে ঐ বৎসর জুন মাসে ঢাকায় আনা হয়েছিল কিছু নৌসেনা। একঘেঁয়েমি কাটানোর জন্যে এবং সম্ভবত উত্তেজিত ইংবেজদেব স্নায়ু শান্ত করাব জন্যে নৌসেনারা জুলাই মাসে মঞ্চস্থ করেছিল দুটি প্রহসন— 'ক্যাওস ইজ কাম এগেন' এবং 'অরিজিনাল'।

প্রহসনদুটিব বিস্তৃত প্রশংসা করার পর ঢাকা থেকে প্রকাশিত তৎকালীন পূর্ববঙ্গেব একমাত্র ইংরেজি পত্রিকা 'ঢাকা নিউস' লিখেছিল—

'নৌসেনারা না থাকলে আমরা কি কবতে পারতাম? নৌ-সেনারা আমাদের হয়ে দৃশ্যপট সাজালো, গান গাইলো আমাদের জন্যে, এমনকি বাঁশিতে সঙ্গত করতেও সাহায্য করল একজন, ব্যারাকেও ছিল একদল যাদের হাতে ন্যস্ত ছিল আমাদেব ঘরবাড়ির নিরাপত্তা। তারা যখন এসবে ব্যস্ত, তখন আমরা আমাদের প্রতিদিনের উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম দু'একঘণ্টার জন্যে।'[২]

ঢাকার কোথায় প্রহসনটি অভিনীত হয়েছিল তা জানা যায়নি। তবে এটুকু বলা যায়, শুধু থিয়েটারের জন্যে আলাদা করে তখনও 'হল' বা মঞ্চ নির্মাণ করা হয়নি।

১৮৫৮ সনে দেখা যায় যেখানে যেখানে 'স্টেশন' ছিল সেখানেই মোটামুটি থিয়েটারের জন্যে 'হল' তৈরি করা হয়েছিল। ঐ সময় চট্টগ্রাম, সিলেট ও পাবনায় (কুমারখালী?) নির্মিত হয়েছিল 'হল'। এ প্রেক্ষিতে আক্ষেপ করে লিখেছিল 'ঢাকা নিউস'—

'ঢাকা সব কিছুব কেন্দ্র, থিযেটারে পথপ্রদর্শক হওযার কথা তারই। সে তো তা পারেইনি, বরং পাবনা, চট্টগ্রাম, সিলেট এগিয়ে গেছে। অথচ ঢাকায অবস্থানরত ইংরেজ সেনাবাহিনীতে ভারতের শ্রেষ্ঠ কযেকজন অ্যামেচার অভিনেতা আছেন।' পত্রিকাটি আরো দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছিল, 'যদি টাকাই হয় এর কারণ তাহলে চাঁদা তুলে সে অন্তবায় দূব করা যায়। (এবং সবাই তা দেবেও) কাবণ, ঢাকায় বিষাদপূর্ণ আবহাওয়া থেকে মুক্তি পাওয়াব উপায় নাটক ছাড়া আর কি আছে?'[৩]

অবশ্য ঢাকা আব পিছিয়ে থাকেনি। ১৮৫৮ সনের নভেম্বরে, জেন্টলম্যান অ্যামেচাররা নিজেদের থিয়েটারেব উদ্বোধন করেছিলেন।[৪] সিলেট, পাবনা, চট্টগ্রামের থিয়েটারগুলি কিন্তু নির্মিত হয়েছিল তখন বাংলাদেশে অবস্থানরত নৌসেনাদেয় উদ্যোগে।

পাবনার নাট্যশালাটি ছিল 'স্টেশনেব' সবচেয়ে সুন্দর বিল্ডিং। দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্যে নীলকর কেলি তা দান করেছিলেন সরকারকে। (এ বিষয়ে তথ্যাদি দিয়ে চিঠিটি লিখেছিলেন কুমারখালি থেকে জনৈক দ্রাঁ এমিলি)। যে ঘরে স্টেজ বসানো হয়েছিল সে ঘরের চারদিকের দেয়াল সাজানো হয়েছিল নানা দেশের পতাকা নিয়ে। 'স্টেশনের' এই নাট্যশালার ছিল একটি বাদকদল। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ছিল— একটি বাঁশি, দুটি বেহালা, একটি ট্রামপেট ও একটি ড্রাম। নাট্যমঞ্চটি স্থাপন করতে নাকি খরচ হয়েছিল দুশো রূপি এবং তা জোগাড় করা হয়েছিল চাঁদা তুলে। ১৮৫৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এখানে অভিনীত হয়েছিল 'ম্যাকবেথ' এবং জনৈক দর্শকের মতে তা যথেষ্ট উতরেছিল।[৫]

সিলেট স্টেশনের নাট্যশালাটি উদ্বোধন কবা হয়েছিল সেপ্টেম্বব ১৮৫৭ সনে। মঞ্চের নাম দেয়া হয়েছিল— 'হাব ম্যাজেস্টিস থিয়েটাব' এবং ঠিক হয়েছিল প্রতি তিন সপ্তাহে একটি নাটক মঞ্চস্থ হবে। প্রথম রজনীতে মঞ্চস্থ হয়েছিল— 'সেন্ট প্যাট্রিকস ডে' এবং 'বোসবাসতো

ফিউরিসে'।[৬] অক্টোবরের শেষের দিকে অথবা নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেও (১৮৫৮) এই মঞ্চে আরেকটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল বলে জানা যায়।[৭]

১৮৫৮ সনের নভেম্বরে ঢাকার থিয়েটারটি উদ্বোধন করা হয়েছিল 'লক্‌ড ইন উইথ এ লেডি' নামে একটি প্রহসন দিয়ে। প্রহসনের পর গান বাজনা করে আনন্দ দেয়া হয়েছিল দর্শকদের।[৮]

এর পরের বছরগুলিতে কোন কোন 'স্টেশনে' কী অভিনীত হয়েছিল বা এ ধারা অবিচ্ছিন্ন ছিল কিনা সে সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা যায়নি। তবে অনুমান করে নিতে পারি, এটি পরিণত হয়েছিল ইংরেজদের বিনোদনের একটি প্রধান মাধ্যম হিসেবে। জনৈক দর্শক একবার লিখেছিলেন, সিলেটের স্টেশনে থিয়েটার দেখতে যাওয়ার জন্যে তাকে অনেক দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হয়েছিল।[৯]

১৮৫৮ সনের পর ইংরেজদের থিয়েটারের আর একটি সংবাদ পাই ১৮৮৪ সনে। ঢাকায় (৫.১.১৮৮৪) মঞ্চস্থ হয়েছিল একটি ফার্স্। 'পুওর পিলিকোডি' এবং দুঅঙ্কের কমেডি 'মোর প্রেশাস দ্যান গোল্ড'। মঞ্চের নাম ছিল 'থিয়েটার রয়াল'। টিকিটের দাম ছিল আট আনা, এক টাকা ও দুটাকা।[১০] এরপর এ ধরনের নাটক সম্পর্কে আর কোনো তথ্য পাইনি।

ইংরেজদের থিয়েটার সীমাবদ্ধ ছিল নিজেদের মধ্যেই। ১৮৮৪ সনে দাতব্য কারণে যে কমেডি মঞ্চস্থ হয়েছিল তাও সীমাবদ্ধ ছিল ইউরোপিয়ানদের মধ্যে। 'নেটিভ'দের থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য জাহির করার জন্যেই নেয়া হয়েছিল এ ব্যবস্থা।

এ ধরনের থিয়েটারগুলি শুরু হত সাধারণত রাতের খাওয়ার পর, সাড়ে আট থেকে নটার মধ্যে। চলত এগারোটা-বারোটা পর্যন্ত। তবে শুধু নাটকই অভিনীত হত না, নাটকের আগে ও পরে সাধারণ বিচিত্রানুষ্ঠানের বন্দোবস্ত থাকত (যেমন গান বা বাঁশি বাজানো)।

শৌখিন নাট্যগোষ্ঠীর থিয়েটার

শৌখিন নাট্যগোষ্ঠীর থিয়েটার বলতে কী বুঝব? যাঁরা নিছক শখ মেটানো বা বিনোদন বা অন্য কোনো কারণে নাটক করতেন তাঁরাই ছিলেন শৌখিন নাট্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। নিয়মিত প্রদর্শনী বা ঐ ধরনের প্রদর্শনীর মাধ্যমে অর্থোপার্জন তাঁদের কাছে মুখ্য বিষয় নয়। শৌখিন থিয়েটারে প্রধানত আমন্ত্রিত হন দর্শকরা। তবে সব ধরনের দর্শকের জন্যেও তাঁরা প্রদর্শনী করতে পারেন। দাতব্য বা অন্য কোনো কারণেও মাঝে মাঝে এ ধরনের নাট্যগোষ্ঠী টিকিটের বিনিময়ে প্রদর্শনী করে।

বাংলাদেশে এ ধরনের ধারাটি সবচেয়ে পুরোনো (ইংরেজদের জনজীবন বিচ্ছিন্ন থিয়েটারকে বাদ দিলে)। তবে এর যাত্রা কখন শুরু হয়েছিল তা নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। একটি পত্রিকার সংবাদে জানা যায়, ১৮৬১ সনে 'নীলদর্পণ' ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়ে ঢাকাতেই মঞ্চস্থ হয়েছিল প্রথম।[১১] এই খবরের সূত্রে ধরে বলা চলে, 'নীলদর্পণে'র আগে ঢাকায় অভিনয় কিছু হয়েছিল। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে ষাটের দশকের শুরুতে ঢাকা শহর থেকেই বাংলাদেশে শৌখিন থিয়েটারের যাত্রা শুরু।

শুধু শৌখিন নয়, গ্রুপ এবং পেশাদারি থিয়েটারেরও কেন্দ্র ছিল ঢাকা। তবে বিচ্ছিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, দ্বিতীয় ধারাটি শুধু ঢাকাতেই নয়, ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলাদেশের আনাচে-কানাচেও। তবে, শেষোক্ত ধারাটি খুব সম্ভব কেন্দ্রীভূত ছিল ঢাকাতেই।

ঢাকায় থিয়েটার জোরদার হওয়ার একটি কারণ, এখানে স্থাপিত হয়েছিল একটি স্থায়ী রঙ্গ-মঞ্চ— 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'। থিয়েটার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার আগে পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাত করা দরকার।

ঢাকার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। পূর্ববঙ্গ রঙ্গ-

ভূমি ছিল ঢাকা শহরের থিয়েটার চর্চা এবং বিভিন্ন সভা-সমিতির কেন্দ্র। ঢাকার টাউন হলের বেশ খানিকটা অভাব মিটিয়েছিল পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি।

মণ্ডি সাহেবের কুঠি এবং পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের মাঝে, এখন যেখানে জগন্নাথ কলেজ, সেখানে ছিল পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি। সৈয়দ শামসুল হক কথা প্রসঙ্গে একবার আমাকে জানিয়েছিলেন তাঁদের ছেলেবেলায় কলেজিয়েট স্কুলের এক কোণে ডাকবাংলার মতো পুরানো একটি বাড়ি দেখেছিলেন। হতে পারে, উনিশ শতকে সেটিই ছিল মণ্ডি সাহেবের কুঠি। মণ্ডি সাহেব ছিলেন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ। তার পাশেই ব্রাহ্মসমাজ। এ দুটির মাঝামাঝি বা কাছাকাছি ছিল রঙ্গ-ভূমি। শিশিরকুমার বসাক লিখেছেন, এটি স্থাপন করেছিলেন সবজিমহলের জমিদার মোহিনীমোহন দাস, উকিল রাম চক্রবর্তী ও অভয় দাস, নর্মাল স্কুলের পণ্ডিত মতিলাল চক্রবর্তী, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশ গাঙ্গুলি।[১২]

তবে পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি ঠিক কখন স্থাপিত হয়েছিল তা জানা যায়নি। শিশিরকুমার বসাক লিখেছেন ১২৭২ (১৮৬৫) সনে স্থাপিত হয়েছিল 'পূর্ববঙ্গ নাট্যসমাজ' বা 'ইস্ট বেঙ্গল ড্রামাটিক হল'।[১৩] অধ্যাপক আবদুল কাইয়ুম লিখেছেন, ১৮৬৫ সনে ঢাকা শহরে গড়ে উঠেছিল 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গ-ভূমি'।[১৪] সৈয়দ মুর্তাজা আলী এ প্রেক্ষিতে ১৮৬২ সনের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৫] কিন্তু সঠিকভাবে এঁরা কেউই তাঁদের তথ্যের উৎস উল্লেখ করেননি। ফলে তাঁরা কোন ভিত্তিতে ১৮৬২ কিংবা ১৮৬৫ সনকে পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি স্থাপনের সময় বলে গ্রহণ করলেন বোঝা গেল না।

তা ছাড়া আর একটি ব্যাপার তাঁরা এক করে ফেলেছেন। সেটি হচ্ছে 'রঙ্গভূমি' ও 'নাট্য সমাজ'। 'নাট্যসমাজ' গড়ে তোলা ও 'রঙ্গভূমি' প্রতিষ্ঠা করা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। মনে হয়, উদ্যোক্তারা রঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে গড়ে তুলেছিলেন একটি নাট্যদল, যার নাম ছিল— 'পূর্ববঙ্গ নাট্যসমাজ'। 'ঢাকা প্রকাশ'-এর একটি সংবাদও এই অনুমান সমর্থন করে— 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি নামে ঢাকাতে একটি নাট্যশালা আছে। সে সময়ে ধনী সম্ভ্রান্তগণ রামাভিষেক নাটকের প্রথম অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন বহুতর টাকা সংগ্রহে ইহা সুনিশ্চিত হইয়াছিল।'[১৬]

খুব সম্ভব ষাটের দশকের শুরুতেই নির্মিত হয়েছিল 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'। কারণ, ১৮৬৫ সনের 'ঢাকা প্রকাশ'-এর একটি সংবাদে উল্লেখ আছে, ঐ সময় আট হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়ে এটি সংস্কার করা হয়েছিল।[১৭] নব্বই দশকে পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি ভেঙে সেখানে স্থাপন করা হয়েছিল 'ক্রাউন থিয়েটার'।

এ ধারার অভিনীত প্রথম নাটকটি আমাদের জানা মতে 'নীলদর্পণ', যা ১৮৬১ সনে মঞ্চস্থ হয়েছিল ঢাকায়। ১৮৬৮-৬৯ সনে ঢাকায় রাধামাধব চক্রবর্তীর উদ্যোগে এক্রামপুর পদ্মাসার বাড়িতে অভিনীত হয়েছিল 'পদ্মাবতী' ও 'আবু হোসেন'।[১৮] ১৮৬১-৬৯-এর মধ্যবর্তী সময়ে অভিনীত কোনো নাটকের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

১৮৬৯ সনের আগস্ট মাসে বৃন্দাবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণশৃঙ্খল' অভিনীত হয়েছিল বরিশাল শহরে। নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রাজকুমার দত্ত। 'অধিক গোল হইবে বলিয়া আহূত ব্যক্তিদিগের জন্যে টিকেট করা হইয়াছিল।' এখানে উল্লেখ্য যে, অর্থের বিনিময়ে প্রদর্শনীর এটিই প্রথম খবর। শুধু তাই নয়, বরিশাল শহরে খুব সম্ভব এটিই প্রথম অভিনীত নাটক,

কারণ জনৈক পত্রপ্রেরক লিখেছিলেন, বরিশালেও যে 'নাটকাভিনয় হইবে ইহা আমরা একদিনের জন্যও মনে করি নাই।'[১৯]

সত্তর দশকে থিয়েটার আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সংবাদ-সাময়িকপত্রে এ সম্পর্কে নিয়মিত সংবাদ প্রকাশ এর প্রমাণ। এ সময় শুধু ঢাকায়ই নয়, ঢাকার আশেপাশের অঞ্চল, এমনকী পাবনা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া থেকেও থিয়েটারের সংবাদ পাওয়া যায়। তবে সে-সব অঞ্চলে 'পূর্ববঙ্গে বঙ্গভূমি'র মতো কোনো মঞ্চ ছিল না।

১৮৭২-এর দিকে ঢাকায় কয়েকটি শৌখিন নাটকাভিনয়ের খবর জানা যায়—

'বাঙ্গলাবাজারে কতিপয় ব্যক্তি স্বতন্ত্র দলবদ্ধ হইয়া 'প্রাণেশ্বর নাটক', 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের অভিনয় করেন। তদনন্তর আর কয়েক ব্যক্তি সমবেত চেষ্টা হইয়া 'কক্‌স এন্ড কক্‌স' এবং 'চক্ষুদান' প্রহসনের অভিনয় করিয়া উৎসাহিত হন। ইতিমধ্যে আমলী গোলায় আর একদল হইয়া রামাভিষেক নাটকের পুনরাভিনয় করিয়াছেন এবং সেদিন আবার কলেজের কতিপয় বালক রমণী গোপাল নামক অতি জঘন্য একখানি নাটকের অভিনয় করিয়া অনেকেরই বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছেন।.... ঢাকায়ই এ পর্যন্ত ৪/৫ দলের সৃষ্টি হইয়াছে।'[২০]

ঢাকা শহরের আশেপাশে বিক্রমপুরের হাসাড়া, কালীপাড়া, পাওনদিয়া, শ্রীনগর ও বজ্রযোগিনী প্রভৃতি গ্রামেও 'অভিনয়ের বিলক্ষণ ধুম আরম্ভ'[২১] হয়েছিল। বজ্রযোগিনীতে অভিনীত হয়েছিল 'সীতাহরণ' এবং সংবাদ প্রেরকের মতে, পূর্ববাংলার 'পল্লীগ্রামে এই প্রথম অভিনয়। দর্শকসংখ্যার আধিক্য প্রযুক্ত অনেকে আসনাভাবে বসিতে পারেন নাই, মধ্যে মধ্যে লোকের গণ্ডগোল অভিনয় কার্য্যের অনেক ব্যাঘাত হইয়াছিল।'[২২] 'শ্রীনগর থিয়েটার'[২৩] নামে একটি দলের নামও জানা যায়, খুব সম্ভব শ্রীনগর গ্রামে এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

পাবনার মালঞ্চী গ্রামে ঐ একই বছর অভিনীত হয়েছিল 'সাবিত্রী নাটিকা'। মালঞ্চী গ্রামের ব্রজলাল সরকারের বাসায় অভিনীত এ নাটকের বিষয়বস্তু ও অভিনয় দর্শকদের এতই বিমোহিত করেছিল যে, দর্শকদের মধ্যে নাকি 'কোন অসতী স্ত্রীলোক, আপন কার্য্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়া, মুগ্ধপ্রায় ভয়ে'[২৪] কাঁদছিল। ফরিদপুরে পৌষ মেলা উপলক্ষে 'তত্রত্য যুবকগণ দিবারাত পরিশ্রম'[২৫] করে মঞ্চস্থ করেছিল 'রামাভিষেক' এবং তার ব্যয় ধরা হয়েছিল তিনশত রূপি।

কুষ্টিয়া, আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে কুমারখালিতে থিয়েটারের খবর পাই ১৮৭০ থেকে। 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র খবর থেকে অনুমান করে নিতে পারি, ঐ সময় থেকে কুমারখালিতে নিয়মিত থিয়েটার হত (অন্তত গ্রামবার্ত্তার বছর তিনেকের যে ফাইলের খোঁজ পেয়েছি তাতে নিয়মিত এর উল্লেখ আছে)।

কুমারখালির আশেপাশের গ্রামগুলিতে নাটকাভিনয় হয়েছিল। মহিষবাগান ও মেঘলা গ্রামে মঞ্চস্থ হয়েছিল 'ধ্রুব চরিত্র'।[২৬] উকিল শশিভূষণ দত্তের উদ্যোগে সেরকান্দি গ্রামের মধুসূদন সাহার বাড়িতে অভিনীত হয়েছিল 'সীতাহরণ'। নাটকটির রচয়িতা ছিলেন শশিবাবু নিজে।[২৭]

১৮৮০ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত ঢাকা ও অন্যান্য অঞ্চলে এ ধরনের যে-সব খবর পাওয়া গেছে তার বিবরণ দিচ্ছি।

১৮৮২ সনে ঢাকার জনসাধারণ সভা 'স্বায়ত্তশাসন'-এর পক্ষে জনমত সংগঠন করার জন্যে মঞ্চস্থ করেছিল 'ভারত মাতা'। এর রচয়িতা ছিলেন রামচন্দ্র চক্রবর্তী ও কেদারনাথ ঘোষ এবং পরিচালক ছিলেন গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত ও মদনমোহন বসাক। গীতিনাটকটির 'জয়ধ্বনিসূচক সমতান গীতি ও সানন্দধ্বনি এতাদৃশ হৃদয়স্পর্শী ও উদ্বেলক হইয়াছিল যে, সহৃদয় শ্রোতাবর্গ মাত্রেই আহ্লাদে নাচিয়া উঠিয়াছিলেন।....

'ঢাকার জনসাধারণ সভা, যে উদ্দেশ্যে ভারতমাতার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আমরা কণ্ঠ খুলিয়া বলিতে পারি, সেই সুদূর গত লক্ষ্য, অবশ্য ফল লাভ করিয়াছে ও করিবে। প্রত্যেক ভারত সন্তান চিন্তার সহিত এই অভিনয় দর্শন করুন।'[২৮]

১৮৮৪ সনে ঢাকায় 'কতিপয় সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য লোক' পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে 'উত্তরবাম্ন রচিত' অভিনয়ের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।[২৯] ১৮৯৪ সনে 'জগন্নাথ কলেজ গৃহে নলগোলাস্থ বণিকবাবুদিগের উৎসাহ উদ্যোগে নন্দবিদ্যায় নামক নাটকের অভিনয' হয়েছিল কয়েকদিন ধরে।[৩০] ১৮৯৯ সনে ফরাসগঞ্জে ''জীবনবাবুব নাটমন্দিরে 'দি গ্রেট ইম্পিরিয়াল থিয়েটাব ঢাকা' নামক সকের সম্প্রদায়'' মঞ্চস্থ করেছিল 'জনা'। 'ঢাকা প্রকাশ'-এর সংবাদদাতা এই অভিনয় দেখে মন্তব্য কবেছিলেন— 'অভিনেতাদিগের মধ্যে ৭/৮ বর্ষীয় বালকগণ হইতে ৩০/৩২ বর্ষীয় যুবক সকলেই অভিনয়কার্য্যে ধন্যবাদের পাত্র। বুনিয়াদি বড়োলোকের ঘর হইতে লাভ করাতেই বোধ হয়, ইহাদের সাজসজ্জা বস্ত্রালঙ্কারগুলি অতিশয় মূল্যবান ও সুদৃশ্য।'[৩১]

উনিশ শতকের শেষার্ধে (সঠিক সময় জানা যাযনি) তাঁতিবাজারে পণ্ডিত প্রসন্নকুমাব বিদ্যারত্নের উদ্যোগে মঞ্চস্থ হযেছিল 'মালতীমাধব' এবং নবাবপুরের বসাক সম্প্রদায় করেছিল 'সীতার বনবাস'।[৩২] এক্রামপুবেব অধিবাসীরা মঞ্চস্থ করেছিল 'স্বপ্নবিলাস' এবং বালিয়াটির জমিদাব কিশোরীলাল রায় চৌধুরী নিজের বাড়িতে মঞ্চস্থ করেছিলেন 'নবনারী'।[৩৩]

কুমিল্লায় ১৮৮০ সনে থিযেটারের উদ্যোগ গ্রহণের খবর পাওয়া যায় এবং সে খবব থেকে আরো জানা যায় যে, এর আগেও কুমিল্লায় থিযেটার হত।[৩৪] ১৮৯৬ সনে সংবাদপত্রের এক সংবাদে জানা যায়, মুন্সীগঞ্জে থিয়েটার নিয়ে বিলক্ষণ ঝামেলা হয়েছিল এবং 'কলেজের প্রধান মুরুব্বী বাবু জ্ঞানচন্দ্র দাস, ডিঃ ম্যাজিস্ট্রেট ছাত্রদিগের ভয়ে নাটক দর্শনার্থিনী নিজ আত্মীয়দিগকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন।'[৩৫]

গ্রুপ থিয়েটার

বাংলাদেশে এই ধারাটি ছিল বেশ শক্তিশালী, বিশেষ করে ঢাকায় (ঢাকা সম্পর্কিত তথ্যই আমাদের নজরে পড়ে বেশি)। তবে মফস্বল শহরগুলিতে একটি-দুটি গ্রুপ থিয়েটার নিশ্চয়ই ছিল যেগুলির সংবাদ আমরা জানি না।

গ্রুপ থিয়েটার আংশিক পেশাদারি। পুরোপুরি নয় এ কারণে যে, থিয়েটারই দলের সদস্যদের জীবিকার্জনের একমাত্র মাধ্যম নয়। অন্য পেশায় তাঁরা নিয়োজিত, অবসর সময়টুকু তাঁরা ব্যয় করেন থিয়েটারের জন্যে। কোনো বিশেষ আদর্শ বা ভাব প্রচার বা সুস্থ বিনোদনের কারণে সমভাবাপন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয় গ্রুপ থিয়েটার। শৌখিনদের সঙ্গে তাঁদের তফাৎ এ কারণে যে, তাঁরা নিয়মিত নাটক মঞ্চস্থ করার চেষ্টা করেন দর্শনীর বিনিময়ে। টিকেট (কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও হতে পারে) বাবদ যা আয় হয় তা দিয়েই গ্রুপ থিয়েটাবের ব্যয়ের অধিকাংশ নির্বাহ হয়।

বাংলাদেশে গ্রুপ থিয়েটারের উদ্ভব ঢাকায়, এবং 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি'কে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়েছিল তা। দলগুলির আদর্শ কী ছিল তা তথ্যের অভাবে জানা যায়নি। তবে এটুকু বলতে পারি যে, তাঁরা চেয়েছিলেন সুস্থ বিনোদনের মাধ্যম গড়ে তুলতে। এখানে উল্লেখ্য যে, সম্পূর্ণ পেশাদারি থিয়েটাবের পূর্বসুরী ছিল এই গ্রুপ থিয়েটার।

ঢাকার বাইরে যে-দুটি গ্রুপ থিয়েটার সম্পর্কে জানতে পাবি, তা গড়ে উঠেছিল কুমারখালিতে। সত্তর দশকে গড়ে উঠেছিল দল দুটি। 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' লিখেছিল এ সম্পর্কে— 'অদ্য দুই

বৎসর যাবৎ কুমারখালীবাসী যুবকেরা নাটকাভিনয়ের আমোদ অনুভব কবিতেছেন।.... এখানে একটি গীতাভিনয় ও একটি নাটকাভিনয়েব দল আছে।' ১৮৭১ সনে তাঁরা মঞ্চস্থ করেছিল 'রামাভিষেক' যা 'সাধারণের হৃদয়গ্রাহী' হযেছিল। 'গীতাভিনয়ের দলপতিরা ক্রমে সতী, সাবিত্রী এবং কংসবধ প্রভৃতি প্রস্তাবের গীতাভিনয় কবিয়াছেন। ইহারা পাবনা নিবাসী শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পালের রচিত কন্যাবিক্রয় নাটকেরও অভিনয় কবেন।'[৩৬]

কুমাবখালির এ দুটি গ্রুপ থিয়েটার ছাড়া ঢাকার বাইবেব গ্রুপ থিয়েটার সম্পর্কে আর তথ্য পাইনি। এবাব ঢাকার গ্রুপ থিয়েটারগুলি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যেব ভিত্তিতে আলোচনা করব।

১৮৭১ সনে গঠিত হয়েছিল 'প্রাইড অব বেঙ্গল থিয়েটাব'।[৩৭] এব উদ্যোক্তা ছিলেন রাধাকান্ত চক্রবর্তী, শ্যামাকান্ত গাঙ্গুলি, পরেশনাথ ঘোষ, রাজেশ্বর চক্রবর্তী, দ্বাবকানাথ চক্রবর্তী, জ্ঞানেশ্বর রায, আকমল খাঁ এবং ইউসুফ খাঁ। এর মধ্যে শ্যামাকান্ত ও পবেশনাথ ছিলেন পালোয়ান, বাজেশ্বর ডাক্তার, দ্বারকানাথ ছিলেন মুন্সীগঞ্জ স্কুলের বেক্টব এবং শেষোক্ত দুজন ছিলেন সাবান-ব্যবসায়ী। পূর্ববঙ্গ বঙ্গভূমি ভাড়া নিয়ে 'প্রাইড অব বেঙ্গল' অভিনয় করত,[৩৮] তার মানে টিকেটের বন্দোবস্ত ছিল। 'শরৎ সরোজিনী', 'মেঘনাদ বধ' ও 'মহারাষ্ট্র কলঙ্ক' নামে তিনটি নাটক তাঁরা মঞ্চস্থ করেছিলেন বলে জানা গেছে।[৩৯]

ঢাকায় দীর্ঘকাল যে গ্রুপ থিয়েটারটি টিকে ছিল, তার নাম 'নবাবপুর এমেটিয়ার থিয়েটার কোম্পানী'। আবদুল কাইয়ুম লিখেছেন (মুর্তাজা আলীর প্রবন্ধ অনুসারে), 'সমসাময়িক কালে ঢাকায় নবাবপুর এমেটিয়ার থিয়েটার কোম্পানী নামে একটি নাট্যগোষ্ঠী গঠিত হয়, যে নাট্যগোষ্ঠীর উদ্যোগে কালিদাসের অভিজ্ঞানম শকুন্তলম বাংলায় অনূদিত হয় এবং ১৮৭১ সনে তা মঞ্চস্থ হয়।'[৪০]

১৮৮১ সনের জুলাই মাসে 'ঢাকা প্রকাশ'-এর এক সংবাদে জানা যায়, 'ঢাকা নবাবপুর এমেটিয়াব কোম্পানী অভিনয়কার্যে সবিশেষ যশ আহরণ করিয়াছেন।'[৪১] ঐ একই পত্রিকায় অক্টোবর মাসে লেখা হয়েছিল তারা 'শকুন্তলা' মঞ্চস্থ করছে।[৪২] ফলে মুর্তাজা আলী ও আবদুল কাইয়ুম উল্লিখিত সময় নিয়ে একটু সংশয় থেকে যায়।

এভাবে ঘটনাটিকে দেখা যেতে পারে— নবাবপুবেব বসাক পরিবারের চৌদ্দজন সদস্যকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল এই সংস্থা এবং তা বোধ হয ১৮৭১ সনেই। যদিও এব নামের শেষে 'কোম্পানী' শব্দটি যুক্ত ছিল, কিন্তু পেশাদাবি সংস্থা ছিল না এটি। এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ছিল তাঁতিবাজারের এক অ্যামেচার থিয়েটার দলের।[৪৩] এদের একটি সদিচ্ছা ছিল সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ করে মঞ্চস্থ করা। হযতো ১৮৭১ সনে 'অভিজ্ঞানম শকুন্তলম' দিয়েই তারা যাত্রা কবেছিল, নাটকটি হযতো জনপ্রিয় হওয়ায দলটি গঠিত হওযাব দশ বছর পরও তা অভিনীত হয়েছিল। ১৮৯৮ সনেও দেখা যায় দলটি টিকেছিল। এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করছি একটি সংবাদ— 'নবাবপুরে সকের অভিনয় দ্বাবা অনেককাল পূর্ব হইতে অনেকবার ঢাকাস্থ ভদ্রমণ্ডলীব প্রীতি সম্পাদন করা হইয়াছে। এবারও (১৮৯৮) উত্তব নবাবপুরে সকের থিযেটারে বুদ্ধদেব চরিত্রের অভিনয় হইতেছে।'[৪৪]

১৮৯০-৯১ সনের দিকে নবাবপুরেই গঠিত হয়েছিল 'ইলিশিয়াম থিযেটার'। ১৮৮৪ সনের একটি সংবাদের সূত্র ধরে এ সম্পর্কে কিছু অনুমান করা যেতে পারে—

'ঢাকায় স্থানীয়রূপে আমোদ-আহ্লাদের কোনো বন্দোবস্ত ছিল না; কিন্তু কতকদিন হইতে নবাবপুরে অত্রত্য জজকোর্টের পেস্কারবাবু কৃষ্ণকিশোর বসাকের ঐকান্তিক যত্নে একটি নাট্য সমাজ গঠিত হইয়া সাধারণকে নাট্যাভিনয় প্রদর্শিত হইতেছে।'[৪৫]

উপবিউক্ত সংবাদের প্রেক্ষিতে বলা যেতে পাবে, নবাবপুবের বসাক পরিবারেই একজন

কৃষ্ণকিশোর উদ্যোগ নিয়ে 'ইলিশিয়াম' গঠন করেছিলেন। নবাবপুরেই কোনো এক জায়গায় নাটক মঞ্চস্থ হত নিয়মিত, সপ্তাহে দুদিন— বুধ ও শনিবারে।[৪৬] এবং ১৮৮৮ সন থেকে 'রীতিমত অর্থ গ্রহণ করিয়া অভিনয় প্রদর্শন হইতেছে।'[৪৭]

মুর্তজা আলী জানিয়েছেন, ''ইলিশিয়াম 'বিল্বমঙ্গল', 'শকুন্তলা', 'জটিল চরিত', 'সীতার বনবাস', 'প্রভাস মিলন', 'নীলদর্পণ' ইত্যাদি মঞ্চস্থ করেছিল।''[৪৮] এতে মনে হয়, নব্বই দশকের গোড়ার দিকে ইলিশিয়াম ঢাকার সাংস্কৃতিক জগতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল।

ইলিশিযাম বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন কবেছিল, এবং এর মূলে ছিলেন জগন্নাথ কলেজেব অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল নাগ (১৮৫৮-১৯২৪)। তিনি ছিলেন সংস্থার পবিচালক।[৪৯] কুঞ্জলাল ছিলেন বক্ষণশীল হিন্দু। ব্যাপারটি স্ববিরোধী মনে হতে পারে।[৫০] মনে হয় পৌরাণিক নাটকের প্রচাবের মানে ধর্মভাব প্রচার এই ভেবে হযতো তিনি 'ইলিশিয়াম'-এর পরিচালকের পদ গ্রহণ করেছিলেন।

ইলিশিযাম অভিনীত 'বিল্বমঙ্গল' ঢাকায় অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। গিরিশ ঘোষেব 'বিল্বমঙ্গল' অবলম্বনে কুঞ্জলাল ১৮৮৮ সনে নাটকটি রচনা করেছিলেন। এর জনপ্রিয়তার পবিচয পাওয়া যায় প্রকাশিত গ্রন্থটির 'মুখবন্ধ' পড়লে— 'নাট্য সমুদায়ের মোহর ও স্বাক্ষর ভিন্ন কোনো পুস্তক ক্রয বিক্রয় নিষিদ্ধ। যদি কাহারও হস্তে এরূপ পুস্তক দৃশ্য হয় তবে ক্রেতা বা বিক্রেতা ধর্মাবিধকরণে দণ্ডনীয় হইবেন। কেহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক উক্তরূপ ক্রয় বিক্রয়ের সংবাদ আমাদিগকে জানাইযা সন্তোষজনক প্রমাণ প্রদর্শন কবিতে পাবিলে তাহাকে দশ টাকা পুবস্কার দেওয়া হইবে।'[৫১]

এখানে উল্লেখ্য যে, 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের অপবাধেই এই দলের নাটক অভিনয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নাটকটি অভিনীত হওয়ার সময় স্থানীয় সরকাব পক্ষ থেকে আপত্তি ওঠানো হয়েছিল নাটকেব বিশেষ অংশ নিয়ে। এরপর ইলিশিয়াম ভেঙে গিয়েছিল।

১৮৯৯ সনে দক্ষিণ মৈশুণ্ডীতে গড়ে উঠেছিল 'সনাতন নাট্যসমাজ'।— 'ঢাকায আর একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দক্ষিণ মৈশুণ্ডীতে ঢাকার শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন সাহা ও মনিমোহন সাহার উদ্যোগে (শিশিবকুমার বসাকের মতে, উদ্যোক্তাদেব মধ্যে ভজহরি সাহা শঙ্খনিধি ও রাখাল দাস বসাকও ছিলেন) ও অর্থব্যযে সনাতন নাট্যসমাজ নামে ঐ নাট্যশালা গঠিত হইয়াছে।'[৫২] গঠিত হওয়ার পব তারা মঞ্চস্থ করেছিল 'প্রহ্লাদ চরিত্র' এবং মঞ্চাযনের পর দলের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। এবং ঐ সময় ঝড়ে 'নাট্যসমাজের' ঘর ভেঙে গেলে দলও উঠে গিয়েছিল।[৫৩]

ঢাকা থেকে আর একটি গ্রুপ থিয়েটারের নাম পাওয়া যায়, যা গঠিত হয়েছিল ১৮৮৯ সনে। 'ঢাকা প্রকাশ'-এর একটি সংবাদে জানা যায়— 'ঢাকায় আর একটি থিয়েটার কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অত্রত্য সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়— যাঁহাদের আদিনিবাস পশ্চিমবঙ্গে এবং এখনও তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের কথাবার্তাই ব্যবহার কবেন। তাঁহাদের দ্বারাই উহা সম্পাদিত হইতেছে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তি। ইঁহারা পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে 'দক্ষযজ্ঞ' নামক নাটকাভিনয় দেখাইতেছেন।'[৫৪] এর দুসপ্তাহ পর আর একটি সংবাদ— 'অত্রত্য সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়েব অলিম্পিযান থিয়েটারে দক্ষযজ্ঞ নাটক সুন্দররূপ অভিনীত হইতেছে। প্রতি বুধ ও শনিবাবে অভিনয় হইয়া থাকে।'[৫৫]

এই নাট্য সম্প্রদায়ের নাম পরে আব খুঁজে পাইনি। খুব সম্ভব এ দলের নাম ছিল 'অলিম্পিযান থিয়েটাব'। কারণ ঐ নামে ঢাকায় কোনো 'মঞ্চ' বা 'হলেব' নাম পাওয়া যায়নি।

উর্দু নাটকেব খুব চল ছিল ঢাকায, যদিও এ সম্পর্কে বিস্তৃত তেমন কোনো তথ্য পাইনি। উর্দু গ্রুপ থিয়েটারের ভিত্তি খুব সম্ভব মহল্লা। ঢাকায উর্দু নাটকের বা গ্রুপ থিয়েটারের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সাবান-ব্যবসায়ী আকমল খাঁ ও ইউসুফ খাঁ, সত্তর দশকে যাঁরা জড়িত ছিলেন 'প্রাইড অব বেঙ্গল থিয়েটার'-এর সঙ্গে। সম্ভবত নব্বই দশকে এ দুভাই আবার গঠন করেছিলেন

'ফের হাত আবজা' নামে একটি দল, যারা তৎকালীন বিখ্যাত নাটাকার আলি নফিসের ত্রিশটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিল।[৫৬]

সত্যেন সেন জানিয়েছেন, স্থানীয় বারবনিতাবা এসব নাটকে স্ত্রী-পুরুষ দু-ভূমিকায়ই অভিনয় করতেন।[৫৭]

শিশিরকুমার লিখেছেন, গুনুবাঈ, আনুবাঈ এবং নয়াবন— এই তিন বোন পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি ভাড়া করে টিকেট বিক্রি করে 'ইন্দ্রসভা' মঞ্চস্থ করেছিলেন। তিনি অবশ্য তারিখটি জানাতে পারেননি। 'ঢাকা প্রকাশ'-এর সংবাদ অনুযায়ী জানতে পারি ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮৮০ সনে। এই তথ্যটি আমাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ঢাকায় স্থানীয় মহিলাদের দ্বারা অভিনয় এই প্রথম। এবং থিয়েটাবের ক্ষেত্রেও শুধু মহিলাদের উদ্যোগে নাটকাভিনয়ও বোধ হয় এই প্রথম। 'ইন্দ্রসভা' ছাড়াও তাঁরা 'যাদুনগর' নামে আর একটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন।[৫৮]

পেশাদারি থিয়েটার

পেশাদারি থিয়েটার বলতে আমরা বুঝব, একটি রঙ্গমঞ্চ এবং সেই রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি দল, যাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় বা পেশাই হচ্ছে থিয়েটার এবং সে থিয়েটার পরিচালিত হয় সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে।

গ্রুপ থিয়েটারের তুলনায় পেশাদারি থিয়েটার নব্বই দশক থেকে হয়ে উঠেছিল জোরদার। বাংলাদেশে পেশাদারি থিয়েটারের শুরু ঢাকাতেই। কিন্তু কবে থেকে? এ বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য যদিও নেই আমাদের হাতে, তবুও সামান্য যে তথ্য আছে তার ওপর অনুমান করে বলতে পারি, ষাটের দশকে পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠাই ছিল প্রথম পেশাদারি প্রচেষ্টা। যদিও তা সফল হয়নি।

আগেই উল্লেখ করেছি, পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি যাঁরা নির্মাণ করেছিলেন তাঁরা একই সময় পূর্ববঙ্গ নাট্যসমাজ নামে একটি দলও গড়ে তুলেছিলেন। হয়তো তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল অর্থের বিনিময়ে বা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তাঁরা রঙ্গমঞ্চটি পরিচালনা করবেন (যা পরবর্তীকালে তাঁরা পারেননি; কারণ দেখা যাচ্ছে সাধারণ থেকে চাঁদা নিয়ে হল সংস্কার করা হয়েছিল)। এ অনুমান ঠিক হলে ধরে নিতে হবে যে, পূর্ববঙ্গ নাট্যসমাজ গড়ে উঠেছিল ষাটের দশকেই।

সংবাদপত্রের সূত্র অনুসারে, পূর্ববঙ্গ নাট্যসমাজ ১৮৭২ সনে প্রথম মঞ্চস্থ করেছিল 'রামাভিষেক'।[৫৯] মুর্তাজা আলীর মতে 'সীতার বনবাস'।[৬০] কিন্তু এখানে কয়েকটি প্রশ্ন অনুক্ত থেকে যায়— ষাটের দশকেই দল যদি গঠিত হয়ে থাকে তাহলে পরবর্তী এক যুগ কি তারা নিশ্চুপ ছিল? দল গঠনের পর নিশ্চুপ থাকাটা স্বাভাবিক নয়। ১৮৭২-এর আগে নিশ্চয়ই কিছু নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল যা আমরা জানি না।

'রামাভিষেক' অভিনীত হয়েছিল ১৮৭২ সনে; নাটকটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৭ সনে। হতে পারে ১৮৭২ সনের আগেই 'রামাভিষেক' এখানে অভিনীত হয়েছিল 'নাট্যসমাজ' দ্বারা। কিন্তু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল ১৮৭২ থেকে।

'রামাভিষেক' ঢাকার দর্শকদের টিকেট কেটে দেখতে হয়েছিল। টিকেটের হার ছিল চার টাকা, দুটাকা এবং এক টাকা। সেই সময়ের তুলনায় টিকেটের হার যে অত্যন্ত বেশি ছিল তা বলাই বাহুল্য। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এই নাটকাভিনয়ের পর চমৎকৃত হয়ে লিখেছিল, 'আমাদের দেশে (কলকাতায?) নাটক অভিনয়ের নিমন্ত্রণ প্রায় বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে হয়। যাহার ইচ্ছা সে উহা দর্শন করিতে যাইতে পারে না। ঢাকার অভিনয়ে সেটি হইবে না। অভিনয় কর্ত্তারা উহার নির্মিত টিকেট বিক্রি করিবেন। টিকেট চারি, দুই এবং এক টাকা মূল্য লাগিবে।'[৬১]

বস্তুত, কলকাতায় ন্যাশনাল থিয়েটারই ১৮৭২ সনের ৭ই ডিসেম্বব নীলদর্পণ মঞ্চায়নের মাধ্যমে শুরু করেছিল পেশাদার থিয়েটার। এ কাবণেই বোধ হয় অমৃতবাজাব কযেকমাস আগে মন্তব্য করেছিল— 'আমাদের দেশে নাটক অভিনয়ের নিমন্ত্রণ প্রায় বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই হয়।'

এ প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, পেশাদারি বাংলা থিয়েটারের শুরু ঢাকাতেই ১৮৭২ সনের মার্চ মাসে (পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি ও নাট্যসমাজেব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আরো তথ্য পেলে হয়তো এ তারিখ আবো পিছিযে যেতে পাবে)। তবে এ পেশাদারি ধারা টিকিয়ে রাখা যায়নি, সত্তর দশকেব মাঝামাঝিই তা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আর পূর্ববঙ্গ বঙ্গভূমিও তখন আব শুধু থিয়েটাবের স্থান ছিল না, বিভিন্ন সভা-সমিতি হত সেখানে, এক কথায় তা অনেকটা পবিণত হযেছিল ঢাকার টাউন হলে। পেশাদাবি থিয়েটার আবাব নতুনভাবে যাত্রা শুরু করেছিল নব্বই দশকে।

'রামাভিষেক' ছিল ঢাকাব প্রথম জনপ্রিয় নাটক (পরবর্তীকালে আরো অনেকবার নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল)। নাট্যসমাজ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছিলেন টিকেটলব্ধ টাকা তাঁরা ব্যয় করবেন 'সৎকার্যানুষ্ঠানে'। 'রামাভিষেকে'র অভিনয় দেখতে— 'বিস্তর লোকের সমাগম হয়। অনেক অনেক প্রধান মুসলমান, ঢাকার ডিস্ট্রিক্ট সুপাবিনটেনডেন্ট, পোগোজ সাহেব এবং অন্যান্য কয়েকজন খৃষ্টান উপস্থিত হন এবং সকলেই অভিনয় দেখিয়া অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়া গিয়াছেন। সুপাবিনটেনডেন্ট সাহেব এমন আনন্দিত হন যে, তিনি বলেন যে, আবার যখন অভিনয় হইবে তখন আমি মেম সাহেবদিগকে আসিতে বলিব এবং পোগোজ সাহেব বলেন যে, অভিনয়ের টিকেট কিনিতে যে পাঁচ টাকা ব্যয হইয়াছে, তাহা তিনি সৎ কাজে লাগাইয়াছেন।'[৬২]

[illegible] নাট্যসমাজ সম্পর্কে উল্লিখিত তথ্য ছাড়া আর কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে ব্রজেন্দ্রনাথেব গ্রন্থে আমরা 'ঢাকা থিয়েটার কোম্পানী' নামে একটি নাম পাই, যারা 'নবনাটক' মঞ্চস্থ করেছিল।[৬৩] এই কোম্পানিব নাম পরবর্তীকালে আর কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। 'ঢাকা প্রকাশ' (১৬.৭.১৮৭৩)-এর সূত্রে জানা যায (অমৃতবাজারে একই সংবাদ ছাপা হয়েছিল ৪.৯.১৮৭৩-এ). . প্রথমোক্ত 'রামাভিষেক' নাটকাভিনযের কয়েক ব্যক্তি পুনরায় নবনাটকের অভিনয় প্রদর্শনে সমুদ্যোগী হইযাছেন....।' এ থেকে অনুমান করে নিতে পারি— পূর্ববঙ্গ নাট্যসমাজ ও ঢাকা থিযেটাব কোম্পানি ছিল একই সংস্থা; সংস্থার ইংরেজি নাম ছিল শেষোক্তটি। অথবা, ১৮৭৩-এ পূর্ববঙ্গ নাট্যসমাজ ভেঙে গিয়েছিল এবং পূর্বোক্ত দলের কয়েকজন মিলে গঠন করেছিল ঢাকা থিয়েটার কোম্পানি। এবং পূর্ববঙ্গ নাট্যসমাজ 'রামাভিষেকেব' পর 'নবনাটক' মঞ্চস্থ কবেছিল।

১৮৭০ থেকে ১৮৯০ সনেব মধ্যে পেশাদারি থিয়েটার সম্পর্কে আর কোনো তথ্য পাওযা যায়নি। '৯০-এর পর এ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। তাব ভিত্তিতে বলা যায়, নব্বই দশকে ঢাকা শহরকে মাতিয়ে বেখেছিল দুটি পেশাদারি বঙ্গমঞ্চ— একটি 'ক্রাউন', অপরটি 'ডায়মন্ড জুবিলি।

ক্রাউন ও ডাযমন্ড জুবিলি সম্পর্কে সত্যেন সেন লিখেছেন, 'জুবিলী স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা কিশোরীলাল রায় চৌধুরী ১৮৮৭ সালে মহাবানী ভিক্টোরিয়ার রাজ্য শাসনকালের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ডায়মণ্ড জুবিলী থিযেটারেব প্রতিষ্ঠা করেন।

'ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটাব ঢাকার প্রথম পেশাদান নাট্যভবন। ইসলামপুবে আশেক লেনের এক টিনের বাড়িতে এই নাট্যভবনের প্রতিষ্ঠা হয়।....

'ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটার প্রতিষ্ঠা হবার বছর কয়েক বাদে ক্রাউন থিয়েটারের সৃষ্টি হয়। নবাববাড়ির কাছে ইতিপূর্বে যেই ববফ কলটি ছিল তারই পাশে ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটারের মতই একটি টিনেব বাড়িতে ঢাকার দ্বিতীয় পেশাদাব থিয়েটার উদ্বোধন হয।'[৬৪]

উপবি-উক্ত কোনো তথ্যই সঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে শিশিবকুমাবের তথ্য ববং নির্ভরযোগ্য। তাঁব

মতে, 'সনাতন নাট্যসমাজ' ভেঙে গেলে তাব উদ্যোক্তাদের নিয়েই গড়ে উঠেছিল ক্রাউন থিয়েটার। সনাতন-এর ভজহরি ও মনিমোহন সাহা যোগ দেননি এ দলে। কিন্তু অন্যান্য সবাই, এমনকী অভিনেতা দলটিও যোগ দিয়েছিল ক্রাউন থিয়েটাবে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে যোগ হয়েছিল একটি নতুন নাম— কলতাবাজাবেব হরিদাস বসাক। খুব সম্ভব বসাক পবিবাবেরই লোক।[৬৫]

পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি ভেঙে সেখানেই উদ্বোধন করা হয়েছিল ক্রাউন থিয়েটারেব। তবে ক্রাউন থিয়েটার কখন স্থাপিত হয়েছিল তার সঠিক তারিখ জানা যায়নি। 'ঢাকা প্রকাশ'-এ ক্রাউন থিয়েটাব সম্পর্কে প্রথম সংবাদ পাওয়া যায় ১৮৯৩ সনে। সনাতন নাট্যসমাজ ভেঙে গিয়েছিল আশির শেষদিকে। ফলে আমবা ধবে নিতে পারি, ১৮৯০-৯২ সনেব মধ্যে গঠিত হয়েছিল ক্রাউন থিয়েটার। তবে ১৮৯৬ সনে প্রকাশিত এক সংবাদের সূত্র ধরে বলা যায়, ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৬-এর গোড়ার দিক পর্যন্ত কিছুদিন এ থিয়েটার বন্ধ ছিল। সংবাদটি এ বকম—

'অত্রত্য ক্রাউন থিয়েটারে পুনরায় অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে।.... স্থানীয় লোকের উৎসাহ পাইলে ক্রমে ক্রমে ইহা উচ্চশ্রেণিস্থ থিয়েটারে পবিণত হইতে পারিবে। মধ্যে মধ্যে মন পরিবর্তনেব নিমিত্ত এরূপ একটা রঙ্গালয় ঢাকায় স্থায়ী হওয়া অতি আবশ্যক।'[৬৬]

১৮৯৩-এব দিকে ক্রাউন প্রতি সোম, বুধ ও শনিবার অভিনয় হত।[৬৭] ১৮৯৪ সনে দেখা যাচ্ছে সপ্তাহে দুদিন— শনি ও বুধবাব অভিনয় হচ্ছে।[৬৮] প্রথম দিকে সারারাত ধরে অভিনয় চলত। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ ও ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ মন্ডি এ ব্যাপাবে আপত্তি করলে, ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট অভিনয়ের সময় বেঁধে দিয়েছিলেন রাত এগারোটা পর্যন্ত।[৬৯] এ সব কারণেই বোধ হয় এই রঙ্গমঞ্চ পবে স্থানান্তরিত করা হযেছিল ইসলামপুরে।[৭০]

ক্রাউন ও ডায়মন্ডে টিকেট ছিল চার ধরনের। প্রথম শ্রেণি (গদি) দুই টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণি (চেয়ার) এক টাকা, তৃতীয় শ্রেণি (টুল) আট আনা এবং চতুর্থ শ্রেণি (গ্যালারি) চার আনা।[৭১]

ক্রাউন থিয়েটারেব কৃতিত্ব এই যে, বাংলাদেশে এখানেই বাংলা নাটকে অভিনেত্রীরূপে স্থানীয় মহিলারা অভিনয় করেছিলেন। ১৮৯৩ সনে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'পূর্ণচন্দ্র' অভিনয়ের সময়[৭২] নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন দুনিয়া, নায়ক হয়েছিলেন ললিতচন্দ্র দাস।[৭৩] দুনিয়া অবশ্যই বারবনিতা ছিলেন, কারণ, এ ছাড়া তখন অন্য কোনো উপায়ও ছিল না। তা ছাড়া ঢাকার বাইজিরা ঐতিহ্যগতভাবেই নৃত্যগীতে ছিলেন পটু। মঞ্চে অভিনেত্রীর আগমন নিয়ে ঢাকায় তখন অবশ্য বেশ হইচই হয়েছিল। 'ঢাকা প্রকাশ' মন্তব্য করেছিল—

'মনোহরিণী বাববনিতাগণ অভিনয় করে বলিয়া যাহারা আপত্তি করেন তাহাবা এই নাট্যাভিনয়ের সুখ-সৌন্দর্য্যে বঞ্চিত হইতে পারেন; কিন্তু সর্বসাধারণে যখন তাহাদের ভদ্রমহিলাগণের নৃত্যগীতাদি দর্শনে-শ্রবণে সমর্থন নহে.. অপিচ এই অভাববশতঃ লোককে যখন বাইখেমটাওয়ালার নৃত্যগীতে যোগ দিতেই হয় তখন তাহা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এই নাটক অভিনয় দর্শন আমরা কাহারও পক্ষে অন্যায় মনে করি না।'[৭৪] তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, এই মন্তব্য পত্রিকা কর্তৃপক্ষের থিয়েটার প্রীতি সঞ্জাত নয়, এই কটাক্ষ ছিল ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি, যাঁরা ছিলেন মঞ্চে বারবনিতা আমদানির বিরুদ্ধে।

সত্যেন সেন ক্রাউন থিয়েটারের জনপ্রিয় কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম জানিয়েছেন। তাঁরা হলেন— হরিপদ দে, বিনু বাবু, বিনোদ বাবু, নুটু রায, রাধামাধব চক্রবর্তী, গৌরচন্দ্র দাস, বর্ধমানের বাণী (ছদ্মনাম), কনক সবোজিনী ও সরলা। কনক সরোজিনী ছিলেন রাখাল দাসের রক্ষিতা (ক্রাউন থিয়েটারের একজন অংশীদার ছিলেন রাখাল দাস বসাক)।[৭৫]

ক্রাউন থিয়েটার প্রয়োজনবোধে কলকাতা থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রী আমদানি করত। সত্যেন সেন লিখেছেন, 'অর্ধেন্দুশেখব মুস্তোফী কলকাতা থেকে এসে যোগ দিয়েছিলেন ডায়মণ্ড

জুবিলীতে।[৭৬] আসলে, অর্ধেন্দুশেখর প্রথমে এসে যোগ দিয়েছিলেন ক্রাউনে, তারপর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনাবনি না হওয়ায় যোগ দিয়েছিলেন ডায়মণ্ডে।[৭৭]

মুর্তাজা আলী ক্রাউনে অভিনীত বারোটি নাটকের নাম দিয়েছেন। সেগুলি হল— 'চৈতন্যলীলা', 'নলদয়মন্তী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'জনা', 'লায়লি-মজনু', 'তুলাবাঈ', 'আনারকলি', 'সতীসুকন্যা', 'নৈশবালা বা অষ্টবজ্র মিলন', 'কেদার রায়' ও 'সুরসুন্দরী'।[৭৮] এর সঙ্গে 'ঢাকা প্রকাশ' থেকে প্রাপ্ত আরো কয়েকটি নাম যুক্ত করা যায়। যেমন— 'মীরাবাঈ', 'রাজা বাহাদুর', 'আবু হোসেন' এবং 'প্রফুল্ল'।

ক্রাউনের মালিকানা বদল হয়েছিল কয়েকবার। একবার যুগীনগরের দ্বারকানাথ কর্মকার এবং বনগ্রামের ব্রজলাল সাহা রাখালচন্দ্রের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন ক্রাউন থিয়েটার[৭৯] (তখন রাখালচন্দ্রই হয়তো পুরো মালিক ছিলেন)। কিন্তু তাঁরা বেশিদিন তা চালাতে না পেরে ফের বিক্রি করে দিয়েছিলেন রাখালচন্দ্রের কাছে।

১৮৯৭ সনে বালিয়াটির জমিদার কিশোরীলাল রায় চৌধুরী ক্রাউন থেকে কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে ক্রাউনের প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ডায়মণ্ড জুবিলি।

'রাজাবাবুর ময়দানের নূতন গৃহে অভিনয় আরম্ভ' করেছিল ডায়মণ্ড।[৮০] ১৮৯৮ সনে ইসলামপুরে (আজ যেখানে লায়ন সিনেমা দাঁড়িয়ে আছে) স্থানান্তর করা হয়েছিল ডায়মণ্ড জুবিলি। ডায়মণ্ড কলকাতা থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রী এনেছিল এবং প্রয়োজনে স্থানীয় বারবনিতাদের নিয়ে কাজ চালিয়ে নিত। 'ঢাকা প্রকাশ'-এ তাঁদের অভিনীত যে-সব নাটকের নাম পাওয়া গেছে সেগুলি হল, 'দুর্গেশনন্দিনী', 'দেবী চৌধুরাণী', 'বিজয় সেন', 'প্রমোদরঞ্জন', 'আলী বাবা', 'নবীন তপস্বিনী', 'স্ত্রী', 'প্রভাস মিলন', 'বাবু', 'বিল্বমঙ্গল' এবং 'নন্দদুলাল'।

বর্তমান শতকের প্রায় ত্রিশ দশক পর্যন্ত পেশাদারি থিয়েটার টিকে ছিল। এর পাশাপাশিও তখন গড়ে উঠেছিল বেশ কিছু শৌখিন ও গ্রুপ থিয়েটার।

উপসংহার

উনিশ শতকের আত্মমগ্ন বাংলাদেশে, যেখানে বাস্তব সভ্যতার রূপ ছিল গ্রামীণ, সেখানে থিয়েটারের উদ্ভব ও বিকাশ হয়তো খানিকটা আশ্চর্যজনক। কারণ, থিয়েটার ছিল পাশ্চাত্যের সৃষ্টি যা আমদানি করা হয়েছিল রাজধানী কলকাতায় এবং তা আবার সেখান থেকে রপ্তানি করা হয়েছিল বাংলাদেশ (ঢাকায়), তারপর তা ছড়িয়ে পড়েছিল মফস্বল শহরগুলিতে, যেগুলি সামগ্রিকভাবে ছিল সমৃদ্ধ গ্রামেরই বিস্তৃতি, লোকসংখ্যা ছিল অতি নগণ্য (শহরে স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যাও ছিল কম)।

নিরানন্দ শহরগুলিতে বিনোদনের মাধ্যম প্রায় কিছুই ছিল না (সে ক্ষেত্রে শহরে অবস্থানরত প্রবাসীদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়— যাঁরা বাস করতেন পরিবার-পরিজনহীন অবস্থায়)। বিনোদনের নতুন উপায় হিসেবে থিয়েটারের উদ্যোগ নিয়েছিল প্রধানত 'সর্বোচ্চ পদের আমলাদের বাদ দিয়ে মধ্যবিত্তের বাকি অংশ' ও 'অপেক্ষাকৃত হীনবল গ্রামভদ্র'।

কিন্তু শুধু বিনোদনই মুখ্য হতে পারে না। সে সময় সমাজক্ষেত্রে (বিশেষ করে মধ্যশ্রেণীর ক্ষেত্রে) দেখা গিয়েছিল জাগরণ। ব্রাহ্ম আন্দোলন নাড়া দিয়েছিল হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে; স্কুল-কলেজ আরো অধিকসংখ্যক যুবক আসছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে, গড়ে উঠেছিল সভা-সমিতি, সংবাদপত্র। শহরের এইসব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের একটি অংশ হিসেবে শুরু হয়েছিল থিয়েটার।

এ পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যশ্রেণী আবার ধারক-বাহক হয়ে উঠেছিল নৈতিক মূল্যবোধের। খুঁজেছিল

তারা বাই-খেমটা বা ঘোড়-দৌড়ের বিপরীতে সুস্থ বিনোদনের উপায়। কাঙ্গাল হরিনাথ যেমন লিখেছিলেন, 'কুৎসিতামোদ পরিত্যাগ' করে যুবকরা 'বিশুদ্ধ নাটকাভিনয়' করলেই ভালো।[৮১]

বিনোদনের এ উপায়কে আবার অনেকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন সমাজ সংস্কারের বাণী পৌছে দেয়ার মাধ্যম হিসেবে। একটি সাময়িকপত্র লিখেছিল— 'নাটকাভিনয় যে স্বদেশ উন্নতি সাধনের একটি উত্তম পথ' সবাই তা স্বীকার করেন। আর সবার উপরে রাজধানী কলকাতার প্রভাব তো ছিলই।

এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে থিয়েটারের উদ্ভব ও বিকাশ। মূলত ঢাকা শহরেই ছিল এর প্রভাব ও প্রতিপত্তি। কারণ, থিয়েটারের ইনফ্রা-স্ট্রাকচারের সুযোগ-সুবিধাগুলি ঢাকায়ই ছিল বেশি। উল্লেখ্য যে, একদিক থেকে ঢাকায় (তথা বাংলাদেশে) থিয়েটারের যাত্রা ছিল কলকাতা থেকে ভিন্ন। কলকাতায় থিয়েটারের শুরু বাগানবাড়িতে এবং তা থেকে থিয়েটারের মুক্তি পেতে সময় লেগেছিল প্রায় চল্লিশ বছর। বাংলাদেশের থিয়েটার শুরু হয়েছিল প্রধানত মধ্যশ্রেণির আগ্রহে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের থিয়েটার এমন কিছু করতে পারেনি যা কলকাতা থেকে একেবারেই ভিন্ন। এবং সেটাই ছিল বোধ করি স্বাভাবিক। এ সম্পর্কে ঢাকার থিয়েটারের সঙ্গে আজীবন সংশ্লিষ্ট ব্রজগোপাল দাসের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

'পাশ্চাত্যের সকল থিয়েটারের পীঠভূমি কলকাতা। আর কলকাতার নকলের পীঠভূমি ছিল ঢাকার থিয়েটার। এ ব্যাপারে এখানে মৌলিকত্ব বলতে কোন কিছুই ছিল না, না জেনে না বুঝে নকল। পবিকল্পনা, মঞ্চ-স্থাপত্য— এ সবের কোনো ধার ধারা হত না। নকলের নকল যা হয় তাই।.... ছিল সখীর পার্ট; গানের প্রাচুর্য। ছিল না সমাজ দায়িত্ববোধ, পারিবাবিক জীবনই ছিল নাটকের উপজীব্য।.... এন্টারটেনমেন্ট ভ্যালু— এটাই ছিল মূলকথা। ভাল প্রোডাকশন হলে দর্শকরা তাব মধ্যেই নিজেদের সত্তা হারিয়ে ফেলতো।'[৮২]

বাংলাদেশের থিয়েটারের প্রথম যে ধারার কথা এই প্রবন্ধের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে, তার সঙ্গে বাংলাদেশের বাংলা বা উর্দু থিয়েটারের কোনো যোগই ছিল না। সম্পূর্ণ জনজীবন বিচ্ছিন্ন সেই থিয়েটার সীমাবদ্ধ ছিল স্বল্পসংখ্যক ইংরেজ কর্মচারীর মধ্যেই। বাকি তিনটি ধারা চলছিল পাশাপাশি, সমান্তরালভাবে। এ ক্ষেত্রে কলকাতার থিয়েটার থেকে ভিন্ন কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। দর্শনীর বিনিময়ে নাটক প্রদর্শন, বাঙালি দর্শকের কাছে যা ছিল একেবারে নতুন ধারণা, তার খবর আমরা প্রথম পাই বাংলাদেশে (১৮৬৯ সনে বরিশালে): অবশ্য, এর আগে ঢাকায়ও তা শুরু হয়ে থাকতে পারে, পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমিতে। উল্লেখ্য যে, শুধু থিয়েটারের জন্যেই একটি রঙ্গভূমি তৈরি করা ছিল অবিভক্ত বাংলায় এক অভাবনীয় ঘটনা। (তাও আবার রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছিল সাধারণের টাকায়)। পেশাদারি থিয়েটার আগে শুরু হলেও জোরদার হয়ে উঠেছিল নব্বই দশকে। এ প্রসঙ্গে 'ঢাকা প্রকাশ' লিখেছে—

'.... কলিকাতায় তিনি [অর্ধেন্দুশেখর মুস্তোফী] ব্যবসায়ী নাট্য সম্প্রদায় করিবার পূর্বে ঢাকায় রঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠিত হইয়া নাটকাভিনয়ের ব্যবসায় আরম্ভ করা হইয়াছিল। বাঙ্গালা ১২৮০ (১৮৭৩) আমরা ঢাকায় টিকেট কিনিয়া এলোকেশী নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম। এলোকেশী নাটকাভিনয়ের পূর্বে যে রামাভিষেক প্রভৃতি নাটকাভিনয় হইয়াছিল তাহা আমরা ব্যক্তিগতভাবে দেখি নাই, কিন্তু 'ঢাকা প্রকাশ' আমাদের পূর্বে যাঁহারা সম্পাদনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন। অতএব কলিকাতায় অর্ধেন্দুবাবুর কার্যারম্ভের এক [যুগ?] পূর্বে ঢাকায় ঐ কার্যারম্ভ হইয়াছিল।'[৮৩]

শুরুতেই টিকেট বিক্রি মুক্ত করেছিল বাগানবাড়ি থেকে, মুষ্টিমেয়র হাত থেকে।

বাংলাদেশে থিয়েটারের জয়যাত্রা যে একেবারে অপ্রতিহত ছিল তা নয়। মাঝে মাঝে তা বিরুদ্ধ পক্ষের সম্মুখীন হয়েছে, অন্তত ঢাকায়। এ বিরোধিতা কবেছিল ব্রাহ্ম সমাজের একটি গ্রুপ এবং

কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঢাকা কলেজের অল্পসংখ্যক ছাত্রদের কাছ থেকে। সত্যেন সেন লিখেছেন এ প্রসঙ্গে—

'ব্রাহ্মদের প্রগতিমুখী চিন্তার পাশাপাশি, প্রতিক্রিয়াশীল যদি নাও বলি, অন্ততপক্ষে রক্ষণশীল চিন্তাও ঠাঁই করে নিয়েছিল। সামাজিক উচ্ছৃংখলতার হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে তারা একেবারে বিপরীত প্রান্তে গিয়ে কঠোর নীতিবাগীশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।.... পতিতা মেয়েরা থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকত বলেই তারা থিয়েটার বর্জনীয় বলে মনে করতেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেছে মেয়েরা জড়িত থাক আর নাই থাক, কোন থিয়েটারকেই তারা সুদৃষ্টি নিয়ে দেখতেন না।'[৮৪]

আবার এর বিপরীতে দেখি হিন্দু রক্ষণশীল কুঞ্জলাল নাগ থিয়েটারের ব্যাপারে ঢাকায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন। মধ্যশ্রেণীর স্ববিরোধিতা স্বাভাবিকভাবেই এ ক্ষেত্রে কাজ করেছে। যাঁরা রক্ষণশীল অথচ থিয়েটার দেখেছেন বা বিরোধিতা করেননি তাঁরা একে দেখেছিলেন সমাজ সংস্কারের বাহন হিসেবে। অমৃতবাজার লিখেছিল—

'সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন আমোদ-আহ্লাদের আবির্ভাব হয়। ইংরাজি সভ্যতায় এ দেশে অন্যান্য আমোদের মধ্যে মদ্যপান এবং নাটকাভিনয় আনয়ন করিয়াছেন।.... মদ আনিয়া যেমন হিন্দু সমাজে নানা পাপ প্রস্রবণ খুলিয়াছে, সমাজ সংস্কার করিবার নিমিত্ত তেমনি নাটক অভিনয়ের সৃষ্টি হইয়াছে।'[৮৫]

ঢাকায় গত শতকে যে-সব নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল তার একটি খতিয়ান নিলে দেখা যাবে অধিকাংশ নাটকের বিষয়বস্তু ছিল পৌরাণিক বা অন্য কথায় যাত্রার উন্নত রূপ, যা দেখে 'ঢাকা প্রকাশ'-মন্তব্য করেছিল, 'কল্পনামূলক নাটক অপেক্ষা ঢাকায় পুরাণঘটিত উৎকৃষ্ট নাটকের সমাদর অধিক।'[৮৬] পাবনা থেকে একই সময় (১৮৭৩) এক ভদ্রলোক লিখেছিলেন, 'প্রাচীনপন্থী বৃদ্ধ বা যুবকরাও সংস্কৃত ভাষায় ভিন্ন নাটক না দেখিলে সন্তোষ' প্রকাশ করেন। শুধু তাই নয়, পৌরাণিক বিষয় না থাকলে 'যারপরনাই ঘৃণা করেন' এবং উদ্যোক্তাদের মনে করেন 'অপদার্থ, নির্লজ্জ ও মূর্খ'।[৮৭]

এ প্রসঙ্গে মঞ্চস্থ দু-একটি প্রহসন বা ব্যঙ্গ নাটকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শিশিরকুমার বসাক লিখেছেন, ঢাকায় অভিনীত এ ধরনের নাটকগুলিতে সমসাময়িক ঘটনাবলি প্রতিফলিত হত। 'এক কথায় সমাজের দুর্নীতিমূলক ব্যবস্থাগুলোর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া পরোক্ষে সুষ্ঠু পরিবেশ গঠনের ইঙ্গিত দিত।' তিনি 'তাজ্জব ব্যাপার' নামে একটি নাটকে তৎকালীন 'নারী জাগরণের চিত্র' তুলে ধরেছিলেন।

কলকাতাতেও এর খুব একটা রকমফের হয়নি। অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন— 'মাইকেল-দীনবন্ধুর নাটকে যে প্রগতিশীল, সমাজ সংস্কারমূলক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল তার সঙ্গেও ১৮৭২ সনের পরবর্তী সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর কোনোই যোগ ছিল না। ওই সময় আদর্শের পুনঃস্থাপনা ও পুরাতন সামাজিক মূল্যগুলো সংরক্ষণের দিকেই সমাজের ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। মাইকেল-দীনবন্ধু যুগের প্রতিবাদ ও ভাঙ্গনের দিকে তখনকার সমাজের আগ্রহ ছিল না, আধ্যাত্মিক ভাবের পুনরুদ্বোধন, পুরাতন সমাজনীতি ও আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিকেও তখনকার সমাজমনের ঝোঁক দেখা গেল।'[৮৮]

পৌরাণিক বিষয় পছন্দ করার পেছনে এ সব কারণ ছাড়াও যাত্রার ঐতিহ্য ও প্রভাবের কথা মনে রাখতে হবে। সাধারণ মানুষের কাছে, গ্রামাঞ্চলে, এমন কী শহরেও যাত্রা ছিল জনপ্রিয়। কৃষ্ণকুমার মিত্র লিখেছেন— 'সেকালে ময়মনসিংহ পৌষ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত অনেক বাড়িতেই যাত্রাগান হইত। পশ্চিমবাংলা ও বরিশালের যাত্রাওয়ালাগণ অনেক টাকা উপার্জন করিত। পশ্চিমবাংলার যাত্রাওয়ালাগণ 'অক্রূর সংবাদ', 'মানভঞ্জন', 'রাম বনবাস' প্রভৃতি প্রাচীন ধরনের

গান করিত। বরিশালের এক নট প্রায় প্রতি বৎসরই ময়মনসিংহ আসিয়ার বহু টাকা লইয়া যাইত। সে ঢাকার কৃষ্ণকমল গোস্বামী বিরচিত প্রথমে 'স্বপ্নবিলাস', তাহার পর 'বাই উন্মাদিনী' যাত্রাগান করিয়া সমস্ত সহর মাতাইয়া তুলিত। লোকে যশোদাব খেদোক্তি ও রাধিকার প্রমত্ত অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইত।"[৯]

যাত্রাব জন্যে, এমনকী ঢাকা শহরও ছিল বিখ্যাত, লিখেছেন হৃদয়নাথ মজুমদার। 'সীতার বনবাস' ছিল ঢাকার প্রথম যাত্রা। এক্রামপুব থেকে 'স্বপ্নবিলাস' নামে একটি যাত্রা মঞ্চস্থ করা হয়েছিল, যা নাকি তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল শহরে। 'স্বপ্নবিলাস'-এর সাফল্যের পর এক্রামপুর থেকে পবপর মঞ্চস্থ করা হয়েছিল 'বায় উন্মাদিনী' ও 'বিচিত্র বিলাস'। নবাবপুরের বাবুদের উদ্যোগে মঞ্চস্থ হয়েছিল 'নাবদ সম্বাদ' ও 'প্রভাস লীলা'। ঢাকার শেষ অ্যামেচার যাত্রা 'কোকিল সংবাদ'। সুভড্যার কযেকজন ভদ্রলোক মিলে এর আয়োজন করেছিলেন। শহরে ছয়মাস এবং গ্রামাঞ্চলে ছয়মাস— প্রায় একবছব ধবে চলেছিল 'কোকিল সংবাদ'।[১০]

যাত্রার জনপ্রিয়তার হয়তো একটি কাবণ, পূর্ববঙ্গের বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশ, যা এ অঞ্চলেব মানুষেব মনে সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল এক ফ্যান্টাসিব জগৎ। যাত্রা সে ফ্যান্টাসির জগৎ পূবণে সাহায্য করত এবং এখনও কবে। কিন্তু একটি জিনিস লক্ষণীয়, উদ্যোক্তারা এদিকে খেয়াল রেখেই থিযেটার করেছিলেন, যা ছিল যাত্রাবই উন্নত রূপ।

উনিশ শতকে বাংলাদেশেব থিযেটাব আঙ্গিকগত বা বক্তব্য প্রকাশে নতুন কিছু হয়তো করতে পাবেনি, এবং এর দর্শকও ছিল মুষ্টিমেয, কিন্তু এ কথা বোধ হয অস্বীকার করা যায় না যে, বিনোদনের সুস্থ মাধ্যম হিসেবে থিযেটার নিজেকে তুলে ধবেছিল, সাধারণ মানুষকে দিয়েছিল শিক্ষা, উন্নয়ন কবেছিল তাদের সাংস্কৃতিক মান,[১১] দিয়েছিল নির্মল আনন্দ।

তথ্যপঞ্জি

১ The Bengal Times, 22 6.1878 ঢাকা এবং কলকাতা ছিল এই সংজ্ঞার বাইরে।

২. The Dacca News, 18 7.1857.

৩. Ibid, 4 10 1858

৪. Ibid, 6 11.1858

৫ Ibid, 2 10 1858.

৬ Ibid

৭ Ibid, 6.11 1858

৮. Ibid

৯. Ibid

১০. The Bengal Times, 2 1 1884.

১১ ঢাকার থিয়েটার সম্পর্কে কলকাতার 'হরকরা' পত্রিকার ঢাকাস্থ সংবাদদাতা লিখেছিলেন— 'Our native friends entertain themselves with occasional theatrical performances and the 'Nil Darpan' was acted on one of these occasions'. (হরকরার সংবাদ, ১২.৬.১৮৬১), উদ্ধৃত, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, 'উনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকায় নাট্য আন্দোলন', 'সাহিত্য পত্রিকা', ১৭ বর্ষ, ২ সংখ্যা ১৩৮০, পৃ. ৩৪।

১২. শিশিরকুমার বসাক, 'ঢাকার নাট্যশালার আদি ইতিহাস', দৈনিক আজাদ, ১০.১০.১৯৬৪, পৃ. ৬, ৭।

১৩ ঐ।

১৪. মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, 'সাময়িকপত্রে সেকালেব ঢাকা', বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ১৯৭০, পৃ. ৫১।

১৫. সৈযদ মুর্তাজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

১৬. ঢাকা প্রকাশ, ২৮.১১.১৮৮০।
১৭. ঐ, ২৭.৪.১৮৮৪।
১৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দেখুন, শিশিরকুমার বসাক, প্রাগুক্ত। [মুর্তাজা আলী জানিয়েছেন, '১৮৬৫ সনে ময়মনসিংহের শেরপুরের জমিদাররা 'একেই কি বলে সভ্যতা' মঞ্চস্থ করেছিলেন।' অবশ্য তিনি কোনো তথ্য নির্দেশ করেননি। সৈয়দ মুর্তাজা আলী। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।]
১৯. ঢাকা প্রকাশ, ৮.৮.১৮৬৯।
২০. ঐ, ১৬.৮.১৮৭৩।
২১. ঐ।
২২. ঐ, ২.২.১৮৭৩।
২৩. অমৃতবাজার পত্রিকা (৪.৯.১৮৭৩), উদ্ধৃত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', কলকাতা, ১৩৬৮, পৃ. ১২১।
২৪. গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১.১১.১৮৭৩।
২৫. ঐ, ১০/৩৩, ১৮৭৩।
২৬. ঐ, ৩.১.১৮৭৩।
২৭. ঐ, ১৫/১১শ, ১৮৭৩।
২৮. ঢাকা প্রকাশ, ৩০.১২.১৮৮২।
২৯. ঐ, ২৮.১২.১৮৮৪।
৩০. ঐ, ১৭.৬.১৮৯৪।
৩১. ঐ, ১২.৩.১৮৯৯।
৩২. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।
৩৩. সত্যেন সেন, 'ঢাকা শহরের নাচগান, শহরের ইতিকথা, ঢাকা', ১৯৭৪, পৃ. ৩৮, ৩৯।
৩৪. ঢাকা প্রকাশ, ৪.৪.১৮৮০।
৩৫. ঐ, ৪.১০.১৮৯৬।
৩৬. গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ১০/২৪,১৮৭২।
৩৭. সৈয়দ মুর্তাজা আলী ও শিশিরকুমার বসাকের প্রাগুক্ত প্রবন্ধ।
৩৮. শিশিরকুমার বসাকের প্রাগুক্ত প্রবন্ধ।
৩৯. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ৩৬।
৪০. মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম. প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ৫২।
৪১. ঢাকা প্রকাশ, ২৪.৭.১৮৮১।
৪২. ঐ, ৪.৯.১৮৮১।
৪৩ ঐ।
৪৪. ঐ, ২.১০.১৮৯৮।
৪৫. ঐ, ১৭.৫.১৮৯১।
৪৬. ঐ।
৪৭. ঐ।
৪৮. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ, পৃ. ৩৮।
৪৯. শিশিরকুমার বসাক, প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, (১০.১০.১৯৬৪)।
৫০. কুঞ্জলাল ব্রাহ্মমত গ্রহণ করেছিলেন। একদিন জগন্নাথ কলেজে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেয়ার সময় মেঝেতে পা ঠুকে বলেছিলেন, এ ভাবে পৌত্তলিকতা দমন করতে হবে। এ সময় কাঠের পাটাতন সরে গেলে তিনি নীচে পড়ে প্রচণ্ড ব্যথায় মাস তিনেক শয্যাশায়ী ছিলেন। সবাই তখন বলতেন, এটা তাঁর বাড়াবাড়ির ফল। কুঞ্জলালও তা বিশ্বাস করে আবার হিন্দু ধর্মে ফিরে গিয়েছিলেন।
৫১. শিশিরকুমার বসাক, প্রাগুক্ত প্রবন্ধ।

৫২. ঢাকা প্রকাশ, ৬.১.১৮৮৯।
৫৩. শিশিরকুমার বসাক, প্রাগুক্ত প্রবন্ধ।
৫৪. ঢাকা প্রকাশ, ১১.৮.১৮৮৯।
৫৫. ঐ, ২৫.৮.১৮৯৯।
৫৬. সত্যেন সেন, প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ৩৯।
৫৭. ঐ।
৫৮. শিশিরকুমার বসাক, প্রাগুক্ত প্রবন্ধ, (১০.১০.১৯৬৪), পৃ. ২।
৫৯. ঢাকা প্রকাশ, ২৮.১১.১৮৮৫।
৬০. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪।
৬১. অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৮.৩.১৮৭২, উদ্ধৃত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত।
৬২. অমৃতবাজার পত্রিকা, ৪.৪.১৮৭২, ঐ, পৃ. ৬৯।
৬৩. ঐ।
৬৪. সত্যেন সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।
৬৫. শিশিরকুমার বসাক, প্রাগুক্ত, (১৭.১০.১৯৬৪)।
৬৬. ঢাকা প্রকাশ, ২.২ ১৮৯৬।
৬৭. ঐ, ৩.১২.১৮৯৩।
৬৮. ঐ, ২৯.৪.১৮৯৪।
৬৯. শিশিরকুমার বসাক, প্রাগুক্ত (১০ ১০.১৯৬৪)।
৭০. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।
৭১. সত্যেন সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।
৭২. ঢাকা প্রকাশ, ২১.৫.১৮৯৩।
৭৩ সৈয়দ মুর্তাজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।
৭৪. ঢাকা প্রকাশ, ২১.৫.১৮৯৩।
৭৫. সত্যেন সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬,৭।
৭৬. ঐ। সে সময়ের বিখ্যাত অভিনেত্রী সুকুমারী দত্তও ক্রাউনে কিছুদিন কাজ করেছিলেন, ঢাকা প্রকাশ।
৭৭. ঢাকা প্রকাশ, ২.৭.১৮৯৯।
৭৮. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।
৭৯. ঐ।
৮০. ঢাকা প্রকাশ, ২৬.১২.১৮৯৭।
৮১. মধ্যস্থ, বৈশাখ, ১২৮০।
৮২. সত্যেন সেন, প্রাগুক্ত. পৃ. ২৯।
৮৩. ঢাকা প্রকাশ, ১৬.১২.১৯০০।
৮৪. সত্যেন সেন। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।
৮৫. অমৃতবাজার পত্রিকা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮, ৬৯।
৮৬. ঢাকা প্রকাশ, ১২.৬.১৮৭৩।
৮৭. গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা ১.১১.১৮৭৩।
৮৮. অজিতকুমার ঘোষ, 'শতবর্ষের মঞ্চ পরিক্রমা' সংকলিত হয়েছে 'শতবর্ষের নাট্যশালায়'। উদ্ধৃত, Suniti Kumar Chattopadhyay, 'Hundred Years of Bengali Natyashala', Nineteenth Century Studies, No. 6, Calcutta, P 266
৮৯. কৃষ্ণকুমার মিত্র, আত্মচরিত, কলকাতা, ১৩৮১।
৯০. বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন, Hridaynath Majumdar, Reminiscences of Dacca, Calcutta 1926
৯১. সত্যেন সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

বাংলাদেশের নাটক : সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ (১৯৪৭-৭০)

আহমেদ সানি

বাংলা নাটকের কাল নির্ণয় করতে হলে লোকজবীতিব নাট্যকে অনুসবণ কবা উচিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে লিয়েবেদেফের নাট্য প্রয়াসকে বাংলা নাটকের সূচনাপর্ব ধবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। কথাটা বলার কারণ এই যে, লিয়েবেদেফকে নিয়ে বাংলা নাটকের শুরু কথাটা প্রকৃত অর্থে আজ আর ইতিহাস সম্মত নয় কারণ সহস্র বৎসব ধরে অজস্র বিষয় আঙ্গিক নিয়ে যে সকল কাহিনি কাব্য পরিবেশিত হয়ে আসছে তার নিরিখে বলা যায় বাংলা নাটক হাজার বছর পূর্বেই শুরু হয়েছিল। তবু প্রদত্ত শীর্ষনামেব এ প্রবন্ধ লিখতে লিয়েবেদেফের নাট্যপ্রয়াসকেই অনুসবণ কববে। কাবণ ১৯৪৭-১৯৭০ সাল পর্যন্ত যে সকল নাটক মঞ্চস্থ ও রচিত হয়েছে তার অধিকাংশ লিয়েবেদেফের নাট্যবীতির ধারাবাহিকতায় সৃষ্ট।

মধুসূদন দত্ত বচিত 'শর্মিষ্ঠা' 'একেই কি বলে সভ্যতা' 'বুড় সালিকেব ঘাড়ে রোঁ', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী' এবং 'মায়া-কানন' নাটকেব মধ্য দিয়ে প্রকৃত অর্থে বাংলা নাটকেব আধুনিক যুগ সূচিত হলেও রবীন্দ্রনাথের নাটকের মাধ্যমে তা পূর্ণরূপ লাভ করে। অতঃপব শুরু হয় বাংলা নাটকের সংকট। বাংলা নাটকের সে সংকট প্রকৃত অর্থে আজও দূবীভূত হযনি। তবে রবীন্দ্রোত্তর কালে বাংলা নাটকের যে কয়জন প্রতিভাবান নাট্যকারের কথা আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশে উচ্চারিত হয় তন্মধ্যে মমতাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ শামসুল হক, মামুনুর রশীদ এবং সেলিম আল দীনের নাম অন্যতম। কিন্তু এ কথা সত্য যে স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলা নাটক সাহিত্য ও প্রায়োগিক শিল্পমূল্যে যতটুকু ক্রমোন্নতির ধারা প্রত্যক্ষ করা যায় স্বাধীনতাব পূর্বে তা ততটুকুই ছিল ম্রিয়মান।

তবে এ কথা ঠিক, যে কোনো শিল্পসৃষ্টি নিত্যই নতুন পথের সন্ধানে চলে। তবে শিল্পের সে পথ সৃষ্টি হয় দেশ-কালের প্রেক্ষাপটে। কারণ কালের প্রভাব শুধু নাটকে নয় সকল শিল্পেই সংশ্লিষ্ট থাকে। সুতরাং প্রাক্ ১৯৪৭-১৯৭০ সাল পর্যন্ত অখণ্ড ভারতবর্ষে যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল তার সকল প্রভাব সে সময়ে বচিত নাটক তথা সকল শিল্পে অঙ্গীভূত থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে ধ্বংসাত্মক হত্যাযজ্ঞ শুরু হয় সাবা বিশ্বে তাতে মানব মনে সৃষ্টি হয়েছিল হতাশা, শূন্যতা। এবং ক্ষয়ের চিহ্ন লেগেছিল মানবিক মূল্যবোধে। তারই ঘূর্ণিপাকে শুরু হয় এই উপ-মহাদেশেব স্বাধীনতা আন্দোলন। সেই আন্দোলনের সফল ফসল হিসাবে ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ই আগস্ট যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। বাংলাদেশ নামের এই স্বাধীন রাষ্ট্র তখন পাকিস্তানের অধীনে পূর্ব পাকিস্থান নামে পরিচিত ছিল। পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত বাঙালি জাতি বিভিন্ন সময়ে নানা বিষয় নিয়ে তৎকালীন পাকিস্তান সবকারের বিরুদ্ধে বাদ-প্রতিবাদে মুখরিত হয়ে উঠেছিল— তারই বিচিত্র চিত্র উক্ত কালপর্বে বাংলা ভাষায় রচিত নাটকে অনুসন্ধান করাই এ প্রবন্ধের মূল বিষয়। প্রসঙ্গক্রমে ১৯৪৭-১৯৭১সাল পর্যন্ত বাংলা নাটকের শিল্পদর্শন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় বিশ্লেষণ করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

উল্লেখ্য যে, এ সময়ে বাংলা ভাষায় যে সকল নাটক বচিত হয়েছে তাতে তিনটি ধারা প্রত্যক্ষ

করা যায়। প্রথমত পাশ্চাত্য রীতিতে রচিত মৌলিক নাটক, দ্বিতীয়ত অনুবাদ, রূপান্তর ও ভাবান্তর নাটক এবং তৃতীয়ত লোকজরীতির নাটক। এর মধ্যে সর্বাধিক নাটক রচিত হয়েছে পাশ্চাত্য নাটকের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য অনুসরণে। বিদেশি নাটকের অনুবাদ, রূপান্তর, ভাবান্তর এবং লোকজরীতির সৃষ্ট নাটকের সংখ্যা সে অর্থে গৌণ। আবার উল্লিখিত কালপর্বে রচিত সমগ্র বাংলা নাটককে শিল্পগত দিক থেকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন, সামাজিক নাটক এবং রাজনৈতিক বা ঐতিহাসিক নাটক। অ্যাবসার্ড ও রূপক শ্রেণির নাটকও রচিত হয়েছে এ সময়ে।

১৯৪৭-১৯৭০ এই কালপর্বের সূচনায় যে কয়জন নাট্যকারের নাটকে তৎকালীন সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্র দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে শওকত ওসমান রচিত 'তস্কর ও লস্কর', 'কাকরমণি', 'আমলার মামলা', নূরুল মোমেন রচিত 'নেমেসিস', 'রূপান্তর' এবং আসকার ইবনে সাইখ রচিত 'বিরোধ' ও 'পদক্ষেপ' অন্যতম। সামাজিক নাটক রচনার পাশাপাশি এ সময়ে ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত হয় ঐতিহাসিক নাটক। যেমন, মোহাম্মদ ইবনে কাশেমের সিন্ধু বিজয়ের পটভূমিকায় আকবর উদ্দীন রচনা করেন 'সিন্ধু বিজয়' এবং গজনীর অধীশ্বর সুলতান মাহমুদ-এর গৌরব গাথা অবলম্বনে রচনা করেন ঐতিহাসিক নাটক 'সুলতান মাহমুদ'। অনুরূপভাবে নাট্যকার শাহাদাৎ হোসেন ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনার রং মিশিয়ে রচনা করেন 'সরফরাজ খাঁ', 'মসনদের মোহ', 'আনারকলি', 'শা-জাহান-আলমগীর-সংবাদ' এবং 'জাহাঁগীরের আত্মসমর্পণ' নাটক, অন্যদিকে মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিশ্বাসী নাট্যকার ইব্রাহিম খাঁ ও ইব্রাহিম খলিল ইসলামের অপার মহিমা এবং এর অতীত ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বর্ণনা করেছেন 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার পাশা' ও 'স্পেন বিজয়ী মুসা' নাটকে।

পাকিস্তান সরকারের দুঃশাসন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং পূর্ব পাকিস্তানের উপর বিভিন্ন শর্ত আরোপ করায় এ দেশে বসবাসরত সর্বস্তরের জনগণ ক্রমেই প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র অঞ্চলে সে প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হয়। 'রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে''— পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসক কর্তৃক এই ঘোষণা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি জাতি দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানায়। অতঃপর শুরু হয় বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন। আর এই ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আসকার ইবনে শাইখ রচনা করেন 'বিদ্রোহী পদ্মা' নাটকটি। পদ্মাপারের মেহনতি মানুষ এবং জমিদারের দ্বন্দ্ব এ নাটকের উপজীব্য হলেও এতে স্থিত হয়েছে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের কথকতা। তোর 'শরীরটা কাইটা দেখ্ শরীরেও যে রক্ত আমার শরীরেও তাই'।[২] এ নাটকের মুসলমান চরিত্র রহমান অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে যখন উপরোক্ত সংলাপ উচ্চারণ করে তখন আর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতিই ছিল নাট্যকারের প্রত্যাশা। এই সময়ে রচিত আসকার ইবনে শাইখের অন্যান্য নাটকগুলোর মধ্যে আছে 'দুরন্ত ঢেউ', 'দুর্যোগ', 'আওয়াজ' এবং 'যাত্রী'। তাঁর 'দুরন্ত ঢেউ' নাটকে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পরপরই শওকত ওসমান রচনা করেন 'বগদাদের কবি'। বাদশা হারুনর রশীদের রাজত্বকাল এবং তাঁর জীবন চরিতের নানা বৈশিষ্ট্য এ নাটকের কাহিনিতে অন্তর্ভুক্ত। ভাষা আন্দোলনের কথাও এ নাটকে ব্যক্ত হয়েছে। এ পর্যায়ে আকবর উদ্দীন রচনা করেন 'নাদিরশাহ' ওবায়েদ-উল-হক রচনা করেন 'এই পার্কে'। ফরুখ শিয়ার রচনা করেন 'ব্ল্যাক মার্কেট' এবং বাংলাদেশে মগ ও ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের আক্রমণ-অত্যাচারের কাহিনি নিয়ে নাট্যকার ইব্রহিম খলিল রচনা করেন 'ফিরিঙ্গীরাজ'[৩]। এর মধ্যে কিছু কিছু সামাজিক নাটক রচিত হয়। তন্মধ্যে আলী মনসুর রচিত 'পোড়োবাড়ী', 'বোবা মানুষ', ইব্রাহিম খাঁ-র 'ঋণপরিশোধ' আবদুল হক রচনা করেন 'অদ্বিতীয়া', আশরাফ উজ-জামানের 'সয়লাব', জসীমউদ্দীনের 'মধুমালা',

'পল্লীবধূ', 'বদল বাঁশী', 'আসমান সিংহ' এবং ইব্রাহিম খলিলের 'সমাধি' অন্যতম। উল্লেখ্য যে এ সকল নাটকের মধ্যে 'বোবা মানুষ'- এর শুরুতেই দৃষ্ট হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জীবনচিত্র। বাংলা লোকনাট্যের বিষয় ও আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য অনুসরণে রচিত জসীমউদ্দীন ও ইব্রাহিম খলিলের নাটকে আছে গ্রাম বাংলার প্রেম-বিরহ। এ ক্ষেত্রে জসীমউদ্দীন রচিত 'আসমান সিংহ' নাটকের কিছু সংলাপ উদ্ধৃত হতে পারে—

কেলের মা : এই দেশেতে আছে এক রসিক নাগর
গুণে গুণবান অতি প্রেমের নাগর।
রূপেতে কার্ত্তিক তুল্য শ্রীখণ্ড কপাল
বসেতে রসিক সে যেমন গোপীর গোপাল।
....
প্রেম যদি কর ধনি তাহাব সঙ্গেতে
দিবসের মধ্যে আমি পারি এনে দিতে।

দুর্গা : শোন শোন চন্দ্রকলা এ কথা কেমন
আমি হই হিন্দু নাবী সে হয় যবন।
হিন্দু যবনে যদি প্রেম কবা যায়
বল দেখি জাতিকুল কিসে রক্ষা পায়।

বুড়ি : শোন শোন রামদুর্গা শোন রসবতী
প্রেম করিবারে কারো নাহি যায় জাতি।
জাতি বর্ণ ভেদাভেদ এ কার্যেতে নাই
যে যার নয়নে লাগে তার ভাল সেই।
বাজারের চিড়াগুড় নানান জাতে খায়
বল দেখি কবে কার জাতি মারা যায়?
উপপতি প্রাণনাথ থাকে গোপনেতে
অন্যে কি তাহার কিছু পারিবে জানিতে?

দুর্গা · গুঞ্জরে ভোমরা লো সই
মনেব দুঃখের কথা কার কাছে কই
ছয়মাস ফিরে গেছে প্রাণনাথ
একলা ঘরে কেমনে রই।

বুড়ি · কেন্দ না কেন্দ না নাতীন
একটি কথা কই
আমার কাছে বসিক নাগর
তোর কথা তারে কই।[৪]

১৯৫৮ সালে আসকার ইবনে শাইখ বচিত 'অগ্নিগিরি' নাটকটি প্রকাশিত হয়। নাট্যকার তাঁর এ নাটকে পূর্ববাংলার অত্যাচারিত কৃষক সমাজ ফকিব মজনু শাহের নেতৃত্বে দেবী সিংহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখাতে প্রয়াসী হয়েছেন। ব্রিটিশদের শোষণ প্রক্রিয়া, বাংলার গণঅভ্যুত্থান এবং কোম্পানি প্রতিনিধিদের বর্বরোচিত নৃশংস অত্যাচারের চিত্র ইতিহাসের ধারাবাহিকতা তুলে ধরে পূর্ববাংলার মানুষকে মুক্তিসংগ্রামের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছেন নাট্যকার তাঁব 'অগ্নিগিবি' নাটকে।

মজনু : প্রয়োজনে জালেমকে মেরে মরতে হবে। ....তোমাদের ইজ্জত, মাধো, ইজ্জত বাঁচাতে আজ তোমরা বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও। ....এ দেশ আমার এ দেশ তোমার । তোমার আমাব পূর্ণ অধিকাব এ দেশের মাটিতে। সে অধিকার হারিয়ে আমরা আজ মরতে বসেছি। মরবার আগে তাই চেষ্টা করে দেখি দেবীর উদ্ধত শির মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারি কিনা।[৫]

অন্যদিকে মজনু অন্তিম মুহূর্তে যে সংলাপ উচ্চারণ করেন তাতে প্রত্যক্ষ করা যায় মুক্তি সংগ্রামের আগাম বার্তা—

মজনু : পরাস্ত আমরা কোনদিন হব না। গড় থেকে অন্য গড়ে গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে উঠবে আমাদের.... প্রতিরোধ ব্যবস্থা। জন্মভূমিকে আমরা বিদেশির কবল থেকে মুক্ত করব; এই আমাদেব পণ।...

রুদ্ধ আক্রোশ ওদের উপর ছড়িয়ে পড়বে। ওরা এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে। এ দেশ আমার মুক্ত হবে। সেদিন বেশি দুরে নয়, আজ না হোক, কাল সেই স্বর্ণপ্রভাতে আমার দেশ আবার হেসে উঠবে।[৬]

অতঃপর তিনি 'অনুবর্তন' ও 'বিল বাওড়ের ঢেউ' নামে দুটি সামাজিক নাটক রচনা করেন। পাঁচ অঙ্কে রচিত 'অনুবর্তন' নাটকে 'দবিদ্র কেরাণী আজমতের সংসার জামাল-নাহাব এবং রীনা-শাহরিয়ার হৃদয় ঘটিত সম্পর্কের' কথা বর্ণিত হয়েছে। তিন অঙ্কে মোট ছ'টি দৃশ্যে বচিত 'বিল বাওড়ের ঢেউ' নাটকে শ্রমজীবী জেলে সম্প্রদায়ের দুঃখ-কষ্ট থেকে উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান করাব চেষ্টা প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁর 'রক্তপদ্ম' নাটকের কাহিনি গড়ে উঠেছে মূলত ১৯৫৭ সালে কানপুরে বেনিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে এ দেশীয় সিপাহিদের বিদ্রোহে।[৭] সেদিন সেই সিপাহি বিদ্রোহের অন্তরালে ছিল মুক্তিসংগ্রামের বীজ।

রফিক ও রহমান চরিত্রের সংলাপে বিষয়টি আরো স্পষ্ট—

রহমান :আমার ক্ষেতের ধান উঠবে জমিদারের গোলায়। আমরা উপাস করব, ভাঙ্গা ঘরে আমার মেয়ে ঔষধ না পাইয়া, আর জমিদার দালানে বইসা আমার ধান দুই হাতে উড়াইব।

রফিক · উড়াতে আর দেব না , তার এ স্বেচ্ছাচাবের বিরুদ্ধে বুক উঁচু করে দাঁড়াবে দেশের লাঞ্ছিত হিন্দু মুসলমান। কিন্তু তা মুহূর্তের আবেগে নয়, দৃঢবিশ্বাস নিয়ে সবল হ'য়ে সাবধান হয়ে।[৮]

এছাড়াও আসকার ইবনে শাইখ রচনা করেন 'এপার ওপার' এবং 'অনেক তারার হাতছানি'। 'অনেক তারার হাতছানি' নাটকে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ ১৯৬২ সালের গণতান্ত্রিক আন্দোলন, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন এবং সর্বোপরি পাকিস্তানি শাসক কর্তৃক পূর্ববাংলার মানুষের প্রতি যে অন্যায় অত্যাচর অবিচার, নিপীড়ন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন এ দেশের যুব সম্প্রদায় তথা সকল শ্রেণির মানুষকে। এতদ্ব্যতীত এ সময়ে রচিত অন্যান্য নাটকের কাহিনিতে বাজনৈতিক পটপরিবর্তনের নানাঘটনা প্রত্যক্ষভাবে চিত্রায়িত না হলেও তাতে আছে সমসাময়িক কালের সামাজিক ঘটনা প্রবাহ,। এ ধরনের নাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে সৈয়দ মকসুদ

আলী রচিত 'ইউরেকা', আলাউদ্দীন আল-আজাদ রচিত 'মরক্কোর জাদুকর', 'ইহুদীর মেয়ে', 'মায়াবী প্রহর', 'ধন্যবাদ'; আসীমউদ্দিন রচিত 'মা', 'অহঙ্কার', 'কাঞ্চন'; নুরুল মোমেন রচিত 'যদি এমন হতো', 'আলোছায়া', 'নয়া খানদান', 'আইনের অন্তরালে'; রাজিয়া খান রচিত 'আবর্ত' এবং লায়লা সামাদ রচিত 'বিচিত্রা'। এ সময়ের অন্যতম নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচনা করেন 'বহিপীর', 'তরঙ্গভঙ্গ', 'সুড়ঙ্গ' এবং 'উজানে মৃত্যু' নাটক। দুই অঙ্কে মোট ছটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর 'বহিপীর' নাটকে সামাজিক দ্বন্দ্ব এবং মানুষের বহির্জগত ও অন্তর্জগতের গভীর সংস্পর্শ নির্ণয় করেছেন। গ্রামীণ সমাজের পটভূমিকায় রচিত হলেও এ নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্র স্বীয় আত্মিক পরিচয়ে উদ্ভাসিত। তাঁর 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটক পাশ্চাত্য শিল্পদর্শনের রূপরীতির আশ্রয়ে রচিত। মতলুব আলী, আব্দুস সাত্তার, জজ উকিল, যুবক, ভিখারিনি, কাবিশপির প্রমুখ চরিত্রের উচ্চারণে সমকালীন চিত্র প্রকাশ পেয়েছে রূপক ও প্রতীকী ব্যঞ্জনায়।

: জজ সাহেব,সর্বনাশ হয়ে গেছে! যাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, সে আর বেঁচে নেই। ....রক্তপাগল জনতার আর্তনাদ শুনেছেন? আমেনাকে খুন করেও তাদের তৃপ্তি হয় নাই।

কিংবা—

: জজ সাহেব, আমাদের মতভেদের কারণ যখন দূর হয়েছে তখন আমাদের মনমিলনের পথে আর বাধা কি? আসুন মিলজুক করে ফেলি। আমার বন্ধুত্বের প্রমাণ যদি চান তবে এই দেখুন। ....আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্রটি পাঠানো আমি বন্ধ করেছি। আপনার প্রতি বন্ধুত্ব না থাকলে, আপনার মঙ্গল কামনা না করলে বাধা দিতাম কী?[৯]

ছোটোদের জন্য লেখা তাঁর 'সুড়ঙ্গ' নাটকও রূপকের ভাবধারায় সৃষ্ট। রাবেয়ার বিবাহ ও অসুস্থতা, ডাক্তার-কবিরাজের আবির্ভাব এবং গুপ্তধন অনুসন্ধান ইত্যাদি অবতারণাপূর্বক এক রহস্যময় জীবনবোধের পরিচয় উদ্ভাসিত হয়েছে তার এই 'সুড়ঙ্গ' নাটকে। তাঁর 'উজানে মৃত্যু' নাটকটি এক মহৎ শিল্পসৃষ্টিরূপে বিবেচ্য। কারণ এ নাটকের তিনটি চরিত্রেই আছে গভীর জীবনবোধের অন্বেষণ। নৌকা বাহক, সাদা ও কালো পোশাকধারী চরিত্রগুলি মূলত প্রতীকরূপে প্রকাশ পেয়েছে। কালোপোশাকধারী 'ষড়যন্ত্রকারী অসত্যের প্রতীক' সত্যানুসন্ধানী শুদ্ধতার প্রতীক সাদা পোশাকধারী। জীবনসংগ্রামে ক্লান্ত-শ্রান্ত পরাজিত মৃত্যু প্রত্যাশী নৌকা-বাহকরা জীবনের অর্থ বোঝাতে চায়, দেখাতে চায় প্রকৃতির সৌন্দর্য।[১০]

সাতচল্লিশ- উত্তর এবং স্বাধীনতার পূর্বকালে বাংলা ভাষার অন্যতম নাট্যকার মুনীর চৌধুরী। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে আছে 'রক্তাক্ত প্রান্তর', 'চিঠি', 'মর্মান্তিক', 'দণ্ড', 'দণ্ডধর', 'দণ্ডকারণ্য', 'কবর', 'মানুষ' এবং 'নষ্টছেলে'। তাঁর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' এবং 'কবর' নাটকটি বহুল আলোচিত ও শিল্পসম্মত রচনা। ১৬৬১ সালে সংঘটিত পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত হয় তাঁর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকটি। অন্যদিকে 'কবর' নাটকের প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছে বায়ান্নর বাংলাভাষা আন্দোলনকে আবর্তিত করে। তাঁর রচিত 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকের প্রাণধর্মে আছে ইতিহাস-আশ্রিত ট্র্যাজিক চেতনা। এ নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র জোহরার হৃদয় যন্ত্রণা পাঠক ও দর্শকের কোমল হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে।[১১]

জোহরা : তুমি কেন সাড়া দিলে না? কেন জেগে উঠলে না? কেন ঘুমিয়ে পড়লে? আমি

এত কষ্টের আগুনে পুড়ে মনের বিষে জরজর হয়ে এত রক্তের তপ্তস্রোত সাঁতরে পার হয়ে তোমাকে পাবার জন্যে ছুটে এলাম— আর তুমি কিনা ঘুমিয়ে পড়লে। ঘুমের কোন্ অতলতলে ডুবে রইলে যে আমি এত চিৎকার করে ডাকলাম তবু তুমি একবারও শুনতে পেলে না। আহা! ঘুমোও। আমি তোমাকে জাগাবো না। তোমার মুখ দেখে আমি বুঝেছি অনেকদিন তুমি ঘুমোওনি। চোখের দুপাতা মুদে মনের আগুনের লকলকে শিখাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও আড়ালে ঠেলে দিতে পারোনি। কষ্ট, ঘুমের বড় কষ্টে ভুগেছো তুমি। ঘুমোও। আরো ঘুমোও। প্রাণ ভরে ঘুমোও।[১১]

নাটকের সমগ্র কাহিনির অন্তে যে বাণী প্রতিধ্বনিত হয় তা যুদ্ধের ধ্বংসলীলাকে স্বাগত জানায় না বরং মানুষকে সুন্দর এক স্বপ্নলোকের পৃথিবী অন্বেষণে প্রয়াসী হতে সাহায্য করে।

সুজা : আল্লাহ যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। বাদশার যিনি বাদশা খোদ তিনি মুক্তির ফরমান জারি করেছেন। দুনিয়ার এক সামান্য বাদশার ফরমানের চেয়ে তার দাম অনেক বেশি। যিনি প্রকৃত বীর ও মহান তিনি দুয়ের মধ্যে মেকিটা ঠেলে ফেলে দিয়ে সাচ্চাটা কুড়িয়ে নিয়েছেন। ছোট মুক্তিটাকে অবহেলা করে বড় মুক্তিটাকে আলিঙ্গন করেছেন। খোদা তাঁকে শান্তিতে রাখুন।[১২]

কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' কাব্য থেকে এ নাটকের উপাদান গৃহীত হলেও চরিত্র সৃজনে, দ্বন্দ্ব সংঘাতে, রচনা-কৌশলে, ভাষার সৌন্দর্যে নাট্যকার আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিষয় উপস্থাপন করেছেন স্বীয় বৈশিষ্ট্যে। 'Bury the Dead' নাটকের কাহিনিগত প্রভাব তাঁর 'কবর' নাটকে বিদ্যমান থাকলেও এতে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যসহ অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা পেয়েছে নাট্যকারের সৃজনশীল রচনা-কৌশলে। এ নাটকের কৌতুকপূর্ণ সংলাপের অন্তরালে আছে জীবন ও জগতের রহস্য। বিষয় বৈচিত্র্য ও উপস্থাপনার গুণে মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকটি বাংলা নাট্য সাহিত্যের এক মহৎ সৃষ্টি।

নেতা : আমার মাত্রা আমি জানি। পুঁতে ফেল। দশ-পনেরো বিশ-পঁচিশ হাত নীচে পারো। একেবারে পাতাল পর্যন্ত খুঁড়তে বলে দাও। পাথর মাটি দিয়ে ভরাট করে গেঁথে ফেল। কোনদিন যেন আর ওপরে উঠতে না পারে। কেউ যেন টেনে ওপরে তুলতে না পারে। যেন মিছিল করতে না পারে, শ্লোগান তুলতে না পারে, যেন চ্যাঁচাতে ভুলে যায়।[১৩]

১৯৪৬ সালে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উপর ভিত্তি করে রচিত হয় তাঁর 'মানুষ' নাটকটি। এ নাটকে তিনি মানুষকে মানুষরূপে দেখার প্রয়াসী হয়েছেন। 'নষ্টছেলে' নাটকে আছে ভাষা আন্দোলনের প্রতিবাদী কণ্ঠ এবং ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষ কবলিত জনজীবনের অসহায় চিত্র।

সাম্প্রদায়িক হানাহানির কালে উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও নিরীক্ষাধর্মী কাব্যনাটক রচিত হয়েছে। যেমন ফররুখ আহমদ-এর 'নৌফল ও হাতেম'। এ নাটকের মূলে আছে 'ব্যক্তির খ্যাতির লিপ্সা বনাম মানসিকতার দ্বন্দ্ব'।[১৩] আলী মনসুর গ্রামীণ সমাজের প্রেক্ষাপটে রচনা করেন 'দুর্নিবার' ও 'শেষ রাতের তারা' নাটক দুটি। আকবর উদ্দিন রচিত 'মুজাহিদ' নাটকে আছে ইংরেজ কোম্পানির বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির প্রতিবাদ।

তোরাব : ....মনে রেখো, আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত রাখার জন্য আমাদের অধিকার রক্ষার জন্য আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমরা লড়াই করছি। তাতে জান যায় সেও ভাল[১৬]....

আনিস চৌধুরীর 'মানচিত্র' এবং 'অ্যালবাম' নাটকে দৃষ্ট হয় নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির সুখ-দুঃখের কথকতা। আবদুল হকের 'ফেরদৌসী' নাটকে আছে মহাকবি ফেরদৌসের জীবন-চিত্র। আ.ন.ম. বজলুর রশীদ সমাজ জীবনের চলমান ঘটনার আবর্তনে রচনা করেন 'উত্তর ফাল্গুনী' ও 'সংযুক্তা'। লোককাহিনী অবলম্বনে তিনি রচনা করেন 'ধনুয়াগড়ের তীরে', 'কোন এক দীপক সন্ধ্যায়' এবং 'মেহের তোমার নাম' নাটক তিনটি। এ সময়ের অন্যতম নাট্যকাব সিকান্দার আবু জাফর বচনা করেন 'সিরাজ-উদ-দ্দৌলা', 'মহাকবি আলাউল', 'মাকড়সা' এবং 'শকুন্ত উপাখ্যান'। ইংরেজদের বিরুদ্ধে দৃঢ়কণ্ঠ বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলাব শাসনামলের ঘটনাপ্রবাহ তাঁর 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের মূল উপজীব্য। এ ক্ষেত্রে নবাবের কণ্ঠে উচ্চরিত একটি সংলাপ—

নবাব : বাংলার নবাবকে ভয় দেখাচ্ছেন সিপাহসালার? দরবারে বসে নবাবেব সঙ্গে কিরকম আচরণ বিধেয় তাও আপনার স্মরণ নেই? এই মুহূর্তে আপনাকে বরখাস্ত করে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব আমি নিজে গ্রহণ করতে পারি। আপনি, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ, সবাইকে কয়েদখানায় আটক রাখতে পারি। হ্যাঁ কোন দুর্বলতা নয়। শত্রুর কবল থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে আমাকে তাই করতে হবে। মোহনলাল।[১৭]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, নবাব সিরাজউদ্দৌল্লাব জীবন কাহিনি নিয়ে নাট্যকার সাঈদ আহমদ রচনা করেন 'শেষ নবাব'। নাট্যকার আবু জাফর মহাকবি আলাওলের নানা ঘটনার সঙ্গে কল্পনার রং মিশিয়ে রচনা করেন 'মহাকবি আলাওল' নাটকটি। তিনি 'মাকড়সা' নাটকের মাধ্যমে শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির বারংবাব বিদ্রোহের ব্যর্থ প্রয়াসকে আশার বাণী শুনিয়েছেন। সমাজ পবিবর্তনের দৃঢ় প্রত্যয়বাণী উচ্চারিত হয় তাঁর 'শকুন্ত উপাখ্যান' নাটকে।

সাঈদ আহমদ-এর 'কালবেলা' সমসাময়িক কালের বাংলা নাটকে ব্যতিক্রমী সংযোজন। কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে মানব মনের শূন্যতা হতাশা অস্থিরতা এবং অসহায় বোধ থেকে পাশ্চাত্য অ্যাবসার্ডধর্মী যে নাটকের যাত্রা শুরু হয়েছিল তারই আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য অনুসরণে রচিত সাঈদ আহমদ-এর 'কালবেলা'। এ নাটকের কাহিনি নির্মাণের নেপথ্যে আছে চট্টগ্রামেব ছোট্ট একটি দ্বীপে ঘটে যাওয়া 'ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের' ভয়াবহ চিত্র।[১৮] বিষয় বৈচিত্র্য বচনা-কৌশল এবং সংলাপ সৃজনে সাঈদ আহমদের 'কালবেলা' নাটকটি বাংলা নাটকের শিল্পচিন্তায় নব্যধাবার সার্থক রূপাযণ। এ ক্ষেত্রে মোড়ল ও উপেং চরিত্রের সংলাপ উদ্ধৃত হল—

মোড়ল : আমার অতীতের কথা শুনতে চাই না আমি! অনেক আগেই তার আমি গোব দিয়েছি। তা দিয়ে কারও কোন লাভ নেই। তার চেয়ে বরং শুনবো গৌরবদীপ্ত বর্তমানের আশাভরা ভবিষ্যতের কথা।

উপেং : অতীত, বর্তমান ভবিষ্যৎ। শুধু বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা। এগুলো পৃথক করা চলে না। অতীতে যা শুনেছো তা বর্তমানে, বর্তমানে যখন আছো মন ছুটে চলেছে ভবিষ্যতে। আর বিবেক ঘড়ির দোলকের মত ভূত আব ভবিষ্যতের মধ্যে দুলে চলেছে।

বর্তমানকে সঁপে দেওয়া নিয়তির হাতে। (বিরতি) বর্তমান। (বিরতি) অসাড়, অনড়, একটি মুহূর্তে শুধু।[১৯]

সাঈদ আহমদ-এর 'মাইলপোস্ট' নাটকটি পাশ্চাত্যেব শিল্পদর্শন এবং বাংলা লোকনাট্যেব বিষয় ও আঙ্গিকনির্ভর রচনা। তিনি এ নাটকের মাধ্যমে এ দেশের অনাহারী অসহায় অত্যাচারিত দুর্ভিক্ষ কবলিত ক্ষুধাব যন্ত্রণায় আত্মদগ্ধ শ্রমজীবীর করুণ চিহ্ন প্রত্যক্ষ করেছেন আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে। 'শিয়াল ও কুমীবছানা' নামের রূপকথাকে নাট্যকার সাঈদ আহমদ রূপক অর্থে 'তৃষ্ণায়' নাটক রচনা কবেন। বাংলা লোকনাট্যের সার্থক প্রয়োগ তাঁর 'তৃষ্ণায়' নাটকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

ষাটের দশকেব অন্তিম লগ্নে যে সকল নাটক বচনা ও মঞ্চায়নের সন্ধান পাওযা যায তন্মধ্যে 'ক্রীতদাসের হাসি' অন্যতম। উল্লেখ্য যে, শওকত ওসমানের উপন্যাস 'ক্রীতদাসের হাসি' অবলম্বনে রচিত এর নাট্যরূপ মঞ্চায়ন হয়। সে সময় মঞ্চনাটক হিসাবে 'ক্রীতদাসেব হাসি' ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এ নাটকেব সমগ্র বিষয স্পষ্ট হয়ে উঠে মৃত্যু-পথযাত্রী গোলাম তাতারীর সংলাপে—

: 'শোন হারুনর রুশীদ দীবহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা চলে বাদী কেনা সম্ভব। কিন্তু ক্রীতদাসেব হাসি কেনা যায় না।'[২০]

অতঃপব ১৯৬৮-১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলা ভাষায় যে সকল নাটক এ দেশে বচিত হয়েছিল তন্মধ্যে উল্লেখ্য ওবায়েদ-উল-হক 'রুগ্ন পৃথিবী', আসকাব ইবনে শাইখ 'লালন ফকির', 'প্রচ্ছদপট', 'শতকবা আশি', 'যেমন ইচ্ছা তেমন', আ.ন.ম. বজলুব বশীদ 'একে একে এক', 'ধান কমল', মুনীব চৌধুবী 'পলাশী ব্যাবাক', 'ফিট কলম', 'আপনি কে', 'মিলিটারী' এবং জিয়া হায়দার রচিত 'শুভ্রা সুন্দব কল্যাণী আনন্দ'। স্মর্তবা যে এ ধবনের নাটকে নাট্যকার সর্বদা সমাজ ও দেশকালের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে তুলে ধরার চেষ্টা কবেছেন কৌতুকপূর্ণ উপভোগ্য সংলাপে।

উপরোক্ত আলোচনার সূত্র ধরে এ কথা বলা যায যে ১৯৪৭-১৯৭১ এই কালপর্বে বর্তমান বাংলাদেশ নামের ভূখণ্ডে যে সকল নাটক রচিত হয়েছে তাব অধিকাংশ নাটকেই আছে তৎকালীন সামাজিক ও বাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতিব কথকতা। ইতিহাসের দিকে তাকালেই দেখা যায় এই সময়ে বাঙালি জাতি বাংলার মুক্তিসংগ্রাম তথা ১৯৫২ সালেব ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের ষড়যন্ত্র, পাকিস্তানেব সামরিক আইন, '৬২-ব ছাত্র আন্দোলন, '৬৪-র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, '৬৯-র গণ অভ্যুত্থান এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছে। বাঙালি জাতির এই সংগ্রামমুখব জীবনপ্রবাহ উক্ত কালপর্বে বচিত নাটকে বিদ্যমান। নাটকীয কলাকৌশল বিশ্লেষণ করলে লক্ষ কবা যায এ সময়েব নাটক পাশ্চাত্য শিল্পরীতির অনুসবণে রচিত। অবশ্য বিষয়গত দিক থেকে প্রাচ্যের ঐতিহ্যকে গ্রহণও করেছেন কযেকজন নাট্যকার। তাঁদের মধ্যে জসীমউদ্দীন, ইব্রাহিম খাঁ, অ.ন.ব. বর্জলুর এবং সাঈদ আহ্মদ-এব নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা পাটক রচনার বিষয় হিসাবে লোকনাট্যের কাহিনিকে গ্রহণ কবলেও রচনা কৌশলে সবসময় পাশ্চাত্যের নাট্যরীতিকেই অনুসরণ করেছেন। ফলে বাংলা নাটকে নিজস্ব নাট্য আঙ্গিক নির্মাণেব যে সমূহ সম্ভাবনা ছিল তাও হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। তবুও বলা যায উল্লেখিত কালপর্বেব বচিত নাটকই পরবর্তী কালেব নাটক ও নাট্যচর্চাকে স্বীয় নন্দনতাত্ত্বিক শিল্পচিন্তাব পথ প্রসারিত করেছে সন্দেহ নেই।

টীকা

১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ডঃ মোহাম্মদ হান্নান, এ হাকিম এন্ড সন্স, কলিকাতা, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ ৭০।
২. আসকার ইবনে শাইখ, 'বিদ্রোহী পদ্মা'।
৩. বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, সুকুমার বিশ্বাস, বাংলা একাডেমী ঢাকা, মাঘ ১৩৯৪ ফেব্রয়ারি ১৯৮৮, পৃ ১৭১।
৪. জসীমউদ্দীন, 'আসমান সিংহ'।
৫. আসকার ইবনে শাইখের 'অগ্নিগিরি' নাটকের সংলাপ। কিন্তু উদ্ধৃতিটি গ্রহণ করা হয়েছে 'বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা' গ্রন্থ থেকে। প্রাগুক্ত, পৃ ২৬০।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২৬০।
৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২৬৩।
৮. আসকার ইবনে শাইখ, 'রক্তপদ্ম'।
৯. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, 'তরঙ্গভঙ্গ'।
১০. বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮৩।
১১. আনিসুজ্জামান সম্পাদিত মুনীর চৌধুরী রচনাবলী (১ম খণ্ড) গ্রন্থের 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯ জুন ১৯৮২, পৃ ১২৪।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ ১২৪।
১৩. বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯২।
১৪. মুনীর চৌধুরীর রচনাবলীর 'কবর' নাটক, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫।
১৫ বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৬।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৮।
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৭।
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ ৩১১।
১৯. সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক (কালবেলা), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, আষাঢ় ১৩৮৩, জুলাই ১৯৭৬, পৃ ১৫।
২০. বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮৩।

বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের নাট্য সাহিত্যের ধারা (১৯৭১-৯৫)

বিশ্বজিৎ ঘোষ

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সাহিত্যের যে শাখাটি সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ ও বিকশিত হয়েছে, নিঃসন্দেহে তা নাটক। স্বাধীনতাচেতনাকে মর্মমূলে লালন করে আমাদের সাহিত্যের ধারায় নাটক ইতিমধ্যেই নির্মাণ করেছে গৌরবোজ্জ্বল এই ইতিহাস। বস্তুত, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাচেতনা এবং মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্য অভিন্ন সত্তায় গ্রথিত। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতিসত্তাকে নতুন চিন্তায় করেছে পুনর্জাত, শিল্প-সংস্কৃতির অন্যান্য শাখার মতো নাটকেও ঘটেছে এর উজ্জ্বল প্রতিফলন। স্বাধীনতার রক্তধারায় স্নাত হয়ে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশের নাটক এখন এক সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চল। বিগত পঁচিশ বছরে (১৯৭১-১৯৯৫) বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের এই উজ্জ্বল বিকাশ, তার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, রূপ ও রূপান্তর অঙ্কনই আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের অন্বিষ্ট বিষয়।

২. বাংলাদেশের নাটক : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার

গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফ-এর (১৭৪৯-১৮১৭) 'কাল্পনিক সংবদল'-এর (১৭৯৫) পর বাংলা নাটক অতিক্রম করেছে ঠিক দুশো বছর। এই দুশো বছরের নাট্যসাহিত্য থেকে আমরা মাত্র পঁচিশ বছরের সৃষ্টিকে সন্ধান করব বর্তমান প্রবন্ধে। কিন্তু বলাই বাহুল্য, আমাদের আলোচ্য পঁচিশ বছরের নাট্যসাহিত্য বাংলা নাটকের শতাব্দী-বহমান ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; তবে যা সত্য, তা এই— অতীতের শরীরে ও সত্তায় আলোচ্য পঁচিশ বছর ছড়িয়ে দিয়েছে নতুন স্বাদ আর সৌরভ আর স্বাতন্ত্র্য। বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের নাট্যসাহিত্যের ধারা নির্মাণের পূর্বে, একবার অতি সংক্ষেপে তাই আমরা ঘুরে আসতে চাই বাংলা নাট্যসাহিত্যের ঐতিহ্যার্ণব থেকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাদ দিলে, এ কথা বলা অসঙ্গত হবে না, বিষয়ভাবনা ও প্রকরণ-প্রকৌশলে, প্রথমার্ধ— বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা নাটকে নেই প্রাগ্রসরতা কিংবা শতাব্দী ভেদ— বলতে গেলে সবই উনিশ শতকী, প্রথাশ্রয়ী, সনাতনপন্থী এবং একমুখী। কাব্য-উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের অগ্রগতির সমান্তরাল হলেও বাংলা নাটক কখনোই ছিল না ওই গৌরব-প্রত্যাশী। 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫১) থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তি পর্যন্ত কালখণ্ডে, গভীরতর পরীক্ষণে বলতেই হয়, বাংলা নাটক বিকশিত হয়েছে চারটি প্রবণতাকে আশ্রয় করে— ১. জাতীয়তাবাদ (কখনো আবার তা সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়-চেতনাশ্রয়ী) উন্মেষের জন্যে ইতিহাস-ঐতিহ্য-পুরাণ মন্থন করে রচিত নাটক; ২. সামাজিক-পারিবারিক অসঙ্গতি থেকে মুক্তির অভিলাষে রচিত হাস্যরসাত্মক প্রহসন; ৩. বাস্তব-অবাস্তব কাহিনি-আশ্রয়ী সামাজিক নাটক; এবং ৪. গণনাট্য সঙ্ঘ-এর পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত-মঞ্চায়িত সংগ্রামশীল জীবনাশ্রয়ী সমাজবাদী বক্তব্য-ঋদ্ধ নাট্যধারা। পুনরুক্তি হলেও, আবারও বলতে হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছেন একজন, প্রাচীন বটবৃক্ষের মতো বিস্তৃত সৃষ্টিছায়াপ্রসারী একজন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। বিষয় ও প্রকরণে, চিন্তায় ও পরিচর্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক নাট্যকার।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) হাতে সৃষ্ট ইতিহাস-নির্ভর নাটকীয় ফর্ম এবং সামাজিক অসংগতি শোধনার্থে প্রাহসনিক রূপকল্প শতাব্দীব্যাপী অবলীলায় অনুসৃত হয়েছে। এ দ্বৈত-স্রোতের সঙ্গে তৃতীয় মাত্রা, সমাজ ও মৃত্তিকা-সংলগ্নতা বাংলা নাটকে সঞ্চারিত করলেন দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)। বিষয়বস্তুতে যেমন, তেমনি প্রকরণ-পরিচর্যা এবং গঠনশৈলীতে

বাংলা নাটকে দীর্ঘদিন এই ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল প্রবহমান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫) কি গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৭৭-১৯১২), একজন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) কি একজন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৪-১৯৩৭), কনটেন্ট ও ফর্মে, প্রতিভা সত্ত্বেও প্রয়াসী ছিলেন না নতুন মাত্রা সংযোজনে। অনস্বীকার্য যে, সময় ও সমাজ তাদের অনুকূলে ছিল না। কিন্তু তাঁদের উত্তরসূরিরাও বিচরণ করতে চাইলেন গতানুগতিক ওই সহজ আবর্তে। ফলে, জাতীয়তাবাদ বিকাশের নামে, আমাদের নাট্যকাররা অধিক মাত্রায় ব্যস্ত থাকলেন হিন্দু অথবা মুসলিম সম্প্রদায়চেতনা বিকাশে, কিংবা মাইকেল-দীনবন্ধু-সৃষ্টধারায় প্রহসন নির্মাণে। বাংলাদেশের প্রাথমিক যুগের নাট্যকাররাও ছিলেন না এর ব্যতিক্রম। তাঁদের হাতেও, সাফল্য-ব্যর্থতা মিলে, উপযুক্ত চতুর্ধারায় রচিত হল অনেক নাটক। বিশ্ব-নবনাট্যাঙ্গন সম্পর্কে তাঁরা সচেতন হলেন না, থাকতে চাইলেন উনিশ শতকী আবহে, বিষয় ও প্রকরণে তাঁরা পূর্বসূরিকেই আঁকড়ে থাকলেন পরম নির্ভরতায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের নতুন জীবনভাবনা ও শিল্পবোধে জাগ্রত বাংলাদেশের কয়েকজন নাট্যকার, সমকালীন ভারতীয়-বঙ্গের ব্যতিক্রম-সৃষ্টিকারী আধুনিক নাট্যকারের মতোই, বাংলা নাটকে বিষয়ভাবনা ও নির্মাণকলায় আনলেন পাশ্চাত্যের নব-নাট্যাঙ্গনের কিছু মৌল-প্রবণতা। আমাদের দৃষ্টিতে, প্রাক-মুক্তিযুদ্ধ কালখণ্ডে, বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে যাঁরা নতুন প্রাণধর্ম ও রূপশৈলী নির্মাণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন— নুরুল মোমেন (১৯০৮-১৯৯০), সিকানদার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) এবং সাঈদ আহমদ (১৯৩১-)। মেধাবী, আন্তর্জাতিক-মনস্ক, শিক্ষিত এবং পরিস্রুত জীবনভাবনায় বিশ্বাসী এই পাঁচজন নাট্যকার সচেতনভাবে পাশ্চাত্য নাটকের আধুনিক কলা-প্রকৌশল বাংলা নাটকে সংযোজন করেছেন শিল্পিত স্বরগ্রামে।

বিষয়বস্তু, জীবনদৃষ্টি, গঠনশৈলী এবং উপস্থাপনা-রীতির পরীক্ষায়, সাফল্য এবং সিদ্ধিতে, নুরুল মোমেনের অবদান বাংলা নাটকের ধারায় বিশিষ্ট ও ব্যতিক্রমধর্মচিহ্নিত। মাত্র একটি নাটক তাঁকে এনে দিয়েছে প্রাতিস্বিক সৃষ্টি-ক্ষম-প্রজ্ঞার অভিধা, বাংলা নাটকের প্রথাস্থবির ধারায় মাত্র একটি নাটক নিয়ে এসেছে আধুনিক পাশ্চাত্য নাটকের স্বাদ-সৌরভ-সাধর্ম্য। আমরা নুরুল মোমেনের 'নেমেসিস' (১৯৪৮) নাটকের কথা বলছি। বিষয়াংশ ও গঠনশৈলীর স্বাতন্ত্র্যে 'নেমেসিস' বাংলা নাটকের ধারায় স্বয়ংস্বতন্ত্র, অদ্বিতীয় এবং অনতিক্রান্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ এবং চোরাকারবারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, 'নেমেসিস' একাঙ্কিকার অবয়ব। সুরজিত নন্দী নামের এক স্কুল শিক্ষক ক্রিস্টোফার মার্লোর (১৫৬৪-১৫৯৩) ফস্টাসের মতো, বিবেক বিসর্জন দিয়ে কীভাবে অর্থের পাহাড় গড়ে তুলেছে, এবং অবশেষে রক্তাক্ত পথযাত্রা-সমাপ্তিতে আত্মহননে মুক্তির সন্ধান পেয়েছে— তারই শৈল্পিক শব্দপ্রতিমা 'নেমেসিস'। অস্তিত্বসন্ধানী এবং চেতনতল-উদ্ভাসী এই নাটক বাংলা নাটকের সংগঠন-বিন্যাসে সংযোজন করেছে নতুন মাত্রা, সৃষ্টি করেছে সুদূরসঞ্চারী প্রভাব। কেবল বিষয়ভাবনার বিশ্বজনীনতায় নয়, নতুন সংগঠন প্রকৌশলের স্বাতন্ত্র্যেও 'নেমেসিস' বিশ্বনাট্যাঙ্গনের এক উজ্জ্বল নির্মাণ, বাংলাদেশের নাটকের অবিস্মরণীয় অহংকার। 'নেমেসিস' ছাড়াও নুরুল মোমেন আরো কিছু নাটক লিখেছেন, কিন্তু তাঁর অন্য কোনো সৃষ্টিকর্মই 'নেমেসিস'-এর উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যকে অঙ্গীকার করতে পারেনি।

বিষয়ভাবনা ও আঙ্গিক-নিরীক্ষায় বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের ধারায় যাঁরা নতুন তরঙ্গ নির্মাণ করেছেন, সিকান্দার আবু জাফর তাঁদের অন্যতম। সিকান্দার আবু জাফর সংরক্ত সমকালস্পর্শী সাহিত্যিক, কিন্তু ষাটের দশকের অবরুদ্ধ সময়ের পটভূমিতে, আরো অনেক শিল্পীর মতো, তিনি সমকালকে, সমকালের যুদ্ধবিরোধী মানসিকতাকে প্রকাশ করার জন্যে গ্রহণ করেছেন রূপকের

আশ্রয়। 'শকুন্ত উপাখ্যান' (১৯৬১) একাঙ্কিকায়, পক্ষিকুলের রূপকে, তিনি তুলে এনেছেন মানুষের চেতনতলের 'good' এবং 'evil'-এর দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে 'evil' পরাজিত হয়েছে, যুদ্ধ আর ক্ষমতার দম্ভের পরিবর্তে ভালোবাসা আর মৈত্রীবন্ধন বিজয়ী হয়েছে। সিকান্দার আবু জাফর তাঁর মূল্যবোধগত সদর্থক অবচেতন আকাঙ্ক্ষাকে পাখিদের রূপকে রূপময় করে তুলেছেন আলোচ্য নাটকে। 'সিরাজ-উ-দ্দৌল্লা' (১৯৬৫) নাটকে ইতিহাসকে সমকালীন চেতনার সঙ্গে বিখণ্ডিত করেছেন সিকান্দার আবু জাফর। উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠীর মাঝে নাট্যকার সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন সিরাজ-উ-দ্দৌল্লার শক্তি আর সাহস আর অফুরান দেশপ্রেম। কলোনিশাসন আর প্রচলিত সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে দ্রোহের বাণী উচ্চারিত হয়েছে সিকন্দার আবু জাফরের 'মাকড়সা' (১৯৫৯) নাটকে। 'মহাকবি আলাওল' নাটকে বিষয়ভাবনায় সিকান্দার আবু জাফর রেখেছেন স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের খ্যাতকীর্তি এক কবির জীবন নিয়ে নাটক রচনায় তিনি যে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। উপর্যুক্ত নাটকসমূহে সিকান্দার আবু জাফরের প্রাতিস্বিক নাট্যপ্রতিভার পরিচয় সুপ্রকাশিত।

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বিষয়ভাবনা ও প্রকরণ-নিষ্ঠায়, তাঁর কথাসাহিত্যের মতোই, প্রাতিস্বিক জীবনার্থ-ঋদ্ধ, তপস্যাশুদ্ধ এবং আধুনিকতা-স্পর্শী নাট্যকার। শিল্পবোধ ও জীবনচেতনার প্রশ্নে পূর্বাপর সতর্ক, সপ্রতিভ এবং বিশ্ববিস্তারী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র নাটক চতুষ্টয় বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারায় নির্মাণ করেছে এক স্বকীয় মাত্রা। তাঁর প্রথম নাটক 'বহিপীর' (১৯৬০) বিষয়বস্তু, ঘটনাংশ, সংগঠন এবং মঞ্চকলার দিক থেকে বিশিষ্টতার পরিচয়বাহী। এখানে সামন্তযুগীয় মূল্যবোধের সঙ্গে নবজাগ্রত মধ্যবিত্তমানসের দ্বন্দ্ব চিত্রিত হয়েছে। তবে 'বহিপীর' নাটকে, ওয়ালীউল্লাহ্ বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথা ও শাসনের শৃঙ্খল ভাঙতে চাননি, যা তিনি করেছেন তাঁর পরবর্তী নাট্যত্রয়— 'সুড়ঙ্গ' (১৯৫৫), 'তরঙ্গভঙ্গ' (১৯৬২) এবং 'উজানে মৃত্যু'-তে (১৯৬৩)। এই ত্রয়ী নাটকে বিষয়ভাবনা ও শিল্পপ্রকরণে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্কে আধুনিক নাট্যকার হিসেবে সহজেই চিনে নেওয়া যায়— এ সব নাটকে পাওয়া যাবে অস্তিত্ববাদী রীতি-প্রভাবিত নাট্য-সংগঠন, কখনো এক্সপ্রেশনিস্ট বা অ্যাবসার্ড নাট্যকার হিসেবেও তাঁকে সহজেই আখ্যা দেওয়া যাবে। 'সুড়ঙ্গ' নাটকটির কাহিনি রহস্যমণ্ডিত, অবিশ্বাস্য— এবং এই রহস্য ও অবিশ্বাসের পটে ওয়ালীউল্লাহ্ তুলে আনতে চেয়েছেন মানুষের চেতনার গভীরস্থ লোভ-লালসা-ঘৃণা ও ঈর্ষাকে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র প্রাতিস্বিক নাট্যপ্রতিভার উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন, 'তরঙ্গভঙ্গ' বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের ধারায় একটি শক্তিশালী পালাবদলকারী নাটক।[৮] বিষয়ভাবনা, ঘটনাংশ-উপস্থাপনা, মানুষের অন্তর্বাস্তবতার প্রতীকী প্রকাশ এবং সংলাপরীতির অভিনবত্বে 'তরঙ্গভঙ্গ' বাংলা নাটকের ধারায় এক সম্পূর্ণ নতুন নির্মাণ। আর্থার অ্যাডামোভ (১৯০৮) তাঁর 'প্যারডি' (১৯৫১) নাটকে যেমন মানুষের বাস্তবচিত্র উপস্থাপনে বিচরণ করেছেন অন্তর্বাস্তবতার জগতে, তুলে ধরেছেন তার মনোলোকের অবরুদ্ধ চেতনা, তেমনি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকে, জজের বহুস্তর-অন্তর্চেতনা নির্মাণ করেছেন চরিত্রের অভ্যন্তর-বাস্তবতার জগতে শিল্পের আয়ত দৃষ্টি ফেলে। ব্যক্তিমানুষের অন্তর্জগতের বিচূর্ণ-বিভঙ্গ, ভাবনার রূপাঙ্কনের কারণে 'তরঙ্গভঙ্গ' যেমন পায় অভিব্যক্তিবাদী নাটকের (expressionist drama) অভিধা, তেমনি অন্তর্চেতনার ঘূর্ণাবর্তে এক সময় স্থিত ও দায়িত্বসচেতন হয়ে-ওঠা জজ সাহেবের ভূমিকা একে এনে দেয় অস্তিত্ববাদ-প্রভাবিত শিল্পের চারিত্র্য। জজ সাহেব যখন বুঝতে পারেন, হত্যাকাণ্ডের পিছনে নেওলাপুরীর ভূমিকা আছে, তখন তিনি সার্ত্রে (১৯০৫-১৯৮৮) কথিত মানবিক প্রান্তিক পরিস্থিতি (border-line situation) অতিক্রম করে অস্তিত্বের শুদ্ধসত্তায়

(authentic being) উত্তীর্ণ হন এবং নেওলাপুরীকে হাজতে বন্দি করেন। অতিবাস্তব প্রতিবেশের সহায়তায় ইয়োনেস্কোর (১৯১২-১৯৯৬) 'দ্যা কিলাব' (১৯৫৯) নাটকের বেরেন্‌জোর মতো, জজের অবচেতন ভাবনাস্রোত এবং সামুদ্রিক তরঙ্গভঙ্গের মতো বিচূর্ণ ভাবনা আলোচ্য নাটকে আবসার্ড আবহে চিত্রিত হয়েছে। ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'উজানে মৃত্যু' (১৯৬৩) নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় আধুনিক জীবনের সর্বাত্মক অর্থহীনতা, শূন্যতা, ক্লান্তি, নৈরাশ্য এবং অন্তহীন প্রতীক্ষা। এখানেও তিনি অ্যাবসার্ড আবহে চেতন নয়, অবচেতনের জগতে সন্ধানী আলো ফেলেছেন এবং তুলে এনেছেন শুভ্রতা ও কল্যাণের সঙ্গে মলিনতা ও অকল্যাণের দ্বন্দ্বে-বিপর্যস্ত মানুষের অন্তর্জগতের স্তরীভূত চিত্র। ব্যক্তিক অবচেতন ভাবনাতরঙ্গ, অস্তিত্ব-অভিশঙ্কা, ভঙ্গুরতা-বিভঙ্গতা উপস্থাপনে, তাঁর নাটক চতুষ্টয়ে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ সিদ্ধিতে শিখরবিন্দু-স্পর্শী, প্রকবণশৈলীতে আধুনিকতা-শুদ্ধ, শিল্প-অভিযাত্রায় বিশ্ব প্রসারিত।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মতো তপস্যাশুদ্ধ এবং বিশ্বমনস্ক নাট্যকার মুনীর চৌধুরী; গদ্যের মতো, নাটকেও, তাঁর প্রতিটি রচনা প্রাতিস্বিকতা-চিহ্নিত। বিষয়ের গৌরব, প্রকাশরীতির অভিনবত্ব, শৈল্পিক পরিমিতিবোধ এবং মঞ্চকলার মৌলিকতায় মুনীর চৌধুরীর 'কবর' (রচনাকাল ১৯৫৩; প্রকাশকাল ১৯৬৬) বাংলা নাট্যসাহিত্যের এক উজ্জ্বল সৃষ্টি। ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা 'কবর' পূর্ববাংলার প্রথম প্রতিবাদী নাটক। সমালোচক আনিসুজ্জামান যথার্থই বলেছেন, 'কবর' আর মুনীর চৌধুরীর নাম এক হয়ে গেছে। যেমন রাজনৈতিক আন্দোলন-নির্ভর শিল্পসৃষ্টিব সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছে 'কবরে'র নাম।.... 'কবর' মানে রাজনৈতিক সচেতনায় উদ্দীপ্ত জনমনে গভীরভাবে প্রোথিত, প্রত্যয়বোধে ঋদ্ধ একটি সফল শিল্পরূপ।'[২] 'কবর' নাটকে জার্মান অভিব্যক্তিবাদী নাট্যকারদের প্রভাব যেমন আছে, তেমনি আছে অ্যাবসার্ড নাটকের আবহ। বিষয়ভাবনা ও সংগঠনশৈলীর অভিনবত্বে মুনীর চৌধুরীর 'দণ্ডকারণ্য' (১৯৬৬) ও বাংলা নাটকেব ধারায় নতুনত্বের স্বাক্ষরবাহী। আলোচ্য নাটকে মুনীর চৌধুরী এক সেট চরিত্র দিয়েই পুরাণ এবং সমকালের মধ্যে মানবিক প্রবৃত্তির সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন। মানবিক প্রবৃত্তিব আদিম মৌলিকতা পুরাণের পাতা ছিঁড়ে সমকালেও সমান মাত্রায় থাকে সঞ্চরণশীল। এই সূত্রেই এ নাটকে পুরাণ আর সমকাল মিলেমিশে হয়ে গেছে একাকার। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১) অবলম্বনে রচিত 'বক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকে মুনীর চৌধুরী প্রকাশ করেছেন তাঁর যুদ্ধবিরোধী মনোভাব। যুদ্ধ মানবভাগ্যকে করে বিপর্যস্ত ও বিপন্ন। যুদ্ধকে অবলম্বন করে লেখা 'রক্তাক্ত প্রান্তর' হয়ে উঠেছে একালের অন্যতম যুদ্ধ-বিরোধী নাটক। বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের ধারায় মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' যথার্থ অর্থেই সংযোজন করেছে একটি নতুন মাত্রা। হিন্দু অথবা মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রকাশের জন্যে তিনি ইতিহাসকে ব্যবহার করেননি, যেমন করেছেন পূর্ববর্তী অধিকাংশ নাট্যকাব, বরং ইতিহাসকে তিনি ব্যবহার করেছেন সমকালীন একটি বিশ্বজনীন চিন্তা প্রকাশের উদ্দেশ্যে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে ইতিহাসের সঙ্গে সমকালীন চিন্তার জৈব-ঐক্য মিলনের যে-প্রবণতা আমরা লক্ষ করি মুনীর চৌধুরী নিঃসন্দেহে সে ক্ষেত্রে পালন কবেছেন পথিকৃতের ভূমিকা। হাস্যকৌতুক কিংবা ক্ষোভ-অভিযোগ প্রকাশের জন্যে মুনীব চৌধুরী যে সব একাঙ্কিকা রচনা করেছেন, বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের বিকাশের ধারায় তারও বয়েছে উল্লেখযোগ্য অবদান।

১৯৭১-পূর্ববর্তী কাল-পরিসরে নিরীক্ষাধর্মী নাটক রচনা করে যাঁবা বিশিষ্টতার পরিচয় দিযেছেন, সাঈদ আহমদ তাঁদেব অন্যতম। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'কালবেলা', 'মাইলপোস্ট' এবং 'তৃষ্ণায়' নাটকের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।[৩] 'কালবেলা' এবং 'মাইলপোস্ট' নাটকে সমকালীন মানবভাগ্যেব বিপর্যযকে সাঈদ আহমদ শিল্পরূপ দিয়েচেন অ্যাবসার্ড নাট্যআঙ্গিকে। ১৯৬১ সালে বাংলাদেশে উপকূলবর্তী এলাকায প্রলয়ঙ্কব ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসেব পটভূমিতে বচিত হয়েছে

'কালবেলা' নাটক। নাটকের এই বিষয় আমাদের কাছে অভিনব নয়, বরং অভিনব হচ্ছে এর উপস্থাপনা কৌশল এবং সংগঠনশৈলী। বাস্তববাদী নাট্যসংগঠনের পরিবর্তে সাঈদ আহমদ এখানে সচেতনভাবে গ্রহণ করেছেন পাশ্চাত্যের অ্যাবসার্ড নাট্য-প্রকৌশল। স্বপ্ন-ব্যাকরণময় কাহিনিবিন্যাস, আপাত সংলগ্ন সংলাপ, অর্থহীন প্রতীক্ষা— 'কালবেলা' নাটকের অ্যাবসার্ড ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'মাইলপোস্ট' এবং 'তৃষ্ণায়' নাটকে সাঈদ আহমদ রূপক অভিব্যঞ্জনায় জীবনের আশাবাদের কথা ব্যক্ত করেছেন। 'মাইলপোস্ট'-এ পরিচিত বাস্তবতার পরিবর্তে জীবনের ক্লান্তি-নৈরাশ্য শূন্যতা-অস্থিরতা রূপময় হয়ে উঠেছে অ্যাবসার্ড নাটকের আঙ্গিকে, আর 'তৃষ্ণায়' নাটকের প্রচলিত লোককাহিনিতে সংরক্ত সমকালের স্পর্শ মিলিয়ে নাট্যকার এনেছেন নতুন মাত্রা। 'তৃষ্ণায়' যথার্থ অর্থেই, বাংলাদেশের একটি পালাবদলকারী নাটক। শিয়াল এবং কুমিরের লোককাহিনির আড়ালে আলোচ্য নাটকে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণ এবং একই সঙ্গে এই শোষণ থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তির আত্যন্তিক আকাঙ্ক্ষা। রূপকথার মাধ্যমে আধুনিক জীবনযন্ত্রণা ও শ্রেণিসংগ্রাম উপস্থাপন করে সাঈদ আহমদ বাংলাদেশের নাটকের ধারায় সংযোজন করেছেন একটি নতুন মাত্রা।

স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীকালে উপর্যুক্ত পঞ্চপ্রতিভা ছাড়াও অন্য যে-সব নাট্যকার নাটক রচনায় বিশেষ সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), আকবরউদ্দীন (১৮৯৫-১৯৭৮), শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮), আসকার ইবনে শাইখ (১৯২৫-) আলী মনসুর (১৯২৫-), আনিস চৌধুরী (১৯২৯-১৯৯১), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-), জিয়া হায়দার (১৯৩৬-), কল্যাণ মিত্র (১৯৩৯-) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক, সামাজিক কিংবা নিরীক্ষামূলক নাটক রচনা করে এঁরা সম্মিলিতভাবে নির্মাণ করে দিয়েছেন স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল বিকাশধারার পটভূমি।[৪]

১৯৭১-পূর্ববর্তী নাট্যধারায় আর একটি ক্ষীণস্রোতের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। লোককাহিনি বা রূপকথার নাট্যরূপ-সৃজনে এ পর্বে কয়েকজন নাট্যকার বিশেষ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ইব্রাহিম খলিলের (১৯১৬-) 'সমাধি' (১৯৪৬), আযীমউদ্দীন আহমদের (১৯০৪-১৯৭৩) 'মহুয়া' (১৯৫২), জসীমউদ্দীনের (১৯০৩-১৯৭৬) 'মধুমালা' (১৯৫৬) এবং ইতিপূর্বে উল্লিখিত সাঈদ আহমদের 'তৃষ্ণায়' নাটকের কথা উল্লেখ করা যায়। এ সব নাটকে অতীত ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়ন ঘটেছে, তবে সমকালীন জীবনচিন্তা ও সমাজ-প্রবণতার সঙ্গে লোককাহিনি বা রূপকথার আন্তরসম্পর্ক নির্মাণে সাঈদ আহমদের মতো সার্থকতা অন্য কোনো নাট্যকার অর্জন করতে পারেননি।

আলোচ্য কালখণ্ডে নাট্য-আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নতুনত্ব আনয়নের ক্ষেত্রে দুজন নাট্যকার নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) এবং আলাউদ্দিন আল আজাদ কাব্যনাট্য রচনা করে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে এ আঙ্গিকে রচিত বাংলাদেশের সমৃদ্ধ নাট্যসাহিত্যের পথটি উন্মোচন করে দিয়েছেন। ফররুখ আহমদের 'নৌফেল ও হাতেম' (১৯৬১) এবং আলাউদ্দিন আল আজাদের 'ইহুদির মেয়ে' (১৯৬২) কাব্যনাট্য বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের বর্তমান বিকাশের ধারায় বিশেষভাবে স্মরণীয়, কেননা, এদের প্রদর্শিত পথেই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে কাব্যনাট্য রচনায় একটা সজীব উজ্জ্বলতা আমরা লক্ষ করি।

১৯৭১-পূর্ববর্তী কালখণ্ডে রচিত বাংলা নাটক, বিশেষত পূর্ববাংলাকেন্দ্রিক নাট্যসাহিত্যের এই ঐতিহ্যকে অঙ্গীকার করেই সূচিত হয়েছিল স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের নাট্য-সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল অভিযাত্রা।[৫] ১৯৭১-১৯৯৫ কালপরিধিতে রচিত বাংলাদেশের নাটকের পরিচয় দিতে গিয়ে আমরা বিশেষ কারণেই ১৯৭১-পূর্ববর্তী নাট্যধারার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেছি। আমাদের

বিবেচনায়, প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বের এই নাট্য-ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য ১৯৭১-পরবর্তী বাংলাদেশে নাট্যসাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য ও চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য। আমরা বিশ্বাস করি, অতীতের আলোকেই যথার্থভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব সমকালীন কোনো সাহিত্যধারা, এবং সে কারণেই অতীতের আলোকে বিচার করা প্রয়োজন ১৯৭১-পরবর্তী বাংলাদেশের নাট্যধারার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও সাধর্ম্য, তার রূপ ও রূপান্তর।

৩. বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের নাট্যসাহিত্যের ধারা

সূচনা-সূত্রেই ব্যক্ত হয়েছে যে, স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশের সাহিত্যধারায় সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ ও বিকশিত হয়েছে নাট্যসাহিত্য। স্বাধীনতাচেতনা বাংলাদেশের নাট্যকারদের পুনর্জাত করেছে নতুন মূল্যবোধে। স্বাধীনতা-উত্তর সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে আমাদের নাট্যকাররা শাণিত হাতে বেছে নিলেন নাট্য-আয়ুধ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কলকাতার গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ যেমন এ ক্ষেত্রে প্রেরণা সঞ্চার করেছে, তেমনি অনুপ্রেরণা এসেছে মুক্তিযুদ্ধের অম্লান সব সদর্থক চেতনা থেকে। ফলে স্বাধীনতা-উত্তরকালে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের চেতনাকে মর্মমূলে লালন করে আমাদের নাট্যসাহিত্যের অঙ্গনও হয়েছে নতুন নতুন ভাবনা ও মূল্যবোধে পরিস্রুত ও সমৃদ্ধ, নাটকের বিষয় ও আঙ্গিকে সঞ্চারিত হয়েছে নতুন নতুন মাত্রা।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে নবতরঙ্গ সৃষ্টির পশ্চাতে নাট্যকর্মীদের প্রগতিশীল নাট্য-আন্দোলনের রয়েছে সুদূরপ্রসারী প্রভাব। প্রাক্‌-স্বাধীনতা পর্বের মৌসুমি নাট্যচর্চার পরিবর্তে নাট্যকর্মীরা নিয়মিত নাটক মঞ্চায়নে উদ্যোগী হলেন, নাট্যকর্মীরা নাটককে গ্রহণ করলেন সমাজ-বদলের হাতিয়ার হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালে নাটক হয়ে উঠল একটি নিয়মিত শিল্পমাধ্যম। স্বাধীনতার মূল্যচেতনাকে অর্থবহ করার আন্তরগরজে নাট্যকর্মী ও নাট্যকাররা এগিয়ে এলেন নতুন উদ্যমে, এবং এভাবেই বাংলাদেশের নাটকে লাগল পালাবদলের হাওয়া। শতাব্দী বহমান নাট্য-ঐতিহ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সমাজমানসকে আর প্রতিনিধিত্ব করতে পারল না, ফলে দেশ-কালের দাবিতে রচিত হল নতুন নাটক, আবির্ভূত হলেন নতুন নাট্যকার। ইতিহাসের ধূসর আবর্ত আর রূপকথার মোহান্ধতার পরিবর্তে বাংলাদেশের নাটকের প্রধান বিষয় হয়ে উঠল মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজমানস। সমাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন প্রধান বিষয় নাটকে আর স্থান পেল না, সমাজবিবিক্ত নাট্যযুগের ঘটল অবসান। প্রাক-মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের নাটকের মৌল পার্থক্য নির্দেশ-সূত্রে সমালোচকের মন্তব্য এখানে স্মরণযোগ্য—

> 'যে বিষয়বস্তু নিয়ে আগেকার নাটকগুলোর রচিত হল, সে-সব বিষয় '৭১ পরবর্তী নাট্যকর্মী-দর্শকদের মনে দাগ কাটতে সক্ষম হল না। তাই প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াল নতুন নাট্য রচনার। আগেকার নাটকের সাথে এই নতুন নাটকের প্রধান পার্থক্য হল নাটকে এখন একটা সুস্পষ্ট বক্তব্য এল। বক্তব্য ছাড়া কোনো নাটক আজকের নাট্যকর্মীদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হল না। বেশির ভাগ নাটক রচিত হল সমকালীন সমাজ নিয়ে। সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয়, মানুষের হতাশা-বঞ্চনা, আনন্দ-উল্লাসকে উপজীব্য করে নাটক রচিত হল।.... নাট্যকাররা তাঁদের রচনায় সমাজ-সচেতনার পরিচয় দিলেন।'[৫]

বিগত পঁচিশ বছরে (১৯৭১-১৯৯৫) বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত এই বিকাশধারা নাটকের বিষয় ও আঙ্গিক উভয় ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা প্রথমে নাট্যসাহিত্যের প্রবণতা সম্পর্কে আলোচনা করব, আর দ্বিতীয় স্তরে নাট্য-আঙ্গিক। বিষয়-বিবেচনায়

বাংলাদেশের নাটককে আমরা প্রধান পাঁচটি প্রবণতায় বিন্যস্ত করতে পারি। প্রবণতাগুলো নিম্নরূপ :

ক. মুক্তিযুদ্ধের নাটক;

খ. প্রতিবাদেব নাটক : প্রতিরোধের নাটক;

গ. ইতিহাস-ঐতিহ্য-পুরাণ পুনর্মূল্যায়নধর্মী নাটক;

ঘ. সামাজিক নাটক, এবং

ঙ. অনুবাদ নাটক · রূপান্তরিত নাটক।

এখানে উল্লেখ কবা প্রয়োজন, উপর্যুক্ত পদ্ধতির প্রবণতা-বিভাজন অনেক সময়েই ভ্রান্তির জন্ম দিতে পারে, কারণ একটি নাটকের মধ্যে একই সঙ্গে একাধিক প্রবণতার উপস্থিতি অস্বাভাবিক নয়। তবে, আলোচনায়, অগ্রসব হওযায সুবিধার্থে, নাটকসমূহের কেন্দ্রীয় প্রবণতা ও মৌল-জীবনার্থের বিবেচনায় আমরা এ ধবনের প্রবণতা-বিভাজন পরিকল্পনা করেছি। স্বাধীনতা-উত্তব বাংলাদেশেব নাট্যসাহিত্যের সার্বিক মূল্যাযনেব জন্যে, পর্যাযক্রমে, আমরা এই পঞ্চ-প্রবণতায় বচিত নাটকসমূহ বিবেচনা কবব, দেখতে চাইব আমাদেব প্রধান নাট্যকারদের মৌল অর্জন, তাদের প্রাতিস্বিকতা ও কলাবোধেব স্বাতন্ত্র্য।

৩.১ মুক্তিযুদ্ধের নাটক

কোনো পরাধীন জাতিব মুক্তিসংগ্রামেব দীর্ঘ সাধনা যখন সফল হয়, তখন তা জাতীয় চেতনাব মর্মমূলে থাকে নিবন্তর প্রবহমান, বিরাজ করে অনাগত কাল ধরে অনির্বাণ প্রেবণার উৎস হয়ে। অসীম সমুদ্রে ভাসমান দূরগামী জাহাজের নাবিকের কাছে বাতিঘরের আলোক-স্তম্ভেব মতো, মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রামী জাতিসত্তাকে নতুন আশা আব আকাঙ্ক্ষার বাণী শোনায় প্রতিনিয়ত। মুক্তিযুদ্ধের বৃহত্তম প্রেক্ষাপট নির্মাণে একটি দেশেব জাতীয় সংস্কৃতি পালন কবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি যেমন একটি দেশেব মুক্তিসংগ্রামকে ত্বরান্বিত করতে পারে, তেমনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় স্নাত হয়ে সে-দেশের শিল্প-সাহিত্যও যুগান্তকাবী নতুন সৃষ্টিতে হয় ঋদ্ধ। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের চেতনায় স্নাত হযে পৃথিবীর দেশে দেশে গড়ে উঠেছে সমৃদ্ধ শিল্প সাহিত্য। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামেব প্রেক্ষাপট নির্মাণেও এ দেশের সাহিত্য, বিশেষ নাটক, পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, আবার যুদ্ধোত্তরকালে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামেব চেতনাকে মর্মমূলে লালন কবে আমাদের সাহিত্যেব, বিশেষত নাটকের অঙ্গনও হয়েছে নতুন ভাবনা ও মূল্যবোধে পরিস্রুত ও সমৃদ্ধ, নাটকে সঞ্চারিত হযেছে নতুন নতুন মাত্রা।

স্বাধীনতা-উত্তবকালে মুক্তিযুদ্ধকে অবলম্বন করে অনেক নাটক বচিত হয়েছে। এ কথা নির্দ্বিধায বলা যায়, স্বাধীনতা-উত্তব বাংলাদেশের নাটকে জড়িযে আছে সংগ্রাম ও বিজযের বিমিশ্র অভিব্যক্তি, যা একান্তই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার। দীর্ঘ সিকি-শতাব্দী ধবে নিজেকে শনাক্ত করার যে সাধনায় বাংলাদেশের নাট্যকাররা ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ, তার সাফল্যে নাটকের বিষয় ও প্রকবণে যুদ্ধোত্তরকালে এসেছে নতুন মাত্রা। বিষয় ও ভাবের দিক থেকে বাংলাদেশের নাটকে যেমন মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন ঘটেছে, তেমনি প্রকরণ-পরিচর্যায়ও মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ উপস্থিত। আমাদের নাটকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন ঘটেছে বিভিন্নভাবে। কখনো সরাসরি যুদ্ধকে অবলম্বন করে নাটক বচিত হয়েছে, কখনো-বা নাটকের বিষয়াংশ সৃষ্টি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় পরিস্নাত হয়ে। কোনো-কোনো নাটকে স্বাধীনতা স্বপক্ষীয়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এবং বিপক্ষীয়দের প্রতি ঘৃণাবোধ উচ্চারিত হয়েছে, আবার কোথাও-বা নাটকের বহিরঙ্গে লেগেছে মুক্তিযুদ্ধের স্পর্শ।

স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের নাট্যকাররা ছিলেন পাকিস্তানি ঘাতকদের অন্যতম শিকাব।

সন্ত্রাসের মধ্যে বাস করেও বাংলাদেশের নাট্যকাররা সংগ্রামেব মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে নাটক রচনা করেছেন, পালন করেছেন শব্দ-সৈনিকের ভূমিকা। একাত্তরের যুদ্ধকালে যেমন, তেমনি যুদ্ধ-পরবর্তী সময়েও শোণিতাক্ত শব্দে ও সংলাপে আমাদের নাট্যকাররা বাণীবদ্ধ করে রেখেছেন মুক্তিযুদ্ধের অম্লান চেতনা এবং একই সঙ্গে এখানে স্মরণীয়, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কী অব্যবহিত পরে যেসব নাটক রচিত হয়েছে, তাতে প্রাধান্য পেয়েছে আবেগ, মনন নয়। এটিই বোধ হয় প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে রচিত বাংলাদেশের নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বনে পঞ্চাশের অধিক নাটক রচিত হয়েছে, কিন্তু শিল্পসিদ্ধির প্রশ্নে অধিকাংশ নাটকই অনুল্লেখ্য।[৬] যুগের দাবিতে রচিত প্রচারসর্বস্ব এ সব নাটকে যুদ্ধের সংবাদ আছে, পাকিস্তানি সৈন্য কর্তৃক নারী-ধর্ষণের চিত্র আছে, আছে করতালি-নিনাদিত জনপ্রিয় বক্তৃতার মেলা, আছে বিপুল আবেগের উদ্দাম প্লাবন; কিন্তু যা নেই তা হল শৈল্পিক পরিমিতিবোধ ও স্রষ্টার নিরাসক্ত জীবনচেতনা। তবু, এরই মাঝে আমরা স্মরণ করতে পারি বেশ কিছু যুগন্ধর ও যুগোত্তীর্ণ নাটকের নাম।

মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিকুণ্ডে বসে নাটক রচনা করেছেন মমতাজউদ্‌দীন আহমদ (১৯৩৫-)। এ পর্যায়ে স্মরণীয় তাঁব চারটি নাটক, 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' (রচনাকাল ১৯৭১), 'এবারের সংগ্রাম' (রচনাকাল ১৯৭১), 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' (রচনাকাল ১৯৭১) এবং 'বর্ণচোর' (রচনাকাল ১৯৭২)। পরবর্তীকালে এ সব নাটক নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' (১৯৭৬) শীর্ষক নাট্যগ্রন্থ। কিশোরদের জন্যে মমতাজউদ্‌দীন আহমেদ লিখেছেন 'বকুলপুরের স্বাধীনতা' (১৯৮৬) শীর্ষক নাটক। 'এবারের সংগ্রাম' এবং 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' নাট্যদ্বয়ে রূপকের ব্যঞ্জনায় মমতাজউদ্‌দীন আহমদ তুলে ধবেছেন পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির অত্যাচারের কাহিনি এবং একই সঙ্গে বাঙালির রুখে দাঁড়ানোর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। 'বর্ণচোর' নাটকে চিত্রিত হয়েছে, উচ্চকণ্ঠ উচ্চারণে মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের ভণ্ডামি ও পাশবিকতা ও মনুষ্যত্বহীনতার কাহিনি। তবে মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বনে রচিত মমতাজউদ্‌দীন আহমদের শ্রেষ্ঠ নাটক 'বিবাহ' ও 'কী চাহ শঙ্খচিল' (১৯৮৫)। 'বিবাহ' নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় ভাষা আন্দোলন হলেও ইতিহাসের ক্রমধারায় তা মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক 'কী চাহ শঙ্খচিল' নাটকের সঙ্গে একীভূত ও একাত্ম। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় নাট্যকারের ভাষ্য :

> 'স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে কী চাহ শঙ্খচিলের বিষয় নির্ধারিত। বিবাহ নাটকের সখিন এবং কী চাহ শঙ্খচিলের রৌশনআরা আবেগ ও যন্ত্রণার সূত্রে আমার কাছে অভিন্ন চরিত্র। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন স্বাধিকার এবং একাত্তবের যুদ্ধ স্বাধীনতার শপথে যেমন ধাবাবাহিক সূত্রে গ্রথিত তেমনি বিবাহ ও কী চাহ শঙ্খচিল একই আবেগ ও বেদনার ধারাবাহিক বিকাশ।'[৭]

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সৈন্য কর্তৃক নারী ধর্ষণের কলঙ্কিত ইতিহাস নিয়ে রচিত হয়েছে 'কী চাহ শঙ্খচিল' নাটক। নির্যাতিত নারীদের অপরিমেয় যন্ত্রণা ও বেদনার ইতিহাস মমতাজউদ্দীন আহমদ শৈল্পিক ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেছেন, তুলে ধরেছেন সর্বস্বহাবা নারীদের বুক-ফাটা আর্তনাদ। স্মরণীয়, নাটকের নায়িকা রৌশনআরার রক্তিম সংলাপ :

> 'যুদ্ধকে নিয়ে তোমরা ভাগ্য গড়ে নাও, সাধের সিংহাসন মজবুত কর, পৃথিবীর রঙকে মলিন কর আমি তো প্রতিবাদ করিনি— আমি তো সূর্যের আলোতে মুখ দেখাতে চাইনি— কিন্তু আমার সন্তানকে নিয়ে তোমরা বাণিজ্য গড়তে চাও কেন? আমাব সন্তানেব পরিচয়কে তোমরা অপবিত্র কর কেন?.... স্বাধীনতা? কার স্বাধীনতা? কেমন স্বাধীনতা? মায়ের কোলে বাচ্চা নেই, মানুষের চোখে নিদ নাই, নদীব বুকে পানি নাই। কেমন স্বাধীনতা? তোমাব মাথার উপব থাইকা উডা

জাহাজের মতোন জল্লাদ পাখি তাড়াইতে পারবা, তোমরা বইনের মুখ থাইক্কা লাঞ্ছনা মুছতে পাববা? আমার মাথার আগুন নিভাইতে পারবা?'[৮]

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক নারীধর্ষণের পটে লেখা হয়েছে আরো কিছু নাটক। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আলাউদ্দীন আল আজাদের (১৯৩২-) 'নিঃশব্দ যাত্রা' (১৯৭২), 'নরকে লাল গোলাপ' (১৯৭৪), জিয়া হায়দাবের (১৯৩৬-) 'সাদা গোলাপে আগুন' (১৯৮২), 'পঙ্কজ বিভাস' (১৯৮২), মোহাম্মদ এহসানুল্লাহর 'কিংশুক যে মরুতে' (১৯৭৪), নীলিমা ইব্রাহিমের (১৯২১-) 'যে অরণ্যে আলো নেই' (১৯৭৪) ইত্যাদি নাটক। উপর্যুক্ত নাটকগুলোর মধ্যে 'নরকে লাল গোলাপ', 'সাদা গোলাপে আগুন', এবং 'পঙ্কজ বিভাস' বন্দিনী নারীদের মর্তযাতনা উপস্থাপনে, অন্য নাটকগুলোর তুলনায় অনেক বেশি সংহত ও শিল্পসফল।

মুক্তিযুদ্ধকে অবলম্বন করে সবচেয়ে সার্থক ও সঞ্চসফল নাটক লিখেছেন সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-)। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় তাঁর 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' (১৯৭৬) শীর্ষক কাব্যনাটক। মুক্তিযুদ্ধেব সমাপ্তিতে গ্রামে প্রবেশ করছে মুক্তিবাহিনী। এ সংবাদে গ্রামের মাতবর, যে যুদ্ধের সময় পাকিস্তানেব দালালি কবেছে, এমনকী নিজের কন্যাকে তুলে দিয়েছে পাকিস্তানি সেনা-অফিসারের হাতে, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে মাতবরের সামনে আত্মহত্যা করে তার আত্মজা, মুক্তিযোদ্ধারা হত্যা করে মাতবরকে। এই নাটকে মাতবরের বুকফাটা কান্নায়, তার অপমানিত আর্তিতে আমাদেব মুক্তিযুদ্ধের একটি বিশেষ প্রান্ত হয়েছে উন্মোচিত। কাব্যনাট্যের আঙ্গিকে রচিত এই নাটক আঞ্চলিক শব্দেব নিপুণ ব্যবহারে যুদ্ধকালীন উত্তরবাংলার গ্রামীণ জীবনকে যেন শব্দবন্দি করে ধরে বেখেছে। ভাষার গীতিময়তা, আঞ্চলিক শব্দের কুশলী প্রয়োগ এবং যুদ্ধকালীন জীবনবাস্তবতাব কাব্যিক উচ্চারণে 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' বাংলাদেশের জন্যে নাট্যসাহিত্যে একটি পালাবদলকারী নাটক হিসেবে বিবেচিত। নাটকের সমাপ্তিতে পাইকের সংলাপে যে-প্রতিশোধের বাণী উচ্চাবিত, তা বুঝি বাংলাদেশের এখনো সমান প্রাসঙ্গিক :

'এদিকে, এদিকে সব আসেন এখন
দেখাইয়া দেই সব কোথায় কখন
কী গজব কী আজাবে ছিল লোকজন
জালেমের হাতে ছিল যখন শাসন
শত শত মারা গেছে আত্মীয়স্বজন।
এদিকে, এদিকে সব আসেন এখন
দেখাইয়া দেই সব কী ভাবে কখন
মেলেটারি ঘাঁটি নিয়া ছিল কয়জন
কাবা কারা সঙ্গে ছিল তাদেব তখন।
অবিলম্বে সারা দেশ ঘেরা প্রয়োজন
জলদি জলদি সব চলেন এখন।'[৯]

মুক্তিযুদ্ধের নানা অনুষঙ্গ নিয়ে অন্য যেসব নাট্যকার নাটক লিখেছেন, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সাঈদ আহমদের 'প্রতিদিন একদিন' (১৯৭৮), কল্যাণ মিত্রের 'জল্লাদের দরবার' (১৯৭২), আল মনসুবের 'হে জনতা আরেকবাব' (১৯৭৪), রণেশ দাশগুপ্তের (১৯১২-১৯৯৯) 'ফেরী আসছে' ইত্যাদি নাটক। এ সব নাটকে আমাদের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের নানা খণ্ডচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে, কখনো আবেগী ভাষ্যে, কখনো-বা শিল্পিত পরিচর্যায়। এ ধারায় কয়েকটি টেলিভিশন-নাটক লিখেছেন হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-), ইমদাদুল হক মিলন (১৯৫৫-) এবং বাবেয়া খাতুন (১৯৩৫-)। এই ত্রয়ী নাট্যকাবেব বচনায় শিল্পরূপ লাভ কবেছে মুক্তিযুদ্ধেব নানা খণ্ডচিত্র।

৩.২ প্রতিবাদের নাটক : প্রতিরোধের নাটক

মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালে বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের একটি প্রধান প্রবণতাই হচ্ছে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধচেতনা। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের (১৮৬০) মাধ্যমে বাংলা নাটক যে প্রতিবাদ-প্রতিরোধকে অঙ্গীকার করেছিল, শতবর্ষ ব্যবধানে বাংলাদেশের নাট্য-সাহিত্যে সে ধারাই যেন হয়ে উঠল আরো বেগবান, আরো প্রাণবন্ত ও শ্রেণি-সচেতন। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক আমলে আমাদের নাটকে যে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধচেতনা ছিল সুপ্ত ও ম্লান, যুদ্ধোত্তরকালে সেখানে সঞ্চারিত হল নতুন মাত্রা। ১৮৭৬ সালে জারিকৃত ব্রিটিশ সরকারের 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' শীর্ষক কালাকানুন যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি করেছিল। নাটকের সঙ্গে মঞ্চের যেহেতু রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক, তাই এ বাধাটা সহজে অতিক্রম করা যায়নি। কেননা, ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের স্বার্থবিরোধী কোনো নাটক মঞ্চায়নের অনুমতি দিত না। স্বাধীনতা-উত্তরকালে এ ক্ষেত্রে এলো যুগান্তকারী পরিবর্তন। স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন সরকার শতাব্দী-প্রাচীন অভিনয় আইন সংশোধন করে নতুন আদেশ জারি করেন ১৯৭৫ সালের জুন মাসে, খুলে গেল দীর্ঘদিনের বদ্ধ অর্গল। বাংলাদেশের নাটকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধচেতনার পরিপ্রেক্ষিত খুঁজতে গেলে আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন ১৯৭৫ সালে জারিকৃত রাষ্ট্রপতির আদেশের দুটো উল্লেখযোগ্য ধারা :

ক. দেশে জাতীয় সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশের উদ্দেশ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি শৌখিন নাট্যগোষ্ঠী কর্তৃক নাট্যাভিনয়ের উপর থেকে প্রমোদকর রহিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তদনুসারে অর্থ মন্ত্রণালয় ১৯২২ সালে The Bengal Amusement Tax Act 1922 (Bengal Act V of 1922) সংশোধন করেছেন।

খ. অভিনয়ে অনুমতি দেবার পূর্বে নাটকের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে দেখার বিধি বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে। তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় অহেতুক হয়রানি এড়াবার জন্যে এই পরীক্ষা প্রণালি সহজ করার উদ্দেশ্যে সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সহিত পরামর্শক্রমে ১৮৭৬ সালের Act No. 29 of 1876 (16th December 1876) An act for the better control of dramatic performances আইনের সংশোধনের ব্যবস্থা করবেন।[১০]

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের এই সংশোধন বাংলাদেশের নাট্যকার ও নাট্যকর্মীদের মাঝে সঞ্চার করেছে মেরুদণ্ড সোজা হয়ে দাঁড়ানোর শক্তি। ফলে সামাজিক শোষণ আর বঞ্চনা আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে নাট্য-আয়ুধ হাতে তাঁরা হয়ে উঠলেন এক একজন নতুন মুক্তিযোদ্ধা, সুষম বণ্টনভিত্তিক সমাজ গড়ার কারিগর। শোষক আর শোষিতের দ্বন্দ্ব, শ্রেণিসমাজের দ্বন্দ্ব এভাবেই হয়ে উঠল আমাদের নাটকের অন্যতম উপজীব্য বিষয়। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের মৌসুমি আর বিনোদনধর্মী নাট্যধারার পরিবর্তে বাংলাদেশের সাহিত্যে দেখা দিল বক্তব্যমুখ্য সমাজসচেতন নাট্যধারা। বস্তুত, সামাজিক বক্তব্যমুখ্য প্রগত এই নাট্যধারাই হয়ে উঠল বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের প্রধান প্রবণতা। এ ধরায় যাঁরা স্মরণীয় অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মমতাজউদ্‌দীন আহমদ, আবদুল্লাহ আল-মামুন (১৯৪২-), মামুনুর রশীদ (১৯৪৮-), সেলিম আল দীন (১৯৪৮-), আবদুল মতিন খান, এস. এম. সোলায়মান, কবীর আনোয়ার, রাজীব হুমায়ুন (১৯৫১-) প্রমুখ নাট্যকার।

শোষিত-নিপীড়িত-বঞ্চিত মানুষের জন্যে নাটক লিখেছেন মামুনুর রশীদ। বস্তুত, তাঁর নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয়ই হচ্ছে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধচেতনা। মানুষের শ্রেণি সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাসকে নাট্যরূপ দেয়াই মামুনুর রশীদের নাটকসমূহের কেন্দ্রীয় বিষয়। মামুনুর রশীদ বিশ্বাস করেন, 'ভাঙনের মুখে সুরম্য নগর, সমৃদ্ধ জনপদ, বড় বড় সভ্যতা কিছুই টেকে না কিন্তু টিকে থাকে মানুষ, তার সংগ্রাম, সর্বোপরি শ্রেণি-সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস।'[১১] এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ ও অটল থেকে মামনুর রশীদ তাঁর নাটকের নির্মাণ করেছেন সামাজিক শোষণ-বঞ্চনা-নিপীড়নের বিরুদ্ধে

সংঘবদ্ধ মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-অগ্রযাত্রার ইতিহাস। কেবল বাংলাদেশের নাটক নয়, গোটা বাংলা নাট্যসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতেই মামুনুর রশীদের এই প্রাতিস্বিক জীবনদর্শন সবিশেষ লক্ষযোগ্য। তাঁর নাটকে 'অত্যাচারিত মানুষ সামাজিক অসাম্যে সচেতন হয়ে ওঠে, উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে নিজেরাই শিখে নেয় যে একতাবদ্ধ প্রতিরোধই শ্রেণিশত্রু বিনাশের হাতিয়ার।'[১২] 'ওরা কদম আলী' (১৯৭৮), 'ওবা আছে বলেই' (১৯৮০), 'ইবলিশ' (১৯৮২), 'এখানে নোঙর' (১৯৮৪), 'খোলা দুয়ার' (১৯৮৪) 'গিনিপিগ' (১৯৮৬) প্রভৃতি নাটকে মামুনুর রশীদের শ্রেণিসংগ্রাম চেতনার শৈল্পিক প্রকাশ ঘটেছে। এইসব নাটকে শ্রেণিদ্বন্দ্বের চেতনায় প্রোজ্জ্বল তাঁর প্রিয় মানুষেরা সামাজিক শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ায়, উচ্চাবণ কবে বিদ্রোহেব বাণী। শোষিত বঞ্চিত মানুষকে অধিকার-সচেতন ও প্রতিবাদী হযে উঠতে তাঁব নাটক পালন করেছে বলিষ্ঠ ভূমিকা। যেমন, গাঙ্গেয অববাহিকার কৃষক সমাজের সংগ্রামী জীবনগাথা নিয়ে রচিত তাব 'এখানে নোঙব' নাটকেব সফুরাব অন্তিম সংলাপবাশি ·

'আমি যাই— এই চড়ায় আবাব আবাদ অইবো— সোনার ফসল অইবো—
কোনো এক ফসল তোলাব দিনে আমি ফিরা আসুম, ততদিন তোমবা একলগে
থাইকো— কও তোমরা আব চেয়ারম্যানেব কতা হুনবা না' ...[১৩]

কিংবা 'ওরা কদম আলী' নাটকে সর্দাবেব অন্তিম সংলাপ :

'আজই থিকা এই ঘাটে আমরা মাথাব ঘাম পায়ে ফেইলা কাম করুম আব
আমাগো ইজ্জতেব উপর হামলা অইলে জান দিয়া রুখমু।'[১৪]

অথবা 'ওরা আছে বলেই' নাটকে কাওছাবেব উজ্জীবিত সংলাপ :

'আমাগো তো সবই গেছে, আর কী-ইবা যাইবো। এইবার ওগো শেষ করুম।
হেরপর যদি আমবাও শেষ হই— কোনো দুঃখ থাকবো না।'[১৫]

মামুনুব বশীদেব প্রিয় মানুষদের এই সংলাপগুচ্ছের মধ্যে তাঁব জীবনার্থ ও সমাজভাবনাব নিবিড় নৈকট্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়। চরিত্রের মতো প্রতিটি নাটকের ভূমিকায় মামুনুর রশীদ প্রকাশ করেছেন তার শ্রেণিসংগ্রাম চেতনা। যেমন ·

ক. 'ওরা আছে বলেই' নাটকে ছিন্নমূল ও ব্যাপক সংগ্রামী মানুষদেব সাথে আমলাতন্ত্রের দ্বন্দ্বকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। শ্রেণিসংগ্রামের একটা সূক্ষ্ম হাতিয়ার হয়ে ছিন্নমূল মানুষের উজ্জীবনে প্রেবণা যোগাতে পারলেই এ প্রচেষ্টা আমাদের সফল হবে।'[১৬]

খ. 'এই বাস্তবতার উল্টো পিঠেও কিন্তু একটা বাস্তবতা আছে, সেটা হল এই 'গিনিপিগ'-রা বিদ্রোহ করতে জানে। নিকারুগুয়া, কাম্পুচিয়ার দিকে তাকালে কি মনে হয় না সাম্রাজ্যবাদ যতোই সক্রিয় হোক, যতোই কিনে নিক বিশেষজ্ঞ, আমলা, সামরিক জান্তা বা বাজনীতিবিদদেব, তবু বিদ্রোহ অনিবার্য।'[১৭]

উপর্যুক্ত ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি থাকলেও মামুনুর রশীদের নাটক বিষয়ভাবনা ও উপস্থাপনাবীতিতে এক ধরনের পৌনঃপুনিকতায় আক্রান্ত— এ কথা স্বীকার করতেই হয়। তাঁর নাটকেব প্রধান যারা মানুষ, তারা নিষ্পেষিত শোষিত মানুষ, সুদভোগী মহাজন, অসৎ মোড়ল, দালাল চেয়ারম্যান, দুর্বল ও দরিদ্র মানুষকে শোষণকারী পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী চক্র। বঞ্চিত-শোষিত মানুষকে কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) কথিত একই অর্থনৈতিক অবস্থান থেকে (class in itself) অভিন্ন স্বার্থচেতনা ও রাজনৈতিক লক্ষ্য-সমন্বিত (class for it-self) রূপান্তরের[১৮] মামনুর রশীদের নাটকের সংলাপ ও পরিস্থিতি কখনো-কখনো প্রচার কিংবা শ্লোগানধর্মিতায় পর্যবসিত হয়। তবু, এ কথা অনস্বীকার্য যে, বঞ্চিত-শোষিত মানুষের শ্রেণিসংগ্রামের রূপকার হিসেবে মামুনুর রশীদের নাটক সমকালীন বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারায় সংযোজন করেছে একটি স্বতন্ত্র মাত্রা।

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ-বিরোধী নাটক রচনায় আবদুল্লাহ আল মামুনও উল্লেখযোগ্য

ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর 'শপথ' (১৯৭৮) নাটকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ছবি চিত্রিত হয়েছে। আবদুল্লাহ আল মামুনের 'সেনাপতি' (১৯৮০) নাটকেও আছে শ্রেণিসংগ্রামের ছবি। তালুকদারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের জাগরণ ও তাকে হত্যা করার মধ্যে নাট্যকারের শ্রেণি-চেতনা সুপরিস্ফুট! 'এখনও ক্রীতদাস' (১৯৮৪) নাটকে আবদুল্লাহ আল মামুন শিল্পরূপ দিয়েছেন অদৃশ্য শোষকের বিরুদ্ধে বস্তিবাসী মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের কাহিনি। 'এখনও ক্রীতদাস' নাটকে আবদুল্লাহ আল মামুন মনে করেন, কেউ-না-কেউ কোনো-না কোনো কৌশলে আমাদের জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশকে এখনও ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছে। নাটকে এই ক্রীতদাস বানানো শোষক শক্তির বিরুদ্ধে নাট্যকারের প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। নাটকের সমাপ্তিতে কাজী আবদুল মালেকের ষড়যন্ত্রে নিহত বাক্কা মিয়ার মৃত্যুর কথা বলতে নিয়ে নাট্যকারের দৃষ্টিকোণে আভাসিত হয় এই প্রগত ইঙ্গিত:

> 'আসলে কাজী আবদুল মালেকেরা কখনও মরে না। মরে বাক্কা মিয়ারা। তবু এই বাক্কামিয়ারই ভবিষ্যতের হাতে একটা স্বপ্ন রেখে যায়। স্বপ্ন প্রতিরোধের, প্রতিশোধের এবং চূড়ান্ত প্রতিবিধানের।'[১৯]

সেলিম আল দীনের একাধিক নাটকে চিত্রিত হয়েছে শোষিত-বঞ্চিত মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ছবি। তাঁর নাটকে প্রধান চরিত্র হয়ে এসেছে শ্রমজীবী আতর আলী আর করিম বাওয়ালীরা। 'করিম বাওয়ালীর শত্রু অথবা মূল মুখ দেখা' (১৯৭৩) একাঙ্কিকায় সুন্দরবনের করিম বাওয়ালী শ্রেণিচেতনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে মহাজনের বিরুদ্ধে:

> 'হাসিস না। হাসিস না। এখনও জেন্দা আছি। ....কে? মহাজন? কী চাও— সব চাও? ক্যান? তোমার দরকার, আমার দরকার নাই? আমি খামু না? আমি বাঁচমু না? ....নাহ্ ই তো মহাজন নয়। ঠিকাদার? না। আমি কারখানায় যামু না। বর্শা রাখতি দিবা হাতে? দিবা না। তয় জাহান্নামে যাও।'[২০]

সেলিম আল দীনের 'কিত্তনখোলা' (১৯৮৬) নাটকে ক্রুদ্ধ-স্পর্ধিত শোষক-চরিত্রের সঙ্গে সহজ-সরল নিরন্ন মানুষের দ্বন্দ্বের ইতিহাস চিত্রিত হয়েছে। সামাজিক শোষণের ভয়াবহতা সত্ত্বেও সংগ্রামী চেতনা নিয়ে বেঁচে থাকে 'কিত্তনখোলা'-র অবিনাশী মানুষেরা। 'প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় পূজা-উৎসবকেন্দ্রিক অলিখিত বাংলা নাটকের সম্ভাব্য আঙ্গিক রীতিতে' রচিত হয়েছে 'কিত্তনখোলা' নাটকের মহাকাব্যিক পট। সেলিম আল দীন বিশ্বাস করেন:

> 'আমি এই প্রত্যয়ে বদ্ধমূল যে হাজার বছরের বাঙলা নাটকের আঙ্গিক সাধনাতেই আমাদের জাতীয় নাট্যরীতির প্রকৃত উজ্জীবন সম্ভব। পূর্বাঞ্চলীয় জনপদের প্রাকৃত ও কর্মমুখর ভাষাতেই রচিত হবে আগামী দিনের মহানাটক।'[২১]

—এই বিশ্বাসে স্থিত থেকে সেলিম আল দীন দক্ষিণ বাংলার সংগ্রামী মানুষের জীবনসংগ্রামেব ছবি এঁকেছেন 'কিত্তনখোলা' নাটকে। এ প্রসঙ্গে নাট্যকারের অভিমত বিশেষভাবে স্মরণীয়—

> 'কিত্তনখোলার দর্শক ও নাটকবৃন্দ সহৃদয় চিত্তে নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে শিল্প-মাধ্যম হিসেবে নাটককে আমরা বিস্তৃততর তাৎপর্য দান করতে চাই। যমুনা ও বঙ্গোপসাগরের কূলে কূলে ধ্বংস ও সৃষ্টির যে লীলা— নাটকের যথার্থ আঙ্গিক তো সেখানে। রৌদ্রে নুনে রক্তে ঘামে সে জীবন হয়ে ওঠে আমাদের নাট্যবস্তু। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি। সাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের বদলে আমবা চাই আধুনিক ও সাবলীল জীবনের নবীন ভাষা। দক্ষিণে গর্জায়মান সমুদ্র। কাকে ভয়?'[২২]

জীবনের এই অভয় মন্ত্র উচ্চারণের জন্যে, 'কিত্তনখোলা' নাটকে পৌরাণিক উপাখ্যানের সঙ্গে সামাজিক রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে অন্বিত করেছেন সেলিম আল দীন। এভাবেই 'কিত্তনখোলা' হয়ে উঠেছে বাঙালির মহাজীবনের মহানাটক।

মমতাজউদ্দীন আহমদেব হাতেও নাট্যরূপ পেয়েছে বাঙালির সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ প্রতিরোধের ইতিহাস। শোষকের বিরুদ্ধে সমুত্থিত বাঙালির রুখে দাঁড়ানোব এক বিশ্বস্ত নাট্য-দলিল তাঁর 'সাত ঘাটের কানাকড়ি' (১৯৯১)। স্বৈরাচার-শাসিত অসহনীয় এক কুৎসিত সময়ের কিছু নষ্ট-চরিত্রের সঙ্গে সহজ-সরল নির্ভীক মানুষের সংগ্রাম আর সাহস আর আত্মত্যাগেব ইতিকথা 'সাতঘাটের কানাকড়ি' বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের উজ্জ্বল সম্পদ। এ নাটক সম্পর্কে আহমদ শরীফের অভিমত এখানে উদ্ধরণযোগ্য :

> 'এ নাটক অসামান্য। জ্ঞানের সঙ্গে বুদ্ধির, সাহসের সঙ্গে শক্তির, অঙ্গীকারের সঙ্গে উদ্যোগ ও আয়োজনের এমন সমাবেশ, সামগ্রিক, সামষ্টিক ও সাময়িক চালচিত্র একাধারে ও যুগপৎ আর কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'[২৩]

রাজীব হুমায়ুনের 'নীলপানিয়া' (১৯৯২) নাটকেও আছে সম্মিলিত বাঙালির প্রতিবাদ-প্রতিরোধের শব্দচিত্র। ১৯৭০-এর দক্ষিণ বাংলার জনপদ-বিনাশী জলোচ্ছ্বাস এবং ১৯৭১ সালের বাঙালি জাতির মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় বচিত হয়েছে 'নীলপানিয়া' নাটক। ঝড়-জল-জলোচ্ছ্বাস আর বহির্শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে সংঘসত্তায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ঐতিহ্যে ঋদ্ধ বাঙালি জাতি। রাজীব হুমায়ুনের 'নীলপানিয়া' প্রকৃতি ও পাশবিকতা-সৃষ্ট ওইসব বৈরী ও বিনাশী প্রতিবেশ থেকে বাঙালির অস্তিত্ব-উপলব্ধি ও উজ্জ্বল উত্তরণের এক শিল্পিত নাট্যব্যঞ্জনা। বাংলাদেশেব নাট্যধারায় আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার নৈপুণ্যের ক্ষেত্রেও 'নীলপানিয়া' নাটক বিশিষ্টতাব পরিচয়বাহী।

মানুষের জীবনসংগ্রামের পাঁচালি আর দ্রোহ-বিদ্রোহ প্রতিবাদ-প্রতিরোধের এই নাট্যধারায় আরো অনেক নাট্যকার নিজেদের নাম সংযুক্ত করেছেন। আবদুল মতিন খানের 'মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব' (১৯৮০) এবং 'সম্মেলন' (১৯৮১) নাটকদ্বয়ে ভন্ড রাজনীতিবিদ ও আমলাদের বিরুদ্ধে জনতার রুদ্ররোষ ও বিদ্রোহ রঙ্গ-ব্যঙ্গর মধ্য দিয়ে চিত্রিত হয়েছে। কবীর আনোয়ারের 'জনে জনে জনতা' (১৯৮৪) এবং 'পোস্টার' (১৯৮৬) নাটকে শ্রেণিদ্বন্দ্ব উচ্চকণ্ঠ উচ্চারণে উদ্ভাসিত। উত্তরবাংলাব বঞ্চিত-শোষিত কৃষক সমাজের জীবনযুদ্ধের ছবি গম্ভীরা গানের নিপুণ ব্যবহারে চিত্রিত হয়েছে এস.এম. সোলায়মানের 'ইঙ্গিত (১৯৮৫), 'এই দেশে এই বেশে' (১৯৮৮) ইত্যাদি নাটকে। বাংলাদেশের তরুণতর নাট্যকারদেব রচনার প্রধান প্রবণতাই হচ্ছে সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠীর এই প্রতিবাদ-প্রতিরোধকে শিল্পরূপ দান করা। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নাট্য-আন্দোলন সৃষ্টির পশ্চাতে এ-ধারার নাটকের রয়েছে ঐতিহাসিক ভূমিকা। নাটক, সীমিত পরিমণ্ডলে হলেও, এ দেশে এখন সমাজচেতনা বিকাশের অন্যতম মাধ্যম বলে স্বীকৃতি পেয়েছে।

৩.৩ ইতিহাস-ঐতিহ্য-পুরাণ পুনর্মূল্যায়নধর্মী নাটক

জাতিসত্তার উৎস ও অস্তিত্ব-অনুসন্ধানের প্রশ্নে এবং সমকালের বিপন্নতা-উত্তরণের বাসনায়, শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে, সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞা কখনো-কখনো বিচরণ করেন ইতিহাস ও ঐতিহ্যলোকে। ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধস-আক্রান্ত অবরুদ্ধ একটি জাতিকে দিকনির্দেশ করতে পারে অনাগত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের। প্রাতিস্বিক প্রতিভার স্পর্শে, এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫) যেমন বলেছেন, ইতিহাস ও ঐতিহ্য অভিব্যঞ্জিত হয় নবতর মাত্রায়; ঐতিহ্যের শরীরে ও সত্তায় সমকালের তনু-মন মিশে সৃষ্টি হয় নব-প্রতিনব ঐতিহ্য।[২৪] ১৯৭১-পববর্তী কালখণ্ডে বাংলাদেশের নাটকের একটি অন্যতম প্রবণতা হযে উঠল ইতিহাস-ঐতিহ্য-পুরাণের নব-মূল্যায়নের প্রচেষ্টা এবং এভাবেই ইতিহাস ঐতিহ্যের কঙ্কালে সমকালকে ধরণ কবতে চাইলেন আমাদের কয়েকজন নাট্যকার। এ ধারায় যাঁরা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে সৈয়দ শামসুল হক, সাঈদ আহমদ, মমতাজউদ্দীন আহমদ, সেলিম আল দীন, আবদুল মতিন খান, মামুনুর রশীদ প্রমুখ নাট্যকারের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

ইতিহাস-ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়নধর্মী নাট্যধারায় সৈয়দ শামসুল হক সঞ্চার করেন একটি প্রাতিস্বিক মাত্রা। তাঁর নাটকে যেমন নানা-কৌণিক রূপায়ণ ঘটেছে মুক্তিযুদ্ধের, তেমনি মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজ-বাস্তবতার। স্বাধীনতা-উত্তর বিপন্ন সময় থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সৈয়দ শামসুল হক দুশো বছর পুরানো ইতিহাস থেকে তুলে এনেছেন রংপুরের বীর কৃষকনেতা নূরলদীনকে। ১৭৮৩ সালের রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কৃষক-নেতা নূরলদীনের সংগ্রামের আর সাহস আর সংক্ষোভ নিয়ে গড়ে উঠেছে সৈয়দ শামসুল হকের অবিস্মরণীয় নাটক 'নূরলদীনের সারাজীবন' (১৯৮২)। নূরলদীনের ব্রিটিশ-বিরোধিতার সঙ্গে সৈয়দ শামসুল হক অসামান্য নৈপুণ্যে মিলিয়ে দিয়েছেন ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের উপনিবেশবাদ-বিরোধী মুক্তিসংগ্রামকে এবং এখানেই 'নূরলদীনের সারাজীবন' নাটকের কালোত্তীর্ণ সিদ্ধি। প্রসঙ্গত স্মরণীয় নাট্য-সমালোচক জিয়া হায়দারের অভিমত:

In 'Nural Deen' Syed Haq has taken a bigger canvas dramatizing the past. The peasant revolt in Rangpur in the sixth decade of the eighteenth century against the British and its defert In a sense 'Nural Deen' is a prelude to 'Payer Awaz' though it was written later Clearly, he wanted to show the continuity of our freedom struggle against colonialism and foreign occupation. He concludes 'Nural Deen' on a note of unfaltering promise of a continuous struggle and hope for success [২৫]

সৈয়দ শামসুল হক মনে করেন, ১৭৮৩ কী ১৯৫২ কিংবা ১৯৭১ সালের বাঙালির জাগরণ বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। বাঙালি জাতিসত্তার এই সংগ্রামী চেতনা উপস্থাপনের জন্যেই তাঁর নূরলদীন স্মরণ। রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত পয়ার ছন্দে বিন্যস্ত ব্যতিক্রমী এই কাব্যনাট্য বাংলা নাটকের ইতিহাসে সঞ্চার করেছে নতুন এক মাত্রা। 'নূরলদীনের সারাজীবন' নাটক প্রসঙ্গে সৈয়দ শামসুল হকের ভাষ্য এখানে প্রণিধানযোগ্য—

> 'নিজেকে দেয়া অনেকগুলো কাজের একটি এই যে, আমাদের মাটির নায়কদের নিয়ে নাটকের মাধ্যমে কিছু করা, নূরলদীনের সারাজীবন লিখে তার সূত্রপাত করা গেল। যে জাতি অতীত স্মরণ করে না, সে জাতি ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পাবে না। এই কাব্যনাট্যটি লিখে ফেলবার পর আমার আশা এই যে, এই মাটিতে জন্ম নিয়েছিলেন এমন যে সব গণনায়কদের আমরা ভুলে গিয়েছি তাদের আবার আমরা সম্মুখে দেখব এবং জানাব আমাদের গণআন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘদিনের ও অনেক বড় মহিমার— সবার ওপরে, উনিশশো একাত্তরের সংগ্রাম কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।'[২৬]

বাঙালি জাতিসত্তার এই সংগ্রামী চেতনা এই প্রতিবোধ বাসনা এই জীবন-মৃত্যুর বাজি রেখে আপন মৃত্তিকায় সোজা হয়ে দাঁড়াবার ধারাবাহিকতা নূরলদীনের শেষ সংলাপে উদ্ভাসিত:

> পুন্নিমার চান বড় হয় বে ধবল।
> জননীর দুগ্ধের মতন দ্যাখো রোশনাই।
> ভাবিয়া বি দেখিব, আব্বাস, যদি মরো, কোন দুঃখ নাই।
> হামার মরণ হয়, জীবনের মরণ যে নাই।
> এক যে নূরলদীন যদি চলি যায়,
> হাজার নূরলদীন আসিবে বাংলায়।
> এক যে নূরলদীন যদি মিশি যায়,
> অযুত নূরলদীন য্যান বাঁচি যায়,
> হয় হয় হয় হয়।
> এ দ্যাশে হামার বাড়ি উত্তরে না আছে হিমালয়
> উয়ার মতন খাড়া হয় য্যান মানুষেরা হয়।

এ দ্যাশে হামার বাড়ি দক্ষিণেতে বঙ্গোপসাগর,
উয়ার মতন গর্জি ওঠে যান মানুষের স্বব।
এ দ্যাশে হামার বাড়ি পূর্ব ব্রহ্মপুত্র আছে,
উয়ার মতন ফিব মানুষেব রক্ত যান নাচে।
এ দ্যাশে হামার বাড়ি পশ্চিমেতে পাহাড়িযা মাটি,
উয়ার মতন শক্ত হয় যান মানুষের খাঁটি।
হয় হয় হয় হয়।[২৭]

ঐতিহাসিক ঘটনার সমকালস্পর্শী নাট্যরূপ-সৃজনে সাঈদ আহমদের অবদানও উল্লেখযোগ্য। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার জীবন-ইতিহাস অবলম্বনে সাঈদ আহমদ লিখেছেন 'শেষ নবাব' (১৯৮৯) নাটক। সিরাজদ্দৌলার শক্তি আর সাহস আর দেশপ্রেমকে নাট্যকার সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন সমকালীন জনমানসের চিত্তে, ফলে সিরাজদ্দৌলা তাঁর হাতে উপস্থাপিত হয়েছে নতুন পরিচয়ে, নতুন সত্তায়। ইতিহাসেব জটিলতা কাটিয়ে সিরাজদ্দৌলাকে তিনি সমুত্থিত বাঙালির রূপক চরিত্র হিসেবে নির্মাণ করেছেন, ইতিহাসেব অস্থি-করোটিতে তাই সহসাই প্রতিভাসিত হয় আরেক শ্রেষ্ঠ বাঙালির অবয়ব, শেখ মুজিবর রহমান যাঁর নাম। সাঈদ আহমদের হাতে ইতিহাস এভাবেই হয়ে ওঠে সমকালস্পর্শী এবং এখানেই 'শেষ নবাব' নাটকের কালোত্তীর্ণ সার্থকতা। এ প্রসঙ্গে শামসুব বাহমানের অভিমত প্রণিধানযোগ্য :

> 'শেষ নবাবের পাণ্ডুলিপি পড়তে পড়তে বারবার আমার মান পড়েছে সমকালীন বাংলাদেশের কথা। আর সবকিছু ছাপিয়ে সিরাজদ্দৌলার অন্তরালে এক অতিকায় ছায়ার মতো জেগে রয়েছেন সেই মহানায়ক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যাঁর নাম। সৎ সাহিত্যের একটি গুণ এই যে তা কোনো বিশেষ কালে সীমাবদ্ধ থাকে না।'[২৮]

মমতাজউদ্দীন আহমদ মুক্তিসংগ্রামী স্পার্টাকাসকে রূপকের ব্যঞ্জনায় নতুন মাত্রায় উপস্থাপন করেছেন তাঁর 'স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা' (১৯৭৬) নাটকে। ক্রীতদাসদের বীর নেতা স্পার্টাকাসকে নাট্য বিষয় করে মমতাজউদ্দীন আহমদ তুলে ধরেছেন তাঁর প্রগত সমাজচেতনার পরিচয়। স্পার্টাকাস, লুলুম্বা, ল্যাটিন আমেরিকা, ভিয়েতনাম, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে এ নাটকে মমতাজউদ্দীন আহমদ ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়নে একটি নতুন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন। লুলুম্বার একটি সংলাপে এ নাটকের মৌল প্রত্যয় অভিব্যঞ্জিত :

> 'আমার সাধ ছিল কবি হবো, আমার কালো অন্ধকার মানুষগুলোর অসহায় কান্না আমাকে পাগল করে দিল। কবিতার কলম ফেলে দিয়ে আমি স্বাধীনতার কথা বললাম। বাঁচার কথা বললাম। মানুষের জড়ত্বকে জাগ্রত করলাম। এই কি আমার অপরাধ?'[২৯]

বাংলা নাটকের পথিকৃৎ শিল্পী গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফেব কীর্তিময় জীবন অবলম্বনে ব্যতিক্রমধর্মী এক নাটক লিখেছেন মামুনুর রশীদ। তাঁর 'লেবেদেফ' (১৯৯৫) নাটক বিষয় গৌরবে অনন্য ও অভিনব। দুশো বছর পূর্বে, ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর, 'লেবেদেফ' নাটকে মামুনুর রশীদ লেবেদেফের বাংলা ভাষা প্রীতি, তাঁর সৃষ্টিশীলতা নতুন ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেছেন।

ইতিহাস এবং পুরাণের নাট্যরূপ-নির্মাণে বাংলাদেশের নাটকে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন সেলিম আল দীন। দিল্লির সম্রাট মাহমুদ-বিন তুঘলকের জীবন-কাহিনি নিয়ে তিনি রচনা করেছেন 'অনিকেত অন্বেষণ' (১৯৭৩) নাটক। বাংলা ঐতিহাসিক নাট্যধারায় 'অনিকেত অন্বেষণ' বিষয় ও প্রকারণে দাবি করতে পারে স্বতন্ত্র আসন। ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে সেলিম আল দীন এখানে সঞ্চারিত করেছেন আধুনিক জীবনবেদ, আধুনিক মানুষের অনন্বয়চেতনা। তবে এ ধারায় সেলিম আল দীনের উজ্জ্বল সৃষ্টি 'শকুন্তলা' (১৯৭৬) নাটক। কেবল নাট্যগুণ আর সংলাপের স্বাতন্ত্র্যেব

জন্যে নয়, পৌরাণিক কাহিনির সমকালস্পর্শী আধুনিক ব্যাখ্যার জন্যেই 'শকুন্তলা' বাংলা নাটকের ধারায় এক দীপ্র নির্মাণ। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ-পটভূমির কাঠামোতে ইউজিন ও' নীল (১৮৮৮-১৯৫৩) যেমন গ্রিক মিথের পুনর্নির্মাণ করেন 'Mourning Becomes Electra' (১৯৩১) নাটকে, সমকালকে প্রকাশ করার আন্তর-আকাঙ্ক্ষায় মুনীর চৌধুরী যেমন ভেঙে দেন রামায়ণ মিথ তাঁর 'দণ্ডকারণ্য' (১৯৬৬) নাটকে, তেমনি আধুনিক নারীচেতনা প্রকাশের আত্যন্তিক বাসনায় সেলিম আল দীন শকুন্তলার পুরাণে আনেন আধুনিক মানববেদ, বিশ শতকীয় নারীভাবনা। প্রকরণশৈলীর অভিনবত্বে ব্যতিক্রমী বিষয় আশ্রয়ী 'শকুন্তলা' বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের এক সাহসী-নির্মাণ। এই নাটকের অস্থিতে প্রবহমান আছে মিথ, শোণিতে সমকাল। তাই পুরাণের ষড়যন্ত্র-আচ্ছন্ন মেনকা আর বিশ্বামিত্রের অবৈধ সন্তান শকুন্তলার সংলাপে উঠে আসে সমকালীন নারীর সংক্ষোভ সংবেদ-সংদাহ :

> 'হায় মানুষী, শীতে চামড়া তোমার কুঁকড়ে যায়, গ্রীষ্মে যায় ঝলসে। মেনকার উজ্জ্বল আভা জ্বলে চোখে, স্বর্ণচাঁপার গন্ধ নিয়ে আমি কী করুণ জ্বলছি। জ্বলে জ্বলে কেবলি জ্বলছি। ....নীল অভ্রের পাখা চাই, সুগন্ধি শিশির হতে চাই। ধূপ জ্বালো, ধূপ জ্বালো। যা, যা, অনেক দূরে নীলিমার দিকে চলে যা। পূর্ণিমার হরিদ্রা আলোতে পথ চিনে যা, চৈত্য সিঁড়ি! যেখানে মা আমার, সুগন্ধি লবঙ্গবল্লরী। চির সুস্মিতা। আমার কষ্টের কথা, শোণিত ক্ষরণের গন্ধ, নিয়ে যা।'[৩০]

ইতিহাস-ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়নধর্মী ধারায় নাটক করেছেন আবদুল মতিন খান। তাঁর 'গিলগামেশ' (১৯৮২) নাটক এশিয়া-মাইনরের ঐতিহ্যিক গিলগামেশের সংগ্রাম আর স্বপ্ন নিয়ে রচিত। গিলগামেশের সংগ্রাম আর স্বপ্নের সঙ্গে নাট্যকার একাত্ম করে দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাঙালির স্বপ্ন আর সংগ্রামকে।

ইতিহাস-ঐতিহ্য-পুরাণের নাট্য রূপায়ণে প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের নাট্যধারার সঙ্গে স্বাধীনতা-উত্তর নাটকের মধ্যে একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ১৯৭১-পূর্ববর্তী নাটক ছিল ইতিহাস-ঐতিহ্যের পুনর্লিখন মাত্র; সমকালবিবিক্তি ও সম্প্রদায়চেতনা-আচ্ছন্নতা ছিল তার সাধারণ লক্ষণ। এ পর্বের প্রায় সব ঐতিহাসিক নাটকই একটা বিশেষ টাইপে পর্যবসিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য— 'বিষয়গত দিক দিকে আমাদের ঐতিহাসিক নাটকের সংখ্যাধিক্য এবং তথাকথিত সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রেও অনেক নাট্যকারই স্টক সিচুয়েশন ও স্টক চরিত্রেব উপর বড় বেশি নির্ভরশীল।'[৩১] কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তরকাল এ ধারার নাটকে এলো মৌলিক পরিবর্তন। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে ইতিহাস-পুরাণ-ঐতিহ্য-আশ্রিত নাটকে সমকালীন চিন্তা ও যুগ-প্রবণতা জৈব-ঐক্য সূত্রে হয়েছে সংগ্রথিত।

৩.৪. সামাজিক নাটক

স্বাধীনতা-উত্তরকাল সমাজের অবক্ষয়, মূল্যবোধের বিচ্যুতি আর মুক্তিযোদ্ধাদের বিপথগামিতা নিয়ে বচিত হয়েছে অনেক নাটক। এ ধারার উল্লেখযোগ্য নাটক রচনা কবেছেন আবদুল্লাহ আল মামুন। এ ছাড়া অন্য যেসব নাট্যকাব সামাজিক নাট্য রচনায় বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন সৈয়দ শামসুল হক, মমতাজউদ্দীন আহমদ, বশীর আল হেলাল (১৯৩৬-) বুলবন ওসমান, (১৯৪০-), রশীদ হায়দার (১৯৪১-), আতিকুল হক চৌধুবী, সেলিম আল দীন, হুমায়ুন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন, এস. এম. আকবাম আলী প্রমুখ। এঁদের সম্মিলিত সাধনায় বাংলাদেশের সামাজিক নাট্যধারা সমৃদ্ধ হয়েছে, সন্দেহ নেই।

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতাকে অবলম্বন কবে বচিত হয়েছে আবদুল্লাহ আল

মামুনের নাট্যভুবন। আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিংবা বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের দিকে আবদুল্লাহ আল মামুন তাঁর ততটা মনোযোগ দেন না, যতটা দেন একটি সরল বিষয়বস্তুর হাস্য-কৌতুকময় নাট্য-রূপায়ণ। এ ধারার তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো হচ্ছে— 'সুবচন নির্বাসনে (১৯৭৪), 'এখন দুঃসময়' (১৯৭৫), 'এবার ধরা দাও' (১৯৭৭), 'আয়নায় বন্ধুর মুখ' (১৯৮৩), 'চারদিকে যুদ্ধ' (১৯৮৩), 'তোমরাই' (১৯৮৯), 'কোকিলারা' (১৯৯০), 'আমাদের সন্তানেরা' (১৯৮৯), ইত্যাদি। মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালে সর্বব্যাপ্ত হতাশা, প্রত্যয় ও প্রমূল্যের অবক্ষয় এবং সামাজিক বৈনাশিকতার পটে রচিত হয়েছে 'সুবচন নির্বাসনে' নাটক। ১৯৭৫ সালের বন্যা-কবলিত বাংলাদেশের গ্রাম-জীবনকে নিয়ে রচিত হয়েছে আবদুল্লাহ আল মামুনের 'এখন দুঃসময়'। যুদ্ধোত্তরকালে যুবসমাজের হতাশা এবং বিপথগামিতা নিয়ে তিনি লিখেছেন তিনটি নাটক— 'তোমরাই', 'এবার ধরা দাও' এবং 'আয়নায় বন্ধুর মুখ'। মুক্তিযুদ্ধোত্তর যুবসমাজের বিপর্যয়ের ছবিটি পৌনঃপুনিকভাবে ঘুরে-ফিরে আসে আবদুল্লাহ আল মামুনের রচনায়,। এই সব নাটকে একটি সদর্থক ইতিবাচক মূল্যবোধ সঞ্চারিত করে তরুণ সমাজকে নতুন করে জাগ্রত করতে চেয়েছেন আবদুল্লাহ আল মামুন। যেমন 'এবার ধরা দাও' এবং 'আয়নায় বন্ধুর মুখ' নাটকদ্বয়েব অন্তিম দুটো সংলাপ :

ক. আমি করজোড়ে মিনতি করছি, আপনারা আমাকে একটি সৎ পরামর্শ দিন। আমি ভালো থাকতে চাই। আপনারা আমাকে বাঁচান। আপনাদের একটা জেনারেশন নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। আপনারা কি তাকে হারিয়ে যেতে দেবেন? ধ্বংস হতে দেবেন? এই জেনারেশন যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে ধ্বংসের হাত থেকে আপনারাও বাঁচবেন না। তাই বলছি, আমাকে পথ নির্দেশ করুন। আপনারা আমাকে একটি সৎ পরামর্শ দিন।[৩২]

খ. কী করে পালাবো বল? এত বছর যে পথ ধরে রাবেয়া এসেছে, তুই এসেছিস, সেই পথে পলাতকের পদচিহ্ন আমি আর রাখতে চাই না। গত বছরগুলোতে জীবন থেকে পালিয়ে আমি তো কিছুই পাই নি। শুধু পাপের পেয়ালা পূর্ণ করেছি। ....আমার জীবনটাও যদি তোমাদের মত হতো! কোনোদিন হবে কি?[৩৩]

—তরুণ কিংবা রানার সংলাপে, এখানে অন্ধকার থেকে মুক্তির জন্যে আত্যন্তিক আকুতির কথা অভিব্যক্ত। আঙ্গিক-নিরীক্ষায় অভিনব আবদুল্লাহ আল মামুনের 'কোকিলারা' (১৯৯০) নাটক। এ নাটকে আমাদের সমাজে নারীর ত্রিমাত্রিক রূপ শিল্পমূর্তি লাভ করেছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় নাট্যকারেব অভিমত 'কোকিলা। এক নারী। এক জীবন। একক অভিনয়। সাধারণ, খুব সাধারণ এবং অসাধারণ, এই তিন পর্যায়ে কোকিলা দর্শকদের কাছে ধরা দেবে।"[৩৪] পুরুষশাসিত সমাজে নারীর সামগ্রিক অবস্থান মূল্যায়িত হয়েছে এক চরিত্রের এই নাটকে। কোকিলা, তিন সত্তায় পূর্ণাঙ্গ এক নারী-শক্তি পুরুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছে তীব্র এই ক্ষোভ— 'তদ্দিনে আমার বোজা সারা, এই দুনিয়াটা আল্লায় বানাইছে কেবল পুরুষ গো লিগা। এইহানে মাইয়া মানুষের বাঁচানের পথ নাই,। এই দুনিয়া পুরুষের বাচ্চার ফুর্তির জায়গা। দেশেও হেগো ফুর্তি। বিদেশেও। তাই ঠিক করলাম, বাঁচুম না। এই দুনিয়ায় বাঁইচ্যা থাকলে আমার জিন্দিগিতে আরও পুরুষ আসবো। আমাবে বেশ্যা বানাইয়া ছাইরা দিব। তারথন বালো মইরা খোদার কাছে গিয়া বিচার চাই। ....বিদাশ কারে কয় আমি জানি না। খালি এদ্দুর জানি বিদাশ অনেক দূরের পথ। সেই খানে যাওনের সাধ্য আমার নাই। আপনের সন্তানেরে বাঁচানির অনেক চেষ্টা আমি করছি। আপনে আমারে ক্যান ঠকাইলেন সেই প্রশ্ন আমি আপনেরে করুম না। কেয়ামতের দিন আল্লারে জিগামু।"[৩৫]

সৈয়দ শমসুল হকের একাধিক নাটকে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশেব সমাজজীবনের নানা অনুষঙ্গ রূপায়িত হয়েছে। তাঁর 'এখানে এখন' (১৯৮৮) নাটকেব বিষয়বস্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে

বাংলাদেশের উঠতি বুর্জোয়া শ্রেণির লালসা, ষড়যন্ত্র ও স্বার্থপরতা এবং সাধারণ মানুষ ও দেশের প্রতি তাদের অমানবিক আচরণ ও মনোভাবের নাট্যব্যঞ্জনা সৈয়দ শামসুল হকের 'এখানে এখন' নাটক।[৩৬] কাব্যনাট্যের অন্যতম চরিত্র শাদা বেশধারীর সংলাপে 'এখানে এখন' নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় অভিব্যক্ত, উন্মোচিত বাংলাদেশের সামূহিক দুরবস্থা :

ছিয়ান্ন হাজার বর্গ মাইলের মতো এ বিশাল
মানচিত্রে নদীগুলো লাল রঙে এঁকে দিয়ে গেছে....
জননী ও জন্মভূমি মরা গাঙে ভেলা ভাসিয়েছে,
অবেলায় সে ভেলায় তার কোটি ছেলে শুয়ে আছে
শিয়রে জননী জাগে, লাশ ভেসে যায় ইতিহাসে।[৩৭]

১৯৭১-পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতির অঙ্গনে অস্থিরতা ও অনিয়ম, আমলাতান্ত্রিক অব্যবস্থা, সার্বিক অবক্ষয়, মধ্যবিত্তের জীবনসংগ্রামের সর্বব্যাপী হতাশা ইত্যাদি নিয়ে অনেক নাটক রচিত হয়েছে। এ ধারায় রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম— মমতাজউদ্‌দীন আহমদের 'ফলাফল নিম্নচাপ' (১৯৭৬), 'ক্ষত-বিক্ষত' (১৯৮৬), বশীর আল হেলালের 'স্বর্গের সিঁড়ি' (১৯৭৭)'সেলিম আল দীনের 'মুনতাসীর ফ্যান্টাসী' (১৯৮৬), 'সংবাদ কার্টুন' (১৯৮৭), রশীদ হায়দারের 'তৈল সংকট' (১৯৭৪), বুলবন ওসমানের 'পাণ্ডুলিপির আড়ত' (১৯৭৩), আতিকুল হক চৌধুরীর 'দূরবীন দিয়ে দেখুন' (১৯৮৬) গোলাপ আম্বিয়া নূরীর 'কুমারখালির চর' (১৯৭৮), শেখ আকরাম আলীর 'লাশ ৭৪'(১৯৭৪), ফরহাদ মালহারের 'প্রজাপতির লীলালাস্য' (১৯৭৫), 'ঘাতক দেশকাল' (১৯৭৬) ইত্যাদি। এ সব নাটকে সমকালীন বাংলাদেশ, বাংলাদেশের সমাজ-জীবনের নানা ছবি উদ্ভাসিত হয়ে আছে।

৩.৫. অনুবাদ নাটক : রূপান্তরিত নাটক

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের অন্যতম প্রবণতা বিদেশি নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তরকরণ। স্বাধীনতার পূর্বেও এ ধারায় এসেছে নতুন প্রাণ। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে বিদেশি নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তরে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন মুনীর চৌধুরী। শেক্সপিয়র, টেনেসি উইলিয়ামস, বার্নার্ড শ', গলসওয়ার্দি, স্ট্রিন্ডবার্গ প্রমুখ নাট্যকারের রচনা অনুবাদে মুনীর চৌধুরী সবিশেষ সার্থকতা অর্জন করেন। মুনীর চৌধুরী ছাড়া ১৯৭১-এর পূর্ববর্তীকালে যাঁরা নাট্য-অনুবাদ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন জিয়া হায়দার, মমতাজউদ্দীন আহমেদ, কবীর চৌধুরী, শওকত ওসমান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবদুল হক, আবদার রশীদ, সৈয়দ আলী আহসান, ফতেহ লোহানী প্রমুখ। ১৯৭১-পরবর্তীকালে এঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণে বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে অনুবাদ ও রূপান্তরিত নাটকে নতুন সমৃদ্ধি এলো।

১৯৭১-১৯৯৫ কালপর্বে বেকেট, ইয়োনেস্কো, ব্রেখট, সার্ত্র, কাম্যু, অ্যালবি, মলিয়েব, মোলনার, শেক্‌স্‌পিয়র প্রমুখ নাট্যকারের নাটক অনূদিত কিংবা রূপান্তরিত হয়েছে। এই অনুবাদ ও রূপান্তর বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের সমৃদ্ধিতে দূরসঞ্চারী ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীন দেশের নতুন চিন্তা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই অনূদিত রূপান্তরিত হয়েছে এ সব নাটক। এই অনুবাদ ও রূপান্তরিত নাটকের ধারায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সৈয়দ শামসুল হকের 'গণনায়ক' (১৯৭৬; মূল নাটক উইলিয়ম শেক্সপিয়রের 'জুলিয়াস সিজার'), কবীর চৌধুরীর 'গডোর প্রতীক্ষায়' (১৯৮১; মূল নাটক বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গডো'), মমতাজউদ্দীন আহমদের 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' (১৯৭৬; মূল নাটক লেডি গ্রেগরির 'রাইজিং অব দি মুন'), 'যামিনীর শেষ সংলাপ'

(১৯৭৭; মূল নাটক চেকভের 'দি সোয়ান সঙ'), আলী যাকেরের 'বিদগ্ধ রমণীকুল'। (১৯৭৪; মূল নাটক মলিয়েরের 'ইনটেলেকচুয়াল উইমেন'), 'সৎ মানুষের খোঁজে' (১৯৭৫; মূল নাটক ব্রেখটের 'দি গুড ওম্যান অব সেটজুয়ান'); জিয়া হায়দার-আতাউর রহমানের 'প্রজাপতি নির্বন্ধ' (১৯৭৩; মূল নাটক গোগোলের 'দি ম্যারেজ'), জিয়া হায়দারের 'ডক্টর ফস্টাস', (১৯৮১; মূল নাটক ক্রিস্টোফার মার্লোর 'দ্য ট্র্যাজিকাল হিস্টরি অব ডক্টর ফস্টাস'); আসাদুজ্জামান নূরের 'দেওয়ান গাজীর কিসসা' (১৯৭৪; মূল নাটক ব্রেখটের 'হের পুন্টিলা অ্যান্ড হিজ ম্যান মাট্টি'), মহিদুল ইসলামের 'চিড়িয়াখানা' (১৯৮৭; মূল নাটক অ্যালবির 'দি জু স্টোরি'), খোন্দকার আশরাফ হোসেনের 'রাজা ঈদিপাস' (১৯৮৬; মূল নাটক সফোক্লিসের 'কিং ঈদিপাস'), ইত্যাদি।[৩৮] মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ে জাগ্রত বাঙালির স্বাধীনতাচেতনার আন্তরপ্রেরণায় এ সব নাটক অনূদিত-রূপান্তরিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ শামসুল হকের 'গণনায়ক' নাটক সম্পর্কে জিয়া হায়দারের অভিমত স্মরণীয় :

> সৈয়দ হকের 'গণনায়ক' নাটকটির কথাও বলতে হয়ে, বিশেষত এর বিষয়বস্তুর জন্যে। শেক্সপীয়ারের 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের অনুপ্রেরণায় লিখিত এই নাটকে জুলিয়াস সিজার এবং শেখ মুজিবর রহমানের হত্যাকাণ্ডের মধ্যে একটা সাদৃশ্য অঙ্কন করা হয়। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এবং কাব্যময়তার সূতায় গাঁথা হয়েছে শেখ মুজিবের করুণ পরিণতি এবং পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দ্বারা প্ররোচিত তার হত্যাকারীদের উদ্দেশ্যাবলী।[৩৯]

৪. বাংলাদেশের নাটক : আঙ্গিক বিবেচনা

বিষয়বস্তুর মতো আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও, স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে আমরা মৌল পরিবর্তন লক্ষ করি। ১৯৭১-১৯৯৫ পর্বের নাট্যকাররা পূর্ববর্তী যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি আঙ্গিক-সচেতন সংলাপ-নির্মিতি, আঞ্চলিক শব্দের কুশলী প্রয়োগ, বিশেষ নাট্যমুহূর্ত নির্মাণ আঙ্গিকগত এ সব বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি যে বৈশিষ্ট্যটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য তা হল এ সময়ে এসেই বাংলাদেশের নাটক তথা বাংলা নাটক তার হাজার বছরের ঐতিহ্যের সঙ্গে সত্তাগত ঐক্যসূত্রটির সন্ধান পেয়ে গেল। বাংলা নাটকের উদ্ভব পাশ্চাত্য নাটক থেকে নয়, বরং হাজার বছর পূর্ব থেকেই জারি-সারি-পালাগান মঙ্গলকাব্য-পাঁচালি-গম্ভীরা— এ সব দেশজ ঐতিহ্য থেকে কালক্রমে বাংলা নাটকের জন্ম[৪০] এই বিশ্বাস নাট্যকারদের নতুন ফর্ম নিরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছে। আমাদের বিবেচনায়, এই নতুন আঙ্গিক-সাধনাই ১৯৭১-পরবর্তী বাংলাদেশের নাটকের মৌল অর্জন।

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের নাটকে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে কাব্যনাট্য রচনার একটা প্রবণতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ ধারায় যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তাঁদের মধ্যে আছেন সৈয়দ শামসুল হক, মমতাজউদ্দীন আহমদ, সেলিম আল দীনের অর্জন বিশেষ স্মরণীয়। সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'নূরলদীনের সারাজীবন', 'এখানে এখন', 'গণনায়ক', 'ঈর্ষা', (১৯৯১) প্রভৃতি কাব্যনাটক সমগ্র বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় সৃষ্টি। কাব্যনাট্য রচনায় সৈয়দ শামসুল হকের সাফল্য বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের এক গর্বিত প্রান্তর। সৈয়দ শামসুল হক মনে করেন, কাব্যনাট্যের আঙ্গিকেই রচিত হতে পারে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ মহানাটক। এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত স্মরণীয় :

> 'কাব্যনাট্যই শেষ পর্যন্ত আমার করোটিতে জয়ী হয়, টি.এস.এলিয়টের কাব্যনাট্যভাবনা আমাকে ক্রয় করে, আমি লক্ষ্য না করে পারি না যে আমাদের মাটি নাট্যবুদ্ধিতে কাব্য এবং সঙ্গীতই হচ্ছে নাটকের স্বাভাবিক আশ্রয়; আরো লক্ষ্য

> করি আমাদের শ্রমজীবী মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাই হচ্ছে এক ধরনের কবিতাশ্রয়ী উপমা, চিত্রকল্প, রূপকল্প উচ্চারণ করা— আমাদের রাজনৈতিক স্লোগানগুলো তো সম্পূর্ণভাবে ছন্দ ও মিলনির্ভর; লক্ষ করি, আমাদের সাধারণ প্রতিভা এই যে আমরা একটি ভাব প্রকাশের জন্যে একই সঙ্গে একাধিক উপমা বা রূপকল্প ব্যবহার না করে তৃপ্ত হই না, ময়মনসিংহ গীতিকা যা বহুদিন থেকেই আমি নাটকের পাণ্ডুলিপি বলে সনাক্ত করে এসেছি, আমাকে অনুপ্রাণিত করে....।'[৪১]

কাব্যনাট্যের আঙ্গিকে নাটক রচনা করে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন সেলিম আল দীন। তাঁর 'কিত্তনখোলা' নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে কাব্যনাট্যের আঙ্গিক। 'কিত্তনখোলা'য় লোকজ ও কাব্যিক উপাদানগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, যা নাটকটিকে করে তুলেছে কাব্যনাট্যগুণসম্পন্ন। এস.এম.সোলায়মানের 'এই দেশে এই বেশে', মমতাজউদ্দীন আহমদের 'রাজা অনুস্বারের পালা' (১৯৮৭) ইত্যাদি নাটকেও কাব্যনাট্যের আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাক্ষর বর্তমান। 'এই দেশে এই বেশে' নাটকে উত্তরবাংলার গম্ভীরা গানের সংলাপনির্ভরতা এবং 'রাজা অনুস্বারের পালা'-য় ময়মনসিংহগীতিকার রূপকল্প ব্যবহারে স্মরণীয় সাফল্যের পরিচয় উপস্থিত।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নাটকে লোকনাট্যের আঙ্গিক ব্যবহারেও বিশেষ প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। লোকনাট্যের অন্যতম উপাদান নৃত্য ও সংগীতের কুশলী ব্যবহার ঘটেছে এ পর্বের বাংলাদেশের নাটকে। লোক-উপাদান এবং লোকজ বিশ্বাস, যা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের 'সম্ভাব্য নাটকের অন্যতম উপাদান', বাংলাদেশের নাটকে নতুন মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশের কয়েকজন নাট্যকার মঙ্গলকাব্য, পালাগান, কৃষ্ণলীলা, জারিগান, কবির লড়াই, পুতুল নাচ প্রভৃতি ঐতিহ্য থেকে লোকনাট্য রচনার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। স্বাধীনতা-উত্তরকালে এ ধারায় উল্লেখযোগ্য নাটক রচনা করেছেন সৈয়দ শামসুল হক, সেলিম আল দীন, মামুনুর রশীদ, মমতজউদ্দীন আহমদ, আবদুল্লাহ আল মামুন, এস.এম.সোলায়মান, আবদুল্লাহ হেল মাহমুদ, মান্নান হীরা, সাজেদুল আওয়াল, সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক, সালাম সাকলাইন প্রমুখ নাট্যকার। এ ধারায় উল্লেখযোগ্য নাটক হল সৈয়দ শামসুল হকের 'নূরলদীনের সারাজীবন', সেলিম আল দীনের 'কিত্তনখোলা', 'কেরামতমঙ্গল', 'হাত হদাই', 'চাকা' প্রভৃতি। এ সব নাটকে বাঙালির লোকজীবনের ছবি সুপরিস্ফুট। লোকনাট্যের সাঙ্গীতিক রীতির অমিত সম্ভাবনাকে সৈয়দ শামসুল হক ব্যবহার করেছেন 'নূরলদীনের সারাজীবন' নাটকে। লোকনাট্যের নৃত্যাশ্রয়ী গীতল ভাষার আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে সেলিম আল দীনের 'কিত্তনখোলা' নাটক। 'কিত্তনখোলা' লোকনাট্য-আঙ্গিকের বর্ণনাত্মক রীতিতে রচিত। তাঁর 'কেরামতমঙ্গল' নাটকে সপ্ত দোজখের লৌকিক বিশ্বাস ও মানবজন্মের সহস্র বিনষ্টি শিল্পরূপ পেয়েছে। 'হাতহদাই' নাটকে আরব্য রজনীর গল্পের মৃত্যুঞ্জয়ী গল্পরীতির সঙ্গে সুফিতত্ত্বের দেহবাদী প্রাচ্যরূপ বিধৃত হয়েছে।[৪২] লোকনাট্যের চিরায়ত বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে বাংলাদেশের নাট্যকাররা আলোচ্য পর্বে বাংলা নাটকে সংযোজন করেছেন একটি প্রাতিস্বিক মাত্রা।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের সাহিত্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য নাট্য-আঙ্গিক পথনাটক। পথনাটকগুলোর পথের ধারে উন্মুক্ত মঞ্চে স্বল্প-আয়োজনে অভিনীত হয়। এ সব নাটকের মাধ্যমে আমাদের নাট্যকাররা জনগণের চেতনা বিকাশের চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় সেলিম আল দীনের অভিমত— 'জনগণের স্নায়ুতন্ত্রীতে আগুন জ্বালাবার দায়িত্ব এ দেশের পথনাটক যে আন্তরিকতার সঙ্গে নির্বাহ করছে তার কোনো সমকালীন তুলনা পৃথিবীর কোনো দেশে আছে কিনা সন্দেহ। পথনাটকের মধ্যে বাংলা লোকনাট্যের বিস্তৃততর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ আঙ্গিকের সমাবেশ ঘটেছে।'[৪৩] বাংলাদেশের নাট্যধারার উল্লেখযোগ্য পথনাটকগুলো হচ্ছে আবদুল্লাহ আল মামুনের 'তিনটি পথনাটক' (১৯৯১), 'আন্দু ও অভিষেক' (১৯৯১); নাসিরউদ্দীন ইউসুফের 'একাত্তরের পালা' (১৯৯০); মান্নান হীরার 'মৃগনাভি'

(১৯৯১), 'শেকল' (১৯৯১), 'আদাব' (১৯৯১), 'ঘুমের মানুষ' (১৯৯২) প্রভৃতি। এই পথনাটকগুলো বাংলাদেশের নাটকেব ধারায় সংযোজন করেছে একটি প্রাতিস্বিক মাত্রা।

উপর্যুক্ত নাট্য-আঙ্গিক ছাড়া ঐতিহ্যিক পথে, আলোচ্য কালখণ্ডে নাটক রচিত হয়েছে, কখনো বা অ্যাবসার্ড কিংবা অভিব্যক্তি পথে লেখা হয়েছে নাটক। সাঈদ আহমদের 'প্রতিদিন একদিন', সেলিম আল দীনেব 'সর্প-বিষযক গল্প' (১৯৭৩) প্রভৃতি নাটকে অ্যাবসার্ড আঙ্গিক ব্যবহৃত হয়েছে। অ্যাবসার্ড আঙ্গিকের মাধ্যমে তাঁরা আধুনিক জীবনের সর্বব্যাপী শূন্যতা ও নৈরাশ্যকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। আধুনিক মানবচৈতন্যের শূন্যতা ও অস্তিত্ব-অভিশঙ্কা উপস্থাপনের মানসেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে পাশ্চাত্যে অ্যাবসার্ড নাটকের সূত্রপাত।[১২] স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশের সামূহিক অব্যবস্থা, অসঙ্গতি আর অবক্ষয় উপস্থাপনের জন্যে আমাদের নাট্যকাবরা গ্রহণ করলেন অ্যাবসার্ড নাট্যআঙ্গিক। আলোচ্য পর্বেই বাংলাদেশের নাট্যধারায় যুক্ত হয়েছে এপিক থিয়েটার, ছন্দোনাটক, কথানাট্য, মুক্তনাটক ইত্যাদি নামের নাট্য-আঙ্গিকসমূহ। আমাদেব তরুণ নাট্যকারদের হাতে এ সব ধারা এখন ব্যাপকভাবে অনুসৃত হচ্ছে।

৫. উপসংহার

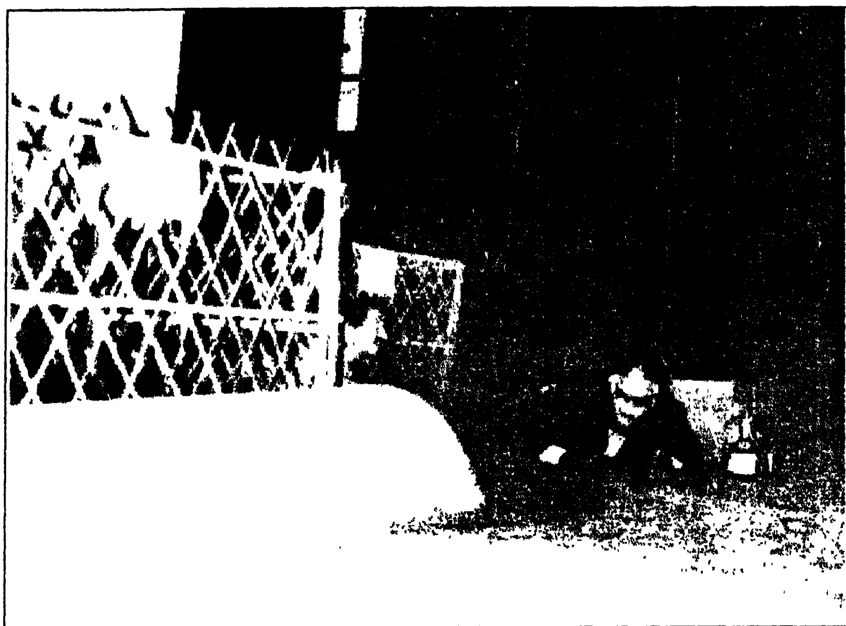
পঁচিশ বছর, সাহিত্যধারাব নির্মাণের প্রক্রিয়ায়, খুব একটা বেশি সময় নয। তবু, এ সময়েই বাংলাদেশের নাট্যধারার মৌলিক অর্জন প্রশংসনীয় ও প্রাতিস্বিক— সন্দেহ নেই। উপর্যুক্ত আলোচনায় বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যের এই প্রাতিস্বিকতায আমরা সন্ধান করাব চেষ্টা করেছি। আমরা সতর্কতার সঙ্গে, শিরোনাম দাবি করে না বলে, আলোচনায় অনুক্ত রেখেছি বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনেব ইতিহাস। জীবন থেকে নির্যাস সংগ্রহ করে, বাংলাদেশের নাটক আরো গৌববিত অহঙ্কাবকে অঙ্গীকার করুক, অঙ্গীকাব করুক দেশজ ঐতিহ্যেব বিশাল ভাণ্ডারকে, রচিত হোক আমাদের জাতিসত্তার মহানাটক— এই-ই আমাদের দীপ্র প্রত্যাশা।

তথ্যসঙ্কেত

১. মমতাজউদ্দীন আহমদ 'বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নাট্যচর্চার ইতিবৃত্ত', রামেন্দু মজুমদার (সম্পাদক), বাংলাদেশের নাট্যচর্চা (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৬) শীর্ষক গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ, পৃ. ১২৬।
২. আনিসুজ্জামান, 'কবব', বাংলাদেশেব নাট্যচর্চা, পূর্বোক্ত. পৃ. ১০৫।
৩. সাঈদ আহমদের 'কালবেলা', 'মাইলপোস্ট' এবং 'তৃষ্ণায়' নাটক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে, কিন্তু তিনটি নাটকই স্বাধীনতার পূর্বে বচিত ও মঞ্চায়িত হয়। তাই আমরা উপযুক্ত নাট্যত্রয়কে ১৯৭১-পূর্ববর্তী নাট্যধারার অন্তর্গত করেছি।
৪. বিস্তৃত বিবরণেব জন্যে দ্রষ্টব্য . সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধাবা (ঢাকা · বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮)।
৫. রামেন্দু মজুমদার, বিষয় : নাটক (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৭), পৃ. ৭৮।
৬. বিস্তৃত তথ্যের জন্যে দ্রষ্টব্য : মমতাজউদ্দীন আহমদ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১, পৃ. ১২৮-২৯।
৭. মমতাজউদ্দীন আহমদ, বিবাহ ও কি চাহ শঙ্খচিল (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), দ্র. ভূমিকাংশ।
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১।
৯. সৈয়দ শামসুল হক, পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, কাব্যনাট্য সংগ্রহ (ঢাকা : বিদ্যাপ্রকাশ, ১৯৯১), পৃ. ৫৫।
১০. উদ্ধৃত : আলী যাকের, 'স্বাধীনতা যুদ্ধ ও আমাদের নাটক', বাংলাদেশের নাট্যচর্চা, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১, পৃ. ১৫৯।
১১. মামুনুর রশীদ, এখানে নোঙর (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৪), দ্র. ভূমিকাংশ।
১২. নাজমা জেসমিন চৌধুরী, "স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর : বিষয় ও প্রকরণ— প্রসঙ্গ", একুশের প্রবন্ধ-১৯৮৮ (ঢাকা · বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ৬২।

১৩. মামুনুর রশীদ, এখানে নোঙর, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ১১, পৃ. ৭১।
১৪. মামুনুর রশীদ, ওরা কদম আলী (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৮), পৃ. ৮১।
১৫. মামুনুর রশীদ, ওরা আছে বলেই (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮০), পৃ. ৬৭।
১৬. মামুনুর রশীদ, পূর্বোক্ত, দ্র. ভূমিকাংশ।
১৭. মামুনুর রশীদ, গিনিপিগ (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৬), দ্র. ভূমিকাংশ।
১৮. মার্ক্স বর্ণিত 'Class in itself' এবং 'Class for itself' প্রত্যয় দু'টির জন্যে দ্রষ্টব্য— Tom Bottomore et al (ed.), A Dictionary of Marxitst Thought (Oxford : Blackwell Reference, 1988), P. 76
১৯. আবদুল্লাহ আল মামুন, এখনও ক্রীতদাস (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৪), পৃ. ৬৮।
২০. সেলিম আল দীন, সর্প-বিষয়ক গল্প ও অন্যান্য নাটক (ঢাকা : রহমান প্রকাশনী, ১৯৭৩), পৃ. ৭৪।
২১. সেলিম আল দীন, কিত্তনখোলা, তিনটি মঞ্চনাটক (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬), দ্র. ভূমিকাংশ।
২২. সেলিম আল দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪।
২৩. আহমদ শরীফের এই মন্তব্য মমতাজউদ্দীন আহমদের সাত ঘাটের কানাকড়ি (ঢাকা . মুক্তধারা, ১৯৯১) গ্রন্থের চতুর্থ প্রচ্ছদে মুদ্রিত আছে।
২৪. T.S. Eliot, 'Tradition and the Individual Talent' in Twentieth Century Criticism : The Major Statements (Editor-William J Handu of Max Wesbrok, New Delhi : 1974), P. 29
২৫. Zia Hyder, 'Contemporary Theatre of Bangladesh' in Contemporary Bengali Writing (Editor-Khan Sarwar Murshid (Dhaka : University Press Limited, 1996), P. 287.
২৬. সৈয়দ শামসুল হক, কাব্যনাট্য সংগ্রহ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৯, পৃ. ৫৮।
২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯।
২৮. শামসুর রাহমান, 'পূর্বলেখ', সাঈদ আহমদ, শেষ নবাব (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৯)।
২৯. মমতাজউদ্দীন আহমদ, নাট্যত্রয়ী (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৬), পৃ. ১৭।
৩০. সেলিম আল দীন, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ২১, পৃ. ৯৬-৯৭।
৩১. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'আমাদের সাহিত্যের রূপরেখা ১৯৪৭-১৯৬৭', বই, ৩য় বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আগস্ট ১৯৬৭, পৃ. ৩০৬-০৭।
৩২. আবদুল্লাহ আল মামুন, এবার ধরা ধরা দাও (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৭), পৃ. ৭২।
৩৩. আবদুল্লাহ আল মামুন, আয়নায় বন্ধুর মুখ (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৩), পৃ. ৫৬।
৩৪. আবদুল্লাহ আল মামুন, কোকিলারা (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৯০), পৃ. ১।
৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫-১৬।
৩৬. জিয়া হায়দার, 'বাংলাদেশের সমকালীন নাটক', সমকালীন বাংলা সাহিত্য (সম্পাদক খান সারওয়ার মুরশিদ, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৮৯), পৃ. ২৮৭।
৩৭. সৈয়দ শামসুল হক, এখানে এখন (ঢাকা : সব্যসাচী, ১৯৮৮), পৃ. ৫৮।
৩৮. বিস্তৃত তথ্যের জন্যে দ্রষ্টব্য : কবীর চৌধুরী, প্রসঙ্গ নাটক (ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮১) , পৃ. ১৮৭-২০৭।
৩৯. জিয়া হায়দার, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৩৬, পৃ. ২৮৭।
৪০. সেলিম আল দীন, 'বাংলাদেশের নাটকের প্রকরণে দেশজ উপাদান', একুশের প্রবন্ধ ১৯৯৫ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ১৮২-১৯৩।
৪১. সৈয়দ শামসুল হক, কাব্যনাট্য সংগ্রহ, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৯, দ্র. ভূমিকাংশ।
৪২. আফসার আহমদ, মঞ্চের ট্রিলোজি ও অন্যান্য প্রবন্ধ (ঢাকা : গ্রন্থিক, ১৯৯২), পৃ. ১২০- ২১।
৪৩. সেলিম আল দীন, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নং ৪০, পৃ ১৮৮।
৪৪. Martin Esslin, The Theatre of the Absurd (London : 1968), P. 402.

মুক্তিযুদ্ধের
দর্পণে



ক



খ

মুক্তিযুদ্ধ ও আমাদের নাটক

সৈয়দ শামসুল হক

বাংলাদেশের নাটক সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই অনিবার্যভাবে এসে পড়ে মুক্তিযুদ্ধের কথা— সেই যুদ্ধ, একাত্তার, স্বাধীনতা, সাম্য, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা আর বাঙালি জাতীয়বাদ প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধ ছিল অতীত অনেক সংগ্রামের শীর্ষ আমাদের ভূখণ্ডে। শীর্ষের সেই সংগ্রামের আশু পটভূমি তো ছিল এই, যে উনিশ শো সাতচল্লিশ সালে ব্রিটিশরাজ বিদায় নিল, বাংলা ভাষাভাষী যে অঞ্চলটিকে আমরা এক ও অখণ্ড ভাবতে অভ্যস্ত ছিলাম এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে ভূখণ্ডটি আসলেই ছিল আমাদের নিজস্ব জাতি ও সংস্কৃতির দাবিতে— সেই এলাকাটি হল দ্বিখণ্ডিত; আমরা, এখনকার এই রাষ্ট্রের মানুষেরা, নিক্ষিপ্ত হলাম এক প্রমাদী স্বাধীনতার ভেতরে, আর আমাদের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হল সরকারি যন্ত্রে প্রস্তুত এক সংস্কৃতি ও জাতি পরিচয়, যার সূত্রই ছিল শেকড় ও মানবকে অস্বীকার করা।

সেইসব সংগ্রাম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির স্বপ্নে যদিওবা, তারই ভেতর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসেছে আমাদের জাতি পরিচয়ের সূত্র, আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির বোধ এবং আমরা বুঝে উঠেছি যে, শেষ পর্যন্ত আধিজাতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তিই এনে দিতে পারে আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি। সংস্কৃতির কাঠামোতে গড়ে ওঠে একেকটি জাতিসত্তা; তাই বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান প্রসঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সনাক্ত করবার কাজটি এবং তা শুরু হয় একাত্তরের অনেক আগেই, রণাঙ্গনে অস্ত্র ধরবার বহু আগে থেকেই।

নাটকের ক্ষেত্রে এই কাজটি কিন্তু একেবারেই হয়নি একাত্তরের আগে; এখানে তা অপেক্ষা করছিল আক্ষরিক অর্থেই দেশটি স্বাধীন হবার জন্যে। শেকড় সন্ধানের কাজ, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সনাক্ত করবার কাজ— নাটকে— এবং নাটক যেহেতু সমবায়ী ফলিত শিল্প, তাই নাটক প্রযোজনার বাস্তবিক কাজটিও শুরু হয় একাত্তরে বাংলাদেশের মাটি থেকে দখলকারী পুরনো পাকিস্তান অন্তত দৃশ্যত সরে যাবার পর। নাটকের ক্ষেত্রে এই যে অপেক্ষা ও নিষ্ক্রিয়তা, একে আমাদের ব্যর্থতা বলে দেখলে চলবে না— আমাদের চিত্রকলা, সাহিত্য বা সংগীতের ক্ষেত্রে তুমুল কর্মসম্পাদনের পাশে নাটকের দীপটিকে নির্বাপিত বলে ভাবলে চলবে না, কারণ দীপটি ছিল না নির্বাপিত, বরং ছিল জ্বলে উঠবার জন্যে অন্ধকারে দীর্ঘ অপেক্ষমান, আর নাটক যেহেতু জীবন্ত মানুষের সঙ্গে জীবন্ত মানুষের বিদ্যুৎ বিনিময়ের একটি অনুষ্ঠান, তাই মানুষ প্রকৃত অর্থে যতক্ষণ নয় জীবন্ত, ততক্ষণ তাকে অপেক্ষায় থাকতেই হয়।

আমরা লক্ষ না করে পারব না, মুক্তিযুদ্ধের পরপরই দেশে যে শুরু হল নাট্য আন্দোলন, এখনকার আলোকোজ্জ্বল বিপণি বিজ্ঞান শোভিত বেইলি রোড নয় সেদিনকার নির্জন ও স্তিমিত আলোয় ম্লান বেইলি রোডে মহিলা সমিতির মিলনায়তনটিকে অবলম্বন করে প্রস্তাবিত হল যে নাট্যচর্চা, সেই মিলনায়তন ছিল পাকিস্তান আমল থেকেই আর নাট্যচর্চায় যাঁরা এগিয়ে এলেন সেই নাট্যকার, অভিনেতৃ, কুশলী, প্রয়োগকর্তা ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর প্রধান প্রায় সকলেই ছিলেন পাকিস্তান আমল থেকে আমাদের পরিচিত মুখ, ছিল সবাই— যন্ত্র ব্যক্তি, সত্তার সব স-ব কিছু, আগে থেকেই, কেবল ছিল না পেষণ , ছিল না প্রেরণা, ছিল না কল্পনা।

আসলে, পরাধীন জাতির নাটক হয় না, স্বাধীনতা নামমাত্র হলেও হয় না; যে জাতি রক্তের ভেতরে স্বাধীনতা অনুভব করতে না পারে সে জাতি হয়তো সাহিত্যে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে বা

সংগীতে বড়ো মাপের কিছু সৃষ্টি করতে পারে, নাটক তার কাছে অধরাই থেকে যায়। কালিদাসের জন্যে বিক্রমাদিত্যের কাল, সফোক্লিসের জন্যে আথেন্সের স্বর্ণকাল, শেক্সপিয়ারের জন্যে এলিজাবেথের কাল হয় এক জরুরি গর্ভথলি; ও ভিন্ন ওঁদের আবির্ভাব সম্ভব ছিল না; এবং আমাদের শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথের মতো নাট্যপ্রতিভাকেও অপেক্ষা করতে হয় ভারতের স্বাধীনতার জন্যে যার ভেতরে থেকে বেরিয়ে আসেন শম্ভু মিত্র-র মতো প্রয়োগকর্তা তাঁর নাটকের অন্তর্গত শক্তিকে আমাদের ভেতরে চারিয়ে দেবার প্রতিভা নিয়ে। ভারতের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে; যে ভারতে নাট্যচর্চা হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে, বিশ্বে এক বিশেষ নাট্যরীতি ও সূত্রের জন্ম দিয়েছে যে ভারত সেই ভারত যখন ব্রিটিশ রাজশক্তির পদানত তখন তার নাটক হারিয়ে ফেলে রক্ত এবং স্বপ্ন, সাহিত্যে চিত্রে বা সংগীতে ভারত এই কালে পিছিয়ে না থাকলেই নাটকে সে হয়ে থাকে একেবারেই স্থবির ও অন্ধ; তারপর স্বাধীনতা আসে। আজ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নাট্যচর্চা কেবল স্বদেশেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও কী প্রবল প্রাণশক্তি নিয়ে উপস্থিত।

এক ব্যাপার ঘটবার সম্ভাবনা বাংলাদেশের মাটিতে যা পুরনো পাকিস্তান আমলে ছিল না; কারণ তখন আমরা প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ছিলাম না, ছিলাম ছদ্মবেশী এক ঔপনিবেশিক শক্তির দাসমাত্র। তাই সাতচল্লিশের পরে বাংলাদেশের মাটিতে সাহিত্য হয়েছে, চিত্র হয়েছে, সংগীত হয়েছে—নাটক হয়নি; এবং সে— পাকিস্তানের আগে ব্রিটিশ আমলে তো হয়ইনি। ব্রিটিশ আমলে কি আমাদের নাট্যচর্চা ছিল না? ছিল এই, যে, আমরা তখন আমাদের উত্তরাধিকার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম শহরে ও শিক্ষিত সমাজে, ধার করেছিলাম বিদেশের এবং আরো স্পষ্ট করে ইংরেজের নাট্যবুদ্ধি; আর অন্যদিকে বিশাল জনজীবনে আমরা পুরনোরই পুনরাবৃত্তি করে চলেছিলাম যাত্রা মাধ্যমে এবং ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের গণনাট্য যার এক উজ্জ্বল ফসল ময়মনসিংহ গীতিকা, হায়, যাকে আমরা নাটকের পাণ্ডুলিপি মনে না করে কেবলই বাক্য বলে ধারণা করেছি এবং এই প্রকারে অজ্ঞান থেকেছি আমাদের গণনাট্যের শক্তি ও বুদ্ধি সম্পর্কে। তবে এটাও উল্লেখ করা কর্তব্য হয় যে জীবন্ত মানুষের অস্তিত্বের চাপে সেই কালের নাট্যচর্চাও কখনো কখনো পেয়েছে বেগ ও গতি; বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, পাশ্চাত্য শিক্ষার কুফল, নীলকরদের অত্যাচার পরাধীনতার বেদনা ও স্বাধীনতার জন্যে আকুতির মতো সামাজিক ও রাজনৈতিক তীব্র অভিজ্ঞতাগুলো যেন অন্তর্গত চাপেই ঠেলে বেরিয়ে এসেছে নাটকে— রামনারায়ণ তর্কালঙ্কার, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মুকুন্দ দাসের নাটকে ও পালায় কখনো কখনো এঁদের হাতে বাংলা নাটক বেগ ও গতি অনুভব করলেও তা আমাদের অগ্রসর করায় না, বিবর্তনের দিকে আমাদের প্রেরণ করে না, বস্তুত নাটক আমাদের অন্যতম প্রধান শিল্পমাধ্যম হিসেবে আর অতীতের মতো থাকে না ; এমনকী রবীন্দ্রনাথ, যে রবীন্দ্রনাথ কাজ করেছেন বহু মাধ্যমে নাটকে তিনি তাঁর কবিতা, উপন্যাস, গানের তুলনায় তাঁর বহু পরের চিত্রের মতোই সবচেয়ে 'মৌলিক' হয়েও তাঁর জীবদ্দশায় শুধুই এক ব্যতিক্রমী, নিষ্ফলা ও নিঃসঙ্গ নাট্যকর্মীই থেকে যান।

সাতচল্লিশে পাওয়া পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের মাটিতে অস্তিত্বের সেই চাপ যে একেবারে আমরা অনুভব করিনি নাটকে, তা নয়; অত্যন্ত ক্ষীণ হলেও করেছি--- যেমন মুনীর চৌধুরী ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের রচনার ভেতরে, বস্তুত এগুলোও নিঃসঙ্গ নিষ্ফলা চেষ্টামাত্র, পরিণামহীন যাত্রাই বটে, পাণ্ডুলিপি রচনাতেই সীমাবদ্ধ মাত্র; এবং একেবারে শেষদিকে, সত্তরের শেষভাগ ও একাত্তরের শুরুতে পথনাটকে। সেদিনের এই পথনাটকগুলোর ভেতরেই হয়তো আজ আমরা সনাক্ত করতে পারব মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালের বাংলাদেশের নাট্যচর্চার বীজটিকে; এবং এরই জের ধরে বলব যে বাংলাদেশের নাট্যচর্চা মুক্তিযুদ্ধের ফসল নয়, মুক্তিযুদ্ধ যা করেছে— বীজটিকে উপ্ত এবং বৃক্ষের দিকে বর্ধিত হবার মাটি দিয়েছে। স্বাধীন জাতি না হলে যা হয় পাকিস্তান আমলে

বাংলাদেশেও তাই-ই হয়েছে— মুনীব চৌধুরী ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর রচনা একদিকে, মকসুদ উস-সালেহিন ও বজলুল করিমের অসামান্য মঞ্চভাবনা ও প্রয়োগ-উদ্ভাবন অন্যদিকে, দুয়ের দূরত্ব ঘোচেনি, দুয়ের সমন্বয় কখনো ঘটেনি।

রচনা ও মঞ্চভাবনা— এবং মঞ্চ অর্থে আমি এখন মহিলার সমিতির মিলনায়তন বা চারদেয়ালে বাঁধা কোনো ক্ষেত্রের কথা ভাবছি না— এ দুয়ের মিলন ঘটে, একে অপরের জন্যে তারা অনিবার্য হয়ে ওঠে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর এবং এরপরই আমরা আবিষ্কার করি, যেমন সফোক্লিস বা কালিদাসের কালে, শেক্সপিয়ারের কালে বা স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতে, মাধ্যম হিসেবে নাটকের অন্তর্গত শক্তি বৃদ্ধি ও প্রয়োজনটিকে— প্রয়োজন এবং উদ্ভাবনকে, উদ্ভাবন এবং প্রয়োগকে, প্রয়োগ এবং সিদ্ধিকে। আমরা ফিরে যাই আমাদের নাট্য ঐতিহ্যের কাছে, আমাদের মাটির নাট্যবুদ্ধির কাছে এবং যাত্রা ও পালার ঐতিহ্যকে মেধাহীন অবলম্বন আর নয়। তার উপাদানগুলোকে নতুন কালের জন্যে নতুন মাত্রা নিয়ে ব্যবহার করবার দরকার বুঝি। বাঁধামঞ্চের নাটক তো আছেই, আমরা এগিয়ে যাই এবং প্রবর্তন করি গ্রাম থিয়েটার, মুক্তনাটক, পথনাটকের মতো আঙ্গিক ও প্রয়োগরীতি; আমবা সঙ্গীতের দিকে, নৃত্যের দিকে কাব্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি এবং নাটকে সেসব ব্যবহার করি না, শৌখিন জামার মতো নয় যে গায়ে পরেছি, টান দিয়ে খুলেও ফেলতে পারব ব্যবহার করি জরুরি উপাদান হিসেবে, আমাদের নাটকের রক্তমাংস বোধে। কেবল উপাদানের বেলাতেই নয়, আমরা আবিষ্কার করি মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের নাট্যচর্চার প্রবাহে, যে একদা নাটকের শরীর নির্মাণে যে দৃষ্টিভঙ্গি আমরা প্রয়োগ করেছি তা মুলত ছিল পাশ্চাত্যের কাছে না বুঝে ধার করা; আমরা এখন চরিত্র ও ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাতের যে সূত্র আমাদের মাটিতে মহাকাব্য, মঙ্গলকাব্য, গীতিকা ও পালাগানে বর্তমান, তাকে ব্যবহার করছি এবং এটা এই প্রথম বাঙালির দুশো বছরের নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে এই প্রথম এত বিপুল, সপ্রাণ ও তাৎপর্যপূর্ণ করে।

কিন্তু এ সবই সূচনামাত্র; নাটকের মাধ্যমটিকে আবার আবিষ্কার করে ও ব্যবহার করতে পারবার সময় দেখে উল্লাসেরই ঢল এখন; ঢল, এই ঢলটিকে এখনি সমালোচনা করবার দরকার নেই, বাঁধ দিয়ে তাকে শাসন করবারও মুহূর্তে এটা নয়; এখন শুধু প্রচুব ও প্রচুর, বিশাল ও ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়, উদ্ভাবনের সময় প্রয়োগের সময়, নেবার সময়, দেবার সময়, হোঁচট খাবার সময়, উঠে দাঁড়াবার সময় দৌড়ে যাবার সময়, ঝাঁপ দেবার সময় এবং এই সময়টিই আমাদের নিয়ে যাবে নতুন সময়ে যখন বাংলাদেশের নাটক হয়ে উঠবে সব অর্থে বাংলাদেশেরই নিজস্ব নাটক, স্বাধীন জাতির আত্মপরিচয়ে বিশিষ্ট এক নাট্যধাবা।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আমাদের সংস্কৃতি প্রসঙ্গে কিছু কথা

ড. ইনামুল হক

১৬ ডিসেম্বর আমাদের জন্যে গৌরবের দিন, আনন্দের দিন এবং প্রত্যয় ব্যক্ত করার দিন। এ দিনটি আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিনও বটে। আজ থেকে ২৬ বছর আগে যে চেতনার ওপর ভিত্তি করে ১৬ ডিসেম্বর আমাদের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত হয়েছিল, আজ তার মূল্যায়নের সময় এসেছে। ৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে বাঙালি জাতির আত্ম-পরিচয়ের লক্ষ্যে সংগ্রামী আন্দোলনের ফলশ্রুতিই হচ্ছে এই ১৬ ডিসেম্বর। জাতি হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে যেসব সামাজিক, রাজনৈতিক, মানবিক মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটানোর প্রয়োজন হয়েছিল তারই প্রধান ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনিই হচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তারই রাজনৈতিক প্রজ্ঞামণ্ডিত পরিচালনায় বাঙালি জাতির জন্যে বিশ্বের মানচিত্রে শোষণমুক্ত মানবিক চিন্তায় সিক্ত বাংলাদেশের অবির্ভাব ঘটে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র এই মূল চার নীতিকে ধারণ করেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ৭৫ সালে ঘাতকরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কবর রচিত করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাগুলো বিভ্রান্তির কবলে নিমজ্জিত হয়। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী শক্তির তাণ্ডব কর্মকাণ্ড। পাকিস্তানি ভাবধারার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস। রাজনৈতিক প্রশাসনিক প্রতিটি ক্ষেত্রে পাকিস্তানপন্থীদের প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মূল উৎপাটনের দুর্মর প্রচেষ্টা। এমনিভাবেই আমাদের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি মানবতাবোধ তথা ধর্ম-নিরপেক্ষতা আহত হয়। আমাদের চেতনায় প্রচণ্ড আঘাত হানা হয়। পাকিস্তান আমলে ধর্মকে যেভাবে রাজনৈতিক বৈতরণী পাড়ি দেবার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হত সেই মানসিকতাকে ব্যবহার করে পাকিস্তানিপন্থী রাজনীতিকরা বাংলাদেশের ভূমিতে শেকড় গাড়তে শুরু করে এবং ৭৫-এর ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার মাধ্যমে আরম্ভ হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী শক্তির পদচারণা; প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে প্রচার। কোমলমতি শিশু-কিশোরদের শেখানো হয় ভুল ইতিহাস। শৌর্য-বীর্য এবং বৈভবের স্পর্শে কিশোর-কিশোরীদেরকে ত্যাগ-তিতিক্ষার আন্দোলন থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। তাদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া হয় সন্ত্রাসী মনোভাব। সন্ত্রাসের মাধ্যমে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের স্পৃহার অনুভূতি তাদের মাঝে গ্রথিত করা হয়। এভাবেই আমাদের জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশ যাদের জন্ম স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সেইসব কোমলমতি কিশোর-কিশোরী যাদের মাঝে রয়েছে সৃষ্টির অপার সম্ভাবনা তারাই জড়িয়ে পড়ে অবক্ষয়ী, নেশাগ্রস্ত এবং সন্ত্রাসী মনোভাবের আবর্তে। সৃষ্টির শক্তি থেকে তারা ছিটকে পড়তে থাকে। বিজয় দিবসে আমরা যারা এখনও স্বাধীনতার পূর্ণ ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞাত আছি, তাদের দায়বদ্ধতার কথা ভুললে চলবে না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই স্বাধীনতার সুফল বাংলাদেশের প্রতিটি ধূলিকণাতে ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব আমাদেরই। আমাদের অন্যতম চেতনা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবোধ। এই চেতনা আর কিছুই নয়, বাঙালি সংস্কৃতির দ্বারাই চিহ্নিত হয়ে থাকে এবং নিজেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করে থাকে। আমাদের যে ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি আছে তা দু-একদিনে গড়ে ওঠেনি। এর পেছনে রয়েছে সংস্কৃতিকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা। সেই প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার অন্যতম অঙ্গীকার ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়। আমাদের সংস্কৃতিকে পৃথিবীর অন্য সংস্কৃতির সঙ্গে একই সারিতে

প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এ দেশের প্রতিটি মানুষের প্রতিটি স্তরের প্রতিফলন ঘটাতে হবে সাংস্কৃতিক আচার-আচরণ প্রকাশ করে নাটক, গান, নৃত্য, শিল্পকলা ইত্যাদির মাধ্যমে। আমাদের বাঙালি সংস্কৃতিকেও প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আমাদের বাঙালিদের আচার-আচরণগুলো প্রস্ফুটিত হতে হবে আমাদের নাটক, গানসহ সকল শিল্পকলার মাধ্যমে। বিশ্বকে একটি মাত্র পরিবারে করবার ইচ্ছা সারা পৃথিবীর মানুষের মাঝে যে জেগেছে তা থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন থাকতে পারি না। তাই বিভিন্ন দেশ এবং জাতির সংস্কৃতির আদান-প্রদানের প্রচেষ্টা চলছে। আমাদের সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত না হয়ে লেন-দেনের মাধ্যমে একই সারিতে যাতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তার জন্যে আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আরো সৎ এবং সাহসী হতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে এমন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে যেখানে মানবতাবোধই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে।

নাটক : প্রতিবাদ প্রতিরোধের

কবীর চৌধুরী

প্রতিবাদ-প্রতিরোধের নাটক — শ্রেণিকরণটি অপেক্ষাকৃত হাল আমলের। নাটকের শ্রেণিবিভাগ অব্যশ্য অনেক রকমের হয়। একটি ঐতিহ্যগত প্রাচীন শ্রেণিকরণ হচ্ছে — ট্রাজেডি, কমেডি, ট্রাজি-কমেডি ইত্যাদি। বিষয়ের ভিত্তিতেও নাট্যকর্মকে চিহ্নিত করা যায়, যেমন, ঐতিহাসিক, সামাজিক, পৌরাণিক। বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আরো সংকীর্ণ শাখার কথাও ভাবা যায়, যেমন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, প্রেমমূলক অথবা রহস্য নাটক। বার্নার্ডি শ তাঁর নাটকগুলির ক্ষেত্রে প্রায়ই নাটকের নামের সঙ্গে অন্য একটি পরিচিতমূলক শব্দ যোগ করে দিয়েছেন, যেমন, রোমান্স, ফেবল, অ্যাডভেঞ্চার, ফ্যান্টাসিয়া, মেলোড্রামা, হিস্ট্রি, ফিলসফি। শ অবশ্য ওই নামকরণের মধ্যে তাঁর স্বভাবসুলভ তির্যক সিরিও-কমিক দ্ব্যর্থবোধক দৃষ্টিকোণকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। তবে আধুনিক যুগে প্রবেশ করে আমরা নাটকের যে নতুন শ্রেণির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হই তা হল বিচার-বিতর্কের নাটক, ডিসকাশান প্লে, অথবা থিসিস প্লে। ইবসেন, শ প্রমুখ এই নাট্যধারাকে বিকশিত করেন। তাঁদেরকে সমাজের নানা অসঙ্গতি, অনাচার, অন্যায় আন্দোলিত করে এবং তাঁদের নাটকে তার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ-প্রতিরোধমূলক সুর সহজেই চোখে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিক নাট্যাঙ্গনে এই সুর নানা বিচিত্র আঙ্গিকে নিজেকে প্রকাশ করেছে, প্রাধান্য দিয়েছে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিকোণকে। তারই ফলে জন্ম নিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন নাম —যেমন, ব্রেশটের এপিক থিয়েটার, থিয়েটার অব লার্নিং, থিয়েটার অব সাফারিং, থিয়েটার অব ক্রুয়েল্টি। বেকেট, ইয়োনেস্কো, অ্যাডামোভ, জাঁ জেনে প্রমুখের অ্যাবসার্ড থিয়েটার। এই সব ধরনের নাটকেই জীবনের অর্থহীনতা, শূন্যতা, কিংবা সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চেতনা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

বস্তুতপক্ষে এ ধরনের প্রতিরোধমূলক দৃষ্টিকোণ বিশ্বব্যাপী আধুনিক নাটকের অন্যতম চারিত্র্যলক্ষণ। তবে প্রতিবাদ- প্রতিরোধের নাটক বলতে অনেকে আরেকটু সীমিত ও আরেকটু প্রত্যক্ষ প্রতিবাদী ভূমিকার কথাই সাধারণত ভাবেন।

একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যাবে যে প্রতিবাদী চেতনা প্রকৃতপক্ষে সমাজ চেতনারই সম্প্রসারিত রূপ। সমাজে যখন অন্যায় অবিচার দেখা দেয় তখন শিল্পীচিত্তে তাঁর তীক্ষ্ণতর স্পর্শকাতরতার জন্যই প্রতিবাদ-প্রতিরোধের আকাঙ্ক্ষা জাগে। প্রতিবাদী চেতনার সঙ্গে তাই সামাজিক বাস্তবতার বিষয়টি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

মার্কসীয় বিচারে ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে — যাবতীয় সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অন্যবিধ অন্যায় মূলত সংঘটিত হয় অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে প্রভুত্ব অর্জনের লিপ্সা থেকে। এই থেকেই সাম্রাজ্যবাদী-উপনিবেশবাদী শাসকগোষ্ঠী অন্য দেশকে পরাধীন রাখতে চায়, আবার পরাধীন দেশের নিজের মানুষের মধ্যেও শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় পুঁজিবাদী বিত্তশালী জমিদার-মহাজন-ব্যবসায়ী শ্রেণি শোষণ করে নিম্নবিত্ত মানুষকে, নির্যাতন চালায় শ্রমিক-কৃষকের উপর, চোরাকারবারে নেমে গুটি কয়েক মানুষ লক্ষ কোটি মানুষকে বঞ্চিত করে মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলে। এ সবের বিরুদ্ধে যেসব নাটকে প্রতিরোধমূলক মানসিকতা ও চিন্তাধারা ফুটে ওঠে আমরা স্পষ্টতই তাকে প্রতিবাদী নাটক বলে চিহ্নিত করতে পারি। যেমন, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অতি মুনাফার লোভ, চোরাকারবার ইত্যাদি আমাদের যেসব নাটকের উপজীব্য হয়েছে তাব মধ্যে নাম করা যেতে পারে নূরুল মোমেনের বহু প্রশংসিত ট্রাজেডি ‘নেমেসিস’ ও শওকত ওসমানের উপভোগ্য কমেডি ‘কাঁকরমনি’-র। আমাদের সমাজে অন্যতম অন্যায় ও ব্যাধি হচ্ছে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও গোঁড়ামি এবং মিথ্যা আভিজাত্যবোধ।

ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে উদার মানসিকতার সপক্ষে উদাত্ত সুর ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কাব্যনাটক 'বিসর্জন'-এ, শহিদ মুনীর চৌধুরীর উজ্জ্বল একাঙ্কিকা 'মানুষ'-এ। তবে বাংলা নাটকে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে প্রতিবাদী চেতনার প্রথম উল্লেখযোগ্য বিচ্ছুরণ আমরা দেখি দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'-এ। ওই ধারায় পুষ্ট হয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে তখন আরো কয়েকটি প্রতিবাদ-প্রতিরোধের নাটক রচিত হয়েছিল, যদিও শিল্পগুণের দিক থেকে তারা তেমন সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। অর্থনৈতিক শোষণের বিষয়টি পরবর্তীকালে ভিন্নতর আঙ্গিকে রচিত একাধিক সার্থক নাটকের জন্ম দিয়েছে। আর এইসব নাটকে শ্রেণি সচেতন রাজনৈতিক মাত্রিকতাও এসে যুক্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের সহজেই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী', বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান', 'ছেঁড়াতার' প্রভৃতি নাটকের কথা। উল্লেখিত নাটকগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই চোখে পড়ে যে প্রতিবাদী নাটক বিষয় ও আঙ্গিকের দিক থেকে নতুন মোড় দিয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে নাটকে রাজনৈতিক চেতনা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তার সাম্রাজ্যবাদ, স্বৈরাচার ও শোষণ বিরোধী চরিত্র আরো স্পষ্টতা অর্জন করেছে। রবীন্দ্রনাথ 'চার অধ্যায়'-এ সন্ত্রাসবাদকে নিয়ে এলেন নাটকের অঙ্গনে, আর 'অচলায়তন', 'তাসের দেশ', 'মুক্তধারা' প্রভৃতি নাটকের মধ্য দিয়ে সাংকেতিকতাকে আশ্রয় করে প্রতিরোধ-প্রতিবাদ চেতনার নতুন ব্যাপ্তি ঘটালেন।

প্রতিবাদী নাটক হিসেবে বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত মুনীর চৌধুরীর 'কবর'। একটি বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও প্রতিরোধধর্মী জীবন দর্শনের গাঢ় অনুভূতিময় প্রকাশের জন্য এবং উপস্থাপনার আঙ্গিকগত অভিনবত্বের কারণে নাটকটি বিশেষকে অতিক্রম করে সার্বজনীনতা অর্জন করেছে, সকল রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে মৃত্যুহীন প্রতিরোধের মহৎ প্রতীকী তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েছে।

এখানেই শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের চাবিকাঠি নিহিত। কোনো একটি বিশেষ ঘটনা শিল্পীমনে আলোড়ন তোলে, তার চিত্তকে বিক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদী করে, শিল্পী তখন তাকে অবলম্বন করে তাঁর আবেগ-অনুভূতি ও বক্তব্য তুলে ধরেন, কিন্তু তাঁর রচনাশৈলীর গুণে বিষয়টি সীমিত চিহ্নিত স্থানকালকে অতিক্রম করে বৃহত্তর ব্যঞ্জনায় ভূষিত হয়। প্রতিবাদ-প্রতিরোধের নাটক বা ওই জাতীয় সাহিত্যকর্ম বিচারের সময় এ তথ্যটি বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। কারণ এখানে শিল্পকে ব্যবহার করা হচ্ছে হাতিয়ার রূপে। শিল্পী এখানে তাঁর শিল্পকর্মকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী করে তুলতে চান। প্রতিভার যাদুস্পর্শ ছাড়া কাজ দুঃসাধ্য। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর প্রতিভার স্পর্শ না পেলে এই শ্রেণির নাটক নিতান্ত প্রচারধর্মী হয়ে পড়তে বাধ্য। তখন ক্ষতি ঘটে দ্বিবিধ: শিল্পকর্ম হিসেবে তা ব্যর্থ হয়। পাঠক-দর্শক চিত্তে আকাঙ্ক্ষিত আবেগ অনুভূতি সৃষ্ট হয় না এবং সেই কারণেই হাতিয়ার হিসেবেও সে তার কার্যক্ষমতা ও উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে। সার্থক প্রতিরোধ চেতনার সৃষ্টিও তখন আর হয় না।

মার্কিন নাট্যকার লিলিয়ান হেলম্যান ফ্যাসিবাদী তৎপরতার বিরুদ্ধে 'ওয়াচ অন দি রাইন' নামে একটি অনবদ্য প্রতিরোধের নাটক রচনা করেছেন। স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সুন্দর নাটক রচনা করেছেন এলমার রাইস 'জাজমেন্ট ডে' নামে। শ্রেণিবৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে সাম্যবাদী চেতনার উদ্বোধন সহায়ক ক্লিফোর্ড ওডেটসের প্রতিবাদী নাটকটির নাম 'ওয়েটিং ফর লেফটি'। এককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার আর্থার মিলার 'দি ক্রুসিবল' নাটকে ম্যাকার্থি যুগের অর্বাচীন কমিউনিস্ট বিরোধিতাকে প্রতিরোধ করার লক্ষ্য সামনে রেখে প্রায় তিন শতাব্দী আগের ঐতিহাসিক পটভূমিতে তাঁর উজ্জ্বল প্রতিবাদী সত্তাকে তুলে ধরেছেন। বার্টোল্ট ব্রেশট তাঁর একাধিক নাটকে এই একই কাজ করেছেন আশ্চর্য দক্ষতা ও শৈল্পিক নৈপুণ্যের সঙ্গে। এই প্রসঙ্গে হাওয়ার্ড ফাস্টের 'স্পার্টাকাস', ম্যাক্সিম গোর্কির 'মাদার', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' এবং শওকত

ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' প্রভৃতি উপন্যাসের নাট্যরূপের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে বাংলাদেশের একাধিক নাটকে আমরা প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সুরকে নানাভাবে ধ্বনিত হতে দেখেছি। তীব্র প্রত্যক্ষ সমালোচনা, শ্লেষ ও ব্যঙ্গ-কৌতুক, রূপক-প্রতীকের সাহায্যে অন্যায়ের মুখোশ উন্মোচন, অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী চেতনার উজ্জীবন—এই সবই আমাদের নাটকে আমরা লক্ষ করছি। মৌলিক নাটক ছাড়াও আমাদের রূপান্তরিত নাটকগুলিতেও এর পরিচয় বিধৃত। সৈয়দ শামসুল হক, মমতাজউদ্দীন আহমদ, আবদুল্লাহ আল-মামুন, সেলিম আল দীন, মামুনুর রশীদ সহ আরো অনেক নাট্যকারের রচনায় এর স্বাক্ষর রয়েছে। 'সুবচন নির্বাসনে', 'এখন দুঃসময়', 'সেনাপতি', 'এখনও ক্রীতদাস', 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'ওরা কদম আলী', 'গিনিপিগ', 'সৎ মানুষের খোঁজে', 'দেওয়ান গাজীর কিস্‌সা', 'কোপেনিকের ক্যাপ্টেন', 'তিন পয়সার পালা' সহ সমকালীন বাংলাদেশের অনেক নাটকে মূল্যবোধের অবক্ষয়, সমাজে বিদ্যমান ঘৃণ্য শ্রেণি বৈষম্য, উচ্চবিত্ত কর্তৃক নিম্নবিত্ত সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের নিগ্রহ ও নির্যাতন, স্বৈরাচারী শোষক-শাসক গোষ্ঠীর অনাচার, খাকি পোশাকের দাপট প্রভৃতির বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণপ্রতিবাদী সুর দক্ষতার সঙ্গে রূপয়িত হয়েছে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেও বর্তমান বাংলাদেশে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অন্যায়-অবিচার-শোষণের অবলুপ্তি ঘটেনি। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের নাটক রচনার কাজ তাই অব্যাহত থাকা দরকার। সে সব নাটকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র তীক্ষ্ণ ক্রোধ ও ঘৃণা জাগিয়ে তোলার পাশাপাশি শোষণহীন নতুন সমাজ নির্মাণের সহায়ক সৃজনশীল গঠনমূলক চেতনার উদ্বোধনও দর্শক পাঠকের কাম্য। আশা করি বাংলাদেশের নব-নাট্যান্দোলনের নিবেদিত-চিত্ত নাট্যকার ও নাট্যকর্মীদের সাধনার ফলে আমাদের আগামী দিনের নাটক উপভোগ্য শিল্পকর্ম হবার সঙ্গে সঙ্গে আকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য শক্তিশালী হাতিয়ারও হয়ে উঠবে।

মুক্তিযুদ্ধের পর আমাদের নাটক

মামুনুর রশীদ

বহুদিন ধরে অনেক বন্ধুকে বলতে শুনি আমাদের নাটক মুক্তিযুদ্ধের ফসল। কথাটা শুনে ভালো লাগে। কারণ মুক্তিযুদ্ধেব সাথে আমাদের আবেগ জড়িত। কিন্তু আবার একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবলে কথাটার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

নাটক তো কোনো ভুঁইফোড় ব্যাপাব হতে পারে না। শতাব্দীব পর শতাব্দী ধরে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে নাট্যচর্চা হয়ে থাকে। সেখান থেকে একটা নাট্য-সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এই নাট্য-সংস্কৃতি গড়ে ওঠার কালেই সমাজে অভিনেতা-নির্দেশক-নাট্যকার-কলাকুশলীরা গড়ে ওঠে।

বহু শতাব্দী ধরেই এই উপমহাদেশের লোকায়ত সংস্কৃতিতে নাট্যমাধাম একটা প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল। অনেক ভাঙাগড়াব পর মধ্যবিত্তেব প্রয়োজনে এই মধ্যবিত্ত কেন্দ্রিক একটা নাট্যচর্চা গড়ে ওঠে কলকাতাকে কেন্দ্র কবে। কিন্তু তখনও পূর্ববঙ্গে অনিয়মিত এবং নিযমিত নাট্যচর্চা হয়েছে। পালা-পার্বণ-উৎসবে এই নাট্যধারা চলে আসছে। নাট-মন্দিব ও বিভিন্ন শহরের প্রাচীন মঞ্চগুলিতে সে নিদর্শন বয়ে গেছে।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর এই ধারা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ঢাকায় মাহবুব আলী ইনস্টিটিউটকে কেন্দ্র কবে একটা পেশাদার নাট্যচর্চার সূচনা দেখা যায। কিন্তু নানা কারণে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরবর্তীকালে ড্রামা সার্কেলের নাট্য-উদ্যোগটাও ছিল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে ও দেশের বিভিন্নস্থানে বিক্ষিপ্ত বেশ কিছু নাট্যচর্চা আমাদের নাট্যসংস্কৃতির এ বহমান ধারাকে স্মরণ কবিয়ে দেয। ষাটের দশকেব শেষের দিকে চট্টগ্রাম ও ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নাটককে গণমানুষের একটা হাতিয়ার হিসাবেও দাঁড় করাবার প্রচেষ্টা লক্ষ করি।

তাবপব আসে মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের নিজেদেব দিকে তাকাবার একটা বড়ো সুযোগ এনে দেয়। আমরা ভাবতে থাকি আমাদের কী আছে? আছে একটা শক্ত সাংস্কৃতিক ভিত্তি। তাব মধ্যে আছে নাটক। এই নাটককে অনিয়মিত চর্চা থেকে সংহত করে প্রয়োজন হচ্ছে নিয়মিতকরণের। কারণ কোনো কিছুই নিযমিতভাবে চর্চা না করলে তার বিকাশ সম্ভব নয়। তাই তখনকার নাট্যমনস্ক যোদ্ধাবা ভাবতে শুরু করেন স্বদেশের মাটিতে একটা জাতীয় নাট্যশালা গড়ে তুলতে হবে। যাতে প্রধানত চর্চা হবে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার পদাবলী।

কলকাতায় প্রবাসী নাট্যকার, নির্দেশক , অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সমন্বয়ে 'পশ্চিমের সিঁড়ি' নামে একটি নাটকের মহড়া চলছিল। নাটকটি মুক্তিযুদ্ধের কালেই অভিনীত হবার কথা। কিন্তু ১৬ই ডিসেম্বব দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে তা তখন আর অভিনীত হয়নি।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় অনেক নাট্যকর্মীর সুযোগ ঘটে কলকাতার নাটক, নাট্য-সংগঠন, নাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী ও কুশলীদের সাথে পরিচিত হবার। এ ঘটনাটি আমাদের নাট্য ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ সময়ই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কর্মের অবসরে, বেতার নাটকের মহড়ায়, 'পশ্চিমের সিঁড়ি'র মহড়ায় বা কলকাতার নাটক দেখার পর পথ হাঁটতে হাঁটতে সবাই ভাবতে শুরু করে দেশে ফিরে একটা কিছু করতে হবে। মঞ্চ কবতে হবে— যেখানে নাটক হবে নিয়মিত। তখন এটাও অনুভূত হয় যে, ঢাকায় যে-সব মঞ্চে অভিনয় হয়, সেগুলো আদৌ অভিনয়ের উপযোগী নয। কিন্তু আছে নাটকের মানবিক সম্পদ। অভিনেতা-অভিনেত্রী আছে, নাট্যকার-নির্দেশক আছে,

আর আছে দর্শক। উৎকণ্ঠায় দিন কাটে। কিন্তু দেখা গেল ডিসেম্বরের দুই মাসের মধ্যেই 'আরণ্যক' নাট্যদল গড়ে উঠল, যাদের অধিকাংশ সদস্যই যুদ্ধ প্রত্যাগত। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত যে-সব ছাত্রছাত্রীরা যুদ্ধে গিয়েছিল তারাও ফিরে এসে দ্রুত সংগঠিত করতে লাগল নাটককে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলিতে, ডাকসুতে, সর্বত্র একটা ব্যাপক সাড়া পড়ে গেল।

মুক্তিযুদ্ধের আগেই 'নাগরিক' নাট্যদল সংগঠিত হয়েছিল। তারা অনুবাদ নাটক নিয়ে কাজ শুরু করেছিল। নানা কারণে তা অভিনীত হয়নি। 'পারাপার' নাট্যদলটিও কাজ শুরু করেছিল। সবাই এবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠল।

আরণ্যক নাট্যদল '৭২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে মুনীর চৌধুরীর নাটক 'কবর' নিয়ে মঞ্চে আসে। ওই বছরই তারা 'পশ্চিমের সিঁড়ি' নাটকটির অভিনয় করে কয়েকবার। অভিনয়গুলিতে টিকেটও বিক্রি হয়। এ সময় বহুবচন নাট্যদল গড়ে ওঠে। নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় ব্রিটিশ কাউন্সিলে 'বাকি ইতিহাস' নাটকটির নিয়মিত অভিনয় শুরু করে। থিয়েটার নাট্যদল আত্মপ্রকাশ করে। শুধু ঢাকায় নয়, '৭৩ সাল থেকে চট্টগ্রাম-সহ দেশের সর্বত্র নাট্যচর্চার একটা জোয়ার লক্ষ করা যায়।

নাট্যচর্চায় জোয়ার আবার গড্ডল প্রবাহের ধারায় বেশি দিন চলে না। তাকে সংহত হতে হয়, গভীর হতে হয়। তাই নাটকে বিভিন্ন ধারা লক্ষ করা যায়।

একদিকে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে মূল্যবোধের একটা অবক্ষয় দেখা যায়। মুক্তিযুদ্ধ পাকিস্তান আমলে গড়ে ওঠা সনাতনী তথাকথিত সামন্তবাদী মূল্যবোধের উপর প্রবল আঘাত হানে। ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার পর যখন নতুন মূল্যবোধ গড়ে তোলা দরকার তখনই সমস্যা বাঁধে। এই সমস্যাটি আমাদের নাটকে সরাসরিই চলে এলো। মুক্তিযুদ্ধের পর প্রথম বহুল অভিনীত নাটক 'সুবচন নির্বাসনে'। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক যে নাট্যচর্চা— তারও মূল ধারা হচ্ছে অবক্ষয় আর হতাশাকে কেন্দ্র করেই। এ সময়টা একটা প্রবল উত্তেজনায় সময়।

বাঙালি প্রথমবারের মতো স্ব-শাসিত হবার সুযোগ পেয়েছে। নানা টানাপোড়েন এবং দিক নির্দেশনা স্থাপনের কঠিন সময়। অসহিষ্ণু রাজনৈতিক কর্মীদের বিভক্তির সময়। দর্শকও নাটকের কাছে দাবি করছে এ সময়ের কথা নাটকে চলে আসুক। আর নাটক সময়ের কাছে দায়বদ্ধ তো বটেই।

সত্তরের দশকের শেষের দিকটায় নাট্যদলগুলি হাতড়ে বেড়াচ্ছে সংকটকে। আর তাকে যতটা সম্ভব শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা চলছে। বেশ কিছু দল সারা দেশে ভালো কিছু প্রযোজনাও তুলে ধরতে সক্ষম হল। নাটক ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে বহু আগেই মহিলা সমিতিতে চলে এসছে। বেইলি রোডের অকিঞ্চিৎকর মঞ্চে যতটা সম্ভব নিরীক্ষা চলছে। কলকাতার নাট্যদল ঢাকা ঘুরে গিয়েছে। ঢাকার নাট্যদল কলকাতা যাওয়া শুরু করেছে। বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে একটা প্রতিযোগিতা, একটা বোঝাপড়াও চলছে।

আন্তর্জাতিক নাট্যধারাগুলিও প্রবেশ করেছে মঞ্চে। প্রধানত বের্টল্ট ব্রেখট্। ব্রেখ্টের জনপ্রিয়তা প্রায় গগনস্পর্শী। শেক্সপিয়ার, কার্ল সুখমায়ার, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মঞ্চে চলে এসেছে। এ ক্ষেত্রে নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের ভূমিকা অগ্রণী।

থিয়েটার মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ নিয়ে লড়ছে। আরণ্যক শ্রেণি-সংগ্রাম ও বিত্তহীন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরছে।

ঢাকা থিয়েটার প্রসেনিয়ামকে ভেঙে লোকজ আঙ্গিককে ব্যবহার করতে মনোনিবেশ করছে। ঢাকা পদাতিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কাঠামোতে ভিন্ন উপস্থাপনার চেষ্টা করছে।

তেমনি চট্টগ্রামেও। থিয়েটার '৭৩, অরিন্দম, তির্যক বন্দর নগরীর অপবিসর ও অপ্রস্তুত দর্শকদেব নাড়া দিযে চলেছে।

সত্তরের দশক আমাদের নাট্যচর্চায় অকটা উল্লম্ফনের দশক। এ সময়ে আবার আরণ্যক মুক্তনাটক ও ঢাকা থিয়েটার গ্রাম থিয়েটার চর্চাব সূচনা করেছে।

আশির দশকেব গোড়ার দিকে আরো তীব্র হয়ে উঠেছে নাট্যচর্চা। অনেক বেশি চ্যালেঞ্জ, অনেক বেশি কাজ শুরু হয়ে গেল।

এ সময়ই আবার স্বৈরাচারী শাসনের শুরু।

প্রথম থেকেই আমরা একটা ব্যাপাবে ভীষণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম যে, রাষ্ট্র পরিচালিত গণমাধ্যমগুলি যেমন করে সরকাবের প্রচারযন্ত্রে পরিণত হয, কিন্তু নাট্যমঞ্চকে আমরা সংকীর্ণ দলীয় প্রচাবের ঊর্ধ্বে বাখব, এবং একটি বিশ্বস্ত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে নাটককে গড়ে তুলব। ৭২ থেকে ৮০ পর্যন্ত এ কাজটি বিভিন্ন নাট্যদল অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথেই করেছেন। মতাদর্শগত নানা পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এ কাজটি তাঁরা কবে জনগণের আস্থাভাজনও হযেছেন।

এ ক্ষেত্রে তাই অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথেই বলা যায়— মুক্তিযুদ্ধের যথার্থ চেতনা শিল্পের এ মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। সত্তবের দশক অতিক্রম কবে যখন মুক্তিযুদ্ধেব উত্তেজনা একটু সুস্থিত হযে নাটক একটা শিল্প ও দর্পণ হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখনই আসে আবেকটি উত্তেজনা— সে উত্তেজনা স্বৈরাচাব।

উপর্যুপবি সামরিক শাসন মেনে নেওয়া যায় না। বাষ্ট্রক্ষমতায় এভাবে রাতের অন্ধকাবে উর্দি পরে ক্ষমতার আরোহণ এবং প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ফলে বাষ্ট্রনায়কদের হত্যা জাতিকে ইতিমধ্যেই মধ্যযুগে নিয়ে গিয়েছে। তাই ছাত্রসমাজ যেমন প্রতিবাদে ফেটে পড়ল, তেমনি নাট্যকর্মীরাও প্রতিবাদে প্রতিরোধে মঞ্চ এবং রাজপথ কাঁপিযে তুলল।

এই ঘটনার একটু আগেই বাংলাদেশের নাট্যদলগুলিব ফেডারেশন গঠিত হয়েছে— হাজার হাজার নাট্যকর্মীদের অভিন্নস্বার্থ নিয়ে লড়াই কবার প্রতিষ্ঠান।

আর স্বৈরাচারী শাসনের পটভূমিতে গড়ে ওঠে 'সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট'। স্বৈরাচাবের বিরুদ্ধে এ সময় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে রচিত নাটকগুলিকে খুঁজে খুঁজে এনে অভিনীত হয় মঞ্চে ও পথে। সারাদেশব্যাপী প্রতিরোধের নাটক গড়ে উঠতে থাকে। প্রায় নয় বছর ধরে মঞ্চ এবং পথনাটকে সামবিক শাসন বিরোধী নাটক অভিনীত হয়। জাতির এই প্রয়োজনে নাট্যকর্মীদের ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত হয় বটে, কিন্তু এ ধরনের সামবিক শাসন যেমন জাতিকে পিছিয়ে দেয় তার অগ্রযাত্রা থেকে, তেমনি পিছিয়ে দেয় সাংস্কৃতিক বিকাশের জায়গাটুকু থেকেও। তাই নব্বুইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকে আবার যেন নতুন করে কাজ শুরু কবতে হয।

এই এগিয়ে যাওয়া এবং পেছনে ফেরা— আবার এগিয়ে যাওয়া এবং পেছনে ফেবা প্রক্রিয়ায় হয়তো দীর্ঘদিন তৃতীয় বিশ্বের মানুষকে চলতেই হবে।

ইতিমধ্যে পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিব বিপর্যয়ও আমাদের মনোভূমিতে একটা আঘাত হেনেছে। কারণ আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নসমূহ বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র (চীন বাদে) সাহায্য করেছিল। আন্তর্জাতিকতাবাদেব একটা মহান দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল তখন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী চেহারাও সেদিন উলঙ্গ হযেছিল। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ অনেক নাট্যকারের নাটক আমাদের মঞ্চকেও সমৃদ্ধ করেছিল। আর নাটকের সাথে একটা আন্তর্জাতিকতার গভীর সম্পর্কও আছে। আমাদের মঞ্চে শুধু আমাদের দেশ নয়, সারা পৃথিবীটাকে তো নিয়ে আসতে চাই। নাটকের কোনো দেশ নেই, এখানে কূপমণ্ডুকতা চলে না, এখানে একটা খোলা দুনিয়া যেভাবেই হোক চাই। তাই আমাদের যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ঢাকার মঞ্চে সাবা পৃথিবীটাকে আনা

হয়েছে। এখনো সে প্রক্রিয়া অব্যাহত। আবারও এ প্রসঙ্গে নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের অবদানকে স্মরণ করি।

কার্ল সুখমায়ারের 'কোপেনিকের ক্যাপ্টেন', আরউইন শ'র 'বেরি দি ডেড'কে যেভাবে তাঁরা আমাদের দেশের চলমান ঘটনার সাথে প্রযুক্ত করেছেন তাতে আমাদের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিও প্রসারিত হয়েছে। সম্প্রতি অভিনীত 'মুখোশ' নাটকেও এ প্রচেষ্টা লক্ষণীয়।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে আমাদের নাট্যবোধ গভীরভাবে সম্পর্কিত। কারণ স্তানিসলাভস্কি, মস্কো থিয়েটার, চেকভ, গোর্কি, টলস্টয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে সুদীর্ঘ ৭০ বছর ধরে চর্চিত নাট্যধারা সারা বিশ্বের নাটককেই সমৃদ্ধ করেছে; সারা দুনিয়ার নাট্য ঐতিহ্যকে রাষ্ট্রীয়ভাব লালন করেছে। সে ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব-জার্মানির ভবিষ্যতের সাথে পৃথিবীর সংগ্রামরত মানুষের যেমন সম্পর্ক আছে, তেমনি সম্পর্ক আছে নাট্যকর্মীদেরও। তাই যে-কোনো আন্তর্জাতিকতাবাদী নাট্যকর্মীর মধ্যে প্রশ্নগুলো জাগতে বাধ্য। মস্কো থিয়েটার, বলশয় থিয়েটার, বার্লিনার আনসাম্বল, ব্রেখ্‌ট সেন্টার, সোফিয়ার থিয়েটার, প্রাগের থিয়েটার— এ সবই সারা পৃথিবীতে নাট্যকর্মীদের জন্যে বিস্ময়।

বাংলাদেশের নাটক গাঙ্গেয় অববাহিকার আবেগসমৃদ্ধ সংস্কৃতির অংশ। দুর্ভাগ্যজনক-ভাবে '৭২ সাল থেকে নাট্য-প্রযুক্তিবিদদের আবেগে এবং মস্তিষ্কে যতটুকু ধারণ করা সম্ভব হয়েছিল তার অকিঞ্চিৎকর একটা অংশই শুধু মঞ্চে দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়েছে। প্রধান বাধা হয়েছে উপযোগী মঞ্চ এবং সেই সাথে ভীষণ পশ্চাৎপদ মঞ্চ-প্রযুক্তি। আর এই সব সবটাই বাঁধা পড়ে আছে সাংস্কৃতিকভাবে পশ্চাৎপদ রাজনীতিকদের হাতে। ক্রীড়ায় তাঁরা উৎসাহী, উৎসাহী রাষ্ট্রশাসনে, কিন্তু কোনোমতেই উৎসাহী নয় জাতির মনন মেধা গঠনে। ফলে পেশির চর্চা সর্বত্র, মস্তিষ্কের চর্চা অবহেলিত। একদা হিটলারও জার্মানিতে যে পরিমাণে মনোযোগ দিয়েছিল অপেরা থিয়েটার গড়ে ওঠার কাজে— এরা স্বৈরশাসনের কালেও এ ধরনের উদ্যোগ নেয়নি।

এ দেশের নাট্য-প্রযুক্তিবিদরা নানা উদ্ভাবন ও বিকল্প দিয়ে থিয়েটার গড়ে তুলেছে, দেশে-বিদেশে থিয়েটারকে পরিচিত করিয়েছে, তবু তার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি মেলেনি। কোনো ধরনের পৃষ্ঠপোষকতাও জোটেনি তাদের ভাগ্যে। অথচ রাজনীতিকদের কণ্ঠে প্রশংসার অভাব নেই। যদিও এঁদের কেউ কেউ ভাবেন টেলিভিশন-নাটকই যথার্থ নাটক। টেলিভিশন-নাটকের শৈল্পিক দিকটা যে সম্পূর্ণতই মঞ্চনাটকের উপর নির্ভরশীল তা ভাববার অবকাশও তাদের নেই।

রাষ্ট্রশক্তিতে আবার মুক্তিযুদ্ধের সরাসরি শত্রুরা আবির্ভূত হয়েছে। তারা ভয়ানকভাবে মঞ্চকে ভয় পায়। তাই মঞ্চের উন্নয়নে তারা যে ভীষণভাবে শত্রুভাবাপন্ন হবে সন্দেহ নেই।

আর আমরা মৌলবাদের এই উত্থানকে আমাদের নাট্য-মাধ্যমে সরাসরিভাবেই বিরোধিতা করতে থাকব— মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একটা বড়ো অংশ হিসেবে।

তাই মঞ্চ-প্রযুক্তির বিষয়টি এখন অনিশ্চিতই মনে হয়, যদি না নিজেরাই এ কাজটি করি। অনুপযোগী মঞ্চে এত বছর ধরে অভিনয় করে শরীর এবং কণ্ঠ দুটোই প্রায় হারিয়ে বিদায় নিচ্ছে অনেক প্রতিভাবান অভিনেতা-অভিনেত্রী। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আর কতটুকুই বা কষ্ট সহিষ্ণুতা সম্ভব?

প্রচুর পরিশ্রম করে একটি বিশ্বাসযোগ্য প্ল্যাটফর্ম হিসেবে নাটককে আমরা গড়ে তুলেছি বহু মানুষের পরিশ্রমের বিনিময়ে। কিন্তু সাংগঠনিকতার কারণে, সংকীর্ণতার কারণে এবং সর্বোপরি এক ধরনের স্থূল অলীক কু-নাট্য রঙ্গের ফলে যদি আমাদের আবেগটুকু হারিয়ে যায়, তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে আবেগহীন বুদ্ধির চর্চার ফলে আমাদের বাঙালিদের থিয়েটারটা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

উপনিবেশবাদ, আমলাতন্ত্র ও শিল্পকর্ম

আলী যাকের

বছর দেড়েক আগে নাট্যবিষয়ক একটি আলোচনা সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম রংপুর শহরে। সঙ্গে বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যচর্চা বিষয় বিদগ্ধজনেরা ছাড়াও ছিলেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর তৎকালীন মহাপরিচালক মহোদয়। ঐ আলোচনা সভায় দিনাজপুরের জনৈক অপেক্ষাকৃত তরুণ নাট্যকর্মী তাঁর ভাষণের শুরুতে দিনাজপুর এবং প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার ইতিহাস বর্ণনার পর ওখানকার নাট্যকর্মীদের বর্তমান দুরবস্থার কথা তুলে ধরলেন। এই দুরবস্থা অর্থনৈতিক অভাবসৃষ্ট নয়। অর্থের অভাব তো রয়েছেই। ওদের অভিযোগ ছিল নির্বিঘ্ন নাট্যচর্চায় সরকারি প্রতিরোধ বিষয়ক। যার শুরু ছাড়পত্র প্রদান দিয়ে এবং শেষ প্রমোদ করের কঠোর আইন প্রয়োগে। দিনাজপুরের নাট্যকর্মীটি এ কথাও বলেন যে ওখানকার জেলা প্রশাসন নাকি কিছুদিন পূর্বে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'বহিপীর' নাটকটি মঞ্চায়নের ছাড়পত্র দেয়নি নাটকটি আপত্তিজনক বলে। অথচ আমরা সবাই জানি যে 'বহিপীর' পাকিস্তানি আমলেও স্নাতক শ্রেণিতে পাঠ্য ছিল এবং দিনাজপুরের ঘটনাটি ঘটার বছর দুয়েক পূর্বে ঢাকার মঞ্চে ছাড়পত্র নিয়েই নাটকটি নিয়মিত মঞ্চায়িত হয়ে গেছে। আমি এই বক্তার পরপরই বলতে উঠেছিলাম। কিন্তু এমন এক এলাকায় যেখানে নির্বিঘ্নে নাটক মঞ্চায়নই সম্ভব নয়, সেখানে শিল্পমাধ্যম হিসেবে নাটকের ওপর তত্ত্বগত আলোচনা নিতান্ত হাস্যাস্পদ হবে ভেবে আমাদের আমলাদের ক্রমবর্ধমান গণবিরোধী ভূমিকার ওপর সবিস্তার প্রতিবেদন হাজির করে শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক (যিনি নিজেও একজন আমলা) মহোদয়কে অনুরোধ করেছিলাম এই ধরনের সমস্যাগুলোর সমাধানে এগিয়ে আসার জন্য। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ঐ বিষয়ে তিনি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন অচিরেই। তারপর অবশ্য পত্রপত্রিকা মারফত প্রচার করা হয়েছে যে ঢাকাস্থিত বাংলাদেশে নাটক সেন্সর কমিটি কর্তৃক ছাড়পত্র প্রদানকৃত নাটক বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে স্থানীয় প্রশাসনের ছাড়পত্র ছাড়াই মঞ্চায়ন করা যাবে এবং শৌখিন নাট্য সম্প্রদায় অভিনীত নাটকে প্রমোদকর প্রদানের প্রয়োজন নেই। এই আইন দুখানি অবশ্য জারি করা হয়েছিল অনেক আগেই ১৯৭৭ এর জুন মাসে তৎকালীন রাষ্ট্রপতির নির্দেশে কিন্তু যথাযথ প্রচারের অভাবে বিভিন্ন জেলার প্রশাসন নাকি ঐ বিষয়ে অবহিত ছিলেন না।

আমি জানি না শিল্পকলা একাডেমী তথা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রচারিত এই নির্দেশের ফলে দিনাজপুরের নাটকর্মীদের সমস্যার কোনো সুরাহা হয়েছে কিনা। তবে এই কয়দিন আগে নরসিংদিতে অবস্থিত কল্লোল নাট্যগোষ্ঠীর আমন্ত্রণে ওখানে গিয়ে সেই রংপুরে উচ্চারিত অভিযোগেরই পুনরাবৃত্তি শুনে বুঝলাম আমরা যে তিমিরে ছিলাম সে তিমিরেই রয়ে গেছি। অবস্থার কিছুমাত্র রদবদল হয়নি।

আমরা যারা ঢাকায় নাট্যচর্চার সাথে জড়িত তাদের একটা সুবিধে এই যে, যে-কোনোরূপ প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে আমরা একেবারে এক নম্বরকে ঘিরে ধরি এবং অনেক ক্ষেত্রে এতে কাজ হয়। যেমন হয়েছিল ১৯৭৫-এ। কিন্তু মফস্বলের ব্যাপারটি একটু ভিন্ন ধরনের।

ওখানে জেলা অথবা মহকুমা প্রশাসনই সর্বেসর্বা, তাঁদের ওপর প্রভাব বিস্তার করা অসম্ভব।

প্রসঙ্গত আমার মনে পড়ে গেল বছর চারেক আগের একটি ঘটনা। কথায় কথায় একদিন তৎকালীন শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমাদের নাট্যচর্চায় আমাদের সরকার কীভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারেন এবং তাঁদের কাছে আমাদের কিছু

চাওয়ার আছে কিনা। আমি সবিনয়ে বলেছিলাম যে সরকারের কাছে আমাদের কিছুই চাওয়ার নেই এবং নাট্যচর্চায় সবকাবেব সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সাহায্য হবে এই, অবাধে এবং নির্বিবাদে অগ্রসরমান শিল্পমাধ্যমটির চলার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করা। অর্থাৎ, সোজা কথায় আমবা আপানাদের কাছে কিছুই চাই না, কোনো অযাচিত হস্তক্ষেপ তো নয়ই। কারণ আমি জানি যে সাহায্য হিসেবে তৃতীয় বিশ্বের যে কোনো সরকারে কাছ থেকে কিছু গ্রহণ কবা হলেই তাঁদেবই বেঁধে দেওয়া সুরে গাইতে হবে গান।

তবুও আমরা যারা ঢাকায় আছি তাদেব সৌভাগ্য যে মাঝে মধ্যে এইরকম আইন প্রণয়নকারীদের সাক্ষাৎ ঘটে, যাব ফলে আইন প্রয়োগকারীদের রক্তচক্ষু এড়ানো আমাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় না। কিন্তু যেমন বলেছি, মফস্বলে তা সম্ভব নয়। সেখানে সব অনাচাব মেনে নিয়েই সীমিত স্বাধীনতার গন্ডিতে আবদ্ধ হয়েই সংস্কৃতিব চর্চা করতে হয়। বিংশ শতাব্দীব সপ্ত দশকের শেষভাগে একটি স্বাধীন দেশেব নাগবিকের জন্যে এর চেয়ে অধিক মর্মপীড়াব আর কী থাকতে পাবে।

এইখানেই আমার এই নিবন্ধেব শীর্ষে উচ্চারিত শব্দগুলো, যেমন উপনিবেশবাদ, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি মূলত ইতিহাসেব আলোয় প্রণিধানযোগ্য।

চার্লস অ্যালিসন সম্পাদিত Plain Tales From The Raj শীর্ষক একটি অত্যন্ত চমকপ্রদ গ্রন্থ পড়ছিলাম এই কয়েকদিন আগে। এই গ্রন্থে ভাবতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনামলে বিভিন্ন ব্রিটিশ কর্মচারীব শ্রেণি বিন্যাস, তাদের জীবনযাত্রা, তাদের মানসিকতা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদির ওপর বিশদালোচনা করেছেন তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতে অবস্থানকারী একাধিক শ্রেণি, ক্ষমতা এবং পেশায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ। ঐ বিশেষ সময়ের ওপর সবাব প্রতিবেদনে যে একটি বিষয় পবিচ্ছন্নভাবে দৃশ্যমান তা হল একটি উপনিবেশবাদী জাতিব উপনিবেশ শাসনের যথার্থ মানসিকতা। যেমন তখনকাব সিভিল সার্ভিসের কথাই ধবা যাক; স্যুট, টাই, হ্যাট, ছোটা হাজারি, বড়া হাজারি, লাঞ্চ, ডিনারেব সাথে সাথে ব্রিটিশ সাহেবদের প্রায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে যে বিশেষ বস্তুটি তাঁদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে বিচরণ করত তা হল একটি ব্যাটন অথবা যষ্টি। নেটিভদের আয়ত্তে বাখবার জন্যে কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যম প্রয়োগ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার এবং তাব জন্যে যষ্টি বস্তুটি ছিল অপবিহার্য। যে কোনো উপনিবেশবাদী সরকারের ক্ষমতা জাহিরের জন্য এবং ক্ষমতা রক্ষার জন্য যষ্ঠি দিয়ে শুরু কবে বাইফেলের নল অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এই অস্ত্রগুলো ব্যবহারের যথোপযুক্ত আইন স্পষ্টভাষায় প্রণীতও আছে তাদের এই কর্মে সহযোগিতা করবার জন্য। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আশ্চর্য হতে হয় যখন দেখি একটি মহাবিপ্লব দ্বারা সদ্য স্বাধীন একটি দেশে নির্বিবাদে ছড়ি ঘুরছে দেশজ আমলার আঙুলের ডগায়। তবে একটু তলিয়ে দেখলেই আব আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না, কারণ আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের আমলা তৎকালীন ব্রিটিশ উপনিবেশ অথবা তৎপববর্তী পাকিস্তানি উপনিবেশবাদ-সৃষ্ট একই শ্রেণির, চরিত্রেব এবং মেজাজেরই আমলা। বস্তুতপক্ষে আজকের আমলার জন্য পাকিস্তানি আমলা সৃষ্টিকাবী আঁতুবঘর লাহোরস্থিত অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজে যার জন্ম ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সূতিকাগারে। ফলে, ক্লাইভ—হেস্টিংস্ যে দণ্ডটি হস্তান্তর কবেছিলেন আয়ুব ইয়াহিয়ার হাতে, সেই দণ্ডটিই আজকের বাংলাদেশেরও শাসনদণ্ড। স্বাধীনতা যুদ্ধে লক্ষ প্রাণ বিসর্জন, অসংখ্য মা-বোনের সম্মানহানি হলে যে বৃত্তটি ভেদ করে বৃহত্তর জীবনবোধের পথে পা বাড়িয়েছি বলে ভেবেছিলাম, সে বৃত্তটি যেমনকাব তেমনটি আছে। কারণ, উপনিবেশবাদী অস্ত্রবাজদের পবিহার কবতে পাবলেও তাদের সৃষ্ট শাসনকর্তাদের চক্রভেদ করা সম্ভব হয়নি। প্রকৃতপক্ষে শহব জনপদ ও পল্লি অঞ্চলে সরকারি ক্ষমতাব প্রয়োগে তাদেবই সাহায্য প্রয়োজন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এ অদৃষ্টের পবিহাস।

যা হোক সামগ্রিকভাবে সমস্যাটিকে বিশ্লেষণ করলে এই নিবন্ধের পরিসর আয়তনে বিশাল হয়ে উঠবে বিধায় আমার আজকেব আলোচনায় বিষয় মঞ্চনাটকের ওপরেই আলোকপাত করা যাক। মফস্বলের প্রশাসনের কাছে অহরহ শোনা যায় যে রাজধানীতে প্রণীত অথবা পরিবর্তিত কোনো বিশেষ আইনের কথা তাদেরকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানাননি এবং যতদিন না পর্যন্ত ঐ সম্বন্ধে কোনো সরকারি নির্দেশ প্রপার চ্যানেল মারফত তাঁদের কাছে এসে পৌঁছায় ততদিন সেই আঠারো শো ছিয়াত্তর এবং উনিশশো বাইশ সালের বয়সের ভারে ন্যুব্জ বাদামি রংধারী আইনের চটিগ্রন্থ দুখানি আমাদের নাটক প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করবে। প্রসঙ্গত একটি মজার ঘটনা মনে পড়ে গেল। কোনো এক হাকিমের দপ্তরে উল্লেখিত আইন সম্বলিত গ্রন্থ দুখানি দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। পাঠক শুনে আশ্চর্য হবেন যে ঐ গ্রন্থে এখনও শহর কলকাতা এবং জনপদ হাওড়াব সূত্র ধরে আইনগুলো বর্ণিত আছে অর্থাৎ গত একশো' বছরে কত তাণ্ডব ঘটে গেল এই ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে তার কোনো ছোঁয়াই লাগেনি ঐ মান্ধাতাব আমলের গ্রন্থ দুটোতে। যেমন প্রবীণ লোকদের কাছে শুনে এসেছি, 'হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না'।

কে শোনাবে ওদের যে ৫২-র ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধেব অন্যতম প্রধান কারণ এবং উদ্দেশ্য ছিল ঘুণে ধবা একটি প্রশাসনিক কাঠামোকে ভেঙেচুরে দিয়ে নতুন যুগোপযোগী প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা? কে বলবে ওদের যে প্রশাসনিক যন্ত্রে কর্মরত কর্মচারীরা আর রাজকর্মচারী নয়, তারা জনগণেব ভৃত্য এবং তাদেব কাজ সমাজের স্বভাব-সুলভ আগে বেড়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে জনগণের সাহায্যে এগিয়ে আসা?

অবশ্য আমাদের সৌভাগ্য যে, সকল আমলা একই মানসিকতার নয়। এমন অনেক প্রশাসনিক কর্মচারী আছেন যাঁরা বস্তাপচা ঔপনিবেশিক অধ্যাদেশকে উপেক্ষা করে অথবা আইনের ফাঁক বার করে শিল্পকলায় পথকে মসৃণ করতে সচেষ্ট। একটি স্বাধীন দেশে সত্যিকার জনকল্যাণের উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো প্রশাসক যদি স্বীয় কাজ কবতে চান তবে অতি সহজেই তিনি নিজের গরজে এবং সদিচ্ছায় দিজেই পরিবর্তিত আইন সম্বন্ধে অবহিত হতে পারেন এবং সংস্কৃতিকর্মীদের সাথে একটি প্রতিরোধী অবস্থায় সৃষ্টি না করে তাঁদের বন্ধুব আসনে সমাসীন হতে পারেন। বস্তুত, একটি স্বাধীন দেশের নবমূল্যবোধ প্রশাসকের দৃষ্টিভঙ্গি এরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং মঙ্গলকর। কারণ, পৃথিবীর ইতিহাসে কে কবে শুনেছে যে নাট্যমঞ্চ থেকে দেশদ্রোহিতার মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে? অথবা স্বাধীনতা হানিকর কথাবার্তা বলা হয়েছে? বরঞ্চ সমাজের দর্পণ যে মঞ্চ তাতে প্রতিফলিত অনেক সামাজিক অমঙ্গলের চিত্রদ্বাবা প্রশাসনিক কর্মচারীই তো লাভবান হতে পাবেন। শিক্ষালাভ কবতে পারেন, জানতে এবং বুঝতে পারেন, শাসকের বঙিন চশমা এঁটে নয়, সমাজ সংস্কারকের দৃষ্টি দিয়ে।

নচেৎ বাধা দিলে বাধে লড়াই, যা সমগ্র জাতির জন্যেই অকল্যাণকর।

গ্রুপ থিয়েটার ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

জিয়া হায়দার

থিয়েটাব বিষযটিই একাধিক সম্মিলিত কর্মফল, অর্থাৎ থিয়েটার-কর্ম মাত্রেই একটি গ্রুপের কর্ম। এদিক থেকে গ্রুপ থিয়েটার অভিধাটিব আলাদা কোনো অর্থ নেই।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও গত চার দশক থেকে গ্রুপ থিয়েটার নাট্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারীরূপে বিশেষ স্থান পেয়ে আসছে।

১৯২৯ সালে নিউইয়র্কে হ্যাবল্ড ক্লাবম্যান, লি স্ট্র্যাসবার্গ, চেরিল ক্রফোর্ড প্রমুখ কযেকজন তরুণ নাট্যকর্মী 'গ্রুপ থিয়েটাব' নাম দিয়ে একটি নাট্যদল গঠন করেন — dedicated to the principles of group acting as formulated by Stanislavsky and practised at the Moscow Art Theatre.

সম্ভবত এদেবই অনুসরণে লন্ডনেও প্রতিষ্ঠিত হল আরেকটি গ্রুপ থিযেটার, ১৯৩৩-এ— with the object of presenting modern non-commercial and experimental plays.

নিউইয়র্কেব গ্রুপ থিযেটারের প্রতিষ্ঠাতারা সকলেই ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত থিযেটাব গিল্ডের সদস্য-কর্মী ছিলেন। গিল্ডেব পরিচয ছিল— a membership society for the presentation of distinguished and non-commercial American and foreign plays....

এরও তিনবছর আগে ১৯১৬ সালে গঠিত হয় প্রভিন্সটাউন প্লেয়ার্স, লক্ষ্য ছিল— to give American playwrights a chance to work out their ideas in freedom.

গ্রুপ থিযেটার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই যদিও কথাটি নাট্যজগতে চলে আসছে, কিন্তু এই concept-টিব প্রথম উন্মেষ ঘটে উনিশ শতকের আটের দশকে। রিয়্যালিস্টিক-ন্যাচারালিস্টিক থিয়েটারের জয়যাত্রা এবং ইবসেন, স্ট্রিন্ডবার্গের শক্তিমত্তা সত্ত্বেও য়ুবোপে তখন well made plays-এব দৌরাত্ম্য। প্যারিসের গ্যাস কোম্পানিব একজন সামান্য কর্মচাবী শৌখিন অভিনেতা আঁদ্রে আঁতোযা well made তথা সস্তা কমার্শিয়াল নাটকের প্রতি হয়ে পড়লেন বীতশ্রদ্ধ, গঠন করলেন থিয়েটার লিবর, উদ্দেশ্য কমার্শিয়ালিজমকে উপেক্ষা করে ন্যাচারালিস্টিক থিযেটাবকে প্রতিষ্ঠা দেওযা। ১৮৯৪-এ তাঁব প্রথম প্রোডাকশন অর্থকরী দিক থেকে অতীব দুঃখজনকভাবে বার্থ, কিন্তু ইতিহাসকাবেরা বলে থাকেন it had an immense cultural value.

প্রথম মহাযুদ্ধ য়ুরোপের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবনে যেমন সাংস্কৃতিক জগতেও তেমনি বিপর্যয় এনে দেয়। এই বিপর্যয়ের অন্যতম ভয়াবহ শিকার জার্মানিতে মহাযুদ্ধেব পরপরই নতুন রাজনৈতিক চিন্তা, মার্কসবাদের প্রসার ঘটতে থাকে। রাজনৈতিক সচেতন নাট্যকর্মীবা পুরোনো নাট্যধাবাকে অস্বীকার কবলেন গতানুগতিক নাট্যকর্ম তথা কমার্শিয়ালিজম যেহেতু জনগণকে কী রাজনৈতিক কী শৈল্পিক কোনোদিক থেকেই সচেতন, আন্দোলিত বা আলোড়িত কবতে পারে না, সেই হেতু ঐ নাট্যধারা বর্জনীয় বলে তাঁরা বায় দিলেন। সংগঠিত হল শ্রমিক নাট্যদল, এলো অ্যাজিটপ্রপ প্রভৃতি। মার্কিন মুলুকেও তার অভিঘাত দেখা দিল— লিভিং নিউজ পেপার নাট্যদল সরাসরি পথে নামল নাটক করতে; সেখানেও গঠিত হল অ্যাজিটপ্রপ।

পববর্তীকালেও এর প্রবাহ থামেনি। নিউইয়র্কের কমার্শিয়াল নাটকের স্বর্গরাজ্য ব্রডওযেব বিবোধিতায় আবির্ভূত অফ-ব্রডওয়েব অনুসবণ করে গড়ে উঠল অফ-অফ ব্রডওয়ে, দি ওপেন থিযেটার, দি লিভিং থিয়েটার, লা মামা এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটাব, দি হ্যাপেনিংস, পারফরমেন্স গ্রুপ, কাফে চিনো রেস্টুরেন্ট থিয়েটার প্রভৃতি। অন্য প্রান্ত সানফ্রান্সিস্‌কোতে তৈবি হল

সানফ্রান্সিস্‌কো মাইম ট্রুপ, আমেরিকান কনজারভেটবি থিয়েটার, বার্কলির ম্যাজিক থিয়েটাব প্রভৃতি। লন্ডনের ওয়েস্ট এন্ড, পিকাডিলির বিপক্ষতা বহুদিন পরে শুরু হলেও— ব্রিস্টল ওল্ডভিক ও অক্সফোর্ড প্লে-হাউসের নাট্যকৃতি ব্যতিবেকে— কমার্শিয়ালিজমকে আঘাত হানবার পথ প্রশস্ত করে দিল রয়াল শেক্সপিয়র কোম্পানি ও ন্যাশনাল থিয়েটাব; আব ওদিকে আঁদ্রে আঁতোয়ার শিষ্য জ্যাক কোপ্যু, ১৯১৩ সালে ভিউ কলম্বিয়ের প্রতিষ্ঠা করে এগিয়ে আনলেন থিয়েটারের সর্ববিধ এক্সপেরিমেন্টকে (in an effort to bring back truth, beauty and poetry to the French stage), এবং জাঁ লুই বাবল ও পল ক্লদেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পববর্তী পশ্চিম জার্মানির বিভিন্ন শহবে গড়ে উঠল এমন ইনটিমেট থিয়েটার, যা ড্রয়িংরুমের পবিসরেও প্রাণবন্ত; এবং পূর্ব জার্মানিতে প্রতিষ্ঠিত হল বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রিপারটবি ব্রেখটেব বার্লিনাব এনসেম্বল; অপর একটি সমাজতন্ত্রী দেশ পোল্যান্ডে ইয়ারজি গ্রোটোওস্কী তার ল্যাবরেটরি থিয়েটারের কর্মকৃতির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করলেন এমন নাট্যচিন্তা যার কনসেপটকে বললেন তিনি Poor Theatre, যেখানে তিরিশ বা পঞ্চাশজন দর্শকের বেশি তিনি প্রয়োজন বোধ করেন না।

পার্শ্ববর্তী ভাবতের নাট্যজগতেও অনুরূপ বিপ্লব ঘটেছে। চল্লিশ দশকের গোড়াতে গঠিত ভাবতীয় গণনাট্য সংঘেব কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা রাজনীতির কাবণে, কম্যুনিস্ট পার্টির দ্বাবা। পববর্তীকালেব বহুরূপী গণনাট্য সংঘেরই প্রতিষ্ঠাকালের কর্মীদের কয়েকজনকে নিয়ে, এবং প্রাথমিক যুগে বহুরূপী দিবেদিত নাট্যকর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল রাজনীতি সচেতনতা, কলকাতার আরেকটি নাট্যদল , উৎপল দত্তেব পি.এল.টি-র চরিত্র এখনো রাজনৈতিক।

এমনিতরো আবো অনেক নামের উল্লেখ কবা যায়, যাবা গতানুগতিক নাট্যধারার বিরুদ্ধে, নিরেট সস্তা কমার্শিয়াল মনোভঙ্গির বিরুদ্ধে সুস্থ শিল্প ও জীবনবোধ সম্পন্ন, ভিন্ন চেতনা নির্ভর, নিরীক্ষাধর্মী নাট্যধারা সৃজনে ব্রতী হয়েছে। এখনো হচ্ছে, বর্তমানের নবনাট্য পুরোনো হযে গেলে— হয়ে যাবেই, ভবিষ্যতেও হবে।

এখন দেখা যাক এইসব নামেব নাট্যদলগুলোকে কেন পৃথক বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করছি আমরা, কেন সেগুলোকে 'গ্রুপ থিযেটার' এই বিশেষ অভিধায সম্মানিত কবছি?

এই আলোচনায় ব্যবহৃত কয়েকটি বাক্যাংশ পুনবায উদ্ধৃত করলেই 'গ্রুপ থিয়েটারের' চরিত্র আরো খোলাসা হবে। 'Principles of group acting', 'object of presenting moden non-commercial and experimental plays', ' a membership society', 'ideas in freedom', 'cultural value', 'truth, beauty and poetry', 'রাজনৈতিক সচেতনতা' প্রভৃতি কথা ও ভাবনাগুলি 'গ্রুপ থিযেটাব' ভিত্তিভূমি রচনা কবেছে; এবং পুনরায় উল্লেখ করছি, 'গ্রুপ থিয়েটাব'-কর্মীদের নব-নাট্যধারা সৃজনে উদ্বুদ্ধ করেছে।

'গ্রুপ থিযেটার' অতএব কোনোমতেই কমার্শিয়াল থিয়েটার নয়। কমার্শিয়াল থিয়েটারের প্রধান লক্ষ্য ব্যবসা, 'গ্রুপ থিয়েটারের' শিল্পকর্ম।

ব্যবসাভিত্তিক বলেই কমার্শিয়াল থিয়েটারের সঙ্গে সংযুক্ত নাট্যকর্মীদের ঐ দলেব প্রতি দায়দায়িত্ব থাকে না, থাকলেও বড়ো গৌণ। অপর পক্ষে 'গ্রুপ থিয়েটারের' নাট্যকর্মীরা অখণ্ডভাবে একটি যৌথ পবিবার। অর্থাৎ কমার্শিয়াল থিয়েটারেব কর্মীদের বিশেষ কোনো নাট্যদলের প্রতি loyalty-ব প্রয়োজন করেন না, আর 'গ্রুপ থিয়েটাব'-এ loyalty অপরিহার্য, থিয়েটার তাদেব সার্বক্ষণিক পেশা না হলেও। কোনো নাট্যদলের বা প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করলেও কমার্শিয়াল থিয়েটাবে এক বা একাধিক পুঁজি বিনিয়োগকারী থাকে; 'গ্রুপ থিয়েটারে' কোনো মালিকানা নেই— এক বা একাধিক ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকেন, থাকতে পাবেন, অথবা পুঁজি বিনিয়োগের প্রশ্নও নেই, কারণ সেখানে লাভ-অলাভের প্রশ্নটি প্রধান নয়, যেটি রয়েছে কমর্শিয়াল থিয়েটাবে।

পুঁজির প্রশ্নেই দেখা যায়, কমার্শিয়াল থিয়েটার এমন নাট্যের প্রতিই সদা আগ্রহী যে নাট্য বক্সঅফিস সাকসেস আনবে; 'গ্রুপ থিয়েটার' লক্ষ্য বক্স অফিস সাকসেস নয়, non-commercial নাটক করতে সক্ষম, নাটক নিয়ে রচনা ও উপস্থাপনা উভয় দিক থেকেই বিভিন্ন রামের experiment করতে পিছপা হয় না।

গ্রুপ থিয়েটার star-value-তে বিশ্বাসী নয়; আর কমার্শিয়াল থিয়েটারের তার ওপরই নির্ভর করতে হয়, কারণ তাদের নাট্যকর্ম 'শিল্প' কিনা সে বিচারে তারা যাবার প্রয়োজন বোধ করে না, না যেয়ে 'স্টারকে' দেখিয়ে অর্থোপার্জন করাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য বলে বিবেচনা করে।

গ্রুপ থিয়েটারের কর্মীরা, বিশেষভাবে গ্রুপের সঙ্গে সংযুক্ত নাট্যকার যে স্বাধীনতা পেয়ে থাকেন, তার চিন্তাকে বক্তব্যকে, দর্শনকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় নাট্যরূপ দেওয়ার প্রয়াস ও সুযোগ পান, কমার্শিয়াল থিয়েটারের নাট্যকারের পক্ষে তা আদৌ সম্ভব নয়। নাট্য ইতিহাসের বিবর্তনে, বিশেষভাবে এই বিশ শতকে এত দ্রুত যে সব drama genre-এর বিকাশ ঘটেছে ও ঘটছে তার পেছনে একমাত্র কারণ 'গ্রুপ থিয়েটারের' নীতি অনুসারে পাওয়া নাট্যকারের স্বাধীনতা। Provincetown Players যদি স্বাধীনতা না দিত তাহলে ইউজিন ও নীল আসতেন কিনা প্রশ্ন তোলা যায়, গ্রুপ থিয়েটার (নিউইয়র্ক) না থাকলে ক্লিফোর্ড ওডেট্স- এর মতো নাট্যকার প্রতিষ্ঠা পেতেন কিনা, ওপেন থিয়েটার-এর জন্যেই জাঁ-ক্লড ভ্যান ইটালির প্রতিষ্ঠা অথবা আমাদের এখানে, ঢাকা থিয়েটারের কর্মী-সদস্য না হলে সেলিম আল-দীন।

গ্রুপ থিয়েটার নাট্যকর্মের শিল্পত্বে বিশ্বাসী ও নিবেদিত। তাদের লক্ষ্য একটিই, নাটকের ভোক্তার সংস্কৃতি চিন্তা ও জীবনবোধকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করার দিকে, তাৎক্ষণিকতার প্রতি নয়। কমর্শিয়াল থিয়েটার যেহেতু থিয়েটারকে commodity রূপে গ্রহণ করে থাকে, ফলে সংস্কৃতি চিন্তা, রুচি, শিল্পবোধ প্রভৃতি সংস্কৃতিচর্চার আবশ্যিক শর্তসমূহকে উপেক্ষা করে থাকে। Commodity রূপে গণ্য করার জন্যেই সস্তা ও হীনরুচির আশ্রয় তাদের নিতে হয়। আর সে জন্যেই সাম্প্রতিক কালের কলকাতার কমর্শিয়াল নাটকে ক্যাবারে নাচানাচি ইত্যাদির এত প্রাধান্য যার ঢেউ আমাদের কমার্শিয়াল উদ্দেশ্য পরিবেশিত নাটকগুলোতেও লেগেছে।

গ্রুপ থিয়েটারের তাৎক্ষণিক সার্থকতা লক্ষ্য নয় বলেই দেখা গেছে গ্রুপ থিয়েটারের impact অনুসন্ধান করতে সময় লাগে। গ্রুপ থিয়েটার নিরন্তর experiment-এর মধ্য দিয়ে অগ্রসরমান বলে তারাই থিয়েটারকে 'dynamic' ও 'living art' করে তুলতে পারে, করে তোলে। নিউইয়র্কের বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটারের প্রভাব তাদের শুরুর কালে যতটা না বোঝা গিয়েছিল এখন আরো স্পষ্টরূপে তা প্রতিভাত। ফলে গত ১৫/২০ বছর open theatre থেকে শুরু করে environmental, street theatre প্রভৃতি আমেরিকার সাম্প্রতিক নাট্যপ্রবাহকে চঞ্চল করে রেখেছে। গণনাট্য সংঘের প্রভাবের মূল্যায়ন এখন আরো ভালোভাবে করা যায়— বহুরূপী, নান্দীকার বা লিট্‌ল্ থিয়েটার প্রভৃতির যে প্রতিষ্ঠা, তা গণনাট্য সংঘেরই অবদান।

গ্রুপ থিয়েটার— এই concept-এর ভেতরেই অন্যতম উপাদান হিসাবে নিহিত রয়েছে সমাজ-রাজনীতি। প্রধানত বিশের দশক থেকেই থিয়েটারকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির আলোকে দেখার প্রয়াস শুরু হয়। কমার্শিয়াল থিয়েটার রাজনীতির মতো বিষয়কে তাদের কর্মের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেনি, কারণ রাজনৈতিক চেতনা-নির্ভর শিল্পকর্ম ব্যবসার পরিপন্থী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় রাজনৈতিক সামাজিক চিত্র তুলে ধরার বা আঘাত হানার ক্ষমতা ছিল গ্রুপ থিয়েটারের, লিভিং নিউজপেপারের, লিভিং থিয়েটারের; এখন রয়েছে সানফ্রান্সিসকো মাইম ট্রুপ, গেরিলা থিয়েটার , স্ট্রিট থিয়েটার, নিগ্রো নাট্যগোষ্ঠীগুলোর। জার্মানিতে এ দায়িত্ব নিয়েছিল

পিসকাটর-ব্রেখটের নাট্যদল, এবং প্রলেট বুহনে; ভারতে নিয়েছিলো গণনাট্য সংঘ। কোনো নাট্যপ্রযোজক, যিনি পুঁজি খাটিয়ে থাকেন, নিতে পারেন না; নেয়নি কলকাতার স্টার বা বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষ। বিশ শতকের গোড়া থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারত-পাকিস্তান বিভাগ পর্যন্ত অবশ্য স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা নাট্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে কিন্তু তা গ্রুপ থিয়েটার কনসেপ্টের অন্তর্ভুক্ত নয়।

গ্রুপ থিয়েটারেব কর্মরীতিব প্রতি লক্ষ করলে এটা দেখা যাবে যে এর সমস্ত কর্মই যৌথভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। অবশ্য কমার্শিয়াল থিয়েটারেও তাই-ই হয়ে থাকে কেননা থিয়েটার শিল্পটিই যৌথশিল্প। কিন্তু কমার্শিয়াল থিয়েটাবের সঙ্গে এব স্পষ্ট ভেদরেখা এখানে যে গ্রুপেব কর্মীদের কাছে দলগত মান ও শিল্পকর্মেব মর্যাদা প্রাণ আর কমার্শিয়াল প্রতিটি কর্মীর কর্মকৃতির মাপকাঠি অর্থ বা মজুরিভিত্তিক। সেহেতু এমন গ্রুপ থিয়েটার পবিচয়েও বিদ্যমান যাদের নাট্যকর্ম কোনো ব্যক্তিব নাম বিশেষ উল্লেখ্য নয়— নয নাট্যকারের বা নির্দেশকের। গণনাট্য সংঘের গোড়াব দিককার নাটক 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' কে বা কারা পরিচালনা করেছিলেন তা জোব করে বলা যাবে না, দিল্লির নাট্যকাল গোষ্ঠী এখনো তাদের নাট্যকারের বা নির্দেশকের নাম উল্লেখ করে না, নাট্যকাল গোষ্ঠীর সদস্যবাই যৌথভাবে নাটক-রচয়িতা, নির্দেশনার দায়িত্বও যৌথভাবে তাদেরই, মোদ্দা কথা গ্রুপ থিয়েটারে কোনো individual -এব বিশেষ মূল্য নেই, মূল্য সম্পূর্ণতই দলগত। অবশ্যই পাশ্চাত্য গ্রুপ থিয়েটারের কর্মীবাও অর্থলাভ কবে থাকে, কিন্তু তা কমার্শিয়াল থিয়েটারের সঙ্গে তুল্য নয় এবং তাতে গ্রুপ থিয়েটারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না।

সরকারি আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতাও পেয়ে থাকে গ্রুপ থিয়েটার। আব কমার্শিয়াল থিয়েটার সরকারকে দিয়ে থাকে ট্যাক্স। নাট্য ইতিহাসে দেখা যায় যতদিন থিয়েটার ব্যবসাপণ্য না হয়েছে ততদিন তা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে এসেছে— গ্রিক আমল থেকে রেনেসাঁ যুগের বিভিন্ন কোর্ট পরিপোষিত থিয়েটার তার প্রমাণ। গ্লোব বা সোয়ান বা রোজ, এ সব থিয়েটার এলিজাবেথীয় দরবারের কোনো সাহায্য পেয়েছে বলে জানা নেই। যখনই commodity রূপে থিয়েটারকে ব্যবহার কবা শুরু হয়েছে তখন থেকে জনগণ অর্থাৎ দশক হয়েছে তার পৃষ্ঠপোষক। স্বভাবতই দশককে খুশি রাখার প্রয়োজন প্রধান হয়েছে থিয়েটার নামক commodity-র নিয়ন্তাদের। সমসাময়িক কালে, আমার জানা মতে, মার্কিন সরকাবের National Endowment for the Arts সংস্থাটি ১৯৭৩-এব আর্থিক বছরে Experimental Theatres, New Play Producing Groups ও Playwright Development Program-এ মোট ৪২টি প্রতিষ্ঠানকে অনুদান দিয়েছে ৪,০৭,৫০০ ডলার, এবং Professional Theatre কোম্পানিগুলোকে (মোট ৬৪) দিয়েছে ২০,২০,৫০০ ডলাব। এই Professional কোম্পানিগুলোর মধ্যে সেইসব দলই অন্তর্ভুক্ত যারা গ্রুপ থিয়েটারের শর্তাবলী সম্পন্ন করে আসছে। এ সব দলের মধ্যে রয়েছে La Mama Experimental Theatre Club, The Negro Ensemble, Tyron Guthrie Theatre Foundation, Lincoln Centre, Yale University Repertory Theatre contemporary theatre, American Shakespeare Festival theatre প্রভৃতি। ফরাসি সরকার কমেডি ফ্রাঁসাযেজ ও আরো দুটি প্যারিসীয় নাট্যদল (ন্যাশনাল থিয়েটারেব মর্যাদাসম্পন্ন) ছাড়াও আরো কুড়িটি প্রাদেশিক নাট্যদলকে সাহায্য দিয়ে থাকে, কারণ তারা ফ্রান্সেব সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত করে আসছে। (Decentralized theatrical companies have culturally stimulated the French provinces for almost 30 years. The results obtained by these companies, initially private troops, have led competent cultural

authorities in France to grant them increasingly larger subsidies providing them with the resources needed to continue their work.– News Briefs from France, No. 1321.1 Nov. 1975) কলকাতাতেও দেখি বহুরূপী নান্দীকার প্রভৃতি নাট্যদলই অর্থাৎ গ্রুপ থিয়েটারই সরকারি সাহায্য, কর মওকুফ পেয়ে আসছে, স্টার বা মিনার্ভা বা বিশ্বরূপা নয়।

গ্রুপ থিয়েটারের যে বৈশিষ্ট্য চরিত্র, লক্ষণ ও নীতির কথা বলা হল, তা পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, গ্রুপ থিয়েটারের উদ্ভব ও বিকাশ কমার্শিয়াল থিয়েটারকে তথা পুরানো হয়ে যাওয়া নাট্যধারাকে বিরোধিতা করেই, তাকে প্রতিবাদ করেই এবং তার প্রতিপক্ষে নতুন নাট্যচিন্তা ও নাট্যধারা সৃজন করার জন্যেই ঘটেছে, এখনো ঘটছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে।

গ্রুপ থিয়েটার সম্পর্কে এতক্ষণের আলোচনা স্মরণে রেখে আমরা দেখতে চেষ্টা করব বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় এখানের নাট্যদলগুলোর ভূমিকা ও বৈশিষ্ট্য কী।

মনে রাখা দরকার ঢাকায় তথা বাংলাদেশে নাট্যচর্চার কোনো ঐতিহ্য ছিল না। ব্রিটিশ আমলে নাট্যচর্চার স্থান ছিল কলকাতা; ঢাকা বা অন্য কোনো শহরের commodity theatre বলতে যা বোঝায় তাও গড়ে ওঠেনি। ঢাকা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হবার পরও নাট্যচর্চার নিয়মিত স্থান হয় না। চর্চা যেটুকু হত তা শৌখিন ও ক্ষণস্থায়ী। চলচ্চিত্র শিল্প ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গড়ে উঠলেও নাটকের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেনি। দলগত মালিকানায় অবশ্য মিনার্ভা থিয়েটার্স, নীতা থিয়েটার্স প্রমুখ কয়েকটি পেশাদারি নাট্যদল অনিয়মিতভাব নাটক করতে শুরু করে। এদের জীবনকালও ক্ষণস্থায়ী। অন্যদিকে একমাত্র ড্রামা সার্কল ছাড়া এমন কোনো গ্রুপ থিয়েটার গড়ে ওঠেনি যাকে গ্রুপ থিয়েটারের আলোকে বিচার করা যেতে পারে। ড্রামা সার্কলের আয়ুষ্কাল পাকিস্তান আমলে প্রায় দশ বছর। এ দেশের গ্রুপ থিয়েটার কর্মকৃতিতে, যতটুকুই হয়ে থাক, ড্রামা সার্কেল পথিকৃৎ।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই বিশেষভাবে ঢাকায় নিয়মিত ও ব্যাপকভাবে নাট্যচর্চা শুরু হয়েছে। এই চর্চা গত কয়েক বছরে বেশ কটি নাট্যদল আত্মনিয়োগ করেছে। প্রথম দিকে ১৯৭৩ ও ৭৪ এই দুই বছরে মাত্র পাঁচটি কি ছ'টি দল নাট্যচর্চার নিয়োজিত হয়। ১৯৭৫-এর মে মাসে তৎকালীন সরকার নাট্যানুষ্ঠানের ওপর থেকে প্রমোদ কর তুলে নেওয়ার পর থেকে মাত্র ছমাসে গোটা দশেক নাট্যদলের আবির্ভাব ঘটে। বর্তমানে এক ঢাকাতেই পঁচিশটিরও বেশি নাট্যদল নাট্যচর্চার নিরত।

এখন পর্যালোচনা করা যাক, এগুলোর ভেতরে কটি দল গ্রুপ থিয়েটারের শর্ত পূরণ করে থাকে ও তার আদর্শে আদর্শায়িত। এ দেশের সাম্প্রতিক নাট্যচর্চাকে যারা লক্ষ করে আসছেন তাঁরা নিশ্চয়ই এটাও লক্ষ করেছেন যে ইতিপূর্বে গ্রুপ থিয়েটার সম্পর্কে আমি যে সব বৈশিষ্ট্য ও নীতির কথা উল্লেখ করেছি, খুব সঠিকভাবে কম দলই সে অনুযায়ী গ্রুপ থিয়েটারের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। যদিও প্রায় সবগুলি দলের চরিত্রের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। প্রাথমিক পর্যায়ে ত্রৈমাসিক 'থিয়েটার' পত্রিকার সৌজন্যে এ দেশের নাট্যচর্চা ও নাট্যদলের ভূমিকা প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি নাট্যদলের বক্তব্য জানতে পেরেছি তখনো প্রমোদ কর মওকুফ হয়নি। তাদের বক্তব্য থেকে জেনেছি যে, কোনো দলের লক্ষ্য দর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখার জন্যে দর্শকদের উদ্বুদ্ধ করে তোলা অর্থাৎ দর্শক সৃষ্টি করা এবং স্বদেশি নাট্যকর্মকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েও বিদেশি নাট্যকর্ম ও নাট্যচিন্তাকে রূপান্তর বা অনুবাদের মাধ্যমে উপস্থাপনার দ্বারা সুস্থ ও রুচিশীল নাট্যচর্চার পরিবেশ গড়ে তোলা; অপর দলের দর্শক সৃষ্টিই প্রধান উদ্দেশ্য; আরেকটি দলের লক্ষ্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তা-নির্ভর ও নিরীক্ষাধর্মী নাট্যকর্মের মাধ্যমে দর্শক সমাজকে দেশ-কাল সম্পর্কে

সচেতন করে তোলা, আরো একটি দলের বিমূর্ত নাট্য-সাহিত্য ইত্যাদি। পরবর্তী সময়ে ১৯৭৫-এর শেষ দিকে থেকে যে সব নাট্যদলের আবির্ভাব তাদের কাছ থেকে আমরা কোনো পৃথক বক্তব্য পাইনি, এমন কী কোনো বক্তব্যই নয়। ধরে নেওয়া যায় তাদের বক্তব্যও তাদের অগ্রজ দলগুলোর অনুরূপ।

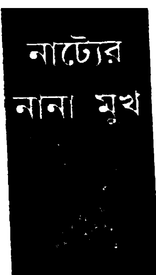
কিন্তু তবুও ব্যত্যয় আছে। কর মওকুফের পর যে সব দল গঠিত হয়েছে তাদের কয়েকটি মনোভঙ্গির দিক থেকে গ্রুপ থিয়েটারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। 'গ্রুপ থিয়েটারের' কর্মীরা থিয়েটারকে commdity হিসাবে গণ্য করে না, অর্থ উপার্জনের মাধ্যমরূপে থিয়েটারকে তারা উপাসনা করে না— উপাসনা শব্দটি আমি সজ্ঞানে তার সর্বপ্রকার আবহ স্মরণে রেখে ব্যবহার করছি। কিন্তু লক্ষ করা যাচ্ছে উক্ত দলগুলোর মনোভঙ্গি ও চেতনা থিয়েটারকে প্রধানত commodity ও ব্যবসা মাধ্যম রূপে গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের জন্যে এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, দর্শক সৃষ্টিই শুধু নয়, দর্শককে সুস্থ ও উন্নত রুচির দিকে টেনে তোলা; চিন্তা, চেতনা, সৌন্দর্য ও শিল্পবোধের দিক থেকে ওপর দিকে নিয়ে যাওয়া। এই সব নাট্যদলগুলো কর মওকুফের সুযোগে যেসব নাটকের প্রদর্শনীতে আগ্রহ প্রকাশ করে আসছে তা রুচি গঠনে দর্শকদের সাহায্য করছে না বললে অত্যুক্তি হয় না। তা ছাড়াও বড়ো কথা, এইসব দলগুলো প্রায় দলগত মালিকানায় পরিচালিত বলে এদের অধিকাংশ সদস্য কোনো দলের প্রতি loyal নয়। সাক্ষ্যস্বরূপ কয়েকজন চলচ্চিত্র অভিনেতা-অভিনেত্রীর কথা বলা যায় যাঁরা একাধিক নাট্যদলের পক্ষে অভিনয় করে চলেছেন। এমন কী আমি দু-একজনকে জানি যাঁরা নিজেদের গ্রুপ থিয়েটার কর্মী বলে দাবি করেন, তাঁদেরও কোনো বিশেষ গ্রুপের প্রতি loyalty নেই— তাঁরা একই সঙ্গে একাধিক গ্রুপের কর্তা হয়ে কাজ করেন কেবল নিজের স্বার্থসিদ্ধির কারণেই। দল ত্যাগ ও নতুন দল গঠন স্বাভাবিক, হয়েও থাকে, কিন্তু অমন আচরণ যাঁদের, তাঁদের গ্রুপ থিয়েটার কর্মী বলা যায় না। আরো একটি কথা, ঐসব দল সৎ নাট্যকর্ম বা সৎ শিল্পবোধ দিয়ে দর্শককে আকর্ষণ করছে না. থিয়েটার নামক কমোডিটি বিক্রয়ের জন্যে star value-র ওপরে নির্ভর করে চলেছে।

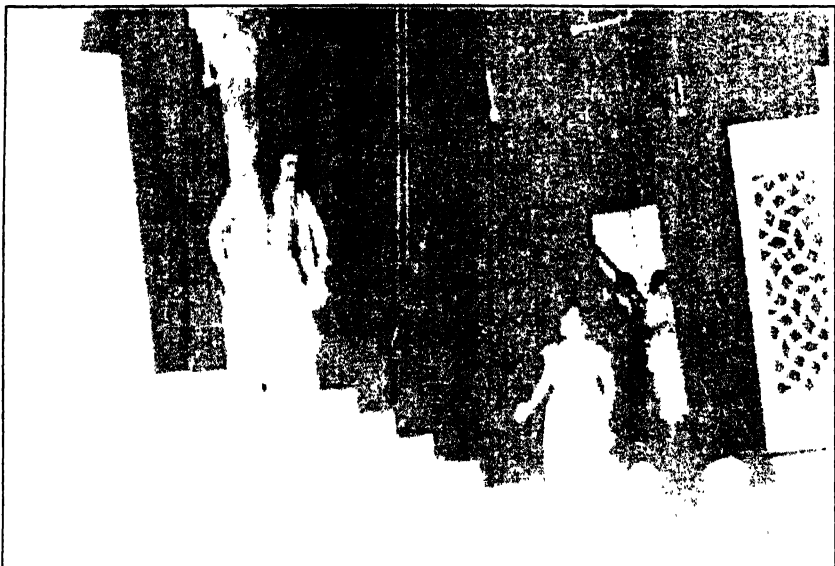
তবে, ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, এই সব নাট্যদলকে গ্রুপ থিয়েটারের সম্মান না দিলেও তারা পেশাদারি বা কমার্শিয়াল থিয়েটারের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। কে না জানে, শিল্পকর্মের বিকাশে বিরোধী শক্তি হিসেবে commercialism-এর প্রয়োজনও যথেষ্ট। এই প্রসঙ্গে আরো একটি মন্তব্য করা যেতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কমার্শিয়াল থিয়েটার তথা গতানুগতিক ধারার থিয়েটারের বিরোধিতা করার জন্যেই গ্রুপ থিয়েটারের জন্ম ও বিকাশ কিন্তু বাংলাদেশে দেখা গেল ১৯৭৩ থেকে যথার্থভাবে না হলেও গ্রুপ থিয়েটারের আবরণে কমার্শিয়ালিজমের সূচনা। বলা বাহুল্য, কর মওকুফ এমন একটি উল্টো ব্যাপারকে সংঘটিত হতে সাহায্য করেছে।

বাংলাদেশের নাট্যচর্চায়, বিশেষভাবে এই গড়ে ওঠার কালে গ্রুপ থিয়েটারের দায়িত্ব অপরিসীম। জনসাধারণকে দর্শনীয় বিনিময়ে নাটক দেখায় অভ্যস্ত করে তোলা অর্থাৎ দর্শক সৃষ্টি ছাড়াও রয়েছে রুচিশীলতার মান তৈরি করা, দর্শকের ভেতরে শিল্পবোধ জাগানো, সাহিত্যমূল্য সম্পন্ন নাট্য সাহিত্যের সৃজন, নাট্য আঙ্গিক নিয়ে নতুন নিরীক্ষা, দেশকাল জীবন চেতনায় জনগণকে আলোড়িত ও আন্দোলিত করা— ইত্যাদি দায়িত্ব যেমন কঠিন তেমনি নিরলস নিষ্ঠা ও সাধনা সাপেক্ষ। এ দায়িত্ব পালনে একালের যে সব দল গ্রুপ থিয়েটার মনোভঙ্গি নিয়ে নাট্যকর্মে নিয়োজিত হয়েছে তাঁদের এগিয়ে আসতে হবে সম্মিলিত ভাবে। বিভিন্ন গ্রুপের ভেতরে মতপার্থক্য যতই থাক, এ দায়িত্বের প্রশ্নে কোনো বিভেদ থাকবে না, এটাই কাম্য।

আমাদের এখানে নিয়মিত নাট্যচর্চার বয়স মাত্র বছর সাত। সময়ের বিচারে সাত বছর কিছুই নয়। যে সব দল কাজ করে চলেছে তাঁদের কাজের পূর্ণ মূল্যায়ন এখনই করা ঠিক হবে না। সে জন্যেই বলা যায়, গ্রুপ থিয়েটার রূপে যেসব দল নিজেদের চিহ্নিত করতে চাইছে তাঁরা সে সম্মান

এখনো ষোলো আনা অর্জন করতে পারেনি। কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য কর্ম ছাড়া কোনো দলেরই এ যাবৎকালের নাট্যচর্চা legitimate conventional ও theatre practice-এর বাইরে এখনো তেমন যেতে পারেনি। বাংলাদেশের নাট্য পরিমণ্ডলে content-এর দিক থেকে দু-একটি দল ব্যতিক্রমী হবার প্রয়াস পেলেও form-এর দিক থেকে তারা এমন কোনো নতুনত্বের দাবি করতে পারে না যাকে বিশেষ স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য বলা যেতে পারে। গ্রোটোওস্কীর theatre practice ও philosophy, শেকনার কাঁ চাইকিনের অথবা পিটার ব্রুক কী জাঁ লুই বাররেলের নিরীক্ষা তো দূরের কথা, এমন কী বাদল সরকারের মতো form ভাঙার প্রয়াসও আমাদের কারো দ্বারা হয়নি। কোনো দলের নাট্যচর্চাই এখনো দর্শক সমাজের জীবনবোধ ও মননে এমন কিছু আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি যা দেশকাল চেতনায় দিকচিহ্ন হতে পারে, যেমনটি হয়েছিল ওডেট্সের 'Waiting for Lefty' বা লিভিং নিউজ পেপারের 'Unemployment' অথবা বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' বা উৎপল দত্তের 'দুঃস্বপ্নের নগরী'। অবশ্য কেউ যদি আত্মতৃপ্তিতে এখনই নার্সিসাস হতে চান তাহলে বলার কিছু নেই।


নাট্যের
নানা মুখ



ক



খ

বাংলাদেশের যাত্রা : অতীত ও বর্তমান

অমলেন্দু বিশ্বাস

সৃষ্টির আদিম অন্ধকার যুগে যখন ভাষা ও লিপি আবিষ্কৃত হয়নি, দেহসর্বস্ব অরণ্যচারী মানব সন্তানেরা তখন মস্তক, চক্ষুগোলক, হস্ত-পদ ও দেহের অন্যান্য প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনসহ স্বরধ্বনির মাধ্যমে পারস্পরিক ভাব বিনিময় করত। তাতেই সর্বকলার আদিকলা নৃত্যকলার সৃষ্টি বলে তাত্ত্বিকদের বিশ্বাস। ভাব প্রকাশের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হস্ত-পদ, মস্তক ও চক্ষু ঈক্ষণসহ দেহের বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ড সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে নৃত্য-মুদ্রারূপে বিকশিত হয়ে নৃত্যকলার প্রাণসত্তার উদ্বোধন ঘটায়। নৃৎ ধাতু থেকে নৃত্য-নাট বা নাটক শব্দটির উৎপত্তি। আদিকালে ধর্মচর্চা কলাচর্চা পরস্পরের সম্পূরক ছিল বলে ধর্ম সাধনার নানা প্রকার উপায়ের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন কলার উন্মেষ ঘটেছিল। নাট্যকলার উদ্ভবও এই ধর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হয়েছিল বলেই সমাজতাত্ত্বিক গবেষকদের অভিমত। গ্রিস, রোম ও ইংল্যান্ডেও এই ধর্মাচরণ থেকে নাটকের উৎপত্তি। ইংল্যন্ডের মিরাকল্ নাটক এবং গ্রিসের ডাইনোসাসের মন্দির থেকে যেমন গ্রিক ট্র্যাজেডি ও কমেডির উৎপত্তি, ঠিক তেমনি প্রাচীন ভারতীয় নাটকের উৎপত্তির মূলেও ছিল বৈদিক ধর্মাচরণ।

কথিত আছে যে, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব এই চর্তুবেদ থেকে সুললিত নান্দনিক উপাদান সংগ্রহ করে পঞ্চম বেদ অর্থাৎ নাট্যবেদ নামান্তরে গন্ধর্ববেদ সৃষ্টি করে শিষ্য ভরতমুনিকে তা প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করেন, যা ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র হিসাবে খ্যাত। বৈদিক যুগের পর রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি ও উপকাহিনির মধ্যে প্রচুর নাট্যিক উপাদান বিরাজমান। রামায়ণের কুশ ও লব এ দুটি শব্দ থেকে নাটকের ভূমিকালিপি বোঝাতে আজ কুশীলব কথাটি প্রচলিত। সংস্কৃত নাটকের জন্ম যখনই হয়ে থাক না কেন, সাধারণ মানুষ সংস্কৃত নাটকের কাব্যরসের আসব পানে বঞ্চিত ছিল বলেই সংস্কৃত তার যথার্থ জাতীয় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছিল। শিক্ষা-জ্ঞানহীন সাধারণ মানুষের মধ্যে কিন্তু সঙ, রঙ্গ, নাট, কৌতুক ও পালাগান ধরনের এক প্রকার নাট্যচর্চার রেওয়াজ ছিল। একাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে মুসলমান আগমনের পর সংস্কৃত নাটকের চর্চা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে স্তিমিত হয়ে যায়। নাটকের ক্ষেত্রে মুসলমান শাসকদের অনীহার কারণে রাজকীয় আনুকূল্য না পেয়ে মানুষ অন্য এক অতি সহজ ও সুলভ পথে নাট্যরস আস্বাদনে উদ্যোগী হয়। ব্যয়বহুল মঞ্চনির্ভর নাটকের স্থলে দৃশ্যপটবিহীন সাধারণ মানুষের বুদ্ধিগ্রাহ্য আসর অভিনয়ের প্রবর্তন হয়, যা পরবর্তীতে যাত্রা নামে পরিচিতি লাভ করে।

যে সংস্কৃত নাটকে সাধারণ মানুষ তার প্রাণের প্রতিধ্বনি শুনতে পেত না, এতদিন পর রাজসম্মানবর্জিত, মৃত্তিকাসম্পৃক্ত আসর নাট্য বা যাত্রা নাটকে তা শুনতে পেয়ে উন্মত্ত আগ্রহে যাত্রাকে বরণ করে নেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গ্রিস দেশের ডাইনোসাসের মন্দির প্রাঙ্গণে মুক্ত আকাশতলে পঞ্চাশ হাজার দর্শক সমবেত হয়ে মানবজীবনের নিগূঢ় সমস্যা সংবলিত নাটক উপভোগ করত। অথচ ভারতীয় উপমহাদেশের গণমানুষেরা সে অধিকার থেকে ছিল বঞ্চিত। সঙ্গত কারণেই রাজন্যবর্গ ও সংস্কৃতজ্ঞ উচ্চবর্ণের পৃষ্ঠপোষকতায় চর্চিত সংস্কৃত নাটক সাধারণ মানুষের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

'যাত্রা' শব্দটি অতি প্রাচীনকাল থেকে উচ্চারিত একটি প্রতীকী শব্দ এবং বিতর্কিতও বটে। বহু নাট্যবিশারদ পণ্ডিত ও নাট্যশাস্ত্রকারগণ 'যাত্রা' শব্দটির বহুবিধ প্রকরণগত বিশ্লেষণী ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। যেমন—'শোভাযাত্রা', 'স্নানযাত্রা', 'রথযাত্রা', 'মঙ্গলযাত্রা', 'যুদ্ধযাত্রা', 'বরযাত্রা', 'বিদেশ যাত্রা', যাত্রা যাত্রা যাত্রা, বহু রকমারি যাত্রা। জীবনযাত্রা, জেলযাত্রা এবং শোভাযাত্রা এবং শেষাবধি শবযাত্রা কিংবা শ্মশানযাত্রা;এ যাত্রার যেন শেষ নেই। কোনো কোনো গবেষকের মতে সূর্যের কক্ষান্তর

গমন উপলক্ষে যে উৎসব উদ্‌যাপিত হত তার প্রধান অঙ্গ অভিনয় ছিল বলে অভিনয় অর্থে যাত্রা বোঝায়। আবার কারো অভিমত দেবদেবীর দর্শন উদ্দেশে রঙ্গ-কৌতুক-নৃত্য-গীত সহযোগে গমনপূর্বক অভিনয় প্রদর্শনের মাধ্যমে দেবমন্দিরে পূজা অর্পণ এবং সার্বিক কর্মকাণ্ডের লক্ষ্যে যে উৎসব সে উৎসবই যাত্রা। 'যা'-ধাতু থেকে উৎপত্তি যা অর্থে যাওয়া বা গমন করা। উৎসব উপলক্ষে গমন করে নৃত্য-বাদ্য-গীতাভিনয় সহকারে দেবার্চনার যে ক্রিয়া তা কালক্রমে অভিনয় অর্থে যাত্রা বলে প্রচলিত সত্যে পরিণত হয়েছে। কারো কারো মতে রামায়ণ গান ও পাঁচালি থেকে যাত্রার উৎপত্তি। যাত্রা শব্দটির মধ্যে যে চলমানতার আভাস পাওয়া যায় সেটা ক্রমে ক্রমে স্থিতিশীল আসরে পর্যবসিত হয়ে লোকনাট্যের রূপ লাভ করে। বলাই বাহুল্য যে বর্তমানের যাত্রা গণমানুষের বিনোদন মাধ্যম গণনাট্যরূপে সমাদৃত।

বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হলে যাত্রাভিনয় (পালাগান) বিষয়ক আলোচনা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কারণ যাত্রা বাংলার অন্যতম প্রাচীন অভিনেয় সাহিত্য। যাত্রার অভিনয় ধারাটি বাংলা নাট্যচর্চার সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেক জাতির লোকনাট্য থেকেই সেই দেশের জাতীয় নাট্যধারার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। বাংলার ও বাঙালির দুর্ভাগ্য যে আমাদের নিজস্ব নাট্যধারা যাত্রা থেকে উদ্ভব না হয়ে ইংরেজি নাটকের থেকেই বাংলা নাটকের উৎপত্তি। এ কথা অবিসংবাদিত সত্য যে, জাতির মনন, মানসিকতা ও পারিপার্শ্বিক বাতাবরণ উপেক্ষা করে কোনো রচয়িতার পক্ষেই নাট্যসৃষ্টি সম্ভব নয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের দেশে নাট্যচর্চা শুরু হলেও যাত্রার দুর্নিবার প্রভাব কোনো নাট্যকারই এড়িতে যেতে সমর্থ হননি। দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ সকলেই পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষভাবে বাংলা লোকজ নাট্য যাত্রা দ্বারা প্রভাবিত।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য স্বয়ং কৃষ্ণলীলায় অভিনয় করেছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলায় পাওয়া যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ সেজেছিলেন অদ্বৈত আচার্য আর শ্রীরাধা ও রুক্মিণীর দ্বৈত ভূমিকায় রূপ দিয়েছিলেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্য। বাংলা লোকনাট্যের সূত্রপাত এখানেই। শ্রীচৈতন্যের জীবনটাই ছিল মহানাটক। 'নিমাই সন্ন্যাস' নাট্যরূপে রূপায়িত হয়ে লক্ষ মানুষকে অশ্রুসজল করত। স্বয়ং মহাকবি গিরিশচন্দ্র ইংরাজি থিয়েটারের প্রভাবে গড়ে ওঠা কলকাতার প্রসিদ্ধ নাট্যমঞ্চ স্টার থিয়েটারের জন্য 'নিমাই সন্ন্যাস' প্লে লিখে সারা কলকাতাকে ভক্তিরসে আপ্লুত করেছিলেন।

পালাকারদের মধ্যে কৃষ্ণকমল অধিকারী, বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী ও নীলকণ্ঠ অধিকারী সে যুগে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এঁদের রচিত পালাগানে গানের আধিক্য বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এরপর পরমানন্দ অধিকারী গানের সঙ্গে সংলাপ জুড়ে যাত্রাগানে কিছু নতুনত্বের স্বাদ এনেছিলেন। পরবর্তীকালে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যাত্রাপালায় ক্রমশ কুরুচিপূর্ণ তরল রসিকতা ও অশ্লীলতার অনুপ্রবেশ ঘটলেও সামাজিক বিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পথ ধরে দেবদেবীর মহিমা কীর্তনের স্থলে মানুষের কথা ও কাহিনি যাত্রার আসরে প্রাধান্য পেতে থাকে। 'বিদ্যাসুন্দর'-এর আবির্ভাবে যাত্রার অঙ্গ কলঙ্কিত হলেও যাত্রায় সাধারণ মানুষের জীবনের জয় ধ্বনিত হয়েছিল। এই অশ্লীলতার বিরুদ্ধে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ় বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

উল্লিখিত কুরুচিপূর্ণ যাত্রাকর্মের বিরুদ্ধে রুচিবান মানুষের প্রতিবাদ ধ্বনিত হওয়ার প্রেক্ষিতে উনবিংশ শতকের ষষ্ঠ এবং সপ্তম দশকে শিক্ষিত সমাজে শৌখিন যাত্রা একটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। থিয়েটারের দৃশ্যপট বর্জন করে থিয়েটারি নাটকের চেয়ে অধিকতর

সঙ্গীতসমৃদ্ধ এই যাত্রার নতুন রূপটি গীতাভিনয় নামে আখ্যায়িত হয়। কুরুচিপূর্ণ যাত্রার প্রতি ধীরে ধীরে দেশবাসীর মনে বিতৃষ্ণা সঞ্চারিত হতে শুরু করে।

১৭৭৫ সালে রুশদেশি হেরাসিম লেবেদেভ কলকাতায় বেঙ্গলি থিয়েটার নামে একটি থিয়েটার স্থাপন করেন। ইংরাজি মঞ্চের অনুকরণে 'Disguise' 'Love is the Best Doctor' নামক দুখানি ইংরেজি প্রহসনের বাংলা অনুবাদ মঞ্চায়নের ব্যবস্থা করে উপমহাদেশের প্রথম থিয়েটারের প্রবর্তন করেন।

রঙ্গালয়ে নাটক শুরু হওয়ার পর যাত্রার জনপ্রিয়তা কমে গেলেও একেবারে লুপ্ত হল না, উপরন্তু মঞ্চসফল নাটকাবলির অনুকরণে আর এক নতুন যাত্রার জন্ম হল, যা অপেরা নামে খ্যাত হয়ে আজ অবধি চলমান। গ্রামবাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নিকট এর আবেদন ক্রমশ সম্প্রসারিত হতে থাকে। যাত্রা প্রসঙ্গে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য মনে পড়ে। তিনি বলেছেন, 'যাত্রার অভিনয় দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া ওঠে। কাব্যরস যেটা আসল জিনিস সেইটেই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মত চারদিকে দর্শকের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে।' 'বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি—তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ান শক্ত, তাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য; তাহাতে লক্ষ্মীর পেঁচাই সরস্বতীর পথকে প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া আছে।'

দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষা পূরণে তারপর যিনি যাত্রামণ্ডলে আবির্ভূত হলেন—তিনি যাত্রার যুগপ্রবর্তক মতিলাল রায়। তিনি গানের সঙ্গে কথকতা জুড়ে দিয়ে ফত্‌রা-ভাঁড়ামি বর্জন করে যাত্রাভিনয়কে সুসংবদ্ধতায় স্থাপন করলেন। তাতে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণির মানুষ গীতাভিনয়ের নব যাত্রার রসপান করে পরিতৃপ্ত হল। এটা নিঃসন্দেহে এক বৈপ্লবিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। এর ব্যাপ্তি বাংলাদেশের বাইরে পরিব্যাপ্ত হতে বিলম্ব হল না। তৎকালীন থিয়েটারের নাট্যগুরু মহাকবি গিরিশচন্দ্র মতিলালের ভক্তিরসাশ্রিত গীতাভিনয়ের প্রভাব মুক্ত হতে পারেননি। 'আগমনী', অকালবোধন', 'দোললীলা', 'রাবণবধ', 'চৈতন্যলীলা', ও 'নিমাই সন্ন্যাস' প্রভৃতি গিরিশচন্দ্র রচিত নাটকগুলো নিঃসন্দেহে অপেরাধর্মী। আবার এদিকে যাত্রাপালাগুলি থিয়েটারের আদলে রচিত হলেও যাত্রাগান কিন্তু সম্পূর্ণভাবে থিয়েটারের মধ্যে হারিয়ে গেল না।

সামাজিক যে উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টন এবং তার চাহিদার সঙ্গতিতে যে বিবর্তন—তারই পথে ব্রিটিশ শাসকদের শোষণের বিরুদ্ধে স্বদেশি আন্দোলনের ঝড় তুললেন চারণসম্রাট মুকুন্দ দাস। তৎকালীন সমাজের শোষিত মানুষের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা—সেই মাত্রা যোগ করেলেন মুকুন্দ যাত্রায়। স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেলেন সাধারণ মানুষকে। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের কুখ্যাত বঙ্গভঙ্গ আইনের বিরুদ্ধে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে প্রাচ্যের ভেনিস বরিশালের অবিসংবাদিত নেতা মহাত্মা অশ্বিনীকুমার, ব্যারিস্টার রসুল প্রমুখ নেতৃবর্গের প্রেরণায় মুকুন্দ দাস তাঁর যাত্রার মাধ্যমে সারাদেশে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করেছিলেন। মুকুন্দের 'মাতৃপূজা' পালা স্বদেশি যাত্রা নামে পরিচিত হয়ে যাত্রাগানকে গণযাত্রার গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। স্বদেশি যাত্রা প্রচারের অভিযোগে মুকুন্দ দাসকে ইংরেজ শাসকদের রোষানলে পড়ে জেলযাত্রাও করতে হয়েছিল। মুকুন্দ দাসের পথের নিশানা ধরে যাত্রার অগ্রযাত্রা শুরু। তারপর মথুর সাহা, ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী, ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ, সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, সতীশ মুখোপাধ্যায় ও হেম পাণ্ডা প্রমুখ যাত্রা কাণ্ডারীরা স্বদেশি যাত্রার পথে অগ্রসর হলেও কলকাতা ও তার শহরতলিতে যাত্রার তেমন কদর ছিল না। যাত্রাপালার বইগুলি কোনো শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা স্পর্শ করতেন না। পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন—'দীর্ঘদিন যাবৎ আমি যাত্রা নাটক লেখার ব্যাপারটা যথাসম্ভব লোকের কাছে গোপন

রেখেছিলেম।' থিয়েটারের অভিনেতারা যাত্রাদলে সংযুক্ত হতেন তো না-ই বরং উল্টো ব্যাপারটাই ঘটেছিল এ ক্ষেত্রে। শখের যাত্রাভিনয়ে খ্যাতি অর্জন করে অহীন্দ্র চৌধুরী, তিনকড়ি চক্রবর্তী ও ইন্দু মুখার্জি প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট যাত্রাশিল্পী থিয়েটার মঞ্চে যোগ দিলেন। ইতিমধ্যে থিয়েটারের ও যাত্রার মধ্যে এক নতুন সেতুবন্ধ তৈরি হল। থিয়েটারের কিছু কিছু মঞ্চসফল নাটক যাত্রামঞ্চে অভিনীত হতে থাকে।

১৯৩২ সালে যাত্রাঙ্গনে আরেক মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হল। আধুনিক যুগের আদ্যভাগে ক্ষুরধার লেখনীহস্তে যাত্রাপালাকাররূপে আবির্ভূত হলেন পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে। শিক্ষকতার পেশায় নিযুক্ত থেকেও তিনি পঞ্চাশটি বছর যাবৎ যাত্রাপালা রচনায় নিবেদিত ছিলেন। কলকাতা রঙ্গমঞ্চে তখন নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের যুগ। যাত্রায়ও শিশিরকুমারের প্রভাব পড়তে দেরি হল না। পণ্ডিতি ভাষায় নির্মিত দীর্ঘ সংলাপের বদলে ব্রজেন্দ্রকুমার সহজ সরল বাক্যবিন্যাসে সংলাপ সৃষ্টি করে মর্মস্পর্শী বাণীর মাধ্যমে মানুষের জয়গান গাইলেন। দীর্ঘ সংলাপ ভেঙে ছোটো ছোটো সংলাপ (short dialogue) প্রচলন করলেন। তাতে যাত্রার অভিনয় প্রাণবন্ত ও স্বাভাবিকতায় উন্নীত হল। ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধের হিড়িক, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তহীনতা, বিয়াল্লিশের আন্দোলন, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে ফ্যাসিবাদবিরোধী কর্মীশিবিরের উদ্যোগে 'নবান্ন' দিয়ে শুরু হল নবনাট্য আন্দোলন। তার ঢেউ এসে লাগতেও দেরি হল না।

অহিভূষণ অধিকারী সৃষ্ট যাত্রায় অশরীরী বিবেক ব্রজেন দে ও তাঁর অনুসারী সৌরীন্দ্রমোহন ও জিতেন বসাক প্রমুখ পালাকারগণের যাত্রায় শরীরী চরিত্রে রূপলাভ করে। 'বিদ্যাসুন্দর' পালার অশ্লীলতা দূর করতে মতিলাল রায়ের পথ ধরে যে পালাকারগণ লেখনী ধরেছিলেন তাঁরা হলেন অহিভূষণ, কেশব, অঘোর কাব্যতীর্থ, হরিপদ ভট্টাচার্য ও কুঞ্জবিহারী। এঁদের কেউ কেউ যাত্রায় ইংরেজ বিরোধী বক্তব্যও তুলে ধরেন স্পষ্ট ভাষায়। ভোলানাথ শাস্ত্রী তাঁর সংলাপ রচনায় ও দৃশ্য বিন্যাসে যে যুক্তিগ্রাহ্য দার্শনিক তত্ত্বের প্রবর্তন করেছিলেন ব্রজেন্দ্রকুমার তাঁর প্রকৃত উত্তরসাধক। ব্রজেন্দ্রকুমার পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, কাল্পনিক, সামাজিক ও জীবনী পালা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'বিদ্যাসাগর', 'পাগলাঠাকুর রামকৃষ্ণ', 'নটী বিনোদিনী' ও আধুনিক যুদ্ধবিরোধী রূপক পালা 'প্রতিশোধ' তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠকীর্তি।

ষাট দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় যাত্রাপালায় শ্রেণি সংগ্রামের ভিত রচনা করলেন 'একটি পয়সা', 'রক্তে রোয়া ধান', 'পাঁচ পয়সার পৃথিবী', 'মা মাটি মানুষ' 'জানোয়ার', ও 'অচল পয়সা' প্রভৃতি পালাকর্মে। এরপরই পালাকার শম্ভু বাগের 'হিটলার', 'লেনিন', 'কার্ল মার্কস', 'অশান্ত চিলি' ও 'মহেঞ্জোদারো' অত্যন্ত আধুনিকতা ও নতুনত্বের দাবিদার। বিশ্বভারতীর নাট্যবিভাগের অধ্যাপক অমর ঘোষ নাটক লিখলেন—'নেপোলিয়ন বোনাপার্ট'। পিপলস্ লিট্‌ল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা বিতর্কিত নট ও নাট্যকার উৎপল দত্ত যাত্রায় উপহার দিলেন—'রাইফেল', 'সন্ন্যাসীর তরবারি' ও 'শেখ মুজিব'। রমেন লাহিড়ী লিখলেন 'অজেয় ভিয়েৎনাম'। সত্যপ্রকাশ দত্ত শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' যাত্রায় রূপান্তরিত করেন।

আই.পি.টি.এ-র বীরু মুখোপাধ্যায় রচনা করলেন আণবিক যুদ্ধ বিরোধী যাত্রাপালা 'রাহুমুক্ত'। বিধায়ক ভট্টাচার্য যাত্রার জন্য লিখলেন—'মাইকেল মধুসূদন'। উপরোল্লিখিত তালিকাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় না কি যে যাত্রা এক জীবননিষ্ঠ লোকজ নাট্যধারা?

অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিতপ্রবরদের মুখে শুনতে পাই যে, যাত্রা জীবননিষ্ঠ নয়। কারো কারো মন্তব্য, যাত্রা তার স্বকীয়তা হারিয়ে নাটক সিনেমার অনুকরণ করছে—তখন বিস্মিত হতে হয় বইকী। তাঁদের মতে সমাজের কথা, মানুষের যুগযন্ত্রণার কথা বলার অধিকারই যেন যাত্রার নেই। যাত্রা যেন পুরাণ ইতিহাসের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ। গণ্ডি অতিক্রমণের অধিকার যাত্রার নেই। এই মধ্যযুগীয় প্রতিক্রিয়াশীল

ধ্যান-ধারণার জন্যই স্বাধীন বাংলাদেশে যাত্রার অগ্রগতির পথ অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে।

বিভাগপূর্ব যুক্তবাংলার সাংস্কৃতিক পরিচর্যার কেন্দ্র কলকাতার সিনেমা, নাটক ও যাত্রার পূর্ব বাংলার বাঙালদের প্রবেশাধিকার ছিল না বললেই চলে। কারণ হিসেবে বলা হত বাঙালদের ভাষার গলদ আছে। পূর্ববাংলার মানুষদের ধারণা ছিল যে, পশ্চিমবাংলার কলকাতাকেন্দ্রিক ভাষাই উৎকৃষ্ট। কিন্তু নাটকীয় ভাষা তৈরি করতে হলে যে কোনো অঞ্চলের শিল্পীকেই যে অনুশীলন করতে হয়— এ ধারণায় তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন না বলেই এই জাতীয় মানসিকতা পোষণ করতেন।

রেডক্লিফ রোয়েদাদে বিভাজিত '৪৭-এর পূর্ব পাকিস্তানে ব্রাহ্মণবেড়িয়ার যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীই একমাত্র ব্যক্তি যিনি জয়দুর্গা অপেরা নামে যাত্রাদলের মালিক ছিলেন। সেই অপেরার শিল্পীবৃন্দ কলকাতা থেকে এ দেশে অভিনয় করতে আসতেন এবং মরশুম শেষে ফিরে যেতেন। বলাই বাহুল্য সেই যাত্রায় অভিনীত পালাগুলি কলকাতার পালাকারদের সচিত্র মুদ্রিত পালা। যাত্রা-ব্যবসার রমরমা অবস্থায় তিনি দ্বিতীয় দল ভোলানাথ অপেরা খুলে বসলেন। ১৯৫০ সালের দিকে ঝালকাঠিতে নাথ কোম্পানি নামে একটি দলেরও জন্ম হল। যতীন চক্রবর্তীর দলে পশ্চিমবাংলা থেকে আগত যাত্রাশিল্পীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করে যশস্বী হয়েছিলেন অনেক বাঙাল শিল্পী। ঐসব প্রয়াত ও জীবিত শিল্পীদের নাম এখানে উল্লেখ না করলে তাঁদের প্রতি কৃতঘ্নতা প্রকাশ করা হবে। এঁরা হলেন, শ্যামাচরণ চক্রবর্তী, নয়ন মিঞা, আশরফ আলী, হরিপদ ভট্টাচার্য, নগেন নট্ট, গজেন দত্ত ও ওস্তাদ মোহনলাল গাইয়ে।

এ প্রসঙ্গে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আলোচনা শিরোনামের সার্থকতা আনবে। দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে রেলওয়ের প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রামের ওয়াজিউল্লাহ্ ইন্সটিটিউটের নাট্যশিল্পীবৃন্দ ১৯৫০ সাল থেকে দর্শনীর বিনিময়ে নাট্যচর্চা ও প্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গে লোকজ নাট্যকলা যাত্রারও নিরীক্ষধর্মী চর্চা শুরু করে। তারই ফলে সৃষ্টি হয়েছিল এ দেশের দর্শকনন্দিত যাত্রাশিল্পী সাদেকুন্নবী, সাদেক আলী, নাজির আহমেদ, আব্দুল হামিদ, সাধনা চৌধুরী, মঞ্জুশ্রী মুখার্জি, জাহানারা বেগম, শান্তি দেবী ও প্রবন্ধকার। তাঁরা প্রত্যেকেই নাটক থেকে যাত্রায় এসেছিলেন। তদানীন্তন পাকিস্তানে ১৯৫৪ সালে উপরোক্ত শিল্পীদের দ্বারা বাবুল থিয়েটার নামে একটি ভ্রাম্যমাণ নাট্যদল গঠন করা হয়। এঁরা ছুটির অবকাশে বিভিন্ন স্থানে দর্শনীর বিনিময়ে নাটক প্রদর্শন করেন। পরবর্তীকালে এই বাবুল থিয়েটারই পূর্ব পাকিস্তানের নির্ভেজাল প্রথম যাত্রা সংগঠনে রূপান্তরিত হয়ে পেশাভিত্তিক যাত্রাব্যবসায়ে অবতীর্ণ হয়। সেই পঞ্চাশ দশকে কলকাতা মহানগরীর যাত্রাদলগুলিতেও গুঁফো রাণীরাই নারী চরিত্রে অভিনয় করত। সেই ১৯৫৫/৫৬ সালে বাবুল অপেরা এ দেশে নারী-পুরুষ সমন্বয়ে যাত্রাভিনয় প্রথার প্রবর্তন করে নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেয়। শাহজাদপুরের নারী-পুরুষ সম্মিলিত দ্বিতীয় যাত্রাদল বাসন্তী অপেরায় এ প্রবন্ধকারের পরিচালনায় তুষার দাশগুপ্ত, ঠাকুরদাস ঘোষ, কালী দত্ত, ফণীভূষণ, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, জয়শ্রী প্রামাণিক, অমিয় সরকার প্রমুখ শিল্পীগণ যুক্ত ছিলেন। এভাবেই বাংলাদেশে নারী-পুরুষ নিয়ে যাত্রাদল গঠিত হতে থাকে।

বাংলাদেশে বর্তমানে ন্যূনধিক একশোর মতো যাত্রাদল রয়েছে। স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশের স্কুল কলেজে ও জনকল্যাণমুখী সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি শুকনো মরশুমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য যাত্রা উৎসবের ব্যবস্থা করতেন। তখন যাত্রাদল ও যাত্রা প্রদর্শনীর প্যান্ডেলে একটি সুস্থ পবিত্র প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ বিরাজ করত। স্ত্রী-পুত্র পরিবার-পরিজনসহ যাত্রা প্যান্ডেলে বসে পালা উপভোগের পরিবেশ বিরাজিত ছিল। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশি নাট্যচর্চার অনেকানেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, কিন্তু গ্রামবাংলার নাট্যধারা যাত্রায় অধোগতি হয়েছে। যাত্রার এই অধঃপতিত অবস্থা থেকে যাত্রাকে উর্ধ্বগামী করার উদ্দেশ্যে অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ১৯৭৯ ও '৮০ সালে জাতীয় ভিত্তিতে যাত্রা উৎসবের আয়োজন করেছিল এবং কৃতি শিল্পীদের সামান্য কিছু আর্থিক

পুরস্কারসহ সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করেছিল। দুটি উৎসবেই রাষ্ট্রপতি দুরাত্রি উপস্থিত থেকে যাত্রা উৎসবকে ধন্য করেছিলেন। এরপর '৮০ সালে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শ্রেষ্ঠ যাত্রাদলকে স্বহস্তে ট্রফি প্রদান করেছিলেন। এরপর '৮০ সালে বাংলাদেশি পালা রচনায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে শিল্পকলা একাডেমী পালা রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ঘোষণা করে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর বেশ কিছু পালাও একাডেমীতে জমা পড়েছিল। তার কী হল সে সংবাদ কারো পক্ষেই জানা সম্ভব হয়নি। '৮১ সালে বাংলাদেশি পালাকারদের রচিত পালা নিয়ে শিল্পকলা একাডেমী একটি যাত্রা উৎসবেরও আয়োজন করে। এরপর থেকে শিল্পকলা একাডেমীর যাত্রা বিষয়ক নীরবতা পরবর্তী ছয় বছরে অব্যাহত থাকে। আজ সে নীরবতা ভেঙে শিল্পকলা একাডেমীর সরব হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

এখন বাংলাদেশের সর্বত্র যাত্রা প্রদর্শনী নির্ভর। প্রদর্শনী মারফত বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সরকার প্রদর্শনীর অনুমতি দেয় বলে পূর্বেকার সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকল্পে তহবিল গঠনের জন্য যে অনুমতি দেওয়ার রেওয়াজ ছিল—তা বর্তমানে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যাত্রার সৎ পৃষ্ঠপোষকগণ যাত্রাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করায় যাত্রা প্রদর্শনী নির্ভর হতে বাধ্য হয়েছে। প্রদর্শনী নির্ভর যাত্রা তাই মাত্রাহীন। এরপর যাত্রা হয়তো জাদুঘরে যাত্রা করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা প্রবর্তিত ১৮৭৬ সালের অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও যাত্রাকে রেয়াদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্বদেশি যাত্রার অনুসারী নব নব যাত্রাদলে সংস্কারমূলক যাত্রাভিনয় নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে ১৯৩৩ সালে Bengal Places of Amusement Act—১৯৩৩ নতুন করে প্রবর্তন করে যাত্রাদলগুলিকে লাইসেন্স প্রথার নাগপাশে বন্দি করে ফেলে। জেলা প্রশাসক, আন্তঃজেলা এনডোর্সমেন্ট, পুলিশি ছাড়পত্র (verification) ছাড়া যাত্রাদলের পরিক্রমণ নিষিদ্ধ। এই কট্টর জংলি বিধি এখনও সগৌরবে স্বাধীন বাংলাদেশে সক্রিয়ভাবে বহাল রয়েছে। বড়োই পরিতাপের বিষয় বাংলাদেশে মননশীল কোনো লেখকের লেখনী যাত্রাপালা রচনায় নিবেদিত হয়নি। হাতে গোনা যে কয়টি পালা এ দেশে রচিত হয়েছে সেগুলি পশ্চিমবাংলার মুদ্রিত যাত্রাপালার নকল বা গিলিত চর্বণ। পালারচনার ক্ষেত্রে এই বন্ধ্যাত্বের অবসানে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ যদি সংশ্লিষ্ট মহল না করেন—তাহলে 'যা' ধাতু থেকে উৎসারিত যাত্রা 'যা' ধাতুতে প্রত্যাবর্তন করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমাদের অহংকার ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশের লোকজ-নাট্যকলা 'যাত্রা'কে অবক্ষয় থেকে মুক্ত করে সুস্থ সংস্কৃতির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রতিটি সচেতন মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। যাত্রাকে যাত্রাওয়ালাদের সম্পত্তি মনে না করে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জাতীয় নাট্যসম্পদ হিসেবে গণ্য করে এর পরিচর্যা, পরিচর্চা ও প্রসারে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করলেই যাত্রা নামক লোকজ নাট্যকলার অপমৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে, নইলে এর মৃত্যু অবধারিত। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি সুপারিশ :

১। সরকারি পরিসরে যাত্রাশিল্পকে ইন্ডাস্ট্রি ঘোষণা করে অনুদান ও ব্যাংক ঋণসহ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রবর্তন।

২। বিদেশগামী সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলে যাত্রাদলকে নির্বাচন।

৩। সারা বছর যাত্রাভিনয় প্রদর্শন ও চর্চার জন্য জেলা-উপজেলা ভিত্তিক যাত্রা আসর (rostrum) নির্মাণ।

৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে যাত্রাকে আবশ্যিক পাঠ্য বিষয় ও যাত্রা বিষয়ক গবেষণাকর্মে বৃত্তির ব্যবস্থাকরণ।

সর্বশেষে যাত্রার গলায় লাগানো ঔপনিবেশিক আমলের ফাঁসির রজ্জু ১৯৩৩ সালের লাইসেন্স বিধি অপসারিত করে যাত্রা প্রদর্শনে অবাধ পরিক্রমণের পথ অনিরুদ্ধ করা হোক।

বাংলাদেশের মঞ্চে বিদেশি ও রবীন্দ্র নাটকের অবস্থান

আতাউর রহমান

বাংলা থিয়েটারের প্রসঙ্গ এলে স্বাভাবিকভাবেই বাংলা নাট্য সাহিত্যের বিষয়টি এসে যায়। কারণ থিয়েটারের যাত্রারম্ভ হয় নাটকের পাণ্ডুলিপি দিয়ে। যেহেতু পাণ্ডুলিপি সাহিত্যেরই অংশ সেহেতু বাংলা নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে কিছু কথা খোলাখুলিভাবে আলোচনা হওয়া উচিত বলে মনে করি। বাংলাদেশও এই আলোচনাব বাইরে থাকবে না। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা যেমন উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদির তুলনায় বাংলা নাট্য সাহিত্য নিশ্চিতভাবে দুর্বল। সংস্কৃত নাট্য, সাহিত্য, যার জন্ম এ ভূখণ্ডেই, নন্দন-তাত্ত্বিক বিবেচনায় ছিল উচ্চমানের। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার ভাস, শূদ্রক, কালিদাস এবং ভবভূতির অবদানকে নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হয়। কালের ধোপে এ ভূখণ্ডের নাটক তার সাহিত্যগুণ হারিয়ে ফেলতে থাকে। ইউরোপে কিন্তু এ ঘটনাটি ঘটেনি। সফোক্লেস এসকিলাস, ইউরিপিডিস এবং এরিস্টোফিনিসের পর আমরা একাধিক নাট্যকারকে জানি যাঁরা নাটকের গুণগত মানকে আজও ধরে রেখেছেন। গড়্গাড় করে যাঁদের নাটকের উচ্চমানের কথা বলা যায় তাঁরা হলেন মলিয়ের, শেকস্‌পিয়ার, মারলো, ইবসেন, বার্নার্ড শ, পিরানদেল্লো, জ্যাঁ আনুই, ব্রেশট, মেটারলিঙ্ক, হাউপ্টম্যান, স্যামুয়েল বেকেট, চেখভ, গোগোল, আয়েনেস্কো, জাঁ জেনে, হ্যারল্ড পিন্টার, হাইনা মূলার, ডুরেনমার্ট, টম স্টপার্ড, পিটার ভাইস, আর্নল্ড ওয়েস্কার, এডওয়ার্ড বন্ড, পিটার শেফার, থর্টন ওয়াইলডার, ক্রিস্টোফার ফ্রাই, জন অসবর্ন, দারিও ফো প্রমুখ। নামগুলো কোনো পরম্পরা মনে রেখে উল্লেখ করা হয়নি। কলমেব মাথায় তাৎক্ষণিকভাবে যা এসেছে তা লেখা হল এবং সোভিয়েত রাশিয়াকে ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

বাংলা নাট্য সাহিত্যে বিশ্বমানের নাটকের সংখ্যা খুবই কম। আজকাল অনেক ক্ষেত্রে নাটক আবার বচন প্রধান না হয়ে ক্রিয়া সর্বস্ব হয়েছে, সেখানে সাহিত্য-মূল্য বিচারের দায়টা কমে গেছে। বাংলা নাট্য সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথই আমাদের মান রেখেছেন। কালিদাস, শূদ্রক, ভবভূতির নন্দন মূল্য ও গভীরতাকে উনিই ধরে রেখেছেন তাঁর নাটকে, নিশ্চিতভাবে অন্যভাবে. অন্য-আলোকে ও দ্যোতনায়। আমি বাংলা সাহিত্যের শক্তিমান নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত, গিরিশ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দীনবন্ধু মিত্র, শচীন সেনগুপ্ত, বাদল সরকাব, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত,, মনোজ মিত্র প্রমুখেব কথা মনে রেখেই উপরোক্ত উক্তি করেছি। তবে মাইকেলকে আমরা যেমন তাঁর 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র জন্য মনে রেখেছি তেমনি তাঁর 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁশি' প্রহসনকে অবজ্ঞা করার শক্তি নেই।

বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পরে আমরা বেশ কয়েকজন মঞ্চসফল নাট্যকারকে পেয়েছি, তবে সাহিত্যমূল্য বিচারে কেবলমাত্র সৈয়দ শামসুল হক এবং সেলিম আল দীনের নাট্য সমুদয় হয়তো কালের পরিক্রমায় বেঁচে থাককেবে। সাহিত্য ও শিল্পমাধ্যমে কোনটি বড়ো কাজ হিসেবে বেঁচে থাকবে আর কোনটি থাকবে না এ সম্পর্কে শুধু আন্দাজই করা যায়, নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না, কারণ এ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও রসায়ন যেমন অজানা তেমনি যৌগিক।

বাংলাদেশে রূপান্তরিত, অনূদিত ও রবীন্দ্র নাটকের অবস্থান বোঝানোর জন্য উপরের প্রস্তাবনাটা করা হল। বাংলাদেশের নাট্যচর্চা বলতে আমরা স্বাধীনতা পরবর্তী নাট্যচর্চাকে বোঝাই যাব বয়েস প্রায় সাতাশ বছর হল। বাংলাদেশের নাট্য সাহিত্য এবং মঞ্চায়নের একটি বিরাট অংশ

দখল করে আছে, বিদেশি নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তর। এই ঘটনাটা যেমন ঘটেছে এ দেশের নাট্যকর্মী ও নাট্যজনদের বৈশ্বিক ও উদার মনোভাবের কারণে, তেমনি এ কথাও সত্যি যে আমাদের দেশে মৌলিক নাট্য রচনার এখনও যথেষ্ট অভাব আছে। দেশের চারটি প্রথম সারির নাট্যদলের নিজস্ব নাট্যকার আছে। এঁরা নাট্যকার হিসাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। এঁরা নিজের দলের জন্যেই প্রধানত নাটক লেখেন, কচিৎ-কদাচিৎ অন্য দলের জন্য লিখে থাকেন। দলহীন প্রতিষ্ঠিত নাট্যকারের সংখ্যা এক দুজনের বেশি নেই। দেশটি যখন পাকিস্তানের অংশ ছিল তখনও এ দেশে নাট্যচর্চা ছিল, তবে তা ছিল আজকের গ্রুপ থিয়েটার নাট্যচর্চার চেয়ে ভিন্নতর। তখন উৎসব-অনুষ্ঠানে নিছক আনন্দ-বিনোদনের জন্য এক কী দুসন্ধ্যা একটি নাটকের মঞ্চায়ন হত। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এবং পাড়ার ক্লাবের সদস্য-সদস্যারা এ ধরনের উদ্যোগে অংশ নিত। এখনকার মতো দর্শনীর বিনিময়ে নিয়মিত নাট্যচর্চা হত না। এখনকার মতো একটি নাটকের পঞ্চাশ ও একশো দুশো এমনকী তিনশো প্রদর্শনী তখন ভাবা যেত না। সেই আমলেও অর্থাৎ তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানে বেশ কিছু বিদেশি নাটকের অনুবাদ এবং রূপান্তর যেমন বই আকারে বেরিয়েছে তেমনি মঞ্চায়িতও হয়েছে। এই সব অনূদিত ও রূপান্তরিত নাটকের মধ্যে সফোক্লেসের 'কিং ইডিপাস', ইউরিপিডিসের 'অরিস্টিস' ও 'মেডিয়া', অ্যারিস্টোফিনিসের 'লিপস্ট্রাটা', এস্কাকাইলাসের 'সেভেন এগেইন্টস থেবস' এবং 'প্রমিথিউস বাউন্ড', শেকস্‌পিয়ারের 'টেমিং অব দি শ্রু', মলিয়েরের 'তার্তুফ', 'দা মিসানথ্রপ', 'এ উবটাব অব হিমসেলফ', জাঁ ফব 'নো এক্সিট', একিন্ট, নিকোলাই গোগোলের 'দ্য ম্যারেজ' এবং 'ইন্সপেক্টর জেনারেল', বার্নার্ড শ'য়ের 'আমর্স এন্ড দা ম্যান' ও 'ইউ নেভার ক্যান টেল', জে বি প্রিস্টলির 'ডেঞ্জারাস কর্নার', থর্নটন ওয়াইলডারের 'আওয়ার টাউন' এবং 'দা স্কিন অব আওয়ার টিথ', অসকার ওয়াইলডের 'দ ইমর্পটেন্স অব বিইংগ আর্নেস্ট', টেনিসি ইউলিয়ামসের 'দ্যা গ্লাস ম্যানেজারি' এবং 'এ স্ট্রিট কার নেমড ডিজায়ার', আর্থার মিলারের 'ডেথ অব এ সেলসম্যান', গলসওয়ার্দির 'দ্য সিলভার বক্স', ইউজিন ওনীলের 'মোর্নিং বিকামস ইলেকট্রা', 'দ্য গ্রেট-গড্ ব্রাউন', 'মার্কোমিলিয়ান্স', 'আহ্ ওয়াইল্ডারনেস', এমেন্ট শেরউডের 'এবিই লিঙ্কন ইন ইলিনয়' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ইবসেনের প্রায় সবকটি নাটকই স্বাধীনতা পূর্বকালে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এ কাজটি করেছেন আবদুল হক নামে এক নিষ্ঠাবান নাট্য অনুবাদক। উপরে উল্লেখিত অনুবাদ ও রূপান্তরিত বিদেশি নাটকের নামগুলো স্মৃতি থেকে উল্লেখ করা হল কারণ এ বিষয়ে কোনো নির্দেশিকা বা নির্ঘণ্ট প্রাপ্তিসাধ্য নয়। স্মৃতি মাঝে মধ্যে প্রতারণা করে, কাজেই এ ক্ষেত্রেও সে সম্ভাবনা থেকে যাবে। স্বাধীনতা পূর্বকালে নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তর কাজে যাঁরা হাত লাগিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, বজলুল করিম, ফতেহ লোহানী, আবদুল হক প্রমুখ। এই সব অনূদিত ও রূপান্তরিত নাটকের মধ্যে বেশ কয়টি স্বাধীনতা-পূর্বকালে সাফল্যের সঙ্গে বেতার, টেলিভিশন ও মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। আধুনিক বাংলা থিয়েটার বা নব-নাট্যচর্চার একটা বড়োসড়ো অংশ আবর্তিত হয়েছে বিদেশি অনুবাদ ও রূপান্তরিত নাটককে ঘিরে। মনে আছে, ১৯৭৩ সালে কলকাতায় গিয়ে দেখলাম সেখানকার মঞ্চে বিদেশি নাটকের ভিড় লেগে রয়েছে। বহুরূপী, পি এল টি, নান্দীকার সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চায়ন করে চলেছে শেক্‌সপিয়ার, ব্রেশট, পিরানদেল্লো, আয়েনেস্কো প্রমুখের নাটক। বিদেশি নাটককে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করার পেছনে চেতনায় আন্তর্জাতিকতা যেমন কাজ করেছে, তেমনি মনে হয়েছে বাংলা মঞ্চের দাবির তুলনায় বাংলা নাট্য রচনা যথেষ্ট নয়। এই অবস্থায় খুব একটা উন্নতি এখনও চোখে পড়ে না। বলা বাহুল্য, লেবেদেফ পরবর্তী কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়েও বাংলা মৌলিক নাটক মঞ্চায়নের অপ্রতুলতা চোখে পড়ে, যার অনেকখানি অধিকার ছিল সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ।

নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় এ পর্যন্ত বাংলাদেশের মঞ্চে সর্বাধিক বিদেশি নাটক প্রযোজনা করেছে। বিদেশি নাট্যকারদের মধ্যে বাংলাদেশে জার্মান নাট্যকার ব্রেশ্‌টের নাটক সর্বাধিক অভিনীত হয়েছে। আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে বহুবচন নামে একটি নাটকের দল ব্রেশ্‌টের 'দ্য থ্রি পেনি অপেরা' অবলম্বনে রচিত অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তিন পয়সার পালা' নাটক ঢাকায় মঞ্চায়িত করেছে। বর্তমানে মুজিবর রহমান দিলু-কৃত একই নাটকের রূপান্তর 'জনতার রঙ্গশালা' দু'টি নাটকের দল নিয়মিতভাবে মঞ্চায়ন করছে। বেশ কয় বছর আগে ঢাকার নাট্যচক্র ব্রেশ্‌টের 'দ্য ককেশিয়ান চক সার্কেল' নাটকের রূপান্তর 'চক সার্কেল' নিয়মিতভাবে মঞ্চায়িত করত। ঢাকার পদাতিক নাট্য সংসদ গোর্কি-ব্রেশ্‌টের 'মাদার'-এর অনূদিত রূপ প্রশংসনীয়ভাবে মঞ্চায়ন করেছে। ঢাকার প্রথম সারির নাটকের দল ঢাকা থিয়েটার 'ধূর্ত উই' নামে ব্রেশ্‌টের 'দ্য রেসিস্টেবল রাইজ অব আর্তোরো উই'-এর রূপান্তরিত রূপ মঞ্চে আনে। স্থানীয় গ্যেটে-ইনস্টিটিউটের সহায়তায় এই নাটকটির নির্দেশনা দেন একজন জার্মান নাট্য নির্দেশক। প্রয়াত জার্মান নির্দেশক ফ্রিৎজ বেনেভিৎজ যিনি কলকাতা-সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নাট্যকর্মীদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত, তিনিও ঢাকায় কাজ করে ছিলেন। ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট ঢাকা কেন্দ্র প্রযোজিত 'লোক সমান লোক'-এর নির্দেশনা দান করেছিলেন ফ্রিৎজ বেনেভিৎজ। নাটকটি ছিল ব্রেশ্‌টের 'ম্যান ইজ ম্যান' নাটকের অনূদিত রূপ। বাংলাদেশে ব্রেশ্‌টের অন্যান্য নাট্য প্রযোজনা থেকে ফ্রিৎজের প্রযোজনা ছিল ভিন্ন। তাঁর নির্দেশনা পদ্ধতিতে ব্রেশ্‌টের মৌলধারার স্পর্শ ছিল, অনেকটা যেমন ছিল শৈলজারঞ্জন মজুমদারের রবীন্দ্র সংগীত শেখানোর পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথের মৌলধারার অকৃত্রিম রূপ। ঢাকার বাইরে বন্দর নগর চট্টগ্রামে ব্রেশ্‌টের তিনটি নাটক অভিনীত হয়। তিনটি নাটকই ছিল ব্রেশ্‌টের ক্ষুদ্রায়তন নাটক 'সিনোরা কারার রাইফেল', 'দ্য মেজারস টেকেন' এবং 'দ্য একসেপশান এন্ড দ্য রুল'। তিনটি নাটকই অনূদিত রূপে মঞ্চায়িত হয়। নাটক তিনটি যথাক্রমে প্রযোজনা করে চট্টগ্রামের অরিন্দম, থিয়েটার-৭৩ এবং তির্যক নাট্যদল। আসাদুজ্জামান নূর ছাড়া ব্রেশ্‌টের নাটক অনুবাদ ও রূপান্তরে যোগ্যতার পরিচয় দেন আবদুস সেলিম, তাহমিনা আহমেদ ও আলী যাকের। ব্রেশটের নাটক নির্দেশনায় আলী যাকের, জামিল আহমেদ, কামালউদ্দিন নীলু ও আতাউর রহমান কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ব্রেশ্‌টের পরে বাংলাদেশের মঞ্চে শেকস্‌পিয়ার ও মলিয়েরে প্রায় সমান সমান জায়গা দখল করে আছেন। ঢাকার মঞ্চে শেকস্‌পিয়ারের 'ম্যাকবেথ', 'হ্যামলেট', 'ওথেলো', 'টেম্পেস্ট', 'জুলিয়াস সিজার', 'কিং লিয়ার', 'এ মিডসামার নাইটস ড্রিম', 'কোরিওলেনাস' এবং 'দ্য মার্চেন্ট অব ভেনিস' মঞ্চায়িত হয়। শেকস্‌পিয়ারের এই নাটকগুলো হয় অনূদিত না হয় রূপান্তরিত ফর্মে মঞ্চায়িত হয়। এই প্রযোজনার মধ্যে 'ম্যাকবেথ', 'টেম্পেস্ট', 'ওথেলো', 'কোরিওলেনাস', 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' এবং 'হ্যামলেট' অবলম্বনে 'দর্পণ' দর্শকনন্দিত হয়।

শেকস্‌পিয়ারের নিজের দেশের মানুষ নাট্য নির্দেশক ক্রিস্টোফার স্যানফোর্ড এবং ডেবরা ওয়ানার স্থানীয় ব্রিটিশ কাউন্সিলের আমন্ত্রণে ঢাকায় এসে যথাক্রমে 'ম্যাকবেথ' ও 'টেম্পেস্ট' নাটকের নির্দেশনা দান করেন। ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট ঢাকা কেন্দ্র প্রযোজিত 'টেম্পেস্ট' নাটকের নির্দেশনা দেন ডেবরা ওয়ানার। তাঁর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাওয়া এ দেশের নাট্যকর্মীদের জন্য ছিল এক বিরাট অভিজ্ঞতা। ডেবরা এখন ইংল্যান্ডের শীর্ষস্থানীয় নাট্য নির্দেশক। তিনি ব্রিটেনের রয়েল শেকস্‌পিয়ার কোম্পানি এবং ন্যাশনাল থিয়েটারের নাট্য নির্দেশক। বলা প্রয়োজন যে, 'দ্য মার্চেন্ট অব ভেনিস' ঢাকার দুটো দল প্রযোজনা করেছে। ঢাকা লিট্‌ল থিয়েটার বর্তমানে লেখকের নির্দেশনায় 'ভেনিস সওদাগর' নামে নাটকটি মঞ্চায়িত করেছে এবং বর্তমানে নাটকটি নাসিরউদ্দিন ইউসুফের নির্দেশনায় ঢাকা থিয়েটার মঞ্চায়ন করছে। 'হ্যামলেট'ও বাংলাদেশের দুটো দল মঞ্চায়ন করছে। আলী যাকের রূপান্তরিত ও নির্দেশিত এবং নাগরিক নাট্য

সম্প্রদায় প্রযোজিত 'দর্পণ' ছিল 'হ্যামলেট' অবলম্বনে রচিত নাটক। খুলনা থিয়েটার 'হ্যামলেট' নামেই নাটকটির প্রযোজনা করে। রূপান্তরিত ও নির্দেশনায় ছিলেন খুলনার নাজমুল আলম। চট্টগ্রামের তির্যক নাট্যগোষ্ঠী শেকস্‌পিয়ারের 'অ্যাজ য়ু লাইক ইট' মঞ্চায়ন করে। রূপান্তর ও নির্দেশনায় ছিলেন রবিউল আলম। শেকস্‌পিয়ারের অনুবাদে সর্বাধিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন কবি-নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক। তিনি নিজে কবি এবং কাব্যনাটক লেখেন এ জন্যে কাজটি হয়তো তাঁর জন্যে তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল। 'ম্যাকবেথ'-এর কথা আগেই বলেছি, তাঁর অনূদিত 'টেম্পেস্ট' এবং শেকসপিয়ারের 'জুলিয়াস সিজার' দ্বারা অনুপ্রাণিত নাট্য রচনা 'গণনায়ক' আমাদের নাট্যাঙ্গনে উঁচুমানের সাহিত্য-কাজ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। উল্লেখ্য যে, ছয়ের দশকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কৃত শেকস্‌পিয়ারের 'দ্য কমেডি অব এরোরস' -এর বাংলা রূপান্তর 'ভ্রান্তিবিলাস' মঞ্চায়িত হয়েছিল। এই প্রযোজনার অংশগ্রহণ করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদান্তীন ছাত্রছাত্রীবা। মলিয়ের এখন বাংলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন নাট্যকার। ঢাকার লোকনাট্যদল প্রযোজিত মলিয়েরের 'দ্য মাইজার' অবলম্বনে তারিক আনাম কর্তৃক রূপান্তরিত 'কঞ্জুস' বিপুলভাবে জনপ্রিয় হয়েছে। এই প্রযোজনা ইতোমধ্যে তিনশোর অধিক মঞ্চায়ন সম্পন্ন করেছে । এ ছাড়া ঢাকার মঞ্চে মলিয়েরের 'দ্য ইনটেলেকচুয়াল লেডিজ' অবলম্বনে 'বিদগ্ধ রমণীকুল', 'দ্য স্কাউন্ড্রেল স্ক্যাপি' অবলম্বনে 'বিচ্ছু', 'দ্য বুর্জোয়া জেন্টলম্যান' অবলম্বনে 'ভদ্দরনোক' 'ল্যার্মেরিস মাঁলগ্রে ল্যুই অবলম্বনে 'গিট্টু' ও 'তার্তুফ' অবলম্বনে 'ভন্ড তার্তুফ' মঞ্চায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে। 'কঞ্জুস'-এর পাশাপাশি নাট্যকেন্দ্র প্রযোজিত 'বিচ্ছু'-ও দর্শকপ্রিয় হয়েছে। তবে বাংলাদেশে মলিয়ের প্রযোজনা সম্পর্কে প্রায়ই একটা অভিযোগ শোনা যায় তা হল, জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে মলিয়েরের কমেডিকে যথেচ্ছাচার করা হয়েছে। অর্থহীনভাবে তরল থেকে তরলতর করে তোলা হচ্ছে। ঢাকার মঞ্চে নাগরিক নাট্যসম্প্রদায় প্রযোজিত এবং বর্তমানে লেখক নির্দেশিত বেকেটের দুরূহ নাটক 'ওয়েটিং ফর গডো'-র বাংলা অনুবাদ 'গডোর প্রতীক্ষায়' যথেষ্ট সফল প্রযোজনা হিসেবে বিবেচিত হয়। এই প্রযোজনা কলকাতার দর্শকদেরও প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হয়।

সুইজারল্যান্ডের নাট্যকার ফ্রেডারিশ ডুরেনমার্টের নাটক 'দ্য ভিজিট' অবলম্বনে 'ফেরা' বর্তমানে লেখকের নিদের্শনায় দেশের অগ্রগামী নাট্যদল পদাতিক মঞ্চস্থ করে। 'ওয়েটিং ফর গডো'র মতো একই ধারার মঞ্চনাটক এডওয়ার্ড অ্যালবির 'দ্য জু স্টোরি'ও ঢাকার মঞ্চে অভিনীত হয়। হেন্‌রিক ইবসেনের 'অ্যান এনিমি অব দ্য পিপল'-এর বাংলা রূপান্তর 'জনতাব শত্রু' ঢাকা পদাতিক নাট্যদল কর্তৃক প্রযোজিত হয়। এই প্রযোজনা দর্শকদেব মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। 'কণ্ঠশীলন' আবৃত্তি গোষ্ঠী খালেদ খানের নির্দেশনায় শম্ভু মিত্র-কৃত ইবসেনেব 'এ ডলস হাউসের' বাংলা রূপান্তর 'পুতুল খেলা' অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চায়ন করে। সেন্টার ফর এশিয়ান থিয়েটার পেশা ভিত্তিক ভাবে ইবসেনের 'গোস্টস'-এর বঙ্গানুবাদ নিয়মিতভাবে ঢাকার দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করে। ঢাকা পদাতিক নাট্যদল নিকোলাই গোগোলেব 'ইন্সপেক্টার জেনারেল' দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিতভাবে মঞ্চায়ন করে। থিয়েটার নাট্যদল অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে জাঁ আনুই-এর 'আন্তিগোনে' মঞ্চায়ন করে। নাটকটির অনুবাদ ও নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন খায়রুল আলম সবুজ।

নারায়ণগঞ্জ থিয়েটার ক্রিস্টোফার মার্লোর 'ডক্টর ফস্টাস' জাতীয় নাট্যোৎসব'৯৩ -এ ঢাকার মঞ্চে উপস্থাপন করে। চট্টগ্রাম তির্যক নাট্যদল নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নাইজেরিয়ান নাট্যকার ওলে সোয়েংকার নাটক খুব সম্ভবত 'দ্য রোড' এর রূপান্তর 'সহজ সরল পথ' সফলভাবে মঞ্চায়ন করে। মিশরের নন্দিত নাট্যকার তওফীক উল্ হাকীম-ও বাংলাদেশের মঞ্চ-প্রয়াসের অঙ্গীভূত

হয়েছে। তাঁর নাটক 'সুলতানুজ জান্নাম'-এর অনুবাদ 'শেষ সংলাপ' চট্টগ্রামের গণায়ন নাট্যগোষ্ঠী কর্তৃক প্রযোজিত হয়। কামালউদ্দিন নীলু-র নির্দেশনায় এ নাট্য প্রযোজনা দেশের নাট্যামোদীদের প্রশংসা অর্জন করে। অবাঙালি নাট্যকার স্বদেশ দীপক এবং গিরিশ কারনাডও বাংলাদেশের মঞ্চে অনায়াসে তাঁদের জায়গা করে নিয়েছেন। স্বদেশ দীপকের 'কোর্টমার্শাল' এবং গিরিশ কারনাডের 'তুঘলক' ও 'হয়বদন' যথাক্রমে থিয়েটার আর্ট এবং নাট্যকেন্দ্র কর্তৃক বহুল মঞ্চায়িত হয়। প্রায়ই আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিক নাট্যকার ইউরিপিডিসের 'হেলেন' এবং সফোক্লেসের 'কিং ইডিপাস' ঢাকার পাদপ্রদীপের আলোয় উন্মোচিত হয়েছে। বজলুল করিম ছিলেন বাংলাদেশের আধুনিক নাট্যচর্চার অন্যতম প্রধান পুরুষ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের কয়েক বছর পরে উনি লোকান্তরিত হন। বজলুল করিমের নাট্যদল ড্রামা সার্কেল স্বাধীন বাংলাদেশে জার্মান নাট্যকার বুশনারের 'দাঁতোর মৃত্যু' প্রযোজনা করেন। 'দাঁতোস ডেথ' বা 'দাঁতোর মৃত্যু' ছিল নির্দেশক বজলুল করিমের শেষ কাজ। উল্লেখ্য, পাঁচ ও ছয়ের দশকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে কর্মঠ নাটকের দলটির নাম ছিল ড্রামা সার্কেল। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নাট্যকলার বিভাগ সমূহে এবং বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত থিয়েটার স্কুলগুলোতে পাঠক্রমের অংশ হিসেবে বিদেশি ও সংস্কৃত নাটক প্রযোজিত হয়। ঢাকায় এখন বেশ দাপটের সঙ্গে অভিনীত হচ্ছে নাট্যকেন্দ্র প্রযোজিত আর্থার মিলারের বিশ্বখ্যাত নাটক 'দ্য ক্রুসিবল'। শুধু নাটক নয়, বিদেশি কাব্যের নাট্যরূপও বাংলাদেশের মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। বরিশালের শব্দাবলী গ্রুপ স্টুডিও থিয়েটার কবি কোলরিজের বড় কবিতা 'দ্য রাইম অব দ্য এন্সেন্ট মেরিনার'-এর নাট্যরূপ মঞ্চায়িত করেছে।

আমার এ তালিকায় কিছু নাটকের দল ও প্রযোজনার উল্লেখ করেছি তা আমার বাস্তব দেখা ও শোনার উপর নির্ভর করেই করেছি। তবে এ তালিকা থেকে বাংলাদেশের বিদেশি নাটক মঞ্চায়নের হালচাল সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে। একটি বিষয় এখানে জানানো বিশেষ প্রয়োজন বোধ করছি। বাংলাদেশ ছোটো দেশে হলেও বৈশ্বিক চেতনার অংশীদার হতে চায়, যা ভালো ও সুন্দর তা মঞ্চমূর্ত করতে চায়, আর সে জন্যেই এত বেশি বিদেশি নাটক গত পঁচিশ বছরে বাংলাদেশে পাদপ্রদীপের আলো দেখতে পেয়েছে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। যে সব বিদেশি নাটক বাংলাদেশের মঞ্চে অভিনীত হয়েছে, সে সব নাটক বাছাই করার বিচার্য বিবেচনা ছিল শৈল্পিক মানের পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে সব নাটকের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা। ভুললে চলবে না যে, বাংলাদেশের থিয়েটারের চরিত্র অনেকাংশে রাজনৈতিক, যা বাস্তব পরিস্থিতি উদ্ভূত। শেকস্‌পিয়ার যেমন ইংরাজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তেমনি রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের অবিসংবাদিত প্রধান নাট্যকার। তাঁর তুল্য কোনো নাট্যকারের আবির্ভাব এখনও আমাদের নাট্যাঙ্গনে হয়নি। তবে তফাৎ একটা আছে শুধু ইংল্যান্ডে নয় সমগ্র ইউরোপীয় তথা সারা বিশ্ব এখনও শেকস্‌পিয়ারের নাটকে যে ভাবে অবগাহন করছে তার সিকি ভাগও আমরা বাংলাভাষীরা রবীন্দ্রনাথে হচ্ছি না। রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে সাধারণ একটি ধারণা অনেকের মনে কাজ করে, তা হল, রবীন্দ্রনাথের নাটকের বক্তব্য ও সংলাপ দুরূহ, চরিত্রগুলো রূপকের জালে আবদ্ধ এবং সে কারণে তাঁর নাটক শুধুমাত্র এলিটদেরই উপযোগী সাধারণের বোধগম্য নয়। এই ধারণাগুলো ভ্রান্ত মনে হয়। শেক্‌সপিয়ারের নাট্যভাষার প্রায় বিশ শতাংশ এখন পর্যন্ত তুখোড় ইংরেজ অভিনেতা-অভিনেত্রীরও সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয় বলে শোনা যায়, তবুও তারা অনলসভাবে তাঁর নাটক করে যাচ্ছে। আসলে রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রযোজনার জন্য যে মনস্কতা মেধা শ্রম ও আত্মনিবেদনের প্রয়োজন সেটা খুব কম নাট্যদলই দিতে সক্ষম এবং সে কারণে তাঁর নাটকের মঞ্চায়ন তুলনামূলক কম চোখে পড়ে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রচর্চায় বাংলাদেশের তুলনায় অগ্রগামী। রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্র কাব্য, উপন্যাস, গল্প, নাটক,

অঙ্কন শিল্প, জীবন চর্চা ইত্যাদি বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গে অনেক বেশি আলোচনা পর্যালোচনা ও গবেষণা হয়ে থাকে বলে আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু কলকাতাসহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে রবীন্দ্র নাটকের করুণ অবস্থা দেখলে আমাদের সে বিশ্বাস টলে যায়। সে বাঙালি শুধুমাত্র রবীন্দ্র নাটক মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য। রবীন্দ্রনাথ যেমন আমাদের কাছে স্টেটাস সিম্বল মাত্র, তিনি যেন নিয়মিত চর্চার উপযোগী নন। মঞ্চায়নের দিকে থেকে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁকে ঘিরে তাঁর নাটকের বহুল চর্চা হয়েছে। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পরে তাঁর নাটক হয়ে পড়ল বিদগ্ধজনদের ড্রইংরুম কেন্দ্রিক আলোচনার বিষয়বস্তু।

সাধারণ বঙ্গালয়ে শিশিরকুমারেরাও তাঁর নাটকের প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করেননি। তাঁরা বক্স অফিসের কথা ভেবে শুধু তাঁর লঘু নাটকগুলো (কমেডি) নিয়ে কিছু নাড়াচাড়া করেছেন মাত্র। দুঃখ হয়, রবীন্দ্রনাথকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল দীর্ঘ সময় বহুরূপীর মতো একটি নাট্যদলের জন্যে। যাঁদের প্রয়োগকর্তা ছিলেন প্রয়াত শম্ভু মিত্র, যাঁরা প্রমাণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাটক প্রয়োগের ক্ষেত্রেও আমাদের নাট্যাকাশের উজ্জ্বলতম জোতিষ্ক। বহুরূপী প্রযোজিত এবং শম্ভু মিত্র নির্দেশিত রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' ও 'রাজা' নাটকের অসামান্য সাফল্য আজ কিংবদন্তির মতো শোনায়। বহুরূপী এ দুটো নাটক ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা', 'বিসর্জন', 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নাট্যরূপ, 'মালিনী' নাটক মঞ্চস্থ করেছে। এ থেকে বোঝা যায় বহুরূপী নাটকের দল হিসেবে যথার্থই রবীন্দ্রনিষ্ঠ ছিল। বহুরূপীর পাশাপাশি এবং পরে, কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে আমরা রবীন্দ্র নাট্যচর্চার ধারাবাহিকতা লক্ষ করি না। কলকাতায় মাঝে মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' কী 'বিসর্জন' নিয়ে খণ্ডিত ও দ্বিধাগ্রস্ত প্রয়াস লক্ষ করা গেছে। আসলে রবীন্দ্রনাটকের মঞ্চায়নের যে বিন্যস্ত ও সংঘবদ্ধ প্রয়াস দাবি করে তার অনুকূল অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে এখন বিরাজ করে না বলে মনে হয়। সে তুলনায় বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাট্যচর্চার অবস্থা তেমন খারাপ নয়। ১৯৮০ সালে নাগরিক নাট্যসম্প্রদায় কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটকের অভাবনীয় সাফল্য দেশের নাট্যামোদী দর্শকদের চমকে দেয়। সবাই ভাবতে শুরু করে রবীন্দ্রনাথেও এত মজা আছে। নাগরিক-এর 'অচলায়তন' কলকাতায় একাধিকবার অভিনীত হয় এবং দর্শকনন্দিত হয়। এরপরে নাগরিক নাট্যসম্প্রদায় একে একে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন', 'মুক্তধারা' ও 'রথের রশি' নাটকের নিয়মিত মঞ্চায়ন করে। ব্রেশট্ চর্চার মতো নাগরিক বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাট্যচর্চার ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। থিয়েটার নাটকের দল বিরাট সাফল্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গল্প 'দুই বোন'-এর নাট্যরূপ এবং উপন্যাস 'ঘরে বাইরে'-এর নাট্যরূপ প্রযোজনা করে। এ দুটো প্রযোজনাই অনেক দিন ধরে থিয়েটার-এর জনপ্রিয় প্রযোজনা তালিকার শীর্ষে অবস্থান করেছিল। এ ছাড়াও ঢাকার নান্দনিক নাট্যদল সাফল্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের নাট্যরূপ মঞ্চে আনে। এই প্রযোজনাটিও দর্শকপ্রিয় হয়। চট্টগ্রামের তির্যক নাট্যদল নিরলসভাবে নাট্যচর্চা চালিয়ে যাচ্ছে। এই নাট্যদলটি এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ৬-৭টি প্রধান নাটক মঞ্চে এনেছে। গুণগত মানের দিক থেকে খুব উন্নত না হলেও তির্যকের রবীন্দ্রনাট্যচর্চা রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে ভয়-ভীতি ভাঙতে সাহায্য করছে। মনে পড়ে স্বাধীনতা-পূর্বকালে, খুব সম্ভবত পাঁচের দশকের ড্রামা সার্কেল এবং ছয়ের দশকের সাংস্কৃতিক সংসদ খুব জাঁকিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' মঞ্চায়ন করেছিল। দুটো প্রযোজনাই দর্শকনন্দিত হয়েছিল। ১৯৬৪ সালে সংস্কৃতি সংসদের 'তাসের দেশ' প্রযোজনাও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। বর্তমান লেখক গান বিন্দুমাত্র গাইতে না জেনেও শুধুমাত্র ব্যাকগ্রাউন্ড গানের সঙ্গে লিপ্‌সিং-এর উপর নির্ভর করে রাজপুত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে মুস্তফা মনোয়ারের নির্দেশনায় খোলা মাঠে প্রায় পনেরো হাজার দর্শকের সামনে রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' মঞ্চস্থ হয়। বর্তমানে লেখক যন্ত্ররাজ বিভূতির ভূমিকায় অভিনয়

করেছিল। মনে আছে, মুক্তধাবাব বাঁধ ভাঙা দেখাবার জন্যে দমকল বাহিনীর পাঁচটি গাড়ির হোস পাইপ ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই উন্মাদনাব কথা ভাবলে এখনও শিহরিত হতে হয়। বাংলাদেশের টেলিভিশনে ববীন্দ্রনাথের নাটক ও গল্পের নাট্যরূপ প্রযোজনাগুলো যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ কবে। মুস্তফা মনোয়ার প্রযোজিত 'রক্তকরবী' এখনও টিভি প্রযোজনার ক্ষেত্রে মাইলস্টোন হয়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালযের নাট্যকলা বিভাগগুলো এবং বেসরকাবি উদ্যোগে পরিচালিত থিয়েটাব স্কুলগুলো বর্তমানে রবীন্দ্রনাটক প্রযোজনায় বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছে। ববীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাণের মানুষ, তাঁকে ছাড়া বাঙালি জীবন অচল, তাই আশা করছি একদিন এ দেশের মানুষ রবীন্দ্রনাটকের মূল্য বুঝতে শিখবে এবং শেক্সপিয়াবেব নাটকে ইংল্যান্ডবাসীরা যে ভাবে প্রতিনিয়ত অবগাহন করছে বাঙালিও ববীন্দ্রনাটকে তেমনিভাবে স্নাত হবে।

বাংলাদেশের শিশুনাট্যচর্চা

আবদুল্লাহ্ আল হারুন

জাতি হিসেবে আমাদের দীনতা হচ্ছে আমরা কোনো কিছু ধরে রাখতে পারি না, তার ইতিহাস সংরক্ষণ করি না ও মানুষের অবদানকে স্বীকৃতি দেই না। শুরুতেই এ কথাটি বলতে হচ্ছে এ কারণে যে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া ছোটো একটি তথ্যও একদিন হয়ে উঠতে পারে সুবিশাল এক কর্মযজ্ঞের সূচনা মন্ত্র। অথচ সামান্য অবহেলা ও অসচেতনতায় সেই কথাটি ইতিহাসের বিকৃতি ঘটাতে পারে।

অনেকে আবার মনে করতে পারেন কী আবার শিশুনাট্যচর্চা, তার আবার ইতিহাস। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে এ দেশের শিশুনাট্যচর্চা বাংলাদেশের গ্রুপ থিয়েটার চর্চার প্রায় সমান বয়সি। যদিও গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের মতো শিশু থিয়েটার চর্চা এত ব্যাপকতা এবং জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। অবশ্য এর সঙ্গত কারণও রয়েছে। একে তো শিশুদের নিয়ে ক্রমাগত কাজ চালিয়ে যাবার প্রাসঙ্গিক দুরূহতা, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা এবং সর্বোপরি শিশুদের প্রতি আমাদের অবহেলা। আমরা বড়োরা বড়ো হয়ে গেলে মনে করি, নাটক করবে বড়োরাই। তাহলে ছোটোরা কী করবে? তারা স্কুলে যাবে, টিচারের কাছে পড়বে, টেলিভিশনে কার্টুন ছবি আর গতবাঁধা ছোটোদের অনুষ্ঠান দেখবে, আর বড়ো জোর কেউ গান, নাচ শিখবে। আরেকটা হতে পারে শিশুটিকে টেলিভিশনে যদি দেখা যায়। নাটক করবে? তাও আবার মঞ্চে? তাহলে এ হেন শিশুনাট্যচর্চা তার আবার ইতিহাস।

কিন্তু ইতিহাস আছে অবয়বে এবং বক্তব্যে। উদ্যমী কিছু তরুণ তৈরি করেছিলেন একদা প্রচণ্ড উদ্দীপনা। কিন্তু শুরুতেই যে ধরে রাখার ব্যাপার বলেছিলাম, সেই ধরে রাখা সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কাজেই নিয়মিত শিশুনাট্যচর্চার কাজটি সব সময় সমানভাবে অব্যাহত থাকেনি। প্রচণ্ড উৎসাহ উদ্দীপনায় একেকবার প্রচণ্ড জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে, হয়তো বা আবার নানাকারণে প্রতিবন্ধকতার কারণে ভাটাও নেমে এসেছে পরক্ষণে। একই কারণে বাংলাদেশের শিশুনাট্যচর্চায় সুসমন্বিত রূপও এখনও পর্যন্ত কেউ প্রণয়ন করেননি, কিংবা লেখেননি।

সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হল শিশুদের নাটক বড়োদের নাটকের মতো নিয়মিত মঞ্চায়নের প্রক্রিয়াটি চালু করা সম্ভব হয়নি। মঞ্চের যাঁরা দিক্‌পাল রয়েছেন আমাদের দেশে, তাঁরা কখনো শিশুদের নাটক নিয়ে ভাবেননি। না নাটক লেখার ক্ষেত্রে, না, নির্দেশনার ক্ষেত্রে। এমন কী উৎসাহ দিয়েও নয়। কাজেই নিয়মিত শিশুনাট্যচর্চার প্রচলন হয়ে ওঠেনি এবং দর্শক হিসেবে শিশুদের আগ্রহী করে তোলা যায়নি।

পিপলস্ থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন এ ব্যাপারে এক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। নিয়মিত শিশুনাটক মঞ্চায়ন, নাটকের দর্শক তৈরি করা এবং শিশুদের নাট্যদল সমূহকে সংগঠিত করা অথবা নতুন নতুন শিশুনাট্যদল গঠনে উৎসাহিত করার মানসে পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এই প্রথম জাতীয় শিশুনাট্য উৎসবের মাধ্যমে ইতিহাসের নবতম পর্যায়ের সূচনা সৃষ্টি করতে চায় পিপলস্ থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন। আর সে জন্য তার অতীত ইতিহাস প্রণয়নও প্রয়োজন।

এই রিপোর্টে সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা করা হয়েছে একটি ইতিহাস তুলে ধরার। দলিল সাপেক্ষে কোনো মতান্তর ও তথ্যের সংযুক্তি আমরা সানন্দে গ্রহণ করব।

১৯৭০-এর আগে এ দেশে শিশুনাট্যচর্চার কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। ১৯৭০-এ প্রথম কচিকাঁচার মেলার উদ্যোগে শিশুদের নাটক মঞ্চায়নের চিন্তা ভাবনা ও প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু ১৯৭



চিত্র ৫



চিত্র ৬



চিত্র ৭



চিত্র ৮



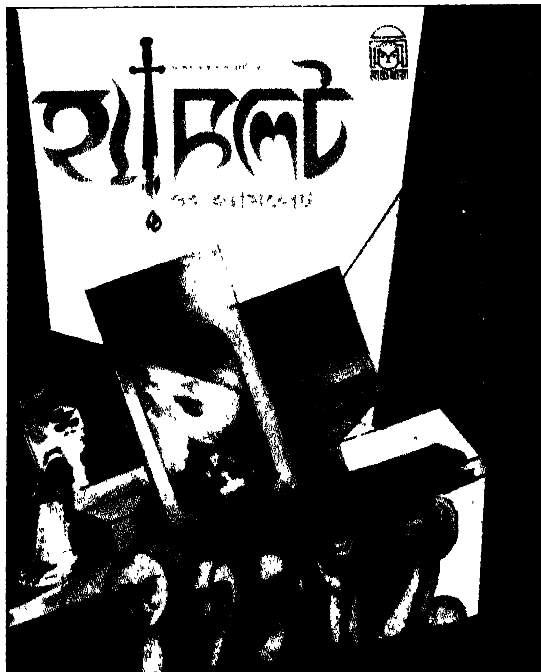
চিত্র ৯



চিত্র ১০



চিত্র ১১



চিত্র ১২

সালে এসে তা বাস্তবতা লাভ করে। এ বছর কচিকাঁচার মেলার সক্রিয় সদস্য মুস্তাফা মজিদের তত্ত্বাবধানে মঞ্চস্থ হয় হাবিবুর রহমানের লেখা নাটক 'আলোর ফুল'। এরপর ১৯৭৪ সনে কবি হাবিবুর রহমানেরই লেখা 'মায়াকানন' কচিকাঁচার মেলা মঞ্চস্থ করে একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে। অন্য অনেকের মধ্যে মোরশেদুল ইসলাম, তারান হালিম প্রমুখ এই নাটকে অভিনয় করেন। এদিকে কচিকাঁচার মেলা এককভাবে শুধু নাট্য সংগঠন না হওয়ায় ১৯৭৩ সন থেকেই একটি শিশুনাট্যদল গঠনের চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। এই শিশু নাট্যদল গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি থেকে ঢাকা শিশুনাট্যম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৬ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক-কেন্দ্রে এক সভা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। উদয়ন স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষিকা বেগম মমতাজ হোসেনকে ঢাকা শিশু নাট্যম-এর প্রথম সভায় নিমন্ত্রণ করা হয়, যাতে করে উদয়ন স্কুল থেকে শিশু-কিশোরদের সংগ্রহ করতে সুবিধা হয়। এ দল গঠনে অন্যতম প্রধান ভূমিকা রাখেন মুস্তাফা মজিদ। দলের সভাপতি বেগম মমতাজ হোসেন। মরহুম কবি হাবিবুর রহমান ঢাকা শিশু নাট্যম-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলে জানা যয়ে। জন্মের পর থেকেই এ দল শিশুনাটক মঞ্চায়ন শুরু করে। প্রথম নাটক কবি হাবিবুর রহমানের 'আলোর ফুল'। প্রদর্শিত হয় ১৯৭৬ সনে, মোট প্রদর্শনী ৪টি। এরপর কবি হাবিবুর রহমানেরই লেখা 'মায়াকানন' ১৯৭৭ সনে মোট ৩টি প্রদর্শন হয়।

সুকুমার রায়ের 'হযবরল' ঢাকা শিশুনাট্যমের তৃতীয় নাটক। অরুণ চৌধুরী নাট্যরূপ দেন। ১৯৭৭-৭৮ সনে নাটকটি প্রদর্শিত হয়। আজাদ হাফিজ এ নাটকের সংগীতে কাজ করেছিলেন আর সেই আফজল হোসেন। ব্রিটিশ কাউন্সিল মিলনায়তন, মহিলা সমিতি এবং শিশু হাসপাতাল মিলনায়তনে নাটকটির প্রদর্শনী হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্নস্থানে আমন্ত্রণমূলক প্রদর্শনীও হয়েছে এ নাটকের, ঢাকা শিশুনাট্যমের চতুর্থ প্রযোজনা 'আলোটা জ্বালো'। রচনা নাজমা জেসমিন চৌধুরী, নির্দেশনা মুস্তাফা মজিদ। ঢাকা শিশুনাট্যমের কার্যক্রমে কিছুটা ভাঁটা পড়ে কর্মকর্তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বগত কিছু টানাপোড়েনের কারণে।

এদিকে ১৯৭৪ সনে ঢাকায় ছোট্ট থিয়েটার নামেও অপর একটি শিশুনাট্যদল গঠিত হয়েছিল বলে জানা যায়। তারা সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'অভিযান' এবং অন্য এক লেখকের (নাম অজানা) 'বুদ্ধির বেড়াল' নামে দুটি নাটক প্রযোজনা করে। দুঃখের বিষয় হল দু-একটি প্রদর্শনীর পরে খুব অল্প সময়ের মধ্যে এ দলের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে পড়ে।

১৯৭৬ (মতান্তরে ১৯৭৭) সালে কিশলয় কচিকাঁচার মেলা (চকবাজার) বৈকালী কচিকাঁচার মেলার সহযোগিতায় মোরশেদুল ইসলাম রচিত ও নির্দেশিত 'আবার অরুণোদয়' নাটক মঞ্চস্থ করে। নাটকটি হয় ব্রিটিশ কাউন্সিল মিলনায়তনে ১৬ ডিসেম্বরের অনুষ্ঠানে।

অন্যদিকে মোরশেদুল ইসলাম এবং ঢাকা থিয়েটারকর্মী মজহারুল ইসলাম বাবলা একটি নূতন শিশুনাট্যদল গঠনের চিন্তাভাবনা শুরু করেন ডাঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং নাজমা জেসমিন চৌধুরীর উৎসাহে। ডাঃ চৌধুরীর বাসায় প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা থিয়েটারের বলিষ্ঠ সহযোগিতায় ১৯৭৮ সালের ১ অক্টোবর ঢাকা লিটল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। ফয়েজ আহমদ সংগঠনের আহ্বায়ক এবং নাজমা জেসমিন চৌধুরী কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। এ দল প্রতিষ্ঠার পেছনে অন্যান্যদের মধ্যে ভূমিকা রাখেন সালাহউদ্দিন জাকী, নাসিরউদ্দিন ইউসুফ, রাইসুল ইসলাম আসাদ, আফজল হোসেন, মাহবুব আলী, সৈয়দ সিদ্দিক হোসেন, সেলিম আল দীন, মোশারফ হোসেন প্রমুখ।

ঢাকা লিটল থিয়েটার বাংলাদেশের শিশুনাট্যচর্চার ইতিহাসে এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে। ছোটোখাটো সাময়িক বিরতি বাদ দিলেও বলা চলে একটা দীর্ঘ সময়ের ধারাবাহিকতায় ঢাকা লিটল থিয়েটার এখনও পর্যন্ত শিশুনাট্যচর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে এবং এখনও পর্যন্ত টিকে রয়েছে।

ঢাকা লিটল থিয়েটারের প্রথম প্রযোজনা ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তাসের দেশ'। রূপান্তর নাজমা জেসমিন চৌধুরী, নির্দেশনা মজহারুল ইসলাম বাবলা এবং মোরশেদুল ইসলাম। বাংলাদেশ টেলিভিশনের রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকীতে ঢাকা লিটল থিয়েটার নাটকটি মঞ্চস্থ করে। বংলাদেশের শিশুনাট্যচর্চার ইতিহাসে 'তাসের দেশ'ই সর্বাধিক মঞ্চায়িত শিশুনাটক যার প্রদর্শনী হয়েছে ৫৬টি।

নাজমা জেসমিন চৌধুরীর লেখা 'যেমন খুশি সাজো' লিটল থিয়েটারের দ্বিতীয় প্রযোজনা। নির্দেশনা মজহারুল ইসলাম বাবলা। নাটকটির মঞ্চায়ন কাল ১৯৮০। এ নাটকে মঞ্চ পরিকল্পনার কাজ ছিল সৈয়দ জামিল আহমেদের, যা তাঁর প্রথম মঞ্চ পরিকল্পনা।

১৯৮১ সালে মজহারুল ইসলাম বাবলার নির্দেশনায় আবদুল মতিন খানের 'বজ্রানলে' ঢাকা লিটল থিয়েটারের তৃতীয় প্রযোজনা। যার সর্বমোট মঞ্চায়ন ৬টি।

সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' এ দলের চতুর্থ নাটক। রূপান্তর ও নির্দেশনা মোরশেদুল ইসলাম। মঞ্চায়নকাল ১৯৮২, সর্বমোট প্রদর্শনী ২১। মুজিবুর রহমান দিলু রচিত ও মোরশেদুল ইসলাম নির্দেশিত 'সাদা পায়রার খোঁজে' এ দলের পঞ্চম প্রযোজনা। মঞ্চায়নকাল ১৯৮৩, প্রদর্শনী হয় ১১বার। ঢাকা লিটল থিয়েটার ১৯৮৩ সালে মঞ্চায়ন করে 'চন্দন বয়াতীর গাঁও'। রচনা ও নির্দেশনা ওবায়দুল্লাহ্ আল-জাকির। এ নাটকের সর্বমোট ৪টি প্রদর্শনী হয়। 'আবার অরুণোদয়' মোরশেদুল ইসলাম রচিত ও জাকির হোসেন শোভন নির্দেশিত নাটক লিটল থিয়েটারের সপ্তম প্রযোজনা। মঞ্চায়নকাল ১৯৮৫, মাত্র একটি প্রদর্শনী হয় নাটকটির।

শিশুদের জন্য পথনাটকও ঢাকা লিটল থিয়েটার মঞ্চস্থ করে দুটি। এর একটি অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন আহমেদের 'চৌর্যাচৌর্য বিনিশ্চয়', নির্দেশনায় জাহিদ হোসেন শোভন, যার প্রদর্শনী হয় ১৭টি। অন্য পথনাটকটি হচ্ছে নাজমা জেসমিন চৌধুরীর 'সন্ত্রাস'। নির্দেশনায় মজহারুল ইসলাম বাবলা।

শুধুমাত্র শিশুদের উপযোগী শিশুদের অভিনয়ের নাটক হিসেবে সৈয়দ শামসুল হকের 'ভয় করলেই ভয়' ঢাকা লিটল থিয়েটারের অন্তিম নাটক। নির্দেশনা মোরশেদুল ইসলাম। ১৯৯০ সালে ৫ই অক্টোবর ঢাকা লিটল থিয়েটার তাদের এক যুগপূর্তি উৎসবও পালন করেছে ব্রিটিশ কাউন্সিল মিলনায়তনে। এরপর কিছুটা নিষ্ক্রিয়তা। নানারকম অসুবিধার কারণে লিটল থিয়েটারের যাত্রাপথ মাঝে মাঝেই থেমে গিয়েছে। যেমন এ দলের তৃতীয় প্রযোজনা 'বজ্রানল'-এর পরেও কিছু উত্থান-পতনের ঘটনা ঘটে। ১৯৯০ সালের পরেও বেশ কিছু সময়কাল নিষ্ক্রিয় থাকার পর ১৯৯১ সালের শেষে আবার কার্যক্রম শুরু করে লিটল থিয়েটার। উইলিয়াম শেক্স্‌পিয়ারের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' -এর আবদুস সেলিম-কৃত অনুবাদ 'ভেনিস সওদাগর'কে আতাউর রহমানের নির্দেশনায় শিশুদের উপযোগী করে মঞ্চায়ন শুরু করে এ দল। এখনও নাটকটি মঞ্চস্থ হয়ে আসছে।

এ পর্যায়ে এসে শিশুদের সবচেয়ে সচল নাট্যদলটির চরিত্রগত কিছু পরিবর্তন আমরা লক্ষ করি। শুধুমাত্র শিশুদের অভিনয়ের উপযোগী নাটক মঞ্চায়নই এ দলের মূল উদ্দেশ্য আর নেই। এর সাথে তারা যুক্ত করেছে অন্য দুটি উদ্দেশ্য—(১) GRIPS থিয়েটারের আঙ্গিকে নাটক মঞ্চায়ন অর্থাৎ শিশুদের উপযোগী নাটকে শিশুদের জন্য বড়োরা অভিনয় করবে। (২) বড়োরা অভিনয় করবে বড়োদের নাটকে। তবুও বাংলাদেশের শিশুনাটকে শিশুনাট্যচর্চায় ঢাকা লিটল থিয়েটার গৌরবময় ভূমিকা পালন করে এসেছে।

ঢাকা লিটল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পরপরই আরেকটি সাহসী সম্ভাবনা নিয়ে জন্ম হয়েছিল অভিযাত্রিক কিশোর নাট্যগোষ্ঠীর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোডে সংগঠনটির বেড়ে ওঠা। ১৯৭১-এর শহিদ ডাঃ মূর্তজার স্ত্রী মূর্তজা সংগঠনের সভাপতি এবং মুস্তাফা মজিদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। অভিযাত্রিক নাজমা জেসমিন চৌধুরীর 'ঘুম নেই' নাটকটি নতুন করে ৭/৮ টি মঞ্চায়ন করে।

মাঝখানে কিছুদিন কার্যক্রম বন্ধ থাকার পর অভিযাত্রিক ১৯৮০-৮১ সালের দিকে আবার নাটক মঞ্চায়নে এগিয়ে আসে নাজমা জেসমিন চৌধুরীর 'অন্যরকম অভিযান' মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে। এ নাটকের সেট করেন জামিল আহমেদ এবং শিশুদের এ নাটকের মাধ্যমেই বাংলাদেশ সর্বপ্রথম রিভলভিং সেটের প্রয়োগ হয় বলে দাবি করা হয়েছে। দলের কিশোরী শিল্পী শাফিনাজ আলী 'ঘুম নেই' নাটকের নির্দেশনা দেন। অভিযাত্রিক-এর উদ্যোগে একটি শিশুনাট্য পত্রিকাও অভিযাত্রিক নামে প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মুস্তাফা মজিদ। কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে পড়ে। অবশ্য ক্রমবিলীয়মান ধারায় অভিযাত্রিকও একদিন বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৮০ ও ৮১ সালে শিশু নাট্যান্দোলনের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য এবং অবিস্মরণীয় ইতিবাচক কর্মসূচির অবতারণা করা হয়। পরপর দুবছর অনুষ্ঠিত হয় শিশু-কিশোর নাট্যোৎসব। অবশ্য এর অনুপ্রেরণা আসে ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের প্রথম গ্রুপ থিয়েটার উৎসবের ঘটনা থেকে। তখনও গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন গঠিত হয়নি। কেন্দ্রীয় পরিষদ গ্রুপ থিয়েটার উৎসব ৭৯-এর ব্যানারে আয়োজিত এই উৎসবে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষকে উপলক্ষ করে দুটি নাট্য সংগঠনকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। দল দুটি হচ্ছে ঢাকা লিটল থিয়েটার এবং ঢাকা শিশুনাট্যম। তারা মঞ্চস্থ করে যথাক্রমে 'তাসের দেশ' এবং 'হ য ব র ল'।

গ্রুপ থিয়েটার উৎসব '৭৯-এর পথ ধরে প্রথম শিশু-কিশোর নাট্যোৎসবে ঢাকা শিশুনাট্যম, ঢাকা লিটল থিয়েটার, অভিযাত্রিক শিশু-কিশোর নাট্যগোষ্ঠী, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর, কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলা, সন্ধানী নাট্যসংসদ, শিশুতীর্থ, নেত্রকোণা নজরুল সেনা অংশ নেয়। এই উৎসবে মঞ্চস্থ নাটকগুলো হচ্ছে 'যেমন খুশি সাজো', রচনা নাজমা জেসমিন চৌধুরী, নির্দেশনা মাজহারুল ইসলাম বাবলা ; 'হাতুড়ে ডাক্তার' রচনা ও নির্দেশনা শাফিনাজ আলী ; 'রাস্তার ছেলে', রচনা কল্যাণ মিত্র, নির্দেশনা সিরাজুল হক মন্টু ; 'গুপী গাইন বাঘা বাইন', রচনা উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ; 'স্বপ্নের বন্ধু', রচনা বেগম মমতাজ হোসেন, নির্দেশনা হেমায়েতউদ্দিন বাবুল ; 'মায়াকানন' রচনা হাবিবুর রহমান এবং 'হ য ব র ল' যার নাট্যরূপ অরুণ চৌধুরী, নির্দেশনা আহমদ সিদ্দিকী।

১৯৮০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ব্রিটিশ কাউন্সিল মিলনায়তনে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। হেমায়েতউদ্দিন আহমেদ বাবুল উৎসব কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন।

একই রকমভাবে ১৯৮১ সালে দ্বিতীয় শিশু-কিশোর নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৮ থেকে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত মহিলা সমিতি মিলনায়তনে। মুস্তাফা মজিদ এবং হেমায়েতউদ্দিন বাবুল উৎসব প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। এই উৎসবে যে সমস্ত শিশুনাট্যদল অংশ নেয় সেগুলো হচ্ছে শিশুনাট্যম (নাটক : হিজলতলীর গাঁয়ে), কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর (নাটক : ডাকঘর), অভিযাত্রিক কিশোর নাট্যগোষ্ঠী (নাটক : আসল রাজার রাজা), ঢাকা লিটল থিয়েটার (নাটক : তাসের দেশ), কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলা (নাটক : এপার ওপার), সন্ধানী (নাটক : ঝালাপালা), চাঁদের হাট, বরিশাল (নাটক : তোতা কাহিনী), খুদে লেখক শিবির (নাটক : লালু)।

১৯৮০ এবং ১৯৮১ সালের দুটি শিশুনাট্য উৎসব শিশুনাট্যচর্চার ইতিহাসে সুবাতাস দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার পরবর্তীকালে এই প্রক্রিয়ার কোনো ধারাবাহিকতা উদ্যোক্তারা রাখতে পারেননি এবং যে কারণে আরো একধাপ এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। অনেক দলই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে পরবর্তীকালে।

যাই হোক, এ সমস্ত দল ছাড়াও ঢাকায় আরো কিছু কিছু শিশুনাট্য সংগঠনের নাটক মঞ্চায়নের কথা জানা যায়। যেমন সুকান্ত একাডেমী সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'অভিযান'-সহ অন্যান্য নাটকও প্রযোজনা

করেছে। আলী ইমাম পরিচালিত শিশুদের সংগঠন 'পারাপার', 'চাঁদের হাট' প্রভৃতি শিশুনাটক মঞ্চস্থ করেছে।

পুরানো ঢাকার ওয়ারির ভাস্কর শিশু কিশোর সংগঠনও শিশুদের নাটক মঞ্চায়ন করেছে। তাদের মঞ্চায়িত নাটকগুলোর মধ্যে 'মরক্কোর যাদুকর' 'একালের হবুচন্দ্র' 'সুখের স্বপ্ন' 'হযবরল' 'অন্তর গণতন্ত্র' 'টোকাইর স্বপ্ন' 'আমার দেখা স্বাধীনতা' অন্যতম। বর্তমানে এ দলের কর্মকাণ্ড নেই।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পরিপন্থী সাম্প্রদায়িকতা, শিশুশ্রম, শিশুপাচার, শিশু নির্যাতন, বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর আমলাতান্ত্রিক ও সংস্কৃতি বিরোধী কার্যক্রমের প্রতিবাদে ১৯৮৭ সালে শিশু-কিশোর সাংস্কৃতিক ফেডারেশনও গঠিত হয়েছিল, মাজহারুল ইসলাম বাবলুকে আহ্বায়ক নির্বাচন করে। রাজপথে এসব ইস্যু নিয়ে আন্দোলনের অংশ হিসেবে একটি র‍্যালি হয় ১৯৮৭ সনে, র‍্যালি শেষে টি এস. সি-তে আলোচনা ও শিশু নাট্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা লিটল থিয়েটারের পথনাটক 'সন্ত্রাস' অনুষ্ঠানে মঞ্চস্থ হয়। শিশু-কিশোর সাংস্কৃতিক ফেডারেশনের সাথে যে সমস্ত সংগঠন জড়িত ছিল সেগুলো হচ্ছে ঢাকা লিটল থিয়েটার, কচিকাঁচার মেলা, অভিযাত্রিক, ঢাকা শিশু-নাট্যম, শিশুতীর্থ, সন্ধানী শিশুনাট্যদল, আমরা সূর্যমুখী, চয়ন নাট্যগোষ্ঠী, আর্তনাদ শিশু থিয়েটার। পরবর্তীকালে দু-একটি সংগঠনের পিছুটানগত মনোভাবের কারণে শিশু-কিশোর সাংস্কৃতিক ফেডারেশনের কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর একটি বিশেষ কার্যক্রম রয়েছে, শিশুনাট্যচর্চার ক্ষেত্রে যেটি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে বলে মনে করি। শিশু একাডেমী প্রতিবছর জাতীয়ভাবে 'অগ্রণী ব্যাংক শিশুনাট্য প্রতিযোগিতা' নামে নাট্যোৎসবের আয়োজন করে থাকে। প্রতিবছর ৭টি দলের নাটক নির্বাচিত করা হয় সারা দেশের শিশুনাট্যদলগুলো থেকে। এই ৭টি দলের নাটক থেকে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হিসাবে ৩টি নাটককে পুরস্কৃত করা হয়। এই প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে দেশে শিশুনাট্যচর্চাকে অনুপ্রাণিত করা হয় এবং শিশুদের উপযোগী নাটক বাড়ানো এবং নাটকের উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান করা হয়।

নিম্নে সনওয়ারি শিশুনাট্য সংগঠনের নাটক এবং কৃতিত্ব সম্পর্কে শিশু একাডেমী কর্তৃক প্রদত্ত খতিয়ান পেশ করা হল—

সন	কৃতিত্ব	সংগঠন	নাটক
১৯৮২	১ম	কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলা	এক যে ছিল দৈত্য
	২য়	ঢাকা শিশুনাট্যম	হিজলতলীর গাঁও
	৩য়	তির্যক লিটল থিয়েটার	কেরামতের কেরামতি
১৯৮৩	১ম	নতুন কুঁড়ি	জানা যায়নি
	২য়	ঢাকা লিটল থিয়েটার	চন্দন বয়াতির গাঁও
	৩য়	সুকান্ত একাডেমী (শিশু বিভাগ)	জানা যায়নি
১৯৮৪	১ম	ঢাকা লিটল থিয়েটার	সাদা পায়রার খোঁজে
	২য়	সুকান্ত একাডেমী (শিশু বিভাগ)	খর বায়ু বয়
	৩য়	পদাতিক	শেষ দৃশ্যের পর
১৯৮৫	১ম	কেন্দ্রীয় ফুলকুঁড়ি	সুমনের নাটাই
	২য়	ঢাকা লিটল থিয়েটার	আবার অরুণোদয়
	৩য়	কেন্দ্রীয় কিশোর মেলা	শিশুর রাজ্য

১৯৮৬	১ম	ঢাকা লিটল থিয়েটার	চৌর্যাচৌর্য বিনিশ্চয়
	২য়	মুক্তি খেলাঘর আসর	ডাকঘর
	৩য়	প্রপাত সংঘ	বিজয় আসবে
১৯৮৭	১ম	সমাজ নাট্য সাংস্কৃতিক সংঘ	ডাকঘর
	২য়	আর্তনাদ শিশু থিয়েটার	এক যে ছিল টুই
	৩য়	ঢাকা লিটল থিয়েটার	যেমন খুশি সাজো
১৯৮৮	১ম	সুবচন নাট্যগোষ্ঠী	ফান্দিবাজ বাঘ
	২য়	শতদল নজরুল সেনা (টাঙ্গাইল)	আষাঢ়ে গল্প
	৩য়	শিশু কিশোর (মিরপুর)	বকুলপুরের স্বাধীনতা
১৯৮৯	১ম	হিমগিরি খেলাঘর (টাঙ্গাইল)	ফুটপাথ
	২য়	কিশোর থিয়েটার	আলোটা জ্বালো
	৩য়	সমাজ	অন্যরকম অভিযান

মাঝখানে কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর ১৯৯৪ সন থেকে এই প্রতিযোগিতা পুনরায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত ১৪ই এপ্রিল '৯৪ থেকে ২১শে এপ্রিল '৯৪ পর্যন্ত যে সমস্ত দল প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে সেগুলো হল : সঙ্গীতা বিদ্যানিকেতন (নাটক : প্রদীপ জ্বলবে) কিশোর থিয়েটার (নাটক : কাকলির সংসার), অগ্রণী শিশু-কিশোর সংগঠন (নাটক : মা) শিশু-কিশোর সংগঠন (নাটক : স্বপ্ন) লিটল চতুরঙ্গ (নাটক : দুঃখ থেকে পিকনিক), পাগলাপীর শিশু সঙ্গীত বিদ্যালয়, রঙপুর (নাটক : পাখপাখালীর গান) এবং তরঙ্গ ললিতকলা কেন্দ্র (নাটক : এক যে ছিল টুই)

তবে এ কথা উল্লেখ করতেই হয় যে শিশু একাডেমীর এ প্রক্রিয়া পদ্ধতিগত কারণে যথেষ্ট ফলপ্রসূ নয়। বিশুদ্ধভাবে নাট্যদল গঠিত হচ্ছে না।

পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন এ পর্যায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে এসেছে। পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল এবং লোকনাট্যদলের অধিকর্তা লিয়াকত আলী লাকিএ ব্যাপারে উদ্যোগ নেন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। তিনি শিশুনাটকের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য একটি বিশেষ কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পি টি এ শিশুনাট্যচর্চাকে বেগবান করতে সক্ষম হয়েছে। এ লক্ষ্যে ১৯৯২ সনের ডিসেম্বরে গঠন করা হয়েছে লোকনাট্যদলের চিলড্রেন্স থিয়েটার ট্রুপ। শুরুতেই শিশুনাটক মঞ্চায়নে এগিয়ে আসে দল। হাসি সিদ্দিকী রচিত 'ফন্দিবাজ বাঘ' অবলম্বনে ট্রুপের প্রথম প্রযোজনা 'সংহার'। পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় লিয়াকত আলী লাকি। এ দল চমক তৈরি করে ১৯৯৪ সনের এপ্রিলে জার্মানির লিঙ্গেন শহরে অনুষ্ঠিত ৩য় আন্তর্জাতিক শিশুনাট্য উৎসবে 'সংহার' মঞ্চায়ন করে শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার পুরস্কার অর্জনের মাধ্যমে।

পি টি এ ১৯৯৪ সনে ২০শে জুন থেকে ১লা জুলাই পর্যন্ত প্রথম জাতীয় শিশুনাট্য কর্মশালার আয়োজন করে। যেখানে ২০০ শিশু অংশ নেয়। কর্মশালার মূল প্রশিক্ষক ছিলেন লিয়াকত আলী লাকি। শিশুনাট্য আন্দোলনের অংশ হিসেবে পি টি এ সারা দেশে শিশুনাট্য কর্মশালা আয়োজনের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

অবশেষে 'অনাবিল আনন্দে মিলি নাটকে মঞ্চে' শিশুদের জন্যে এ ধরনের উদ্দীপনামূলক শ্লোগান নিয়ে পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন আয়োজন করেছিল প্রথম শিশুনাট্য উৎসবের। সাতদিন ব্যাপী এই উৎসবে সারাদেশ থেকে ২০টি শিশুনাট্যদল অংশগ্রহণ করেছে।

কোডেক ও বিটা শিশুনাট্য স্কোয়াড	চট্টগ্রাম
বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র	
লোকনাট্যদলের চিলড্রেন্স থিয়েটার ট্রুপ	ঢাকা
থিয়েটার নতুনকুঁড়ি	চট্টগ্রাম
কিশোর থিয়েটার	ফেণী
শিকড় নাট্য সম্প্রদায়	কিশোরগঞ্জ
উপ-শহর শিশু সংগঠন	যশোর
সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদ	হরিরামপুর
অনিয়মিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী	মুন্সিগঞ্জ
সেক্রেড হার্ট স্কুল	যশোর
শ্রুতি নাট্যদল	নারায়ণগঞ্জ
তির্যক কিশোর	যশোর
ক্রান্তি খেলাঘর আসর	নারায়ণগঞ্জ
আনন্দম নাটক	ঢাকা
গণজোয়ার	নারায়ণগঞ্জ
ঘরে বাইরে	ঢাকা
টংগী শিশু-কিশোর নাট্য সম্প্রদায়	টংগী
কিশোর থিয়েটার	ঢাকা
তরঙ্গ ললিতকলা কেন্দ্র	ঢাকা
টংগী শিশু থিয়েটার	টংগী
কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলা	ঢাকা

শিশুনাট্যচর্চার ক্ষেত্রে সুপ্রাচীন শিশুসংগঠন কচিকাঁচার মেলার অবদান সম্পর্কে এই রিপোর্টের পূর্বাংশে আলোচিত হয়েছে। শিশুনাট্যচর্চার শুরুটাই উৎসারিত হয়েছে কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলা এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এর শাখাগুলো বিভিন্ন সময়ে শিশুনাটক মঞ্চায়নে এগিয়ে এসেছে। কচিকাঁচার মেলা থেকে শিশুনাটক মঞ্চায়নে সংগঠনের কর্মী হিসেবে মুস্তাফা মজিদ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

যশোরের সেক্রেড হার্ট জুনিয়র হাইস্কুল ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত। সেবার ব্রতীতে নিবেদিত সিস্টার অব চ্যারিটি এ যুগের সন্তানদের গড়ে তুলতে দায়িত্ব নেন। যশোরে প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত এ স্কুলে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক শিক্ষাকেও গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আর সে জন্যে নাট্যচর্চার মাধ্যমে ছোটোদের বিনোদন এবং মননের বিকাশে এ দল শিশুদের নাটক মঞ্চায়ন এগিয়ে আসে। দলের প্রযোজনার মধ্যে রয়েছে 'জুতা আবিষ্কার', 'সাচ্চা ভগবান', 'শিক্ষকের মর্যাদা', 'সুমন-কুমন', 'আলোর যাত্রী ও বাঘ' প্রভৃতি।

যশোরের তির্যক ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত। প্রযোজিত নাটক ১২টি। প্রযোজনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ভণ্ডুল চাই', 'সূর্যলোক', 'মগের মুলুক', 'সুলতানের অপদেবতা' অন্যতম। ১৯৮৭-৮৮ ও ৯৩-তে জেলা পর্যায়ে এবং ১৯৮৭ সালে বিভাগীয় নাট্য প্রতিযোগিতায় এ দল পুরস্কার লাভ করেছে।

বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র রংপুর শাখা সম্প্রতি স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে নাট্যচর্চায় মনোনিবেশ করেছে। জহির রায়হানের কাব্য 'লেট দেয়ার বি লাইট' থেকে কাব্যনাট্য মঞ্চায়নের মাধ্যমে এই কেন্দ্রের শিশুনাট্যচর্চার হাতেখড়ি। তাদের বর্তমান প্রযোজনা নুরুল ইসলাম রচিত ও জাহাঙ্গীর আলম

নির্দেশিত নাটক 'সুন্দর পৃথিবীর জন্য'।

চট্টগ্রামের থিয়েটার নতুন কুঁড়ি ১৯৯৩ সালের ১১ই নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়। থিয়েটার ওয়ার্কশপ (চট্টগ্রাম) এর সভাপতি নাট্যকর্মী ও সংগীত শিল্পী তাপস শেখর, শিশু সাহিত্যিক ও লেখক সৌরভ সাখাওয়াত, সাংবাদিক মঈন মাহমুদ, কবি আবৃত্তিকার জাহান বশীর ও সমাজকর্মী নাজমা হোসেনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় থিয়েটার নতুন কুঁড়ির প্রতিষ্ঠা লাভ। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী আয়োজিত শিশু আনন্দ মেলায় শিশুনাটক মঞ্চায়ন করে এবং চট্টগ্রামে প্রথম জাতীয় পথনাট্য উৎসবে শিশুপথনাট্যে ১৯৯৪ সালে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেছে থিয়েটার নতুন কুঁড়ি। বাংলাদেশ শিশুনাট্য ফেডারেশনের সাথে যৌথ উদ্যোগে চট্টগ্রামে প্রথম জাতীয় শিশুনাট্য উৎসব আয়োজন করে এ দল ১৯৯৪-এর ১০ মার্চ তারিখে।

১৯৯১ সালের ২৯ জুলাই কিশোরগঞ্জে শিকড় নাট্য সম্প্রদায়ের জন্ম। মূলত বড়োদের দল সাম্প্রতিককালে শিশুনাট্যচর্চার শুরু করেছে। ডঃ নাজমা জেসমিন চৌধুরীর 'ওরা ছিল বাগানে'— শিকড়-এর প্রথম শিশুনাটক।

নারায়ণগঞ্জের শ্রুতি নাট্যদল ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত শ্রুতি আবৃত্তি সংগঠন থেকে শ্রুতি নাট্যদল হিসেবে পরিবর্ধন। প্রথম নাটক সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান' মঞ্চস্থ করে নারায়ণগঞ্জে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। বর্তমানে প্রযোজনা করছে সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'অভিযান'।

মানিকগঞ্জের হরিরামপুরে ১৯৮৬ সনে ১৫ই জুন সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদ গঠন হয়। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এ দল শিশু-কিশোর উপযোগী নাটক মঞ্চায়ন করে আসছে।

মুন্সীগঞ্জের একটি প্রাচীন নাট্যদল অনিয়মিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ১৯৭৩-এর ২১শে ফেব্রুয়ারি জন্ম। বড়োদের নাটকের পাশাপাশি নিয়মিত শিশুনাটক মঞ্চায়ন করে আসছে। এদের নাটকগুলো হচ্ছে 'কেরামতের কেরামতি', 'হীরক রাজার দেশে', 'দুষ্ট ছেলে', 'অন্যরকম অভিযান', 'টোকাই এবং টোকাই', 'বিয়ে', 'হ য ব র ল', 'হট্টিমাটিমটিম' এবং 'দেবতাদের ভয়'।

ফেণীতে ১৯৯২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সিকান্দার আবু জাফরের শিশুনাটক মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে কিশোর থিয়েটার (ফেণী)-র আত্মপ্রকাশ। ফেণীতে শিশুদের নাটক মঞ্চায়ন করে এ দলটি বেশ সমাদৃত হয়। তাদের প্রযোজিত নাটকগুলো হচ্ছে 'আমরা তোমাদের ভুলবো না', 'কুরসী', 'অধূমপায়ী বর চাই', 'দস্তুর ব্যাধি এবং ফলাফল'।

জাতীয় শিশু সংগঠন খেলাঘর-এর শাখা সংগঠন ক্রান্তি খেলাঘর শিশুদের নাট্যচর্চার সাথে ১৯৮৩ সাল থেকে জড়িত। এ সংগঠন মঞ্চস্থ করেছে 'জুতা আবিষ্কার', 'রাজপথের আত্মকাহিনী' প্রভৃতি শিশুনাটক।

টংগীতে টংগী শিশু থিয়েটার শিশুনাট্যচর্চার সাথে জড়িত। আব্দুল হাই দুর্বারের 'আহত একুশ' নাটক মঞ্চায়ন, পরবর্তীতে ১৯৯৪ সনে ঢাকায় পিপল্‌স থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত প্রথম জাতীয় শিশুনাট্য সাফল্যজনকভাবে অংশ নেয়ার মধ্য দিয়ে শিশুনাট্যচর্চায় টংগী শিশু থিয়েটার জোরদার ভূমিকা পালন করে। 'আহত একুশ', 'হৃদয়ে স্বাধীনতা' এবং 'পুতুল তারা' মঞ্চস্থ করেছে।

টংগীতে আরেকটি শিশু নাট্য সংগঠন শিশু-কিশোর নাট্য সম্প্রদায় ১৯৯৪ সালের ২৫শে মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। বেশ কয়েকটি শিশুনাট্য কর্মশালার মধ্য দিয়ে তারা শিশুনাটকে এগিয়ে আসে। সংগঠনের প্রথম প্রযোজনা 'স্বাধীনতার আহাজারী এবং' নাটকটি তারা নিয়মিত মঞ্চস্থ করেছে।

নারায়ণগঞ্জের গোদনাইল এলাকায় ১৯৯৪ সালের প্রথম দিকে গণজোয়ার নাট্যদল তাদের শিশুবিভাগ চালু করে। শিশুদের জন্য তারা নাট্যকর্মশালার আয়োজন করেছে। তাদের প্রযোজনাসমূহ 'সংহার' ও 'বকুলপুরের স্বাধীনতা'।

যশোরের নুতন উপ-শহর শিশু সংগঠন ১৯৮২ সালের ১১ই জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত। যশোরে নিয়মিত শিশুনাটক মঞ্চায়ন করে থাকে এ দল। এ যাবত ৫টি নাটক প্রযোজনা করেছে তারা। নাটকগুলো হচ্ছে 'গোলাপ গোলাপ', 'অরুণ বরুণ কিরণমালা', 'লালকমল নীলকমল', 'আজব রাজ্য' ও 'টাক ডুমা ডুম'। যশোরে শিশু একাডেমী আয়োজিত আনন্দ মেলায় ১৯৮৪-৮৫ সালে নাটক প্রতিযোগিতায় দুবার প্রথম স্থান এবং ঢাকায় শিশু একাডেমীতে নাটক মঞ্চায়ন করে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করে এ দল।

ঢাকার তরঙ্গ ললিতকলা কেন্দ্র ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃতির অন্যান্য শাখার মতো অভিনয় বিষয়ে তারা শিশুদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ঢাকার হাতে গোনা কয়েকটি শিশু সংগঠনের মধ্যে তরঙ্গ অন্যতম। শিশু থিয়েটারের শূন্যতা পুরণে তারা কাজ করে চলেছে। তরঙ্গ ৮টির বেশি নাটক প্রযোজনা করেছে। যার মধ্যে 'দুষ্ট বাঘের গল্প', 'পৃথিবী', 'এক যে ছিল টুই', 'টিয়ার কাহিনী', 'এটম এবং এইডস্', 'মিসিসিপি ও পদ্মা' অন্যতম। ১৯৯৪ সালে শিশু একাডেমী আয়োজিত অগ্রণী ব্যাংক শিশুনাট্য প্রতিযোগিতায় তরঙ্গ প্রযোজিত নাটক 'এক যে ছিল টুই' শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার পুরস্কারসহ শ্রেষ্ঠ নির্দেশনা ও আলোক নির্দেশনার পরিকল্পনার পুরস্কার লাভ করে।

এক সময় ঢাকাব সক্রিয় শিশুনাট্য সংগঠন লিটল চতুরঙ্গ আনন্দম সঙ্গীতাঙ্গনের অভিনয় বিভাগের সাথে যুক্ত হয়ে আনন্দম নাট্যম নামে শিশুনাট্যচর্চার কাজ করছে। লিটল চতুরঙ্গের পরিচালক ও মঞ্চনির্দেশক অজিত চট্টোপাধ্যায় এ বিভাগের দায়িত্বে আছেন।

১৯৯৪ সালের ১৫ই জানুয়ারি 'ঘরে বাইরে' নাট্যগোষ্ঠীর জন্ম। বড়োদের নাটকের পাশাপাশি যাত্রালগ্নেই শিশুনাটক মঞ্চায়নে এগিয়ে আসে। সুকুমার রায়ের 'হ য ব র ল' এদের প্রথম প্রযোজনা। ৭ই মে ১৯৯৪ প্রথম মঞ্চায়ন। এখন নিয়মিত মঞ্চস্থ হয়ে আসছে।

ঢাকার আরেকটি শিশুনাট্য সংগঠন কিশোর থিয়েটার ১৯৯৪ সালের ৫ই মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ সালে অগ্রণী ব্যাংক শিশুনাট্য প্রতিযোগিতায় কিশোর থিয়েটার প্রযোজিত নাটক 'আলোটা জ্বালো' দ্বিতীয় স্থান লাভ করে।

চট্টগ্রামে অবহেলিত ও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত শিশুদেরকে নিয়ে কোডেক ও বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ থিয়েটার আর্টস একটি নাট্য কার্যক্রম চালু করেছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত জেলে সম্প্রদায়ের শিশুদের নিয়ে যৌথ শিক্ষামূলক নাট্য প্রযোজনার অংশগ্রহণই তাদের সাম্প্রতিক কার্যক্রম।

ঢাকার বাইরেই শিশুনাট্যচর্চা সম্পর্কে তেমন কোনো সুসংবদ্ধ ইতিহাস প্রণয়ন সম্ভব হয়নি। তবে আমরা আশা করি এই রিপোর্ট পেশের পরে আমরা আরো অনেক কিছু যুক্ত কবতে পারব ঢাকা ও ঢাকার বাইরের নাট্যচর্চা সম্পর্কে। কিছু কিছু তথ্য আমাদের কাছে রয়েছে। যেমন যশোর শহরে একটি শিশুনাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯৩ সনে। যশোর সহ বিভিন্ন জেলা শহরে নাট্য প্রতিযোগিতার বিচ্ছিন্ন কিছু প্রয়াস লক্ষ করা যায়। মোটামুটি ভাবে নিয়মিত শিশুনাট্যচর্চা এবং নাট্যদলগুলোর সক্রিয়তা রয়েছে চট্টগ্রাম, ফেণী, যশোর, রঙপুর, মুন্সিগঞ্জ, টাঙ্গাইল প্রভৃতি শহরে। এছাড়া এক সময় বরিশাল, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা ও সিলেটে অনিয়মিতভাবে শিশুনাট্যচর্চার কথা জানা যায়।

শিশুনাট্যচর্চার ওপর এই রিপোর্টের শেষ পর্যায়ে আমি শিশুনাটকের পাণ্ডুলিপি সম্পর্কেও কিছুটা আলোকপাত করতে চাই। কেননা প্রথমত প্রচুর নাটক এবং দ্বিতীয়ত সহজ সুন্দর নাটকের পাণ্ডুলিপির ওপর শিশুনাট্যচর্চা অনেক বেশি নির্ভরশীল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিশুদের প্রতি যে অবহেলা শিশুদের নাটকের ক্ষেত্রেও তা খুবই মারাত্মক। শিশুদের নাটক এবং মঞ্চায়ন উপযোগী নাটক লেখা হয়েছে খুবই কম।

সাতচল্লিশের পর ছোটোদের জন্য নাটক লিখেছেন বন্দে আলী মিঞা, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ, আজিজুর রহমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শওকত ওসমান, আব্দুল জব্বার খাঁ, কবি হবিবুর রহমান, জোবেদা খানম, মুহম্মদ ফেরদাউস খান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, মুনীর চৌধুরী, শফিকুল হোসেন, খগেন মিত্র, আনসার আলী, কল্যাণ মিত্র, জহুরুল হক, আবু সাঈদ, ফিরোজ আল মুজাহিদী, রাজিয়া মাহবুব, প্রসাদ বিশ্বাস, মমতাজউদ্দিন আহমেদ, আবদুল মালেক খান, নুরুল মোমেন, রশীদ হায়দার, ফরিদা হোসেন, মোহাম্মদ মোদাব্বের, আখতার হোসেন, জহুরুল ইসলাম, ফজল এ খোদা, জুবাইদা গুলশান আরা।

শিশু-কিশোরদের জন্য সবচেয়ে বেশি নাটক লিখেছেন ইব্রাহিম খাঁ এবং বন্দে আলী মিঞা। ইব্রাহিম খাঁর নাটকগুলোর মধ্যে 'জঙ্গী বেগম', 'দীক্ষা', 'হাতে কলমে', 'জওয়াব', 'বেগম বেগমে', 'আল্লাহর ওয়াদা', 'সফল তীর্থ', 'মুয়াবিয়া ও দারোমা', 'কাশিম ও সাকিনা', 'মহাসমুদ্রের অন্বেষণে' 'রাবেয়ার দরবার', 'শহীদ জননী', 'জাহানারায় ও জেবুন্নেসা'। বন্দে আলী মিঞার নাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে—'বনের ফুল', 'শারদ পরী', 'ফুল ফাল্গুন', 'রাবেয়া বসরী', 'টোটো কোম্পানীর ম্যানেজার', 'অতিবৃদ্ধি খেকশিয়াল', 'দাওয়াত', 'বিচার অহেতুক', 'চিৎপটাং', 'শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা', 'বন্ধুর পিঠাভাগ', 'হারজিত' ইত্যাদি।

বলতেই হয় যে, এ নাটকগুলোর বেশির ভাগই রচিত হয়েছে অলৌকিক ধর্মীয় গোঁড়ামির উপর বিশ্বাস রেখে এবং বাস্তব বিবর্জিত কল্পকাহিনি নিয়ে। সর্বোপরি নাটকগুলো মঞ্চায়ন উপযোগী উপাদান সমৃদ্ধ নয়। তবে প্রখ্যাত কিছু কথা-সাহিত্যিকের লেখা গুটিকতক শিশুনাটক রয়েছে, যেগুলো এ ধারা থেকে ব্যতিক্রমী। যেমন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'সুড়ঙ্গ' নাটকখানি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া শহিদ মুনীর চৌধুরীর 'কুপোকাত', শফিকুল হোসেনের 'বেদের ছেলে' ও খগেন মিত্রের 'বাংলার বাঘ' নাটক দুটি রচনাশৈলীর দিক থেকে উন্নতমানের।

মরহুম কবি হাবিবুর রহমানের লেখা 'মায়াকানন','আলোর ফুল' ও 'লেজ দিয়ে যায় চেনা' খুবই উন্নতমানের নাটক। কিন্তু নাটক তিনটি আজও কেউ প্রকাশ করেননি। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত আল কামাল আবদুল ওহাবের 'ছোটদের অভিনয়', আব্দুন নূরের 'হুতোম প্যাঁচার দেশে', মুক্তধারা থেকে প্রকাশিত ফরিদা হোসেনের 'তুষারকন্যা', 'লুকোচুরি' জহিরুল ইসলামের 'চাঁদের দেশে', ফজল-এ-খোদার 'মিতাভাইয়ের আসর', শিশু একাডেমী থেকে প্রকাশিত রাজিয়া মাহবুবের 'ভূত ভুতুম', জোবেদা খানমের 'মহাসমুদ্র' আখতার হোসেনের 'খেলাঘরের পুতুলগুলো', মোহাম্মদ মোদাব্বেরের 'যাত্রা হলো শুরু', নিয়ামত হোসেনের 'প্রত্নতত্ত্ব ও ফাংশন', আবদুল মালেক খানের 'বসন্ত চির বসন্ত', 'জুবাইদা গুলশান' 'আবার নিঝুম দ্বীপের গল্পকথা', নূরুল মোমেনের 'ভাই ভাই সবাই', বেগম মমতাজ হোসেনের 'রঙধনুর রঙ', মমতাজউদ্দিন আহমেদের 'বকুলপুরের স্বাধীনতা', রশীদ হায়দারের 'গোলাপ গোলাপ', মোহাম্মদ ফেরদউস খানের 'চোখ থাকিতে অন্ধ', 'কচি কল্লোল', শওকত ওসমানের তিনটি ছোট্ট নাটক, নাজমা জেসমিন চৌধুরীর 'ওরা ছিল বাগানে', হাসি সিদ্দিকীর 'ফন্দিবাজ বাঘ' উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত নাটক। আমাদের দেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের মধ্যে কেউ কেউ একটি দুটি শিশুনাটক রচনা করেছেন। যেমন, সিকান্দার আবু জাফর। তাঁর লেখা নাটক 'ফলাফল', সৈয়দ শামসুল হকের 'ভয় করলেই ভয়' অন্যতম। কবি আসাদ চৌধুরী ছোটোদের অতিপ্রিয় কথাশিল্পী এন্ডারসনের গল্প নিয়ে লিখেছেন 'রাজার নতুন জামা', হাসি সিদ্দিকীর আরেকটি নাটক 'শীর্ষের রেফ', লুৎফর রহমান রিটনের 'এক যে ছিল টুই', সৈয়দ মহিদুর রহমানের 'ইচ্ছে রাজার কিচ্ছে', রশীদ হায়দারের 'উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত' ইত্যাদি অন্যতম। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তাসের দেশ', নাজমা জেসমিন চৌধুরীর নাট্যরূপায়ণে বাংলাদেশে সর্বাধিক মঞ্চায়িত শিশুনাটক।

তেমনি কবিগুরুর 'ডাকঘর' বহুল মঞ্চায়িত। সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'অভিযান'ও জনপ্রিয় নাটকগুলোর একটি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা 'জুতা আবিষ্কার'-কে নাটকে রূপান্তর করেও যশোরে মঞ্চস্থ হচ্ছে। রূপান্তর করেছেন কঙ্কর গুপ্ত। এ ছাড়া মোরশেদুল ইসলামের 'আবার অরুণোদয়', শফিনজ আলীর 'হাতুড়ে ডাক্তার', আবদুল হাই দুর্বারের 'পুতুল', আবু নাসের ফেরদৌস-এর 'কাঠের ঘোড়া' উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রামের সৌরভ সাখাওয়াত-এর 'কুসুমপুরে ভূত', নূরুল ইসলামের 'সুন্দর পৃথিবীর জন্য', কঙ্কর গুপ্তের 'লালকমল নীলকমল' উল্লেখযোগ্য—যেগুলো এই উৎসবেই মঞ্চস্থ হয়েছে।

এ সব নাটকের মধ্যে সবগুলো যে সমানভাবে মঞ্চে সফল নয় এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এখনও পর্যন্ত পূর্বকালের সুকুমার রায় সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিশুনাট্যকার। তবে প্রয়াত ডঃ নাজমা জেসমিন চৌধুরী আমাদের শিশুদের জন্য বেশ কিছু মঞ্চসফল শিশুনাটক রচনা করেছেন, যেগুলো খুবই সফলতার সাথে মঞ্চস্থ হয়ে আসছে।

কিন্তু আমরা চাই আরো নাটক। আরো বেশি শিশুনাট্যদল যাতে সেগুলো মঞ্চস্থ করতে পারে।

এ রিপোর্ট প্রণয়নে জনাব মুস্তাফা মজিদ, মোরশেদুল ইসলাম, মাযহারুল ইসলাম বাবলা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, এবং লোকনাট্যদলের কর্মীদের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। আমি সকলের নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

বাংলাদেশের প্রথম নাট্যপত্র থিয়েটার : নির্বাচিত সম্পাদকীয়

রামেন্দু মজুমদার

এক

নাট্যকর্মী ও নাট্যামোদীদের শুভ কামনা নিয়ে বাংলাদেশের প্রথমে নাটকের পত্রিকা থিয়েটার আত্মপ্রকাশ করল। এ ধরনের পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আমরা অনেকদিন ধরেই অনুভব করছিলাম। এখন আমরা আশা করি আমাদের নাট্যকর্মীদের সাম্প্রতিক ভাবনা চিন্তা থিয়েটার পত্রিকার মাধ্যমে সাধারণ্যে উপস্থিত করা সম্ভব হবে। প্রথম সংখ্যা প্রকাশের এ শুভলগ্নে আমাদের আকাঙ্ক্ষা— বাংলাদেশে আরো নাটকের পত্রিকা প্রকাশিত হোক।

মুনীর চৌধুরী আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতিতে একটি অবিস্মরণীয় প্রতিভা। আমাদের দেশে আধুনিক নাটকের তিনিই জনক। 'রাজার জন্মদিনে' নাটিকায় মুনীর চৌধুরীর যে নাট্য প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছিল, তা সার্থকতার সোপান বেয়ে বিকাশের এক পরিণত স্তরে পৌঁছেছিল 'ওথেলো'তে। তাঁর এই উত্তরণ সাথে সাথে আমাদের নাট্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করেছে। কিন্তু আমাদের চরম দুর্ভাগ্য, যখন তাঁর রচনার শ্রেষ্ঠ ফসল আমরা লাভ করতে পারতাম, ঠিক তার পূর্ব মুহূর্তে বাংলাদেশের স্বাধীনতার শত্রুরা তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। অনেক ক্ষতিই হয়তো আমাদের পূরণ হবে, কিন্তু এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়—বাংলাদেশে মুনীর চৌধুরী আর জন্মাবেন না। অদ্যাবধি আমাদের সাহিত্যে মুনীর চৌধুরী সর্বাপেক্ষা প্রতিভাবান নাট্যকার। সংগত কারণেই থিয়েটার পত্রিকার প্রথম সংখ্যা মুনীর চৌধুরী স্মারক সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হল। তাছাড়া এ পত্রিকার উদ্যোক্তাদের এটি একটি নৈতিক দায়িত্বও। কারণ তাদের অভিনয় জীবনের প্রায় সবটা শিক্ষাই মুনীর চৌধুরীর।

এ বছরের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ ও ভারতে সমারোহে বাংলা সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে থিয়েটার পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হবে শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা হিসাবে আগামী ১৫ ডিসেম্বর।

[নভেম্বর ১৯৭২]

দুই

বাংলাদেশে পত্রিকা প্রকাশনা ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। ক্রমবর্ধমান প্রকাশনা ব্যয় ও বিজ্ঞাপনের স্বল্পতা এর প্রধান কারণ। যাঁরা প্রকাশনার সঙ্গে সরাসরি জড়িত নন, তাঁদের অবগতির জন্যে এর একটা বাস্তব উদাহরণ দিতে চাই। বর্তমান সংখ্যা থিয়েটারের প্রকাশনা ব্যয় মোটামুটি নিম্নরূপ :

ভেতরের কাগজ	-	টাঃ ১১৯০.০০
মলাটের কাগজ	-	৩২০.০০
ছাপা খরচ	-	২২০০.০০
কভার ছাপা	-	১৫০.০০
বাঁধাই	-	১৯২.০০
প্রুফ দেখা	-	২০০.০০
যাতায়াত, ব্লক ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ	-	৩৫০.০০
	মোট	৪৬০২.০০

আমরা মোট ১২২৫ কপি ছাপি। সৌজন্য সংখ্যা ইত্যাদি বাদ দিয়ে এক হাজার কপি বিক্রির জন্যে বাজারে ছাড়ি। সব কপি বিক্রির পর পুস্তক বিক্রেতার কমিশন বাদ দিয়ে আমাদের হাতে আসবে দেড় হাজার টাকা (যদিও পুরো টাকা কোনো সময়েই বিক্রেতাদের কাছ থেকে তোলা যায় না)। অথচ আমাদের প্রকাশনা ব্যয় চার হাজার ছশো টাকা। উল্লেখযোগ্য, আমরা সাধারণত যে কাগজ ব্যবহার করি তাতে এ ব্যয় আরো ৫২০.০০ টাকা বেড়ে যায়। এখন এই ঘাটতি সাড়ে তিন হাজার টাকা তুলতে হবে বিজ্ঞাপন থেকে। নিয়মিত এভাবে তিন হাজার টাকার ওপরে বিজ্ঞাপন যোগাড় করা কি রকম কষ্টসাধ্য কর্ম তা সহযোগী প্রকাশকরা জানেন। বাংলাদেশে এখনো শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকাকে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্যে বিজ্ঞাপন দেওয়ার মানসিকতা দুঃখজনকভাবে অনুপস্থিত। তবে একচেটিয়া বিজ্ঞাপনদাতাদের দোষ দিয়েও লাভ নেই। ১৪/১৫টি দৈনিক, অগনতি সাপ্তাহিক পত্রিকা আর অমুক সংগঠনের তমুক অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্মরণিকা ইত্যাদির চাপ তাদের নিত্যদিন সামলাতে হচ্ছে। দৈনিক বা সাপ্তাহিক কাউকে তাঁরা চটাতে চান না। কখন আবার কি সংবাদ ছেপে বসে! কিন্তু দুর্ভাগ্য (?) সাহিত্য বা সংস্কৃতি বিষয়ক সাময়িকীর হাতে এধরনের কোনো অস্ত্র নেই যা দেখিয়ে তারা বিজ্ঞাপন যোগাড় করতে পারে। তাই কণ্ঠস্বর বা থিয়েটার বা গণসাহিত্য পত্রিকার চেয়ে এক ফর্মা নিউজপ্রিন্টে ছাপানো কোনো স্মরণিকা বা অনুষ্ঠানসূচি সহজে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতে পারে। কারণ বিজ্ঞাপনদাতা একটু শান্তিতে বসবাস করতে চান। এসব সত্ত্বেও যে সব বিজ্ঞাপনদাতা সাহিত্য বা সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে আসছেন, তাঁরা সত্যি সত্যিই প্রশংসাভাজন।

বিদগ্ধ পাঠক হয়তো এবার থিয়েটারে ব্যবহৃত কাগজের নিম্নমান লক্ষ করে থাকবেন। আমরা যখন ছাপা আরম্ভ করি তখন বাজারে কার্টরিজ কাগজ ছিল না, হোয়ায়েট প্রিন্টের মধ্যে যা সবচেয়ে ভালো পেয়েছি তা-ই ব্যবহার করেছি বাধ্য হয়ে।

বর্তমান সংখ্যার সঙ্গে থিয়েটারের প্রথম বর্ষ অতিক্রান্ত হল। মোটামুটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমরা চারটি সংখ্যা প্রকাশ করতে পারায় গর্ববোধ করছি। তবে তা সম্ভব হত না যদি আমাদের পাঠকরা পত্রিকার প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন না করতেন এবং বিজ্ঞাপনদাতারা সহৃদয় না হতেন। দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণের আগে, আমরা পাঠকদের এ প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে থিয়েটারের মান আরো উন্নত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেওয়া হবে। নতুন নতুন নাটক, চিন্তাশীল নিবন্ধ ও বিভিন্ন ধরনেব নিয়মিত বিভাগে থিয়েটারকে আপনাদের মনোমত করে তোলা হবে।

[সেপ্টেম্বর ১৯৭৩]

তিন

ঢাকাতে নাটক করার জন্যে কোনো মঞ্চ নেই—এটা বোধ হয় এখানকার নাট্যকর্মীদের প্রাচীনতম ক্ষোভ। আমাদের দেশে শীতকালে সাধারণত সাংস্কৃতিক আসরগুলো জমজমাট হয়ে ওঠে। তাই এই মৌসুমেই মঞ্চের অভাব তীব্রতম মনে হয়। আজকাল একাধিক নাট্যসংস্থা নিয়মিত নাটক করার জন্যে বিশেষ উৎসাহী। এঁদের মধ্যে নাগরিক প্রতি রবিবার তাঁদের নাটক মঞ্চস্থ করছেন মহিলা সমিতির মিলনায়তনে। ঢাকা থিয়েটার আসর বসিয়েছেন পল্টনের ডি ডি এস এ মঞ্চে। সবাই যেহেতু রবিবার সকালে নাটক করতে চান, তাই অন্যান্যের জন্যে অবশিষ্ট থাকে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিট্যুট বা ব্রিটিশ কাউন্সিল। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার্সের ভাড়ার বিরাট অঙ্ক এবং সভা-সমিতির ভিড়ের জন্যে সেখানে রবিবার রবিবার নাটক করা সম্ভব নয়। ব্রিটিশ কাউন্সিলও কোনো গোষ্ঠীকে দর্শনীর বিনিময়ে নিয়মিত নাটক করতে দিতে রাজি নন। স্বাভাবিকভাবেই নাট্যকর্মীদের উদ্যম অনেকটা স্তিমিত হয়ে আসে।

কিন্তু হতাশা আমাদের গ্রাস করলে চলবে না। ঢাকা থিয়েটারকে আমরা অভিনন্দন জানাই—তাঁরা একটি অব্যবহৃত মঞ্চকে নাটকের কাজে লাগাচ্ছেন। নাটক করার মতো যে-কোনো পরিসর যদি

আমরা খুঁজে বার করে প্রচুর নাটক করতে পারি তবে নাটমঞ্চ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সংশ্লিষ্ট সব মহল আরো গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারবেন। তবে আমাদের আশু কর্তব্য—নাটমঞ্চের দাবিতে সম্মিলিত কর্মসূচি নেওয়া। যাঁরা নিয়মিত নাটক করেন বা করার জন্যে উদ্‌গ্রীব তাদের এ ব্যাপারে অগ্রণী হওয়ার জন্যে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।

ডিসেম্বর মাস অতিক্রান্ত হল। ডিসেম্বরের স্মৃতি আমাদের জন্যে একাধারে আনন্দের এবং বেদনার। ইতিহাসের বর্বরতম অত্যাচার থেকে এই ডিসেম্বরে আমরা নিস্কৃতি পেয়েছিলাম। আবার এ মাসেই আমরা হারিয়েছিলাম আমাদের অনেক আপনজন, আমাদের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির অনেক প্রতিভাধর। বাংলার সব শহিদের স্মৃতির প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা জনাই। সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি থিয়েটার গোষ্ঠীর নাট্যগুরু মুনীর চৌধুরীকে।

বর্তমান সংখ্যায় আমরা মুনীর চৌধুরীর অমর সৃষ্টি 'কবর' পুনরায় মুদ্রণ করলাম। নাট্যকারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ছাড়াও এ পুনর্মুদ্রণের আরেকটি কারণ রয়েছে। আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে অনেক সংস্থাই 'কবর' অভিনয় করার পরিকল্পনা করছেন। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে বইটি ছাপা নেই। অনেকে এ ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। উৎসাহী নাট্যকর্মীদের সুবিধার জন্য আমরা নাটকটি এ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণ করেছি।

থিয়েটারের আগামী সংখ্যা বিশেষ একাঙ্ক সংখ্যা। বাংলাদেশের খ্যাতিমান নাট্যকারদের একাঙ্কিকায় সমৃদ্ধ হয়ে এ সংখাটি প্রকাশিত হবে ২১শে ফেব্রুয়ারি।

[জানুয়ারি ১৯৭৪]

চার

যে আশঙ্কা এতদিন আমরা উৎসাহ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলাম, আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি, আর বুঝি আমরা তা পারলাম না। থিয়েটার পত্রিকা চরম সংকটের সম্মুখীন। অবশ্যি দেশে যে মুহূর্তে একটা বিবাট সংকটময় পরিস্থিতি বিরাজ করছে তখন আমাদের ক্ষুদ্র সংকটের কথা তুলে ধরা বোধ হয় সময়োচিত হবে না। তবু বাংলাদেশের এই একমাত্র নাটকের পত্রিকাটির অপমৃত্যু ঘটুক এটা অনেকেই কামনা করেন না এ ভেবেই আমাদের প্রকৃত অবস্থা পাঠকদের কাছে অকপটে প্রকাশ করতে চাই। গত এক সংখ্যায় আমরা আমাদের প্রকাশনার ব্যয়ের একটা হিসেব দিয়েছিলাম। তখন প্রতি কপি থিয়েটারের প্রকাশনা ব্যয় হত সাড়ে চার টাকার মতো। বর্তমানে কাগজ ও মুদ্রণ সংকট তীব্রতর হওয়ায় সাধারণ সংখ্যা থিয়েটারের প্রকাশনা ব্যয় দাঁড়িয়েছে প্রতি কপি সাড়ে সাত টাকায়। ন্যায্য মূল্যে কাগজ পেলে এ ব্যয় কমে ছয় টাকা পর্যন্ত নামবে। অথচ আমরা প্রতি কপি বিক্রি করি তিন টাকা। তারপরও পরিবেশককে ৪০% কমিশন দিতে হয়। ফলে বিজ্ঞাপনই একমাত্র নির্ভর। কিন্তু বিজ্ঞাপনের দ্বার একের পর এক বন্ধ হয়ে আসছে। জিনিস যখন বাজারে ছাড়লেই বেশি দামে বিক্রি হয়ে যায় তখন বিজ্ঞাপনে কে পয়সা খরচ করবে? পৃষ্ঠপোষকতামূলক বিজ্ঞাপন দেবার মতো প্রায় সব প্রতিষ্ঠানই সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন। তবু যে অল্প কয়েকটা প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন দেন তাঁদের উপর চাপ পড়ে অস্বাভাবিক। বর্তমানে একমাত্র ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা অনুনয় বিনয়ের ফলেই বিজ্ঞাপন যোগাড় করা সম্ভব।

এ অবস্থার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে গত দুবছরে আমরা হাজার পাঁচেক টাকা ঋণগ্রস্ত হয়েছি। অবস্থা দিন দিন যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে ক্রমশ আমাদের ঋণের বোঝা আরো বাড়বে। তাই ভবিষ্যতে কী করে থিয়েটারের প্রকাশনা অব্যাহত রাখব সে ভাবনায় আমরা অত্যন্ত বিচলিত। তবে বেশ কয়েকজন সজ্জন ব্যক্তি আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন, এতে আমরা কিছুটা সাহস

পেয়েছি। আমাদের ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করার ভার আমাদের পাঠকদের উপর রাখছি। তাঁদের উপদেশ পেলে আমরা অনুগৃহীত হব।

ঢাকার নাট্যাঙ্গনের একজন একনিষ্ঠ সেবক নীরবে মঞ্চ থেকে অন্তর্হিত হলেন। বিশিষ্ট মঞ্চসজ্জাকর বিশু মুখার্জি কিছুদিন আগে পরলোকগমন করেছেন। সকলের প্রিয় বিশুদার মৃত্যুর সাথে সাথে অবসান হল একটি যুগের, একটি প্রতিষ্ঠানের। আশ্চর্য, একটি পত্রিকা ছাড়া আর কোথাও তাঁর মৃত্যু সংবাদটি পর্যন্ত প্রকাশিত হল না। আমরা এ নাট্যকর্মীর আত্মার সদ্‌গতি কামনা করি।

অবশেষে বহু প্রত্যাশিত শিল্পকলা একাডেমীর কাজ শুরু হচ্ছে। ডঃ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম একাডেমীর মহাপরিচালক নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর মতো একজন যোগ্যব্যক্তির নিয়োগকে আমরা আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। বাংলাদেশের শিল্পী সাহিত্যিক সংস্কৃতিবান মানুষের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত এ একাডেমী আমাদের শিল্পকলার বিকাশে সত্যিকারভাবে সহায়ক হয়ে উঠুক, আমরা তা কামনা করি। সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি, একাডেমীতে বড়ো বড়ো পদের লালসায় কিছু সংখ্যক সংস্কৃতি ব্যবসায়ী বেশ তৎপর হয়ে উঠেছে। আমরা আশা করব অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে কর্তৃপক্ষ একাডেমীকে এখনই একটি মাথাভারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত না করে ধীরে ধীরে সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে অগ্রসর হবেন। কিছু লোকের কর্মসংস্থান একাডেমী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নয়। জাতীয় সংস্কৃতির লালনের জন্যে একাডেমী।

[আগস্ট ১৯৭৪]

পাঁচ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নাটক অন্যান্য শিল্পকলার সাথে তাল না রেখে নিজের উদ্যমে একটু বেশি দ্রুত এগুতে শুরু করেছিল। তাই সম্ভবত তার রাশ টেনে ধরা হয়েছে। সংস্কৃতি সচেতন ব্যক্তিমাত্রই জানেন, গত দুমাস ঢাকাতে কোনো নিয়মিত নাটক হচ্ছে না। অথচ মৌসুম ছিল নাটকের মৌসুম। নাট্যগোষ্ঠীগুলোর অনেক পরিকল্পনা ছিল এ মৌসুমকে ঘিরে। কিন্তু তা কল্পনাই থেকে গেল।

ব্রিটিশ রাজ আমাদের দেশে একটি নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিধি চালু করেছিলেন। ঘোষিত উদ্দেশ্য অতি মহৎ—জনগণের স্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে এমন নাটকের অভিনয় নিয়ন্ত্রিত করা। অঘোষিত লক্ষ্য ছিল—ইংরেজ বিরোধী কোনো মনোভাব নাটকের মাধ্যমে যাতে জনসাধারণ্যে সংক্রামিত হতে না পারে তার পাকা বন্দোবস্ত করা। উত্তরাধিকার সূত্রে ভারতে ও তদানীন্তন পাকিস্তানে আমরা সে আইন প্রাপ্ত হয়েছিলাম। ভারতে নাট্যকর্মীদের চাপে ও সরকারের যুক্তিযুক্ত মনোভাবে ফলে এ আইনটি বাতিল হয়ে গেছে ষাট-এর দশকে।

এ আইন অনুযায়ী কোনো নাটক অভিনয় করতে বলে প্রশাসন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নাটকের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে আপত্তিকর কিছু না থাকলে এবং পরিবেশ নাটক মঞ্চায়নের অনুকূলে থাকলে নাট্যাভিনয়ে অনুমতি দিয়ে থাকেন। ঢাকার বাইরে নাট্যাভিনয় মোটামুটি এ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। কিন্তু ঢাকাতে, বিশেষ করে স্বাধীনতার পর নাট্যকর্মীরা এ আইনটির অস্তিত্ব সম্পর্কেই বিস্মৃত হয়েছিলেন। কারণ ইংরেজ যে উদ্দেশ্যে এই আইন প্রণয়ন করেছিল, পাকিস্তানি আমলে তা বজায় থাকলেও স্বাধীন বাংলাদেশে এর কোনো তাৎপর্য থাকতে পারে না। কোনো নাটক দেশের ও সমাজের প্রচলিত আইন কানুনের চোখে যদি আপত্তিকর সাব্যস্ত হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। তার জন্যে সব নাটকের ক্ষেত্রেই পূর্ব অনুমতির কী আবশ্যকতা? গল্প উপন্যাস লিখতে বা গান গাইতে কিংবা ছবি আঁকতে যদি পূর্ব অনুমতি প্রয়োজন না হয় তবে কেবল নাটক করতেই কেন তা লাগবে?

আমাদের ধারণা বিষয়টি সঠিকভাবে সরকারের সামনে তুলে ধরা হয়নি। এ আইন যে নাট্যচর্চার পথে কত বড়ো প্রতিবন্ধক তা যদি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করানো যায়, তবে অবিলম্বে সরকার এ আইনটি বাতিল করবেন বলে আমরা বিশ্বাস রাখি। নাট্যাভিনয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার দ্বিতীয় কারণ প্রমোদকর সম্পর্কিত বিধি। গোষ্ঠী নাটককে যদি প্রমোদকর থেকে অব্যাহতি না দেওয়া যায়, তবে নিয়মিত নাট্যচর্চা রীতিমতো অসম্ভব। এটি সবদেশেই পরীক্ষিত সত্য। আমরা আশা করব, সরকার এ দুটি প্রতিবন্ধকতা অনতিবিলম্বে দূর করে নাট্যচর্চা পুনরায় সচল করার সুযোগ দেবেন।

বর্তমান সংখ্যা প্রকাশে মাত্রাতিরিক্ত দেরি হল। এর আগে বের করা আমাদের অসাধ্য ছিল। এবারের পৃষ্ঠা সংখ্যাও কম। বর্দ্ধিত কলেবরে বিশেষ সংখ্যা বের হবে মার্চে। সহৃদয় পাঠক আমাদের অনিয়ম মার্জনা করবেন, আশা করি।

[ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫]

ছয়

সরকার চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতার জন্যে জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তন করেছেন। সৃজনশীলতাকে উৎসাহ দেওয়াই এ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির মূল উদ্দেশ্য। প্রত্যেক সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিই সরকারের এই পদক্ষেপে আনন্দিত হয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে সংস্কৃতির অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের প্রতি আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ কথা বোধ হয় আজ অনেকেই নির্দ্বিধায় স্বীকার করবেন যে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর নাটকেই সবচেয়ে বেশি তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়েছে। যে নাটক আগে ছিল নিছক অনুষ্ঠানমাত্র আজ সে নাটক আমাদের শিল্পের একটি শক্তিশালী প্রকাশ মাধ্যম। এখানে এখন নিয়মিত নাটক অভিনীত হচ্ছে টিকেটের বিনিময়ে। নতুন দর্শক তৈরি হচ্ছে। রুচিশীল দর্শকের জন্যে আমাদের এখানে নাটক এক বিরাট স্বস্তি।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় দর্শকের সহানুভূতি ছাড়া নাট্যগোষ্ঠীগুলোর ভাগ্যে আর কোনো পৃষ্ঠপোষকতা জোটে না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যদি এ নাট্যচর্চার স্বীকৃতি দেওয়া যায় তবে আমাদের নাট্যকর্মীরা প্রভূত উৎসাহিত হবেন। একটা কথা এখানে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। চলচ্চিত্র বা টেলিভিশনে শিল্পী ও কলাকুশলীরা তাঁদের কাজের জন্যে (স্বল্প হলেও) পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। কিন্তু নাটক এমন এক ক্ষেত্র যেখানে শিল্পী বা অন্যকোনো নাট্যকর্মী দিনের পর দিন কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই তাঁদের কাজ করে চলেছেন। আমরা অবশ্য এখানে ব্যবসায়ী থিয়েটারের কথা বলছি না। সবাই জানেন মিলনায়তন পূর্ণ হলেও কেবল গোষ্ঠীগুলোর প্রযোজনা খরচ উঠে আসে। আমাদের নাট্যকর্মীরা যে নিষ্ঠার সাথে ব্যক্তিগত ক্ষতিস্বীকার করে নাট্যচর্চা করে যাচ্ছেন—তা নিঃসন্দেহে দৃষ্টান্তমূলক। তাছাড়া চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের মতো মঞ্চনাটকও আমাদের দেশে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে জাতীয় ভিত্তিতে স্বীকৃতির কথা উঠতে পারে।

তাই আমাদের আন্তরিক কামনা, নাটকের ক্ষেত্রে অবিলম্বে জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তন করা হোক।

সাম্প্রতিককালে নাট্যক্ষেত্রে সবচেয়ে সাড়া জাগানো ঘটনা—নাট্যোৎসব। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত পক্ষকালব্যাপী এ নাট্যোৎসবে ঢাকার ১৫টি ও চট্টগ্রামের ১টি নাট্যদল বিভিন্ন দিনে ১৬টি নাটক প্রদর্শন করে। শিল্পকলা একাডেমী এ নাট্যোৎসবের আয়োজন করে নাট্যকর্মীদের প্রশংসাভাজন হয়েছে। কিন্তু নাট্যকর্মীরা শিল্পকলা একাডেমীর কাছে তাঁদের ন্যূনতম প্রত্যাশার কথা বিস্মৃত হতে পারছেন না। নাট্যকর্মীদের দাবি একটি রঙ্গালয় যেখানে নিয়মিত নাটক করা যাবে। যদিও এ মুহূর্তে একাধিক রঙ্গালয় রাজধানীর জন্যে অপরিহার্য, তবু আমরা ন্যূনতম প্রয়োজনের কথাই বলছি।

আমরা যতদূর জানি অদূর ভবিষ্যতে নাট্যকর্মীদের এ দাবি পূরণের কোনো পরিকল্পনা শিল্পকলা একাডেমীর নেই। একাডেমী ভাবছেন এমন 'অডিটরিয়াম'-এর কথা যেখানে দেড় হাজার দুহাজার দর্শক বসতে পারবেন, যেখানে নাটকসহ অন্যান্য প্রদর্শনী হতে পারবে এবং সবচেয়ে হতাশার কথা, সে পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি এবং লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষ।

সুতরাং নাট্যগোষ্ঠীরা এখন যেখানে আছে সেখানেই আরো বেশ কিছুকাল তাদের থাকতে হবে। মঞ্চের অভাব মেটার কোনো লক্ষণ আমরা কোনোদিক থেকে দেখতে পারছি না। শিল্পকলা একাডেমীর কাছে আমাদের প্রস্তাব, পাঁচ / ছয় শত দর্শক বসার উপযোগী করে একটি আটপৌরে রঙ্গালয় অবিলম্বে নির্মাণ করুন যাতে আমাদের গোষ্ঠীগুলোর একটা ঠাঁই হয়। তা না হলে নাট্যোৎসব জাতীয় সব তৎপরতা অর্থহীন আনুষ্ঠিকতায় পরিণত হবে।

[মার্চ ১৯৭৬]

সাত

১৯৭৫ সালে প্রেসিডেন্টের ঘোষণাবলে নাটকের পাণ্ডুলিপি সেন্সর পদ্ধতি সহজীকরণের যে ব্যবস্থা প্রবির্তিত হয়েছিল, তা এখনো বাংলাদেশের সব জায়গায় কার্যকর হয়নি। এ বিষয়ে বর্তমান সংখ্যা থিয়েটারেই খুলনার একজন বিশিষ্ট নাট্যকর্মীব চিঠি ছাপা হয়েছে। খুলনার কথা দূরে থাক, খোদ ঢাকাতেই দ্বিবিধ পদ্ধতি চালু আছে। কেউ কেউ এখনো পুরনো নিয়মে পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি সেন্সর করিয়ে জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে অনুমোদন গ্রহণ করে। বাকিরা নতুন নিয়মে ছাড়পত্র গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় নাটক সেন্সর কমিটির কাছ থেকে। নাটক সেন্সর কমিটি গঠিত হয়েছে, বাদবাকি জায়গায় চলছে সেই সনাতন পদ্ধতি। আমরা তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়—যাঁদের তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় নাটক সেন্সর কমিটি গঠিত হয়েছে—তাঁদের কাছে আবেদন করছি ঢাকা এবং বাংলাদেশের সর্বত্র যেন সেন্সরের নতুন পদ্ধতি চালু হয় তার যথাযথ ব্যবস্থা করতে। তাতে নাট্যকর্মীদের দুদর্শার লাঘব হবে।

১৯৭৭ সালে জানুয়ারি মাস থেকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর উদ্যোগে ঢাকায় জাতীয় নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। দেশের সব জেলা থেকেই নাট্যদলগুলো এ উৎসবে অংশগ্রহণ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। আমরা প্রস্তাব করছি জাতীয় নাট্যোৎসব মাঝে মাঝে ঢাকার বাইরে অন্যান্য জেলায় যেন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাতে সে অঞ্চলের নাট্যাঙ্গনে একটা নতুন প্রাণপ্রবাহের সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয় প্রস্তাব, ঢাকার প্রতিষ্ঠিত নাট্যদলগুলোর বিভিন্ন জেলা সফরের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এবারের শীত মৌসুমেই ঢাকার ৪/৫টা দলকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো যেতে পারে। এতে করে ঢাকার নাট্যকর্মীদের সাথে বাইরের নাট্যকর্মীদের যোগাযোগ প্রত্যক্ষ হবে। স্থানীয় দলগুলোর জন্যে দর্শক সৃষ্টিতেও এ সফর বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

ঢাকার মঞ্চসমস্যা আরো প্রকট হয়েছে। সবেধন নীলমণি মহিলা সমিতি মঞ্চে ভাড়া ৩৭০ টাকা থেকে আরেক দফা বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করা হয়েছে। এখন এখানে নিয়মিত নাটক করতে গেলে খুব কম প্রদর্শনীতেই খরচের টাকা উঠে আসবে। এ সব ব্যবস্থা আমাদের বারবার মনে করিয়ে দেয় মঞ্চের অভাবের কথা। তাই আবারও আমরা বলি, শিল্পকলা একাডেমীর জাতীয় নাট্যোৎসব ও এ ধরনের সব প্রচেষ্টা নিছক আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হবে, যদি না তারা ৫০০/৬০০ দর্শক বসার উপযোগী একটি রঙ্গালয় নির্মাণ না করেন।

[সেপ্টেম্বর ১৯৭৬]

আট

মহিলা সমিতি মঞ্চনির্ভর ঢাকার নাট্যচর্চা ক্রমশ সীমিত হয়ে আসছে। সমিতির মঞ্চ ব্যবহারে দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে সবার ভাগেই বরাদ্দকৃত দিন কমে আসছে। যেসব দল আগে মাসে ৪ দিন অভিনয়ের সুযোগ পেত, তারা এখন পাচ্ছে ৩ দিন। ফলে তাদের কর্মতৎপরতা ক্রমশ কমে আসছে—অথচ বৃদ্ধি পাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। অনেক দল মাসে দুদিন অভিনয়েরও সুযোগ পাচ্ছে না। অভিনয়ই যদি করা না যায়, তবে দল টিকে থাকবে কী করে? এই যখন রাজধানীর নাট্যচর্চার অবস্থা, তখন মঞ্চ নির্মাণে সরকারি উদাসীনতা বিস্ময়কর। দেশে এত সব উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হচ্ছে, নানা প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, কিন্তু মঞ্চ আর হয় না। এ যেন সিদ্ধান্ত নেওয়া আছে যে, আর যাই হোক নাটকের মঞ্চ কোনোদিন হবে না। মঞ্চনির্মাণে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর ঔদাসীন্যের প্রতিবাদে ঢাকার প্রধান নাট্যদলগুলো গত নাট্যোৎসব বর্জন করেছিল। একাডেমী এখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ম্যাজিক আর সার্কাস নিয়ে। নাটক নিয়ে, মঞ্চ নিয়ে ভাববার সময় কোথায়?

সরকারের কাছে আমাদের প্রস্তাব, সক্রিয় নাট্যকর্মী ও নাট্যোৎসাহী দায়িত্বশীল নাগরিকদের সমন্বয়ে মঞ্চ নির্মাণের জন্যে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হোক। এই ট্রাস্টের হাতে মঞ্চ নির্মাণের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু অর্থ ও সরকারের খাস জমি দেওয়া হোক। তারপর এই ট্রাস্টই নিজেদের উদ্যোগে সরকারি বেসরকারি অর্থ সাহায্যে একটি মঞ্চ নির্মাণ করতে সক্ষম হবে।

বর্তমান সংখ্যা প্রকাশে আমাদের তিন মাস দেরি হয়ে গেল। ঠিক ছমাস আগে ছাপাখানায় কাজ শুরু হয়। কিন্তু শেষ আর হয় না। এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আমাদের আয়ত্ত বহির্ভূত। তারপর কাগজ আর ছাপার খরচ যে হারে বাড়ছে, তার সাথে আমরা পাল্লা দিয়ে পারছি না। একটি উদাহরণ দিলেই সহৃদয় পাঠক বুঝতে পারবেন। বর্তমান সংখ্যা থিয়েটারের ক্রোড়পত্র ৩২ পৃষ্ঠা বাদে প্রতিকপির জন্য খরচ দাঁড়াবে ১৬ টাকার ওপর। এজেন্সি কমিশন ও ডাক খরচ বাদ দিয়ে আমাদের হাতে আসবে ৫ টাকা। সুতরাং বাকি বিরাট অঙ্কের ঘাটতি আমরা মেটাব কী করে? বিজ্ঞাপনে আর কত টাকা আসবে? থিয়েটার নাট্যগোষ্ঠীর দেওয়া ভর্তুকিই আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

কিছুদিন আগে ঢাকার বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকের জনৈক প্রতিবেদক থিয়েটারের চলতি নাটক 'সেনাপতির' বিরুদ্ধে নকলের অভিযোগ আনেন। তিনি উৎপল দত্তের 'এবার রাজার পালা'র সাথে 'সেনাপতি'র নানা সাদৃশ্য আবিষ্কার করেন। আমাদের প্রতিবাদ তাকে আরো সোচ্চার করে তোলে। তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম অযথা শক্তিক্ষয় না করে থিয়েটারে আমরা দুটো নাটকই পাশাপাশি ছেপে দেব। তাই বর্তমান সংখ্যায় 'সেনাপতি'র সাথে উৎপল দত্তের নাটকটি ছাপা হল। আমরা কোনো মন্তব্য প্রকাশে বিরত থাকলাম। সহৃদয় পাঠকরাই এবার বিবেচনা করে দেখুন।

বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তীর নায়ক শক্তিমান অভিনেতা উত্তমকুমারের স্মৃতির প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

[জুলাই ১৯৮০]

নয়

গ্রুপ থিয়েটারের আদর্শে বিশ্বাসী বাংলাদেশের বিভিন্ন নাট্যদল একজোট হয়ে 'বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন' গঠন করেছেন। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োচিত পদক্ষেপ বলে আমরা বিবেচনা করি। নাট্য সংগঠনগুলির সামনে যে সব বাধা-বিপত্তি আসে যেসব সমস্যার সম্মুখীন তাদের হতে হয় প্রতিনিয়ত, তার মোকাবিলার জন্যে চাই সম্মিলিত প্রয়াস। এ ধরনের একটি ফেডারেশন অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। নাট্যদলগুলি যদি ফেডারেশনের ক্ষুদ্রস্বার্থের ঊর্ধ্বে রাখতে পারেন, তবেই ফেডারেশন দীর্ঘজীবী হবে। সদস্য দলগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ বা স্বার্থ

সংঘাতে ফেডারেশনকে জড়িত না করে নাট্যচর্চার পথে যেসব মৌলিক সমস্যা আছে তার সমাধানে কাজ করতে পারলেই এই জোট বাঁধা অর্থবহ হবে। বাংলাদেশের নব নাট্যচর্চার নাট্যকর্মীরা যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন ফেডারেশন গড়ে তুলতেও তাঁরা একই আন্তরিকতার স্বাক্ষর রাখবেন বলে আমরা আশাবাদী। আর ফেডারেশনের কর্মকর্তারাও নাট্যকর্মীদের প্রত্যাশা পূরণে সচেষ্ট হবেন বলে আমরা ভরসা রাখি। ফেডারেশন গঠনে ঢাকার বাইরের নাট্যদলগুলো যে ঐকান্তিক আগ্রহ ও নিঃস্বার্থ ভূমিকা পালন করেছেন, তা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন দীর্ঘজীবী হোক।

রাজশাহী সাংস্কৃতিক সংঘ সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগে ৯ই নভেম্বর থেকে ৫ই ডিসেম্বর ১৯৮০ আন্তঃজেলা নাট্যোৎসব '৮০-র আয়োজন করেছিলেন। ২৪টি নাট্যদল এই উৎসবে অংশ নেয়। ঢাকার বাইরে এ ধরনের একটি উদ্যোগ নিয়ে তাঁরা এক কৃতিত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করলেন। এটা যদি তাঁরা বার্ষিক বা দ্বিবার্ষিক অনুষ্ঠানে পরিণত করতে পারেন তবে একটা বড়ো কাজ হয়। আমরা রাজশাহী সাংস্কৃতিক সংঘকে সোচ্চার সাধুবাদ জানাই।

শিশু-কিশোর নাট্যোৎসব দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ মহিলা সমিতি মিলনায়তনে। সরকার বা প্রাতিষ্ঠানিক কোনো সহায়তা ছাড়া নিজেদের সাধ্যের ওপর নির্ভর করে এ ধরনের প্রচেষ্টা নিয়ে উদ্যোক্তারা নাট্যামোদীদের বিশেষ করে ছোটোদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে উদ্যোক্তারা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালকদের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। একাডেমী মিলনায়তনের এ উৎসবের আয়োজন করতে গেলে একাডেমী কর্তৃপক্ষ নাকি যেসব নাটক মঞ্চস্থ হবে তার নতুন করে ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে বলে জানান। অথচ একাডেমীব মহাপরিচালকই কেন্দ্রীয় নাটক সেন্সর কমিটির আহ্বায়ক এবং একাডেমীই সেন্সরের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকে। পরে নাকি খোলাখুলি উদ্যোক্তাদের জানানো হয় রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায় এঁদের নাটক করা কেন? আবারও সেই পুরানো প্রশ্ন যা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সাথে সাথেই চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হয়ে গিয়েছে—আমরা শুধু একটা কথাই মনে করিয়ে দিতে চাই ইতিহাসের শিক্ষাই এই যে ইতিহাস থেকে কেউ কোনোদিন শিক্ষা নেয় না।

মানবদরদি প্রগতিবাদী সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মী সত্যেন সেনের মৃত্যুতে আমরা এক মহাপ্রাণ মানুষকে হারালাম। জীবিতকালে সত্যেন সেনের যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি। আমরা আশা করি, তাঁর রচনাবলি বেশি করে পঠিত হবে, তাঁর জীবনদর্শন আমাদের অনুপ্রেরণা জোগাবে। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

[ফেব্রুয়ারি ১৯৮১]

দশ

আজকের যুগ হচ্ছে যোগাযোগের যুগ। এই যোগাযোগের মাধ্যমেই বিশ্বের বিভিন্ন জাতি একে অপরকে জানছে, একে অপরের কাছে আসছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যোগাযোগ নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যবহ। বিশ্ব শান্তি ও মৈত্রী সংহত করার ক্ষেত্রে এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

এ লক্ষ্য সামনে রেখেই ১৯৪৮ ইউনেস্কোর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইন্সটিটিউট। আই টি আই-র প্রধান উদ্দেশ্য : 'থিয়েটার সংশ্লিষ্ট সকল মানুষের মধ্যে সৃজনশীলতা সহযোগিতা বৃদ্ধি পারস্পরিক সমঝোতা গভীরতর করা এবং মানুষে মানুষে মৈত্রী ও শান্তি সংহত করার লক্ষ্যে নাট্যশিল্পের চর্চা ও জ্ঞানের আন্তর্জাতিক বিনিময় বৃদ্ধি।' পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আই টি আই-র ৬২টি জাতীয় কেন্দ্র রয়েছে।

বাংলাদেশেও সম্প্রতি আই টি আই-র জাতীয় কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে—এটা নাট্যকর্মী ও

নাট্যপ্রিয় সুধীজনের জন্য বিশেষ আনন্দ সংবাদ। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে বিশ্ব নাট্যাঙ্গনের সাথে বাংলাদেশের একটা সার্বক্ষণিক যোগাযোগ বজায় থাকবে। পৃথিবীর কোথায় নাটকের ক্ষেত্রে কী উল্লেখযোগ্য কী ঘটছে, তার সংবাদ বাংলাদেশ কেন্দ্রে আসবে। কেন্দ্র সে সংবাদ নিয়মিত বুলেটিনের মাধ্যমে দেশের নাট্যকর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে। তেমনিভাবে বাংলাদেশের নাটকের সংবাদ স্থান পাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। এছাড়া আই টি আই-র বাংলাদেশ কেন্দ্র নানা গবেষণামূলক প্রকল্প হাতে নেবে বলে জানা গেছে। আমরা কেন্দ্রের শুভযাত্রা কামনা করি।

ঢাকায় অনেকদিন পর একসাথে বেশ কিছু ভালো নাটক চলছে। এ সব নাটকের প্রযোজনা বৈচিত্র্য সত্যিই দর্শককে মুগ্ধ করে। এ সব নাটকের প্রযোজনার পেছনে রয়েছে অক্লান্ত পরিশ্রম ও কর্তব্যনিষ্ঠা। আবার পাশাপাশি এমন অনেক নাটকও দেখা যায় যা আদৌ মঞ্চে আসার উপযুক্ত নয়। দল গড়তে হবে, নাটক করতে হবে তার জন্যেই যেন নাটক করা।

ঢাকার হল সমস্যা আগের মতোই রয়ে গেছে। দল গড়ার সাথে সাথে বরং তা প্রকটতর হচ্ছে। তবে আশার কথা মহিলা সমিতির পাশে গার্ল গাইড মিলনায়তনের সংস্কার চলছে। পাশাপাশি দুটো হল হলে ঢাকার নাট্যদলগুলোর জন্যে খুব সুবিধেজনক হবে।

সম্প্রতি ঢাকা ড্রামা তাদের নাটক 'আমি গাধা বলছি'-র সুবর্ণ জয়ন্তী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী তাদের ২০০তম অভিনয় রজনী পালন করেছে। আমরা ঢাকা ড্রামা ও প্রতিদ্বন্দ্বীকে তাদের কৃতিত্বের জন্যে অভিনন্দন জানাই।

[এপ্রিল ১৯৮২]

এগারো

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন দেশব্যাপী এখন জোরদার হয়েছে। হত্যার যে রাজনীতি শুরু হয়েছে পঁচাত্তরে, তার অবসান ঘটাতে হলে দেশবাসীর সচেতনতা প্রয়োজন। গণতন্ত্রের বিকল্প গণতন্ত্রই, সামরিক শাসন নয়। সংস্কৃতিকর্মীরা দেশের এই বৃহত্তর গণ আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। কেননা সংস্কৃতিকর্মী যদি রাজনৈতিকভাবে সচেতন না হন, তবে তিনি তাঁর ভূমিকা কতটুকু অর্থবহভাবে পালন করতে পারবেন, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

নাট্যকর্মীরাও আজ তাঁদের অধিকার ফিরে পাবার জন্য আন্দোলনে নেমেছেন। ১৮৭৬-এর উপনিবেশিক কালাকানুন 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' বাতিলের দাবিতে আজ সারা বাংলাদেশ জুড়ে নাট্যকর্মীরা সোচ্চার। কিন্তু সরকার চরমভাবে উদাসীন তাঁদের এই নায্য দাবিটির প্রতি। গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারের গোচরীভূত করা হয়েছে এ প্রসঙ্গ নিয়ে, কিন্তু সরকারের দিক থেকে কোনো বাস্তব সাড়া মেলেনি। আমরা আবারও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, সময় থাকতে এর একটা বিহিত করুন। নাট্যকর্মীদের ক্ষোভ ইতোমধ্যেই বিক্ষোভে পরিণত হয়েছে।

নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় সম্প্রতি তাঁদের নাটক নিয়ে ভারত সফর করে এসেছেন। তাঁদের নাটক সেখানে প্রশংসা পেয়েছে সে জন্যে আমরাও গর্ববোধ করি। আমরা আগে অনেকবারই বলেছি ভারতে আমাদের নাট্যদলগুলির নিয়মিত সফরের ব্যবস্থা করতে। আমাদের সংস্কৃতির সবল দিকগুলো যদি আমরা বিদেশে প্রদর্শন করতে পারি তবে জাতি হিসেবে আমাদের মর্যাদা বাড়ে, দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। আর পশ্চিমবঙ্গের বেলায় সুবিধেটা এই একই ভাষায় কথা বলেন সেখানকার মানুষ। তাই ভাষার ব্যবধানের দোহাইও এখানে দেওয়া চলে না। কিন্তু কেন জানি না সাংস্কৃতিক বিনিময়ে কর্তৃপক্ষের বড়োই অনীহা।

দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর কার্যকলাপে সংস্কৃতিকর্মীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। নিয়মিত গান বাজনার আসর বসানোই যেন শিল্পকলা একাডেমীর একমাত্র কাজ। কিছুদিন আগে আরব্য নৃপতির

মনোরঞ্জনের জন্যে একাডেমী রাতভর নাচগানের আসর বসিয়ে, হাজার হাজার টাকা ইনাম নিয়ে যে কেলেঙ্কারি করেছেন, তা অতীতের সব কুকর্মকে ম্লান করে দিয়েছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে লক্ষ্যে একাডেমী আদৌ অগ্রসর হচ্ছে না। এ অবস্থার আশু অবসান হওয়া প্রয়োজন। গতমাসে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও গীতিকার আবু হেনা মোস্তাফা কামাল একাডেমীর মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন। আমরা আশা করব তিনি শিল্পকলা একাডেমীর মর্যাদা ফিরিয়ে এনে এটিকে শিল্পচর্চার একটি ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথাও বলে রাখি। বাংলা একাডেমীর মতো শিল্পকলা একাডেমীরও সাধারণ সদস্য করে তাঁদের দ্বারা নির্বাচিত পরিষদ গঠনের আইনগত বিধান রয়েছে। কিন্তু সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ আজও উদাসীন কেন?

সম্প্রতি থিয়েটার পরিবারে প্রথম মৃত্যুর ছায়া পড়ে। গত জুন মাসে আমরা অকালে হারিয়েছি আমাদের একজন একনিষ্ঠ নেপথ্যকর্মীকে। আমাদের কাজের মধ্যে দিয়ে আমরা সেই আরো দূর নেপথ্যে চলে যাওয়া ফরিদা খাতুনকে মনে রাখব। আমরা তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

[অক্টোবর ১৯৮৪]

বারো

বাংলাদেশে নিয়মিত নাট্যচর্চার একযুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময়ের ব্যবধানে নাটক আজ বলিষ্ঠ শিল্পমাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। নাট্যকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টায় সবচেয়ে বড়ো অর্জন নাটকের জন্য দর্শক সৃষ্টি। রাজধানী ঢাকাতে আজ একাধিক মঞ্চে প্রতিদিন নাটক হয় এবং তা দর্শকের আনুকূল্য লাভ করে।

কিন্তু ঢাকা ও চট্টগ্রাম ছাড়া দেশের অন্যান্য শহরে এ চিত্র ভিন্ন। গ্রুপ থিয়েটার চর্চা সেখানে বড়োই সীমাবদ্ধ। চুয়াত্তরের দিকে সর্বত্র জোয়ার পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে তা স্তিমিত হয়ে গেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একটি নাট্যদল বছরে ৩/৪টি প্রদর্শনীর আয়োজন করে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।

কেন এমন হয়? প্রধান সমস্যা বোধ হয় নাট্যকর্মীদের উদ্যম ও ধৈর্য। ঢাকার বাইরে নাট্যানুষ্ঠান আয়োজন সমস্যা কিছুটা বেশি। তাই বলে অসম্ভব নয়। দর্শক পাওয়া যায় না বলে নাট্যকর্মীরা প্রায়ই হতাশা ব্যক্ত করেন। একটি জেলা শহরে ৪/৫টির বেশি প্রদর্শনী কোনো নাটকের করা সম্ভব হয়ে ওঠে না দর্শকের অভাবে। এই দর্শক বাড়ানোর জন্যে আমাদের নাট্যকর্মীদের সংঘবদ্ধ প্রয়াস চালাতে হবে যেমনটি ঢাকায় প্রথম দিকে চালানো হয়েছিল। জেলা শহরে প্রচারের যেমন সীমাবদ্ধতা আছে, আবার বাড়তি অনেক সুযোগও আছে যা ঢাকায় নেই। প্রচারের সম্ভাব্য সব মাধ্যম ব্যবহার করে (ব্যক্তিগত যোগাযোগসহ) এ সব জায়গায় দর্শক বাড়াতে হবে। তারপর যে বড়ো সমস্যাটি নাট্যকর্মীদের বিব্রত করে তা হচ্ছে মহিলা শিল্পীদের অভাব। ঢাকায় আজ প্রত্যেক নাট্যদলেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক মহিলা শিল্পী রয়েছেন। কিন্তু বিভিন্ন জেলা শহরে নাট্যদলগুলি এখনও নিজেদের মহিলা শিল্পী গড়ে তুলতে পারেননি। খুব কম দলেরই নিজস্ব মহিলা শিল্পী আছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় কয়েকজন আধাপেশাদার মহিলা শিল্পী সে এলাকার সব নাট্যদলে প্রয়োজনমতো অভিনয় করেন এবং সে অঞ্চলের নাট্যদলগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। মহিলা শিল্পী না আসার কারণ সামাজিক বাধা। যে বাধা গোড়ার দিকে ঢাকার নাট্যকর্মীদের সমস্যায় ফেলত। কিন্তু ক্রমে সে বাধা দূর হয়েছে। মহিলাদের মধ্যে অনেকে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন এবং তাঁদের দেখে অন্যরা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। জেলা শহরগুলিতেও মহিলাদের এ ক্ষেত্রে অগ্রণী হতে হবে। নাট্যকর্মীদের আপন আত্মীয়-স্বজন থেকে যদি প্রথম মহিলা শিল্পী এগিয়ে আসেন, তবে কাজটা অনেক সহজ হয়।

আরেকটা জিনিস লক্ষ করা গেছে ঢাকার বাইরে গ্রুপ থিয়েটার চর্চা কেবল তরুণদের মধ্যেই

সীমাবদ্ধ। অল্পবয়সিদেরই সবসময় চুল সাদা করে বুড়ো সাজতে হয়। যাঁরা প্রবীণ এবং দীর্ঘদিন ধরে নাট্যচর্চা করছেন, তাঁদেরকে যদি গ্রুপ থিয়েটার দলে আনতে পারে তবে দলগুলো আরো শক্তিশালী হবে। প্রবীণ নাট্যকর্মীদের প্রতি আজকের গ্রুপ থিয়েটারের নবীন কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন অত্যাবশ্যক।

আমাদের নব নাট্যচর্চা যদি সারা বাংলাদেশে প্রসারিত না হয়, তবে তার শক্তি ক্রমশ ফুরিয়ে আসবে।

[মার্চ ১৯৮৫]

তেরো

নাটকে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কেউ ছোটো করে দেখেন না। কিন্তু আমাদের দেশে এ ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত শিক্ষার কোনো সুযোগ নেই। ফলে নাটকের মহড়ার মধ্য দিয়ে বেশির ভাগ নাট্যকর্মী প্রয়োজনীয় অনুশীলন করে থাকেন। আপন দলের নির্দেশক বা সহযাত্রীরাই এ ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে থাকেন।

সম্প্রতি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি উৎসাহব্যঞ্জক ধারা লক্ষ করা যাচ্ছে। কিছু কিছু নাট্যদল নিজেদের উদ্যোগে ওয়ার্কশপের আয়োজন করছেন। নাগরিক, থিয়েটার, ঢাকা পদাতিক, আরণ্যক, নাট্যচক্র পরপর কয়েকটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করেন। এর আগে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনও ঢাকার বাইরের নাট্যকর্মীদের জন্য অনুরূপ একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছিলেন। বেশির ভাগ দলই নতুন সদস্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এ ধরনের ওয়ার্কশপের আয়োজন করেন। এটা একটা অনুকরণীয় নিয়মে পরিণত হতে পারে। কারণ আমাদের দেশে দলে নতুন সদস্য নেওয়া হয় ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যম। কেউ আগ্রহ নিয়ে যোগাযোগ করলে বা দলে চেনাজানা কেউ থাকলে তার মাধ্যমে দলে ঢোকার একটা পথ হয়। কিন্তু অনেক প্রতিভাবান তরুণ তরুণী আছেন যাঁরা একটি দলে যোগ দিতে উৎসাহী কিন্তু তাঁদের যোগাযোগের মাধ্যম নেই। ফলে কোনো দলে যোগ দেওয়ার সুযোগ তাঁদের সহজে হয়ে ওঠে না।

সম্প্রতি একটি দলের আহ্বানের জবাবে ২৪০০ আবেদন পাওয়া গিয়েছিল। এতেই প্রমাণ হয় নাটকের দলে কাজ করার জন্য নতুনদের মধ্যে কী উৎসাহ। স্বাভাবিকভাবেই ঐ ২৪০০ জন থেকে প্রাথমিক বাছাই করতে গিয়ে অনেক যোগ্য আবেদনকারীও হয়তো বাদ পড়েছেন। কারণ সবাইর তো আর সাক্ষাৎকার নেওয়া সম্ভব নয়। সে বাস্তবতার কথা বিবেচনার রেখে যদি সত্যিকার প্রতিভাধর আবেদনকারী উদ্যম না হারান, তবে একদিন না একদিন তাঁর জন্যে সুযোগ আসবেই।

আমরা মনে করি এ ধরনের ওয়ার্কশপ আয়োজনের মধ্য দিয়ে যদি নাটকের দলগুলো তাঁদের নতুন সদস্য বাছাই করেন, তবে তাঁরা তুলনামূলকভাবে যোগ্যতর ও পরিশ্রমী নাট্যকর্মী পাবেন। আর যদি মাঝে মাঝে দলের সদস্যদের জন্যে ওয়ার্কশপের আয়োজন করা যায়, তবে তো কথাই নেই। এতে করে দলের প্রযোজনার মান উন্নত হবে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করতে অন্য অনেক কিছুর সাথে অর্থেরও প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী এ ক্ষেত্রে একটি ভূমিকা নিতে পারে। তাদেরও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি রয়েছে এবং এ খাতে ব্যয়-বরাদ্দ রয়েছে। প্রশিক্ষকদের সম্মানী বাবদ একাডেমী যদি দলগুলোকে প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে পারে, তবে দলের উপর চাপ অনেকটা কমে আসে। তা নইলে কেবল অর্থাভাবেই অনেক দলের পক্ষে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এ সম্পাদকীয় যখন লেখা হচ্ছে তখন গোটা জাতি শোকে মুহ্যমান। জগন্নাথ হলের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় টেলিভিশনে নাটক দেখতে আসা ৩৬ জন টগবগে তরুণ মুহূর্তে নিথর হয়ে গেল। কী

অবহেলার মৃত্যু এদের! চরম কিছু হবার আগে আমাদের দেশে কারো টনক নড়ে না প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা এটা লক্ষ করেছি। দুর্ঘটনায় আহত শতাধিক ছাত্রর ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত। আমরা নিহতদের আত্মার চিরশান্তি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি জানাই আমাদের আন্তরিক সমবেদনা। তবে এ বিরাট শোকে একটা সান্ত্বনা মানুষের বিপদে মানুষ এগিয়ে আসে কতটা আন্তরিকতা নিয়ে তা আমরা প্রত্যক্ষ করলাম দুর্ঘটনার পরপরই। ৭১-এর পর এতটা একাত্মতা বোধ হয় আর দেখা যায়নি।

[সেপ্টেম্বর ১৯৮৪]

চোদ্দ

বাংলাদেশে নিয়মিত নাট্যচর্চা স্বাধীনতার সমবয়সি। স্বাধীনতা আমাদের সংস্কৃতি বিকাশের যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, তার সদ্ব্যবহার করে আমাদের নাট্যকর্মীরা নির্মাণ করলেন আমাদের নবনাট্যের কাঠামো। নির্মাণের পালা এখনো চলছে, কেবল ভিতটা তৈরি হয়েছে মাত্র।

অনেক সময়ই আক্ষেপ করা হয় আমাদের নাটকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটকের সংখ্যা খুবই কম। কথাটা কিন্তু সমর্থনযোগ্য নয়। বাংলাদেশের এই নতুন নাটক পুরোটাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে উৎসারিত। আমরা যদি স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের নাটকগুলোর দিকে তাকাই তবে দেখব বেশির ভাগ নাটকেই মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। কেবল মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে নাটক লিখলেই যে তা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক হবে এমন কোনো কথা নেই। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন নিয়ে লেখা নাটকও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ সৈয়দ শামসুল হকের সাম্প্রতিক নাটক 'যুদ্ধ এবং যুদ্ধ'র কথা বলা যেতে পারে। মুক্তিযুদ্ধে শহিদ এক অধ্যাপকের স্ত্রীর আজকের জীবনযাপনের কাহিনি নিয়ে এ নাটক। নাটকটি দর্শকদের চেতনাকে এমনভাবে আলোড়িত করে, যা অন্য দশটি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি নিয়ে লেখা নাটকও হয়তো এতটা সফলভাবে করতে পারত না। আজ আমাদের বেশি প্রয়োজন যে মূল্যবোধগুলোর জন্য আমরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলাম সেগুলো ফিরিয়ে আনা। বর্তমান রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশে সেসব মূল্যবোধ হারিয়ে গেছে। যে 'জয় বাংলা' ধ্বনি গোটা জাতিকে মুহূর্তে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, সংগ্রামে সাহস যুগিয়েছিল, তা আজ আওয়ামি লিগের শ্লোগান বিবেচনা করে বর্জিত। আমরা ভুলে গেছি একাত্তরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তার বাঙালি দোসরদের অমানুষিক বর্বরতার কথা। সাধারণ ক্ষমার সুযোগে রাজাকার আলবদররা সময়মতো নতুন রূপে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে তারা পুনর্বাসিত। যে রাজাকার নেতাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে ছবিসহ সংবাদ ছাপা হয়েছিল ১৯৭২-এ, আজ তারই ছবিসহ সংবাদ আমরা পাঠ করি একই সংবাদপত্রে ভিন্ন প্রেক্ষিতে। কী পরিহাস! এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে, আজ মোনেম খান বেঁচে থাকলে তিনিও ইতোমধ্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জাতীয় কিছু হতে পারতেন।

আজ ঘটা করে মুক্তিযোদ্ধার তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। কিন্তু কেবল রাইফেল নিয়ে যাঁরা রণাঙ্গনে সেদিন যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁরাই কি কেবল মুক্তিযোদ্ধা? রাজাকার আলবদর ছাড়া সেদিন বাংলাদেশের সব মানুষই মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছেন। তাই আজ মুক্তিযোদ্ধার তালিকা প্রকাশ না করে প্রকাশ করা দরকার রাজাকার আলবদর আল-শামসের তালিকা। সে তালিকা প্রকাশে কি কোনো অসুবিধা আছে?

[নভেম্বর ১৯৮৬]

পনেরো

সংস্কৃতিক্ষেত্রে আজ বিশ্বজুড়ে শুরু হয়েছে উৎসের সন্ধানে অভিযাত্রা। একটি জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় যদি উৎস-নির্ভর না হয় তবে সে পরিচিতি স্থায়ী হয় না। নাটক নিয়েও তাই আজ দেশে-বিদেশে নানা পরীক্ষা। নাটককে দাঁড় করানোর চেষ্টা চলছে জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিমূলে। নাটকে নিয়ে আসা হচ্ছে জাতীয় সংস্কৃতির অন্যান্য মাধ্যমের অনেক নিদর্শন। তাতে করে একটা জাতির নাটক একটা নিজস্ব রূপ পাচ্ছে, নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করছে। কাজটা মোটেই সহজ নয়। তবু বাংলাদেশে এ নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে, কাজকর্মও একটু হচ্ছে। চেষ্টা হচ্ছে নাটকে এমন কিছু আনা যায় কিনা যা দেখে বলা যাবে এটা বাংলাদেশের নাটক। কেবল এই কথা বলার জন্যই নয়, আমরা যদি আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে কিছু আহরণ করে নাটকের সাথে মেলাতে পারি তবে তাতে আমাদের নাটকই সমৃদ্ধ হবে। একটি উদাহরণ দেওয়ার লোভ এখানে সংবরণ করতে পারছি না। ভারতে হাবিব তানভীর তাঁর প্রদেশের ছত্রিশগড় অঞ্চলের ভাষা ও জীবনযাত্রা নিয়ে যে অসাধারণ কাজ করে চলেছেন, তাঁর নয়া থিয়েটারের প্রযোজনাগুলো তার প্রমাণ। তাঁর অভিনেতা অভিনেত্রীরা বেশির ভাগই খেটে খাওয়া নারীপুরুষ। ফলে ভারতীয় থিয়েটারের একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

বর্তমান সংখ্যায় আমরা এ লক্ষ্যে কিছু নিবন্ধ পত্রস্থ করেছি। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য যাত্রার অতীত ও বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন যাত্রা জগতেরই এক কীর্তিমান পুরুষ। গ্রুপ থিয়েটার কর্মীরা শহরে নাটক করার পাশাপাশি গ্রামে নাটক করার কথাও ভাবছেন এবং কিছু উল্লেখযোগ্য কাজও হয়েছে। ঢাকা থিয়েটার সূচিত গ্রাম থিয়েটার আন্দোলন এবং আরণ্যকের মুক্তনাটক আন্দোলন গ্রামের মানুষের কাছে নাটক নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে দুটি প্রশংসনীয় ধারা। গ্রাম থিয়েটার ও মুক্তনাটক সম্পর্কে দুটি বিশদ আলোচনা বর্তমান সংখ্যায় রয়েছে। আশা করি এ সংখ্যার নিবন্ধগুলো আমাদের নাট্যকর্মীদের সাধারণ মানুষের জন্যে নাটক করার ব্যাপারে আরো উৎসাহিত করে তুলবে।

বর্তমান রাজধানীতে নাট্যচর্চার একটা মন্দাভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন। কথাটা বোধ হয় অমূলক নয়। রোজার মাসে সঙ্গত কারণে নাটক প্রায় হয়ই না। তার উপর প্রচণ্ড গরমে মহিলা সমিতির অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দর্শক দ্বিতীয়বার সেখানে যেতে চাইবেন না। গাইড হাউস মঞ্চ সংস্কারের জন্য বন্ধ। সম্ভবত একটি ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো নতুন নাটকও নেই। এ সব মিলিয়ে নাটক সরণিতে নাটকের চেয়ে টাঙ্গাইল শাড়ির ব্যবসাই এখন জমজমাট। তবে কয়েকটি দলের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা থেকে আশা করা যায় এ বছরের শেষের দিকে দর্শকরা বেশ কয়েকটি ভালো প্রযোজনা দেখার সুযোগ পাবেন। দুটি ভারতীয় দলেরও বাংলাদেশে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

[জুন ১৯৮৭]

ষোল

দেশে এখন চরম রাজনৈতিক সংকট বিরাজ করছে। রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে দেশব্যাপী যে প্রবল গণআন্দোলনের সূচনা হয়েছে তার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে সংস্কৃতিকর্মীসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। চলমান আন্দোলনের এক পর্যায়ে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আহ্বানে শিল্পীরা গত ২৯শে নভেম্বর থেকে ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত রেডিও টেলিভিশনের অনুষ্ঠান বর্জন করে। এ বর্জন গণআন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় সরকার সংসদ বাতিল করেছেন। কিন্তু সংসদ নির্বাচনের চেয়েও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল অনেক বেশি। সে নির্বাচন বহাল রাখার পক্ষে সরকার কী যুক্তি দেখাবেন? রাষ্ট্রপতি এরশাদের যদি আত্মপ্রত্যয় থাকে এবং তিনি যদি জনগণের সমর্থনের উপর

আস্থাবান থেকে থাকেন, তবে পদত্যাগ করে আবার নির্বাচনে দাঁড়াতে তার অসুবিধা কোথায়? দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের ফলে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু সরকারের কাছে ক্ষমতায় টিকে থাকাটাই বড়ো কথা অন্য কিছু যেন বিবেচ্য নয়। আমরা এখনো আশাবাদী গণদাবির কাছে ক্ষমতাসীনরা মাথা নত করে পদত্যাগ করবেন এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে প্রকৃত গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসবে। চলমান আন্দোলনে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নাট্যকর্মীরা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন। আমরা তাঁদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই।

১৯৮৭ সাল শেষ হল। এ বছর ছিল নাটকের জন্যে বন্ধ্যা সময়। নতুন নাটক হয়েছে কম, প্রদর্শনীর সংখ্যাও কম। ঢাকাতে উল্লেখযোগ্য নতুন নাটক হয়েছে মাত্র তিনটি। আমাদের নাট্যকর্মীদের অবিলম্বে উচিত নাটকের এ অবস্থার পেছনের কারণগুলো খুঁজে বার করা এবং তা নিরসনের উদ্যোগ নেওয়া। ঢাকাতে অবশ্যি গত ছমাসের মধ্যে দুমাস রাজনৈতিক কারণে, এক মাস রোজার জন্যে, এক মাস মহিলা সমিতি বর্জনের জন্যে নাটক হয়নি। কিন্তু বাকি সময়েও নাটকে দেখা গেছে ভাটার টান। আমরা আশা করব এ অবস্থা সাময়িক। নতুন উদ্যমে পথ চলার জন্যে থমকে দাঁড়ানো।

আমাদের যাত্রা জগতের প্রবাদ পুরুষ অমলেন্দু বিশ্বাস সম্প্রতি লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যু যে আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কত বড়ো ক্ষতি তা সহজে অনুমান করা যাবে না। তাঁর পেশাকে তিনি ভালোবেসেছিলেন, তাঁর পেশার জন্যে ছিল তাঁর গর্ব যা খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়। আমাদের যাত্রার কিছু কালিমা মোচনের জন্যে তিনি সংগ্রাম করে গেছেন আমৃত্যু। থিয়েটারের বর্তমান সংখ্যায় তাঁর ওপর একটি ক্রোড়পত্র সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু আমরা আশা করব ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইন্সটিট্যুটের মতো কোনো প্রতিষ্ঠান তাঁর ওপর একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করবে।

যাত্রার আরো দুজন প্রবীণ শিল্পী মোহাম্মদ আবু সালেক এবং মহেন্দ্র মজুমদার ৫ দিনের ব্যবধানে গত নভেম্বরে নিজ নিজ যাত্রা প্যান্ডেলে পরলোকগমন করেছেন। শিল্পীর পক্ষে এর চেয়ে গৌরবের মৃত্যু আর কী হতে পারে? আমরা তাঁদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি।

কেবলি শোক! সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন তিন দিকপাল কিশোরকুমার, শ্যামল মিত্র ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস। এঁদের সকলের আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক এই কামনা।

[ডিসেম্বর ১৯৮৭]

সতেরো

সম্প্রতি সরকার একটি কমিশন গঠন করেছেন এবং ইতোমধ্যে কমিশন সরকারের কাছে তার রিপোর্ট পেশ করেছেন। বাংলাদেশ জাতীয় সংস্কৃতি কমিশনের কর্মপরিধির মধ্যে ছিল 'বাংলাদেশের জাতিসত্তা, ধর্ম, বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষাপটে এ অঞ্চলের সংস্কৃতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন।' আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি কোনো ব্যক্তি, কমিশন বা সরকারের পক্ষে সংস্কৃতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়। এটি প্রবহমান নদীর মতো। আমাদের আবহমান কালের সংস্কৃতি আমাদের জীবনাচরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কেউ তা নিয়ে গবেষণা করতে পারে না। অতীতে আমাদের দেশেই এ ধরনের অপচেষ্টা হয়েছিল। আর তার পরিণাম সকলেরই জানা। স্বাভাবিকভাবেই শিল্পী সাহিত্যিক সংস্কৃতিকর্মী সকলে এ কমিশন প্রত্যাখ্যান করেছেন। রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণার পর এ কমিশন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে হয়েছে। মূল কমিশন বিভিন্ন বিষয়ের জন্য ১১টি উপকমিটি গঠন করেন। নাটক ও চলচ্চিত্র বিষয়ক উপকমিটিতে ছিলেন সাঈদ আহমদ (আহ্বায়ক), আলমগীর কবির, আতিকুল হক চৌধুরী, আরিফুল হক, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকী ও সুকুমার বিশ্বাস।

নাটকের ক্ষেত্রে সরকার যদি সত্যিই গঠনমূলক কিছু কবতে চান তবে অবিলম্বে রঙ্গালয় নির্মাণ, অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল, নাটক প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মতো কাজে

এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশে আজও একটি থিয়েটার হল নেই এটা জাতীয় গ্লানি ছাড়া আর কী হতে পারে।

প্রায় ছমাস পূর্বে প্রয়াত বিশিষ্ট রূপসজ্জাকর আবদুস সালামের স্মরণে কয়েকটি লেখা পত্রস্থ করা হল। আবদুস সালাম নিজেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ টেলিভিশনের রূপসজ্জা বিভাগকে তিনি নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন, হাতেকলমে কাজ শিখিয়েছেন অগণিত রূপসজ্জাকরকে। থিয়েটার নাট্যদলের শুরু থেকেই তিনি রূপসজ্জার দায়িত্ব পালন করে এসেছেন এবং আমৃত্যু তা করে গেলেন। থিয়েটারের সফরসঙ্গী হয়ে দিল্লিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর এ আকস্মিক মৃত্যু আমাদের গভীরভাবে শোকাহত করেছে। পরম করুণাময়ের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

এবার দীর্ঘ বিরতির পর থিয়েটারের বর্তমান সংখ্যা প্রকাশিত হল। এবারের অনিয়ম বোধ হয় সীমা লঙ্ঘন করেছে। প্রকাশনা সমস্যার কথা বলে পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না। আমাদের এ অক্ষমতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আশা করি ভবিষ্যতে থিয়েটারের প্রকাশনা নিয়মিত করতে পারব।

এ বছরের ১লা জানুয়ারি দুপুরবেলা দিল্লির অদূরে রাস্তার উপর এক শ্রমিক সমাবেশে 'হল্লাবোল' পথনাটক অভিনয়ের সময় শাসক গোষ্ঠীর মদতপুষ্ট ফাসিস্ত শক্তি অতর্কিতে হামলা চালিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে হিন্দি নাট্য জগতে পথনাটকের জনক ৩৪ বছর বয়সি নাট্যকার অভিনেতা-নির্দেশক সফদর হাশমিকে। এ হত্যার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন সারা ভারতের সংস্কৃতিকর্মীরা। আমরাও একজন সংগ্রামী নাট্যকর্মীর বর্বরোচিত খুনের ঘটনায় ক্ষুব্ধ ও শোকাহত। আগামী সংখ্যায় সফদর হাশমির উপর কয়েকটি লেখা পত্রস্থ করা হবে।

কিছুদিন আগে আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের কর্মীপুরুষ, মুক্তিযোদ্ধা ও চলচ্চিত্রকার আলমগীর কবির এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

[মার্চ ১৯৮৯]

আঠারো

বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান তার জন্মলগ্ন থেকেই দুটো দাবিতে সোচ্চার। প্রথম দাবি অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিলের, দ্বিতীয়টি রাজধানীতে নাটক অভিনয়ের জন্যে একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের। সম্প্রতি ফেডারেশান এ দুটি দাবিতে নতুন করে আন্দোলনের সূচনা করেছে।

১৮৭৬ সনে ইংরেজ সরকার পরাধীন ভারতবাসীর স্বাধীনতার চেতনা যেন নাটকের মধ্য দিয়ে প্রসার লাভ করতে না পারে তার জন্যে এই অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তন করেছিল। ১৯৪৭-এ ইংরেজ উপমহাদেশ ছেড়ে গেছে, কিন্তু পাকিস্তান সরকার আইনটি তাদের স্বার্থরক্ষা করবে বিবেচনা করে বহাল রেখেছিল। স্বাধীন ভারতে আইনটি অকার্যকর বলে রায় দেন এলাহাবাদ হাইকোর্ট ১৯৫৪ তে। ১৯৬২ সনে ভারতে পশ্চিমবঙ্গে সরকার অনুরূপ একটি নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল উত্থাপনের চেষ্টা করে। কিন্তু সকলের তীব্র প্রতিবাদের মুখে তা প্রত্যাহার করা হয়। অথচ কী আশ্চর্য স্বাধীন বাংলাদেশে আজও আমরা সেই শতাব্দী প্রাচীন কালা কানুনটির বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি। প্রেক্ষিত বদল হচ্ছে, স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, কিন্তু মানসিকতার বদল হয়নি। আমাদের সংবিধানের আলোকে আইনটি মৌলিক অধিকার বিরোধী। শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন সংগীত, নৃত্য, চিত্রকলাচর্চায় কোনো পূর্বানুমতির প্রয়োজন হয় না, অথচ নাটক অভিনয়ের বেলায় তার আবশ্যকতার কোনো যুক্তি নেই। কোনো নাটক আপত্তিকর বিবেচিত হলে দেশের প্রচলিত আইনেই তার বিচার হতে পারে। নাট্যকর্মীরা

তো দীর্ঘদিন ধরে এ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেনই; জানা গেল বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ও এই আইনটি বাতিলের পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। তবুও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। সরকারের এই অনড় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন কবে হবে?

বাংলাদেশে কত নতুন নতুন প্রকল্প বাস্তাবায়িত হল, ক্রীড়ার উন্নয়নে কোটি কোটি টাকা খরচ হল, কিন্তু নাটকের জন্যে একটি মঞ্চ হল না। সবাই নাটকের অগ্রগতির প্রশংসা করেন, গর্ববোধ করেন কিন্তু নাটকের ন্যূনতম চাহিদা যে মঞ্চ তা করার জন্যে এগিয়ে আসেন না। রাজধানী ঢাকায় গ্রুপ থিয়েটারগুলো একটা মধ্যযুগীয় পরিবেশে নাটক করেন এবং দর্শক নাটক দেখেন। নাটকের মঞ্চ থেকে সত্য উচ্চারিত হয় বলেই হয়তো মঞ্চের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের যত অনীহা। অথচ সভ্য দুনিয়ার একেকটা জাতি তার নাটকের জন্যে কত গর্ববোধ করেন।

সম্প্রতি আমাদের প্রবীণ নাট্যকার নুরুল মোমেন পরিণত বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর সময়ে তিনি ছিলেন আমাদের দেশে অন্যতম প্রধান নাট্যকার। বুদ্ধির দীপ্তি তাঁর রচনায় ছড়িয়ে আছে। এক চরিত্রের নাটক 'নেমেসিস' বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। সর্বোপরি নুরুল মোমেন ছিলেন এক বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিত্ব। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

আরেকজন নাট্য ব্যক্তিত্বের প্রয়াণ আমাদের ব্যথিত করেছে। নট ও নির্দেশক শেখর চট্টোপাধ্যায় পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রস্থান করলেন অনির্ধারিতভাবেই। থিয়েটার যখন 'কোকিলারা' নাটক নিয়ে গত ফেব্রুয়ারিতে কলকাতা গিয়েছিল তখন থিয়েটার ওয়ার্কশপ ও একাডেমী থিয়েটার একটি প্রীতি সম্মিলনীর আয়োজন করেছিল 'আড্ডা' নাম দিয়ে। সে আড্ডার মধ্যমণি ছিলেন শেখর চট্টোপাধ্যায়। সেদিনের স্মৃতি কোনোদিন ভোলার নয়। শক্তিমান এ অভিনেতার উদ্দেশ্যে আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

[আগস্ট ১৯৯০]

উনিশ

অনন্য এক গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বৈরশাহীর পতন ঘটেছে গত ডিসেম্বরে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে পথে নেমেছিল বলেই বিজয় অর্জিত হয়েছে।

আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে ছাত্র ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাহসী ভূমিকা সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে। জনতার বিজয় দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একটি সুযোগ এনে দিয়েছে। এই প্রথমবারের মতো একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। নির্বাচনে যাঁরা জয়লাভ করেছেন, তাঁদের আমরা সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা আশা করব, তাঁরা আন্দোলনের সময় তিন জোট প্রণীত রূপরেখার পূর্ণ বাস্তবায়ন করবেন। গণতন্ত্রের যে ধারা সূচিত হল, তা অব্যাহত রাখতে আমাদের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল বিচক্ষণতা ও পরম সহিষ্ণুতার পরিচয় দেবেন—তাঁদের কাছে দেশবাসীর এটা আন্তরিক প্রত্যাশা।

বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। বেগম জিয়া ও তাঁর সহকর্মীদের আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা আশা করব প্রথম সুযোগেই তাঁরা ১৮৭৬ সালের অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল করবেন এবং ঢাকাতে অন্তত একটি নাট্যমঞ্চ স্থাপনের বাস্তব পদক্ষেপ নেবেন। নাট্যকর্মীদের এ দুটি দাবি দীর্ঘদিনের।

সম্প্রতি ঢাকাতে ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইন্সটিটিউটের বাংলাদেশ কেন্দ্রের উদ্যোগে এশিয়ায় নাট্যপত্র বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই সঙ্গে আয়োজিত হয়েছিল সপ্তাহব্যাপী নাট্যোৎসব ও আমাদের নাট্য ঐতিহ্যের প্রদর্শনী। এ সেমিনারটি আয়োজনের ফলে আন্তর্জাতিক নাট্যাঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। বিদেশি প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের নাটকের প্রাণচাঞ্চল্যের বিপুল প্রশংসা করেছেন এবং এ অঞ্চলের নাট্যচর্চা সম্পর্কে সম্যক অবহিত

হতে পেরেছেন। আমরা মনে করি আই টি আই মাঝে মাঝে যদি এ ধরনের আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, তবে বাংলাদেশ বিশ্ব নাট্যাঙ্গনে একটি মর্যাদার আসন লাভ করবে। এ ছাড়া বেশি প্রয়োজন বাংলাদেশের নাটকের ইংরেজি অনুবাদের। এ ক্ষেত্রে আই টি আই-র উদ্যোগ আমরা প্রত্যাশা করব।

আই টি আই বাংলাদেশ কেন্দ্রের সভাপতি, থিয়েটার নাট্যদলের সভাপতি ও থিয়েটার নাট্যপত্রিকার উপদেশক অধ্যাপক কবীর চৌধুরী শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য এবার একুশে পদক পেয়েছেন। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি যদিও অনেক বিলম্বে এসেছে, শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্যে তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। একুশে পদক প্রাপ্তির জন্যে আমরা তাঁকে উষ্ণ অভিনন্দন জানাই। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আহ্বায়ক বিশিষ্ট সাংবাদিক-সাহিত্যিক ফয়েজ আহমদও এবার একুশে পদক পেয়েছেন। তাঁকেও আমরা সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এবার নাটকের ক্ষেত্রে পদক প্রাপক নির্বাচন নাট্যামোদী মহলে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে। এবারের গণঅভ্যুত্থানে নাট্যকর্মীদের ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে জাতীয় ভিত্তিতে নাটকের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে এমন কাউকে পদক প্রদান করলে যথাযথ হত।

ভারতের বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক দেবাশিস দাশগুপ্ত সম্প্রতি আকস্মিকভাবে পরলোকগমন করেছেন। কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারগুলোর নাটকে সংগীত পরিচালক হিসেবে তাঁর যে অবদান তা এককথায় অতুলনীয়। আবার সংগীত ও নাট্য সমালোচক হিসেবেও তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অর্জন করেছিলেন। দুবার তিনি নাটকের দলের সাথে বাংলাদেশ এসেছিলেন। তাঁর নিরহঙ্কার ও প্রাণখোলা স্বভাবের জন্যে তিনি সকলের আপনজন হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর অভাব দীর্ঘদিন অনুভূত হবে। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

আমাদের দেশের প্রবীণতম রবীন্দ্রসংগীত সাধক পরিমল দত্ত সম্প্রতি এক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে কিছুদিন যন্ত্রণাভোগ করে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। থিয়েটার তাঁর সুচিকিৎসার সাহায্যার্থে কুমিল্লায় একটি প্রদর্শনী করতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করেছে। রবীন্দ্রসংগীতে তাঁর প্রজ্ঞা ও আদর্শের জন্যে উৎসর্গীকৃত জীবনাচরণের জন্যে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর বিদেহী আত্মা শান্তিলাভ করুক—এই কামনা করি।

[এপ্রিল ১৯৯১]

কুড়ি

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ নাট্যাঙ্গনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর যৌথ উদ্যোগে জাতীয় নাট্যোৎসব '৯১। প্রায় ১১ বছর পর জাতীয় ভিত্তিতে একটি নাট্যোৎসব হল। সে সাথে বাংলাদেশে শিল্পকলা একাডেমীর সাথে নাট্যকর্মীদের যে একটা বিচ্ছিন্নতা ছিল তাও অনেকটা দূর হল। আমরা আশা করি জাতীয় নাট্যোৎসব একটি বার্ষিক অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত হবে যাতে করে এ উপলক্ষে নতুন নতুন প্রযোজনার সাথে দর্শকরা পরিচিত হতে পারেন। এমন নিয়ম চালু করার কথাও ভাবা যায় যে, নাট্যোৎসবে যেসব নাটক মঞ্চস্থ হবে সেগুলোর প্রথম প্রযোজনা গত এক বছরের মধ্যে হতে হবে। তাহলে প্রতিবছরই দেখা যাবে উৎসবকে সামনে রেখে অনেক নতুন নতুন প্রযোজনা মঞ্চে আসবে। তাছাড়া ঢাকায় একমাসব্যাপী উৎসব না করে প্রথম পর্যায় চারটি বিভাগে হতে পারে। সেখানে বেশি সংখ্যক দল অভিনয়ের সুযোগ পাবে। চারটি বিভাগ থেকে বাছাই করা দলগুলোই ঢাকায় চূড়ান্ত পর্যায়ের উৎসবে যোগ দেবে। তাতে করে যোগ্যদলগুলোই নিজ নিজ অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আগামী উৎসব আয়োজনের সময় এ প্রস্তাব বিবেচনা

করে দেখতে পারেন।

এবারের জাতীয় নাট্যোৎসব উদ্বোধনকালে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দুটো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এক, অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিলের পদক্ষেপ গ্রহণ ; আর দুই, নাট্যশালা নির্মাণের জন্যে ফেডারেশানকে এক খণ্ড জমি বরাদ্দ করা। এরশাদ আমলে যে কয়েক দফা সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল, তাতেও ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল যে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল করা হবে। কিন্তু ঘোষণার দিন থেকে ক্ষমতাচ্যুতির দিন পর্যন্ত বেশ কিছু সময় পেলেও এ ব্যাপারে বাস্তব কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি—কোনো ফাইল কোথাও চালু হয়নি। সেগুলো কেবলই ছিল কথার ফুলঝুরি। আমরা আশা করব বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার নাট্যকর্মীদের এ দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবায়নে আশু পদক্ষেপ নেবেন। সংসদে সরকারি ও বিরোধী উভয় দলই যখন অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিলের দাবিকে সমর্থন করেন, তখন এ কালাকানুন বাতিলে কোনো সমস্যা দেখি না। আমরা চাই, সংসদের আগামী অধিবেশনে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হোক। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ফেডারেশানকে যে জমিটি বরাদ্দের কথা বলেছেন, সেটি নিয়ে জটিলতা আছে বলে আমরা শুনেছি। ইস্কাটনের সে জমি একজন মন্ত্রী আগেই জমির পাশে অবস্থিত একটি ক্লাবকে বরাদ্দ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুতরাং ফেডারেশানের জন্যে ঝামেলামুক্ত উপযুক্ত পরিবেশে একটি জমি বরাদ্দ করতে হবে।

গত কয়েক মাস ধরে আমাদের নাট্যাঙ্গনে সুবাতাস বইছে বলা যেতে পারে। বেশ কয়েকটি দল নতুন নাটক নিয়ে মঞ্চে এসেছেন এবং তার মধ্যে কয়েকটি সুপ্রযোজিত। এ ধারা অব্যাহত থাকলে আমাদের নাটকের মান উন্নত হবে, সন্দেহ নেই।

থিয়েটারের একজন পুরানো সাথী ডলি ইব্রাহিম সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেছেন। ব্যক্তিগত হতাশায় তিনি আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন। প্রতিভাময়ী এ অভিনেত্রী থিয়েটার নাট্যদলের প্রথম যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। যদিও থিয়েটারের কোনো নাটকে তিনি অভিনয় করেননি, শুরুর দিকে দলকে গড়ে তুলতে তিনি উৎসাহ নিয়ে কাজ করেছেন। আমরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

এবারের একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হয়েছে একাত্তরের ঘাতক ও দালালদের প্রতিহত করার সংকল্পের মধ্যে দিয়ে। এ চেতনা সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হোক—যাতে করে অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এ স্বদেশভূমিতে বাংলাদেশ বিরোধীরা আবাব নতুন করে তাদের তৎপরতা শুরু করতে না পারে।

[ফেব্রুয়ারি ১৯৯২]

একুশ

গত নভেম্বরে ঢাকার নাট্যাঙ্গন আন্তর্জাতিক পরিবেশে মুখরিত ছিল। ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইন্সটিটিউটের বাংলাদেশ কেন্দ্র আয়োজন করেছিল 'সমসাময়িক নাটকে আন্তর্জাতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া' শীর্ষক তিনদিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সেমিনার। আর আগের দুদিন ছিল আই টি আই-র দুটি স্থায়ী কমিটি—কমিউনিকেশানস কমিটি এবং কালচারাল আইডেনটিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটির নির্বাহী বোর্ডসভা। নাটকের ক্ষেত্রে একসাথে এত দেশি বিদেশি প্রতিনিধির সমাগম বাংলাদেশে এর আগে কখনো হয়নি। আই টি আই-র সেক্রেটারি জেনারেল মিঃ আন্দ্রে লুই পেরিনেত্তিও এসেছিলেন। বিদেশি প্রতিনিধিদের সামনে বাংলাদেশের নাটকের পরিচয় তুলে ধরবার জন্যে বাংলাদেশ আই টি আই আয়োজন করেছিল সপ্তাহব্যাপী নাট্যোৎসব এবং নাটকে আন্তর্জাতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিষয়ক একটি প্রদর্শনীর। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনের প্রাণচঞ্চলতা ও পেশাদারি দক্ষতা থেকে বিদেশি

প্রতিনিধিরা মুগ্ধ হয়েছেন। এ সেমিনার ও অন্যান্য অনুষ্ঠানমালা আয়োজনের ফলে বিশ্বনাট্যসভায় বাংলাদেশের মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেল।

সেমিনারে সত্যিকার অর্থে কী করে আন্তর্জাতিক আদান-প্রদান সম্ভব করা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বেশির ভাগ সময় লক্ষ করা গেছে সম্পদশালী দেশগুলোর সংস্কৃতিই দরিদ্র দেশের সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। তখন আর সে বিনিময় দ্বিপাক্ষিক হয় না—একপেশেই থেকে যায়। কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে দরিদ্র অনেক দেশেরই রয়েছে ঐতিহ্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক ভাণ্ডার—যা থেকে সম্পদশালী দেশগুলো সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে লাভবান হতে পারে। সে জন্যই সেমিনারে সমতার ভিত্তিতে আদান-প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একটি প্রয়োজন বারবার অনুভূত হয়েছে—তা হচ্ছে বাংলাদেশের নাটকের অনুবাদ। আমাদের দেশের ভালো নাটক খুব কমই ইংরেজি বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। যার ফলে আমাদের নাট্য-সাহিত্য বিদেশে সম্পূর্ণ অপরিচিত। এ ব্যাপারে আমাদেরকে উদ্যোগী হতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়েই বাংলাদেশের নাটকের অনুবাদ যাতে প্রকাশ করা যায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আজকাল উন্নত বিশ্বের অনেক দেশেই তৃতীয় বিশ্বের নাটক মঞ্চায়নের প্রতি আগ্রহ দেখা যায়।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর উদ্যোগে ও ফোর্ড ফাউন্ডেশানের অর্থানুকূল্যে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দুসপ্তাহব্যাপী জাতীয় যাত্রা উৎসব। যাত্রানুষ্ঠানের উপর যেসব বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছিল তা দূর হবার পর এ উৎসব যাত্রাঙ্গনে যথেষ্ট সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। ঢাকার নাগরিকরা পরিচ্ছন্ন যাত্রাপালা দেখার সুযোগই পান না। এবারর উৎসব সে অভাব মিটিয়েছে। আমরা আশা করব বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী অন্তত দুবছর পরপর এ ধরনের উৎসবের আয়োজন করবেন। ফোর্ড ফাউন্ডেশানকে ধন্যবাদ আই টি আই সেমিনার ও জাতীয় যাত্রা উৎসবের মতো অর্থবহ কাজে অর্থ সাহায্য প্রদানের জন্যে।

গত ৯ ফেব্রুয়ারি আমাদের দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও প্রগতিশীল চিন্তার অগ্রণী পুরুষ অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর ৭০ বছর পূর্ণ হয়েছে। বিশ্বসাহিত্য বিশেষ করে বিদেশি নাটক বাংলা ভাষায় পাঠকদের সঙ্গে পরিচিত করতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। বাংলাদেশের সাহিত্যও তিনি অনুবাদ করেছেন প্রচুর। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ৯০। জাতীয় জীবনের নানা কর্মকাণ্ডে তাঁর সাহসী ভূমিকা সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। তাঁর কর্মোদ্যোগ ও সৃষ্টিশীলতা নবীনদের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে। আমরা তাঁর দীর্ঘ নীরোগ জীবন কামনা করি।

বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ, বিশ্বনন্দিত চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায় সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। তাঁর সৃষ্টি বাঙালির জন্যে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসন করে দিয়েছে। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের মধ্যে তাঁর নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

[ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩]

বাইশ

দীর্ঘদিনের বিরতির পর থিয়েটারের বর্তমান সংখ্যা প্রকাশিত হল। প্রকাশনা ব্যয়ের ক্রমবর্ধমান হার, সার্বক্ষণিক কর্মীর অভাব ও বিজ্ঞাপনের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও আমরা বাংলাদেশের প্রথম এই নাট্য সাময়িকীকে বাঁচিয়ে রাখতে দৃঢ় সংকল্প। এখন থেকে পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশের লক্ষ্যে নতুন করে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনের সর্বজন শ্রদ্ধেয় পুরুষ মোহাম্মদ জাকারিয়া গত বছরের এপ্রিলে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে তাঁর কিছু রচনা এবং তাঁর স্মরণে কয়েকটি লেখা নিয়ে গ্রন্থিত হয়েছে এই বিশেষ সংখ্যায়। কীর্তিমান এই অভিনেতা পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ—দুজায়গাতেই

গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের আদিপর্বে কাজ করেছেন। বহুরূপী ও থিয়েটার দুদেশে তাঁর দুঠিকানা। আদর্শবাদী মানুষ ছিলেন মোহাম্মদ জাকারিয়া, আশেপাশের মানুষদের অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা ছিল তাঁর। ভালো অভিনেতা হতে গেলে ভালো মানুষ হতে হবে আগে—কথাটার ওপর বেশি গুরুত্ব দিতেন তিনি। সারাটা জীবন তিনি ছিলেন নাটকের প্রতি নিবেদিত। দীর্ঘ রোগভোগকালে অভিনয় থেকে দূরে সরে থাকতে হয়েছিল তাঁকে, এ নিয়ে তাঁর মর্মবেদনার অন্ত ছিল না। মনে মনে ভাবতেন আবার তিনি অভিনয় করতে পারবেন। কিন্তু জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকেই বিদায় নিতে হল তাঁকে। গুণমুগ্ধ দর্শকদের স্মৃতিতে রেখে গেলেন অসামান্য কয়েকটি চরিত্র চিত্রণ। তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। সচেতন নাট্যকর্মীরা তাঁর স্মৃতিরক্ষার যথাযোগ্য আয়োজন করবেন—এ প্রত্যাশা করি।

১৯৯৩-র মে মাসে জার্মানির মিউনিখে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইন্সটিটিউট (আই টি আই)-র বিশ্ব কংগ্রেস ছিল বাংলাদেশের জন্যে অত্যন্ত ফলপ্রসূ। এবারই প্রথম বাংলাদেশ থেকে ৬ সদস্যের একটি বড়ো প্রতিনিধিদল কংগ্রেসে যোগদান করে। বাংলাদেশ প্রতিনিধি ভোট পেয়ে ১৪ সদস্যের নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও পরে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির নির্বাচনেও বাংলাদেশ সহজ বিজয় লাভ করে। বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা নিউ থিয়েটার কমিটির সভাপতি, কমিউনিকেশনস্ কমিটির সহ সভাপতি, কালচারাল আইডেনটিটি কমিটির সদস্য ও কমিউনিকেশনস্ কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের সাফল্যের মূলে ছিল বাংলাদেশ কেন্দ্রের তৎপরতা এবং বাংলাদেশের প্রাণবন্ত নাট্যচর্চা। আই টি আই-র পক্ষে বাংলাদেশ কেন্দ্র প্রকাশিত 'দ্য ওয়ার্ল্ড অব থিয়েটার' বইটি কংগ্রেসে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। বাংলাদেশ আই টি আই-র এই অর্জনের জন্যে আমরা কেন্দ্রের সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানাই। আশা করি আই টি আই-র প্রচেষ্টায় বিশ্ব নাট্যাঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আগামী দিনগুলোতে উজ্জ্বলতর হবে।

আমাদের বিবেচনায় ১৯৯৩ ছিল বাংলাদেশের নাটকের জন্যে সুফলা বছর। এ বছরেই 'কোর্ট মার্শাল', 'মুখোশ', 'পুতুল খেলা', 'যৈবতী কন্যার মন', 'পাথর', 'ভেনিস সওদাগর' ও 'স্পর্ধা'র মতো নাটক-প্রযোজিত ও দর্শকনন্দিত হয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা হালকা রসের নাটকের দিকে দর্শকদের নিয়ে যাওয়ার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল অনেক নাট্যদলের মধ্যে, তার মোড় ঘুরেছে এসব সিরিয়াস প্রযোজনার মাধ্যমে। এ ধরনের নাটক যদি আরো বেশি সংখ্যায় প্রযোজিত হয় এবং দর্শক আনুকূল্য লাভ করে, তবে তা আমাদের নাটকের সামগ্রিক মান উন্নয়নে সহায়ক হবে।

কিন্তু রাজধানীতে নাট্যাভিনয়ের পথে সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতা হলের অভাব রয়েই গেছে। মহিলা সমিতি আর গাইড হাউস কত দলকে ঠাঁই দিতে পারে? যে কোনো প্রতিষ্ঠিত দল চাইবে মাসে অন্তত চারটি প্রদর্শনী করতে, নতুন দল অন্তত একটি। কিন্তু সে সুযোগ কোথায়? সরকারি উদ্যোগে ৫০০ আসনের মঞ্চ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তা আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় পড়ে অনিশ্চিত হয়ে গেছে। অবিলম্বে এ সমস্যার সুরাহা হওয়া প্রয়োজন।

[মার্চ ১৯৯৪]

তেইশ

থিয়েটার পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭২ এর নভেম্বরে আর বিংশতিবর্ষপূর্তি সংখ্যা বেরোচ্ছে ১৯৯৭-র সেপ্টেম্বরে। বর্ষ পরিক্রমায় ২৫ বছর পার হলেও পত্রিকার বর্ষ/সংখ্যার হিসেবে এটি ২০ বছর পূর্তি সংখ্যা। এ ২০ বছরে ত্রৈমাসিক থিয়েটারের মোট ৪৭টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি বছর ৪টি সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্যে যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশ করাতে হয়েছে। ক্রমবর্ধমান প্রকাশনা ব্যয়, বিজ্ঞাপনের স্বল্পতা, পত্রিকার নিজস্ব সার্বক্ষণিক কর্মীর অভাব—এসব প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও ২০ বছর ধরে যে কেবল নাট্য বিষয়ক একটি পত্রিকার

প্রকাশনা আমরা অব্যাহত রাখতে পেরেছি, তাতে কিছুটা গর্ববোধ করি। সাথে সাথে পত্রিকাটির নিয়মিত প্রকাশ নিশ্চিত করতে না পারার ব্যর্থতার গ্লানিও আমাদের মনে উঁকি দেয়।

থিয়েটার নাট্যগোষ্ঠীর উদ্যোগে থিয়েটার পত্রিকা প্রকাশিত হলেও কিছুদিন পর তা আর দলের মুখপত্র থাকেনি। পত্রিকাটি হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের নবনাট্যচর্চার বিশ্বস্ত সহযোগী। দলের বাইরে আলাদা স্বাধীন সত্তা নিয়ে থিয়েটার এখন দেশের নাট্যচর্চার সাথে অবিচ্ছিন্ন একটি প্রতিষ্ঠানের নাম।

নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে থিয়েটার যে ২০ বছর পেরোতে পেরেছে তার প্রধান কারণ পাঠক এবং তার লেখকেদের আনুকূল্য। আমরা কোনো লেখককে সম্মানী দিতে পারি না জেনেও বাংলাদেশের সব প্রতিষ্ঠিত ও নবীন নাট্যকার এবং প্রাবন্ধিক সানন্দে আমাদের কাগজে বছরের পর বছর লেখা দিয়েছেন। এতে করে পত্রিকাটির প্রতি তাঁদের ভালোবাসাই প্রকাশ পেয়েছে। এ পত্রিকার মাধ্যমেই শতাধিক মৌলিক, অনূদিত ও রূপান্তরিত নাটক পৌঁছে গেছে নাট্যকর্মীদের হাতে। নিবন্ধ-আলোচনা তো রয়েছেই আর পাঠকদের অপরিসীম আগ্রহ বারবার পত্রিকাটিকে বাঁচার প্রেরণা জুগিয়েছে। আমরা আমাদের লেখক ও পাঠকদের শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাই।

কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগের বিশিষ্ট গবেষক ড. প্রভাতকুমার দাস স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে থিয়েটার পত্রিকার ২০ বছরে প্রকাশিত সব সংখ্যা নিয়ে একটি গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। তাঁর গবেষণাপত্রটি পুস্তকাকারে শিগ্‌গিরই প্রকাশিত হবে। বর্তমান সংখ্যায় তাঁর প্রণীত ২০ বছরের সূচি প্রকাশিত হল। রেফারেন্স হিসেবে তা গবেষক ও নাট্যকর্মীদের প্রভূত উপকারে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রভাতবাবু কলকাতার বহুরূপী পত্রিকার ওপর অনুরূপ গবেষণা করে প্রশংসিত হয়েছেন। থিয়েটার পত্রিকা নিয়ে এ কাজের জন্যে আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

প্রখ্যাত শিল্পী নিতুন কুণ্ডু থিয়েটার পত্রিকার সিংহভাগ সংখ্যার প্রচ্ছদ এঁকেছেন। থিয়েটারের জন্মলগ্ন থেকে পত্রিকার সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা আনন্দের সাথে স্মরণ করছি। বিজ্ঞাপনদাতারা তাঁদের পণ্যের বহুল প্রচার হবে না জেনেও থিয়েটারের মতো পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখার সামাজিক দায়বোধ থেকে আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছেন। এ ক্ষেত্রে দুটি প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা বিশেষ কর্তব্য বলে বিবেচনা করছি। বাংলাদেশ টোব্যাকো কোম্পানি লিঃ এবং এপেক্স ট্যানারি গ্রুপ আমাদেরকে নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত দেশি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা আপনাদের আয়ের ক্ষুদ্র একটি অংশ শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কিত সাময়িকীগুলোর জন্যে বরাদ্দ করুন—সমাজের সকল ক্ষেত্রের উন্নয়নে আপনাদের অবদান রাখুন।

ব্যবসা স্বার্থহীন এই পত্রিকাটির দীর্ঘ চলার পথে যাঁরা বিভিন্নভাবে এর সাথে জড়িত থেকেছেন এবং সাহায্য করেছেন, তাঁদের সকলকে আজকের এই আনন্দের লগ্নে কৃতজ্ঞতা জানাই।

শিগ্‌গিরই সম্ভবত ঢাকার মঞ্চসমস্যার কিছুটা সুরাহা হবে। বঙ্গভবনের সামনের পার্কে সিটি করপোরেশনের নাট্যমঞ্চটির নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ। ১৯৮৮-র জুন নাগাদ শিল্পকলা একাডেমীর নির্মীয়মাণ থিয়েটার কমপ্লেক্স-এর একটি থিয়েটার চালু হবে বলে আশা করা যায়। এ দুটি হল বরাদ্দের ক্ষেত্রে কেবল নাট্যদলের সংখ্যা নয়, প্রযোজনার মান যেন বিবেচনার প্রাধান্য পায় তা খেয়াল রাখতে দুই কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি। নতুবা বাংলাদেশের নাটকের মান উন্নয়নে নতুন নতুন মঞ্চ কোনোভাবেই সদর্থক অবদান রাখতে পারবে না।

১৯৯৭-তে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে হিংসার উন্মত্ততা দেশবাসীকে আতঙ্কিত করেছে, তা প্রশমিত হয়ে সকলের মাঝে শুভবুদ্ধির উদয় হোক—এ কামনাই করি।

[সেপ্টেম্বর ১৯৯৭]

খোলা নাটক

সাজেদুল আউয়াল

নান্দীমুখ

সংস্কৃতিচর্চা এখন আর শুধু আত্ম বা গণ বিমোক্ষণের জন্যে নয়— এখন তার চর্চা প্রয়োজন একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পুষ্টি দান করার জন্যে, একটি প্রজাতন্ত্রের খসড়া নির্মাণের জন্যে। সচরাচর এটি লক্ষ করা গেছে যে, গণ আন্দোলন জোরদার করার জন্যে যে শক্তিটি সবচেয়ে কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে এবং আন্দোলনটিকে একটি যৌক্তিক পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে, সে শক্তিটি হচ্ছে সর্বস্তরের জনগণের ঐক্যজোট। গণ আন্দোলন এবং সংস্কৃতিচর্চার মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্নটি বিবেচনা করতে গেলে আমাদের দুটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ স্থাপন করতে হবে— সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ ও প্রচারণামূলক আন্দোলন।

সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ প্রস্তাব করে এমন সংস্কৃতিচর্চাব, যে সংস্কৃতি যুগপৎ নয়া উপনিবেশ ও সামন্ত অবশিষ্টের অবসান চায় এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি নির্মাণের জন্যে সক্রিয় হয়। এ সংস্কৃতি হচ্ছে জাতীয়তাবাদী ও বৈজ্ঞানিক, এবং যার ভিত্তি থাকবে জনগণের ভিতর অর্থাৎ গণকেন্দ্রিক। এ সংস্কৃতি জাতীয়তাবাদী এ জন্যে যে, এর লক্ষ্য হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ প্রয়োজনগুলো মেটানোর জন্যে কৃষি-শ্রমিক ও কারখানা-শ্রমিকসহ সকল স্তরের জনগণকে একত্র করা, বিশেষ করে সকল ধরনের সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করা। এ সংস্কৃতি বৈজ্ঞানিক, কারণ এটি কতগুলো বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের অভিব্যক্তি ঘটায়। এটি বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা ও সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধেও কথা বলে। এবং এ সংস্কৃতি জনগণকেন্দ্রিক এ জন্যে যে, এটি জনগণকে তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন ও ইচ্ছাপূরণের জন্যে কী করতে হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নিশ্চিত করে। জাতীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সময় সাংস্কৃতিক বিপ্লব তথা শোষিতের সংস্কৃতিচর্চা বা 'পাল্টা সংস্কৃতিচর্চা' অবশ্যই জরুরি, কেননা, এ সংস্কৃতি জনগণের চেতনার স্তর ও মূল্যবোধকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যায় যেখান থেকে তারা সমাজকে নব আঙ্গিকে সাজানোর কথা ভাবতে পারে।

প্রচারণামূলক আন্দোলন সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের খুব কাছাকাছির ব্যাপার। এর প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে, জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রাজনৈতিক লাইন, জনগণের মধ্যে কাজ করার পদ্ধতি, কৌশল, উদ্দেশ্য-আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তার ঘটানো। প্রচারণামূলক এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে, জনলগ্ন শিল্প-সাহিত্য মানুষের চেতনা-উজ্জীবনের জন্যে কতটা শক্তিশালী এবং কতটা কার্যকরভাবে ধ্যান-ধারণা ও বিপ্লবী আবেগকে জন-মানসিকতার মধ্যে প্রবিষ্ট করতে পারে। সংস্কৃতিচর্চার এ দুটি ধারার মধ্যেই আমরা শিল্প-সাহিত্য যে রাজনীতির জন্যে একটি সহায়ক শক্তি, তা লক্ষ করি। শিল্প-সাহিত্যের একঘরে হয়ে থাকাটা ঠিক নয়— তার উচিত, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক তাবৎ সংগ্রামের সময় জনগণের পাশে থাকা। তা না হলে, শিল্প-সাহিত্য জনগণের প্রাত্যহিক সংগ্রাম ও বিজয়ের যে ইতিহাস, সে ইতিহাসে নিজের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে এবং যারা এই জনবিচ্ছিন্ন সংস্কৃতির চর্চা করেন তারা পরোক্ষভাবে হলেও শাসক শ্রেণির সেবা করেন।

আজকের সংস্কৃতিকর্মীদের দায়িত্ব হচ্ছে— জনগণের মধ্যে যাদের সামাজিক শোষণের বিবিধ

প্রক্রিয়া সম্পর্কে উপলব্ধি নেই তাদেব উপলব্ধি দেওয়া, যাদের উপলব্ধি আছে কিন্তু শ্রেণিচেতনা নেই তাদেব শ্রেণিচেতনা দেওয়া এবং যাদের শ্রেণিচেতনা আছে কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের জন্যে যে আবশ্যক পূর্বশর্তসমূহ উপস্থিত থাকা প্রয়োজন সে সম্পর্কে ধারণা নেই— তাদের সেই ধারণা দেওয়া। কিন্তু দেবে কে? আমরা মনে করি, জনগণ যদি নিজেদের অবস্থানটা মঞ্চে বা খোলা জায়গায় উপস্থিত করতে পারেন, অবস্থাটা ব্যবচ্ছেদ করতে পারেন এবং শোষণমূলক যে বাস্তবতাব মধ্যে তাঁরা কাজ কবছেন তা ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিযে বিশ্লেষণ করতে পাবেন তবে নিজেবাই নিজেদেব উপলব্ধি দিতে সক্ষম হবেন, নিজেদের শ্রেণিসচেতন করে তুলতে পারবেন এবং শ্রেণি-সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজ পবিবর্তন করার আবশ্যক শর্তসমূহ সৃষ্টি করতে পারবেন। শহরেব এবং গ্রামেব অপেক্ষাকৃত অগ্রসব শিল্পী-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মীদের এ কর্মযজ্ঞে নির্দিষ্ট ও অবশ্য পালনীয় ভূমিকা আছে।

সংস্কৃতি ও পাল্টা সংস্কৃতি

সংস্কৃতি কী, সংস্কৃতিব একটি উপাদান হিসেবে 'নাটক' কতটা কার্যকরভাবে জনগণের চেতনার সঞ্জীবনেব জন্যে কাজ কবতে পারে এবং জনগণেব চেতনা-উজ্জীবনের কোন পদ্ধতিতে এই নাট্য মাধ্যমকে ব্যবহার কবা দবকার— এ সব প্রশ্ন বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে। সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসবাদ ও অপসংস্কৃতিব প্রভাববলয় থেকে মুক্তির জন্য যে 'পাল্টা সংস্কৃতি' গড়া প্রয়োজন— সেই পাল্টা সংস্কৃতি তথা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ার করণ-কৌশল, উপাদান-উপাত্ত সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা আজ অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। রাজনীতিব সাথে নাট্যকলার যে পারস্পবিক সম্পর্ক বিদ্যমান— তাব আনুপূর্বিক ইতিহাস সর্বদাই স্মবণে রাখা দরকার। জানা দরকার অ্যারিস্টোফেনিস 'নাট্যকারদের ভূমিকা' সম্পর্কে কী উক্তি কবেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'The dramatist should not only offer pleasure but should, besides that, be a teacher of morality and a political adviser.' সব ধরনের থিয়েটারই রাজনৈতিক, কেননা মানুষের সব ধরনের কর্মকাণ্ডই রাজনৈতিক, এবং থিযেটার তার মধ্যে একটি। যাবা থিয়েটারকে রাজনীতি থেকে আলাদা কবতে চায় তারা আমাদের ভুল পথে ঠেলে দিতে চায়— এটি একটি বাজনৈতিক প্রবণতা। সে জন্যে নিজেদের দেশের সংস্কৃতি, রাষ্ট্রীয বাস্তব অবস্থা এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যকভাবে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন।

সংস্কৃতিকে প্রায়শই ঐতিহ্য, জীবনাচরণ, মূল্যবোধ, আদর্শ, নান্দনিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সুকুমারবৃত্তি এবং বিশ্বাসেব ভাণ্ডাব বলা হয়ে থাকে। সংস্কৃতি সম্পর্কে এ সকল ধাবণা সামাজিক শ্রেণিস্বার্থ ও সামাজিক শোষণেব বিবিধ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের চেতনায় ঝাপসা হলেও কোনো প্রতীতি জন্মাতে ব্যর্থ। সংস্কৃতি জনগণেব অনুভূতি চিন্তা-চেতনা ও ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার মূর্তপ্রকাশ। এটি কখনোই কোনো অর্থে শ্রেণি নিরপেক্ষ নয় এবং সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তব অবস্থাব সাথে সম্পর্কহীনভাবে এর উপস্থিতি বা অস্তিত্ব অসম্ভব। যে দেশের জনগণ শ্রেণিতে বিভক্ত— সে দেশের অর্থনীতি যেমন শ্রেণিবিভক্ত, তেমনি তার সংস্কৃতিও শ্রেণিবন্ধনে আবদ্ধ। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে কোনো একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক আবরণ নেই, সব কিছুই বিভক্ত। বিভক্তির এ বেড়াজালের মধ্য থেকেই শোষিত জনগণকে প্রস্তুত করে নিতে হয় শৃঙ্খলমুক্তির জন্যে 'পাল্টা সংস্কৃতি'।

আমাদের হাজাব বছবের সঞ্চরণশীল সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যমগুলো আজ বিপর্যস্ত ও অবক্ষয়ের

মুখোমুখি। এর পেছনে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান। আমাদের এ ভূখণ্ড চিরকালই কোনো না কোনো আগন্তুক বা দেশীয় শক্তির কাছে পরাভূত ছিল। এর ফলে এ অঞ্চলেব জন-মানসিকতায এক ধরনের হীনম্মন্যতার ছাপ আমরা লক্ষ করি। বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শাসনের কারণে আমাদের মনোজগতে ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণার একটি সুস্পষ্ট প্রভাব রয়ে গেছে, রয়ে গেছে মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি ও সামন্ত সংস্কৃতির বিভিন্ন অপভ্রংশ— যেগুলো অমার্জনীয় ভাববাদী ধর্মান্ধতা ও পারলৌকিকতার দ্বাবা আচ্ছাদিত। আমাদের মতো উন্নয়নকামী দেশগুলো আজ বিশ্ব পুঁজিবাদী সম্পর্ক ব্যবস্থাব গাঁট-ছড়ায় আবদ্ধ— এ দুর্মর সম্পর্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রবেশ করছে সামাজ্যবাদী সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো। সাম্রাজ্যবাদ আজ পুরানো কৌশল ছেড়ে শোষণের নয়া কৌশল গ্রহণ করেছে। নয়া ঔপনিবেশিক কায়দায় তারা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে চালাচ্ছে শাসন ও শোষণ। নষ্ট করে দিচ্ছে তাদের মনোজগৎ। জন-মনস্কতাকে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পাচার করছে এমন সব চলচ্চিত্র, ভিডিও, সিনেমা, সাহিত্য, নীলছবি ও সঙ্গীত— যা বিকৃত ও কুরুচিপূর্ণ এবং যা মানুষকে নিমজ্জিত মানসিকতাব অধিকারী করে। নিজেকে বা পারিপার্শ্বিকতাকে জানবার বা বোঝবাব কোনো সুযোগই এ সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির ভেতরে নেই। অন্যদিকে দেশীয় প্রাক্-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যে সংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে এবং প্রচার ঘটাচ্ছে তাকে আমরা লবণ দিয়ে তৈরি হালুয়াব সঙ্গে তুলনা কবতে পারি। একেবারে অখাদ্য এ সংস্কৃতি। কিন্তু এরও ভোক্তা আছে। এ সংস্কৃতিকে আমবা অপসংস্কৃতি বলে অভিহিত করতে পারি। যে কোনো নিয়তিবাদ, দেশোপযোগী নয় এমন আরোপিত মতবাদ, উদ্দেশ্যহীন শিল্পকর্ম, অধিবিদ্যা বিষয়ক ধ্যান-ধারণা, মানুষের ধারণ শক্তিতে অবিশ্বাস, অনাত্মস্থ বিদেশি অনুকরণ, ইত্যাদি অনেক কিছুই অপসংস্কৃতির পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ অপসংস্কৃতি সেই সংস্কৃতি যা মানুষকে তার শ্রেণিগত অবস্থান সম্পর্কে অন্ধ করে রাখে, অধিকার আদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিভ্রান্ত করে, নিজ ধী-শক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করার এবং বুদ্ধিবৃত্তির অধোগতির পথ উন্মুক্ত করে। সংকীর্ণ বিশ্বাস সঞ্জাত ধর্ম-কর্মও এক ধরনের অপসংস্কৃতি।

আরেক দিকে আজ সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল এবং ক্ষতিকারক যে সংস্কৃতির চর্চা (না কি ব্যবহার?) চলছে, তা পাচারকৃত— আসছে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত থেকে। সমাজের সকল স্তরে বাহাসের জন্যে আজ ব্যবহৃত হচ্ছে ভারতের একটি বিশেষ প্রদেশে উৎপাদিত ফিল্মি পণ্য যা সমাজের বাস্তব অবস্থার চিত্র তুলে ধরে না। এ পণ্যের প্রকোপের ও অপকারের সঙ্গে যদি তুলনা কবতে হয়, তাহলে আমাদের স্মবণে আনতে হয মাইল-মাইলব্যাপী বিস্তৃত সুপক্ক নম্র ধান্য সভার উপর ঝাঁপিয়ে পড়া কোটি কোটি পঙ্গপালেব কথা— যে পঙ্গপাল তাদের ছোটো ছোটো দাঁত দিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লক্ষ লক্ষ ধান্যমঞ্জরি সাবাড় কবে দিয়ে উড়ে যায় অন্য কোনো শস্যক্ষেত্রের দিকে। আমাদের দেশেব মানসক্ষেত্রে শুভতার, মরমীযতার, সুকুমার আবেগের ও দ্রোহিতার যে বীজ এখনো কোনোরকমে বেঁচে-বর্তে আছে সে সমস্ত বীজধান আর মনোধানগুলো আজ গো-গ্রাসে গিলে ফেলছে ভারতেব পাচারকৃত চলচ্চিত্র-সংস্কৃতি। পঙ্গপালের ছোটো ছোটো দাঁত যেন এক-একটি ভিডিও ক্যাসেট। ১৯৮৭-এর দিকে আকাশ সংস্কৃতির সেভাবে বিকাশ ঘটেনি। তাই ক্যাসেটের মাধ্যমেই রুচিহীন হিন্দি সিনেমা বাংলাদেশে প্রবেশ করত।

এই যখন দেশীয় সংস্কৃতিব প্রাত্যহিক অবস্থা এবং আমরা যখন জাতীয় সংস্কৃতিব আঙ্গিক নির্মাণের পক্ষে কাজ করব বলে ভাবছি, ভাবছি শুধু প্রতিবাদের বা প্রতিরোধেব নয়— একেবারে আঘাতের সংস্কৃতি তথা পাল্টা সংস্কৃতি নির্মাণের কথা— যা জনগণের দ্বারা, জনগণের মধ্য থেকে, জনবিমোক্ষণের ও জন-চেতনার স্থায়িক উন্নতির জন্যে গড়ে উঠবে— তখন আমাদেব প্রধান আশ্রয়স্থল চিবাযত গ্রামীণ শিল্পরূপটিকে ব্যবহাব করতে হবে সমস্ত ধরনের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, সাংস্কৃতিক ভিক্ষাবৃত্তি, লেজুড়বৃত্তি, সাম্রাজ্যবাদী সাংস্কৃতিক পাঁযতারা এবং সামন্ত সাংস্কৃতিক

কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে। আমাদের আজ সামনে নিয়ে আসতে হবে জাতীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক বিভিন্ন লোকজ সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহকে। এ পর্যায়েব সংস্কৃতিচর্চার নাম দেওয়া যেতে পারে 'নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি'। এই নযা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি সকল ধরনের অপ্রয়োজনীয় অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়বার প্রধান সাংস্কৃতিক ধারা, কেননা, যে দেশে নযা উপনিবেশ ক্রিয়াশীল, সে দেশে রাজনৈতিকভাবে যেমন লড়তে হয় 'জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব' প্রতিষ্ঠার জন্যে, তেমনি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও লড়তে হয় 'নযা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি' চর্চার লক্ষ্য অর্জনের জন্যে। নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিচর্চাব মধ্য দিয়েই একদা অর্জিত হয় জাতীয় সংস্কৃতির স্বরূপটি। নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিচর্চার প্রধান কথাই হচ্ছে— জনগণের দ্বারা, জনগণের মধ্য থেকে এবং জনগণের চেতনা-মানের উন্নতিব জন্যে শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি করা। আর এ কাজটি আমাদের করতে হবে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে আমাদের হাজার বছরের সঞ্চরণশীল গ্রামীণ শিল্প-আঙ্গিকটি অনুধাবনেব মধ্য দিয়ে। যে অমানবিক পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে আমবা বাস করছি— তা থেকে উৎক্রান্তির জন্যে আমাদের নির্মাণ করতে হবে আঘাতের সংস্কৃতি। সকল সাংস্কৃতিক মাধ্যমেই— সে গ্রামীণ হোক বা শহুরে হোক— আমাদেব তুলে ধরতে হবে শ্রেণিহীন সমাজ গঠনের জন্যে সংগ্রামী অভিব্যক্তি। আমরা এ কথা সব সময়ই স্মরণে রাখব যে যথার্থ অর্থে সংস্কৃতি হচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের অভিব্যক্তি। 'খোলা নাটক' সেই অভিব্যক্তি প্রকাশের এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম।

খোলা নাটক ও গণ জ্ঞাপন

পাল্টা সংস্কৃতি নির্মাণের জন্যে খোলা নাটক সবচেয়ে ফলদায়ক ও প্রভাব-বিস্তারকারী মাধ্যম। খোলা নাটক বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে সেই নাটকের কথা যে নাটক অডিটরিয়ামের বাইবে যে কোনো খোলা জায়গায় অভিনীত হয়। সে হতে পারে কোনো বাড়ির আঙিনা, কোনো পথের মোড়, ফসল তুলে নেওয়া মাঠ।

খোলা নাটক গণ জ্ঞাপনের একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম। এক ধরনের আসরি অভিনয়ের মাধ্যমে এটি সম্পন্ন হয়। এখানে দর্শকশ্রোতা নিষ্ক্রিয় নয় বরং শহরের প্রসিনিয়াম থিয়েটারের চেয়ে অধিক পরিমাণে সক্রিয়। প্রসিনিয়াম থিয়েটারে বাস্তবতার এক ধরনের ইলিউশন তৈরি করা হয়, যা খোলা নাটকসমূহে ইচ্ছে করলেও তৈরি করা সম্ভব নয়। খোলা নাটক খুব বেশি খোলামেলা জায়গায় সাদামাটা আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয় বলে কেউ যেন না ভাবেন যে এটি কোনো শিল্পই নয়। খোলা নাটককে অবশ্যই শিল্প হতে হবে। প্রচারণামূলক কাজ যতই খোলা নাটকের মধ্য দিয়ে করা হোক না কেন— একে প্রথমে শিল্প হতে হবে, পরে প্রচার। খোলা নাটকের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এটি শিল্প ও প্রচারকে সমভাবে ধারণ করবে। আর তা যদি না হয় তাহলে এটি নাটকও হবে না— প্রচারও হবে না। প্রচার মানে হচ্ছে জ্ঞাত করা— জনগণকে সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে জ্ঞাত করা। মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ করার, নিঃস্ব করার, বাস্তুচ্যুত করার, শিকড়চ্যুত করার এবং অসহায় বিপন্ন নিমজ্জমান জনগোষ্ঠীতে পরিণত করার যেসব ঘটনা এ সমাজে ঘটছে— তাদের নাট্যরূপ দিয়ে খোলা জায়গায় অভিনয় করে এই সব শোষক ও সামাজিক পরগাছাদের কিভাবে সমাজবাস্তবতা থেকে উৎখাত করা যায়, উৎপাদনযন্ত্রগুলোর উপর একচ্ছত্র আধিপত্য থেকে হটানো যায় এবং নিজেদের জন্যে অন্তত একটি বাসযোগ্য পরিবেশ গড়া যায়— এ সম্পর্কে খোলা নাটক গ্রাম ও শহরবাসী জনগণকে জ্ঞাত করতে পারে, শিক্ষিত ও সজাগ করে তুলতে পারে। গণ জ্ঞাপনের জন্যে এমন শক্তিশালী মাধ্যম দ্বিতীয়টি নেই। খোলা নাটক শুধু জনগণকে জ্ঞাতই করে না তা জনগণ-মানসে এ প্রতীতিও জন্মাতে সক্ষম যে, এ নাটক মানুষকে শৃঙ্খলমুক্ত করতেও পারে।

খোলা নাটক জনগণেব মধ্যকার নিষ্ক্রিয় শিল্পীদের জাগিয়ে তোলে। এটি এতই নমনীয় ও বহনীয় যে শোষিত জনগণ নিজেরাই অবসরে এ মাধ্যমটিব চর্চা করে তাদের শত্রু-মিত্রদের সরাসরি খোলা জায়গায় চিৎকৃত অবস্থায় দেখতে পারে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও প্রচারণামূলক আন্দোলনের জন্যে খোলা নাটক একটি শক্তিশালী মাধ্যম। যাঁরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছেন, যাঁরা সমাজের সকল বিত্তের অধিকারী— তাঁরাই আজ সকল গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে তাঁদেব বক্তব্যই এ মাধ্যমগুলোর মধ্য দিযে প্রচারিত হচ্ছে। তাদের পণ্যের খবরই তারা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে। জনগণের হাতে বস্তুত কোনো মাধ্যমই আর নেই যা দিযে তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা ও অভিব্যক্তিসমূহ প্রকাশ কবতে পারে। সংস্কৃতিচর্চার ন্যায্য অধিকার থেকে তাবা ক্রমশ বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ সংস্কৃতির সকল বিভাগই এক সময় জনগণের সম্পদ ছিল। এমনকি এই শিল্পকলা— এও জনগণেরই সম্পদ। সমাজ বিকাশের কারণে এটি তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখন এর মালিক হয়ে বসেছে উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন এমন এক শ্রেণি যারা দালাল কিংবা পুঁজির ভাগিদার, যারা গণমানুষের উপর খবরদারি-পোদ্দারি কবে বেড়ায় এবং বিভিন্ন অপরাধের মাধ্যমে প্রভূত ধন-সম্পদের অধিকারী হয়ে বসে আছে। জনগণের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া এই সম্পদ, অর্থাৎ শিল্পকলা, আবার তাদের ফিবিয়ে দিতে হবে। জনগণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার জন্যে একটি উৎকৃষ্ট শিল্পমাধ্যম হল 'খোলা নাটক'। এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রেণিসংগ্রামকে ত্বরান্বিত করা— শাসকশ্রেণীর বক্তব্য কিংবা তাদের পণ্য প্রচার করা নয়। তাই জনগণকে সংগঠিত করতে হলে খোলা নাটকের চর্চা আজ আবশ্যক। অসচেতন জনগণকে সচেতন করার জন্যে পাল্টা সংস্কৃতি নির্মাণ কিংবা নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি তৈরির দায়িত্ব আজ সকল নাট্যকর্মীর হাতে দিতে হবে।

গ্রাম থিয়েটার

নাটক অতি প্রাচীন শিল্পমাধ্যম। হাজার হাজাব বছর ধরে মানুষ নাটকের মাধ্যমে আনন্দ ও শিক্ষা লাভ কবে এসেছে। সমাজের নানাবিধ সমস্যা, ভালো-মন্দের পার্থক্য, শত্রু-মিত্রের ভেদাভেদ, সবার ওপরে জীবনেব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, উত্থান-পতন ইত্যাদি আমরা নাটকের মাধ্যমে দেখতে পাই। মানব-সমাজ হাজার বছর ধরে নাটকের সাথে পরিচিত হলেও বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে এর পরিচয় বেশি দিনেব নয়। একাত্তরের রক্তঝরানো মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের সমাজে যে বিপ্লবী জাগরণ শুরু হয় তাবই সোনালি ফসল হচ্ছে এ নাটক— আজকের গ্রুপ-নাট্যচর্চা। অর্থাৎ নতুন স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যখন পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশে করল ঠিক তখন থেকেই গ্রুপ থিয়েটারের যাত্রা শুরু।

বাংলাদেশে নাট্যচর্চাব ২০ বছর উত্তীর্ণ হলেও এখনো তা এ দেশেব সাধাবণ মানুষেব কাছে শিক্ষা ও আনন্দ লাভের মাধ্যম হযে উঠতে পাবেনি। ২০ বছর ধরে বাংলাদেশেব নাটক শুধু শহুরে গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ হযে রইল। শহরগুলোতে বিশেষত ঢাকা শহরের উচ্চবিত্ত ও শৌখিন মধ্যবিত্ত শ্রেণির দর্শকবৃন্দ ৫০ ও ১০০ টাকার টিকেট কেটে নাটক দেখে। এরা ভোগবিলাসী ও সুবিধাবাদী। শুধু এদেব জন্যে নাটক মঞ্চস্থ করে সমাজপরিবর্তনের যে স্বপ্ন আমবা দেখছি তা কখনো সফল হতে পাবে না। অথচ একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে এ দেশের তরুণ-তরুণীরা যেমন একদিন মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেই একই কারণে তারা একদিন মঞ্চে নাটক করতে নেমেছিল। কাজেই তাদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে নাটককে শহরেব কৃত্রিম পরিবেশ থেকে নিয়ে যেতে হবে গ্রামে বসবাসকারী এ দেশের শতকরা ৯০ জন সহজ-সরল সাধারণ মানুষের কাছে। শুধু শহরে নয়, এ দেশের গ্রামে-গঞ্জে নিয়মিত নাট্যচর্চার বিকাশ ঘটাতে হবে। নাটককে যদি

গ্রামে নেওয়া যায়, যদি কৃষক-শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের জীবন ঘিবে গড়ে ওঠে আমাদের নাটক, নাটকের চর্চা, তবেই এ দেশে সামাজিক পরিবর্তনেব পথ সুগম হবে।

বস্তুত এ প্রেক্ষাপটেই গড়ে উঠেছে গ্রাম থিয়েটাব চর্চা। ঢাকা থিয়েটাব এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তারা বিশ্বাস করে, জনগণেব সংস্কৃতির সমাজরূপ ও শিল্পরূপ সৃষ্টি কবাই গ্রাম থিয়েটাব চর্চাব মূলকথা।

গ্রাম থিয়েটারের উদ্দেশ্য

আমাদের সমাজে সত্যিকার অর্থে কোনো বৈপ্লবিক পবিবর্তন আসেনি। এ দেশের শিল্প, সাহিত্য ও রাজনীতি সবসময়ই বৃহত্তর জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেছে। গ্রামে নাটক নিয়ে যাওযা ও গ্রামে দল গড়ে তোলাব লক্ষ্য হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষের সংস্কৃতিকে জানা এবং বর্তমান সমাজেব জীবনধারাকে বৈজ্ঞানিকভাবে পরিবর্তনের চেষ্টা করা। এ জন্যে মেলা পত্তনের প্রয়োজন। মেলার মাধ্যমে খুব অল্প সমযেব মধ্যে বৃহত্তব জনগণের আচাব-আচরণকে জানা সহজ। মেলাব সময নাটকের মাধ্যমে সাধারণের কাছে জীবন ও সমাজ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য পৌঁছানো যায়। মেলার মাধ্যমে লোক-সংস্কৃতিব নমুনাসমূহের সঙ্গে পবিচয লাভের সুযোগও মেলে।

আজ গ্রামের শোষিত মানুষেরা যদি নিজেদেব অবস্থানটা সঠিকভাবে বুঝতে না পারে এবং সে অবস্থায তাদেব পক্ষে কী কবণীয় তাবা উপলব্ধি করতে না পাবে— তবে আব যাই হোক সমাজ পবিবর্তনেব কথা বলাটা হবে মারাত্মক ভুল। আমাদেব বিবেচনায 'গ্রাম থিয়েটার' গ্রামীণ জনগণকে এ সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম। গ্রামবাসীদের চিত্তে তাদের শোষণের বিবিধ প্রক্রিয়া সম্পর্কে উপলব্ধি দিতে হবে। যাদের উপলব্ধি আছে কিন্তু শ্রেণিচেতনা নেই তাদের শ্রেণিচেতনা দিতে হবে এবং যাদের শ্রেণিচেতনা আছে কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের জন্যে আবশ্যক পূর্বশর্তসমূহ সম্পর্কে ধাবণা নেই তাদের সেই ধাবণা দিতে হবে। আমরা মনে করি, গ্রামবাসীরা যদি নিজেদেব অবস্থানটা মঞ্চে উপস্থিত কবতে পারেন অবস্থাটা ব্যবচ্ছেদ কবতে পারেন এবং শোষণমূলক যে বাস্তবতার মধ্যে তাঁবা কাজ কবছেন তা ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারেন— তবে নিজেরাই নিজেদের উপলব্ধি দিতে সক্ষম হবেন, নিজেদের শ্রেণিসচেতন কবে তুলতে পারবেন এবং শ্রেণি সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন করার আবশ্যক শর্তসমূহ সৃষ্টি করতে পারবেন।

মুক্তনাটক

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধ প্রত্যাগত মধ্যবিত্ত তরুণরা যুদ্ধের অভিঘাতজাত নতুন চেতনায় এই প্রত্যাশা ধাবণ কবেছিল যে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের অবসান হলে ঘটবে সত্যিকারের বিপ্লব, যার ফলে ভূমির পুনর্বণ্টন হবে, সামন্তবাদী কাঠামো ভেঙে ফেলা হবে এবং দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে দেশেরই জনগণ। কিন্তু যখন তারা দেখল তাদের প্রত্যাশা প্রত্যাশাতেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে, গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর কোনো পরিবর্তন হয়নি, দেশের অর্থনীতি বিদেশিদের নিয়ন্ত্রণেই রয়ে গেছে এবং স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ করে একচেটিয়া মুনাফা লুটছে সংখ্যালঘু মুৎসুদ্দিরা, তখন তারা এর বিরুদ্ধে কিছু একটা করতে চাইল।

তাদের এ বাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মাধ্যম হিসেবে তাবা বেছে নিল নাটককে। প্রাথমিক পর্যায়ে তাদেব আদর্শ ও অনুপ্রেরণাব উৎস ছিল কলকাতার গ্রুপ থিয়েটাবগুলো। সে সময (সত্তরেব দশকে) তাদেব বাজনৈতিক বক্তব্য সম্বলিত নাটকগুলো মঞ্চস্থ হত প্রধানত শহব এলাকায। দর্শকবা

(প্রধানত শহুরে মধ্যবিত্ত) নাটক দেখতে দেখতে আবেগাপ্লুত হয়ে উঠলেও নাটক শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যকার আবেগজাত সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং সক্রিয় হয়ে ওঠার তাগিদ সব হারিয়ে যেত। তাদের শ্রেণিগত অবস্থানের যথাযথ বিশ্লেষণ করলেই ব্যাপারটির স্বাভাবিকতা বোধগম্য হয়। ফলে এ নাটকগুলো শিল্প হিসেবে সাফল্য লাভ করলেও প্রত্যাশিত রাজনৈতিক অভিঘাত সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। তরুণ মঞ্চকর্মীরা একদিন অনুভব করল প্রচলিত প্রক্রিয়া তাদের কর্মকাণ্ডকে গ্রাস করে ফেলছে।

এ পর্যায়ে তারা প্রচলিত প্রক্রিয়ার পরিবর্তন সাধন করে নাটককে রাজধানী ঢাকার বাইরে কৃষক-মজুরদের কাছে নিয়ে যায়, যারা দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা নব্বই ভাগ। গ্রামাঞ্চলে খোলা মাঠে অভিনীত হয় তাদের নাটক। হাজার হাজার দর্শকের উষ্ণ অভ্যর্থনা সত্ত্বেও এ প্রক্রিয়াটিও একদিন সমস্যাসংকুল বলে প্রমাণিত হয়। জনগণের জন্যে অভিনয় পরিণত হয় শহরকেন্দ্রিক বামপন্থী দলগুলোর বিপ্লবী প্রচারণা, বক্তৃতা এবং শ্লোগানে। এর প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই সামান্য, কারণ, যে বিপ্লবের কথা বলা হত, তাকে সফল করে তোলার প্রক্রিয়ায় কৃষক-শ্রমিকের কোনো সরাসরি সম্পর্ক সৃষ্টি না হওয়ায়, দর্শকের ভূমিকা পালন ছাড়া তাদের আর কিছুই করার ছিল না। কৃষক-মজুরসহ শোষিত জনতার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে তাদের সচেতন করে তোলার পরিবর্তে এখানে সেই পুরানো পদ্ধতিতে তাদের বলে দেওয়া হত তাদের কী করা উচিত। স্বাভাবিক কারণেই একটি সচেতন গণ-আন্দোলন সৃষ্টির পেছনে সফল ভূমিকা পালনে এ আয়োজন ব্যর্থ হয়। নাটককে আরো বেশি সহজ, সরল ও সর্বত্রগামী করে তোলার লক্ষ্যে পরিবর্তিত হল অভিনেতাদের ভূমিকা। পরীক্ষামূলকভাবে অভিনীত হল 'মুক্ত নাটক'। গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের জন্যে কাজ করবার পরিবর্তে তরুণ নাট্যকর্মীরা অভিনেতার ভূমিকা পরিত্যাগ করে এনিমেটরের ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। তারা তাদের নিজস্ব ইমেজ সৃষ্টির পরিবর্তে ভূমিহীন মজুরদের নিজস্ব নাটক নির্মাণে উৎসাহী করে তোলেন। আগুস্ট বোয়েল যেমন দেখেছিলেন তেমনি আমাদের নাট্যকর্মীরা তাঁদের কাজকে দেখেছিলেন কৃষকদের অপহৃত শিল্প (যা তাদের কাছ থেকে চুরি করে নেওয়া হয়েছিল) পুনর্নির্মাণে উৎসাহ প্রদানের অঙ্গ হিসেবে। তারাই শিল্পের আদি স্রষ্টা (আদিতে কলা ও শ্রম ছিল এক, এটি ঐতিহাসিক সত্য), কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের ধারায় কৃষকের হাত থেকে শিল্প চলে যায় উদ্বৃত্ত লুণ্ঠনকারীর হাতে।

মুক্তনাটকের পুরো কার্যক্রমটিকে মোটামুটি এভাবে ভাগ করা যায়—

১. গ্রামে ভিত্তি স্থাপন, ২. ভূমিহীনদের আস্থা অর্জন, ৩. ভূমিহীনদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ, ৪. সমস্যার বিশ্লেষণ ও নাটকের কাঠামো তৈরি, ৫. ইম্প্রোভাইজিং, বিশ্লেষণ এবং পরিবর্তন সাধন, ৬. গোষ্ঠী অভিনয়, ৭. অভিনয়-পরবর্তী আলোচনা, ফলোআপ এবং মূল্যায়ন।

মুক্তনাটকের বৈশিষ্ট্য

১. অতি অল্প সময়ে কোনো বাস্তব সমস্যা দিয়ে এ নাটক করা যায়। ২. খুবই অল্প খরচে এ নাটক (যা সাধারণ ভূমিহীনদের আনুকূল্যে) মঞ্চস্থ করা যায়। ৩. এ নাটকে পাণ্ডুলিপি, আলোকসজ্জা, অভিনেতা বাছাই ইত্যাদি নেই। ৪. সাধারণ মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ বাস্তব কাহিনি মুক্তনাটকের অলিখিত কাহিনি। ৫. মুক্তনাটক কোনোরকম কলাকৈবল্যবাদের ধার-কাছ মাড়ায় না। ৬. সমাজের সঠিক চিত্র এবং সংগ্রামের প্রেরণা এখানে প্রতিফলিত হয়। ৭. গ্রামের খেটে-খাওয়া মানুষদের (ভূমিহীন এবং শ্রমিকদের) একত্রীকরণ সম্ভব হয়। ৮. একটি সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক ভিত প্রস্তুত করা সম্ভব যেখানে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানো যাবে। ৯. এ নাটকের অভিজ্ঞতায় একজন সাধারণ

মানুষ পরিণত হয় পর্যবেক্ষকে। ১০. ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনা বাদ দিয়ে সমষ্টিগত চিন্তার দৃষ্টি-শক্তিকে প্রসারিত করে। ১১. মুক্তনাটকের মাধ্যমে সমাজের শত্রুকে চিহ্নিত করা সহজ হয়। ১২. সাধারণ মানুষের কাছে শ্রেণি-বৈষম্য স্পষ্ট হতে থাকে, শ্রেণি-দৃষ্টিকোণ স্বচ্ছ হয় এবং শ্রেণি-সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। ১৩. একজন সাধারণ মানুষ বুঝে নেয় শোষকের শোষণনীতির প্রকৃতি।

মুক্তনাটকেব মধ্যে যে স্বাভাবিক দ্বন্দ্বগুলো ফুটে উঠছে, সে দ্বন্দ্বগুলোর বিকাশ চলমান জনজীবনের বিশুদ্ধ ও আলোড়িত জীবনযাত্রাকে রূপায়িত করতে সক্ষম। দ্বন্দ্বগুলোকে যেমন বলা যায়—

ক. কৃষক ও জমিদার-জোতদারদের সংগ্রাম।
খ. শ্রমিক ও মালিকের সংগ্রাম।
গ. শোষণজীবী ও অত্যাচারী শক্তির সঙ্গে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির সংগ্রাম।
ঘ. স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে নিপীড়িত জনতার সংগ্রাম।
ঙ. সার্বিকভাবে এ শোষণ-প্রক্রিয়ার সঙ্গে বৃহৎ শোষণ-প্রক্রিয়ার দ্বন্দ্ব।

শুধু যে সংগ্রাম বা দ্বন্দ্ব, তা নয়, বরং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণের মুক্তির সুস্পষ্ট আভাসও এ নাটকে পাওয়া যায়।

মুক্তনাটকের উদ্দেশ্য

(ক) শোষিত ও নির্যাতিত মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা।
(খ) দেশের জন্যে উপযুক্ত পদ্ধতিতে নিপীড়নমূলক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করা।
(গ) বিশ্বের সকল দেশের শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির আন্দোলনকে সমর্থন দান।
(ঘ) শোষণ ও নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তির লক্ষ্যে মানুষকে রাজনীতি, গণতন্ত্র ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।
(ঙ) দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়ন সাধন করা।
(চ) সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ, সামরিক শাসন. সাম্প্রদায়িকতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা, অপসংস্কৃতি, কুসংস্কার, গোঁড়ামি এবং নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা।
(ছ) সকল মানুষের সৃজনী ক্ষমতার বিকাশ, উন্নয়ন ও তা মানুষের কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে সক্রিয় প্রচেষ্টা চালানো।

মুক্তনাটকের প্রধান বাধা ও কর্মীদের করণীয়

মুক্তনাটকের কাজ— সে কোনো গ্রামের কৃষি এলাকাতেই হোক, বা শিল্প এলাকাতেই হোক, কোনো অবস্থাতেই সহজসাধ্য নয়। কারণ মুক্তনাটকে সঠিক তত্ত্ব আরোপ করে কাজ করতে গেলে শোষকশ্রেণি প্রথম বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং এটাই স্বাভাবিক। কারণ শ্রমজীবী মানুষের চেতনার বিকাশ ঘটানোই মুক্তনাটকের মূল লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্য অর্জন করতে হলে পরশ্রমজীবী শোষকশ্রেণির বাধাকে স্বীকার করে নিয়েই এগিয়ে যেতে হয়। প্রথম অবস্থায় শোষকশ্রেণির অবস্থানগত কারণে অংশগ্রহণকারী মুখ খুলে আসল কথাগুলো বলতে গররাজি থাকে, কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে মুক্তনাটকের দর্শনগত বিষয়গুলোকে তাদের মনে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারলে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তাদের পক্ষে সত্য প্রকাশের পথে সব ধরনের

বাধা-বিঘ্ন দূর হয়ে যায়। মাত্র তিন থেকে চার দিনের ভেতর সাধারণ মানুষের মনে শোষকশ্রেণি সম্পর্কে বিশেষ ক্রোধ জন্ম নেয়, কারণ দীর্ঘদিনের অন্ধত্ব হঠাৎ দূর হয়ে যাওয়ার ফলে জীবনের সকল দৃশ্য তাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়ে। সে ক্ষেত্রে মুক্তনাটকের কর্মীদের দায়িত্ব হচ্ছে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং বুঝিয়ে দেওয়া যে, শোষণকে চিহ্নিত করাই বর্তমানে মূল লক্ষ্য। তাই মূলত দরকার শোষণের প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করা, এবং চূড়ান্ত চিহ্নিতকরণের ফলাফল কী হবে তা আলোচনা করা।

মুক্তনাটকের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার দু-একদিনের মধ্যেই শোষকশ্রেণির ষড়যন্ত্র শুরু হতে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্মীদের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হুমকি আসতে থাকে। কিন্তু অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে গ্রামের মানুষেরা সংগঠিত হয়ে যায়, ফলে সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পরিণত হয়। কিন্তু তা ক্ষণকালের জন্যে। কারণ শোষকশ্রেণি জানে যে এ ধরনের সংগঠিত অবস্থায় যে কোনো পদক্ষেপ জনগণের চিন্তা-ভাবনাকে হঠাৎ করে খুব একটা নাড়া দেবে না, তাই তারা অপেক্ষা করতে থাকে মুক্তনাটকের স্বতঃস্ফূর্ততা কেটে যাবার পরই সুদে-আসলে পুষিয়ে নেওয়ার জন্যে। এ কারণে অনেক জায়গায় দেখা গেছে নাটক শেষ হয়ে যাবার পনেরো দিন অথবা একমাস পর তারা নাটকে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা অভিযোগ এনে তাদের দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রদান করেছে। শোষকশ্রেণির বিরুদ্ধতার পরিচয় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম, তা নির্ভর করে সেই বিশেষ এলাকার পরিস্থিতির উপর। কমবেশি হামলা সব জায়গায় হয়েছে এবং বিভিন্ন এলাকায় তা বিভিন্ন আকারও ধারণ করেছে। কিন্তু একটি ব্যাপার সব জায়গাতেই লক্ষণীয় যে, যে-এলাকার লোক যত বেশি সংগঠিত সে-এলাকার শত্রুদের হামলা ততোধিক শক্তিতে মোকাবেলা করা হয়েছে। যেখানে নাটক হয়ে যাবার পর সাধারণ মানুষের ঐক্য বহাল থাকেনি, সেখানে তাদের বেশি বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং পরবর্তীতে মুক্তনাটকের যে কোনো কর্মসূচি হাতে নেওয়া তাদের জন্যে কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর একটি ব্যাপার অত্যন্ত তীক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে— বাংলাদেশে বিদেশি সাহায্য সংস্থাগুলো, যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের প্রতিনিধিত্ব করছে, তারা এ মাধ্যমটিকে অত্যন্ত সুকৌশলে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে। কারণ তারা জানে যে, বিকল্প সংস্কৃতি হিসেবে এ মাধ্যমটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ। পুষ্টিহীনতা, পরিবার পরিকল্পনা বা তথাকথিত গঠনমূলক ও উন্নয়নমূলক কাজের নামে তারা গ্রামে গ্রামে মুক্তনাটকের এ শক্তিশালী মাধ্যমটিকে ব্যবহার করছে। মুক্তনাটকের কর্মীরা যেখানে গরিবদের পুষ্টিহীনতার মূল কারণ হিসেবে দীর্ঘদিনের শোষণ-প্রক্রিয়াকে দায়ী করে, চিহ্নিত করে, এবং তাকে সমূলে উৎপাটন করার প্রতিজ্ঞায় উপস্থিত হয়, সেখানে বিদেশি সাহায্য সংস্থাগুলোর এজেন্টরা সমস্যার শেকড়ে না গিয়ে (যা তাদের মূল উদ্দেশ্যও নয়) এ.বি.ট্যাবলেট আর প্রচুর শাক-সবজি খাওয়ার ধুঁয়া তুলে বাজার মাত করতে ব্যস্ত। তারা গঠনমূলক কাজের নামে প্রচুর ভূমিহীন কৃষককে প্রকৃত শ্রমজীবী রাজনীতির দর্শন থেকে দূরে সরিয়ে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে সচেষ্ট।

মুক্তনাটক যখন জন্মের শুরুতেই একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, শোষকশ্রেণির এজেন্টরা তখনই উঠে পড়ে লেগেছে তাকে বিপথগামী করতে। তাই এ দেশে মুক্তনাটকের পথিকৃৎ আরণ্যক নাট্যগোষ্ঠীর কর্মীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মুক্তনাটকের কর্মীদের ওপর আজ বিরাট দায়িত্ব এসে পড়েছে প্রচুর সম্ভাবনাময় এ নতুন শিল্প-মাধ্যমটিকে যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার। দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়িয়ে এ কাজ কিছুতেই করা সম্ভব নয়। কারণ, গ্রাম থেকে রাজধানী পর্যন্ত সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে অধিষ্ঠিত শোষকশ্রেণি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রধানত মুক্তনাটকের প্রধান শত্রু। তাই শোষিত ও নির্যাতিত শ্রেণিকে সংগঠিত করার দায়িত্ব মুক্তনাট্য-আন্দোলনের মূল কর্মসূচির সঙ্গে সম্পর্কিত।

তবে, মুক্তনাটক এমন একটি মাধ্যম যাকে যান্ত্রিকভাবে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া দ্বারা বিকশিত করাও প্রায় অসম্ভব। সাংগঠনিক শৃঙ্খলার পাশাপাশি এর শৈল্পিক বিকাশের জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সংগঠনের নেতৃত্বকে সকল সময়ই নাটকের শৈল্পিক উৎকর্ষ সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে। নাটক যদি অধিক বাস্তবতায় দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে জনগণকে সচেতন করার ক্ষেত্রে তা বিশেষ কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে বলে মনে হয় না। শ্লোগান-সর্বস্বতা সর্বক্ষেত্রেই বর্জনীয়। জাতির ইতিহাসে শিল্প-সংস্কৃতির ভূমিকা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মতো প্রত্যক্ষ নয়, তাই শিল্প-সংস্কৃতির একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে 'মুক্তনাটক'কে কীভাবে যুক্ত করা যায়, তা আজকের নাট্যকর্মীদের গভীরভাবে উপলব্ধি করার বিষয়।

পথনাটক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনতত্ত্ব

আজকাল আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রতিটি ক্ষেত্রে 'প্রযোজনবাদ' (pragmatism)-এর প্রভাব দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। মার্কসবাদ এবং বিজ্ঞান যে প্রযোজনতত্ত্বের কথা বলে এ 'প্রয়োজনবাদ' তার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ যে মোটা অর্থে 'প্রযোজনবাদ'-এর প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে, তা হযতো মার্কসবাদের বিকৃতি থেকেই শুরু হয়েছে। কারণ তথাকথিত প্রগতিশীল, মার্কসবাদী এবং সমাজতন্ত্রীদের মধ্যেই এ বিচ্যুতিটা বেশি লক্ষ করেছি। অনেক মার্কসবাদী মার্কসবাদের প্রয়োজনতত্ত্বকে প্রয়োগ করতে গিয়ে মোটা অর্থে 'প্রয়োজনবাদী' হয়ে পড়েছেন। আশু প্রযোজনবোধ মানুষের যথার্থ প্রয়োজনকে প্রতিফলিত করছে কিনা, অর্থাৎ তা সমাজ-প্রগতি, শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী চেতনা ও বিপ্লবের পরিপূরক কিনা— এ সব বিচার করে দেখবার অবকাশ এদের নেই; মার্কসবাদ যে প্রয়োজন বা necessity-র কথা বলেছে এবং বিজ্ঞান যে প্রয়োজনতত্ত্বের কথা বলেছে, সে প্রয়োজনবোধ হচ্ছে প্রগতি এবং সমাজ কল্যাণের স্বার্থে প্রযোজন। সমাজে শ্রেণি-সংগ্রামের বিকাশ, অগ্রগতি এবং বিপ্লবী চেতনার ক্রম-অভিব্যক্তির পথে ব্যক্তির যথার্থ বিকাশ এবং উন্নতির পরিপূরক যে প্রয়োজনবোধ তা-ই হচ্ছে মার্কসবাদ এবং বিজ্ঞানের অর্থে recognition of necessity (প্রযোজনবোধের স্বীকৃতি)। এ প্রয়োজনের সাথে হামেশাই ব্যক্তির সাময়িক প্রয়োজনবোধের বিরোধ দেখা দিয়ে থাকে। এ প্রযোজনের সাথে কখনও কখনও রাজনৈতিক দলের আশু প্রয়োজনবোধেরও বিরোধ হতে পারে।

বর্তমানে রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে যে প্রয়োজনবাদের প্রভাব বেড়ে যাচ্ছে, তাকে এক কথায় বলা যায় নিকৃষ্টধরনের প্রয়োজনবাদ। এই সাময়িক ও আশু প্রয়োজনবোধর তাগিদে তৈরি হয় এমন সব শিল্প-সাহিত্য যা আমাদের প্রযোজন সম্পর্কে মিথ্যা ও অস্বচ্ছ ধারণা দিয়ে থাকে। এ সব শিল্পে গোষ্ঠী-সচেতনতার বদলে ব্যক্তিবুদ্ধির প্রকাশ ঘটে। বুর্জোয়া ভাববাদী শিল্পী-সাহিত্যিক এবং তথাকথিত বিপ্লবী শিল্পী-সাহিত্যিক, যারা মার্কসবাদ এবং বিজ্ঞান যে প্রয়োজনতত্ত্বের কথা বলে সে সম্পর্কে ভুল ধারণা বহন করছে, তাদের এই কুলহীন প্রয়োজনবাদের বিরুদ্ধে আজ তত্ত্বগত সংগ্রাম এবং বাস্তবিক সংগ্রাম— দুটোই পরিচালনা করা প্রয়োজন। কারণ, এ ধরনের শিল্প-সাহিত্য যতই জনগণের কাছে যাবে, জনগণ ততই এ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের ধারণাসমৃদ্ধ 'সাময়িক শিল্প-সাহিত্য' ও 'আশু প্রয়োজনীয় শিল্প-সাহিত্য' মগজে চালান করবে এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে তাদের চিন্তা-চেতনায় ও ধ্যান-ধারণায়।

নাট্যশিল্পীরা যখন তাঁদের নাট্যকর্ম নিয়ে জনগণের কাছে যাবেন, তখন দেখতে হবে যে, সে

নাট্যশিল্প যাতে 'সাময়িক প্রয়োজনবোধ' বা 'আশু প্রয়োজনবোধ'-এর দ্বারা আক্রান্ত না হয় কিংবা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের দ্বারা তাড়িত না হয়। ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য— উভয়েরই জন্ম ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা উদ্ভবের পর। সে জন্যে ব্যক্তির সাময়িক প্রয়োজনবোধের মূল্য আজকে যারা খোলা নাটকের কর্মী, তাদের কাছে মূল্যহীন। শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি ও বিকাশে ব্যক্তির ব্যক্তিগত চিন্তাধারা অপ্রয়োজনীয়, প্রয়োজন সামাজিক চিন্তার প্রক্ষেপণ— যে প্রক্ষেপণে 'সমাজে শ্রেণি-সংগ্রামের বিকাশ ও অগ্রগতি এবং বিপ্লবী চেতনার ক্রম-অভিব্যক্তির পথে ব্যক্তির যথার্থ বিকাশ এবং উন্নতির পরিপূরক যে প্রয়োজনবোধ' তা প্রতিফলিত হবে।

প্রয়োজনবোধের উক্ত প্রতিফলন আমরা খুঁজে পাই আমাদের দেশের পথনাটকগুলোতে। পথনাটক, খোলা নাটকেরই একটি বিশেষ ধারা। পথনাটকের target audience হচ্ছে পথিকবৃন্দ। পথনাটকে সমাজে শ্রেণি-সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের জনগণের কী ভূমিকা নেওয়া উচিত— সে সম্পর্কে পথবাসীকে জ্ঞাত করানো যায়। শুধু তাই নয়, এ নাটকের মাধ্যমে পথগামী নাগরিকবৃন্দকে সমকালীন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে অনেক গোপন তথ্য দেওয়া যায়। পথিককুলের, তথা জনগণের বিপ্লবী চেতনার বিকাশের জন্যে পথনাটক একটি উপযুক্ত মাধ্যম, একটি বিপ্লবী নাট্যক্রিয়া। পথনাটক চলমান মানুষকে বুদ্ধিমান করে, নিজের পারিপার্শ্বিকতাকে বিচার করার ও অনুধাবন করার এবং তার করণীয় কী সে-সম্পর্কে সজাগ করে।

পথনাটকের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১৯৭৭ সালে ঢাকায় প্রথম পথনাটকের চর্চা শুরু করে ঢাকা থিয়েটার। চট্টগ্রামে এর কিছু পরে মিলন চৌধুরী পথনাটক করেন কিন্তু এর অতীত ইতিহাস অনেক দূর বিস্তৃত। প্রাচীনকালেও আমাদের দেশে পথনাটক ছিল। তখন পথনাটক হত দেবতার পূজা উৎসবে শোভাযাত্রায়। পথনাটকের মূল ঐতিহ্য লোকায়ত। লোকধারার পথনাটকও তৈরি হয়েছিল প্রয়োজনের নিরিখে। আজও যে তা বর্তমান তা ওই প্রয়োজনভিত্তিক বলেই। মানুষের জীবনধারণে যে নাটকীযতা আছে, তাকে পূর্ণাঙ্গ ও বিশিষ্টভাবে অনুকরণ করার নামই তো নাটক। আর চলতি পথে দৃশ্যমান যে নাটক, তা-ই পথনাটক। এ নাটক খুঁজতে বিদেশে যেতে হয় না, এ নাটক রয়েছে আমাদেরই দেশের গ্রাম-গঞ্জের পথে-ঘাটে, মেলায়-পার্বণে।

লোকধারার পথনাটকগুলোর মধ্যে গম্ভীরা, খনের পালটিয়া, লেটো, আলকাপ, চোর চুবনি, সঙ, হাটে হাড়ি ভাঙা, কবির লড়াই, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীচৈতন্যের নগর সংকীর্তনকে পথনাটকের আদিরূপ বলতে পারি। প্রায় একশো বছর আগে কলকাতা ও ঢাকা শহরের বিভিন্ন পাড়া থেকে সঙের মিছিল বের হত। কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে পথনাটকের অভিনয় দেখার জন্যে আগে থেকেই দর্শক দাঁড়িয়ে থাকত। পথনাটকের অভিনেতারা ঘোড়ার গাড়ি করে ঘুরতেন। তাঁরা নির্দিষ্ট স্থানে রাস্তায় নেমে অভিনয় করে আবার গাড়িতে উঠতেন। সঙেরা ছড়া কেটে, গান গেয়ে এবং অভিনয় করে দুপাশের দর্শকদের আনন্দ দিতেন। এ প্রসঙ্গে এখানে প্রথম বাংলা রাজনৈতিক পথনাটিকাটির নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি। নাটিকাটির নাম 'হোমরুল', রচনা করেছিলেন মনোমোহন গোস্বামী। এটি কলকাতার জেলেপাড়ার সঙের মিছিলে অভিনীত হয়েছিল। ঢাকার মিছিলেও পথনাটক অভিনীত হত। ঢাকায় পথনাটকের অভিনেতারা গরুর গাড়ির ওপরে এবং রাস্তায় অভিনয় করতেন। পথনাটক পথ-প্রান্তরের নাটক— সে অনেক কথা— পথের যেমন শেষ নেই, তার অনেক গলি, অনেক মোড়, অনেক তার নাম— তেমনি পথনাটকেরও কত ঢঙের কত নাম। লোকধারার কিছু কিছু পথনাটক এখনো জনপদের এতসব ব্যস্ততার মধ্যেও টিকে

আছে— কিছু আশ্রয় পেয়েছে জনশ্রুতিতে, বেঁচে আছে জনগণের স্মৃতিসত্তায়।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ঢাকায় নতুনভাবে পথনাটকের প্রচলন করে ঢাকা থিয়েটার। সেলিম আল দীন রচিত এবং নাসিরউদ্দীন ইউসুফ নির্দেশিত প্রথম পথনাটকটির নাম ছিল 'চব কাঁকড়ার ডক্যুমেন্টারি'। সে সময় ঢাকা থিয়েটার 'নাচাও, বাস্তা নাচাও' নাম দিয়ে পথনাটকের আন্দোলন শুরু করে। প্রশাসন-যন্ত্র এ আন্দোলনকে বানচাল করাব জন্যে তখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। নাটকটি যখন টি.এস. সি.-সংলগ্ন সড়ক-দ্বীপে অভিনীত হচ্ছিল, তখন পুলিশ ঢাকা থিয়েটারের ১১-১২ জন কর্মীকে গ্রেফতার কবে। গ্রেফতারকৃতদেব মধ্যে আমিও ছিলাম। ওই পর্যায়ে ওইটিই শেষ নাটক। তারপর বেশ কয়েক বছব আব রাস্তায় নাটক হতে দেখা যায়নি। ১৯৮০-৮১ সাল থেকে আবার পথনাটক চর্চা শুরু হয়।

সে সময় দেশে চলছিল সামরিক শাসন, স্বৈরাচারী সরকাবেব বিরুদ্ধে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ আন্দোলনে নেমেছে। সাংস্কৃতিক কর্মীরাও অনুভব করল যথার্থ ভূমিকা পালনের তাগিদ। সমাজে শ্রেণি-সংগ্রামেব বিকাশ ও অগ্রগতিব জন্যে তাবা পথে পথে নাটক করতে শুরু করে। সে-সময়কার প্রয় সব পথনাটকই সামরিক শাসন ও স্বৈরাচার-বিবোধী। একটি 'প্রয়োজনবোধ' থেকেই সাংস্কৃতিক কর্মীরা পথনাটকের আশ্রয় নেয়। এ সমস্ত পথনাটক বক্তব্য ও উপস্থাপনার দিক দিয়ে এত বেশি খোলামেলা ও সর্বত্রগামী ছিল যে এব জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলেছিল। আজও এই পথনাটকের দর্শকসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। গত বেশ কয়েক বছর ধরে ফেব্রুয়ারি মাসে শহিদ মিনারে সপ্তাহব্যাপী পথনাটকেব প্রদর্শন চলছে। বাংলা একাডেমীতে একুশের গ্রন্থমেলায় আগত দর্শকদের কাছে এখনও পথনাটক সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

পথনাটক সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কথাও এসে যায়। সে সময় ছাত্র সংগ্রাম পবিষদের এমন কোনো অনুষ্ঠান ছিল না যাতে একটি পথনাটক অভিনীত হয়নি। নাট্যকর্মীরা একটি রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনবোধ থেকেই পথনাটককে বেছে নেন এবং প্রতিবাদ জানানোব একটি সরাসরি মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। তাই পথনাটক, আমাদের বিবেচনায়, নতুন প্রজন্মের কাছে পাল্টা সংস্কৃতি নির্মাণের একটি প্রধান মাধ্যম। ১৯৮৪-৮৫ সালে দেশব্যাপী পথনাটক করতে গিয়ে পাবনাব বেড়া উপজেলায় একটি নাট্য সম্প্রদায়েব দু'জন কর্মী দশ দিন জেল খাটে। হুলিয়া বের হয় ২৯ জনের বিরুদ্ধে। তাদের পথনাটকে সরকার-বিরোধী বক্তব্য থাকায় স্থানীয় প্রশাসন [illegible]ক্ত ব্যবস্থা নেয়। পাংশা থিয়েটার-এব কর্মীরাও পথনাটক করতে গিয়ে নির্যাতনেব শিকার হয়। হওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ, পথনাটক একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সামবিক শাসনের বিরুদ্ধে, তথা সকল প্রকার সামাজিক অন্যায় ও শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলে— গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে অনিবার্য করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে। পথনাটক বস্তুত মঞ্চনাটক, মুক্তনাটক ও গ্রাম থিয়েটার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি নাট্যক্রিয়া— যে নাট্যক্রিয়ার চর্চা আজ একটি সাংস্কৃতিক প্রয়োজনবোধ থেকেই সংগঠিত হচ্ছে।

গণনাটক (পপুলার থিয়েটার)

গণনাটকের কাহিনি : গণনাটক অভিনয়ের জন্যে কোনো লিখিত কাহিনির প্রয়োজন হয় না। এগুলো স্থানীয় কোনো ঘটনা অথবা পার্শ্ববর্তী এলাকায় সংগঠিত কোনো ঘটনা অবলম্বনে অভিনীত হযে থাকে। অনেক সময় একাধিক ঘটনা একত্রে জুড়ে দেওয়া হয়। যাঁরা এ নাটক করেন তাঁদের যেমন ঘটনাটি জানা থাকে তেমনি ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষগুলোকেও তাঁরা চেনেন। ফলে ঘটনাটিকে নাটকেব উপযোগী করে বিন্যস্ত করা, চরিত্রগুলোর জন্যে সংলাপ তৈরির কাজ ইত্যাদি

তাঁরা মুখে মুখেই করতে পারেন এবং অল্প কয়েকটি মহড়াতেই একটি নাটকের অভিনয় সম্ভব হয়ে ওঠে। প্রায়শই গণনাটক যে ঘটনাকে অবলম্বন করে অভিনীত হয় সে ঘটনাটি দর্শকদেরও জানা থাকে। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে সে ঘটনা নিয়ে নাটক করে লাভ কী? এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, শুধু অভিনয়ের মধ্যেই গণনাটকের আসল সার্থকতা প্রতিফলিত হয় না; একে অনুসরণ করে আলোচনা, বিশ্লেষণ, এমনকী যেসব নাটকে দলীয় সদস্যদের পদক্ষেপের ঘটনা থাকে সেগুলোর ক্ষেত্রে ঐ পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে কী অর্জিত হল না-হল তার মূল্যায়ন, তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ এবং ভবিষ্যতে করণীয় কাজ নিয়ে আলাপ হয়ে থাকে।

গণনাটকের মঞ্চ : প্রচলিত নাটকে যে ধরনের মঞ্চ ব্যবহৃত হয় গণনাটকে তার কোনো প্রয়োজন নেই। খোলা মাঠ, স্কুল ঘরের বারান্দা, এমনকী বাড়ির উঠোনেও তা অভিনীত হতে পারে। এর জন্যে প্রয়োজন নেই কোনো দৃশ্যসজ্জার কিংবা অভিনয়ের স্থানটিকে পর্দা বা অন্য কিছু দিয়ে ঘিরে রাখার। এগুলো বরং এ নাটকের জন্যে বাধাস্বরূপ, যার মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। কেননা, এখানে অভিনেতা বা দর্শকবৃন্দ কেউই শুধু বিনোদনের জন্যে সমবেত হন না, তাদের সমাবেশটি শিক্ষাগ্রহণের জন্যেও বটে। তাই এ নাটকে অভিনেতারা অভিনয় করেন চারদিক থেকে দর্শক পরিবেষ্টিত অবস্থায়।

গণনাটকের অভিনয় : গণনাটক প্রকৃত অর্থেই একটি যৌথ কাজ। কোনো বাণিজ্যিক প্রয়োজন কিংবা কারো ভালো অভিনয়কে তুলে ধরার জন্যে নয়, বরং সমস্যাকে তুলে ধরা, সমাধানের পথ খোঁজা এবং পদক্ষেপ গ্রহণের প্রেরণা থেকেই এ নাটকের অভিনয়। এ নাটকের অভিনেতারাই কাহিনিকার, ব্যবস্থাপক ও পরিচালক। প্রত্যেকেই কাহিনি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন, চরিত্রগুলোকে বুঝে নেন, ঘটনা বিকাশের পর্যায় অনুসারে মঞ্চে আসেন এবং সংলাপ বলেন। একজন সংলাপ ভুলে গেলে, কিংবা সঠিক সংলাপটি বলতে না পারলে, অন্য একজন সংলাপ বলার ছলে তা ধরিয়ে দেন। সুতরাং, এ নাটকে কাজে সহযোগিতা করেন। গণনাটকের অভিনয় ঝলমলে পোশাক এবং উগ্র মেকআপ একেবারেই বর্জনীয়। এতে জোর দেওয়া হয় কণ্ঠ ও যতটা সম্ভব দেহভঙ্গির সুষ্ঠু ব্যবহারের উপর। দরিদ্র মানুষের সাধ্যের মধ্যে রয়েছে এমন সব উপকরণই এতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অভিনিষ্পত্তি

বর্তমান আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে স্থিত হওয়া যায় যে, 'খোলা নাটক' হচ্ছে— যাতে সবাই অংশগ্রহণের সুযোগ পায়, অভিনেতা থেকে শুরু করে দর্শক-শ্রোতাবৃন্দ প্রত্যেকে কিছু না কিছু ভূমিকা পালন করে এবং সাংস্কৃতিক প্রয়োজনতত্ত্বের ভিত্তিতে ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিচর্চার খাতিরে 'পাল্টা সংস্কৃতি' গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

তৃতীয় বিশ্বের নাট্যধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, খোলা নাটকের ভাবনা তারা বহু আগেই শুরু করেছে। কেনিয়া, নাইজেরিয়া, জাম্বিয়া এবং আরো কয়েকটি দেশে তারা ঔপনিবেশিক শোষণমুক্তি, জাতীয়তাবাদী চিন্তার উন্মেষ এবং জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের জন্য জনমত গঠনের কাজে নাটককে ব্যবহার করছে। চীনে ১৯৩৪ সালে দেশীয় শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করার জন্যে পিপল্‌স্ আর্মির লোকেরা 'ইয়াংকো' (একটি খোলা নাট্যক্রিয়া) নিয়ে দলে দলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৩৭ সালে জাপানি আক্রমণের মোকাবিলায় শিল্পীদের হাতিয়ার হিসেবে 'ইয়াংকো' এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। তৃতীয় বিশ্বের যে দেশগুলো ঔপনিবেশিকদের আস্তানা ছিল, সে-সমস্ত দেশেই সচেতন সংস্কৃতিকর্মীরা শৃঙ্খল মুক্তির জন্যে

'পাল্টা সংস্কৃতি' নির্মাণেব কাজে নাটককে কাজে লাগিয়েছে। আমাদের দেশে লোকনাট্যের বিভিন্ন মাধ্যম ছিল এ ক্ষেত্রে সরব। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনেব সময় কবি মুকুন্দ দাস সারা বাংলাদেশে স্বদেশি গান ও যাত্রাব এমন এক জোয়াব সৃষ্টি কবেছিলেন, যা দেশপ্রেমিক জনগণেব মধ্যে ব্যাপক প্রেবণাব সৃষ্টি কবেছিল।

এ দেশে মুক্তনাটকের প্রথম অভিযাত্রীদল আরণ্যক বলেছে, 'মুক্তনাটক যদি জনজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাব প্রতিনিধিত্ব কবতে না পাবে, তাহলে তা কাজ করবে জনগণের শত্রুব অস্ত্র হিসেবে।' এ সত্য স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, মুক্তনাটক জনজীবনেব সঠিক চিত্রেব প্রতিফলন ও তাকে এগিয়ে নিতে হলে সামাজিক ভিত্তি ও সমর্থনেব জন্যে কাজ কবাও সমান জরুরি। কিন্তু তাবও আগে দবকার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক শক্তিসমূহের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস এবং নাট্যদলগুলোব যৌথ কর্মকাণ্ড।

আমরা আশা করব, আগামী দিনে গ্রাম থিয়েটার , মুক্তনাটক, পথনাটক, গণনাটক ও গ্রুপ থিয়েটাবের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও যৌথ উদ্যোগে প্রসারিত হবে 'খোলা নাটক'— সৃষ্টি হবে সকল প্রকার অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লডবার জন্যে এক 'পাল্টা সংস্কৃতি'— যে সংস্কৃতি শুধু জনগণের চেতনার স্তরকেই উন্নীত কববে না, ববং একটি বিপ্লবী প্রজাতন্ত্রেব খসড়া নির্মাণের জন্যেও তাদের সচেষ্ট কববে। কেননা, বিপ্লব তখনই সংঘটিত হয় যখন জনগণেব চেতনার স্তর এমন একটি পর্যায়ে উন্নীত হয়, যে স্তরটি একটি বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্তনকে ধারণ করাব জন্যে প্রস্তুত থাকে। নিজেদের ও জনগণের চেতনার স্তরকে সেই পর্যায়ে উন্নীত কবার জন্যে 'খোলা নাটক' আজ এবং আগামীকালের জুতসই নাট্যক্রিয়া।

সূত্র :

১. থিয়েটারের ভাষা, বাদল সবকার।
২. জিজীবিষা, মার্ক্সবাদ ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, শিবদাস ঘোষ।
৩ পথনাটকের কথা, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪. গ্রাম থিয়েটার, মার্চ-আগস্ট, ১৯৮৬ (বিশেষ) সংখ্যা।
৫ 'মুক্ত নাটক : জাতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা', মামুনুব রশীদ।
৬ 'মুক্ত নাটক, আন্দোলন : বৈশিষ্ট্য এবং সীমাবদ্ধতা'— বকুল আশরাফ।
৭. 'গঠনতন্ত্র'— বাংলাদেশ মুক্তনাটক দল। অনুচ্ছেদ ৪,৫।
৮. 'মুক্তনাটক : কিছু কথা ও অভিজ্ঞতা', মান্নান হীরা, মুক্তনাটক, সম্পা. মান্নান হীরা, জুন, ১৯৮৬ সংখ্যা।
৯ 'আরণ্যকের মুক্ত নাটক', শান্তনু কায়সার, প্রাগুক্ত।
১০. 'গ্রাম থিয়েটাব : একটি বিকল্প পাঠশালা'— সাজেদুল আউয়াল, থিয়েটার, সম্পা. রামেন্দু মজুমদাব, জুন, ১৯৮৭ সংখ্যা।
১১. 'The form of Bengali Theatre through thousand years '— A Dhaka Theatre perspective
১২. African Workshop on Theatre for Development, International Popular Theatre Audience.
১৩. Popular Theatre and Popular Organizing in Bangladesh, Kazi Faruque Ahmed.

বাংলাদেশে কমিউনিটি থিয়েটার চর্চা প্রসঙ্গে

লুৎফর রহমান

মহাকালের বিচিত্র বাঁকে নানা জনপদের অসামান্য সব কীর্তিগাথাব সংশ্লেষে রচিত আজকের মানব ইতিহাস। সভ্যতার অধ্রুব সেই ইতিহাসের অনচ্ছ অঙ্গে দৃষ্ট হয় অলঙ্কার। তার রূপকথার প্রসাধন এবং বিচিত্র বিভঙ্গ।[১] তদুপরি সমাজতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠিত সত্য এই যে, সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রত্যুষে প্রাচীন মানবের অর্জন ছিল ধর্মীয় ও উর্বরতার কৃত্য[২] (religious and fertility ritual) এবং গোষ্ঠী চেতনা[৩]। উল্লিখিত গোষ্ঠী চেতনা অর্থনৈতিক উৎপাদনের অমোঘ অনিবার্য প্রয়োজন প্রসূত সত্য। মানব মস্তিষ্কের[৪] ক্রমবিকাশের ধারায় অর্জিত সৃজন ক্ষমতা দ্বাবা উৎপাদন, পুনরুৎপাদন ও জীবন-যাপন পদ্ধতিকে আড়ম্বরপূর্ণ অনায়াস সাধ্য করাব প্রয়াসী মানুষ আবিষ্কার করে তার সংস্কৃতি। বিশেষজ্ঞের ভাষায় 'মুখের ভাষা, ভাব, যুক্তি, শিল্প, চেতনা, লেখার যন্ত্রপাতি, সত্য, নীতিনৈতিকতা, আইন, নীতিশাস্ত্র এবং আদর্শ এইসব কিছুই সামাজিক গুণধর্ম হিসাবে উদ্ভূত'[৫]। উপর্যুক্ত প্রত্যয়সমূহ যে মানব সংস্কৃতির নানান উপকরণ এ সত্য সর্ববাদিসম্মত। বস্তুত সংস্কৃতি বা culture জাতিসত্তার প্রাণময় বিকাশের উৎস[৬]। সঙ্গতকারণেই সাংস্কৃতিক বিবর্তন সমাজ প্রগতির চলমানতার প্রবাহকে রাখে অব্যাহত, বেগবান ও অর্থবহ করে অধিবাসীদের চেতনা জাত সত্যানুসন্ধিৎসা। আলোচ্য ক্ষেত্রে স্মর্তব্য যে, 'জীবন ধারণের বস্তুগত উপায়গুলির উৎপাদনের রীতি (mode) সাধারণভাবে জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক (intellectual) প্রক্রিযাগুলোকে নির্ধারণ করে। মানুষের চেতনা তাদের অস্তিত্বকে নির্ধারণ করে না, তাদের সামাজিক অস্তিত্বই তাদের চেতনাকে নির্ধারণ করে'[৭]। সমাজে ব্যক্তির একক অস্তিত্ব সে কারণেই অকল্পনীয়। সংঘবদ্ধ সমাজ জীবনের বিচিত্র জটিল ও দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে আবর্তিত মানুষ বর্তমানে শিল্পচিন্তায় জটিল জীবন জিজ্ঞাসার সম্মুখীন এবং Community Theatre[৮] সেই জিজ্ঞাসারই সুচিন্তিত ফলশ্রুতি। বাংলাদেশে কমিউনিটি থিয়েটার চর্চার সম্ভাবনা সংক্রান্ত আলোচনায় উল্লিখিত বিষয়সমূহ গুরুত্বসহ বিবেচ্য।

ঐতিহাসিক সত্য এই যে, আধুনিক থিয়েটার তার উদ্ভব ও বিকাশ পর্বেব সামন্ততান্ত্রিক, বুর্জোয়া বিনোদনের সস্তা নির্মোক ছিন্ন করে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের কার্যকর এবং অপরিহার্য শস্ত্ররূপে চিহ্নিত। সুনির্দিষ্ট কোনো জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি অর্থাৎ তাব আত্মার প্রাণময় বিকাশে থিয়েটার নিয়ামক শক্তিরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে সমাজতাত্ত্বিক কারণেই, অনিবার্য বলে। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানসম্মত শিল্প গবেষণায় আজ আন্তঃশৃঙ্খলা পদ্ধতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য বলে বিবেচিত। আলোচ্য পদ্ধতি অনুযায়ী শিল্পবিচারে সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, জাতিতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, সংস্কৃতিবিজ্ঞান এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানের[৯] সমন্বিত প্রয়োগ উন্নত বিশ্বে দীর্ঘদিন যাবত অব্যাহত। অর্থাৎ সমাজ নামক একটি বিকাশমান প্রতিষ্ঠানের অধিবাসীদের আচার-সংস্কার, আচরণ, করণকৌশল, শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা, প্রকৃতিকে নিজস্ব ব্যবহারিক প্রয়োজনে প্রয়োগের মাত্রাগত অবস্থা, নৃগোষ্ঠী সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক, ভাষিক পরিচয়, বিনিয়োগ, বিনিময় নীতি ইত্যাদির অভ্যন্তরে মূর্তরূপ পায় সংস্কৃতি। শিল্প, সমাজ ও সামাজিকের নৈমিত্তিক অভিজ্ঞতার নান্দনিক উপস্থাপনা। ব্যক্তিকে শিল্পের দর্পণে সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা অর্থ তাঁর নিজস্ব সংস্কৃতির রূপরেখাটি পর্যবেক্ষণ করা, তার ক্রটিসমূহ আবিষ্কার ও সংশোধন প্রয়াসী হওয়া। মোদ্দাকথা, সাম্প্রতিক সময়ে শিল্পী, শিল্প-গবেষক, সমালোচক এবং সমাজতাত্ত্বিকের কর্তব্য হওয়া

উচিত নিরক্ষর, নিবন্ন, শোষিত, অধিকার বঞ্চিত মানুষের মৌলিক মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সম্যক ভূমিকা পালন। এর জন্য একটি ঐতিহাসিক সমাজকে তার সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারায় বিচার করা অবশ্য কর্তব্য। অতীতের সঙ্গে তুলনায় বর্তমান রূপটি কতটা উন্নত, সমাজের প্রগতিশীল অংশের শতকবা কতজন প্রশাসন যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন চিন্তাব বাস্তবরূপটি কী, এ সবের পবিপ্রেক্ষিতে যে কোনো সমাজের ভবিষ্যৎ রূপরেখাটি নির্মাণ নিঃসন্দেহে অনায়াসসাধ্য। ইতিহাসেব উক্ত তিনটি কালই ব্যক্তির প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মে শক্তিশালী প্রভাবক এবং ব্যক্তির জীবনে অবিচ্ছিন্নরূপে তারা সহাবস্থান করে। উক্ত ব্যক্তি মানুষটিকে সমষ্টির অংশ রূপে উপস্থাপন শিল্পের অঙ্গীকার। সুতরাং শ্রেণিবিভক্ত সমাজে বিদ্যমান শ্রেণিসমূহের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের স্বরূপ নির্ণয়, উৎপাদন সম্পর্ক, উৎপাদন ব্যবস্থাব প্রকৃতরূপ এবং সমাজে শ্রমজীবী শ্রেণিব অবস্থান, তাদের সাংগঠনিক রূপ ও প্রতিবাদের ভঙ্গিটি থিয়েটারের মাধ্যমে উপস্থাপন করা সম্ভব। সম্ভব, সমাজ পরিবর্তনের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে আপসহীন আদর্শিক সংগ্রামে তাদের সংগঠিত ও সক্রিয় কবা। বস্তুত ইউরোপীয় সমাজেব বিকাশের প্রতিটি স্তরে থিয়েটাব সমকালীন দার্শনিক অভিপ্রায় চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে অনুরূপ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। নব্য ধ্রুপদীবাদ, রোমান্টিকতাবাদ, স্বভাববাদ, বাস্তবতাবাদ, অভিব্যক্তিবাদ, প্রকাশবাদ, প্রতীকীবাদ, স্যুররিয়ালিজম, অ্যাবসার্ডইজম[১০] ইত্যাদি নামের শিল্পমতবাদ বস্তুত স্ব স্ব কালের সামাজিক অভিপ্রায়েরই সূত্রবদ্ধ রূপ। রেনেসাঁস-উত্তর কালে প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্রমাগ্রতির সমান্তবালে বিকশিত হয় সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান। বিশ্বব্যাপী বুর্জোয়া অর্থনীতির চরম বিকাশের কালে উনবিংশ শতকেব মধ্যবর্তী সময়ে সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ রূপ[১১] হিসেবে অভিহিত করার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংগঠনেব মতোই শিল্পের জগতেও ব্যাপক পবিবর্তনের জোয়ার জাগে। বাস্তব সমাজ-সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমস্যাসমূহের কারণ উদঘাটন ও সমাধানের উপায় উদ্ভাবন চিন্তা বাস্তববাদী নাটকের উপজীব্য বিবেচিত হয়। নরওয়ের নাট্যকার ইবসেন, ইংল্যান্ডের নাট্যকার বার্নার্ড 'শ, রুশ নাট্যকার চেখভ প্রমুখ আলোচ্য ধারায় নাটক রচনা করেন।[১২] মঞ্চমায়ায় উক্ত ধারার নাটক উপস্থাপন করেন স্তানিস্লাভস্কি ও তাঁব অনুসারী পৃথিবীর বরেণ্য নাট্য পরিচালকবৃন্দ। শোষিত বঞ্চিত মানুষের অধিকাব প্রতিষ্ঠা, শ্রমজীবী শ্রেণির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে আমরণ থিয়েটার চর্চা অব্যাহত রাখেন জার্মান কবি, নাট্যকার, পরিচালক বের্টল্ট ব্রেখট।[১৩] কালে কালে যুগ চেতনার বিকাশ ও প্রচার কার্যে এভাবেই থিয়েটার এক বিকল্প রাজনৈতিক অথবা বিশেষ মতবাদ বা গোষ্ঠীগত প্রতিষ্ঠান রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বক্ষ্যমাণ কমিউনিটি থিয়েটার তারই নবতর রূপ। কিন্তু এর পরিধি বিস্তৃত তৃণমূল পর্যায় থেকে সমাজের উচ্চস্তর পর্যন্ত। সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে এই থিয়েটারের কার্যক্রম পরিচালিত হয় কমিউনিটি বিশেষের বস্তুগত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে। বক্তৃতার মঞ্চ নয়, থিয়েটার হয়ে ওঠে মানুষের অধিকার অর্জনের যথাযথ ক্ষেত্র। প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কিত আলোচনার পূর্বে কমিউনিটি থিয়েটারের উদ্ভব প্রসঙ্গে সামান্য আলোকপাত জরুবি বিবেচনা করি।

ব্রাজিলিয় নাট্যকর্মী Augusto Boal এবং তাঁর সহকর্মীগণ ব্রাজিলের বিভিন্ন থিয়েটারে ইউরোপীয় রীতির পূর্ণ প্রচলন প্রত্যক্ষ করে স্থানীয় একটি থিয়েটার ফর্ম সৃজনে প্রয়াসী হন (১৯৫৬-৭১)[১৪]। অ্যারিস্টটল থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন যুগে প্রচলিত সমগ্র ইউরোপিয় নন্দনতাত্ত্বিক দর্শনের দর্শনের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ পূর্বক বোয়াল তাঁর নিজস্ব পলিটিক্যাল থিয়েটার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন। তাঁর প্রেরণাস্থল রূপে Paulo Freire-র 'Dialogic Philosophy of Education' (Pedagogy of the Oppressed, 1970) বহুলখ্যাত[১৫]। বোয়াল-এর দর্শন কতিপয় নাট্যিক কলাকৌশলরূপে অভিব্যক্ত। তন্মধ্যে 'Joker system, Forum Theatre

(Story telling techniques), Image Theatre (a technique that privileges physical expression over the spoken word), Invisible Theatre (as a way to continue stimulating debate on current political issues) বিশেষভাবে উল্লেখ্য[১৬]। Theatre of the Oppressed (1974), Latin American Techniques of Popular Theatre (1975), Two Hundred Exercises and Games for Actors and Non-actors (1975) নামের উল্লিখিত গ্রন্থত্রয়ে বোয়াল তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক প্রকাশ করেন। বোয়াল-কৃত dramatic technique-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মন্তব্য নিম্নরূপ : 'Activate passive spectators to become spectactors engaged participants rehearsing strategies for personal and social change'[১৭]। আলোচ্য ধারার থিয়েটার বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই স্বনামে পরিচিত, চর্চিত। সুতরাং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে এর চর্চা নিঃসন্দেহে গুরুত্ববহ।

আডগস্ত বোয়াল-এর অন্যতম অনুসারী John Mcgrath 'British Alternative' এবং 'Brazilian Community Theatre'-কে সমন্বিত করে এই ধারার থিয়েটারের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন— 'Through a series of workshop-based exercises, the human body is used as an expressive tool to represent, non-verbally, a wide repertoire of feelings, ideas and attitudes.

Firstly, it can contribute to a definition, a revaluation of the cultural identity of a people or a section of society, can add to the richness and diversity of that identity.

Secondly, it can assert, draw attention to, give voice to threatened communities, can, by allowing them to speak, help them to survive.

Thirdly, it can mount an attack on the standaridization of culture and consciousness which is a function of late industrial early technological consumerist societies everywhere.

Fourthly, It can be and often is linked to a wider political struggle for the right of a people or a section of a society to control its own destine, to 'self determination'.

Fifthly, It can make a challenge to the values imposed on it from a dominant group— it can help to stop ruling class, or ruling race, or male, or multi-national capitalist values being 'universalized' as common sense. or self-evident truth ; as such, it presents a challenge also to the state's cultural engineers, in ministries of culture, arts councils, universities, schools and the media.'[১৮]

অর্থাৎ, প্রথমত কমিউনিটি থিয়েটার কোনো জাতি বা সমাজের একটি বিশেষ অংশের আবহমান সাংস্কৃতিক পরিচয়কে উদ্ভাসিত করে তার বহুমুখীকরণ ও সমৃদ্ধায়নে সক্ষম।

দ্বিতীয়ত, আগ্রাসন আক্রান্ত কোনো গোষ্ঠীকে ক্রম আত্মলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে তাদের বিকাশ ও প্রকাশকে সুনিশ্চিত করতে পারে।

তৃতীয়ত, সাম্প্রতিক বাণিজ্যিক এবং পূর্বের কারিগরি পণ্য ভোক্তা সমাজের সংস্কৃতি ও সচেতনতার আদর্শায়িত নীতির বিরুদ্ধে কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করে।

চতুর্থত, কমিউনিটি থিয়েটারকে বৃহৎ রাজনৈতিক যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট করা যেতে পারে, যা একটি জাতিকে বা সমাজের বিশেষ অংশকে নিজ ভাগ্যের উপর স্বকীয় অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রবুদ্ধ করে।

পঞ্চমত, কমিউনিটি থিয়েটার একটি গোষ্ঠীকে স্বকীয়তা ও বিশ্বাসে মূর্ত করে। যে শক্তি প্রধান কোনো গোষ্ঠীর মতামতকে চ্যালেঞ্জ করতে শেখায়। প্রধান শ্রেণি বা প্রধান জাতি বা পুরুষ বা সর্বজাতি— ক্যাপিটালিস্ট ভ্যালুজেব যে প্রচলিত ও সার্বজনীন স্বীকৃতি যা প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে গণ্য তার থেকে আত্মস্বরূপে ও গৌরবে মূর্ত হতে শেখায়।

সে কারণেই, কমিউনিটি থিয়েটার রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক মুখপাত্র, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, শিল্প সমিতি (Arts council), বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল ও গণমাধ্যমকে একটি প্রতিশর্ধী শক্তি হিসেবে উত্থিত করতে পারে।

উপর্যুক্ত বক্তব্যেব পবিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী আলোচনায় কমিউনিটি শব্দটির ব্যবহারিক তাৎপর্য উপস্থাপন অতীব জরুরি। সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে সুস্পষ্ট একটি দার্শনিক আদর্শে আস্থাশীল অভিন্ন উদ্দেশ্যে বসবাসকারী জনসমষ্টি সম্প্রদায় বা community[১৯] অভিধা প্রাপ্ত। কার্যত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত জনসমষ্টি সমাজবদ্ধ জীবনের সার্বিক প্রয়োজন মিটাবার উদ্দেশ্যে একত্র বসবাস করে। বিচিত্র রকম আবেগ। অনুভূতি, স্মৃতিকথার দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা তাদের অধ্যুষিত ভূখণ্ড ও তাদের জীবনপ্রণালি সম্পর্কিত বিভিন্ন আচার-ব্যবস্থা নিয়ে গর্ববোধ করে[২০]। সম্ভবত সম্প্রদাযের ঐক্যের ভিত্তি সেই অহংবোধ। বর্ণিত অহংবোধকেই ভিত্তি করে কমিউনিটি থিয়েটার অবশ্য সমাজের নিজস্ব চলনভঙ্গিই নির্ভবতার ক্ষেত্রটি নির্মাণ করে। কেননা সমাজের 'জীবনধারার বাস্তব উপাদানসমূহ (material elements of culture) যত স্বচ্ছন্দে ও দ্রুত পরিবর্তিত হয়, প্রতীকমূলক উপাদনসমূহ (non-material elements of culture) তত সহজে ও দ্রুত পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং বাস্তব উপাদান সমূহের সঙ্গে প্রতীকমূলক উপাদান সমূহের অসম পরিবর্তনজনিত অসঙ্গতি দেখা দেয়।'[২১] নিঃসন্দেহে এটি এক দ্বান্দ্বিক অবস্থা— কারণ সম্প্রদায়ের সকল সদস্যের নিকট উক্ত প্রতীকের যথার্থ অর্থ এক রকম নাও হতে পারে। এমতাবস্থায় সম্প্রদায়েব অভ্যন্তরীণ Ideological পরিবর্তনটা এতদবিষয়ক মতানৈক্য থেকেই সৃষ্টি হয়[২২]। যেহেতু community সরাসরি মিথস্ক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট মাধ্যম যার সাহায্যে সমাজের Ideological ভাবভঙ্গিকে বৃহৎ সামাজিক গঠনের সঙ্গে বিনিময় করা যায়, সেহেতু communities of location ও communities of interest এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানরূপে বিবেচ্য[২৩]। কারণ communities of interest ideologically সুনির্দিষ্ট থাকতে চায় যাতে ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে আগত কোন সম্প্রদায় বিশেষের সদস্যগণ তাদের সাধারণ পরিচিতিটা উপলব্ধি করতে পারে। অন্যদিকে ভৌগোলিকভাবে সীমিত এলাকার মধ্যে সবাসবি মিথস্ক্রিয়ায় সৃষ্ট সম্পর্কেব মাধ্যমে গঠিত হয় communities of location[২৪]। সম্প্রদায় বা কমিউনিটির সদস্যগণ উপর্যুক্ত কারণেই সংস্কারাচ্ছন্ন, এক অনড় পুরাণকেন্দ্রিক সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। সুদীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সারণীতে আছে লোকপুরাণ, ইতিকথা, ধর্মীয়কৃত্য, কথকতা, স্মৃতিকথা, অতিলৌকিক শক্তি সম্পন্ন বিচিত্রনামা দেব দেবী, নিজস্ব আদর্শবোধ, আত্মবক্ষার কৌশল, বীরত্বগাথা, রূপকথা, সৃষ্টি রহস্য, উৎসব, পার্বণ, উৎপাদনের উপায়-উপকরণ, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি। বস্তুত সংস্কৃতির অভ্যন্তরেই ধৃত সম্প্রদায় বিশেষের আত্মিক পরিচয়। কমিউনিটি থিয়েটার সম্প্রদায় বিশেষের সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে তাদেরই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আলোকে নির্মিত। বিশেষজ্ঞের মতে 'The aim is not to create a neo-expressionism, to construct a strange, subjective, individualist style. In this process of image construction, what is important is not to see how one oppressed person sees one oppressor but to find out how the oppressed see the oppressors. If we were compelled to give a name to this approach, we would be forced to call it,

contrarily, social expressionism, objective expressionism etc.[২৫]। সমাজের নিপীড়িত, অত্যাচারিত শ্রেণি কর্তৃক অত্যাচারী শ্রেণির মূল্যায়ন উদ্দেশ্যে সৃষ্ট আলোচ্য মতবাদ সামাজিক প্রকাশবাদ বা উদ্দেশ্যমূলক প্রকাশবাদ অভিধায় চিহ্নিত। সঙ্গত কারণেই সম্প্রদায় বিশেষ নিজস্ব সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে তাদের বিচিত্র সমস্যা চিহ্নিত করে, স্বরচিত পাণ্ডুলিপির মাধ্যমে Image theatre, Forum theatre, Invisible theatre-এ উপস্থাপন করার উপযোগী প্রয়োজনীয় exercise-এ অংশ নেয়। সম্প্রদায় বা কমিউনিটির বহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শক্তিশালী একক বা unit-কে এক্ষেত্রে মাধ্যম রূপে নির্ধারণ করা হয়। ফলত কমিউনিটি থিয়েটার নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের নির্বাচিত জনগোষ্ঠীর চেতনায় উদ্দিষ্ট সম্পর্কে প্রত্যাশিত সাফল্য বয়ে আনে, সৃষ্টি হয় ব্যাপক গণসচেতনতা। অবক্ষয়িত সমাজের সার্বিক পরিবর্তনের সংগ্রামে শোষিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত মানব সম্প্রদায়কে সচেতন করা ও তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে প্রবুদ্ধ কারণে কমিউনিটি থিয়েটার সম্ভবত অদ্বিতীয় থেরাপি। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য ধারার থিয়েটারের উপযোগিতা, বিষয়বস্তু, প্রায়োগিক কলাকৌশল এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনা নিঃসন্দেহে গুরুত্ববহ।

বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার চারিত্র্য পরিচয় উদ্‌ঘাটন নিঃসন্দেহে এক দুরূহ কর্ম। গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সমাজ ভাবাদর্শ, মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক উৎপাদন উপায়-উপকরণ ও পদ্ধতি বিচারে সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতা পুষ্ট। অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল, হৃতদরিদ্র, নিরক্ষর মানুষ আত্ম অসচেতন; নাগরিক সচেতনতা ও অধিকার বোধের সীমাহীন অভাব-জনিত কারণে তারা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসার মতো মৌলিক মানবিক অধিকার বঞ্চিত। ভূত-প্রেত, ডাকিনী, যোগিনী ইত্যকার আধিভৌতিক শক্তিতে বিশ্বাসী। বিচিত্র কুসংস্কার আচ্ছন্ন গ্রামীণ মানুষ জোতদার, মহাজন, অর্ধশিক্ষিত গ্রাম্য টাউটদের দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছে। নির্যাতন, নিপীড়নের শিকার উক্ত অসহায় নাগরিকগণ রাষ্ট্রশক্তিকে খাজনা, ট্যাক্সের মতো নানাবিধ কর প্রদান সত্ত্বেও আইনগত ও বিচার বিভাগীয় কোনোরূপ সহযোগিতা পায় না। সমাজ এবং ধর্ম সম্পর্কিত অন্যদশটি নীতি-নিয়মের মতো শোষণ-পীড়নকেও সে জন্যেই তারা ঈশ্বর নির্ধারিত শাস্তিরূপে দ্বিধাহীন, প্রশ্নাতীত চিত্তে বরণ করে। নাগরিক অধিকার সচেতনতার অভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগেও তারা পরমত নির্ভরশীল— ক্ষেত্র বিশেষে উদাসীনও বটে। বস্তুগত সত্য এই যে, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বসূত্র সম্পর্কে অনবহিত এই গ্রামীণ মানব সম্প্রদায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানবেতর জীবন-যাপন করা সত্ত্বেও স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মোটেও সোচ্চার নয়। প্রতিবাদের শক্তি বিষয়ে তারা অজ্ঞাত, মানসিকভাবে দুর্বল ও অসংগঠিত, স্বভাবে কতকটা আদিম। এমতাবস্থায় কেবল ক্লান্তিহীন শ্রমের মধ্য দিয়ে আয়ুক্ষয় করার মধ্যেই তারা জীবনের সার্থকতা অনুসন্ধান করে। অথচ আবহমান বাঙালির সমৃদ্ধতর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নানা প্রতিকূলতার আগ্রাসন সত্ত্বেও তারাই রক্ষা করে যাচ্ছে অদ্যাবধি। শাস্ত্র অপেক্ষা সংস্কার তাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ বলেই কৃত্য বা ritual-কে প্রাত্যহিক শুভ-অশুভ, মঙ্গল-অমঙ্গলের নিয়ামক মনে করে। যথাযথ ভক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রাকৃতিক ও সামাজিক নানা দুর্যোগে স্মরণ করে কোনো না কোনো দৈবশক্তিকে। জীবনের একদিকে অনতিক্রম্য বঞ্চনা, শোষণপীড়ন, পারিবারিক ও গোষ্ঠীসংঘাত অপর দিকে যূথবদ্ধ জীবনের পারস্পরিক নির্ভরতা, আয়াস, আশ্বাস। দুই ভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কৃষক সম্প্রদায়, কামার-কুমার, তাঁতি-জেলে ইত্যকার পেশায় নিয়োজিত শ্রমজীবী শ্রেণি আজ নিঃস্বপ্রায়। জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণস্পন্দন, রোগ-শোক ও দুর্ভিক্ষের ক্রমনিষ্পেষণে স্তিমিত প্রায়। পেশাগত রূপান্তরের ধারায় উচ্চবিত্তের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটলেও সহস্র বছর পরও অপরিবর্তিত

তাদের উৎপাদন যন্ত্রের মতোই কৃষক, কুমার, জেলে, কামার, তাঁতি প্রমুখের ভাগ্য রয়েছে অপরিবর্তিত।

অপর দিকে বর্ধিষ্ণু নাগরিক জীবনে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণী শ্রমজীবী শ্রেণির শ্রমাত্মসাৎপূর্বক আধুনিক জীবনের বহুমাত্রিক ভোগাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে সদাব্যস্ত। ইউরোপীয় বিজ্ঞান সংস্কৃতির যাবতীয় উপকরণ এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সার্বিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ পূর্বক তারা রুচি ও বোধের নবতর বীক্ষণ দ্বারা এক নগর-সংস্কৃতি গড়ে তোলে। উন্মূল এই সংস্কৃতি বিজাতীয় সংস্কৃতিব নানা উপকরণ নির্বিচাবে গ্রহণ এবং দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বর্জন করতে থাকে অকাতরে। নবোদ্ভূত এই পরিস্থিতিতে গ্রাম এবং নগর জীবনের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয় অতিদ্রুত, এর ফলে গ্রামীণ জীবন মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশের নিগড়মুক্ত প্রোজ্বল-প্রগতির কৌলীন্য লাভে ব্যর্থ হল। দেশের আপামর জনসাধারণের এহেন দুরবস্থায় তাদের মধ্যে অধিকারবোধ জাগ্রত করা এবং রাজনৈতিক সুচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে অনগ্রসর শ্রেণির নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দানের যোগ্য রাজনৈতিক সংগঠন জাতীয়ভাবেই অনুপস্থিত। একই কারণে দেশে বর্তমানে যে-সীমিত গণতন্ত্রের চর্চা অব্যাহত বয়েছে তার মৌসুমি হাওয়া দু-চারজন সৌভাগ্যবানকে স্পর্শ করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সুতরাং সর্বহারা মানুষ সর্বস্ব পুনরুদ্ধারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হবার উপর্যুক্ত মানসিক শক্তি অর্জন করলেও সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক সংগঠনের অভাবে তাদের যে কোনো উদ্যোগ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এমতাবস্থায় উক্ত শ্রেণির রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত একটি দার্শনিক প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত ভবিষ্যৎ শ্রেণিসংগ্রামের উপযোগী বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগঠনের অনুপস্থিতিতে কমিউনিটি থিয়েটার সক্রিয়, কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। এরূপ বিশ্বাসের মূলীভূত কারণ, সর্বক্ষেত্রে বাঙালির দীনতা প্রকট হলেও তার রয়েছে একটি উন্নত সংস্কৃতির সুদীর্ঘকাল বাহিত সমৃদ্ধ ঐতিহ্য। শাস্ত্রগান, কবিগান, পুতুলনাচ, গম্ভীরা, আলকাপ, ভাসান, লীলা, গাজীর গান, ঘাটু, লেটু, কীর্তন, জারি-সারি, নাটগীত, পাঁচালি, ঝুমুর, গীতিকা, যাত্রা, অষ্টক গান. পালা, কথকতা, লক্ষ্মীর গান, যোগীর পালা, বিচারগান ইত্যাদি বাঙালি সংস্কৃতির বিচিত্র উপস্থাপনা। দেশেব প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত এ সব শিল্প গুরু পরম্পরায় সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের সম্প্রদায় বিশেষ কর্তৃক চর্চিত এবং পরিবেশিত হয়ে আসছে। এতদ্‌ব্যতীত রয়েছে রকমারি উৎসব, পার্বণ—যেমন গাজন, রথযাত্রা, নবান্ন, দোলযাত্রা, ভাইফোঁটা, তাজিয়া ইত্যাদি।

বাংলাদেশে বসবাসকারী লঘু নৃগোষ্ঠীসমূহের জীবনচর্চা এখনও গোষ্ঠীভিত্তিক। প্রাকৃত জীবনের যাবতীয় বিশ্বাস সংস্কার সর্বপ্রাণবাদী চাকমা, মারমা, গারো, মান্দাই, হাজং, সাঁওতাল, দালুই, কোচ, বাখাইন, তঞ্চঙ্গা, ম্র, লুসাই, বোম, খেয়াং, খুমী, পাঙখোয়া, চাক, ত্রিপুরা, খাসিয়া প্রমুখ নৃগোষ্ঠী জীবনের নিয়ামক। সর্বপ্রাণবাদী এসব লঘু নৃগোষ্ঠী প্রাত্যহিক শুভ-অশুভের নিমিত্ত বিচিত্র কৃত্য বা ritual পালন করে। উল্লিখিত গোষ্ঠী সমূহের উৎসব বা পার্বণ ভিত্তিক যে কোন উপস্থাপনাই গোষ্ঠীগত উপস্থাপনা বা community presention।

এতক্ষণকার আলোচ্য বিষয়ের ভিত্তিতে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চয়ই অসমীচীন নয় যে, বাংলাদেশে কমিউনিটি থিয়েটার চর্চার ব্যাপক সম্ভাবনা বিদ্যমান। কিন্তু প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালির সমাজ কাঠামোর নিজস্ব গড়ন কমিউনিটি সম্পর্কিত ধারণাকে (concept) একটি জটিল রূপদান করেছে। জীবনযাত্রার ঢঙ, আহার্য, উৎপাদন সম্পর্ক, পোশাক, শাস্ত্রজ্ঞান, কৌলীন্য ইত্যাদি বিচারে হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চতুর্বর্ণে বিভক্ত। বর্ণ-শ্রেণি বিভক্ত সেই সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে সম্প্রদায় ভিত্তিক বিভাজনের আওতাভুক্ত করা অসঙ্গত নয় হয়তো। কাল পরম্পবায় দেখা যায় সেই চতুর্বর্ণের হিন্দুর বংশধরগণ হিন্দু, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব খ্রিস্টান, মুসলমান

ইত্যাদি ধর্ম সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ইউরোপীয় সমাজে সম্প্রদায় সংক্রান্ত ধারণা ঠিক অনুরূপ জটিলতায় আকীর্ণ নয় বলেই ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়েব ভিত্তিতে সমাজ বিশ্লেষিত হয়ে থাকে। সুতরাং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সম্প্রদায় চিহ্নিত করা একটি আয়াসাধ্য কর্ম। তদুপরি কমিউনিটি থিয়েটারের স্বার্থে বিষয়টির প্রতি সচেতন দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে।

ক. ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায় :
❑ হিন্দু সম্প্রদায় ❑ মুসলিম সম্প্রদায় ❑ বৈষ্ণব সম্প্রদায়
❑ বৌদ্ধ সম্প্রদায় ❑ খ্রিস্টান সম্প্রদায়



খ. পেশাগত সম্প্রদায় :
❑ কৃষক ❑ কামার ❑ কুমার ❑ তাঁতি ❑ জেলে ❑ কসাই ❑ ব্যবসায়ী ❑ শ্রমিক ❑ সূত্রধর
❑ কাঁসারি ❑ লাওয়া ❑ শিক্ষক ❑ প্রকৌশলী ❑ চিকিৎসক ❑ ডক শ্রমিক ❑ কারখানা শ্রমিক
❑ রিকশা শ্রমিক ❑ পরিবহন শ্রমিক ❑ মিউয়াল ❑ বাওয়াল ❑ স্বর্ণকার ❑ মজুর
❑ শিল্পী-কণ্ঠশিল্পী-নৃত্যশিল্পী-চিত্রশিল্পী-ভাস্কর-স্থাপত্যশিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক ইত্যাদি।



গ. জাতিতাত্ত্বিক সম্প্রদায় :

বাঙালি

অবাঙালি
(লঘু নৃগোষ্ঠী)
চাকমা-মারমা-ম্র-তঞ্চঙ্গা-খেয়াং-খুমী-গারো-রাজবংশী-পাঙখোয়া-চাক-ত্রিপুরা-সাঁওতাল-খাসিয়া-মান্দাই-কোচ



ঘ. উৎপাদন সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় :
❑ ছাত্র ❑ শিশু-কিশোর ❑ বয়ঃবৃদ্ধ
❑ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ❑ বেকার, ভবঘুরে ইত্যাদি।

সমাজতাত্ত্বিকের গবেষণায় হয়তো আরও কিছু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব গোচরীভূত হবে। কিন্তু বস্তুগত সত্য এই যে, সকল সম্প্রদায়ের সদস্যগণ সমান সচেতন নয়— সামাজিক জীবনেও তারা সংগঠিত নয়। প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই আদর্শিক ঐক্যের অভাব বিদ্যমান যা তাদের সম্প্রদায় রূপে চিহ্নিত করে। এমতাবস্থায় তাদের একটি সাংগঠনিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় এই থিয়েটার কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্য অর্থহীন প্রতিপন্ন হতে বাধ্য। সুতবাং প্রথমেই নির্বাচিত সম্প্রদায়কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার নিমিত্ত তাদেরকে কতিপয় ফোরামের আওতায়

আনয়ন অতীব জরুরি। দ্বিতীয় স্তরে, গঠিত ফোরামের সদস্যদের সঙ্গে অনুসন্ধানী সংলাপ (dia-logue) বিনিময় ও পর্যবেক্ষণের (observation) মাধ্যমে সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহ সনাক্তকরণ। উক্ত আলোচনা, পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা কমিউনিটির প্রাত্যহিক জীবনের এমন গূঢ় সত্যের দ্বারোদঘাটন করবে যা আপাত অভাবনীয় হলেও সম্প্রদায়ের সদস্যগণের জীবনের নৈমিত্তিক অভিজ্ঞতার বিষয়। শোষক-শোষিতের সেই দ্বান্দ্বিক অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমাজতাত্ত্বিক অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, সমাজ-সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে এমন অজস্র সমস্যা রয়েছে যা invisible বা অদৃশ্য। অদৃশ্য বলেই কমিউনিটি বর্হির্ভূত অন্যদশজনেব নিকট তার ভয়াবহতা, ধ্বংসাত্মক রূপ প্রকৃতপক্ষেই অকল্পনীয়। দৈনন্দিন অর্থনৈতিক-সামাজিক-বিচার বিভাগীয় সমস্যাগুলোর অবযব যাদুময় বা magical। কেননা দুঃসহ অবস্থাটিব উত্তরণ ঘটামাত্রই সেই ঘটনাজাত অভিজ্ঞতাটির ভযাবহতা ধীবে ধীরে মানুষের চেতনায় ফিকে হয়ে আসে, আহতচিত্তে জীবনের নবতর কষ্টেব আগমন মুহূর্তের জন্য কম্প্রচিত্তে প্রতীক্ষা করে মানুষ।

শোষিত-নিপীড়িত মানুষের জীবনে একই কাবণে স্মৃতিময় কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। উক্ত অবস্থাব জন্যই তাদের জীবনেব নির্মম সত্যের বিরাট কোনো একটি অংশ অদৃশ্যই থেকে যায়। ফলত সেই অদৃশ্য invisible সত্যকে দৃশ্যমান বা visible করাব পূর্ব পর্যন্ত বিষয়টি সম্প্রদায়েব চেতনায় প্রগাঢ় কোনো ধারণার জন্ম দেয না। এটি এমন এক সত্য যা সম্প্রদায়ের জীবন লীলায় বিস্মৃতিব ক্রম প্রবাহ সৃষ্টি করে। শোষিত সেই বিস্মৃতির সর্বনাশা প্রভাবেই অত্যাচারী শোষককে আবিষ্কাবে ব্যর্থতার সম্মুখীন হয় বারবার। এমনও ঘটে, শোষককে তাব প্রকৃতরূপে আবিষ্কাব কবার পরও তার ব্যক্তিত্ব কিংবা ভালোমানুষ-সুলভ আচরণকেই প্রশ্নাতীতভাবে বিশ্বাস করে এবং অত্যাচারীর পরিকল্পিত ফাঁদে পা দেয় দ্বিতীয়বার। বিষয়টি দৃষ্টান্তসহ পরিষ্কার করা যায় অনায়াসেই। স্বামীব অত্যাচারে গৃহত্যাগী স্ত্রী নিপীড়ক স্বামীর কপট ভালোবাসার ফাঁদে পড়ে অতীত অত্যাচারের স্মৃতি বিস্মৃত হযে পুনরায় তার কাছেই প্রত্যাবর্তন করে। বলা বাহুল্য অত্যল্পকাল মধ্যেই অত্যাচার পীড়নের পুনরাবৃত্তি ঘটে। ক্ষেত্র বিশেষে মাত্রাগত দিক থেকে তা অতীতকেও ছাড়িয়ে যায়। সম্প্রদায বা গোত্র প্রধান, গ্রাম্যমোড়ল, ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, জোতদার, মহাজন, শ্রমিকনেতা, বাজনৈতিক নেতা ইত্যকার নানা অভিধাপ্রাপ্ত সামাজিক শোষণ পীড়নকারীর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য।

অত্যাচারী বা শোষক তার কোনো আদর্শ বা model-এর অস্তিত্বকে অনভিপ্রেত, অগ্রাহ্য বিবেচনা কবে। তার সেই অসহিষ্ণুতার বিকৃত রূপের প্রকাশ ঘটে সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে কোনো প্রগতিবাদী ব্যক্তিব আত্মপ্রকাশ মুহূর্তে প্রদর্শিত হিংস্রতায়। উপর্যুক্ত বাস্তবতায় কমিউনিটি থিয়েটার ফোরামের মাধ্যমে এমন কিছু image সৃজন অভিলাষী যেখানে উক্ত সমাজে বিদ্যমান অত্যাচারী, শোষকের নিখুঁত modelটি মূর্তরূপ পরিগ্রহ করে। শোষিত, নিপীড়িত শ্রেণি (oppressed) তাদের প্রকৃত শত্রুকে তার স্বরূপে প্রত্যক্ষণ পূর্বক বিকল্প রাজনৈতিক (slternative political) প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সক্রিয় ভাবনার অগ্রসর হতে পারে। কমিউনিটি থিয়েটারের আদর্শে বিশ্বাসী কোনো সামাজিক উন্নয়ন সংগঠন সততার সঙ্গে তাদেব লক্ষ্য বাস্তবায়নে আগ্রহী হলে প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হবে প্রতিটি সম্প্রদায়ের সমস্যা সম্পর্কে সম্যক অব্যহিত হওয়া এবং সম্প্রদায় সমূহের সমস্যাবলিব একটি সুনির্দিষ্ট ছক তৈরি। তৈরি ছকের ভিত্তিতে ফোরামের কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রযাস অতীব জরুরি। সুতরাং সম্প্রদায়ের আকৃতি এবং জীবনাচরণ পদ্ধতিই কেবল প্রকৃত দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম। সে ক্ষেত্রে এ সত্যটি অবিস্মরণীয় যে, 'The theatre of the oppressed is about acting rather than talking, questioning rather than giving answers, Analysing rather than accepting. This is a book for all those who are

interested in theatre as a force for change.'[২৬] সুনির্দিষ্ট change বা পরিবর্তন যদি লক্ষ্য হয়, তবে পরিবর্তনের সূত্র সমূহ, সামাজিক দ্বন্দ্ব সমূহ, শোষক-শোষিতের সম্পর্ক, শোষকের রূঢ়তা এবং ক্ষমতার উৎস সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক ধারণা দান করা মূল সংগঠনের কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে Mother Group বা মূল সংগঠনকে অবশ্যই বের্টল্ট ব্রেখটের সেই বিখ্যাত উক্তি বিস্মৃত হলে চলবে না যেখানে তিনি সোচ্চার উচ্চারণে বলেন—

'আমি একজন নাট্যকার
আমি দেখাই
যা আমি দেখি
কেনাবেচার বাজারে
আসল পণ্য মানুষ
কেমন করে তারা একজন আরেকজনের ঘরে ঢোকে
কোন মতলব নিয়ে
বা রবারের মুগুর নিয়ে
বা টাকা নিয়ে
কীভাবে তারা ফাঁদ পাতে একে অপরের জন্য
কীভাবে একজন ফাঁসিতে ঝোলায়
কী করে আগলায় নিজেদের লুটের কড়ি
কীভাবে খায় খাবার
মা কী বলছে ছেলেকে
মালিক কর্মচারীকে
বউ কেমন করে জবাব দিচ্ছে স্বামীকে
দু'একটা নাটক আমি রূপান্তর করেছি
শুধু তাদের সময়ের আঙ্গিকের সঙ্গে
আমাদেরটা মিলিয়ে নেবার জন্য
শ্রমিকেরা যখন কারখানার গেট দিয়ে কাজে ঢুকছে
গেটগুলো মনে হচ্ছে কী উঁচু!
অথচ যখন বেরোচ্ছে ঐ গেট দিয়েই
তাদের মাথা নীচু'[২৭]।

জীবনের নির্মম বাস্তবতার যে চিত্র ব্রেখটের উক্ত কবিতায় বাণীরূপ পেয়েছে তদসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা তাঁর নিজস্ব। তিনি যা প্রত্যক্ষ করেন তাই দেখিয়েছেন। এই দেখা এবং দেখানোর পূর্ণদায়িত্ব কমিউনিটি থিয়েটারের সংগঠক এবং কর্মীগণ পূর্বোক্ত আন্তরিকতার সঙ্গেই পালন করবেন এটাই প্রত্যাশা। অর্থাৎ সম্প্রদায়ের অভ্যান্তরীণ বিচিত্র সমস্যার মূর্তরূপ সম্প্রদায়ের প্রতিটি সদস্যের গোচরীভূত করা এবং প্রকৃত বাস্তবতা থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য পথ বা উপায় সম্পর্কে তাদের নিজস্ব ধারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো এই থিয়েটারের সদস্যদের কর্তব্য বলে বিবেচিত। পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সমাজ প্রেক্ষাপটে কমিউনিটি থিয়েটারের বিষয়বস্তু নিম্নবর্ণিত ছকানুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রথমত মূল প্রসঙ্গসমূহ উল্লেখ্য :

ক. অর্থনৈতিক;
খ. সংস্কারমূলক;
গ. শিক্ষা;
ঘ. লঘু নৃগোষ্ঠী এবং সম্প্রদায় ধারণা;

ঙ. সন্ত্রাস;
চ. নারী ও শিশু নির্যাতন;
ছ. ভূগোল ও পরিবেশ।

ক. অর্থনৈতিক			খ. সংস্কারমূলক
	ধর্মীয় কুসংস্কার		সামাজিক কুসংস্কার
মালিক মহাজন-জোতদার উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদক শোষণ প্রক্রিয়া মিল কারখানা কৃষিক্ষেত্র চাহিদা মুনাফা বাজার উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ কৌশল	গোঁড়ামি, ধর্মীয় বিধির অন্ধ আনুগত্য, পীরপূজা,	ভূত-প্রেত, ডাকিনী, যোগিনী ইত্যাদিতে বিশ্বাস,	ঝাড়ু-ফুঁ-যাদু টোনায় বিশ্বাস, বিজ্ঞান মনস্কতার অভাব জনিত অন্ধত্ব, গোষ্ঠীতন্ত্রে বিশ্বাস, ফতোয়াবাজিকে সমাজের চালিকাশক্তি বিবেচনা, ভাগ্য ও নিয়তির প্রতি অন্ধ বিশ্বাস, অত্যাচারীর বিচারের জন্য ঈশ্বরের নিকট ফরিয়াদ।

গ. শিক্ষা		
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা		ব্যবহারিক জ্ঞান
প্রাথমিক শিক্ষা	উচ্চ শিক্ষা	স্বাস্থ্য-চিকিৎসা-উৎপাদন-নাগরিক অধিকার-সামাজিক অবিচার, আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি, সামাজিক প্রতরণার আগ্রাসন থেকে মুক্তি।

ঘ. লঘু নৃগোষ্ঠী				
নাগবিকতার বোধ জাগ্রত করা।	সর্বপ্রাণবাদী ধারণার ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন।	গোষ্ঠীতন্ত্র ও পিতৃশোভন মূল্যবোধের পরিবর্তন।	উৎপাদন ব্যবস্থায় আধুনিকায়ন।	আধুনিক-সামাজিক জ্ঞান দান।

সম্প্রদায়ের বোধ সম্পর্কিত

'সম্প্রদায়'-এর ধারণাটি পশ্চাদপদ সমাজের, আধুনিক প্রগতিশীল সমাজ অধ্যুষিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই ধারণাটিব পরিবর্তনের আবশ্যকতা সংক্রান্ত বোধ জাগ্রত করা।

ঙ. সন্ত্রাস

সামাজিক সন্ত্রাস			পারিবারিক সন্ত্রাস			
বংশানুক্রমিক শত্রুতা আভিজাত্য	সম্পত্তি অধিকার, দখলদারিত্ব	বলপূর্বক শ্রমশোষণ প্রতিহিংসা	বহুবিবাহ	পণপ্রথা	আধিপত্যবাদ	কৌলীন্য
			পূর্বপুরুষেব অনুসৃত মূল্যবোধ,		জ্যেষ্ঠত্ব বিচারে অধিকার প্রাপ্তি,	

চ. নারী ও শিশু নির্যাতন

ব্যক্তি হিসেবে নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্বীকৃতি।	শিশুশ্রম ও শিশু নির্যাতন বন্ধ করা।
পরিবারে তার স্বাধীন সত্তার বিকাশে সহায়তা দান।	শিশুর মানস গঠনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি।
নারীর শিক্ষার অধিকার সংরক্ষণ।	শিশুব নীবোগ স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা।
নারীর-কর্মক্ষেত্রের সম্প্রসাবণ।	সববকম সামাজিক অপরাধমূলক কার্যক্রম থেকে তাদের দূবে রাখা।
পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তাব মতামত, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, স্বতন্ত্রমত প্রকাশ এবং তদানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ।	দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে জাতিব ইতিহাস-ঐতিহ্যের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ তাদের সামনে নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করা।
পারিবারিক, বৈষয়িক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের কোনো ব্যর্থতার জন্য নাবীকে দায়ী না করা।	পীড়নমূলক শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার পরিবর্তে জ্ঞান অর্জনকে শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্যে পরিণত করা।
তালাক, ফতোয়াবাজি, পাশবিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, ধর্ষণসহ সকল অমানবিক নিপীড়ন থেকে তাদের মুক্ত রাখা। নারী কেবল যৌন-সহচরী নয়, স্বতন্ত্র সত্তাধারী ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন একজন মানুষ— এই উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাকে মর্যাদার চোখে দেখা। তাকে বন্ধু, স্ত্রী, ভগ্নী, মাতা রূপে যথাযোগ্য মানবীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা এবং সে অনুযায়ী আচরণ করার শিক্ষা দান।	জাতীয়তাবোধ, নাগরিক সচেতনা সৃষ্টির প্রয়োজনে তাদের মুক্তবুদ্ধিচর্চাব পরিবেশ দান জরুরি।
	বছরের অর্ধেক সময় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, বাকি অর্ধেক সময় বিভিন্ন ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক স্থানে ভ্রমণের মাধ্যমে তাদের মানসিক ঔদার্য বৃদ্ধি করা সম্ভব। উক্ত সময়ে তাদের বিভিন্নমুখী কারিগরি শিক্ষাও প্রদান করা যেতে পারে।

ছ. ভৌগোলিক পরিবেশ

ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ুর প্রভাবে ভিন্ন জনপদে ভিন্ন ভিন্ন জীবিকা, জনরুচি ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। উৎপাদনের উপায়-উপকরণ. বন্টনের নিযমও সেখানে ভিন্ন ভিন্ন। একই কারণে সামাজিক সংস্কার, পারিবারিক আচাব, নিয়মরীতি ইত্যাদি সাংস্কৃতিক উপকরণ ও ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক। উদাহরণত বলা যায়, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ, জলবায়ুর সঙ্গে উত্তরবঙ্গের স্থানিক (topographical) ও আবহাওয়ার (weather) রয়েছে বিস্তব ব্যবধান। উল্লিখিত ব্যবধানের কারণে উক্ত দুই অঞ্চলের জনজীবন ও সংস্কৃতি আপন আপন বৈশিষ্ট্যগুণে স্বতন্ত্র। পবিবেশ ও ভৌগোলিক কারণে সম্প্রদায়ের জীবনধাবাব পার্থক্য সমূহ অনুধাবনের যোগ্যতা সম্প্রদায়ের সদস্যদের বাস্তব জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে অনায়াসে। প্রকৃতি ও পবিবেশ উদ্ভূত নানা রোগ সংক্রান্ত কুসংস্কার সাধারণত তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। বাতাসে কার্বন, সিসা, সালফার-এব পরিমাণ বৃদ্ধির কুফল তাদের নিকট ব্যাখ্যাতীত অতিলৌকিক শক্তিব লীলা বলে প্রতীয়মান হযে থাকে। অনুরূপ উত্তবাঞ্চলের আয়োডিন স্বল্পতা, দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আর্সেনিক দূষণেব মতো প্রাকৃতিক বিপর্যযের সঠিক কাবণ অজ্ঞাত থাকায় জনজীবনে কুসংস্কারজাত আতঙ্ক সৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয। অনেক রোগ যেমন, কুষ্ঠ, ধনুষ্টংকার, শ্বেতী ইত্যাদি সম্পর্কে পাপজনিত শাস্তি, ভূত-প্রেতেব কুদৃষ্টি, অপদেবতার অভিশাপ এরূপ ধাবণা অশিক্ষাব পাশাপাশি অনগ্রসর জনপদের পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে অনভিজ্ঞতার ফল বলে অভিহিত করা যায়। কমিউনিটি থিযেটাব উপর্যুক্ত বিষয়গুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা কবতে পাবে অনায়াসেই।

অনুসন্ধান করলে আমাদের প্রস্তাবিত বিষযসমূহেব বাহিরেও হয়তো এমন অনেক বিষয় রযেছে যা কমিউনিটি থিয়েটার কার্যক্রমেব অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কিন্তু তা অবশ্যই আরও ব্যাপকতর গবেষণার দাবি রাখে।

কমিউনিটি থিযেটাব কার্যক্রমকে একটি ফলপ্রসূ প্রকল্প রূপে প্রতিষ্ঠা দানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কৌশল সমূহ বিবেচনায আসতে পারে—

১. কমিউনিটি থিয়েটারের প্রবক্তা Augusto Boal প্রতিষ্ঠিত কৌশলসমূহ পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

২. উদ্দেশ্য বাস্তবায়নেব উপযোগী কৌশলগুলোই কেবল প্রয়োগের নিমিত্ত নির্বাচিত হতে পারে।

৩. Augusto Boal সর্বমোট দ্বিশত exercise প্রবর্তন করেন। তন্মধ্যে কমিউনিটি থিয়েটার কর্মীদেব নিকট গ্রহণযোগ্য, অনায়াসসাধ্য ও ফলপ্রসূ exerciseগুলোই ব্যবহৃত হতে পারে।

৪. Augusto Boal কিংবা তাঁর অনুসারীদের অভিজ্ঞতার আলোকে নবতর রূপে কিছু কৌশল বা technique নির্বাচন কবা যেতে পারে।

৫. সামাজিক উন্নয়ন নয, সামাজিক ব্যবস্থাব পরিবর্তন সাধন কমিউনিটি থিয়েটারের

উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রায়োগিক কৌশলগুলির কার্যকারিতা, তাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি পরীক্ষা এবং সমাজ শক্তির নিগড় ভাঙার ক্ষমতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়েই এর কৌশল বা technique ব্যবহার করা কর্তব্য।

৬. অবশ্যই স্মর্তব্য যে, সম্প্রদায়ের সদস্যদের অর্থনৈতিক সঙ্গতির ভিত্তিতেই কার্যপরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

৭. ইউরোপীয় উন্নত দেশ সমূহের সম্প্রদায় সম্পর্কিত ধারণা থেকে বাংলাদেশের সম্প্রদায় সংক্রান্ত ধারণা ভিন্নতর, পরিপ্রেক্ষিতও ভিন্ন। অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসরতার কাবণে এখনও অধিবাসীগণ নানা প্রকার মিথ ও রিচ্যুয়ালেব উপর আস্থাশীল। ফলত কমিউনিটি থিয়েটারের কৌশল রূপে মিথের কাহিনী এবং রিচ্যুয়াল সমূহ ব্যবহৃত হতে পারে। রামকথা, ভারতকথা, গাজীর গান, কৃষ্ণলীলা, মনসাব ভাসান, রাজা হরিশচন্দ্রের পালা, কারবালার পুঁথি, লাঠিখেলা, বলিখেলা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও ময়মনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন পালা, গাজন বা নীলোৎসব, লঘু নৃগোষ্ঠী সমূহের বিভিন্ন কৃত্যমূলক পালা ইত্যাদির রূপান্তরের মাধ্যমে যে সকল সম্প্রদায়ের সমস্যা সংক্রান্ত নিখুঁত চিত্র উপস্থাপন ও তদ্দ্বারা তাদের সচেতন করা সম্ভব। আবহমান বাঙালি সংস্কৃতির মর্মমূলে এ সব পালা, কৃত্যের অবস্থান বিধায় সম্প্রদায়ের দর্শক শ্রোতাব চেতনায় এগুলোর রসগত আবেদন প্রত্যাশিত ফল বয়ে আনবে বলেই বিশ্বাস। তাছাড়া হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙালির শিল্পরস চরিতার্থ হয়েছে গেয়রীতিতে। অর্থাৎ বাঙালির সকল মৌখিক ও লিখিত রীতির সাহিত্যই আদ্যন্ত representa-tional।[২৮] সুতবাং বাঙালি সমাজে প্রচলিত কোনো কাহিনির অভ্যন্তরে protago-nist, antagonist চরিত্রের দ্বন্দ্বের উৎস, দ্বন্দ্বের স্বরূপ এবং তাদের প্রত্যক্ষ সংঘাতের ফল চিহ্নিত করা সম্ভব। এবং অবশ্যই তা যদি হয় সম্প্রদায় বিশেষের সামাজিক বাস্তবতার এমন এক চিত্র বা শ্রেণি বিশেষের পীড়নের বস্তুগতরূপ, পীড়নকারীর বিমূর্ত রূপটিকে মূর্তিমান করে তাহলেই কমিউনিটি থিয়েটারের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। পরিচিত উপাখ্যানে নিজেদের বাস্তব জীবনের শিল্পিত প্রতিফলন অনায়াসেই সম্প্রদায়ের দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হবে। সেই সঙ্গে শ্রেণিশত্রুর প্রতি অন্তরে সুপ্ত ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে, যে কোনো সামাজিক অন্যায় ও পীড়নের বিরুদ্ধে তাদের উচ্চারিত সুতীব্র প্রতিবাদে। সন্দেহ নেই, প্রতিবাদ প্রতিরোধের চেতনাই কেবল কোনো সামাজিক শ্রেণিকে সমাজপরিবর্তনের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে উদ্বুদ্ধ করণপূর্বক সৃষ্টি করে এক একজন সংশপ্তক। উল্লিখিত ক্ষেত্রে প্রতিটি সোশ্যাল টাইপ সম্পর্কে অনুপুঙ্খ জ্ঞান অপরিহার্য।

৮. পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞগণ ক্রীড়ার উদ্দেশ্য, উপযোগিতা ও অন্তর্নিহিত গুণধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে—

❑ Games of skill.

❑ Games of chance এবং

❑ Games of Imitation.'[২৯] এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে Games of skill ও Games of Imitation-এর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গের রয়েছে অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুণে নিম্নলিখিত লোকক্রীড়া সমূহ 'কমিউনিটি থিয়েটার' চর্চায় প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হতে পারে।

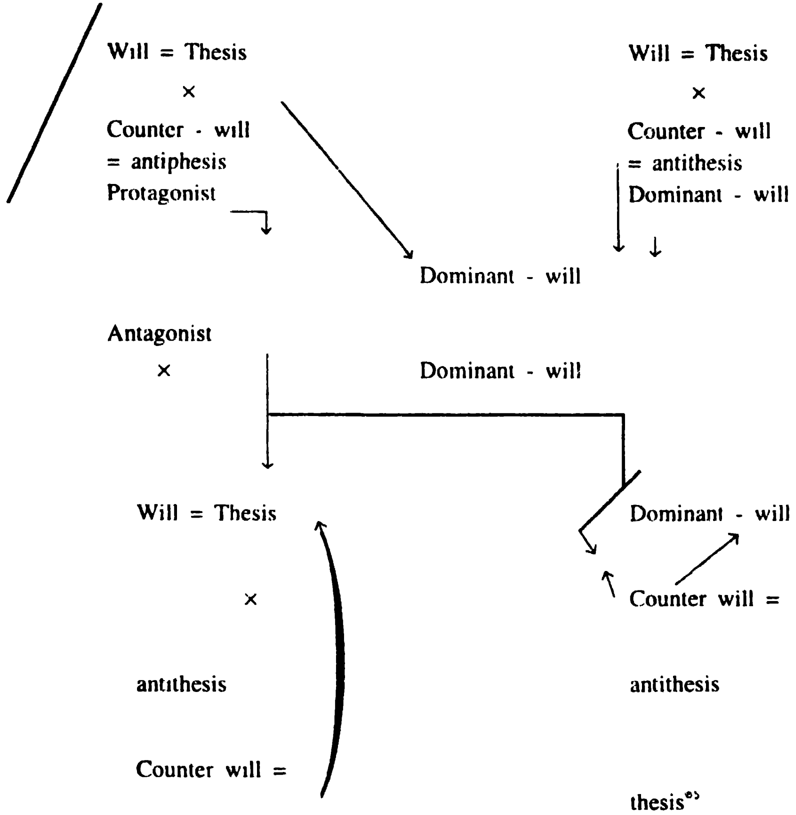
❑ হাডুডু ❑ বউছি ❑ গোল্লাছুট ❑ দাড়িয়াবান্ধা ❑ নুনতা ❑ চিক্কা ❑ এ্যাঙ্গা এ্যাঙ্গা ❑ ডাংগুলি ❑ লাঠিখেলা ❑ গাইগোদানি ❑ সোলঝাপটা ❑ কাদামাটি ❑ বউরানি ❑ কড়িখেলা ❑ ঘুঁটিখেলা ❑ কানামাছি ❑ ছি-ছত্তর ❑ রুমাল চুরি ❑ কুমির কুমির খেলা ❑ বাঘবন্দী ❑ যোলঘুঁটি ❑ চামড়িখেলা ❑ এক্কাদোক্কা ❑ পাতাখেলা ❑ ঢোপের খেলা ❑ হোলডুগ ❑ লাই ❑ তইতই খেলা ❑ পানিঝুপ্পা ❑ ছিলকি ❑ হট্টিহট্টি ❑ আগডুম বাগডুম ❑ ইকড়ি মিকড়ি ❑ ঘূর্ণিখেলা ❑ রাজার কোটাল ❑ ব্যাঙের মাথা ও ❑ চুঙ্গা খেলা'।[৩০]

৯. কমিউনিটি থিয়েটার কার্যক্রম পরিচালনার সাংগঠনিক কাঠামো দুরকম হতে পারে। ক. সম্প্রদায়ের বহির্ভূত সদস্য অর্থাৎ সংগঠকদের অংশগ্রহণে গঠিত থিয়েটার গ্রুপ। খ. সম্প্রদায়ের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত থিয়েটার গ্রুপ।

ক. সম্প্রদায় বহির্ভূত সদস্য দ্বারা গঠিত কমিউনিটি থিয়েটার দল গঠনের ক্ষেত্রে সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে— রাজনৈতিকভাবে সচেতন একদল কমিটেড নাট্যকর্মী হবে এ দলেব সদস্য। শিক্ষা, সংস্কৃতি, রুচি এবং নৈতিক আদর্শে তাঁরা হবেন অবশ্যই অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞ এই নাট্যকর্মীগণ কমিউনিটির সদস্যদের ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য, মানস প্রবণতা, ব্যবহারিক জীবনের বিচিত্র অভ্যাস, খাদ্যদ্রব্য, পানীয়, পারিবারিক জীবনের সম্পর্কের স্তরসমূহ, উৎপাদনের উপায়, উৎপাদন, বণ্টনবিধি, সম্প্রদায়ের শৃঙ্খলায় একটি পরিবারের অস্তিত্ব, অবস্থান, রীতি-নীতি, শাসন-শোষণ প্রণালী, ধর্মবিশ্বাস ও কৃত্যের নানা বিষয় অত্যন্ত নিখুঁতভাবে রপ্ত করবে। অতঃপর কমিউনিটির জীবন ধারার সঙ্গে আত্মসম্পর্ক সৃষ্টির প্রয়োজেন সদস্যদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসবেন যাতে তাঁরা কমিউনিটির সদস্যদের বিশ্বাস অর্জনে সফল হতে পারেন। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য স্মর্তব্য যে, এতদ্দেশীয় নিপীড়িত, শোষিত সম্প্রদায় ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে বিচিত্রভাবে প্রতারিত হয়েছে। নানান রূপে ঘটেছে তাদের বিশ্বাসভঙ্গ। এমতাবস্থায় অগ্রসর শ্রেণির প্রতি তাদের শ্রদ্ধার ঘাটতির সঙ্গে অবিশ্বাসের একটি বহু স্তর ব্যবধান সৃষ্টি সংক্রান্ত বিষয়টিও সংগঠকদের বিবেচনায় স্থান পাওয়ার জরুরি। যদি কোনো কারণে সংগঠনের কোনো সদস্যের আচরণের প্রতি সম্প্রদায়ের সদস্যদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় কিংবা সংগঠকদের মধ্যে আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব দৃষ্ট হয় তবে সম্প্রদায়ের দ্বারা সংগঠনের কর্মসূচি প্রত্যাখ্যাত হবে এ সত্য অনস্বীকার্য। তাছাড়া আলোচ্য দলেব উপস্থাপিত নাটক উদ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের দর্শকদের

নিকট আরোপিত সত্য বলে প্রতীয়মান হতে পারে। শিল্প রসাস্বাদনের নিমিত্ত তার গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও শোষিত, অবহেলিত শ্রেণির মুক্তির সংগ্রামে অবশ্যই তা পরোক্ষ ভূমিকা রাখবে। সুতরাং সম্প্রদায় বহির্ভূত নাট্যকর্মী দ্বারা পরিচালিত দল আলোচ্য থিয়েটারের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য সাংগঠনিক রূপ বিবেচিত হওয়া অনুচিত।

খ. সম্প্রদায়ের সদস্যগণ তখনই একটি থিয়েটার গ্রুপ-এর অন্তর্ভুক্ত হতে মানসিকভাবে সম্মত হবে যখন তাদের নিকট প্রকৃত সত্যটির তাৎপর্য সুপরিস্ফুট হবে— হতে অর্থবহ। আত্মসমস্যা সমাধানেব সুনির্দিষ্ট একটি উপায় রূপে তাদের নিকট থিয়েটারকে তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে। যে সত্য সরাসরি প্রকাশেব সহস্র অন্তরায় বিদ্যমান, যে প্রতিবাদ মুখের ভাষায় কবা অসম্ভব, যে শক্তিধর শ্রেণিশক্রকে সরাসরি প্রতিহত করা দুঃসাধ্য— থিয়েটারের মাধ্যমে তা সুসাধ্য। সম্প্রদায়ের দ্বারা গঠিত থিয়েটার কর্মীদের নিকট থিযেটারেব উক্ত শক্তিব আদ্যন্ত ব্যাখ্যা দান তাদের করবে সক্রিয়। থিয়েটার জীবনের বিশ্বস্ত ও শিল্পিত অনুকরণের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। এর মধ্য দিয়ে নিজেদেব অভাব, অভিযোগ, অধিকাব সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা অত্যন্ত জীবন্তরূপে প্রায অবিকৃতভাবে উপস্থাপন করার বিষয়টি নাট্যকর্মীদের ধারায় পবিষ্কার করা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ থিয়েটারের শক্তির পাশাপাশি থিয়েটার কর্মীর আদর্শ নিষ্ঠা, সচেতনতা, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা, কর্তব্যজ্ঞান, সততা, সমাজ উন্নয়নে তাঁদের দৃঢ় অঙ্গীকার সম্পর্কিত বিস্তারিত শিক্ষায ফোরামেব সদস্যদেব শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন। উল্লিখিত শিক্ষায় প্রশিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত নাট্যকর্মীগণ আত্মশক্তিতে বলীয়ান হবে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বিভিন্ন সেমিনার, প্রশিক্ষণ কর্মশালা, অনুশীলন কার্যক্রম, আলোচনা অনুষ্ঠান, সামাজিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ, উদ্বৃত্ত আত্মসাতের নিয়মাবলি ব্যাখ্যা ইত্যাদির মাধ্যমে সম্প্রদায়ের নাট্যকর্মিগণকে নিজেদের বর্তমান অবস্থান, অতীত অবস্থা এবং এ দুয়ের সমন্বয়ে শোষণমুক্ত, সামাজিক অবস্থা সম্পন্ন ভবিষ্যৎ নির্মাণেব উপযোগী বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ী কর্মীবাহিনী সৃষ্টি করা সম্ভব। সমাজ পরিবর্তনের অঙ্গীকাব যেহেতু mother সংগঠনের উদ্দেশ্য সেহেতু সম্প্রদায়ের সকল সদস্য, বিশেষত থিয়েটার ফোরামের সদস্যদের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের খুটিনাটি বিষয, শ্রেণি সংগ্রাম, শ্রেণিস্বার্থ ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দান করতে হবে। শোষিত, সর্বহারা শ্রেণির সঙ্গে শোষক সম্প্রদায়ের সম্পর্ক নাট্যকাহিনীর উপজীব্য হলে সেক্ষেত্রে পূর্বোক্ত প্রশিক্ষণ ধারায় নাট্যকর্মী অর্থাৎ Protagonist Actor, Spec-actor উভয়েই সামাজিক জীবনে তাদের করণীয় সম্পর্কে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবতে পারে। এ কথা সর্বসম্মতসত্য যে, কমিউনিটি থিয়েটার চিন্তার উৎস মার্কসীয়-দর্শন, স্তানিস্লাভস্কির pshcyo-technique এবং ব্রেখটের alleanation theory। সুতরাং Augusto Boal-কৃত নিম্নবর্ণিত সূত্রটি শুধু কমিউনিটি থিয়েটার কর্মীই নয় সকল থিয়েটার কর্মীর জন্যই আত্মস্থ করা আবশ্যক বিবেচনা করি।



পূর্বোক্ত সূত্রানুযায়ী প্রাথমিক বিবেচনায় একজন পীড়নকারীর উদ্দেশ্য পীড়ন করা বা শোষণ করা নয়। তার উদ্দেশ্য প্রভূত্ব অর্জন বা ক্ষমতাবান হওয়া, ঐশ্বর্যবান হওয়া, নিজেকে সমাজের কিংবা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা। ব্যক্তি হিসেবে তার আলোচ্য আকাঙ্ক্ষা দোষণীয় কিছু নয়। কিন্তু ব্যক্তি ঐ স্বাধীন ও সাধারণ ইচ্ছা চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে মানবিক গুণাগুণ বিসর্জন দিয়ে যখন মরিয়া হয়ে ওঠে তখনই তাকে অত্যাচারী হিসেবে সনাক্ত করা যেতে পারে। এই অত্যাচারী বা পীড়নকারী প্রাথমিক অবস্থায় protagonist রূপেই অভিহিত। তার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে নিপীড়িত শ্রেণি দ্বারা যখন তিনি পীড়নকারী হিসাবে প্রতিরোধের সম্মুখীন হন তখন তাকে সমাজ-প্রগতির বিপরীতে একজন প্রতিক্রিয়াশীল Antagonist রূপেই আবিষ্কার করি। উক্ত antagonist চরিত্রের will বা আকাঙ্ক্ষা এক পর্যায়ে Counter will এ পরিণতি পায়। কারণ তখন শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্রের উদ্দেশ্যটিই মুখ্য হওয়ার ফলে তা protagonist চরিত্রের will রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এভাবেই thesis, antithesis-প্রক্রিয়ায় একটি নাট্যকাহিনীর রস নিষ্পত্তি ঘটে। আমাদের বিবেচনায় কমিউনিটি থিয়েটার কার্যক্রম উক্ত সামাজিক দ্বান্দ্বিক অবস্থার চিত্রটিই দর্শকের (oppressed) সম্মুখে উপস্থাপন করবে। যদি তা নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয় তবে কমিউনিটির আর্থ সামাজিক অবস্থার একটি পরিবর্তন

তাদের বিপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমেই সম্ভব— সম্ভব সমাজে শোষিত শ্রেণির সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা।

এতক্ষণকার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসমীচীন নয় যে, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় কমিউনিটি থিয়েটার চর্চার এটাই শ্রেষ্ঠ সময়। শ্রেণি অধ্যুষিত বুর্জোয়া বিকাশের এই চরম মুহূর্তে বিজ্ঞান-সংস্কৃতির আগ্রাসনের পাশাপাশি সামন্ততান্ত্রিক পিতৃশোভন মূল্যবোধের গোঁজামিল শোষিত নিপীড়িত শ্রেণিকে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর করছে প্রতিনিয়ত। মুদ্রাস্ফীতি, অপরিমেয় উদ্বৃত্ত আত্মসাতের লাগামহীন স্রোতে ভেসে যাচ্ছে শ্রমজীবী শ্রেণি, তাদেব মধ্যে অধিকার সচেতনতা জাগ্রত করে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে অংশগ্রহণের উপযোগী সাংগঠনিক দৃঢ়তায় তাদের একত্রীকরণ প্রয়াসে উদ্যোগী কোনো রাজনৈতিক সংগঠন জাতীয়ভাবেই অনুপস্থিত। এমতো পরিস্থিতিতে একটি বাজনৈতিক বিপ্লবের নিমিত্ত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রস্তুতি গ্রহণ অপরিহার্য। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে, প্রকৃত মার্কসবাদী রাজনৈতিক সংগঠন এবং বিপ্লব সংঘটনের উপযোগী কর্মীবাহিনী সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে এ ধরনের পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে অর্থহীন। কারণ গণসচেতনার স্বাভাবিক প্রবণতাই হচ্ছে তা প্রচলিত সকল বন্ধন শৃঙ্খল ভেঙে মুক্ত আলোর দিগন্তাভিসারী হতে চায়। সে ক্ষেত্রে community-র সদস্যদের সচেতনতাকে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে আশু বিপ্লবের উপযোগী করা প্রয়োজন— অন্যথায় তাদের সদ্যজাগ্রত চেতনা কোনো ভ্রান্ত আদর্শ দ্বারা আক্রান্ত এবং শোষক শ্রেণির স্বার্থরক্ষায়ই ব্যবহৃত হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায় T.C.S.D পরিচালিত 'কমিউনিটি থিয়েটাব' চর্চা— সংস্থার উদ্দেশ্য বাস্তবয়ানে কতটা সহায়ক হবে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। কেননা অধিকার সচেতনতা যে রাজনৈতিক বোধের উন্মেষ ঘটায় তার শক্তি প্রবল— সে হয় কোনো নতুন ভুবন সৃষ্টির প্রয়াসী হবে না হয় আত্মধ্বংসকে করে তুলবে অনিবার্য। সুতরাং 'Theatre centre for social development'-এর কর্মকর্তাগণ যদি সামাজিক উন্নয়ন কল্পেই উক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকেন তবে তাঁদের অপরিহার্য কর্তব্য কোনো শরিক সংগঠন গড়ে তোলা বা অনুসন্ধান করা। যে সংগঠন সাংস্কৃতিকভাবে সংগঠিত, সচেতন, শিক্ষিত নাট্যকর্মীদের দেবে রাজনৈতিক সচেতনতা ও দিক নির্দেশনা, নিরাপত্তা, সমাজ পরিবর্তনের প্রণোদনা এবং দার্শনিক জ্ঞান।

গ্রন্থসূত্র :

১. লুইস হেনরি মর্গ্যান, এনসিয়েন্ট সোসাইটি (১ম পর্ব), প্রথম বঙ্গানূদিত সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৯৩, সম্পাদনা অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক : রেণুকা সাহা, দীপায়ন, ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯।

২. Kenneth M Cameron, A Guide to Theatre Study (Second edition) Theodore J. C Hoffman, Page . 36.

৩. লুইস হেনরি মর্গ্যান, প্রাগুক্ত।

৪. নন্দিকেশ্বর, অভিনয় দর্পণ; অনুবাদ : সেলিম আল দীন, প্রথম প্রকাশ : ১৬ অগ্রহায়ণ ১৩৯৬, কথা প্রকাশন, ৪ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৫. ক্রিস্টোফার কডওয়েল, ফার্দার স্টাডিজ ইন এ ডাইং কালচার, পৃষ্ঠা. ২১, অনুবাদ : রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৮, প্রকাশক : সুনীলকুমার ঘোষ এম. এ. পপুলার লাইব্রেরি, ১৯৫/১ বি, বিধান স্মরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬।

৬. গোপাল হালদাব, সংস্কৃতিব রূপান্তর, মুক্তধারা, বাংলাদেশ সংস্করণ (২য়) মে ১৯৮৪; পৃষ্ঠা ৩৮।

৭. ক্রিস্টোফার কডওয়েল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭।

৮. Baz Kershaw, The Politic of Performance, Radical Theatre as Cultural Intervention,

Page 29, First published 1992 by Routledge, 11, New Fetter Lane, London, EC4P AEE

৯. Aesthetics Art Life, Translated by. Sergari Syrovatkin, Edited by A Zis Raduga Publishers, Moscow, 1988

১০. Oscar G Brockett, The Theatre an Introduction, (Third Editional Copyright 1974 by Hoit Rin-Ehart and Winston,) Ind

১১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩১২।

১২. Allardyce Nicoll, World Drama, Page 503-515, First Published in Great Britain 1949, By George G. Harrap and Co Ltd

১৩. Walter B Benjamin, Understanding Brecht, P VII Introduction, VER SO, London, New York 1970

১৪. Playing Boal, Edited by Mady Schutzman and Jan Cohen Cruz, Page 1-2, First Published 1994 by Routledge 11 New Fetten Lane, London EC4P 4EE.

১৫ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১-২।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১-৩।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১।

১৮. Baz Kershaw, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১।

১৯. Oxford Advanced Learner's Dictionary, Page 223,

২০. পবিমলভূষণ কব, সমাজতত্ত্ব, পৃষ্ঠা ১২৭, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৭৪, প্রকাশক : পশ্চিমবঙ্গ বাজ্য পুস্তক পর্ষদ, আর্য ম্যানসন, ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা : ৭০০০১৩।

২১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫১০।

২২. Baz, Kershaw, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১-৩।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩১-৩৬।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩১-৩৬।

২৫. Augusto Boal . Games for Actors and Non Actors, Page 169, First published in 1992 by Routledge, 11, New Fetter Lane, London EC4P 4EE.

২৬. প্রাগুক্ত P-Translators Introduction - xxiv

২৭. বাবলু দাশগুপ্ত সম্পা ঃ গণনাট্য, শারদ-১৯৯৮, বের্টোল্ট ব্রেশট; দেখি, দেখাই, ভাষান্তব : অশোক মুখোপাধ্যায়।

২৮ সেলিম আল দীন, মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য, দ্রষ্টব্য : প্রথম অধ্যায়, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৬।

২৯. ওয়াকিল আহমেদ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, পৃষ্ঠা ঃ ৪১৭-৪১৮, প্রকাশকাল : অক্টোবর ১৯৭৪, প্রকাশনায় : ফজলে রাব্বি, পরিচালক, প্রকাশন-মুদ্রন-বিক্রয় ডিভিশন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১৭-৪১৮।

৩১. Augusto Boal, Games for Actors and Non Actors, Page · 52, First published in 1992 by Routledge, 11, New Fetter Lane, London EC4P 4EE.

আই টি আই ও বাংলাদেশ

রামেন্দু মজুমদার

১৩ই মার্চ, ১৯৮২। নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের তদানীন্তন কার্যালয়ে নাটকের বিভিন্ন ক্ষেত্রেব কয়েকজন মিলিত হয়ে ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইন্সটিটিউট (আই টি আই)-এর বাংলাদেশ কেন্দ্র স্থাপনের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সূচিত হল বিশ্ব নাট্যাঙ্গনের সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগের এক নতুন অধ্যায়। সব শুরুর পেছনেই একটা ইতিহাস থাকে, আই টি আই-ও তার ব্যতিক্রম নয়। ১৯৮০-তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে একদিন নিউ ইয়র্কের লা মা মা থিয়েটারের কৃষ্ণাঙ্গী পরিচালক এলেন স্টুয়ার্টের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। অসাধাবণ কর্মোদ্যোগী এই মহিলা তাঁর কাজের কথা শোনাবার মাঝে আই টি আই-র প্রসঙ্গ তুললেন এবং আমাদের দল নিয়ে আসন্ন তৃতীয় বিশ্ব নাট্যোৎসবে অংশ নেওয়ার জন্যে উৎসাহিত করলেন। ১৯৮১-ব মার্চে আমরা আই টি আই-র তদানীন্তন তৃতীয় বিশ্ব কমিটির উদ্যোগে সিউলে ৫ম তৃতীয় বিশ্ব নাট্যোৎসবে আমাদের নাটক 'পায়েব আওয়াজ পাওয়া যায়' নিয়ে যোগ দিতে সমর্থ হই। সেখানে আই টি আই'র তখনকার সেক্রেটারি জেনারেল লার্স এফ মামবোর্গ-এর সাথে আলাপ করে বাংলাদেশে আই টি আই-র একটি কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে প্রস্তাব করি। কিন্তু বাংলাদেশে পেশাদারি থিয়েটার নেই বলে আই টি আই-র কেন্দ্র স্থাপন সম্ভব হবে না বলে সেক্রেটারি জেনারেল অভিমত দেন। আমি তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে আমরা নাটকে পেশাদার হতে পারি না সত্যি, কিন্তু নাটকটা আমরা করতে চেষ্টা করি পেশাদারি দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতা নিয়ে। এ প্রসঙ্গ নিয়ে আমাদের পত্র বিনিময় চলার পর ১৯৮১-র ৩রা নভেম্বর আই টি আই-র নির্বাহী পরিষদ বাংলাদেশকে সহযোগী সদস্য হিসেবে গ্রহণ করতে সম্মত হয়।

ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইন্সটিটিউট, যা আই টি আই হিসেবেই সমধিক পরিচিত, ইউনেস্কোর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং বর্তমানে নাটকের ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ একক সংগঠন। ১৯৪৬ সালে প্যারিসে ইউনেস্কোর প্রথম সাধারণ সম্মেলনেই একটি আন্তর্জাতিক থিয়েটার ইন্সটিটিউট স্থাপনের লক্ষ্যে নাট্য বিশেষজ্ঞদের একটি আন্তর্জাতিক সভা আহ্বানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরের বছর প্যারিসে সে সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এ ধরনের একটি ইন্সটিটিউট স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সবাই একমত হন। ইন্সটিউটের একটি খসড়া গঠনতন্ত্রও সভায় প্রণীত হয়। ১৯৪৮ সালেব জুনে প্রাগে অনুষ্ঠিত হয় আই টি আই-র প্রথম কংগ্রেস। আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হয় এই প্রতিষ্ঠানের। শুরুতে ১২টি দেশ ছিল এই ইন্সটিটিউটের সদস্য। ১৯৭৩-এ পঞ্চাশ পেরিয়ে আজ বর্তমানে আই টি আই-র সদস্য সংখ্যা প্রায় একশতের কাছাকাছি।

আই টি আই-র প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাট্যকর্মীদের মধ্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্ব জোরদার করা। আই টি আই যেমন একদিকে আন্তর্জাতিকতাকে উৎসাহ দেয়, অপরদিকে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব নাট্য ঐতিহ্যের লালন ও বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

শুরু থেকেই আই টি আই-র সদর দফতর প্যারিসে অবস্থিত। ইউনেস্কো ভবনে আই টি আই-র সদর দফতরটি কিন্তু আয়তনে বেশ ছোটো, এখানে স্থানাভাব প্রকট। অনেক দেশের আই টি আই কার্যালয় কিন্তু কেন্দ্রীয় দফতরের তুলনায় বেশ বড়ো ও জাঁকজমকপূর্ণ। কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক কর্মী মাত্র দুজন— একজন সেক্রেটাবি জেনারেল এবং তাঁর একজন নির্বাহী সহকারী। ইউনেস্কোর অনুদান ও

জাতীয় কেন্দ্রগুলোর বার্ষিক চাঁদায় আই টি আই-র সদর দফতর চালাতে হয় বলে এর আয়তন বা কর্মীসংখ্যা আর বাড়ানো সম্ভব হয় না। ইতোমধ্যে ইউনেস্কো সিদ্ধান্ত নিয়েছে ১৯৯৬ সন থেকে তার এন জি ও সমূহকে অনুদান দেওয়া বন্ধ করে দেবে। এতে করে আই টি আই-ব অর্থ সংকট আরো বেশি সম্ভাবনা হওযার দেখা দিয়েছে।

প্রতিবছর ২৭শে মার্চ আই টি আই-র উদ্যোগে বিশ্ব নাট্য দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই দিনটি প্রবর্তনের একটা ইতিহাস আছে। ১৯৬১ সালে ভিয়েনায় আই টি আই-র নবম বিশ্ব কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল: সে কংগ্রেসে বিশ্ব নাট্য দিবস হিসেবে একটি দিন বেছে নেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্থির হয় পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬২ সালেব যে দিন প্যারিসে থিয়েটার অব নেশানস্-এব উদ্বোধন হবে সে দিনটাই পালিত হবে বিশ্ব নাট্য দিবস হিসাবে। সেই থেকে চালু হল— ২৭শে মার্চ বিশ্ব নাট্য দিবস।

বিশ্ব নাট্য দিবসেব একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রতি বছর এ দিবস উপলক্ষে বিশ্বের একজন ববেণ্য ব্যক্তিত্ব (সাধারণত নাটকের ক্ষেত্রের) আন্তর্জাতিক বাণী দিয়ে থাকেন। প্রথম বছরের বাণী দিয়েছির্লেন জাঁ ককতু, আর এ বছরের বাণীর রচয়িতা ভাৎস্লাভ হাভেল। অন্যান্য বছর যাঁরা বাণী দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আর্থার মিলার (১৯৬৩), লরেন্স অলিভিয়ের ও জাঁ লুই বারো (১৯৬৪), হেলেনে ভাইগেল (১৯৬৭), পিটাব ব্রুক (১৯৬৯ ও ১৯৮৮), পাবলো নেরুদা (১৯৭১), রিচার্ড বার্টন (১৯৭৪), এলেন স্টুয়ার্ট (১৯৭৫), ইউজিন আয়োনেস্কো (১৯৭৬), ওলে সোইংকা (১৯৮৬), জর্জ লাভেলি (১৯৯২) এবং এডয়ার্ড অ্যালবি (১৯৯৩)।

প্রতি দুবছর পরপর আই টি আই-র বিশ্ব কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এটাই সংগঠনের সর্ববৃহৎ একক তৎপরতা। ৬ দিনব্যাপী অনুষ্ঠেয় এ কংগ্রেস আয়োজনের যাবতীয় দায়িত্ব পালন ও ব্যয় নির্বাহ করতে হয় স্বাগতিক দেশকে। গতবছব মিউনিখে অনুষ্ঠিত আই টি আই-র ২৫তম বিশ্ব কংগ্রেসে ৬৩টি দেশ থেকে ৩৭০ জন প্রতির্নিধি অংশ নিয়েছিলেন। খবচ হয়েছিল প্রায় সোয়া পাঁচ লাখ ডলার। মিউনিখ কংগ্রেসের বাজেটের ২০% খরচ হয়েছে তরুণ নাট্যকর্মীদের ওয়ার্কশপ আয়োজনে। প্রতি কংগ্রেস উপলক্ষে দুসপ্তাহেব ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। প্রায় ৫০ জন তরুণ নাট্যকর্মী (এবার নৃত্যশিল্পীও ছিলেন) ৪/৫টি দলে বিভক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালকদের অধীনে এ ওয়ার্কশপে কাজ করে থাকেন। বাংলাদেশ থেকে মিউনিখে গিয়েছিলেন আজিজুল হাকিম। এর আগের ওযার্কশপে অংশ নিয়েছিলেন শর্মিষ্ঠা রহমান ও আসিফ মুনীর।

প্রথম বিশ্ব কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৮ সালের আগে। এরপর থেকে কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে জুরিখ, প্যারিস, অসলো, দি হেগ, দাবারোভ্‌নিক, এথেন্স, হেলসিংকি, ভিয়েনা, ওয়ারশ, তেল আবিব, নিউ ইয়র্ক, বুদাপেস্ট, লন্ডন, মস্কো, পশ্চিম বার্লিন, স্টকহোম, সোফিয়া, মাদ্রিদ, পূর্ব বার্লিন, হাভানা, হেলসিংকি, ইস্তানবুল ও মিউনিখে।

আই টি আই তার কার্যক্রম চালাবার জন্যে প্রধানত নির্ভর করে সদস্য দেশসমূহের জাতীয় কেন্দ্র এবং ৮টি স্থায়ী কমিটির উপর। এই স্থায়ী কমিটিগুলো হচ্ছে প্লেরাইটিস্ কমিটি, ডান্স কমিটি, মিউজিক থিয়েটার কমিটি, ড্রামাটিক থিয়েটার কমিটি, কমিউনিকেশানস্ কমিটি, থিয়েটার এডুকেশান কমিটি, নিউ থিয়েটার কমিটি এবং কালচারাল আইডেনটিটি ও ডেভেলপমেন্ট কমিটি। প্রত্যেক আই টি আই কংগ্রেসে সাধারণ পরিষদ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে পরবর্তী দুবছরের জন্যে ১৪ সদস্যের নির্বাহী কমিটি এবং সে সাথে তাদের স্থায়ী কমিটির ১০ সদস্যের নির্বাহী বোর্ডের সদস্যরাও নির্বাচিত হন। পরে সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি ও দুজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত কবেন। স্থায়ী কমিটিতে অবশ্য কখনো কখনো একজন সহ-সভাপতি করা হয় এবং সদস্যসংখ্যা ১০ থেকে কমও রাখা হয়।

আই টি আই-র সদস্য দেশের জাতীয় কেন্দ্রগুলো নিজস্ব নিয়ম-রীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয়। নিজ নিজ দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি অনুযায়ী কেন্দ্রের আদর্শ উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় কেন্দ্রগুলো নিজেদের কার্যক্রম প্রণয়ন করে থাকে। ইউনেস্কো নির্ধারিত অর্থনৈতিক স্তর অনুযায়ী জাতীয় কেন্দ্রগুলো প্রতি বছর কেন্দ্রকে চাঁদা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশের জন্যে বর্তমান চাঁদা ৫০০ ডলারের মতো। কেন্দ্র থেকে কোনো দেশের জাতীয় কেন্দ্রকে কোনো অর্থ সাহায্য দেওয়া হয় না।

১৯৮২ সালে আই টি আইর বাংলাদেশ কেন্দ্র স্থাপন হবার সাথে সাথেই বিশ্ব নাট্য দিবস পালনের মধ্য দিয়ে আই টি আই তার কার্যক্রম ঘোষণা করে। ৫/৬ বছর আগে যখন বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন বিশ্ব নাট্য দিবস উদযাপনে আই টি আইর সাথে হাত মেলায় তখন থেকে এ দিবসটি ব্যাপকভাবে উদযাপিত হতে শুরু করে। নাট্যকর্মীদের র‍্যালি, প্রীতি সম্মিলনী, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দিনভর আড্ডা— দিনটির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। ঢাকার বাইরেও দিনটির উদযাপন ক্রমশ ব্যাপকতর হচ্ছে।

বাংলাদেশ আই টি আই-র কার্যক্রম চালাবার পথে সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক অর্থসংকট। পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই সরকার আই টি আই-কে বার্ষিক অনুদান দিয়ে থাকেন। অনেক দেশে আই টি আই কার্যালয় সরকারের সৌজন্যে প্রাপ্ত। কিন্তু আমাদের দেশের পরিস্থিতি ভিন্ন। সদস্যদের চাঁদা, বিজ্ঞাপন ও দানের ওপর নির্ভর করে আমাদের কার্যক্রম চালাতে হয়। কোনো সার্বক্ষণিক বা খণ্ডকালীন কর্মী নিয়োগের আর্থিক সংগতিও বাংলাদেশ আই টি আই-র নেই। এতদিন আই টি আই-র নিজস্ব কোনো কার্যালয় ছিল না। সম্প্রতি থিয়েটার কমপ্লেক্সের সৌজন্যে বেইলি রোডে আই টি আই-র একটি আলাদা অফিস স্থাপিত হয়েছে। সেখানে লাইব্রেরির ব্যবস্থা থাকবে, যেখানে সপ্তাহে তিন দিন উৎসাহী নাট্যকর্মীরা বিদেশি পত্র-পত্রিকা পড়ার সুযোগ পাবেন।

আই টি আই বিশ্ব নাট্যাঙ্গনের সাথে বাংলাদেশের সেতুবন্ধ। আনুষ্ঠানিকতা, দিবস উদ্যাপন বা নাট্য প্রযোজনা আই টি আই-র মূল কাজ নয়। গবেষণাধর্মী ও বাংলাদেশের নাট্য ঐতিহ্যকে বিদেশে পরিচিত করতে সাহায্য করা বা তথ্য বিনিময় জাতীয় কার্যক্রম বাংলাদেশ আই টি আই-র জন্যে অনেক বেশি অর্থবহ। প্রথম দিকে বাংলাদেশ কেন্দ্র থেকে একটি দ্বি-ভাষিক বুলেটিন প্রকাশিত হত। বাংলাদেশে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নাটকের ক্ষেত্রে কী ঘটছে তার সংক্ষিপ্ত সংবাদ দেওয়া হত আমাদের দেশের নাট্যকর্মীদের অবগতির জন্যে। আর ইংরেজি অংশে দেওয়া হত বিদেশিদের জানার জন্যে বাংলাদেশের নাটকের ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য খবরাখবর। বর্তমানে বাংলা ও ইংরেজিতে আলাদা দুটি বুলেটিন প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ আই টি আই আয়োজিত দুটি আন্তর্জাতিক সেমিনার বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ১৯৯১-র জানুয়ারিতে ঢাকায় 'এশিয়ার নাট্যপত্র : যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতা' শীর্ষক তিনদিনব্যাপী সেমিনার আমাদের নাট্যাঙ্গনে একটি আন্তর্জাতিক আবহের সৃষ্টি করে। সেমিনারের সাথে আয়োজিত হয়েছিল নাট্যোৎসব ও প্রদর্শনী। এতে করে বিদেশি অতিথিরা আমাদের নাটকের সাথে সরাসরি পরিচিত হতে পেরেছেন। সেমিনারের সম্পূর্ণ আলোচনা লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১৯৯২-র আন্তর্জাতিক সেমিনার ছিল আরো ব্যাপক। ১৭ জন বিদেশি প্রতিনিধির অংশগ্রহণে সেমিনারের আলোচনা অনেক প্রাণবন্ত ও অর্থবহ হয়েছিল। এ উপলক্ষে আয়োজিত হয়েছিল বাংলাদেশের প্রযোজনা নিয়ে নাট্যোৎসব ও প্রদর্শনী। নাট্যোৎসবে বিদেশি প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের সমসাময়িক নাটক সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করার সুযোগ পেয়েছেন। আমাদের লোকনাট্য যাত্রার অভিনয়ও তাঁদের আকৃষ্ট করে। পথ-নাটক দেখার সুযোগও তাঁদের হয়েছিল জাহাঙ্গীরনগর

বিশ্ববিদ্যালয়েব মুক্তমঞ্চ এবং কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে। আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের নাট্যকর্মীদের সাথে বিদেশি প্রতিনিধিদের যে ভাব বিনিময় হয়েছে সেটাই এ সেমিনারের একটা বড়ো পাওয়া।

বাংলাদেশে আই টি আই কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার ফলে বিদেশে অনেক সেমিনার বা ওয়ার্কশপে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের যোগ দেওয়ার সুযোগ হয়েছে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যাতায়াত ব্যয়ের ব্যবস্থা প্রতিনিধিকে করতে হয় বলে অনেক জায়গায়ই বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণ সম্ভবপর হয় না। ঢাকাতে যে দুটি আন্তর্জাতিক সেমিনার হয়েছে তাতে ৭০ জনের মতো বাংলাদেশের প্রতিনিধি যোগ দেওযার ফলে আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা অর্জন অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে।

এ দুটি সেমিনারে আগত বিদেশি প্রতিনিধিরা এখানকাব নাট্যাঙ্গনের প্রাণচাঞ্চল্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন এবং সে মুগ্ধতার কথা তাঁদের দেশের পত্র-পত্রিকায় বা সভা-সমিতিতে বর্ণনা করেছেন। এর ফলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আই টি আই মহলে অনেক উজ্জ্বল হয়েছে। বিশেষ করে আই টি আই-ব সেক্রেটাবি জেনারেল সব সময়েই একটি সক্রিয় কেন্দ্র হিসাবে বাংলাদেশের উদাহরণ দেন এবং প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও কীভাবে এখানে ভালো কাজ করা হয় তার কথা বলেন।

আই টি আই-র পক্ষ থেকে কমিউনিকেশানস্ কমিটি দুবছর পরপর 'ওয়ার্লড অব থিয়েটার' নামে একটি বই প্রকাশ করে। তাতে আগের দুবছব নাটকের ক্ষেত্রে কোন দেশে কী ঘটেছে সে সম্পর্কে নিবন্ধ থাকে। এতদিন ধরে আই টি আই-ব সাবেক সোভিয়েত কেন্দ্র ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় এ বইটি প্রকাশ করত। তবে প্রকাশনাব মান কতটা উন্নত ছিল না। ইস্তানবুল কংগ্রেসে আমরা বাংলাদেশ থেকে গ্রন্থটির ইংরেজি সংস্করণের ব্যাপাবে উৎসাহী হলে আমরা বইটি প্রকাশ করি এবং আমাদের সম্পাদনা ও প্রকাশনাব মান সকলের প্রশংসা অর্জন করে। বইটি প্রকাশের বিপুল ব্যয়ভাব অবশ্য আমাদেরকেই বহন করতে হয়েছিল।

বিদেশি নির্দেশকের সাথে বাংলাদেশের নাট্যকর্মীদের কাজ করার সুযোগ হয়েছে আই টি আই-র মাধ্যমে। ডোবোরা ওয়ার্নার পরিচালনা করেছিলেন শেক্সপিয়ারের 'টেম্পেস্ট' এবং ফ্রিৎস্ বেনেভিৎস্ নির্দেশনা দিয়েছিলেন ব্রেশ্টের 'লোক সমান লোক'। এ দুজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নির্দেশকের সাথে কাজ করে আমাদের নাট্যকর্মীরা অমূল্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন।

বাংলাদেশ কেন্দ্রের নানা তৎপরতার সুবাদে মিউনিখ কংগ্রেসে বিভিন্ন কমিটির নির্বাচনে বাংলাদেশ আশাতিরিক্ত সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশেব প্রতিনিধি হিসেবে বর্তমান লেখক সর্বাধিক ভোট পেয়ে নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও পরে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। এ ছাড়াও আতাউর রহমান নিউ থিয়েটার কমিটির সভাপতি, রামেন্দু মজুমদার কমিউনিকেশানস্ কমিটিব সহ-সভাপতি, মফিদুল হক ঐ কমিটিরই সদস্য এবং নাসিরউদ্দিন ইউসুফ কালচারাল আইডেনটিটি কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। স্থায়ী কমিটিগুলোর মধ্যে নিউ থিয়েটাব কমিটিতে আতাউর রহমানের সভাপতি হিসাবে নির্বাচন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

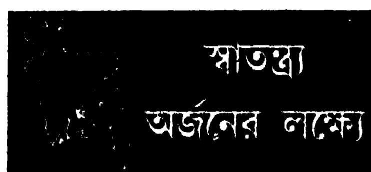
আই টি আই-র মাধ্যমে বিশ্ব নাট্যাঙ্গনের দুয়ার আমাদের সামনে খুলে গেছে। বাংলাদেশ সম্পর্কেই আগে যেখানে তেমন কিছু জানত না, সেখানে আজ বাংলাদেশের নাটকের পরিচিতি বাড়ছে। সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে আই টি আই-র বাংলাদেশ কেন্দ্র এমন কিছু অর্থবহ কাজ করতে পারে যাতে করে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গন সমৃদ্ধ হবে।



ক

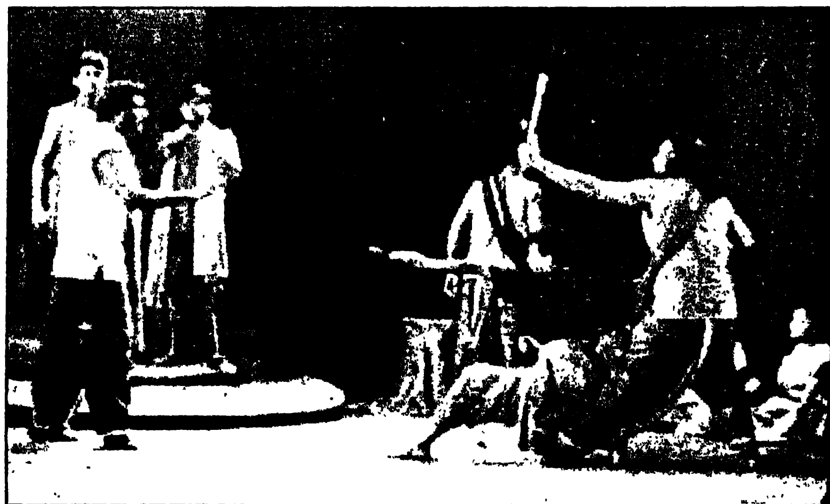


খ


স্বাতন্ত্র্য
অর্জনের লক্ষ্যে



ক



খ

নাটমণ্ডপ এবং বাংলাদেশের জাতীয় নাট্যশালা

সৈয়দ জামিল আহ্‌মেদ

প্রস্তাবনা

বাংলাদেশে একটি জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার দাবি দীর্ঘকাল ধরে উচ্চারিত হয়ে আসছে। ১৯৫৬ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে নাট্য আন্দোলন গড়ে তোলা এবং একটি স্থায়ী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কামরুল হাসান, সান্‌জীদা খাতুন, সুফিয়া খানম, ওয়াহিদুল হক, আনিসুজ্জামান, জাহির রায়হান, আবদুল গনি হাজারী প্রমুখের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'কেন্দ্রীয় নাট্য সংসদ'। সংসদ আয়োজিত 'দেবদাস' নাটকের মহরত অনুষ্ঠানে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ঢাকায় একটি জাতীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা ও সাহায্যের আশ্বাস দেন।[১] শোনা যাচ্ছে, বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণে বাস্তবায়িত হবে বহু প্রতীক্ষিত সেই সোনার হরিণটি।

কিন্তু কেমন হওয়া উচিত এই নাট্যশালা? সকলেই বলেন, আধুনিক। আধুনিক তো বটেই— কিন্তু আমরা কি এমন নাট্যশালা চাই যা রক্ষণবেক্ষণের জন্যেই মাসে লাখ লাখ টাকার সরকারি ভরতুকি প্রয়োজন হবে? না, নাটক হবে সহজসভ্য, সহজে নির্মাণযোগ্য— এ দাবি বাংলাদেশের নাট্যকর্মীরা দীর্ঘদিন ধরেই করে আসছে। এবং এ দাবির সাথে একমত না হবার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না।

১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে রেনেসাঁ ইতালির পারমা শহরে প্রথম প্রসেনিয়াম রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হয়[২], যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবধি পৃথিবীর অধিকাংশই দেশেই সর্বাধিক প্রচলিত রঙ্গভূমি হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু ইদানীং খোদ ইউরোপ ও আমেরিকায় খাঁটি বাস্তবধর্মী নাট্যচর্চা প্রায় 'মিউজিয়াম পিস' হিসেবেই পরিচিত। ফলে প্রসেনিয়াম রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে খ্যাতিমান পরিচালকগণ পিটার ব্রুক নির্দেশিত 'মহাভারত'-এর মতো বহু নতুন নতুন কাজ করছেন। সুতরাং প্রসেনিয়াম মঞ্চ এখন আর 'আধুনিক' নয়। একবিংশ শতকের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা তবে কেন এ জাতের মঞ্চ নির্মাণ করব? উপরন্তু 'জাতীয় নাট্যশালা' স্থাপত্যগতভাবে কি এমন এক চেতনা প্রতিফলিত করবে না— যা একান্তভাবেই জাতীয়, যার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা গর্বভরে বলতে পারি এটি সম্পূর্ণভাবেই আমাদের বাংলাদেশের?

তাহলে কেমন হবে আমাদের জাতীয় নাট্যশালা— যা একাধারে আধুনিক, একান্তভাবে বাংলাদেশের নিজস্ব আদলে নির্মিত এবং স্বল্পব্যয়ে পরিচালিত?

নাট্যমণ্ডপ : বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যশালা

সাধারণত ধারণা করা হয় যে, ইউরোপীয় নাট্যচর্চা প্রচলনের আগে বাংলাদেশে কোনো স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ তৈরি হয়নি এবং ১৮৭২ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-ই এ দেশের প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়, যা ছিল একাধারে বাঙালির জন্যে এবং বাঙালি দ্বারা পরিচালিত। এ ধারণাটা ভুল প্রমাণিত হবে বাংলাদেশের নাটমণ্ডপের দিকে দৃষ্টি ফেরালে।

সারিবদ্ধ খুঁটির উপরে স্থাপিত চালাবিশিষ্ট এবং দেয়ালবিহীন একটি উন্মুক্ত চত্বরকে 'নাটমণ্ডপ'

বলা হয়। এর ভিত হয় ভূমি থেকে সামান্য উঁচু, আকৃতিগতভাবে বর্গ অথবা আয়তাকার এবং ছাদ হয় দোচালা, চাবচালা কিংবা সমতল। ডেভিড জে ম্যাকাচ্চেন মনে করেন, 'ঐতিহ্যগতভাবে বাঁশের খুঁটি এবং খড়ের চালা দ্বারা নির্মিত হলেও ইদানীংকালে অনেকক্ষেত্রেই নাটমণ্ডপ সমতল ছাদবিশিষ্ট পাকা ইমারতে রূপান্তরিত হয়েছে।[৩] এ সব মণ্ডপ সকল ক্ষেত্রেই নির্মিত হয়েছে মন্দির প্রাঙ্গণে, গর্ভগৃহের সম্মুখে। অধিষ্ঠিত দেবদেবীর নামানুসারে নাটমণ্ডপ কখনও হয়েছে চণ্ডীমণ্ডপ, কখনও শিবমণ্ডপ আবাব কখনও বিষ্ণুমণ্ডপ। বাংলাব বৈষ্ণবদের হাতে এ জাতীয় স্থাপত্যিক কাঠামোব নামকরণ হয়েছে নাটমন্দির।[৪] সপ্তদশ শতক থেকে বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তারের সাথে সাথে বৈষ্ণব নাট্য মন্দিরের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং উনবিংশ শতাব্দী নাগাদ নাট্যমণ্ডপের সাধারণ নাম হয়ে দাঁড়ায় নাটমন্দির।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ও লৌকিক দেবদেবী উপাসনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল নৃত্য ও গীত সম্বলিত নাটগীত ও মঙ্গলগান এবং কথকতা জাতীয় গীত সম্বলিত বর্ণনাধর্মী কথানাট্য অভিনয় অনুষ্ঠানাদি। সর্বস্তরের জনগণের সামনে এ সকল অনুষ্ঠান উপস্থাপনেব জন্যে প্রায় সকল মন্দিরের সাথেই নির্মাণ করা হত নাটমণ্ডপ। প্রাক-মুসলিম যুগে বিষ্ণু ও শিবের মন্দিরে দেবদাসীদের যে নাচগান হত সে কথা বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করেছেন।[৫] কল্হন লিখিত অষ্টম শতকীয় গ্রন্থ 'রাজতরঙ্গিণী' হতে জানা যায় যে, তদানীন্তন পুন্ড্রবর্ধনে অবস্থিত কার্তিকেয় মন্দিরের নাটমণ্ডপে নৃত্যপটীযসী কমলা এবং অন্য দেবদাসীগণ নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত অভিনয়রীতি অনুসবণ করে নাটগীত পরিবেশন করতেন।[৬] কোনো কোনো পুরাকীর্তি বিশেষজ্ঞের মতে মহাস্থানগড়েব নিকটবর্তী 'স্কন্ধের ধাপ' ঢিপির আড়ালে লুকিয়ে আছে প্রাচীনকালের কার্তিকেয় মন্দির। সেন যুগেও যে নাটমণ্ডপের অস্তিত্ব ছিল তা অনুমান করা যায় বিজয় সেন ও ভট্টদেব প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে শত শত দেবদাসী উৎসর্গের কথা থেকে। সেনবংশীয় অপর সুক্ষ্মরাজ (সম্ভবত লক্ষ্মণ সেন) প্রতিষ্ঠিত মন্দিবেও দেবদাসী প্রথার অস্তিত্ব ছিল মনে করা হয়।[৭] কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ আরও মনে করেন যে, একই যুগে বাংলায় শিব মন্দিরের চত্বরেও নাটমণ্ডপ নির্মাণ করা হত, লোকমুখে যার প্রচলিত নাম ছিল গম্ভীরামণ্ডপ।[৮]

মধ্যযুগের সাহিত্যকর্ম থেকেও নাটমণ্ডপের কথা জানা যায়। ষোড়শ শতকের শেষভাগে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম বর্ণনা করেছেন :

নগর চত্বর মাঝে শিবের মণ্ডপ সাজে
অনাথ মণ্ডপ অতিথিশালা
বাসাড়ে জনের তরে, দীঘল মন্দির করে
প্রবাসী জনের তিথিমেলা।[৯]

নাটগীত ও কথানাট্য অভিনয় ছাড়াও নাটমণ্ডপে গ্রামের সালিশ বসত, স্থানাভাবে বসত পাঠশালা; এখানেই ধর্মীয় তর্কযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হত, এমনকী কখনও কখনও এটি অতিথিনিবাস কিংবা পুঁথি-পাণ্ডুলিপি রচনার কাজেও ব্যবহৃত হত।[১০] এ সকল নাট্যমণ্ডপ সামন্তশ্রেণি অথবা অবস্থাপন্ন বৃহৎ ভূস্বামী দ্বারা নির্মিত হলেও এখানে সাধারণ মানুষের উন্মুক্ত অধিকার ছিল প্রতিষ্ঠিত।[১১] এক কথায় প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলায় নাটমণ্ডপ ছিল সাধারণ রঙ্গালয় এবং সামাজিক সভা অঙ্গন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে নাটমণ্ডপের সামাজিক চরিত্র ঔপনিবেশিক যুগে রূপান্তরিত হয়ে ধনী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা ঔপনিবেশিক জমিদার শ্রেণি সৃষ্টির পর ধনিক সম্প্রদায় হয়ে ওঠে নগরমুখী। একই সাথে অন্যান্য শোষণের ফলে গ্রামীণ সমাজের অর্থনৈতিক ভিত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পূর্বতন যুগেব সর্বসাধারণের জন্যে নির্মিত নাটমণ্ডপের স্থলে উনবিংশ শতাব্দী থেকে জমিদাববাড়ির মন্দিব প্রাঙ্গণে নির্মিত হল

নাটমন্দির। ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে সেখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার থাকলেও নাটমণ্ডপের উপর সাধারণেব অধিকার হল বিনষ্ট। ফলে ঔপনিবেশিক যুগেব জমিদারবাড়ির প্রাঙ্গণে নির্মিত নাটমণ্ডপসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে কেবল লোকজ নাট্যানুষ্ঠানের জন্যে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাটমণ্ডপ বাঁশ ও খড় দ্বারা নির্মিত হবাব কারণে আজ তার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইট দ্বারা নির্মিত হলেও বাংলার জলবায়ুর কারণে তার অধিকাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত। ঔপনিবেশিক যুগে টিনের অথবা সুরকিব ঢালাই করা চালা এবং কাঠ, লোহা অথবা ইটের স্তম্ভ দ্বারা পাকা মেঝেবিশিষ্ট যে সব নাটমণ্ডপ নির্মিত হয়, তার অধিকাংশ ১৯৪৭ সালেব দেশ বিভাগ এবং জমিদারপ্রথা বিলোপেব কারণে পরিত্যক্ত হয়। ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের অধিকাংশ নাটমণ্ডপ বর্তমানে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে বেখেছে।

বর্তমানে যে সকল নাটমণ্ডপ সম্পর্কে জানা যায় সেগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হল। বিস্তাবিত অনুসন্ধানের ফলে আরও মণ্ডপের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে।

১. কেশিয়াবী মন্দির, মেদিনীপুর (১৬০৪)।
২. রাধা-বল্লভ মন্দির, খাড়ুই, মেদিনীপুর (১৮শ শতক)।
৩. বঘুনাথ মন্দিব, পারুল, আরামবাগ, হুগলি (১৭৬৮)।
৪. বিশালাক্ষী মন্দির, পারুল, আরামবাগ, হুগলি (১৭৫৯)।
৫. বিশালাক্ষী মন্দির, রাজহাটি, আরামবাগ, হুগলি (১৯ শতকের মধ্যভাগ?)[১২]
৬. শিব মন্দির, হট্টনগর, মেদিনীপুব (১৬শ শতক?)।
৭. শ্যামচাঁদের মন্দির, শান্তিপুর, নদীয়া (১৭২৬)।
৮. উলাইচণ্ডী দেবীর মন্দির, বীরনগর, নদীয়া (?)[১৩]
৯. গৌবাঙ্গ মন্দিব, খেতুর, প্রেমতলী, রাজশাহী (আদিমণ্ডপ, ১৬শ শতক, সংস্কার ২০শ শতক)।
১০. ঢাকেশ্বরী মন্দির, ঢাকা।
১১. বুড়োশিব মন্দির, রমনা, ঢাকা (২০শ শতক)। চিত্র ২।
১২. গৌড়ীয় মঠ, নারিন্দা, ঢাকা (২০শ শতক)।
১৩. হরিঠাকুরের মন্দির, ওড়াকান্দি, কাশিয়ানি, গোপালগঞ্জ (১৮৯০)।
১৪. বোয়ালমারি বারোয়ারি মন্দির, বোয়ালমারি বাজার, ফরিদপুর। চিত্র ৩।
১৫. রাধাগোবিন্দ মন্দির, কামারগ্রাম, আমগ্রাম, বোয়ালমারি, ফরিদপুর। চিত্র ৪।
১৬. লস্করবাড়ি কালীমন্দিব, কামারগ্রাম, বোয়ালমারি, ফরিদপুর। চিত্র ৫।
১৭. ভাওয়াল রাজবাড়ি, জয়দেবপুর। চিত্র ৬।
১৮. আটআনি জামিদারবাড়ি, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ। চিত্র ৭।
১৯. রাধাগোবিন্দ মন্দির, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ। চিত্র ৮।
২০. রাধাকৃষ্ণ মন্দির, ছাপ্পান্ন প্রহর মাঠ, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ। চিত্র ৯।
২১. ঠাকুরপুর বারোয়ারি মন্দির, ঠাকুরপুর, বোয়ালমারি, ফরিদপুর। চিত্র ১০।
২২. শ্রীনগর জমিদারবাড়ি, শ্রীনগর, বোয়ালমারি। চিত্র ১১।
২৩. শ্রীনগর মধ্যপাড়া রক্ষাচণ্ডী বারোয়ারি মন্দির, বোয়ালমারি। চিত্র ১২।
২৪. হাসামদিয়া শীতলা মন্দির, হাসামদিয়া, বোয়ালমদিয়া, বোয়ালমারি। চিত্র ১৩।
২৫. কালীবাড়ি, কয়রা, বোয়ালমারি, ফবিদপুর। চিত্র ১৪।
২৬. প্রভু জগৎবন্ধু মন্দির, শ্রীঅঙ্গন, গোযালচামট, ফরিদপুর। চিত্র ১৫।

২৭. মদনগোপাল মন্দির, গোয়ালচামট, ফরিদপুর (১৩৪৫)। চিত্র ১৬।

২৮. গৌরগোপাল মন্দির, গোয়ালচামট, ফরিদপুর। চিত্র ১৭।

এ ছাড়াও আলফাডাঙ্গা থানার শিবগ্রাম ও আলফাডাঙ্গা বাজার (বিষ্ণুপাগল আশ্রম) এবং বোয়ালমারি থানার শেখব গ্রাম (কালীবাড়ি), কলারঙ গ্রাম ও জয়পাশা গ্রাম (রক্ষাচণ্ডী) মন্দিরসমূহে নাটমণ্ডপ রয়েছে বলে জানা যায়। জমিদারবাড়ির মধ্যে দিঘাপতিয়া (নাটোব), পাঁচআনি (পুটিয়া, রাজশাহী), তাজহাট (রংপুর) এবং দিনাজপুব বাজবাড়িতেও সম্ভবত নাটমণ্ডপের অস্তিত্ব রয়েছে।

আকৃতিগত বিচারে বাংলার নাটমণ্ডপসমূহ নিম্নোক্ত ছকে বিভক্ত করা যেতে পারে।

নাটমণ্ডপ

উন্মুক্ত		খিলান বেষ্টিত		আবদ্ধ	
বর্গাকার	আযতাকার	বর্গাকার	আয়তাকাব	বর্গাকার	আয়তাকার
বক্ষাচণ্ডী,	বোযালমাবি	গৌরাঙ্গ হেতুব (৯),	বুড়ো শিবমন্দিব,	শ্রীনগব জমিদাব	শ্যামচাঁদেব মন্দিব
শ্রীনগব (২৩),	বাজাব (১৪),	শিবমন্দিব,	ঢাকা (১১),	বাড়ি (২২),	শান্তিপুব (৭),
শীতলা,	বাবোয়াবি মন্দির,		গৌড়ীয মঠ,	ভাওযাল	গৌবগোপাল,
হাসমদিয়া (২৪),	ঠাকুবপুকুব (২১),	হট্টনগর (৬)	ঢাকা (১২),	বাজবাড়ি (১৭),	ফবিদপুব (২৮),
বাধাকৃষ্ণ,	বাধাগোবিন্দ,		হবি ঠাকুর,	ঢাকেশ্ববী,	জগৎবন্ধু,
ছাপ্পান্ন প্রহর,	মুক্তাগাছা (১৯),		ওড়াকান্দি (১৩),	ঢাকা (১০)	ফরিদপুব (২৬),
মুক্তাগাছা (২০),	বাধাগোবিন্দ,		লক্ষববাড়ি		আট আনি,
মদনগোপাল (২৭)	কামাবগ্রাম-		কালীমন্দিব (১৬),		জমিদাববাড়ি (১৮)
	আমগ্রাম (১৫)।		কালীবাড়ি,		
			কয়রা (২৫)।		

উন্মুক্ত বর্গাকার নাটমণ্ডপসমূহের মধ্যে রক্ষাচণ্ডী, শ্রীনগর (২৩) এবং রাধাকৃষ্ণ, ছাপ্পান্ন প্রহরের মাঠ, মুক্তাগাছা (২০) মণ্ডপদ্বয়ের আকৃতি প্রায় এক। দুটিতেই চার চালা, এবং চার খুঁটিবিশিষ্ট বর্গাকৃতির কেন্দ্রীয় অভিনয় স্থানটিকে চারদিকে ঘিরে রয়েছে এক চালাবিশিষ্ট দর্শক উপবেশন স্থান। ফলে মণ্ডপ দুটি মূলত 'বর্গের অভ্যন্তরে বর্গ' বিশিষ্ট। অবশ্য কেন্দ্রীয় অভিনয়স্থানটি ছাড়াও প্রয়োজনে মণ্ডপের পশ্চিম, পূর্ব অথবা দক্ষিণ প্রান্তের মধ্যভাগে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে দর্শকবৃন্দ অভিনয় স্থানটির তিন দিক ঘিরে উপবেশন করবে। মণ্ডপ দুটির মেঝে মাটির, ছাদ টিনের এবং খুঁটি কাঠের। হাসামদিয়ার শীতলা নাটমণ্ডপটি সম্ভবত অর্থাভাবেই এক চালাবিশিষ্ট। এখানেও বৃহত্তর বর্গাকার ক্ষেত্রের মধ্যভাগে ক্ষুদ্রাকৃতির বর্গাকার অভিনয়ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়েছে। এটির মেঝে মাটির এবং খুঁটি বাঁশের। অপরদিকে মদনগোপাল নাটমণ্ডপটি উঁচু ও পাকা মেঝেবিশিষ্ট। এর কেন্দ্রীয় অংশটিতে ঢালাই করা সমতল ছাদ এবং তিন দিকের বর্ধিত অংশে টিনের একচালা ছাদ দেখা যায়।

রাধাগোবিন্দ (মুক্তাগাছা) এবং রাধাগোবিন্দ (কামারগ্রাম) নাটমণ্ডপ দুটোই আয়তাকার এবং দুটোর মধ্যভাগেই চার খুঁটিবিশিষ্ট ও ভূমি-সমতল বর্গাকার অভিনয় স্থান দেখা যায়। অপরদিকে বোয়ালমারি বাজার বারোয়ারি মন্দির সংলগ্ন নাটমণ্ডপটিতে এ ধরনের কোনো কেন্দ্রীয় বর্গাকৃতির রঙ্গভূমি নির্দিষ্ট করা নেই। অপরদিকে ঠাকুরপুর বারোয়ারি মন্দির সংলগ্ন নাটমণ্ডপটিতে এককালে এ ধরনের বর্গাকৃতিবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় রঙ্গভূমি নির্ধারিত ছিল। কিন্তু ঝড় ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাজনিত

কারণে পূর্বেকার মণ্ডপটি বিধ্বস্ত হয় এবং তার স্থলে একটি একচালা মণ্ডপ নির্মিত হয়। ঠাকুরপুর বারোয়ারি মণ্ডপ ব্যতিরেকে অপর তিনটি মণ্ডপ চার চালাবিশিষ্ট। সকল মণ্ডপের মেঝে মাটির এবং খুঁটিগুলি বাঁশ (রাধাগোবিন্দ, কামারগ্রাম ও বারোয়ারি, ঠাকুরপুর) ও কাঠ (বারোয়ারি, বোয়ালমারি বাজার ও রাধাগোবিন্দ, মুক্তাগাছা) দ্বারা নির্মিত। এ সকল মণ্ডপের মধ্যে রাধাগোবিন্দ (মুক্তাগাছা) কেবল দ্বিতলবিশিষ্ট।

খিলান বেষ্টিত বর্গাকার মণ্ডপ দুটি ইট দ্বারা নির্মিত এবং পাকা মেঝে বিশিষ্ট। গৌরাঙ্গ (খেতুর) মণ্ডপটিতে সমতল ছাদ দেখা যায়। মণ্ডপসমূহের চতুর্দিকে বাঁশ কিংবা কাঠের খুঁটির পরিবর্তে দুই-তিন ফুট চওড়া ইটের স্তম্ভের উপরে খিলান নির্মিত হয়েছে। মোট বারোটি স্তম্ভ দ্বারা বারোটি খিলান নির্মিত হওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রে এ সকল মণ্ডপকে বারোদুয়ারি নামে আখ্যায়িত করা হয়। আলোচ্য সকল মণ্ডপের মধ্যে হট্টনগরস্থ নাটমণ্ডপটি প্রাচীনতম। কথিত আছে, উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা গজপতি মুকুন্দদেব এই মণ্ডপটি নির্মাণ করেন।[১৪]

লস্করবাড়ি কালীমণ্ডপ (কামারগ্রাম) এবং কয়রা কালীমণ্ডপ ব্যতিরেকে অপর সকল খিলান বেষ্টিত আয়তাকার নাটমণ্ডপ ইট দ্বারা নির্মিত, সমতল ছাদ, খিলান এবং উঁচু পাকা মেঝেবিশিষ্ট। কয়রার কালীবাড়ি সংলগ্ন নাটমণ্ডপটিও ইট দ্বারা নির্মিত, খিলান এবং উঁচু পাকা মেঝেবিশিষ্ট, কিন্তু এর ছাদটি ছিল চৌচালা। এটিতে বারোটি খিলান ও স্তম্ভ দেখা যায়। মূল মন্দিরটি ব্রিটিশ যুগের এবং এ অঞ্চলের সর্বপ্রাচীন বলে কথিত। কুমার নদীর ভাঙনে গর্ভগৃহটি বিলীন হয়ে যাওয়ায় সেটি নাটমণ্ডপের দক্ষিণে পুনর্নির্মিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় নাটমণ্ডপটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বর্তমানে এর পুনর্নির্মাণের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। লস্করবাড়ি নাটমণ্ডপটি ভূমি-সমতল, মাটির মেঝে, কাঠের খুঁটি এবং টিনের চৌচালাবিশিষ্ট। এই মণ্ডপটির পশ্চিমে রাখাল ও পূজারীর আবাস কক্ষ এবং পূবে গরু ও মহিষের গোয়ালঘর নির্মিত হবার ফলে এটি দুই দিকে আবদ্ধ। মণ্ডপটির মধ্যভাগে ছয়টি খুঁটি দেখা যায়, যার মধ্যে দক্ষিণ দিকের চারটি খুঁটি নির্ণয়কৃত স্থানটি অভিনয়ের জন্যে নির্ধারিত। ঢাকা শহরে অবস্থিত বুড়াশিব মন্দির ও গৌড়ীয় মঠ এবং ওড়াকান্দি, গোপালগঞ্জে অবস্থিত হরি ঠাকুরের মন্দিরসমূহের নাটমণ্ডপ তিনটিই সমতল ছাদবিশিষ্ট পাকা ইমারত। এর মধ্যে গৌড়ীয় মঠে অবস্থিত নাটমণ্ডপটির প্রথম তলের মধ্যভাগে অবস্থিত অভিনয়-স্থল বরাবর দ্বিতীয় তলের মধ্যভাগ উন্মুক্ত রেখে চতুর্দিকে গ্যালারি নির্মিত হয়েছে। বুড়াশিব মন্দির-এর নাটমণ্ডপটি দক্ষিণ দিকে খিলানবেষ্টিত হলেও পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্ব দিকে অধিকাংশ দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত। এর কেন্দ্রে পাঁচ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট একটি মোজাইক-কৃত বৃত্ত রচিত হয়েছে।

আবদ্ধ বর্গাকার নাটমণ্ডপসমূহের মধ্যে শ্রীনগর ও ভাওয়াল মণ্ডপ দুটি জমিদারবাড়ির অঙ্গনে নির্মিত এবং ঢাকেশ্বরী মণ্ডপটি মন্দির অঙ্গনে নির্মিত। ভাওয়াল রাজবাড়ির নাটমণ্ডপটির উত্তর প্রান্তে মন্দির এবং অপর তিন প্রান্তে আবাসগৃহের বারান্দা অবস্থিত। এটি টিনের দোচালা, পাকা মেঝে ও চার সারি লৌহস্তম্ভবিশিষ্ট। শ্রীনগর নাটমণ্ডপটির উত্তর প্রান্তে দুর্গা মন্দির এবং অপর তিন প্রান্তে পাকা মেঝে ও দোচালাবিশিষ্ট মহিলা দর্শকবৃন্দের বসবার স্থান নির্মিত হয়েছে। তিনদিকের দোচালা তিনটির পেছনে প্রবেশপথযুক্ত দেয়াল এবং উত্তরে মন্দির নির্মাণের ফলে নাটমণ্ডপটি সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ। মণ্ডপটি চৌচালা ও পাকা মেঝেবিশিষ্ট এবং কেন্দ্রে বারোটি কাঠের খুঁটি দ্বারা ঘেরা একটি বর্গাকার অভিনয়ক্ষেত্র রয়েছে। কেন্দ্রীয় এই বর্গক্ষেত্রটিকে ঘিরে রয়েছে চব্বিশটি কাঠের খুঁটিবিশিষ্ট বৃহত্তর বর্গক্ষেত্রকার দর্শক উপবেশন-স্থান।

আবদ্ধ আয়তাকৃতির মণ্ডপসমূহের মধ্যে গৌরগোপাল মণ্ডপটির দক্ষিণ প্রান্তে এবং জগৎবন্ধু মণ্ডপটির উত্তর প্রান্তে গর্ভগৃহ অবস্থিত। মণ্ডপ দুটি পাকা, কেন্দ্রীয় ভাগের ছাদ সমতল এবং পার্শ্ববর্তী দর্শক/ভক্ত উপবেশন-স্থানসমূহ এক অথবা দোচালাবিশিষ্ট। গৌরগোপাল মণ্ডপটির

কেন্দ্রীয় ভাগটি পার্শ্ববর্তী দর্শক উপবেশন-স্থান থেকে নিচু এবং প্রায় তিন ফুট চওড়া স্তম্ভবিশিষ্ট খিলান দ্বারা ঘেরা। দর্শক উপবেশন-স্থানটির পেছনে দেয়াল ও কক্ষ নির্মিত হওয়ায় মণ্ডপটি সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ। জগৎবন্ধু মণ্ডপটির কেন্দ্রে চার স্তম্ভযুক্ত অভিনয়-স্থানটির মেঝে মাটির। এর চতুর্পার্শ্বে খিলান বেষ্টিত ও পাকা মেঝেবিশিষ্ট দর্শক/ভক্তবৃন্দের উপবেশন-স্থান নির্মিত হয়েছে। সম্পূর্ণ স্থানটি সমতল ছাদবিশিষ্ট— যার উত্তরদিকে গর্ভগৃহ এবং অপর তিনদিকে জাফরিযুক্ত খিলান দ্বারা ঘেরা এক ও দুই চালাবিশিষ্ট বারান্দা রয়েছে। অপর দিকে আটআনি জমিদারবাড়ির আঙিনায় বারোটি লৌহস্তম্ভবিশিষ্ট যে আয়তাকৃতির নাটমণ্ডপটি দেখা যায় তার মধ্যভাগে স্তম্ভ ঘেরা কোনো অভিনয়-স্থান নির্দিষ্ট নেই। এই মণ্ডপটির উত্তরে রাজেশ্বরী মন্দির, পূর্বে দুর্গা মন্দির এবং দক্ষিণে অভিনয় দলের আবাস ও পোশাক-পরিচ্ছদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে নির্মিত দ্বিতলবিশিষ্ট ইমারতটির ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। আনুমানিক পঞ্চাশ বছর আগে মণ্ডপটির পশ্চিম প্রান্তে সতু সেনের তত্ত্বাবধানে একটি ঘূর্ণায়মান মঞ্চবিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতির প্রসেনিয়াম মঞ্চ নির্মিত হয়। মণ্ডপটির মধ্যভাগে কীর্তন, পালাগান প্রভৃতি অভিনয় অনুষ্ঠান উপস্থাপিত হলে এর চতুর্দিকে এবং পার্শ্ববর্তী তিন বারান্দায় দর্শকবৃন্দ উপবেশন করতেন। প্রসেনিয়াম মঞ্চে নাটক পরিবেশিত হলে সম্পূর্ণ মণ্ডপটিকে দর্শকবৃন্দের উপবেশন-স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হত।

গর্ভগৃহ এবং নাটমণ্ডপের ভূমি-নকশাগত সম্পর্ক পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ মণ্ডপ দক্ষিণমুখী গর্ভগৃহের সম্মুখে নির্মিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ— রাধাগোবিন্দ, মুক্তাগাছা (১৯), ভাওয়াল রাজবাড়ি (১৭), রাধাগোবিন্দ, কামার-আমগ্রাম (১৫), লস্করবাড়ি (১৬), শ্রীনগর জমিদারবাড়ি (২২), রক্ষাচণ্ডী, শ্রীনগর (২৩) ইত্যাদি মণ্ডপের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে জগৎবন্ধু, ফরিদপুর (২৬) এবং বোয়ালমারি বারোয়ারি (১৪) মন্দির দুটির গর্ভগৃহ দক্ষিণমুখী হলেও এ ক্ষেত্রে নাটমণ্ডপ ও গর্ভগৃহ সংযুক্ত অবস্থায় দেখা যায়। একইভাবে মদনগোপাল (২৭) এবং গৌরগোপাল (২৮) মন্দির দুটিতেও নাটমণ্ডপ এবং গর্ভগৃহ একই ইমারতের অংশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জগৎবন্ধু, মদনগোপাল এবং গৌরগোপাল মণ্ডপ তিনটিই বৈষ্ণব সম্প্রদায় কর্তৃক নির্মিত। অপরদিকে হাসামদিয়ার শীতলা মণ্ডপটি গর্ভগৃহের সম্মুখে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নির্মিত।

কয়রার কালীবাড়ি এবং ঢাকার বুড়াশিব মন্দির দুটিতেও ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। বুড়াশিব মন্দির গর্ভগৃহের পূর্ব দিকে নির্মাণের কারণ সম্ভবত স্থানাভাব। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গা মন্দিরের স্থলে এই মণ্ডপটি নির্মাণ করা হয়। কয়রার কালীবাড়ির ক্ষতিগ্রস্থ আদি নাটমণ্ডপটি আদি গর্ভগৃহের দক্ষিণে নির্মিত হয়েছিল। কুমার নদীর ভাঙনে আদি গর্ভগৃহটি বিনষ্ট হলে নতুন গর্ভগৃহ নির্মাণ করা হয় আদি মণ্ডপের দক্ষিণে। বর্তমানে নবনির্মিত গর্ভগৃহের সম্মুখে নতুন একটি মণ্ডপ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

নির্মাণ উপাদান এবং স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে বাংলার নাটমণ্ডপসমূহ চারভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন :

১. লোকজ	:	মাটির মেঝে, বাঁশ অথবা কাঠের খুঁটি এবং টিনের চৌচালা। বর্গ এবং আয়ত উভয় আকৃতিবিশিষ্ট। সকল ক্ষেত্রে চতুর্দিকে উন্মুক্ত। উদাহরণ : রক্ষাচণ্ডী, শ্রীনগর (২৩)।
২. জমিদারি	:	পাকা মেঝে, লৌহস্তম্ভ, টিনের চৌচালা। সকল ক্ষেত্রে চতুর্দিকে আবদ্ধ। ভূমি-নকশায় মূলত বর্গাকার। উদাহরণ : শ্রীনগর জমিদারবাড়ি (২২)।

৩. ইউরোপীয় প্রভাব বিশিষ্ট : পাকা মেঝে, ইটের খিলান এবং সমতল ছাদ। আয়তাকৃতিবিশিষ্ট। উদাহরণ : জগৎবন্ধু, ফরিদপুর (২৬)।

৪. উড়িষ্যা মন্দির স্থাপত্য প্রভাবজাত : পাকা মেঝে, ইটের খিলান এবং শিখরযুক্ত। বর্গাকৃতি বিশিষ্ট। উদাহরণ : শিব মন্দির, হট্টনগর (৬)।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধরে বঙ্গালয় নির্মাণের এক নিজস্ব ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। স্বভাবতই এখন প্রশ্ন ওঠে, কোন্ সূত্র ধরে বিচিত্র এ সকল মণ্ডপ বিকাশ লাভ করেছে?

নাটমণ্ডপ : ভারতের অন্যান্য অঞ্চল

স্থাপত্যকলা বিষয়ে ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ, যেমন— মনসারা শিল্পশাস্ত্র (খ্রি.পূ. ৩য় শতক), নগর পরিকল্পনার ভূমি-নক্শায় নাট্যশালার অবস্থান নির্দেশ করলেও নাটমণ্ডপ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে নীরব।[১৫] এমনকী ৯ম শতক নাগাদ ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যেও নাটমণ্ডপ পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু, অনেকটা হঠাৎ করেই, ১১শ শতক নাগাদ মন্দির স্থাপত্য কাঠামোর সাথে নাটমণ্ডপ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরে 'রঙ্গমণ্ডপ', পশ্চিম ভারতীয় মন্দিরে 'সভামণ্ডপ' এবং পূর্ব ভারতীয় মন্দিরে 'নাটমন্দির' নামে আখ্যায়িত এ সকল নাটমণ্ডপে সামান্য আকৃতিগত তারতম্য পরিলক্ষিত হলেও উল্লিখিত সকল মণ্ডপ কথানাট্য ও নাটগীত পরিবেশনের জন্যই নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু কী কারণে নাটমণ্ডপ মন্দিরের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়?

সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার যুগ বিবেচিত হলেও এ যুগেই সর্বস্তরের জনগণ এক অভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক প্লাবনে উদ্বেলিত হয়েছিল। সপ্তম শতাব্দী নাগাদ বৌদ্ধধর্ম বাংলা ব্যতিরেকে ভারতের অন্যত্র চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হয়। কিন্তু বিদায়ের পূর্বে ব্রাহ্মণ্য আচারানুষ্ঠানের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করে যায়। এমতাবস্থায় শঙ্করাচার্য (৭০০?-৭৫০?) তাঁর অদ্বৈত বেদান্তদর্শন প্রচারের মাধ্যমে সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও শাস্ত্রাদি পুনরায় সংগঠিত করেন এবং ধর্মীয় জীবনে বলিষ্ঠ প্রাণ সঞ্চার করেন। অবশ্য দক্ষিণ ভারতে সপ্তম শতাব্দী থেকেই আলভার এবং নৈয়ানার সম্প্রদায়দ্বয়ের সাধক পুরুষগণ মন্দিরে মন্দিরে যথাক্রমে বিষ্ণু এবং শিবের বন্দনামূলক ভক্তিগীত দ্বারা ভক্তিবাদ প্রচার এবং হিন্দুধর্ম পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে তৎপর ছিলেন। পরবর্তীকালে রামানুজ (১০১৭-১১৩৭) বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদদর্শন প্রচার করেন, যার প্রেরণায় ভক্তিবাদ সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতিধ্বনিত হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা লাভ করে। তাঁর অনুসারী রামানন্দ, কবীর এবং অপর অসংখ্য ভক্ত সন্তগণের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্কের নতুন দিক উন্মোচিত হয়, যেখানে শাস্ত্রীয় আচারানুষ্ঠানের পরিবর্তে ঈশ্বরের সাথে ভক্তের সরাসরি প্রেমময় যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে উপাসনারীতি অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে। ফলে ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় সহজতর এবং জনগণের মাঝে ধর্ম সম্পর্কে নতুন আগ্রহ সঞ্চারিত হয়।

শৈব ও বৈষ্ণব ধারায় ভক্তিবাদের অভ্যুদয়ের ফলে ৮ম থেকে ১২শ শতকে সমগ্র ভারতবর্ষে অসংখ্য মন্দির নির্মিত হয়। ভক্তিবাদের প্রেরণায় এ সকল মন্দিরে উপাসনা কেবল সাধারণের নিকট দুর্বোধ্য সংস্কৃত ভাষায় সীমিত থাকেনি, বরং সাথে যুক্ত হয়েছে দেবতার লীলাবিষয়ক নাটগীত ও কথানাট্য।[১৬] নিরক্ষর জনগণের মুখের ভাষায় রচিত গীত এবং মূকাভিনয়যুক্ত নৃত্য পরিবেশনের

ফলে দেবতা ও তাঁর লীলা হয়ে ওঠে জীবন্ত, মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি, এবং মানুষের মনে ভক্তিমূলক উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়েছে সহজেই।[১৭]

অষ্টম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত উল্লিখিত নাটগীত ও কথানাট্য অভিনয়েব ব্যবস্থা সম্ভবত গর্ভগৃহের বিপরীতে অবস্থিত মণ্ডপটিতে (জগমোহন) করা হত। মন্দিরে মন্দিরে কথন-গায়েন-সূত্রধার এবং নৃত্যপটিয়সী দেবদাসীব আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়। ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে এঁরাই নাটগীত ও কথানাট্য অভিনয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন। একাদশ শতাব্দী নাগাদ এঁদের অভিনয় অনুষ্ঠান ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং বৃহদাকৃতির দর্শকমণ্ডলীর জন্যে পৃথক মণ্ডপ নির্মাণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে, যা বিভিন্ন অঞ্চলে 'রঙ্গমণ্ডপ', 'সভামণ্ডপ' এবং 'নাটমন্দির' নামে খ্যাত।

দক্ষিণ ভারতের মন্দির প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণা আইয়ার বলেন, এ অঞ্চলের 'প্রতিটি বৃহৎ মন্দিরেব অপরিহার্য অঙ্গ ছিল রঙ্গমণ্ডপ। এ সকল মণ্ডপে নৃতচর্চা হত এবং উৎসব উপলক্ষে এখানেই নৃত্যানুষ্ঠান মঞ্চায়িত হত।'[১৮] দেবদেবীর লীলাবিষয়ক এবং মূকাভিনয়যুক্ত ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যগীতকেই আইয়ার 'নৃত্য' নামে আখ্যায়িত করেছেন।[১৯] এ ধবনের নৃত্যগীত অথবা নাটগীত অনুষ্ঠানে কাহিনি বর্ণনাকারী একজন সূত্রধাব/ভাগবত অভিনয়-অঙ্গনেব একপাশে উপবেশন করেন এবং বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে গীত পরিবেশন করেন; একই সাথে নৃত্যশিল্পী সূত্রধাব/ভাগবত পরিবেশিত গীত মূকাভিনয় দ্বারা দৃশ্যায়ন করেন। উদাহরণস্বরূপ : ভরত নাট্যম, কুচিপুদি, ওড়িসি ও কথাকলি নৃত্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোর, চিদাম্বারাম এবং ত্রিবানদ্রাম-এব মন্দিরের রঙ্গমণ্ডপে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও নিয়মিত নৃত্যগীত পরিবেশন করা হত।

দক্ষিণ ভারতের কেরালা রাজ্যে ত্রিচুর, গুরুভাইয়ুর, পেরুমানাম এবং ইরিঞ্জালাকুড্ডায় অবস্থিত মন্দির প্রাঙ্গণে 'কুতাম্বালাম' নামক মণ্ডপ দেখা যায় যেখানে অদ্যাবধি আঞ্চলিক ভাষা মিশ্রিত সংস্কৃত নাটক 'কুডিয়াট্টাম' পরিবেশন করা হয়। বিশেষজ্ঞবৃন্দের মতে কুডিয়াট্টাম নাট্যরীতির ঐতিহ্য হাজার বছর প্রাচীন। গর্ভগৃহের ডানদিকে অবস্থিত কুতাম্বালাম মণ্ডপের আকৃতি আয়তাকার। মণ্ডপের একপ্রান্তে সাজঘর এবং তৎসংলগ্ন মঞ্চ অবস্থিত। (চিত্র ১৮-২০ দ্রষ্টব্য) মঞ্চ বর্গাকৃতিবিশিষ্ট এবং সাজঘরের সাথে দুটো প্রবেশপথ দ্বারা যুক্ত। মঞ্চের চার কোণায় একটি (কখনও তিনটি) করে খুঁটি স্থাপিত হয়। প্রেক্ষাগৃহ সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত। মঞ্চের সাথে লাগোয়া উচ্চতর অংশটি ব্রাহ্মণদের জন্যে নির্দিষ্ট এবং অপর (নিচু) অংশটি সাধারণ দর্শকদের জন্যে নির্ধারিত। মণ্ডপের অভ্যন্তরে সারিবদ্ধ খুঁটি দেখা যায় এবং এর ছাদ সাধারণত চৌচালাবিশিষ্ট হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কেরালার অপর মন্দির প্রাঙ্গণে অস্থায়ী কুতাম্বালাম নির্মাণের রেওয়াজও প্রচলিত রয়েছে।[২০]

দক্ষিণ ভারতের রঙ্গমণ্ডপের ন্যায় বিহারেও নাটমন্দিরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। ইসলামপুর শহরের সন্নিকটে অবস্থিত ডাপ্থু গ্রামে একগুচ্ছ প্রাচীন মন্দির দেখা যায়, যার মধ্যে একটি মন্দিরেব গর্ভগৃহের সম্মুখে নাটমন্দির অবস্থিত। প্রাচীরবেষ্টিত এই নাটমন্দিরটি চার সারি লৌহস্তম্ভ দ্বারা নির্মিত।[২১] অপর দিকে, আসামের বৈষ্ণব উপাসনালয় 'নামঘর'-এর সন্নিকটে 'ভাওনাঘর' অথবা 'রাভা' নামে আখ্যায়িত নাটমণ্ডপ দেখা যায়। দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬০ গজ এবং প্রস্থে ২০ গজ আয়তনবিশিষ্ট এ সকল উন্মুক্ত মণ্ডপ সাধারণত কাঠের স্তম্ভ, ঢেউ টিন ও খড় দ্বারা নির্মিত হয়।[২২] এ সকল মণ্ডপের মধ্যভাগে ৪০ গজ × ৬ গজ আয়তন জুড়ে 'অঙ্কীয নাট' পরিবেশন করা হয়। উত্তর ভারতের ব্রজ অঞ্চলে, বিশেষত বৃন্দাবন এবং বারসানা-এ রাধাকৃষ্ণের মন্দির সম্মুখে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির উন্মুক্ত মণ্ডপ দেখা যায়। 'রাসমণ্ডপ' নামে খ্যাত এ সকল মণ্ডপ ইট দ্বারা নির্মিত এবং 'রাসলীলা' অভিনয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।[২৩]

উড়িষ্যার চারটি বৃহৎ মন্দিরে 'নাটমন্দির' নামে খ্যাত মণ্ডপ দেখা যায়। যেমন :

১. লিঙ্গরাজ মন্দির, ভুবনেশ্বর (আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টাব্দ)। চিত্র ২১।

২. অনন্ত বাসুদেব মন্দির, ভুবনেশ্বর (আনুমানিক ১২০০ খ্রিস্টাব্দ)। চিত্র ২২।

৩. জগন্নাথ মন্দির, পুরী (আনুমানিক ১১০০ খ্রিস্টাব্দ)। চিত্র ২৩-২৫।

৪. সূর্য মন্দির, কোনারক (আনুমানিক ১২৫০ খ্রিস্টাব্দ)।[২৪]

বিশেষজ্ঞ মহলের মতে চারটি মন্দিরেই নাটমন্দির নির্মিত হয়েছিল মূল মন্দির (দেউল ও জগমোহন) নির্মাণের অন্ততপক্ষে এক থেকে দুই শতক পরে। অর্থাৎ উড়িষ্যার প্রাচীনতম নাটমন্দিব সম্ভবত দ্বাদশ শতকীয়। উল্লিখিত প্রতিটি মণ্ডপ প্রস্তর দ্বারা নির্মিত এবং বর্গাকার। এর মধ্যে জগন্নাথ মন্দিরস্থ নাটমন্দির সর্ববৃহৎ— দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ৮০ ফুট। লিঙ্গবাজ মন্দিরস্থ নাটমন্দিরের আয়তন ৩৮´ × ৩৮´ এবং অনন্ত বাসুদেব মন্দিরস্থ মণ্ডপটির আয়তন ২০´ × ২০´। জগন্নাথ এবং লিঙ্গরাজ মন্দিরের নাটমন্দিরদ্বয় hypostyle হল কক্ষ এবং অনন্ত বাসুদেব মন্দিরের নাটমন্দিরটি স্তম্ভবিহীন কক্ষ। জগন্নাথ নাটমন্দিরের অভ্যন্তবে চার সারি স্তম্ভ দেখা যায়, যার প্রতিটিতে চারটি করে স্তম্ভ রয়েছে। অপর দিকে লিঙ্গরাজ নাটমন্দিরটি সর্বমোট চারটি স্তম্ভ দ্বারা আলম্বিত। উল্লিখিত চারটি মন্দিবের ভূমি-নকশায় যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, তা হল, মন্দিরের চারটি অঙ্গ, অর্থাৎ দেউল, জগমোহন ও ভোগমোহন, একই অক্ষরোখায় অবস্থিত। সূর্য মন্দির ছাড়া আর সকল মন্দিরে উল্লিখিত চারটি অঙ্গ একে অপরের সাথে একটি প্রকোষ্ঠ দ্বারা যুক্ত।

ঝাঁসি থেকে প্রায় একশো মাইল দক্ষিণ-পূর্বে খাজুবাহ গুচ্ছ নামে পরিচিত কিছু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এ সকল মন্দিরে পৃথক নাটমণ্ডপের অস্তিত্ব না থাকলেও 'গর্ভগৃহ' এবং 'অর্ধমণ্ডপ'-এর মধ্যস্থলে অবস্থিত মণ্ডপসমূহ এক আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ সকল মণ্ডপের আকৃতি বাহ্যিকভাবে বর্গাকার হলেও মধ্যভাগ বৃত্তাকার। উদাহরণস্বরূপ দেবী জগদম্বের মন্দির-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে (চিত্র নং ২৬ দ্রষ্টব্য)।[২৫] এ ছাড়াও কেরালায় বেশ কিছু বৃত্তাকার মন্দির দেখা যায়।[২৬]

গুজরাট এবং পশ্চিম ভারতের অপর কিছু মন্দিরে 'সভামণ্ডপ' নামে পরিচিত যে সকল মণ্ডপ দেখা যায়, সেগুলো আকৃতিগতভাবে পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। উদাহরণস্বরূপ পূর্বতন বরোদা রাজ্যেব মোধেরায় অবস্থিত সূর্য মন্দিরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 'গর্ভগৃহ' এবং তৎসংলগ্ন 'গূঢ়মণ্ডপ' হতে পৃথকভাবে নির্মিত সভামণ্ডপটি চতুর্দিকে উন্মুক্ত এবং ক্রস আকৃতিবিশিষ্ট hypostyle হল কক্ষ (চিত্র নং ২৭ দ্রষ্টব্য)।[২৭]

মন্দির প্রাঙ্গণে এ সকল নাটমণ্ডপ ছাড়াও উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে 'ভগবত ঘর' নামে এক ধরনের মণ্ডপ দেখা যায়, যার সাথে মধ্যযুগের বাংলাব নাটমণ্ডপের সাদৃশ্য রয়েছে। এ ধরনের মণ্ডপে, উপর গ্রামেব সর্বস্তরেব মানুষের অধিকার স্বীকৃত এবং সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় ও অর্থানুকূল্যে নির্মিত। অতিথি নিবাস, বিবাহ অনুষ্ঠান, স্কুল-পাঠশালা এবং আড্ডা-আলোচনা এ সকল মণ্ডপে অভিনয় অনুষ্ঠান উপস্থাপিত হয়।[২৮]

তুলনামূলক বিচারে বাংলার কিছু মণ্ডপের সাথে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মণ্ডপের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, বাংলার আয়তাকার মণ্ডপের সাথে আসামের ভাওনাঘর এবং কেরালার কুতাম্বালাম আকৃতিগতভাবে এবং খুঁটি বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রায় এক। উদাহরণস্বরূপ, বারোয়ারি মণ্ডপ, বোয়ালমারি বাজার (১৪)-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কুতাম্বালামে কেবল এক প্রান্তে স্থাপিত উঁচু বেদির উপর অভিনয় হয় এবং দর্শক মঞ্চটিকে তিন দিকে ঘিরে উপবেশন করেন। অপর দিকে ভাওনাঘরে শুধু মধ্যভাগে অভিনয় হয় এবং দর্শক মণ্ডপটির দীর্ঘতর দুই বাহু বরাবর উপবেশন করেন। পক্ষান্তরে বাংলার কিছু কিছু আয়তাকৃতিবিশিষ্ট নাটমণ্ডপে— যেমন, বোয়ালমারি বাজাবের বারোয়ারি

মণ্ডপটিতে মধ্যভাগ এবং প্রান্তদেশ উভয় স্থানেই অভিনয়ের সুযোগ রয়েছে। অবশ্য বাংলার অধিকাংশ আয়তাকৃতিবিশিষ্ট নাটমণ্ডপের কেন্দ্রস্থলেই অভিনয় স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। এ সকল মণ্ডপে আয়তক্ষেত্রের চার বাহু ঘিরে এবং কেন্দ্রীয় অভিনয় বর্গক্ষেত্রেব চার কোণায় খুঁটি স্থাপিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ— রাধাগোবিন্দ, মুক্তাগাছা (১৯), রাধাগোবিন্দ, কামার গ্রাম-আম গ্রাম (১৫), লস্করবাড়ি কালীমন্দির (১৬) ইত্যাদি নাটমণ্ডপের কথা উল্লেখ করা যায়।

বাংলাব বর্গাকৃতিবিশিষ্ট মণ্ডপসমূহের সাথে উড়িষ্যাব নাটমন্দিরের মিল দেখা যায় আকৃতিগতভাবে এবং খুঁটি বিন্যাসের ক্ষেত্রে। উদাহরণস্বরূপ— রক্ষাচণ্ডী, শ্রীনগর (২৩), শীতলা, হাসামদিয়া (২৪), রাধাকৃষ্ণ, ছাপ্পান্ন প্রহর, মুক্তাগাছা (২০) এবং শ্রীনগর জমিদারবাড়ি (২২) মণ্ডপসমূহের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। উড়িষ্যাব নাটমন্দিরেব মতো পাথবে নির্মিত এবং দেয়াল বেষ্টিত না হলেও বাংলার উল্লিখিত মণ্ডপসমূহে উডিষ্যায় অনুসৃত বীতির ন্যায় বর্গাকৃতিবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় অভিনযস্থলেব চার কোণায় চারটি এবং দর্শক উপবেশন ক্ষেত্রেব চতুর্দিকে খুঁটি স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু গৌরাঙ্গ, খেতুর (৯) এবং ঢাকেশ্বরী (১০) মণ্ডপ দুটি যেন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের নাটমণ্ডপেব দেয়াল ও কেন্দ্রীয় চাবটি স্তম্ভ ছাড়া কেবল মধ্যবর্তী বারোটি স্তম্ভের অনুকবণে নির্মিত। অপর দিকে হট্টনগরস্থ শিব মন্দিরেব ভূমি-নক্‌শা সম্পূর্ণভাবে উড়িষ্যার স্থাপত্যরীতি প্রভাবজাত। উড়িষ্যার মন্দিরসমূহের ন্যায এ মন্দিরে গর্ভগৃহের সম্মুখে জগমোহন, তৎসম্মুখে নাটমণ্ডপ দেখা যায়। অবশ্য বাংলায় এ ধরনের মন্দির একেবারেই বিরল। কাবণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে জগমোহনবিহীন এবং গর্ভগৃহ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাংলার নাটমণ্ডপ নির্মিত হয়েছে।

উল্লিখিত সাদৃশ্যের কারণে এ ধারণা হয়তো অসঙ্গত হবে না যে, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ভক্তিবাদের প্লাবনে হট্টনগরের শিব মন্দিরের ন্যায় উড়িষ্যার স্থাপত্য প্রভাবজাত অসংখ্য মন্দির বাংলায় নির্মিত হয়েছিল যার সূত্র ধরে লোকজ জীবনে বর্গাকৃতিবিশিষ্ট নাটমণ্ডপ নির্মাণের প্রথা প্রচলিত হয়েছে। সেন রাজত্বকালে বিজয়সেন ও ভট্ট ভবদেব এবং সূক্ষ্মদেশে অপব এক সেনরাজ কর্তৃক যে মন্দির প্রতিষ্ঠা ও দেবদাসী উৎসর্গ করার কথা জানা যায়, তাও উড়িষ্যার মন্দিরসমূহে প্রচলিত রীতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অপর দিকে আসামের ভাওনাঘর এবং কেরালার কুতাম্বালাম থেকে এ ধারণাও অসঙ্গত হবে না যে, খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রস্তরনির্মিত ব্রাহ্মণ্যস্থাপত্য বিকাশ লাভের পূর্বে ভারতের সর্বত্র কাঠ কিংবা বাঁশের খুঁটিবিশিষ্ট চালাঘরের ন্যায় মণ্ডপ নির্মাণের প্রথা প্রচলিত ছিল। কুতাম্বালাম-এ অভিনীত 'কুডিয়াট্টাম' নাট্যরীতিটিকে নাট্যশাস্ত্রে (খ্রি. পূ.২য় শতক-৪র্থ খ্রিস্টাব্দ) বর্ণিত নাট্যরীতি অনুসৃত একমাত্র প্রচলিত ধারা রূপে গণ্য করা হয়। কুতাম্বালাম-এর সাথে বাংলার আয়তাকৃতিবিশিষ্ট নাটমণ্ডপও কি তাহলে নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত কোনো ধারার ইঙ্গিত বহন করছে? একই সাথে বর্গাকৃতিবিশিষ্ট নাটমণ্ডপের সাথেও নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত 'চতুরস্র' রঙ্গালয়ের আশ্চর্যরকম মিল পরিলক্ষিত হয়। তবে কি নাটমন্দির দেড় হাজার বছর পূর্বে প্রচলিত এবং নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত রীতি অনুসরণ করে নির্মিত? না কি নাট্যশাস্ত্র সৃষ্টির পূর্বে প্রচলিত লোকজ নাটমণ্ডপ নির্মাণরীতি অনুসরণ করেই শাস্ত্রীয় রীতিব সৃষ্টি?

নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত নাট্যশালা এবং নাট্যমণ্ডপ

আদ্য রঙ্গাচার্য ও গীতা সেনগুপ্ত উভয়ে মনে করেন নাট্যশাস্ত্র সংকলন ও তৎপূর্ব যুগে, অর্থাৎ চতুর্থ খ্রিস্টাব্দ ও তৎপূর্বে, শুধু নাট্যাভিনয়ের জন্যে স্থায়ী কোনো নাট্যশালা নির্মাণের রেওয়াজ ছিল না। বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান কিংবা উৎসব উপলক্ষে কোনো উদ্যান অথবা কোনো মন্দির প্রাঙ্গণে

অস্থায়ীভাবে নাট্যশালা নির্মাণ করা হত।[২৯] এ কারণেই হয়তো স্থাপত্যকলা বিষয়ে প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহে নাট্যশালা নির্মাণ সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। কৌটিল্য (খ্রি.পূ. ৩২১-২৯৩)-কৃত 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে লেখক অর্থনৈতিক কারণে স্থায়ী নাট্যশালা (প্রেক্ষাগৃহ) নির্মাণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। বৌদ্ধ উড্ডলক, ঘট, এবং মহাপাণ্ডাভ জাতকে যে নাট্যশালাব কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা স্পষ্টতই অস্থায়ী। এ সকল নাট্যশালা কাঠ দ্বারা নির্মিত এবং চাঁদোয়া দ্বাবা আচ্ছাদিত হত।[৩০] অধিকাংশ নাট্যশালা অস্থায়ীভাবে নির্মিত হত বলেই ভরতমুনিকে তাঁর গ্রন্থের শুরুতেই এর নির্মাণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে হয়েছে এবং এই আলোচনায় স্থান নির্বাচন, জমি পরিষ্কার ও মাপজোক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়েছে। উপরন্তু, খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে প্রস্তরস্থাপত্য মূলত পর্বত গুহায় সীমাবদ্ধ ছিল। কাজেই নাট্যশাস্ত্র সংকলন, অর্থাৎ খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী কিংবা তৎপূর্বে, প্রস্তর নির্মিত স্থায়ী নাট্যশালা যদি আদৌ নির্মিত হয়ে থাকে তবে তাকে ব্যতিক্রম হিসেবেই চিহ্নিত করতে হবে।

এমনি একটিমাত্র ব্যতিক্রমেব সন্ধান পাওয়া গেছে ভারতের অন্ধ্র রাজ্যের নাগার্জুনকোণ্ডায়। সেখানে ইট-পাথর দ্বারা নির্মিত আয়তাকৃতিবিশিষ্ট এমন একটি স্থাপত্যিক কাঠামোর সন্ধান পাওয়া গেছে যাকে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ নাট্যশালা হিসেবে চিহ্নিত কবেছেন (চিত্র ২৮ দ্রষ্টব্য)। এই নাট্যশালার ৫৫´ × ৪৬´ আয়তনবিশিষ্ট রঙ্গভূমিটি ভূমিতল থেকে নিম্নে স্থাপিত, যার চতুর্দিকে ধাপবিশিষ্ট আসন ও সিঁড়ি ভূমিতল পর্যন্ত উঠে গেছে। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, নাট্যশালাটি সম্ভবত তৃতীয় শতাব্দীব প্রথম দিকে নির্মিত।[৩১]

নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত নাট্যশালাব গঠন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মহলে প্রচুব মতভেদ বয়েছে। পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন জটিল মতের গোলকধাঁধায় এ কথাটা অন্তত স্পষ্ট যে, ভরতমুনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিন প্রকার নাট্যশালার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'এই বিষয়ে বুদ্ধিমান বিশ্বকর্মা শাস্ত্রানুসারে ত্রিবিধ বঙ্গালয়ের পরিকল্পনা কবেছেন, যথা বিকৃষ্ট, চতুরস্র ও ত্র্যস্র।'[৩২] বিকৃষ্ট নাট্যশালার নামকরণ থেকে অনুমান করা যায় যে, এতে দর্শকমণ্ডলীর উপবেশনব্যবস্থা ছিল রঙ্গ মঞ্চের বিপরীতে (চিত্র ২৯ দ্রষ্টব্য)।[৩৩]

বিকৃষ্ট নাট্যশালা আয়তাকৃতিবিশিষ্ট এবং অপর দুই প্রকার নাট্যশালার মতোই আবদ্ধ এবং আচ্ছাদিত। এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ২ : ১। যদিও একাধিক পরিমাপের কথা ভরতমুনি উল্লেখ করেছেন, তার মাঝে সর্বাধিক পবিচিত আয়তাকৃতিবিশিষ্ট মধ্যম নাট্যশালার দৈর্ঘ্য ৬৪ হাত এবং প্রস্থ ৩২ হাত। নাট্যশালার পূর্বদিকের অর্ধাংশ (৩২ হাত × ৩২ হাত) ধাপবিশিষ্ট দর্শক উপবেশন স্থান 'প্রেক্ষাগৃহ', অবশিষ্ট অর্থাৎ পশ্চিম দিকের অংশের পশ্চাৎ অর্ধাংশ (৩২ × ১৬ হাত) 'নেপথ্যগৃহ' এবং সম্মুখ অর্ধাংশ (৩২ × ১৬ হাত) 'মঞ্চ' নামে পরিচিত। প্রেক্ষাগৃহ থেকে উচ্চতর মঞ্চটির পশ্চাতে দুটি প্রবেশপথ রয়েছে। মঞ্চটির গঠন সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্রের বর্ণনা অস্পষ্ট। যতটুকু বোঝা যায় তা থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, মঞ্চের দুই পাশে 'মত্তবারণী' নামক দুটি স্তম্ভবিশিষ্ট উচ্চতর বেদি অবস্থিত এবং মধ্যকার মূলমঞ্চটি দুই ভাগে বিভক্ত (ভিন্ন মতে অবিভক্ত)। এর মধ্যে পশ্চাতে অবস্থিত অংশটি (রঙ্গশীর্ষ) সম্মুখে অবস্থিত অংশটির (রঙ্গপীঠ) তুলনায় উচ্চতর। আমাদের আলোচনার জন্যে নাট্যশালাটির খুঁটিবিন্যাস এবং আকৃতি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। বিকৃষ্ট নাট্যশালার ভূমি-নকশার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যাবে এর চতুর্দিকের দেয়াল, মঞ্চ ও নেপথ্যগৃহপৃথককারী দেয়াল এবং মঞ্চের উচ্চতর ধাপ অপসারণ করলেই এই নাট্যশালাটি আয়তাকৃতিবিশিষ্ট উন্মুক্ত নাটমণ্ডপ, বিশেষ করে বোয়ালমারি বারোয়ারি নাটমণ্ডপটির সাথে হুবহু মিলে যায় (চিত্র ৩০ দ্রষ্টব্য)।

সুব্বা রাও-এর মতে 'চতুরস্র' [চতুঃ (চার) + অস্র (কোণ)] নাট্যশালার বিন্যাস বিকৃষ্ট নাট্যশালার মতোই, পার্থক্য শুধু আকৃতিগত। অর্থাৎ বিকৃষ্টের আয়তাকাব ক্ষেত্রের পবিবর্তে চতুরস্রে বর্গাকার ক্ষেত্র পরিলক্ষিত হয় (চিত্র ৩১ দ্রষ্টব্য)।[৩৪]

চতুরস্র নাট্যশালার পরিবেষ্টনকাবী দেয়াল, নেপথ্যগৃহ ও মঞ্চস্থপৃথককারী দেয়াল, প্রেক্ষাগৃহেব ধাপ এবং মঞ্চেব উচ্চতব ধাপ অপসারণ করলেই এই মঞ্চটিও কিছু কিছু বর্গাকার নাটমণ্ডপ. বিশেষত ভাওয়াল রাজবাড়িস্থ নাটমণ্ডপটিব সাথে হুবহু মিলে যায় (চিত্র ৩২ দ্রষ্টব্য)।

কপিলা বাৎস্যাযন, আদ্য রঙ্গাচার্য ও পবিত্র সবকাব চতুবস্র নাট্যশালাব গঠন সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। আদ্য রঙ্গাচার্য মনে করেন চতুবস্র নাট্যশালার মধ্যভাগে বর্গাকার মঞ্চ অবস্থিত এবং এই কেন্দ্রীয় মঞ্চেব চাবদিক ঘিবে দর্শকবৃন্দেব জন্যে আসনেব ব্যবস্থা করা হয়।[৩৫] অপব দিকে কপিলা বাৎস্যায়ন ও পবিত্র সরকারের মতে দর্শকবৃন্দের আসনের ব্যবস্থা মঞ্চেব বিপরীতে। উভয়ে নেপথ্যগৃহ ও রঙ্গশীর্ষের আযতন ভিন্নভাবে উল্লেখ করলেও নাট্যশালাব সামগ্রিক বিন্যাস ও খুঁটি স্থাপন প্রায় এক (চিত্র ৩৩, ৩৪ দ্রষ্টব্য)।[৩৬]

উল্লিখিত নক্শা দুটিতে নাট্যশালাব বহির্দেযাল, মঞ্চ ও নেপথ্যগৃহপৃথককাবী দেয়াল এবং মঞ্চের উচ্চতর বেদির পরিবর্তে নকশায় স্থাপিত খুঁটিসমূহের ছক অনুসাবে অপর কিছু খুঁটি সংযোগ করলেই বাংলার বর্গাকৃতিবিশিষ্ট নাটমণ্ডপ, বিশেষত শ্রীনগরস্থ চণ্ডীমণ্ডপটিব সাথে প্রায় মিলে যায়। অপর দিকে, শ্রীনগবস্থ জমিদারবাড়ির নাটমণ্ডপটির খুঁটি অপসাবণ করে এর চতুর্থ দিকে দর্শকের জন্যে উপবেশন ব্যবস্থা কবলেই এই মণ্ডপটির আকৃতি প্রায় নাগার্জুনাকোণ্ডার নাট্যশালার মতোই দাঁড়ায়।

অদ্যাবধি ত্রিকোণাকৃতিবিশিষ্ট কোনো স্থাপত্যিক নিদর্শন দেখা যাযনি বিধায় ত্র্যস্র নাট্যশালা রহস্যাবৃত রয়ে গেছে। অবশ্য আদ্য রঙ্গাচার্য মনে কবেন এই ধবনেব নাট্যশালায় দর্শকমণ্ডলী মঞ্চেব তিনদিকে আসন গ্রহণ করতেন।[৩৭]

প্রাচীন ও মধ্যযুগের আলঙ্কাবিকগণ ভরতমুনি প্রণীত নাট্যশালার প্রকারভেদ মেনে নিলেও সারদাতনয় তাঁব 'ভাবপ্রকাশনম' (দ্বাদশ শতাব্দী) গ্রন্থে ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে, মন্দির প্রাঙ্গণে তিন প্রকার নাটমণ্ডপ নির্মাণ করা যায়, যেমন, চতুরস্র, ত্র্যস্র এবং বৃত্তাকার। গীতা সেনগুপ্তের মতে মহাস্থানগড়ের কার্তিকেয় মন্দিবের নাটমণ্ডপটি ছিল বৃত্তাকাব।[৩৮] এ ছাড়া, পূর্বে খাজুরাহ-এর জগদম্ব মন্দিরের বৃত্তাকাব মণ্ডপ এবং উড়িষ্যার লিঙ্গরাজ, অনন্ত বাসুদেব, জগন্নাথ ও সূর্য মন্দিরসমূহের বর্গাকার নাটমণ্ডপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব অনুমান কবা সঠিক হবে যে, খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী অথবা তৎপূর্বে ভরতমুনি যে অস্থায়ী নাট্যশালা নির্মাণের কথা আলোচনা করেছেন দ্বাদশ শতক অথবা তৎপূর্বে মন্দির প্রাঙ্গণে সে নাট্যশালাই স্থায়িত্ব লাভ করে উড়িষ্যা, খাজুবাহ এবং দক্ষিণ ভারতের প্রস্তরনির্মিত নাটমণ্ডপরূপে। তাহলে কি এ সকল নাটমণ্ডপ থেকেই বাংলার নাটমণ্ডপ বিকাশ লাভ করেছে?

শিল্প-বিপ্লবপূর্ব সকল সমাজের শাস্ত্রীয়, দববারি অথবা উচ্চাঙ্গ শিল্পকলা জনগণের মাঝে প্রচলিত লোকশিল্পেরই পরিশীলিত রূপ। প্রাচীন গ্রিক-নাট্যধারায় জনগণের fertility rite থেকে ডিথিব্যাম্ব, ডিথিব্যাম্ব থেকে ট্র্যাজেডি এবং সেই ট্র্যাজেডি থেকেই Poetics-এর জন্ম। একইভাবে রোমান-নাট্যধারায় মাইম, প্যান্টোমাইম ও আতেলীয় প্রহসন, এলিজাবেথীয় ইংল্যান্ডের নাট্যধারায় 'মিস্টেবি', 'মিরাকল্', 'মরালিটি' নাট্যরীতিসমূহ এবং জাপানি-নাট্যধারায় 'ডেংগাকু' ইত্যাদি লোকনাট্য থেকেই রোমান কমেডি, এলিজাবেথীয় ট্র্যাজেডি ও কমেডি এবং 'নো' নাটকের বিকাশ

ঘটেছে। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী নাগাদ ভারতে যে নাট্যশাস্ত্র সংকলিত হয়েছিল তা অবশ্যই কোনো এক ব্যক্তি রাতারাতি সৃষ্টি করেননি, ঠিক যেমন ওডিসি, রামায়ণ, মহাভারত কোনো এক ব্যক্তির রচনা নয়। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে একটি নাট্যশাস্ত্রের অস্তিত্ব কেবল এ কথাটাই ইঙ্গিত দেয় যে, তৎপূর্বে জনগণের মাঝে বলিষ্ঠ কোনো এক কিংবা একাধিক নাট্যরীতি প্রচলিত ছিল। এ ক্ষেত্রে নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখকৃত দুটি প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ। একটিতে ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে বলেছেন, এটি সৃষ্টির পূর্বে জনগণের কদর্য রুচির কারণে সমাজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এ রুচির রাহুগ্রাস থেকে জনজীবন উদ্ধারের জন্যে দেবতাগণ ব্রহ্মার দ্বারস্থ হন। অবশেষে ব্রহ্মার অনুগ্রহে একটি বিশুদ্ধ ও শিল্পগুণসম্বলিত নাট্যনির্মাণ-নির্দেশিকা, অর্থাৎ 'নাট্যশাস্ত্র' সৃষ্টি হয়।

হে ব্রাহ্মণগণ, পুরাকালে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যখন সত্যযুগ অতিক্রান্ত হল এবং বৈবস্বত মন্বন্তরে ত্রেতাযুগের আরম্ভ হল এবং জনগণ ইন্দ্রিয়ভোগে আসক্ত হয়ে কাম ও লোভের বশবর্তী হল, ঈর্ষা ও ক্রোধান্বিত হল;.... তখন মহান ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ ব্রহ্মাকে বললেন— আমরা এমন একটি আনন্দদায়ক বস্তু চাই যা (যুগপৎ) শ্রব্য ও দৃশ্য। যেহেতু বেদচর্চা শূদ্রগণের শ্রবণযোগ্য নয়, সেই জন্য অপর একটি পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করুন যা সকল বর্ণের উপযোগী।.... (শ্লোক ৭-১২)। (তারপর ব্রহ্মা ভাবলেন)— আমি ইতিহাস নিয়ে পঞ্চম নাট্যবেদ সৃষ্টি করব.... যা হবে সকল শিল্পের প্রদর্শক। (প্রথম অধ্যায়, শ্লোক ১৪-১৫)[৩৯]

এ প্রসঙ্গে আদ্য রঙ্গাচার্যের ব্যাখ্যা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে আমাদের এই তথ্য স্বীকার করে নিতে হবে যে, উপরূপক ধাঁচের থিয়েটার পূর্বকার যুগ থেকেই ছিল এবং একটি বিশেষ অধ্যায়ে এই থিয়েটারের অবনতি হয়েছিল, যে-অবনতিকে ভরত 'হীন, ইতর ও অশিক্ষিত' অবস্থা বলে নির্দেশ করেছেন। শুধু তখনই দেবতারা বা ব্রাহ্মণেরা হস্তক্ষেপ করে থিয়েটারকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে রুচিসম্মতভাবে সংগঠনের সিদ্ধান্ত করেন। এরকম সংগঠনের প্রথম যে-প্রচেষ্টা আমরা জানি তা হল 'নাট্যশাস্ত্র', ভরতমুনি যার রচয়িতা বলে কথিত।[৪০]

দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি বর্ণিত হয়েছে ভরতভূমি প্রযোজিত প্রথম নাট্য 'অমৃতমন্থন' প্রসঙ্গে। নাটকটিতে দৈত্যরা দেবগণ কর্তৃক পরাজিত দেখান হয়েছিল বলে এর অভিনয়কালে অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ দৈত্যদের রোষানলে পড়েন এবং নাট্যাভিনয় পণ্ড হয়ে যায় [শ্লোক ৫৩ (খ)-৭৬ (খ)]। ভবিষ্যতে এ ধরনের বিঘ্ন থেকে রক্ষার জন্যে ভরতমুনি ব্রহ্মার সাহায্য প্রার্থনা করেন।

তারপর ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে বললেন— হে মহামতি, সযত্নে (উত্তম) লক্ষণ সমন্বিত একটি রঙ্গালয় নির্মাণ করুন [শ্লোক ৭৮ (খ)-৭৯ (ক)]।

এ রঙ্গালয় পূর্বে প্রচলিত উন্মুক্ত মণ্ডপের চারপাশে প্রবেশপথযুক্ত দেয়াল ব্যতিরেকে অন্য কিছু নয়। 'নিম্ন' শ্রেণির জনগণ (দৈত্য) দ্বারা সৃষ্ট বিঘ্ন (হট্টগোল, আক্রমণ) হতে 'উচ্চ' শ্রেণির সুধী ও বিদগ্ধ মহল (দেবতা, ব্রাহ্মণ) দ্বারা প্রযোজিত নাটক রক্ষার্থেই দেয়াল সৃষ্টি করা হয়। এ ব্যাখ্যার সমর্থন মেলে নাট্যশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেখানে নাটশালার ছাদ প্রসঙ্গে প্রায় কিছুই বলা হয়নি। খুঁটি স্থাপন প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তাতে ধারণা হয় যে, বহু প্রচলিত কোনো ব্যবস্থার ঈষৎ পরিবর্তন করা হয়েছে। উপরন্তু, নাট্যমঞ্চ নির্মাণ প্রসঙ্গে মাটি ও কাঠের ব্যবহার একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে।

বৃহত্তর ভারতের সর্বত্র প্রচলিত লোকনাট্যধারায় অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের রীতি আজও অনুসৃত। মন্দির প্রাঙ্গণে অবস্থিত নাটমণ্ডপের বাইরে অনুষ্ঠিত সকল নাট্যানুষ্ঠান এখনও অভিনীত হয় অনুষ্ঠানটির জন্যে বিশেষভাবে নির্মিত রঙ্গমঞ্চে (তা সে গৃহ প্রাঙ্গণে চাঁদোয়া ঢাকা একটি কোণা

হোক, কিংবা বাঁশ ও কাঠ দ্বারা নির্মিত উঁচু বেদি হোক) এবং কোনো প্রকার বিঘ্নের সম্ভাবনা থাকলে আয়োজকমণ্ডলী রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ পরিবেষ্টনকারী অস্থায়ী দেয়াল নির্মাণ করেন। উদাহরণস্বরূপ যাত্রা প্যান্ডেলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

অতএব, উল্লিখিত উদ্ধৃতি ও আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত নাট্যশালা নির্মাণ-পদ্ধতি জনগণের মাঝে প্রচলিত কোনো মঞ্চনির্মাণ-পদ্ধতিরই পরিশীলিত রূপ। কিন্তু কেমন হতে পারে দুই হাজার বছরের প্রাচীন নাট্যশালা নির্মাণের সেই লৌকিক প্রথা? লোকশিল্প তথা জনগণের শিল্পের ইতিহাস রচিত হয় না। অর্থনৈতিক কারণে তাদের নির্মাণ-কৌশল ইট-পাথরের মতো ব্যয়বহুল উপাদানে সমৃদ্ধ নয় বলে জনগণের শিল্পকর্ম দরবারি শিল্পকর্মের মতো স্থায়িত্ব লাভে ব্যর্থ হয়। অতএব, বর্তমানে প্রচলিত প্রথা এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত উপাত্যনির্ভর অনুমান ছাড়া গতি নেই।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বৈদিক যুগে গৃহনির্মাণ উপাদান ছিল বাঁশ, মাটি, পাতা ও ঘাস। গাছের পাতা কিংবা ঘাস দ্বারা নির্মিত এবং বক্র অথবা কৌণিক ছাউনিযুক্ত বৈদিক যুগের কুঁড়েঘরের ভূমি-নক্শাগত আকৃতি ছিল সাধারণত বৃত্তাকার। বিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়ে বৃত্তাকার কুঁড়েঘর রূপান্তরিত হয় উপবৃত্তাকার (oval) কুঁড়েঘর এবং বাঁশ, খড়, তালপাতা, গোলপাতা প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যারেল-আকৃতিবিশিষ্ট ছাউনি নির্মিত হয়। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে বিভিন্ন কারণে গৃহনির্মাণ উপাদান হিসেবে কাঠের প্রচলন ঘটে। এ সকল গৃহের ভূমি-নক্শাগত আকৃতি বৃত্ত ও উপবৃত্ত থেকে আয়তক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়, যদিও আচ্ছাদনের জন্যে পূর্বে প্রচলিত ব্যারেল-আকৃতি বজায় থাকে।[৪১] আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে নির্মাণ উপাদান হিসেবে ইটের ব্যাপক প্রচলন ঘটে, যদিও এর পূর্বে মোহেনজোদারো এবং হরপ্পায় এর ব্যবহার দেখা গিয়েছিল। পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পাথরের ব্যাপক প্রচলনের পূর্বে এটাই ছিল প্রধান নির্মাণ উপাদান।[৪২]

বিশেষজ্ঞ মহলের উল্লিখিত মতামতের আলোকে অনুমান করা ভুল হবে না যে, বাংলার লোকজ নাটমণ্ডপ প্রাচীন বৈদিক ও বৈদিক-উত্তর যুগের বাঁশ, ঘাস (খড়) ও কাঠ দ্বারা গৃহনির্মাণ ঐতিহ্যেরই বর্তমান রূপ। নাট্যশাস্ত্র সংকলন– পূর্ব যুগে লোকায়ত জীবনে উল্লিখিত উপাদান দ্বারা নির্মিত মণ্ডপে নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হত। এ ঐতিহ্যের বিবর্তনেই উড়িষ্যার ভাগবত ঘর, আসামের ভাওনাঘর এবং বাংলার নাটমণ্ডপ-এর আবির্ভাব ঘটেছে। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত ত্রিবিধ নাট্যশালা লোকজ নাটমণ্ডপের পরিশীলিত রূপ। তিনি লোকায়ত জীবনে প্রচলিত কাঠামোর সাথে হয়তো নেপথ্যগৃহ, ভূমি থেকে উচ্চতর মঞ্চবেদি এবং প্রেক্ষাগৃহের সোপান যুক্ত করেছিলেন অধিকতর সুবিধার জন্যে। একই সাথে নাট্যানুষ্ঠান নির্বিঘ্ন রাখার জন্যে নাট্যশালা উন্মুক্ত রাখার পরিবর্তে কাঠ অথবা ইটের দেয়াল দ্বারা আবেষ্টনের সুপারিশ করেছিলেন। একাদশ শতাব্দী অথবা তৎপূর্বে এ সকল নাট্যশালা প্রস্তরে রূপান্তরিত হয়েছিল, যার নিদর্শন দক্ষিণ ভারত, উড়িষ্যা ও খাজুরাহ মন্দিরসমূহের নাটমণ্ডপ। উড়িষ্যার মন্দির-স্থাপত্যরীতির প্রভাবে হট্টনগরস্থ শিব মন্দিরের মতো নাটমণ্ডপ বাংলায় নির্মিত হয়েছে বটে, কিন্তু এ দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রীনগরস্থ রক্ষাচণ্ডী নাটমণ্ডপের ন্যায় প্রাচীন লোকজ রীতিই প্রচলিত ছিল। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক প্রভাবের ফলে লোকজ নাটমণ্ডপের ছাউনি নির্মাণে খড়ের পরিবর্তে ঢেউ টিনের প্রচলন ঘটে। বিশ শতকে বহু স্বচ্ছল জনপদে ইউরোপীয় নির্মাণ-প্রক্রিয়া অবলম্বনে নাটমণ্ডপ নির্মাণ করা হয়, যেমন, ফরিদপুরের জগৎবন্ধু মন্দিরের নাটমণ্ডপ। অপর দিকে উনিশ শতকের গোড়া থেকে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত জমিদারগৃহে যে নাটমণ্ডপ নির্মিত হয়েছে তা লোকজ নাটমণ্ডপেরই উন্নততর সংস্করণ।

ভাওয়াল রাজবাড়ির ন্যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সকল মণ্ডপ পাকা মেঝে, লৌহস্তম্ভ ও টিনের দোচালা কিংবা চৌচালা ছাদবিশিষ্ট।

নাটমণ্ডপ ও জাতীয় নাট্যশালা

নাটমণ্ডপ যদি দুই সহস্র বছর প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসৃত বাংলাদেশের নিজস্ব নাট্যশালা হয় এবং একই ঐতিহ্যে যদি সংস্কৃত নাট্যশালা, উড়িষ্যার নাটমন্দির এবং দক্ষিণ ভারতের রঙ্গমণ্ডপ গ্রথিত হয়, তবে নিশ্চয়ই মানতে হবে যে, এটি জনগণের ব্যবহারিক নাট্যচর্চায় পরীক্ষিত এমন এক অভিনয়ক্ষেত্র যা বিবিধ নাট্যিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। এই মঞ্চ গ্রিক, এলিজাবেথীয়, চীনা অথবা নো নাট্যমঞ্চের তুলনায় কোনো অংশেই কম গতিশীল নয়। খুব কম খরচে, দিনে অথবা রাতে, বাস্তবধর্মী নাটক ছাড়া যে-কোনো নাটক এই মণ্ডপে অভিনয় করা যায়। উপরন্তু, কিছু কিছু নাটমণ্ডপে দর্শক উপবেশন-স্থান ও অভিনয়-স্থানসমূহের আকৃতি ও অবস্থান প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করা সম্ভব, যা অন্য কোনো নাট্যশালায় সম্ভব নয়। যেমন, মুক্তাগাছা আটাআনি জমিদারবাড়ি নাটমণ্ডপটির চতুর্দিকে দর্শক উপবেশন-স্থান নির্দিষ্ট করে কেন্দ্রে রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করা যায় (চিত্র ৩৫), তিন দিকে দর্শক পরিবেষ্টিত অবস্থায় যে-কোনো এক দিকে রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করা যায় (চিত্র ৩৬), এক দিকে রঙ্গমঞ্চ ও বিপরীত দিকে দর্শক উপবেশন-স্থান নির্ধারণ করা যায় (চিত্র ৩৭) , দুই বিপরীত দিকে দর্শক উপবেশন-স্থান এবং অপর দুই বিপরীত দিকে ও মধ্যভাগে রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করা যায় (চিত্র ৩৮), এমন কী, দর্শক-উপবেশন স্থান ও রঙ্গমঞ্চ তির্যকভাবেও স্থাপন করা যায় (চিত্র ৩৯)। ষাট-এর দশক থেকে Performance Group ও Living Theatre-এর মতো বহু বিখ্যাত off-off-Broadway নাট্যদল flexible নাট্যশালায় অভিনয় করেছে বিধায় প্রসেনিয়াম রঙ্গমঞ্চের বিকল্প হিসেবে এ ধরনের উন্মুক্ত নাট্যশালার জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আমাদের কাছে তার চাইতে বড় কথা— নাটমণ্ডপ প্রকৃত অর্থে বাংলারই ঐতিহ্যবাহী নাট্যশালা।

বর্তমানে আমরা যদি এমন এক 'জাতীয় নাট্যশালা' নির্মাণ করতে চাই যা সম্পূর্ণভাবে এ দেশের মানুষের নাট্যচর্চার সাথে সম্পৃক্ত তবে তা অবশ্যই নাটমণ্ডপের আকৃতি অবলম্বনে করতে হবে। ৪০ নম্বর চিত্রে এমনই একটি নাট্যশালার খসড়া ভূমি-নক্শা প্রণয়ন করা হয়েছে। নক্শাটির কেন্দ্রে ৬৪' × ৩২' আয়তনবিশিষ্ট একটি আয়তাকার মণ্ডপ পরিকল্পিত হয়েছে। মণ্ডপটি চতুর্দিকে উন্মুক্ত। আধুনিক নির্মাণপ্রযুক্তি ব্যবহার করা হলে মণ্ডপটির মধ্যভাগে কোনো স্তম্ভের প্রয়োজন হবে না। এর চতুর্দিকে গোলাকার কাঠের খুঁটির উপর টালি দ্বারা চৌচালা ছাদ নির্মাণ করা যেতে পারে। বৃষ্টি হতে রক্ষা পাবার জন্যে চালাসমূহের প্রান্তদেশ অত্যন্ত নিচু হতে হবে (চিত্র ৪১ দ্রষ্টব্য)। মণ্ডপটি চতুর্দিকে উন্মুক্ত অঙ্গন দ্বারা বেষ্টিত। ভূমি-নক্শার এক প্রান্তে সাজঘর, অপর দুই বিপরীত প্রান্তে সেট ও পোশাক রক্ষণাবেক্ষণ কক্ষ এবং অফিস। চতুর্থ প্রান্তে দর্শকবৃন্দের লবি, বক্স অফিস এবং রেস্টুরেন্ট পরিকল্পিত হয়েছে। উল্লিখিত চার প্রান্তের বহিরাংশ পোড়ামাটির ফলকশোভিত দেয়াল দ্বারা ঘেরা এবং ভেতরের অংশের সম্মুখে বারান্দা রয়েছে। এ সকল প্রান্তের ছাদ এক চালাবিশিষ্ট হতে পারে। পরিকল্পিত মণ্ডপটির অভিনয় স্থান ও দর্শক উপবেশন-স্থান প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করা যেতে পারে। বিকৃষ্ট (বিপরীতমুখী) ব্যবস্থায় ৪০ ফুট গভীর দর্শক উপবেশন স্থান নির্ধারিত হতে পারে এবং এ অবস্থায় আনুমানিক একশ দর্শকের স্থান সংকুলান হতে পারে। (অধিকসংখ্যক দর্শকের আসন ব্যবস্থার জন্যে বৃহত্তর মণ্ডপ নির্মাণের পরিকল্পনা করা যেতে পারে)। দর্শকবৃন্দের আসন স্থাপনের জন্যে পায়া ভাঁজ করা যায় এমন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা যেতে পারে।

চতুর্দিক উন্মুক্ত থাকায় এই নাট্যশালায় দিনের বেলা বৈদ্যুতিক আলো ছাড়াই অভিনয় সম্ভব। সবচাইতে বড় কথা, এ নাট্যশালাটি হবে অভিনেতা-অভিনেতাকেন্দ্রিক, যেখানে চোখ ঝলসানো মঞ্চ ও আলোর কারুকাজ থাকবে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। ফলে সামান্য খরচে নাটক মঞ্চায়ন সম্ভব হবে। উপরন্তু, এই নাট্যশালা নির্মাণ ব্যয়বহুল নয়।

কিন্তু তবু যারা প্রসেনিয়াম মঞ্চের 'আধুনিকতা' এবং বাস্তবধর্মী নাটকের মায়া (illusion) ছাড়া নাটক নির্মাণে অপারগ, তাঁদের মন ভরাবার উপায়ও আছে। মুক্তাগাছা আট আনি জমিদারবাড়ি এবং শ্রীনগর জমিদারবাড়ির নাটমণ্ডপদ্বয়ের আলোকে এমন এক নাট্যশালা নির্মাণ করাও সম্ভব যা একাধারে প্রসেনিয়াম এবং flexible নাট্যশালার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। ৪২ নম্বর চিত্রে এমনই এক নাট্যশালার খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হল।

চিত্রের মধ্যভাগে স্থাপিত 'ক' বর্গক্ষেত্রটি (২৪´ × ২৪) অপর এক (বৃহত্তর) বর্গক্ষেত্র 'খ' (৪৮´ × ৪৮)-এর কেন্দ্রে অবস্থিত। একই সমতলভিত্তিক ক্ষেত্র দুটির মধ্যে 'ক' অভিনয়ের জন্যে এবং 'খ' দর্শকবৃন্দের জন্যে নির্দিষ্ট। 'খ' ক্ষেত্রটির চতুর্দিকে স্থাপিত 'গ', 'ঘ', 'ঙ' এবং 'চ' আয়তক্ষেত্রসমূহ প্রতিটি ৩ ফুট উচ্চতা ও ৫৬´ × ২০´ আয়তনবিশিষ্ট। 'চ' ছাড়া অপর তিনটি এলাকা ('গ', 'ঘ' ও 'ঙ') দ্বিতলবিশিষ্ট। উল্লিখিত এলাকা, অর্থাৎ একতলবিশিষ্ট 'চ$_2$' এবং দ্বিতলবিশিষ্ট 'গ', 'ঘ' ও 'ঙ' দর্শকবৃন্দের উপবেশন স্থান। এ অবস্থায় প্রতি আসনের জন্যে ২ ফুট এবং প্রতি সারির জন্যে ৪ ফুট হিসেবে পরিকল্পিত নাট্যশালায় আনুমানিক ৯০০ জন দর্শকের স্থান সংকুলান সম্ভব।

পক্ষান্তরে, একই সমতলভিত্তিক এবং ৪৮´ × ৫৬ আয়তন সম্বলিত 'চ$_1$' ও 'চ$_2$' ক্ষেত্র দুটিকে প্রসেনিয়াম মঞ্চ হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। সে অবস্থায় 'ক', 'খ' এবং দ্বিতলবিশিষ্ট 'ঘ' এলাকাসমূহ দর্শকবৃন্দের জন্যে নির্ধারণ করা যেতে পারে। 'ক' ও 'খ' এলাকাসমূহে দর্শকবৃন্দের উপবেশন ব্যবস্থা করা হলে প্রথম চার সারি আসন মেঝের উপর, দ্বিতীয় চার সারি আসন এক ফুট উঁচু অস্থায়ী বেদির উপর এবং তৃতীয় চার সারি দুই ফুট উঁচু অস্থায়ী বেদির উপর স্থাপন করা যেতে পারে। এই অবস্থায় কমপক্ষে ৫০০ দর্শকের স্থান সংকুলান সম্ভব।

'ঝ' এলাকাটিকে শিল্পীদের সাজঘর, 'ঘ' এলাকাটির ওপরে তৃতীয় তল আলোক-নিয়ন্ত্রণকক্ষ এবং 'ঞ' এলাকাটিকে 'লবি', টিকেট বিক্রয় কেন্দ্র, ক্যাফেটারিয়া ও অন্যান্য প্রশাসনিক এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। পরিকল্পিত নাট্যশালার বহিরাংশ ৪৩ নম্বর চিত্রের মতো হতে পারে।

উপরিউক্ত চিত্রে চৌচালা ছাদ টালি দ্বারা নির্মিত হতে পারে এবং বহিরাংশের দেয়াল পোড়ামাটির ফলক দ্বারা সজ্জিত হতে পারে। নাট্যশালাটির চতুর্দিকে দূর্বাঘাস আচ্ছাদিত ও বৃক্ষশোভিত উদ্যান থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনে এ সকল বৃক্ষের নীচে উন্মুক্ত আসরের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

একটি জাতীয় নাট্যশালা বাংলাদেশের নাট্যকর্মী ও দর্শকদের দীর্ঘদিনের দাবি। সরকারের সদিচ্ছা ও আগ্রহ থাকলে উপরে প্রণয়নকৃত পরিকল্পনার আলোকে এমন একটি নাট্যশালা নির্মাণ করা সম্ভব যা একাধারে হতে পারে আধুনিক, স্বল্পব্যয়ে পরিচালিত এবং একান্তভাবে বাংলাদেশের নিজস্ব আদলে নির্মিত। বাংলাদেশের বর্তমান নাট্যকর্ম সম্পূর্ণভাবে বেসরকারি উদ্যোগে এগিয়ে চলেছে। আমাদের আশা ও দাবি, জনগণ প্রদত্ত যে রাজস্ব দ্বারা শ্বেতহস্তীসম রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালিত হচ্ছে, তার সামান্য একটি অংশ নাট্যশালা নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হোক। এখানে সরকারের

দায়িত্ব কেবল জাতীয় নাট্যশালা নির্মাণ করা, এবং আমাদেব কাজে হস্তক্ষেপ না করা। নাটক নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ আমরাই করতে সক্ষম।

তথ্যপঞ্জি

১. সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ১৫২ ১৫৫।

২. প্রসেনিযাম মঞ্চের উন্মেষ ও বিকাশেব বিস্তাবিত তথ্যের জন্যে দেখুন Oscar Brockett, The Theatre An Introduction (New York Holt, Rinehart and Winston, 1974), পৃ·১৪০-১৫৯।

৩. ডেভিড জে. ম্যাকাচ্চেন, Late Mediaeval Temples of Bengal Origin and Classification (কলিকাতা : এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭২), পৃ. ৬৮।

৪. বৈষ্ণব নাটমন্দির ও যাত্রামঞ্চ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে বর্তমান লেখকেব 'The Evolution of the Performance Space of the Jatra' প্রবন্ধে।

৫. সুকুমার সেন, প্রাচীন বাঙলা ও বাঙালী (কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৭২), পৃ. ৪৮।

৬. শাহানারা হুসেন, The Social Life of Women in Early Mediaeval Bengal (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৮৫), পৃ. ৪৮। নীহারবঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩), পৃ. ৪৫০।

৭. নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৪।

৮. বিনয়কুমাব সবকাব, The Folk Elements of Hindu Culture (নতুন দিল্লি : ওরিয়েন্টাল বুক্স, ১৯৭২), পৃ. ৬৩, ৬৪, ৬৮-৭১।

৯. বিনয় ঘোষ, 'বাংলার চণ্ডীমণ্ডপ', বাংলাব লোকসংস্কৃতি ও সমাজতত্ত্ব (কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী, ১৩৮৬), পৃ. ১৪৭।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৬, ১৫৭।

১২. ডেভিড জে. ম্যাকাচ্চেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮ ২৫, ৩১, ৩৫, ৩৬ ও ৩৭।

১৩. রামরঞ্জন দাস, পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি (কলিকাতা : ফার্মা কে. এল. এম, ১৩৮০), পৃ. ৮২, ৮৩, ১২৯।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯ ও ২৫৭।

১৫. আনানযালওযার এবং আলেক্সান্ডার রীয়া, Indian Architecture (Vol I) Architectonics (দিল্লি : ইন্ডিয়ান বুক গ্যালাবি, ১৯৮০), পৃ. ১৪২, ১৪৫।

১৬. বাংলার লৌকিক নাট্যরীতিসমূহের প্রযোজনাগত বিশ্লেষণে দুটি ধারা পরিলক্ষিত হয় : নাটগীত ও কথানাট্য। কথানাট্যে একজন কথাকার বা গায়েন গান, নৃত্য, মূকাভিনয়, আঙ্গিক ও বর্ণনাধর্মী বাচিক অভিনয়যোগে কোনো কাহিনী এককভাবে পরিবেশন করেন এবং তাঁকে সাধারণত চার-পাঁচজনের দোহার-যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পী সহযোগিতা করেন। উদাহরণস্বরূপ, 'পালাগান', 'গাজীর গান', 'কেচ্ছা-গান' ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অপর দিকে নাটগীত লোকনাট্যসমূহে তিন-চারজন অভিনেতা-অভিনেত্রী বিভিন্ন চরিত্রে নৃত্য সহযোগে গীতাভিনয় করেন এবং কথাকার বা গায়েন ও দোহারবৃন্দ অভিনয় স্থানের একপাশে উপবেশন করে গানের মাধ্যমে কাহিনি বর্ণনা করেন।

১৭. আদ্য রঙ্গাচার্য, ভারতীয় থিয়েটার, অনুবাদ : অরুণ মিত্র, (নতুন দিল্লি : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৭৫), পৃ. ৯৬-৯৮।

১৮. ভি.জি. রামাকৃষ্ণা আইয়ার, The Economy of a South Indian Temple (আন্নামালাইনগর : আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৬), পৃ. ১৪, ১৫।

১৯. উল্লেখ্য যে, গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়-এর মতে, 'ভারতের দৃশ্যকাব্যগুলিতে অভিনয়ের সঙ্গে নৃত্যের বিশেষ সম্পর্ক আছে সেই জন্যই এব নাম নাট্য। নট ধাতুর অর্থ নৃত্য কবা, তাই নৃত্যক্রিয়ার দ্বারা যা করা যায় তা-ই নাট্য। প্রাচীন ভারতে সঙ্গীত অর্থে নৃত্য, গীত ও বাদ্য এই তিনেব সম্মিলিত রূপ বোঝাত।'— ভারতীয় নৃত্যকলা (কলিকাতা : নবপত্র, ১৩৮?), পৃ. ৫২।

২০. জে.সি. মাথুর Drama in Rural India (বোম্বাই : পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৪), পৃ. ৮, ৯। জি.এইচ. তারলেকার, Studies in the Natyashastra (দিল্লি : মোতিলাল বানাবাসী দাস, ১৯৭৫), পৃ. ২৫০, প্লেট ১৪ ও ১৫।

২১. বি.কে. জামুয়ার, The Ancient Temples of Bihar (নতুন দিল্লি : বামানন্দ বিদ্যা ভবন, ১৯৮৫), পৃ. ১০২।

২২. জে.সি. মাথুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০, ১৪।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

২৪. বিস্তারিত তথ্যের জন্যে পারসি ব্রাউন, Indian Architecture . Buddhist and Hindu Period (বোম্বাই : ডি.বি. তারাপোরেভালা সন্স, ১৯৭৬), পৃ. ১০৪, ১০৫। চিত্র নং ২১-২৭ উল্লিখিত গ্রন্থের ৫৮, ৭১, ৭৫, ৭৬ এবং ৮৮ নম্বর প্লেটসমূহ থেকে নেওয়া হয়েছে।

২৫. প্রাগুক্ত, প্লেট ১০৮, নক্শা ২।

২৬. কপিলা বাৎস্যায়ন, The Square and the Circle of the Indian Arts (নতুন দিল্লি : রোলি বুক্স ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৮৩), পৃ. ১৮২, ১৮৩।

২৭. পারসি ব্রাউন, প্রাগুক্ত, প্লেট ১০৭, নক্শা ২।

২৮. বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮।

২৯. গীতা সেনগুপ্ত, বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক (কলিকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৭৫), পৃ. ১৮০। আদ্য রঙ্গাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

৩০. এইচ.ভি. শর্মা, The Theatre of the Buddhist (দিল্লি : রাজলক্ষ্মী পাবলিশার্স, ১৯৮৭), পৃ. ২৯, ৩০।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬, ৫৭।

৩২. ভরতমুনি, নাট্যশাস্ত্র, সম্পাদনা : ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গানুবাদ : ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ড. ছন্দা চক্রবর্তী (কলিকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮০), দ্বিতীয় অধ্যায়, শ্লোক ৭-৮ (ক)।

৩৩. প্রফেসর সুব্বা রাও, 'A Critical Survey of the Ancient Indian Theatre in Accordance with the Second Chapter of the Bharatio Natyashastra', Natyashastra of Bharatmuni, সম্পাদনা : এম.রামকৃষ্ণ কবি (বরোদা : ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট, ১৯৫৬), পৃ. ৪৩৪।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৯।

৩৫. আদ্য রঙ্গাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

৩৬. পবিত্র সরকার, নাটমঞ্চ নাট্যরূপ (কলকাতা : প্রমা, ১৩৮৮), পৃ. ৪৯। কপিলা বাৎস্যায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

৩৭. আদ্য রঙ্গাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

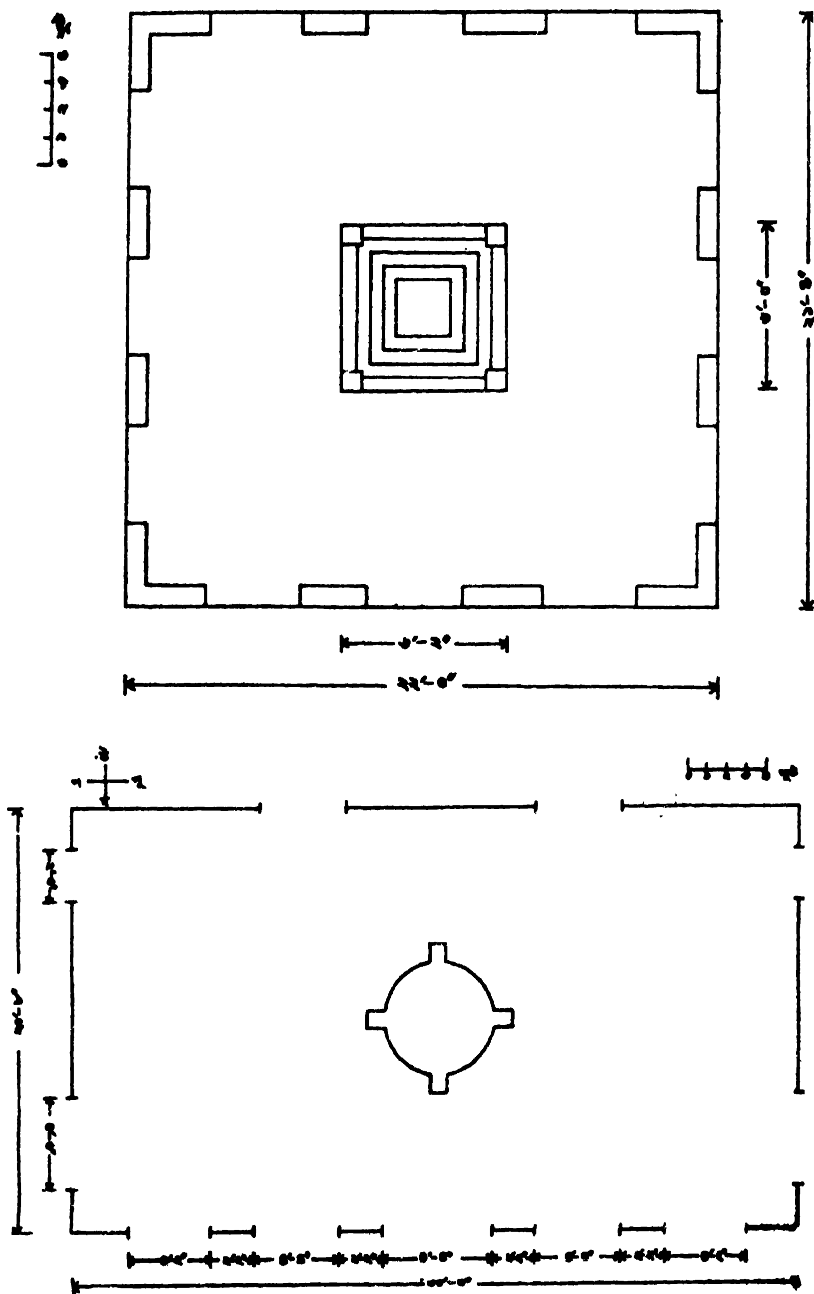
৩৮. গীতা সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০, ১৮১। সুশীলকুমার দে, History of Sanskrit Poetics (লন্ডন, ল্যুজাক, ১৯২৩), পৃ. ২৪১, ২৪২।

৩৯. নাট্যশাস্ত্র (১ : ৭-১২ এবং ১৪, ১৫)।

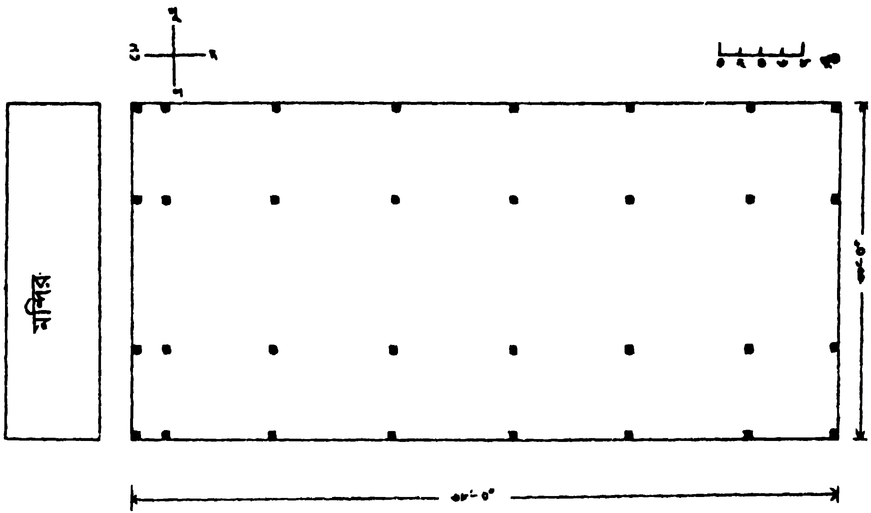
৪০. আদ্য রঙ্গাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫। উপরূপক ধাঁচের থিয়েটার বলতে রঙ্গাচার্য নাট্যশাস্ত্রে গৃহীত নয় অথচ জনগণের মাঝে প্রচলিত থিয়েটার বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন, উপরূপকেব 'অধিকাংশই নৃত্য-নাট্য; এদের বেশির ভাগ চবিত্রগুলি 'নিম্ন' শ্রেণির এবং রঙ্গরসিকতা নিম্নশ্রেণির। এদেব কয়েকটির বিষয় হল প্রেমকাহিনি এবং অধিকাংশেব ভাষা হল উপভাষা।.. এ কথা বিশ্বাস করা অযৌক্তিক হবে না যে, উপরূপকই ভারতীয় থিয়েটারের প্রাচীনতম রূপ।" (পৃ ৪, ৫)।

৪১. পারসি ব্রাউন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩, ৪।

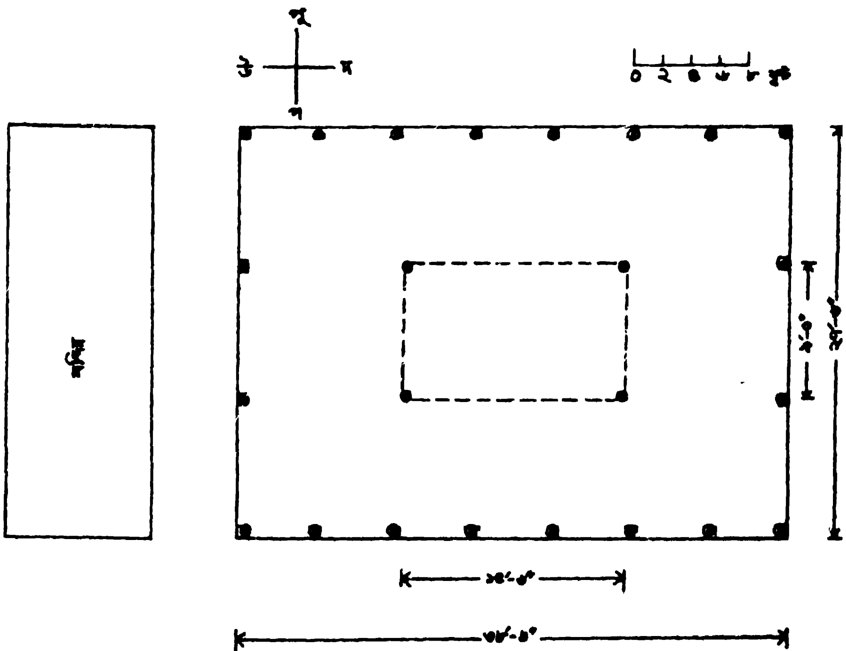
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।



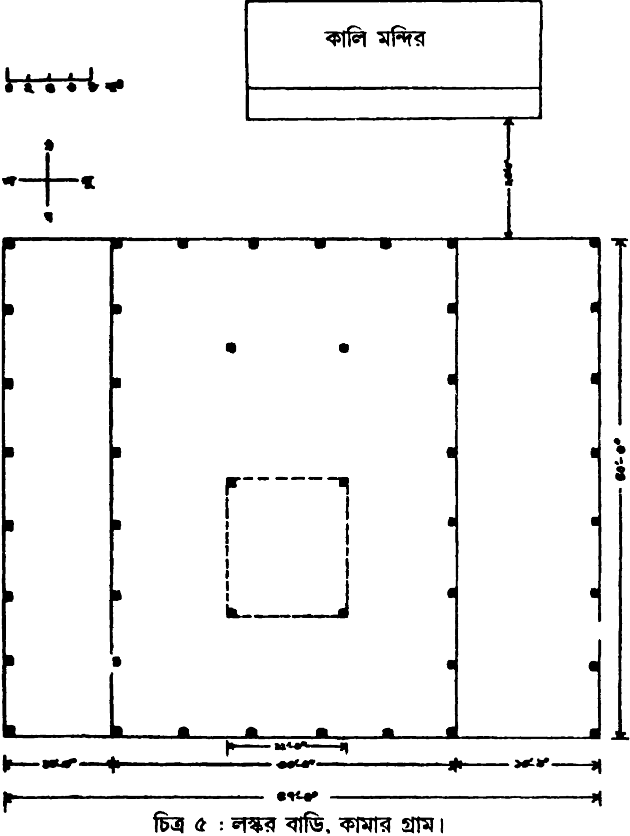
চিত্র ১ : গৌরাঙ্গ মন্দির, খেতুর, রাজশাহী।



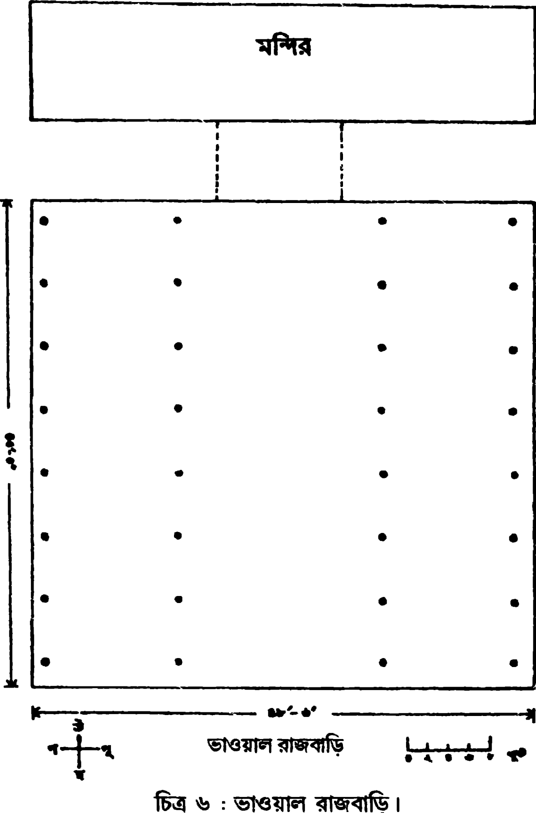
চিত্র ৩ : বারোয়ারি মন্দির, বোয়ালমারী বাজার।



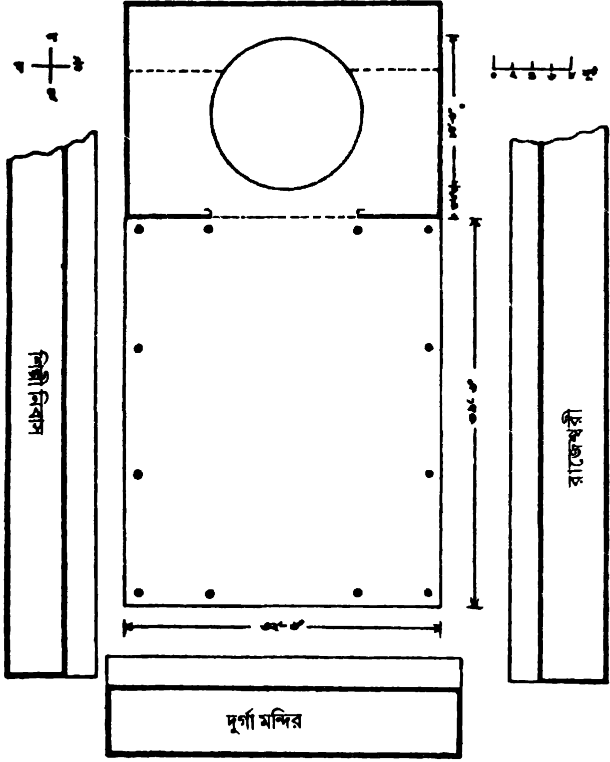
চিত্র ৪ : রাধাগোবিন্দ মন্দির, কামার গ্রাম।



চিত্র ৫ : লস্কর বাড়ি, কামার গ্রাম।

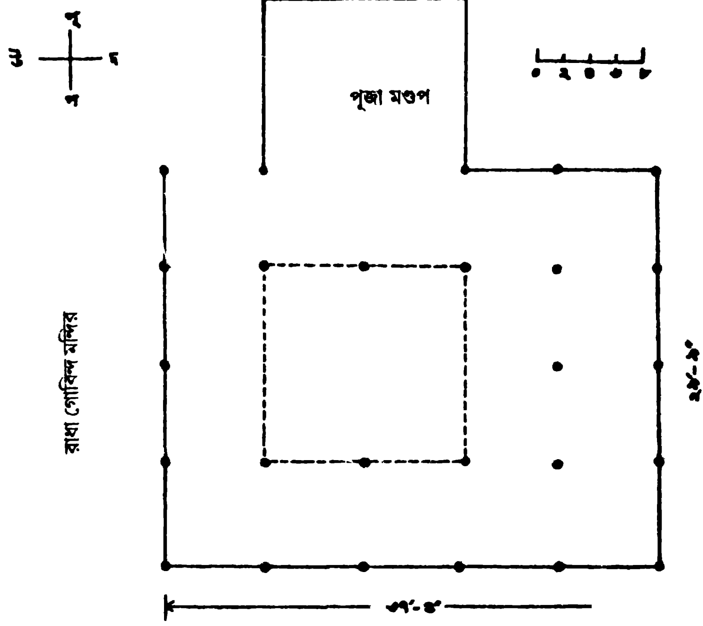


চিত্র ৬ : ভাওয়াল রাজবাড়ি।

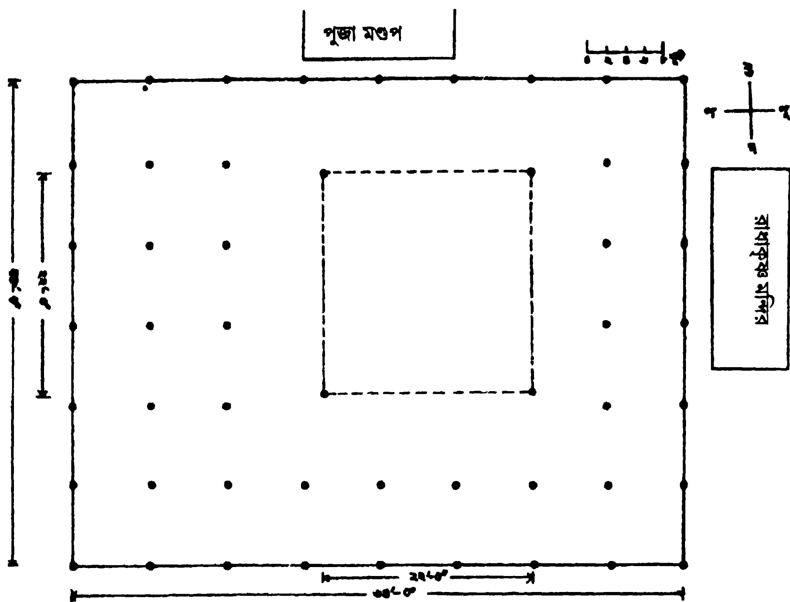


চিত্র ৭ : আটআনি জমিদার বাড়ি।

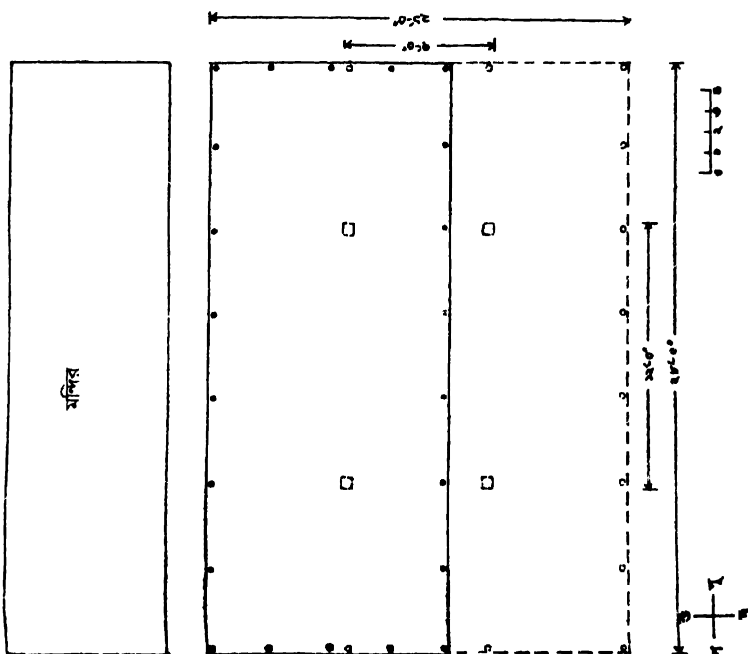
রাধা গোবিন্দ মন্দির



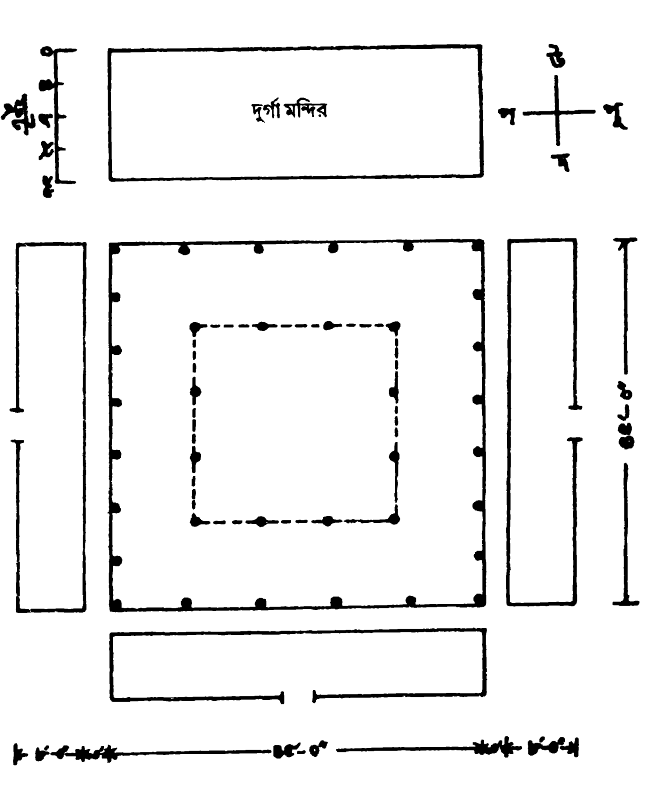
চিত্র ৮ : রাধাগোবিন্দ মন্দির নাটমণ্ডপ।



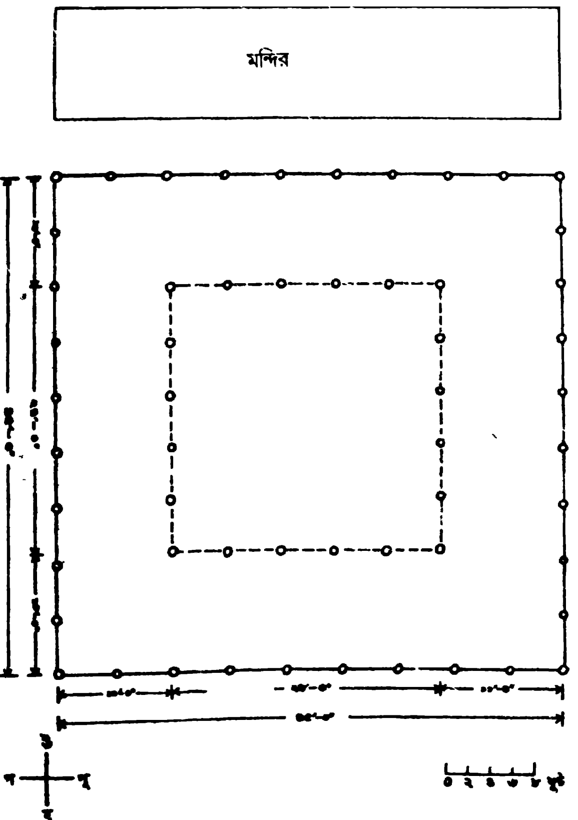
চিত্র ৯ : ছাপ্পান্ন প্রহর মাঠ/রাধাকৃষ্ণ মন্দির



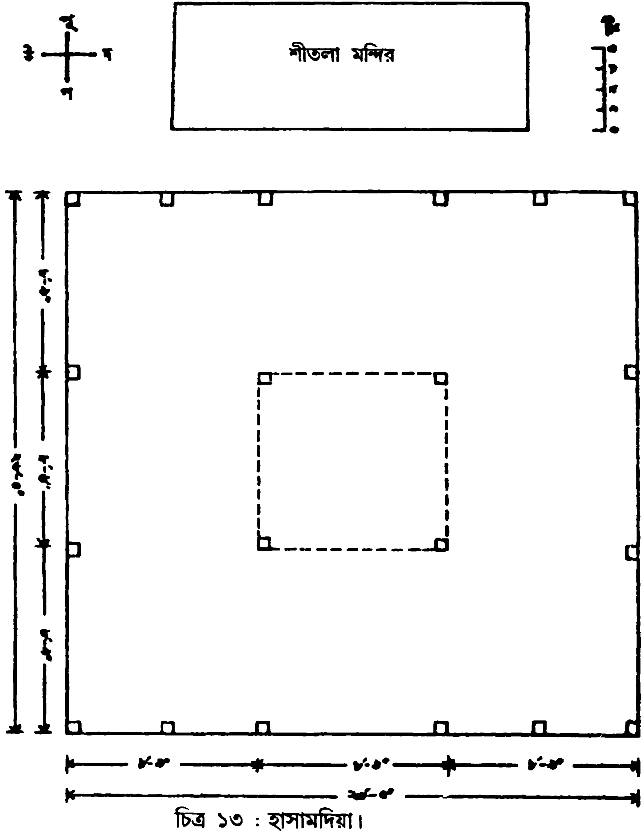
চিত্র ১০ : ঠাকুরপুর, বোয়ালমারী, ফরিদপুর। বারোয়ারি মন্দির।



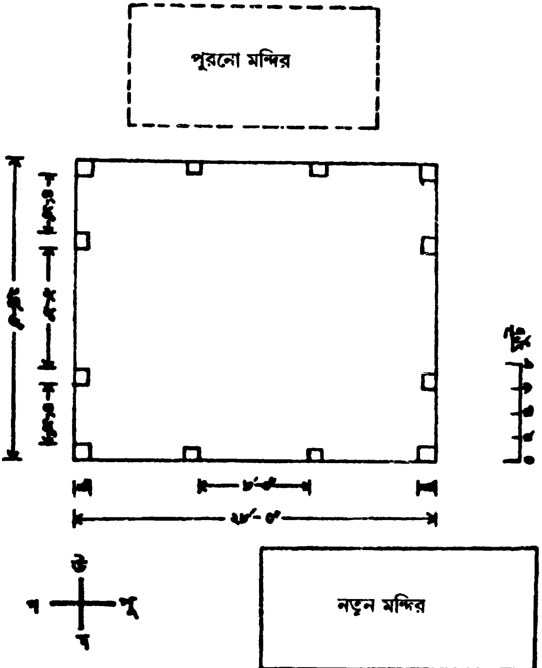
চিত্র ১১ : শ্রীনগর, লোকনাথ সাহা জমিদারবাড়ি।



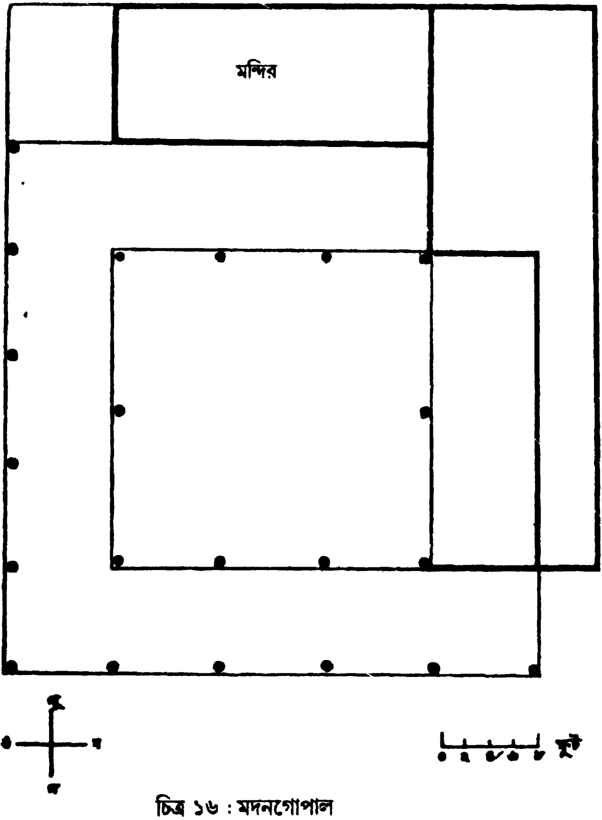
চিত্র ১২ : শ্রীনগর মধ্যপাড়া রক্ষাচণ্ডী মন্দির।



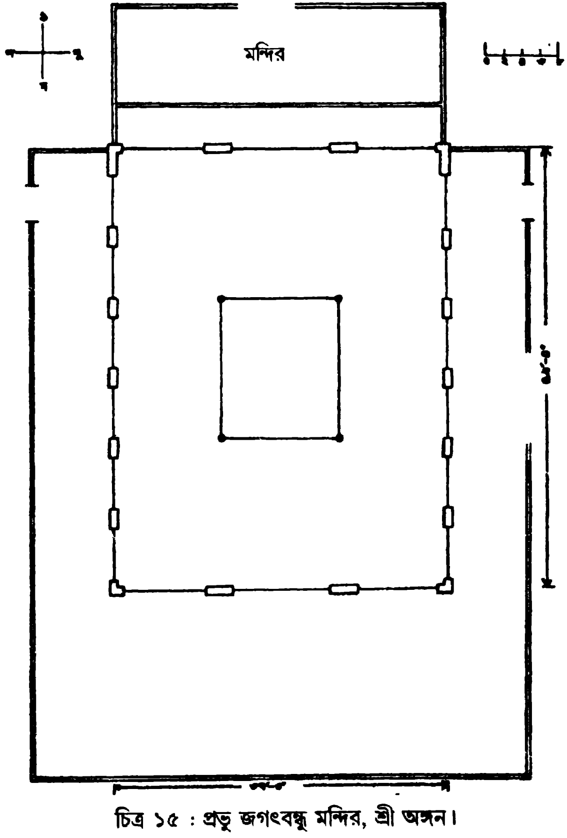
চিত্র ১৩ : হাসামদিয়া।



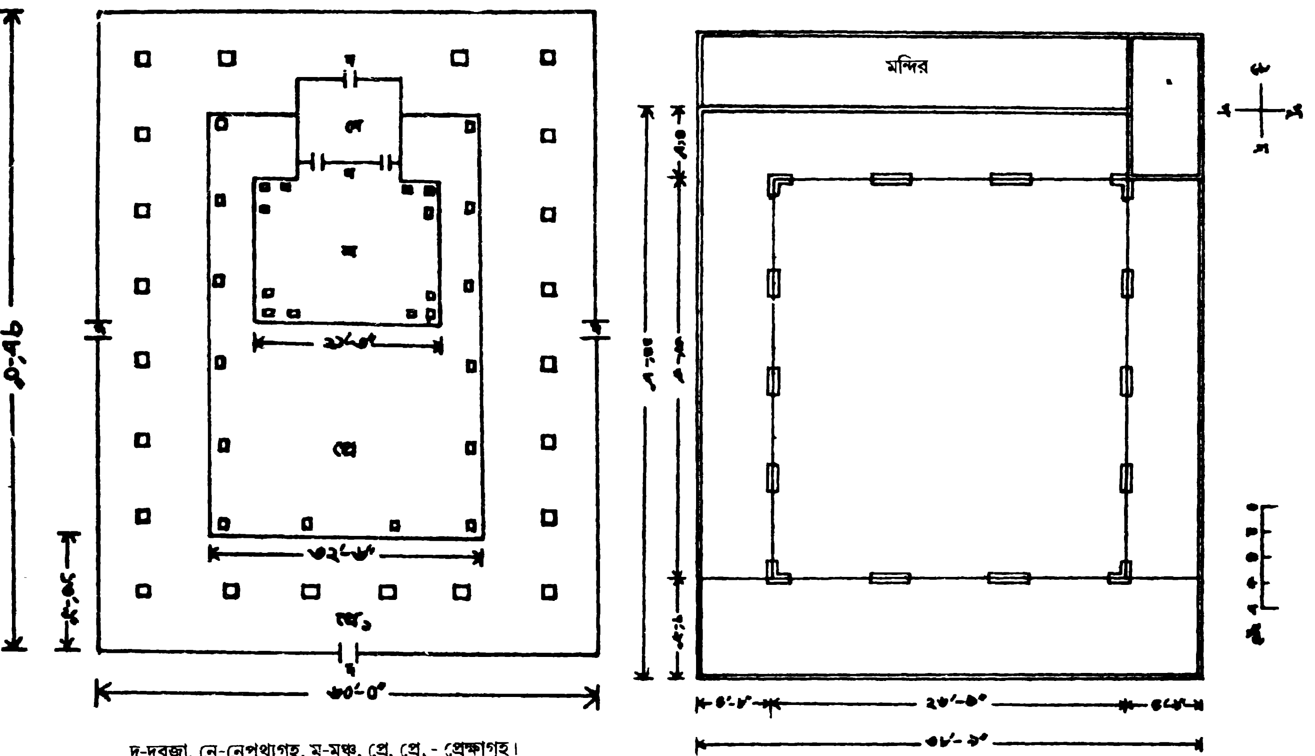
চিত্র ১৪ : কয়রা কালিবাড়ি।



চিত্র ১৬ : মদনগোপাল

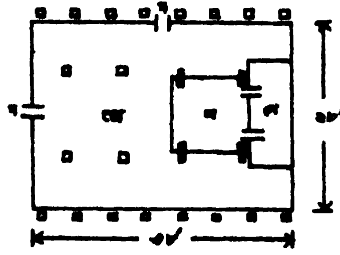


চিত্র ১৫ : প্রভু জগৎবন্ধু মন্দির, শ্রী অঙ্গন।

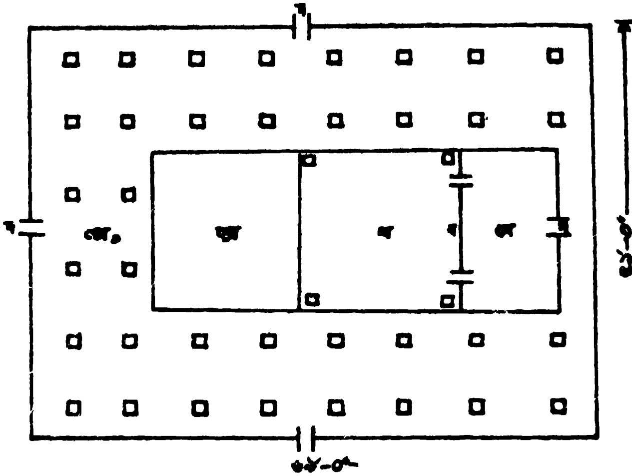


চিত্র ১৮ : কুতাম্বালাম ত্রিচুর।

চিত্র ১৭ : গৌরগোপাল।

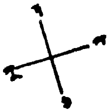


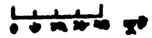
চিত্র ১৯ : গুরুভাইয়ুর।

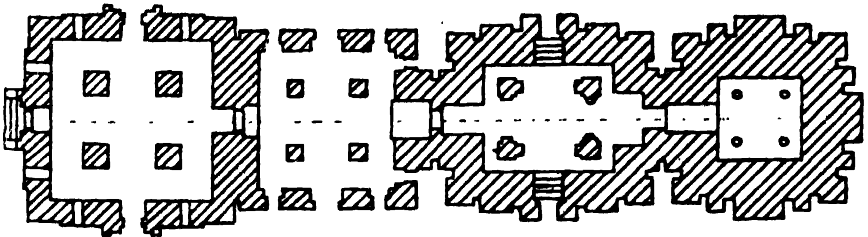


দ-দরজা, নে-নেপথ্যগৃহ, ব-বাদ্যযন্ত্র, ম-মঞ্চ, প্রে, প্রে১- প্রেক্ষাগৃহ।

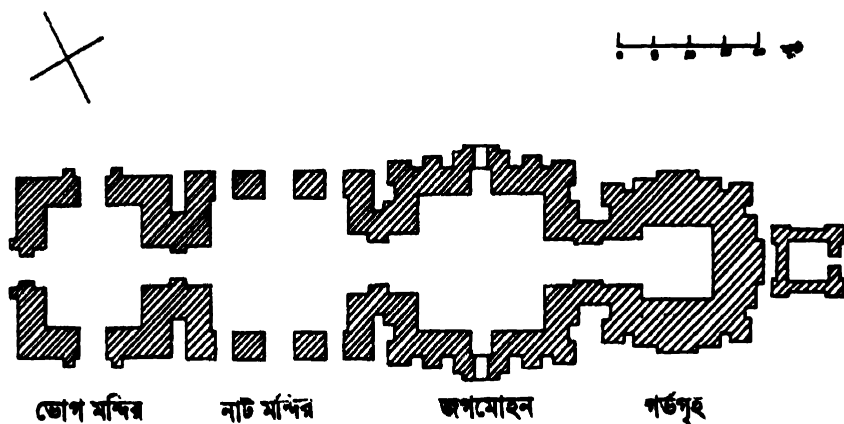
চিত্র ২০ : ইরাঞ্জালাকুড্ডা।



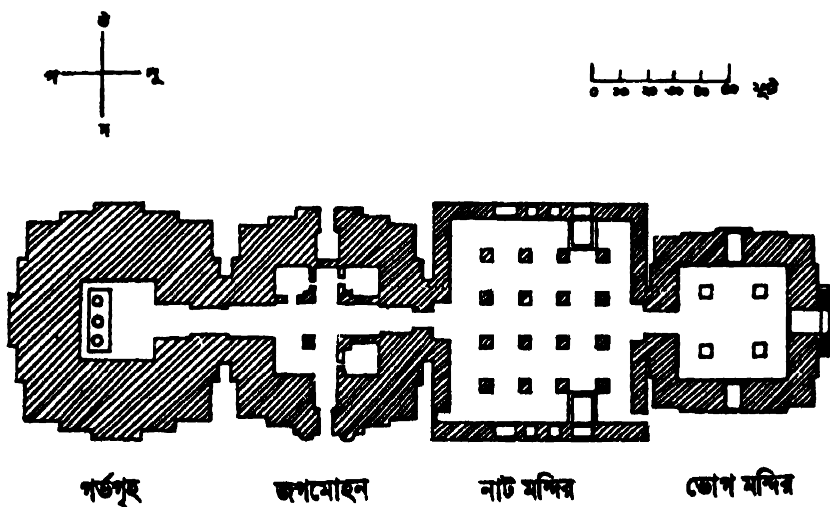




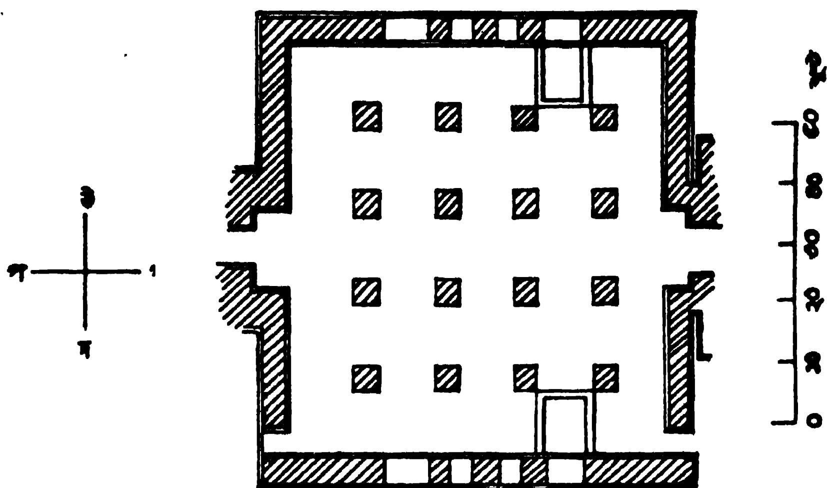
চিত্র ২১ : লিঙ্গরাজ মন্দির, ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা।



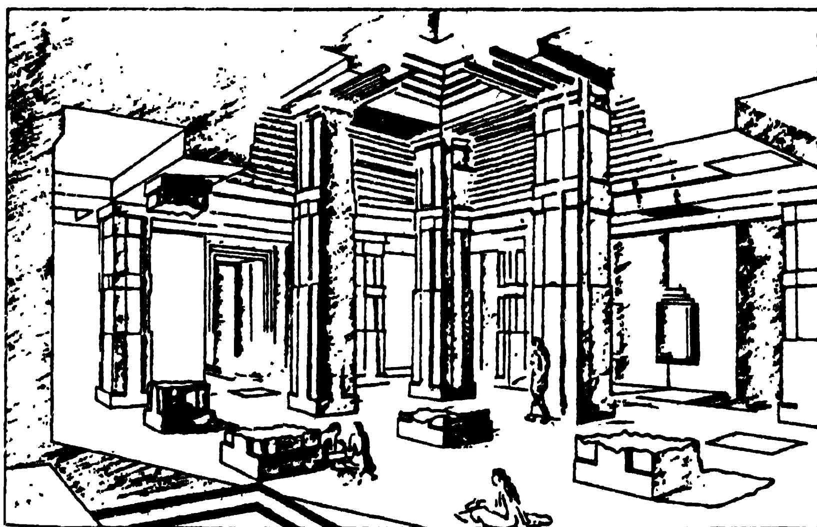
চিত্র ২২ : অনন্ত বাসুদেব মন্দির, ভুবনেশ্বর।



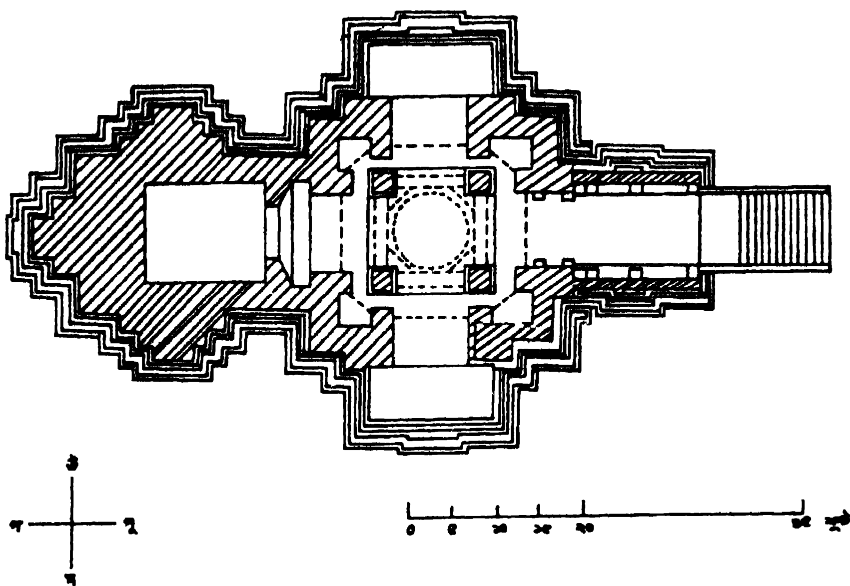
চিত্র ২৩ : জগন্নাথ মন্দির, পুরী।



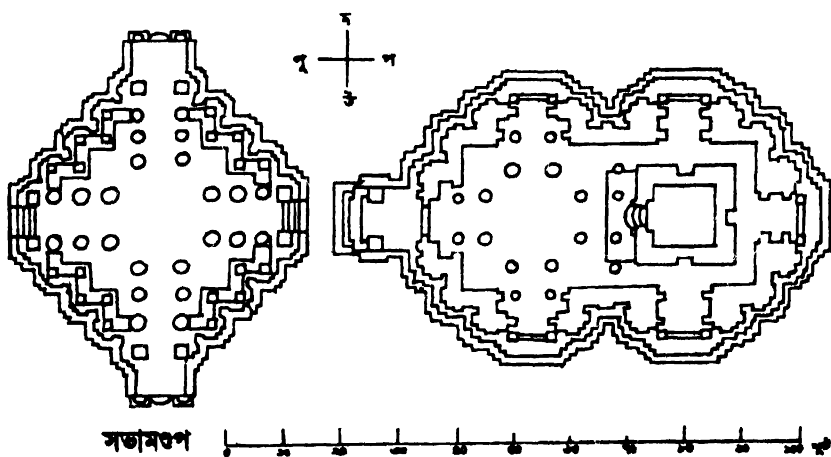
চিত্র ২৪ : নাট মন্দির, জগন্নাথ মন্দির, পুরী।



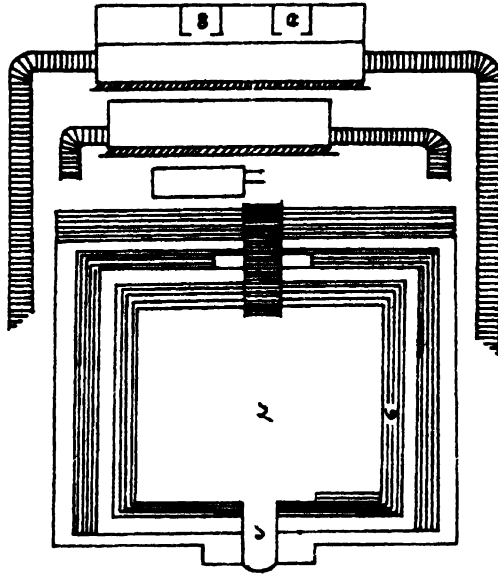
২৫ : নাট মন্দির, জগন্নাথ মন্দির, পুরী।



চিত্র ২৬ : দেবী জগদম্বী মন্দির, খাজুরাহো।

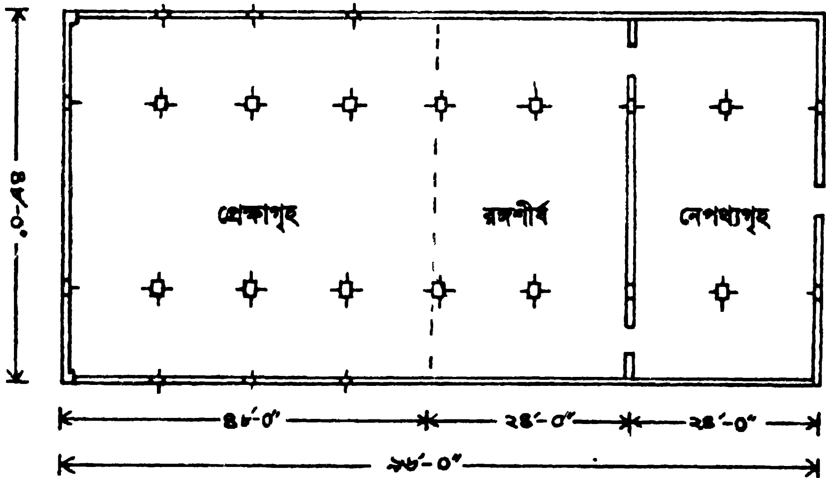


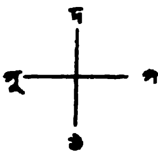
চিত্র ২৭ : সূর্য মন্দির, যোধেরা, বরোদা।



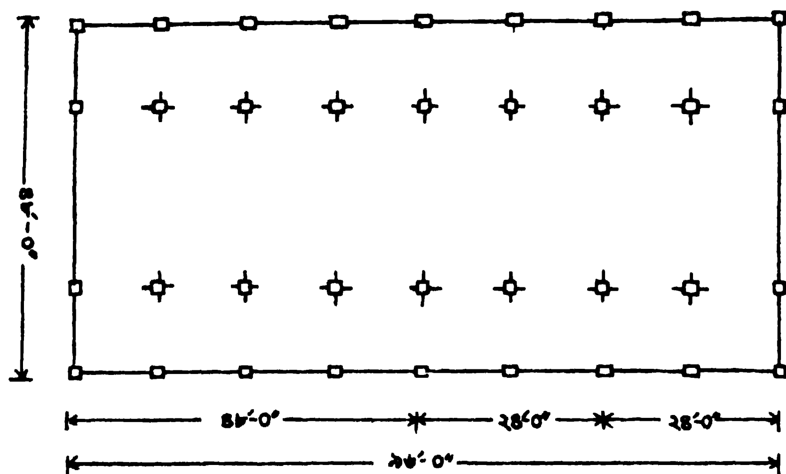
১-প্রবেশ, ২-রঙ্গভূমি, ৩-দর্শক আসন, ৪-মন্দির (হাবিতি), ৫-মন্দির

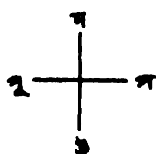
চিত্র ২৮ : নাগার্জুনোকোণ্ডা রঙ্গমঞ্চ।



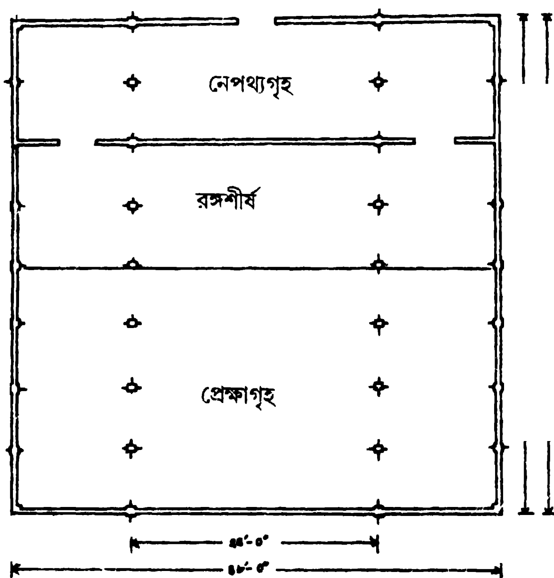


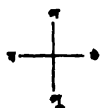
চিত্র ২৯ : বিকৃষ্ট মধ্য নাট্যগৃহ।



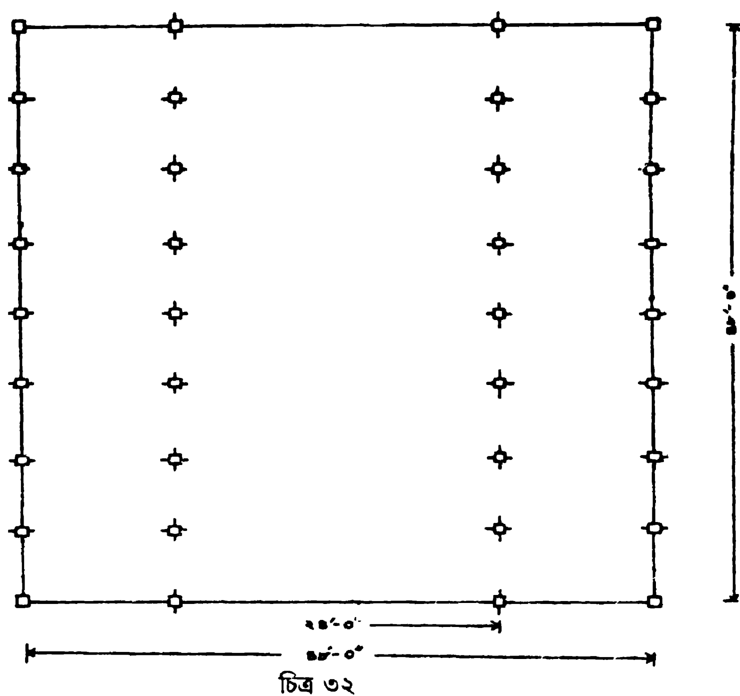


চিত্র ৩০

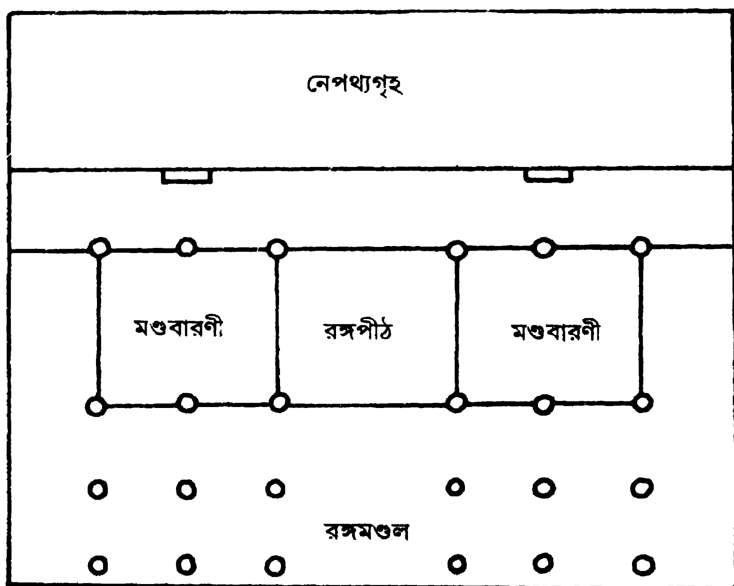




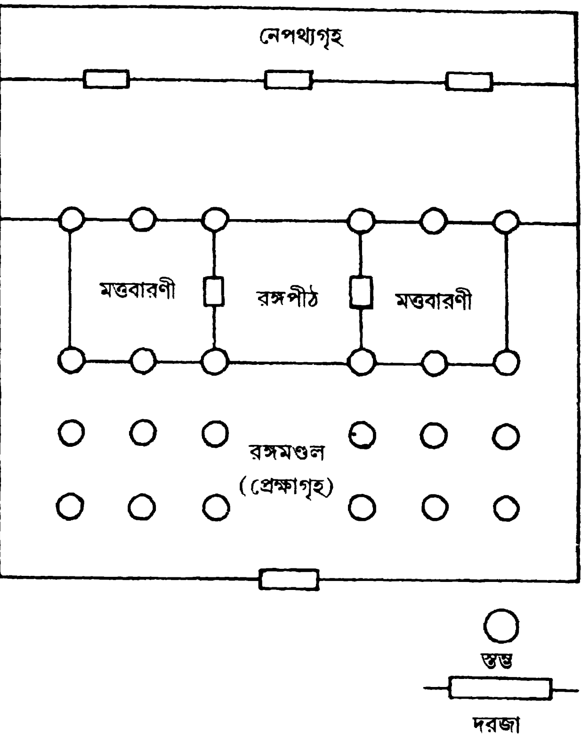
চিত্র ৩১ : চতুরস্র মধ্য নাট্যগৃহ।



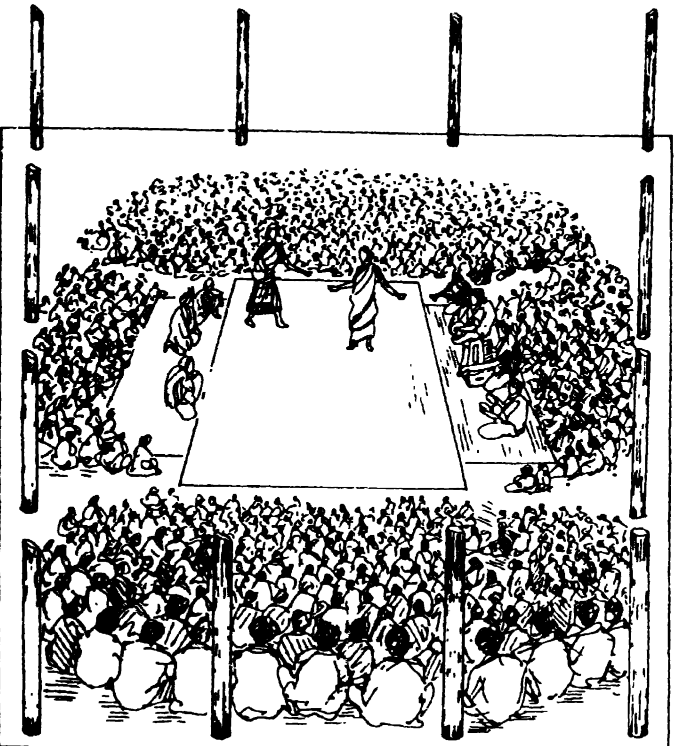
চিত্র ৩২



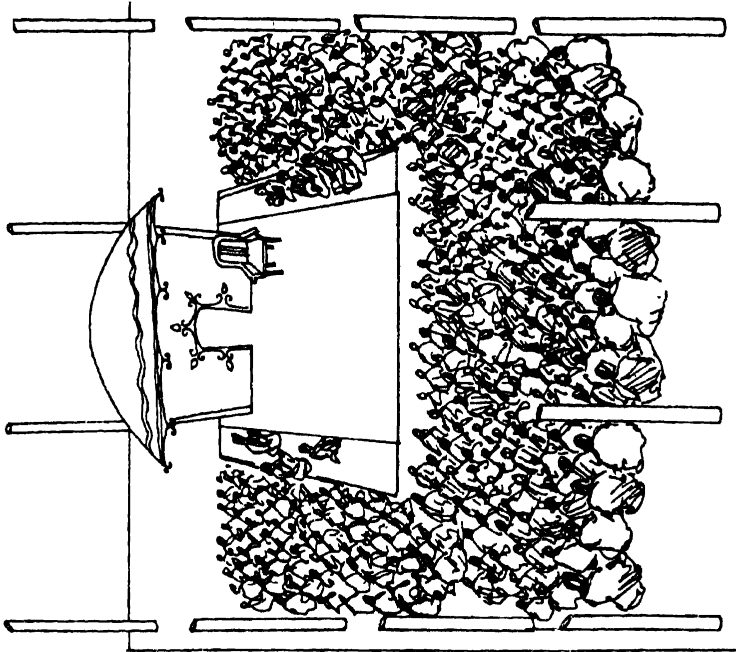
চিত্র ৩৩ : চতুরস্র মধ্য নাট্যগৃহ।



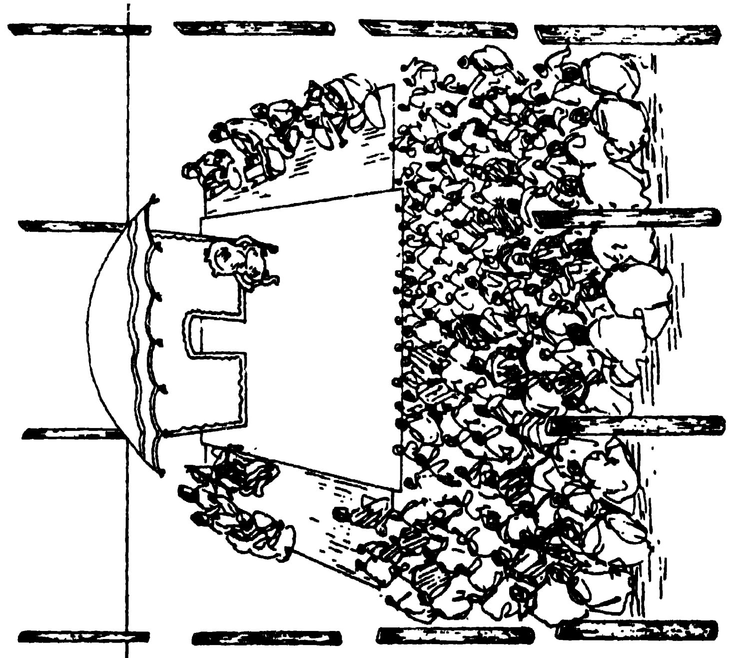
চিত্র ৩৪ · চতুরস্র মধ্য নাট্যগৃহ।



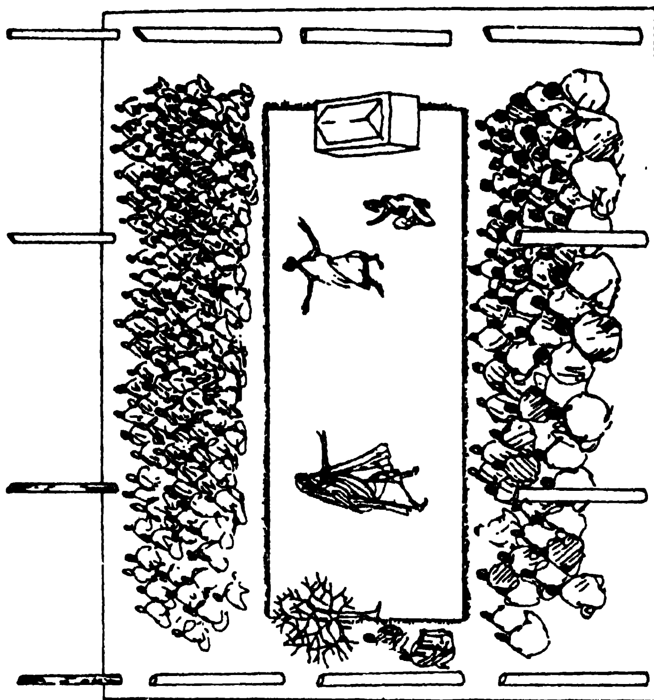
চিত্র ৩৫



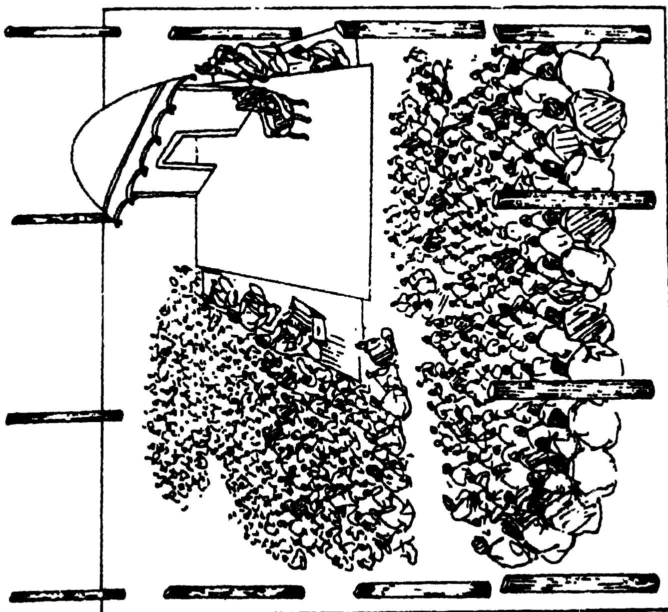
চিত্র ৩৬



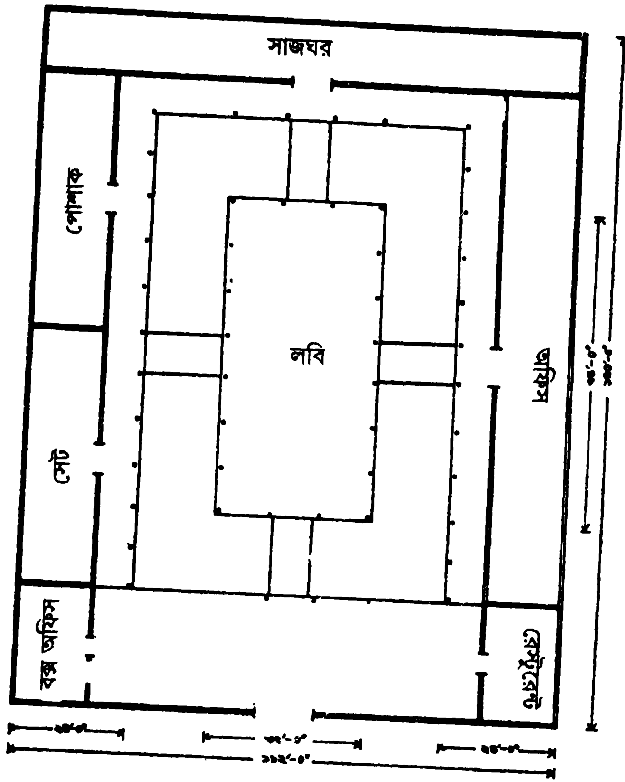
চিত্র ৩৭



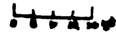
চিত্র ৩৮

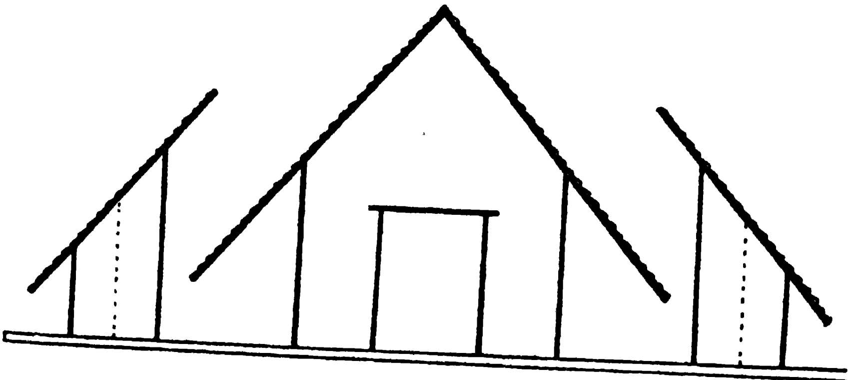


চিত্র ৩৯

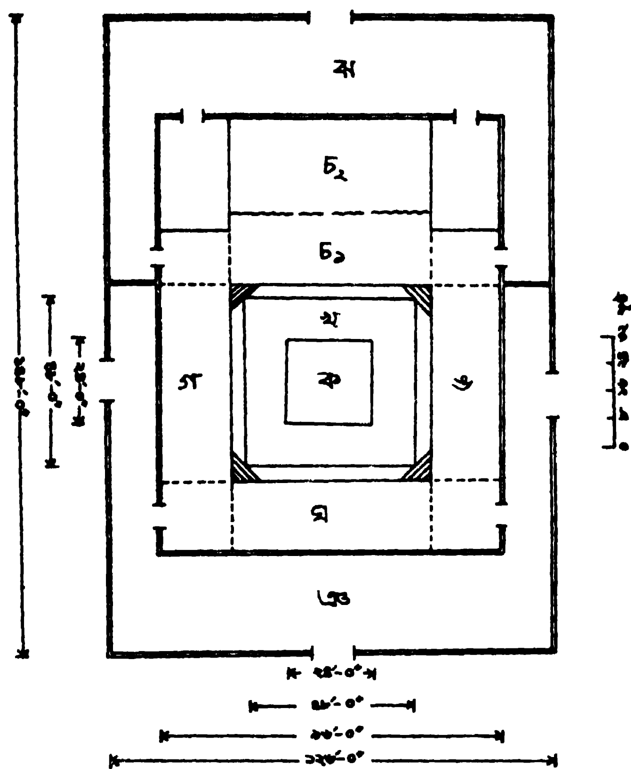


চিত্র ৪০ : জাতীয় নাট্যশালা খসড়া পরিকল্পনা-১

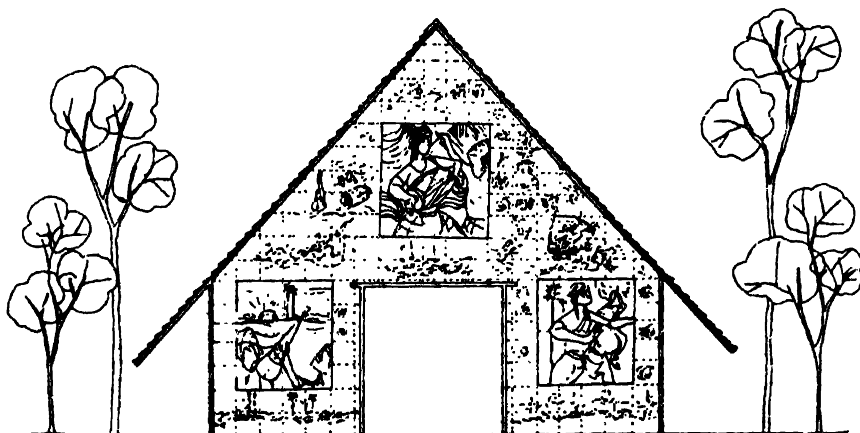




চিত্র ৪১



চিত্র ৪২ . জাতীয় নাট্যশালা খসড়া পরিকল্পনা-২



চিত্র ৪৩

মঞ্চ সমস্যা এবং জাতীয় নাট্যশালা প্রসঙ্গ

গোলাম সারোয়ার

১

স্বাধীনতাব পব বাংলাদেশে যে আন্দোলনেব সূত্রপাত হযেছে, তার একটি দাবিব দিক ছিল নাট্যমঞ্চ নির্মাণ। কেননা নাট্যমঞ্চ ব্যতিরেকে নাটক করা সম্ভব হবে না। এই নাট্যমঞ্চের আন্দোলন শেষাবধি জাতীয় নাট্যশালা তৈরির আন্দোলনে এসে ঠেকেছিল। পরিশেষে সরকাবি প্রতিশ্রুতিতে 'জাতীয় নাট্যশালা' তৈবির কাজও শুরু হয়। অবশ্য ইতিমধ্যে সরকারিভাবে কযেকটি ছোটবড় নাট্যমঞ্চ তৈরিও হযেছে। যদিও এ সকল মঞ্চে নাটক কবরাব উপযুক্ত স্থাপত্য ও কাবিগরি সুবিধাদির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা বয়েছে। তবে যাই হোক প্রতিশ্রুত 'জাতীয় নাট্যশালাব' কাজ যতই এগিয়ে যাচ্ছে নাট্যকর্মীদের উৎসাহ আনন্দ ততই বাড়ছে। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে 'জাতীয় নাট্যশালা' নাট্যকর্মী-সহ সকল সংস্কৃতামোদীদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই জাতীয় নাট্যশালা বাঙালির প্রথম উচ্চারণ নয়। দুই বাংলা যখন একত্রিত ছিল তখন প্রথম ১৮৭২ সালে ৭ই ডিসেম্বর (শনিবার) জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আসলে 'জাতীয় নাট্যশালা' নাট্যকর্মীদের গৌরবের স্থান যা নাট্যকর্মীদের জাতীয় ভাবে স্বীকৃতি দেয, জাতীয় মর্যাদা তৈরি এবং সর্বোপবি নাটক কবার উপযুক্ত স্থান বই অন্য কিছু নয। হয়তো ঐ 'জাতীয় নাট্যশালা'র চেয়ে অনেক বড়ো বড়ো নাট্যগৃহ জাতীয় নাট্য বিষয়ক নানা কিছু পরবর্তী সময়ে হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের পাতায ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বরের গুরুত্ব অনেক বেশি। কিন্তু ঐ সময় 'জাতীয় নাট্যশালা'-ব প্রতিষ্ঠায় গিরিশচন্দ্র বিবোধিতা কবে দল ত্যাগ করেছিলেন। তখন অর্ধেন্দুশেখর 'জাতীয় নাট্যশালা'র অভিনেতাদের শিক্ষা দিয়ে প্রস্তুত করে তুলেছিলেন। তবে বিরোধিতার মূল কাবণ কী ছিল তা জানা নেই।

যাই হোক ইতিমধ্যে একশত বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ইংরেজ শাসনের অবসান হয়েছে। পাকিস্থানি শাসকরাও চলে গিয়েছে। দেশ আজ স্বাধীন। একটি স্বাধীন দেশে তার (বাঙালির) 'জাতীয় নাট্যশালা' স্থাপনের বিষয়টি নিঃসন্দেহে গৌরবের। এখন অনেকেই জাতীয় নাট্যশালা নাট্যমঞ্চের সমস্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ভাবছেন। বর্তমানে এই জাতীয় নাট্যশালার বিষয়ে কেউ কেউ মনে করছেন মহিলা সমিতি কিংবা গাইড হাউসের বিকল্প থিয়েটাব হলের নাম 'জাতীয় নাট্যশালা'। অনেকেব মতে 'কি হবে এসব 'জাতীয় নাট্যশালা' দিয়ে— যে দেশে কোনো পেশাদারি থিয়েটার গড়ে উঠল না?' আবার কেউ মনে করেন— 'আমাদের দেশে যে গ্রুপথিয়েটার চর্চা চলছে— এধরনের নাটক নাট্যশালায় করে দর্শক পাওয়া যাবে না, খরচ বেশি হবে।' তবে এই অভিমতগুলি সীমিত লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু অধিকাংশেরই ধারণা জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হলে নাট্য প্রযোজনার মান বাড়বে, রুচিশীল দর্শক তৈরি হবে। কিন্তু সকলেই যে বিষয়টি নিয়ে বেশি আতঙ্কগ্রস্ত তা হচ্ছে 'জাতীয় নাট্যশালা' আবার আমলা-নির্ভব না হয়ে ওঠে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণে না চলে যায়। এই মিশ্র প্রতিক্রিয়া এখন নাট্যাঙ্গনে সর্বৈব। এ ধরনের অভিমতগুলিব মতোই বেশ কিছু পূর্বের একটি সাক্ষাৎকাব দেখছিলাম 'থিয়েটাব' পত্রিকায়। (২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ডিসেম্বর ১৯৭৪ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত বামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত।)। জাতীয় নাট্যশালা প্রসঙ্গে কলকাতার নাট্যসংস্থা শুভময়ের প্রশ্নেব জবাবে উৎপল দত্ত বলেছিলেন, 'যেহেতু রাষ্ট্র

হইতেছে এক শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীকে দমন করিবাব হাতিয়ারমাত্র সেহেতু বাষ্ট্রায়ত্ত 'জাতীয় নাট্যশালা' হইতেছে এক শ্রেণী কর্তৃক অপর আরেক শ্রেণীকে সাংস্কৃতিক দিক হইতে দমন করিবার অস্ত্রমাত্র। ব্রিটেনের 'জাতীয় নাট্যশালা' স্বভাবতই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুখপাত্র। চীনের 'জাতীয় নাট্যশালা' স্বভাবতই শ্রমিক শ্রেণীর হাতে এক অস্ত্র।'

উপরেব সকল মন্তব্যই ভাবার বিষয়। তবে উৎপল দত্ত যে সময়ে এ কথা বলেছেন সে সময়েরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেই সময়েব প্রেক্ষাপটও বদলে গিয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশেও ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তবে আমলাতান্ত্রিকতা যে নেই তা নয়। তবে স্বাধীনতার পর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং নাট্যচর্চার যে ক্রমবিকাশ এতে নাট্যকর্মীদের উপবই নির্ভর করছে 'জাতীয় নাট্যশালা' আসলে আমলা-নির্ভর হবে কিনা?

আগামী নতুন শতাব্দীর শুভলগ্নে 'জাতীয় নাট্যশালা'-র শুভ উদ্বোধনেব অধীব আগ্রহে গোটা জাতি এখন অপেক্ষমান। তখন নিরসন হবে সকল জল্পনা-কল্পনার।

২

নাট্যশালা নাটকের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডেব একটি পীঠস্থান। যেখানে নাটকের গবেষণা, রচনা, পরীক্ষা, অন্বেষণ, মহড়া, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শন সকল কিছুই করার সুযোগ থাকে। জাতীয় নাট্যশালার প্রতি সকল নাট্যপ্রেমিক এবং দেশবাসীর থাকে অনেক প্রত্যাশা। দেশের সকল নাট্য প্রেমিক কিংবা সংস্কৃতিসেবীরা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের নিকট নাট্য বিষয়ে নানা দিকদর্শন প্রত্যাশা করে থাকে।

জাতীয় যাদুঘর যেমন একটি জাতীয় পুরাকীর্তি প্রাচীন ঐতিহ্যই কেবল সংরক্ষণ করে না পাশাপাশি একটি জাতির সভ্যতা অতীত ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করে। ঠিক তেমনি একটি 'জাতীয় নাট্যশালা' সমসাময়িক মানুষের চিন্তা, চেতনা, সভ্যতা, বুদ্ধিমত্তার উৎকর্ষের মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে, তার প্রযোজনাকর্মের মধ্য দিয়ে জাদুঘর যেমন প্রাচীন পূর্ব পুরুষের ঐতিহ্যের উপস্থাপন করে ঠিক তেমনি একটি 'জাতীয় নাট্যশালা' সবসময় সমকালীন মানুষের চিন্তা ও চেতনার দর্পণ স্বরূপ। সমসাময়িক সভ্যতার মাপকাঠি। জাতীয় চিন্তা-চেতনা, আশা আকাঙ্ক্ষার তীব্র আবেগ বোধ যে শিল্পচর্চার মধ্যে অনুরণন হয় সেই নাট্যচর্চার প্রধান কেন্দ্রটিব একটি পরিচয় জাতীয় নাট্যশালা। 'জাতীয় নাট্যশালা' যেমন আমলাতান্ত্রিক বা আমলা-নির্ভর হয় না তেমনি আবার এই পীঠস্থান সাধারণের কেবলই রঙ তামাশা, হই হুল্লোড়েব রঙ্গশালাও নয়। আমাদের দেশে দীর্ঘ সংগ্রামের পব জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। এই নাট্যশালায় রয়েছে জাতীয় আবেগ ও সংগ্রামের প্রাপ্তির এক দীর্ঘ প্রত্যাশা। এই সংগ্রামে গ্রুপ থিয়েটারের নাট্যকর্মীরাই রেখেছে অগ্রণী ভূমিকা। কিন্তু এই নাট্যশালা কীভাবে তার নাট্যকর্ম পরিচালনা করবে? সেটাও কি শিল্পকলা একাডেমীর নাট্যকলা বিভাগের কর্মকাণ্ডের মতোই অথবা এই নাট্যশালা মহিলা সমিতি কিংবা গাইড হাউসের মতো বিকল্প উন্নত থিয়েটার হল? নানাপ্রশ্ন বিদীর্ণ করে চলেছে সকল নাট্যকর্মীর্কে। তবুও দালান কোঠায় পরিপূর্ণ এই নাট্যশালা যে একদিন জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে এতে সন্দেহ নেই, কেননা ভাবতে পারলে যেমন শুরু হয়, শুরু হলেই তার পূর্ণতা আসে একদিন। 'জাতীয় নাট্যশালা' কোনো অলীক কল্পনা নয়। সারা বিশ্বের সকল সভ্য দেশেই এর অস্তিত্ব রয়েছে। তবে জাতীয় নাট্যশালা কেবল গ্রুপ থিয়েটার নাট্যকর্মীদের একার সম্পত্তি করে ফেললে তা ভুল হবে।

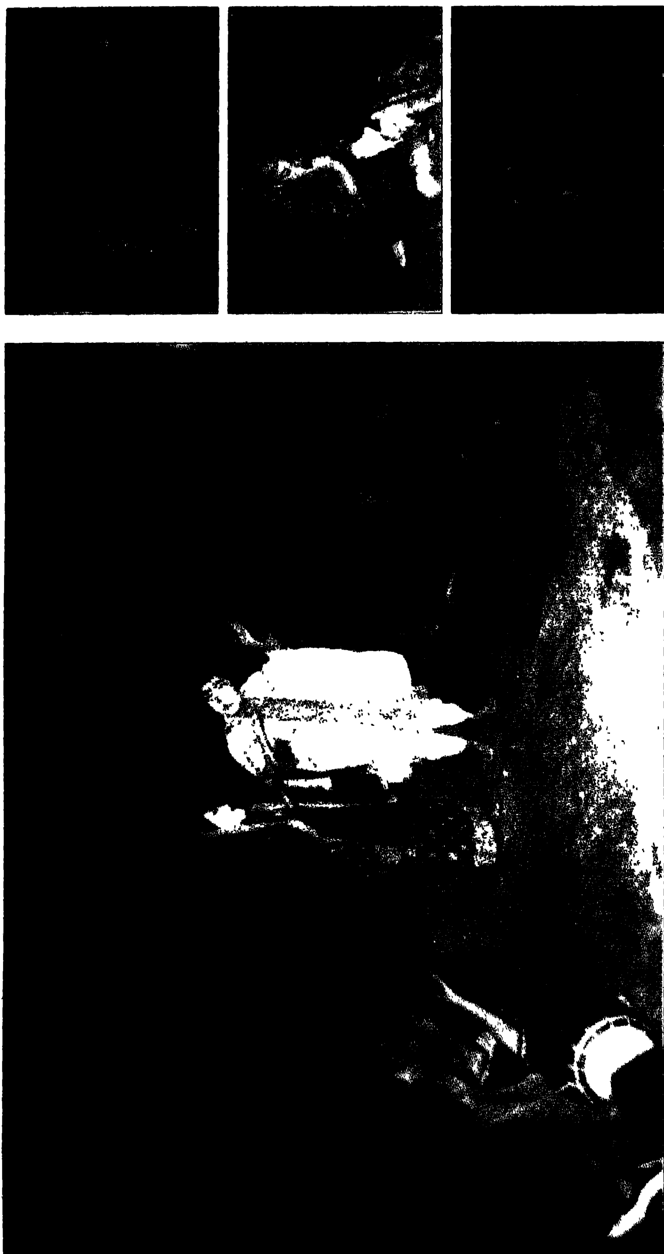
জাতীয় নাট্যশালাকে লোকনাট্য শিল্পী বা যাত্রার অভিনেতার কি নিজেদের বলে দাবি করতে পারবে? লোকনাট্য ও যাত্রাও তো এ দেশের হাজার বছরের নাট্য চেতনাকে সজীব করে রেখেছে।



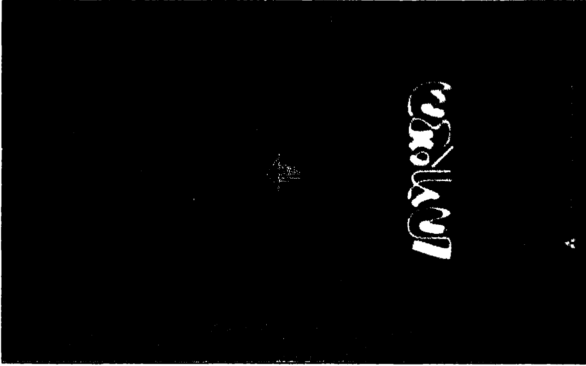
চিত্র ১৩



চিত্র ১৪

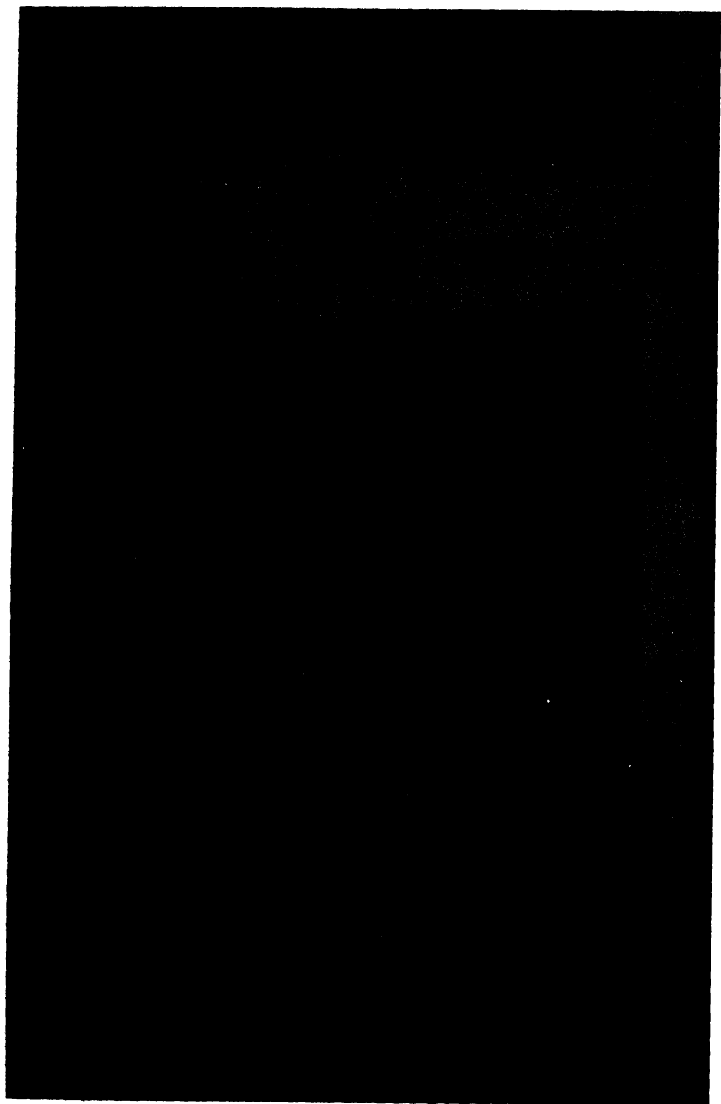


চিত্র ১৩





চিত্র ১৬



চিত্র ১৭

জাতীয় নাট্যশালায় তাদের অংশগ্রহণ কী ভাবে হবে? অভিনয়চর্চার ক্ষেত্রে ও প্রদর্শনের আঙ্গিকতায় ভিন্নতা হয়েছে কিন্তু জাতীয় চরিত্রে সকলেই এক ও অভিন্ন। এই মিল রেখেই জাতীয় নাট্যশালা সকলের অংশগ্রহণের একটা সুযোগ হওয়া উচিত। কিন্তু এ দেশের লোকনাট্যশিল্পীরা জাতীয় নাট্যশালাকে কীভাবে গ্রহণ করবেন, এটাই প্রশ্ন। আমাদের আধুনিক নাটকের চর্চা তো ইংরেজ শাসন আমলের ২০০ বছরের অনুকরণে প্রাপ্ত। কিন্তু আমাদের ঐতিহ্যের নাট্যধারা (লোকনাট্য) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। আধুনিক নব নাট্যকর্মীদের সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগসূত্রতা কম। ফলে আমাদের ঐতিহ্য চেতনার সঙ্গে যে নাট্যরীতি তার নাট্যশালা কেমন হওয়া উচিত সে ভাবনা কেউই করেন না । কিন্তু সকলেই একটি নাট্যশালা দাবি করেন। ফলশ্রুতিতে নাট্যশালা হচ্ছে। ভবিষ্যতে সেখানে নাট্যচর্চাও হবে। আধুনিক ইউরোপীয় নাটকের আদলে নির্মিত নাটকের চর্চাও অনেক সুন্দর হবে। কিন্তু সেখানে দেশের ঐতিহ্য নির্ভর যাত্রা কিংবা লোকনাট্য চেতনার শেকড় সংযোগ হবে কী? দোষ কারোই নেই, ইংরেজ আমলের 'প্রসেনিয়াম মঞ্চ' আমাদের মজ্জাগত। অথচ সেই ইউরোপ আমেরিকাতেই তা এখন পরিবর্তিত হয়েছে। ইচ্ছা করলেই চট করে আমরা কেউ তা পরিবর্তন করতেও পারব না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে বলেছেন 'বিলেতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত এক স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নাড়ানো শক্ত তাহাকে অপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়াও দুঃসাধ্য।' এ আক্ষেপ দীর্ঘদিনের হলেও বাঙালি হৃদয়ে কতটুকু জাতীয় নাট্য ঐতিহ্যের চেতনা ব্যাপ্তিলাভ করেছে। দেশের যে লোকনাট্য ঐতিহ্য, ফোকফর্ম রয়েছে তার কতটুকু গবেষণা কিংবা অন্বেষণ আমরা করেছি? তার হিসাব নিকাশের সময় এখন এসেছে। জাতীয় নাট্যমঞ্চ নির্মাণে নতুন কোনো স্থাপত্য নকশার চমক বাঙালি হৃদয়কে এখনও স্পর্শ করেনি। যে স্থাপত্য নকশা দিয়ে জাতীয় নাট্যশালা হয়েছে, তাও ইউরোপীয় আধুনিক শিক্ষারই অনুকরণ। এই স্থাপত্য নকশা জাতীয় ঐতিহ্য চেতনার অনুরূপ নয়। হবার কথাও নয়, কেননা যে নাটক আমরা মঞ্চায়ন করি তাও তেরা ইউরোপীয় আধুনিক শিক্ষারই অনুকরণ। এখানে প্রধান অন্তরায় সংস্কৃতি চেতনার , তা স্থাপত্যবিদ্যাই হোক অথবা আধুনিক নাটকই হোক। অথচ এ দেশে নাট্য স্থাপত্যের ঐতিহ্য যে ছিল না এমন নয়। ভারতীয় নাট্যশালা একটি নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে ভরত মুনি (খ্রিস্টীয় ২য়-৩য় শতক) বিরচিত নাট্যশাস্ত্রে। নাট্যশাস্ত্রের ২য় অধ্যায়ে নাট্যমঞ্চের গঠন ও অলঙ্করণ সম্পর্কে বলা আছে। ভরত মুনির বিবরণ অনুসারে নাট্যগৃহের তিনটি রীতি। প্রতিটি রীতির তিন রকম মাপ অনুসা... ন রকমের মঞ্চের সম্ভাব্যতার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন:

১. বিকৃষ্ট বা আযতকার
২. চতুরস্র বা বর্গাকার
৩. ত্র্যস্র বা ত্রিভুজাকার।

ক্ষেত্রফল অনুসারে ইহাদের প্রতিটি শ্রেণী ৩টি মাপে বিভক্ত :

ক. জ্যেষ্ঠ (বড়)-১০৮ হাত দীর্ঘ।
খ. মধ্য (মাঝারি)-৬৪ হাত দীর্ঘ।
গ. আবর (ছোট)-৩২ হাত দীর্ঘ।

ভরত মুনি নির্দেশিত নাট্যগৃহ এবং এসব স্থাপত্য নকশা ও পরিকল্পনা আমাদের ঐতিহ্যের নির্দেশক। কালক্রমে এ উপমহাদেশে নানাভাবে তার বিস্তৃতিও ঘটে থাকতে পারে। অধ্যাপক জামিল আহমেদ তাঁর একটি গবেষণা প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন 'প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায়ব্রাহ্মণ্য ও লৌকিক দেবদেবীর উপাসনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল নৃত্য ও গীতসম্বলিত নাট্যগীত ও মঙ্গলগান এবং কথকতা জাতীয় গীত বর্ণনাধর্মী কথানাট্য অভিনয় অনুষ্ঠানাদি। সর্বস্তরের জনগণের সামনে এ

সকল অনুষ্ঠান উপস্থাপনের জন্যে প্রায় সকল মন্দিরের সাথেই নির্মাণ করা হত নাটমণ্ডপ।" অন্যত্র তিনি বলেছেন 'সারিবদ্ধ খুঁটির উপরে স্থাপিত চালা বিশিষ্ট এবং দেয়াল বিহীন একটি উন্মুক্ত চত্বরকে 'নাটমণ্ডপ' বলা হয়। এর ভিত হয় ভূমি থেকে সামান্য উঁচু, আকৃতিগত ভাবে বর্গ অথবা আয়তাকার এবং ছাদ হয় দোচালা, চারচালো কিংবা সমতল।' বাংলাদেশের এই নাট্যমণ্ডপের বিচিত্র রূপ এবং তা পরবর্তীতে নানাভাবে পরিবর্তিত রূপও গ্রহণ করেছে। যদিও এসব আজ প্রায় সব কিছুই বিলীন তবুও কোথাও কোথাও সামান্য জরাজীর্ণ অস্তিত্ব টিকে আছে। এ সব নাটমন্ডপের অস্তিত্ব থেকে আমাদের লোক ঐতিহ্য উপস্থাপনের এবং মঞ্চস্থাপত্যের একটা নকশা অনুমান করা শক্ত কাজ নয়। এখন যদি বলি সেই 'রামও নেই অযোধ্যাও নেই' ওই সব স্থাপত্য নকশার অতীত ঐতিহ্য রোমন্থন করে বর্তমান জাতীয় নাট্যশালা তৈরি করে কী হবে? কারণ এখন কেউ নাটগীত, কথানাট্য, কথকতা পরিবেশন করতে আসবে না। এ কথা ঠিক, কিন্তু যুক্তিতর্কে না গিয়ে আমাদের ঐতিহ্য ভিত্তিক নাট্যচর্চার আধুনিক মননে উপযোগী নাট্যশালা কেন্দ্র তৈরি করা কি খুব কঠিন কাজ? ঐতিহ্য চেতনা এবং চর্চার অবহেলা থেকে যে কুসংস্কার মনের ভিতরে গেঁথে বসেছে তার কি পরিসমাপ্তি হবে না?

এর অর্থ এই নয় যে জাতীয় নাট্যশালা ইউরোপীয় স্থাপত্য নকশার বিরোধিতা করে কথাগুলো বলছি। বর্তমান নাট্যশালার যথাযথ প্রয়োগ হোক তা সকলেই কামনা করে কেননা বর্তমান নাট্যচর্চার বিকাশে এ ধরনের নাট্যশালার খুবই প্রয়োজন। এই নাট্যচর্চার মধ্য দিয়েই হয়তো জাতীয় নাট্যশালার এবং নিজস্ব ঐতিহ্য ভিত্তিক নাট্যচর্চার স্বপ্নও একদিন বাস্তবায়িত হবে। জাতীয় নাট্যশালা সব ধরনের নাটকের প্রযোজনা সহায়ক হোক এটাই সবার কাম্য। অজিতকুমার সেন তাঁর 'রঙ্গালয়ের গঠন' প্রবন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, 'রঙ্গালয়ের নিমার্ণে এ রূপ ব্যাপকতা রাখাই যুক্তিসংগত হইবে যাহাতে তথ্য পরিবেশক নাটক, পেশাদারি নাটক, গীতিনাট্য, পুতুল নাচ, ছায়াছবি, একাঙ্ক নাটক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর অনুষ্ঠানই এমন কি আগত দিনের যে কোনো ধরনের নাটকও প্রযোজিত হইতে পারে। কেননা উক্ত ছকবাঁধা সূত্রগুলির ব্যত্যয়ের অর্থই হইবে কয়েক শ্রেণীর নাট্য প্রযোজনার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া রাখা।' আমাদের ঐতিহ্য নির্ভর নাটমণ্ডপ কিংবা নাট্যশালা প্রসেনিয়াম বা মঞ্চমুখ বিবর্জিত। পাশ্চাত্যের থেকে এখানেই বড়ো পার্থক্য। যাত্রামঞ্চ এবং প্যান্ডেল তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। বর্তমান ইউরোপ আমেরিকার নাটক সমূহ মঞ্চমুখ বা প্রসেনিয়াম বিবর্জিত নাট্যাঙ্গনে নাটক পরিবেশনের ঝোঁক বেশি লক্ষ করা যায়, যাহাই হোক একটি নাট্যশালা সকল ধরনের নাটক মঞ্চায়নের সুযোগ সৃষ্টি করবে এটাই কাম্য। পাশাপাশি এর নির্মাণ এবং ব্যবস্থাপনা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক।

বাংলাদেশে নাট্যমঞ্চের সমস্যা একটি দীর্ঘদিনের নাট্যকর্মীদের শ্লোগান। তবে বিষযটি শুধু নাট্যকর্মীদের নয়, সকল শিল্পমাধ্যমের শিল্পী,কলাকুশলী এবং সংস্কৃতামোদীদের। শুধু এতেই বা কি করে হবে? দর্শকদের জন্য কি বিষয়টি সমস্যা নয়? আসলে মঞ্চ সমস্যা একটি সার্বজনীন সমস্যা। তবে বাংলাদেশে নানাধরনের সমস্যা রয়েছে, সব সমস্যা এক সঙ্গে দেখতে চাইলে মঞ্চ সমস্যা কোনো সমস্যা মনে নাও হতে পারে কারও কারও দৃষ্টিতে।

তবে যাদের দৃষ্টিতে মঞ্চ সমস্যাটি প্রকট এবং যারা সভ্যতার প্রতীক হিসাবে মঞ্চকে বিবেচনা করেন, সেই দিক থেকে যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যাবে ব্যবহারযোগ্য কোনো মঞ্চ না থাকায় এর সমস্যা এক ধরনের। যদি বা থাকত তাহলে সমস্যা হত ভিন্ন ধরনের। আমাদের দেশে মঞ্চ যে নেই সে কথা ঠিক নয়। রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে জেলা শহর পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের মঞ্চ মিলনায়তন এ দেশে বিদ্যমান। একেবারে ব্রিটিশ শাসন আমল থেকে বর্তমান পর্যন্ত সকল সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে নানাধরনের মঞ্চগৃহ তৈরি হয়েছে। তবু সমস্যার কথা বলা হচ্ছে

কেন? তাহলে সমস্যাটা আসলে কোথায়? সকলেই মঞ্চ সমস্যার কথা বলছেন, মঞ্চ নির্মাণের কথা বলছেন, প্রশাসনও মাঝেমধ্যে তৎপর হয়, স্থানে স্থানে দুই একটি তৈরিও হয়ে যায় অথচ অদ্যাবধি সমস্যার কোনো সুরাহা হয় না। এখানে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে 'কমিউনিকেশন'-এর অভাব। যাঁরা তৈরি করছেন এবং যাঁরা ব্যবহার করছেন কেউই কারও ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা এবং পেশা সম্পর্কে সচেতন নন। ফলে মঞ্চশিল্পীদের চাহিদা অথবা প্রযোজনার উপস্থাপন রীতি ও কৌশল বিবেচনা না করেই মঞ্চগৃহগুলো তৈরি হয়েছে যত্রতত্র; কিন্তু সে সব স্থানে সফল প্রযোজনা সম্ভব হচ্ছে না। এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে বর্তমানে যে সব মিলনায়তনে আছে সে সব স্থান নাটক বা নৃত্যনাট্য করবার উপযোগী নয়। তাই সফল প্রযোজনার জন্য যে ধরনের মঞ্চগৃহ আবশ্যক তা নেই বলেই এক ধরনের সমস্যা হয়েছে।

জেলা শহরে অবস্থিত বিভিন্ন মিলনায়তনের বর্তমান অবস্থা দেখে জানা যায় কোনোটিরই নিজস্ব আলোক ও শব্দ ব্যবস্থা নেই। কোনো কোনো মিলনায়তনে বসার আসনও নেই। অথচ এইসব মিলনায়তন তৈরিতে এবং সার্বিক ব্যয় যে পরিমাণ হয়ে থাকে বা হয়েছে তার সিকি ভাগ খরচে এই সমস্ত শব্দ, আলোকসামগ্রী ও দৃশ্যসজ্জার উপকরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব। একটি মিলনায়তনে এই শব্দ, আলোক দৃশ্যসজ্জার স্থাপনা সামগ্রী অত্যন্ত জরুরি, যা ছাড়া মঞ্চ মিলনায়তন ব্যবহার করা অসম্ভব। অথচ কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এসবের প্রয়োগ থাকে না। অনেক সময় মিলনায়তনগুলোর মধ্যে সাধারণ আলোকব্যবস্থার উপকরণ লাগিয়ে মনে করা হয় এ সবের মধ্যেই অনুষ্ঠানের কাজও সম্ভব হবে। আসলে গলদটা কি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নয়? অথচ বাংলাদেশেই আলোক ও শব্দ সামগ্রীর সকল উপকরণ পাওয়া সম্ভব। আমার ধারণা বাংলাদেশের সকল মিলনায়তনে এই ধরনের সংস্কার কাজগুলো করা সম্ভব হলে মিলনায়তন ও মঞ্চসমস্যা অনেকখানি লাঘব হত। এ ক্ষেত্রে একটি বড়ো রকমের সমস্যা রয়েছে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। দেশে যে সব মিলনায়তন রয়েছে এ সব মিলনায়তন যদি কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হত, তাহলে একটি সঠিক দিকনির্দেশনায় সংস্কার বা নিয়ন্ত্রণ করাও যেতে পারত। কিন্তু মিলায়তনগুলোয় এক-একস্থানে এক-এক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান অভিভাবকত্ব বজায় রেখেছেন। যেমন কোনো শহরে ছোটোবড়ো দু'তিনটি মিলনায়তন রয়েছে। কিন্তু দেখা যায় কোনোটি মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ন্ত্রণ করে, কোনোটি জেলা বোর্ড কিংবা জেলা প্রশাসক আবার কোথাও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অধীন। ফলে এ সবের সঠিক অবস্থাটি চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এ দিকটি বিবেচনা করলে আজকের মঞ্চসমস্যা খানিকটা হলেও স্বস্তি আসত। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় মিলনায়তন নিয়ন্ত্রণ মানে একজন কেয়ার-টেকার থাকবেন, তিনি দরজা খুলে দেবেন এবং অনুষ্ঠান শেষে তা বন্ধ করে দেবেন। মিলনায়তন মঞ্চের সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি কর্মী আছেন কিনা বা এসবের দরকার আছে কিনা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা জানেন না। ফলে সংস্কৃতিকর্মীদের ওপরেই ওই বাড়তি দায়িত্ব পরে নিষ্পত্তির। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও পৃষ্ঠপোষকতা বলে একটা কথা আছে, যদিও সময়ে সময়ে তা বদলেছে। যেমন এক সময় সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে রাজা-বাদশাগণ পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। পরবর্তীতে সামন্তপ্রভু, জমিদার তারপর ধনীবণিক শ্রেণি এবং এক রকমের বড়ো ব্যবসায়ী। কিন্তু বর্তমানে কেবলমাত্র রুচিবান ব্যবসায়ী এবং সরকারই এর পৃষ্ঠপোষকতা দিতে পারেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এর উপস্থাপনাও বদলেছে। সেই দিক থেকে এখন রুচিবান ব্যবসার এবং সরকার পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে এলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক বেশি গতিসঞ্চার করবে। এতে কারোরই সন্দেহ নেই।

অতীতে এক সময় শিল্প ছিল কেবলই বিনোদন মাধ্যম, কিন্তু বর্তমানে শুধু বিনোদন নয় জীবনবোধ উপলব্ধি কিংবা সচেতন ও সুস্থ সমাজ তৈরির একটি মৌলিক বিষয় এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমানে যে কোনো শিল্পকলাই একটি পেশাভিত্তিক কর্মাশ্রয়ী শিল্পমাধ্যম। অতীতে শিল্পীদের বৃদ্ধা-ঙ্গুষ্ঠি দেখিয়ে একটি হলঘর কিংবর নাচমহল তৈরি হত একান্ত আপন উপভোগকে চিন্তা করে। কিন্তু এখন সে রকম করে তৈরি হলে সমস্যা থেকেই যাবে। কেননা এখন একটি পেশাদারি মঞ্চ তৈরি করতে হলে পেশাভিত্তিক শিল্পীদের পরামর্শেই তা কবতে হবে, নইলে সমস্যা থেকেই যাবে।

আবার মঞ্চগৃহ নির্মাণের সমস্যার সমাধান হলেই হবে না, পাশাপাশি মঞ্চ পরিচালনার ব্যবস্থাপনা কর্মীও তৈবি করতে হবে। তবেই হয়তো বা সমস্যার একটা সমাধান হতে পারে। নাট্যশালা কীভাবে পবিচালিত হবে এ ব্যাপারে অজিতকুমাব সেন এর একটি মন্তব্য 'প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণেব সময় প্রধান লক্ষ্য রাখিতে হইবে দর্শকের স্বাচ্ছন্দেব প্রতি। মঞ্চে উপস্থাপিত সকল প্রকার দৃশ্য, রূপসজ্জা, আলোক ও অভিনেতার পরিপূর্ণ দৃষ্টি গোচরতা এবং অভিনেতাব কণ্ঠস্বরেব শ্রবণ যোগত্যা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হইতে হইবে। ব্যবস্থাপনায় এমন কোনো ত্রুটি থাকিবে না যাহার ফলে দর্শকের মনোযোগ মঞ্চ হইতে অন্যত্র আকৃষ্ট হইতে পারে। দর্শকের কোনো অসুবিধা হঠাৎ দেখা দিলে উহা দূরীকরণ এবং প্রেক্ষাগৃহ তত্ত্বাবধানেব দায়িত্ব যে সকল কর্মীর ওপর ন্যস্ত থাকিবে তাহাদের ব্যবহার স্বভাবত মধুব এবং সংখ্যা স্বল্পতম হওয়াই কাম্য।' তিনি একই প্রবন্ধে অন্যত্র বলেছেন, 'রঙ্গালয়কে অপব্যয় হইতে দুরে রাখিতে শিল্পীসুলভ ও সার্থকভাবে চালাইতে হইলে পথপ্রদর্শকনীতি হিসাবে 'দক্ষতা' গ্রহণই বাঞ্ছনীয়। দক্ষতাই হইবে বিচারের মানদণ্ড। নাট্যকলার দক্ষতা বলিতে বুঝায় নাটকেব শিল্পীসুলভ চাহিদা সাপেক্ষে দর্শক এবং কর্মীদিগের পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তাব মধ্যে ন্যূনতম সময়ে নাটক সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার সম্ভাব্য কর্তব্য সম্পাদন।'

বাংলাদেশের নাটক : লোকজ উপাদানের ব্যবহার

মমতাজউদ্দীন আহমদ

বাংলাদেশের একটি প্রাচীন জনপদ। এ দেশ পলিমাটি সিক্ত। এ দেশ নদীমাতৃক। ছোটো একটি দেশ। কিন্তু বহু বিচিত্র এ দেশের মানুষ। আর্য-অনার্য, মোঘল-পাঠান, মঙ্গোল-অস্ট্রিক, মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, জমিদার-রায়ত, ধনী-দরিদ্র, শ্রমিক-শিল্পপতি, কালো-ধলো, দীর্ঘ-খর্ব-নানান বৈচিত্র্যে মিলে মিশে আছে বাংলাদেশের মানুষ। এমন ঘন বসতিময় দেশ আর কোথাও নেই। কেউ বাস করছে পাহাড়ের টিলায়, কেউ সমতটে। কারো বাসভূমি গৌড় বরেন্দ্র ভূমিতে। সমুদ্র থেকে সদ্য গেজে ওঠা নরম ঘাসের দ্বীপে কারো ঘর। এমন এক গাঙ্গেয় বদ্বীপের প্রকৃতি ও জনপদ গড়ে উঠেছে দুহাজার বছর ধরে।

বাংলার প্রকৃতি স্নিগ্ধ। বাংলার আকাশ নীল। তবে কখনো কখনো আর্দ্র এই দেশ, আবার রুদ্র এর প্রকৃতি। ভয়ংকর উচ্ছ্বাস এর সাগরে। এমন যে এক দেশ সে দেশের মানুষ বড়ো সরল, বড়ো শান্ত, বড়ো সহিষ্ণু। কিন্তু সময়ে বড়ো কঠিন বড়ো প্রচণ্ড। যেমন এক দিকে হেমন্তের শোভা, অন্য দিকে গ্রীষ্মের নিদারুণ দাহ।

বাংলাদেশ এখনও নগর নয়। নাগরীয় সদ্য সদ্য বাসনার ঢেউ এসে এখনও বাংলাদেশকে অস্থির করেনি। মহানগর ঢাকা এখনও গ্রামীণ সজীবতার রূপ ধুয়ে মুছে ফেলে সম্পূর্ণ মহানাগরিক হয়নি। গোটা দেশটাই গ্রামীণ আবেগে আবিষ্ট হয়ে আছে। সহজ জীবন ও সরল আনন্দ প্রবাহে বাংলাদেশের বারো কোটি মানুষ এখনও নিত্যকালের প্রার্থনা বিভোর। নবীনের এবং আধুনিকতার সংঘর্ষে পুরাতন বোধগুলো ধীরে ধীরে নিজের শক্তির বিনাশ দেখছে, কিন্তু তবু সেই চিরানন্দ সনাতনকে ঝেড়ে ফেলার উদ্যম তত তীব্র নয়।

এখন দুঃখ আছে, দারিদ্র আছে, অভাব আছে, প্রকৃতির বারবার আঘাত আছে — তবু বাংলাদেশের প্রাণে জীবন তৃষ্ণার অন্ত নেই। এত যে দুঃখ, এত যে কঠোর জীবন সাধনা, তবু বাংলাদেশের হৃদয়ে গান আছে। প্রতিদিন কাব্যপাঠ আছে, প্রতি রাত্রে আনন্দের উৎসব আছে।

উৎসব আর পার্বণের দেশ বাংলাদেশ। জন্ম-উৎসব, অন্ন-উৎসব, বিয়ে-উৎসব, ফসল উৎসব, নববর্ষের উৎসব, ঈদের উৎসব, পুজোর উৎসব। স্বাধীনতার উৎসব, বিজয় দিনের উৎসব। আছে মহরমের মেলা, শবেবরাতের মেলা, একুশের মেলা। আছে রবীন্দ্র জয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী। উৎসবে, মেলায়, জয়ন্তীতে থইথই করে বাংলাদেশ। গায়ক গায় গান, কবি শোনায় কাব্য, অভিনয় করে অভিনেতৃ। নৃত্যে মুখরিত হয় রঙ্গমঞ্চ।

আমরা বাংলাদেশের নাটকের কথা বলব। বাংলাদেশের নাটক উৎসবের নাটক, জীবনের নাটক, মানুষের নাটক। চেনা জীবন, চেনা মানুষ, চেনা অঙ্গীকারের প্রতিভাতে বাংলাদেশের নাটক সমুজ্জ্বল। নবাব সিরাজউদৌল্লা আমাদের চেনা, বিদ্যাসাগর, মধুসূদনকে আমরা চিনি। পৌষ পার্বণের নন্দিনী, ডাকঘরের অমল, রংপুরের নূরলদীন, ছেঁড়াতারের ফুলজান, গাঙ্গুরের জলের বেহুলা, কালীয়দমনের শ্রীকৃষ্ণ, আলাওলের পদ্মাবতী, রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র, নীলদর্পণের তোরাপ, কবরে মুর্দাফকির, আলীবাবার আবদুল্লা আর বাংলার স্বাধীনতার সহস্র শহিদ আমাদের চেনা। কেবল চেনা নয়, বহুভাবে চেনা, আপন করে চেনা, তাঁরা সকলেই আমাদের নাটকের পরমাত্মীয়।

'গীতগোবিন্দ', 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন', 'ইউসুফ জোলেখা', 'চৈতন্য ভাগবত', 'মনসামঙ্গল', 'লায়লা মজনু', 'গোরক্ষবিজয়', 'বিদ্যাসুন্দর', 'জঙ্গনামা', 'ময়মনসিংহ গীতিকা', 'কৃষ্ণকুমারী', 'নীলদর্পণ' 'জমিদার দর্পণ', 'প্রফুল্ল', 'নবান্ন', 'নেমেসিস', 'বিদ্রোহী পদ্ম', 'কদমআলী', চেগুনগালা', 'টিনের

তলোয়ার', 'চাঁদ বণিকের পালা', 'সাতঘাটের কানাকড়ি', 'এবং ইন্দ্রজিৎ' আর 'কোকিলারা' প্রভৃতি সৃজনকর্মের মধ্যে আমাদের নাট্য সম্পদ সাজানো আছে।

আমাদের যত সব ঘরের জিনিস মনসার ভাসান, কৃষ্ণযাত্রা, কথকতা, পাঁচালি, কবিগান, পুঁথিপাঠ আর পালাগানের সৌষ্ঠব ও উপাদান নিয়ে যেমন আমাদের নাটক তেমনি সর্বভারতীয় সংস্কৃত নাট্যসম্পদ এবং বিশ্বভুবনের সফোক্লেস, শেক্সপিয়ার, মলিয়ের, গ্যোটে, চেকভ, ব্রেখট, সবই আমাদের নাট্য চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে।

আমার গৃহ, আমার ভুবন, আমার বিশ্ব সবই আমার জীবনের এবং স্বজনের সম্পদ। কী উপাদান, কী বিন্যাস, কী প্রকাশ, কী বিশ্লেষণ, সকলকেই আমি নিজের করে নিতে পেরেছি। এই যে নিজের করে নিতে পারার শক্তি ও যোগ্যতা, সে তো আজকের কোনো আকস্মিক আহ্বানের জন্য ঘটেনি। এর জন্য হাজার বছর ধরে আমি দিবানিশি সাধনা করেছি। কখনো মণ্ডপে, কখনো বারোয়ারিতলায়, কখনো সরোবরের তীরে, কখনো খোলা আকাশের নীচে। আবার কখনো জমিদারের শৌখিন মঞ্চে, কখনো মাসিক চল্লিশ টাকায় ভাড়া করা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে। আর কখনো শহিদ মিনারের পাদদেশে অথবা সাতমাথার মোড়ে খোলা ট্রাকের ওপরে। যাবতীয় আয়োজন আমার নাট্যচর্চার জন্য এবং আমার চেনা প্রিয় জীবনকে প্রতিভাত করার জন্য বিচিত্র অবস্থা, অসংখ্য উদ্যোগের ফলেই আজকের বাংলা নাটক।

বাংলার তিনটি বড়ো নগর ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, আর কলকাতা। তিনটির মধ্যে ঢাকা সর্বপ্রথম রাজধানী। ১৬১০ সালের কথা। ক্ষমতা বদলের সাথে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছে। নবাব আমলে মুর্শিদাবাদে, ইংরেজ শাসনে কলকাতায়। সেই যে জ্যেষ্ঠ নগর ঢাকা সেখানেই ১৮৬০ সালের রামচন্দ্র ভৌমিকের বাংলা মুদ্রণ যন্ত্রে বাংলার প্রথম তপ্ত জীবন সিক্ত নাটক 'নীলদর্পণ' ছাপা হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্র তখন ঢাকা শহরের ডাকঘর ইন্সপেক্টর। বন্ধু ডাঃ দুর্গাদাস কর যিনি ১৮৬৫ সালে বরিশালে 'স্বর্ণশৃংখল' নাটক লিখেছিলেন - সে বন্ধুর বাড়িতে রাত্রিবেলা গোপনে দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ হয় ঢাকা শহরে ১৮৬১ সালে। এ ঢাকা শহরেই ১৮৭২ সালের মার্চ মাসে সর্বপ্রথম চার টাকা, দু টাকা ও এক টাকা টিকিটের বিনিময়ে সাধারণ দর্শককে নাটক দেখানো হয়। মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক' নাটক দিয়ে সে উদ্যোগের শুরু। ১৮৭৩ সালে হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার ঢাকায় এসেছিল। ছিল একমাস। দলপতি ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী। সহযোগী অভিনেতা অমৃতলাল বসু বলেছেন, 'অর্ধেন্দুকে লইয়া সমস্ত সহর উন্মত্ত হইয়া উঠিল। আমাদের দেশের থিয়েটারের জন্য কোনো অভিনেতাকে অমন করিয়া আর কেহ lionize করিয়াছে কিনা জানি না'।

ঢাকাতে এসেছিল গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার গিরিশচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে। স্টার এসেছিল শরৎচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে। স্টার এসেছিল শরৎচন্দ্র ঘোষের উদ্যোগে। ক্রাউন থিয়েটারের অভিনেতা এবং অভিনেত্রী হয়ে পেশাদারি অভিনয় করতে এসেছিলেন মুস্তাফী সাহেব এবং সুকুমার দত্ত।

এখন সেই ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। এ শহরে এখন প্রায় প্রতি রাতে নাটক অভিনীত হয়। নিয়মিত অনিয়মিত প্রায় ৪৫ টি নাট্য গ্রুপ ঢাকাতে নাটক অভিনয় করছে।

১৮৬৫ সাল থেকে ঢাকাতে নিয়মিত নাট্যাভিনয় শুরু হয়েছে। তার মধ্যে সব কটি উদ্যোগ সফল হয়নি। অভিনীত সকল নাটকই ভালো নাটক ছিল না। নিয়মিত পেশাদারি ভিত্তিতে নাট্যচর্চা জমেও ওঠেনি। তখন রাজধানী কলকাতার নাট্য আয়োজনের পাশে নিয়মিত নাট্য প্রযোজনা ঢাকার জন্য সম্ভব ছিল না। তাই এমিচিয়ের থিয়েটার, ইলিসিয়ম থিয়েটার, সনাতন নাট্য সমাজ, বসাক থিয়েটার, ক্রাউন থিয়েটার, ডায়মন্ড জুবিলী থিয়েটার, কমলাপুর থিয়েটার এবং রূপশ্রী থিয়েটার প্রস্তুতির সামান্য বা প্রবল কোনো উদ্যোগই কলকাতার থিয়েটারের সমকক্ষতা লাভ করেনি। ভিন্ন তরভাবে অভিনয় করা সত্ত্বেও ঢাকার থিয়েটার চর্চা কলকাতার অনুগামীই ছিল। শ্যামবাজারের জমিদার ব্রজগোপাল দাস

বলেছেন, 'পাশ্চাত্যের নকল থিয়েটারের পীঠভূমি কলকাতা আর কলকাতার নকলের পীঠভূমি ঢাকার থিয়েটার। ছিল না সমাজ দায়িত্ববোধ। পারিবারিক জীবনই ছিল নাটকের উপজীব্য। এন্টারটেনমেন্ট ভ্যালু এটাই ছিল মূলকথা।

ঢাকার থিয়েটার সম্পর্কে এই যে কথা, যে কথা বঙ্গদেশের সকল থিয়েটার সম্পর্কে কমবেশি প্রযোজ্য। যে শক্তি, উদ্যোগ ও সম্ভার নিয়ে এবং যে সামাজিক চেতনায় সচেতন হয়ে বাংলার তিনজন নাট্যকার রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু নাটক রচনা করেছেন এবং যাঁদের প্রভাবে মীর মোশাররফ, উমেশচন্দ্র মিত্র, উপেন্দ্রনাথ দাস, নাট্যকর্মে নিজেদের সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন—বাণিজ্যিক থিয়েটারের হাতে পড়ে বাংলার নাটক আর সে দায়িত্ব পালন করেছেন না—বাণিজ্যিক রাজ্যে এন্টারটেনমেন্ট ভ্যালুটাই মূলকথা।

কী করলে দর্শক আসে, কেমন আয়োজন হলে দর্শক চমকিত হবে আর কেমন করে অট্টরোল তুললে দর্শকের চিত্ত দ্রবীভূত হবে তারই আয়োজন চারদিকে। দু-এক ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ভক্তিভাব, আর্দ্র দেশপ্রেম আর সঘন পরিবার বোধ নিয়ে সহস্রাধিক নাটক রচিত হল, সে সব নাটক মঞ্চে এল, হইচই হল কিন্তু জীবনের গূঢ়তর, গাঢ়তর বিষয় নিয়ে থিয়েটার হল না।

কলকাতা নির্ভর ঢাকার থিয়েটার বারবার সে সব নাটকই মঞ্চায়নের জন্য সচেষ্ট হয়েছে যে নাটক কলকাতার মঞ্চে জনপ্রিয়। তবে সেই রকম মুখাপেক্ষিতা পুচ্ছগ্রাহিতার মোহে সচেতন নাট্যকর্মীরা কখনই লুব্ধ হয়নি। সমাজ, রাজনীতি ও ঐতিহ্য সচেতন কোনো ব্যক্তির পক্ষে সে মোহে বন্দী থাকা সম্ভব নয়। যেমন নগর কলকাতার গ্রুপ থিয়েটার চর্চা শুরু হয়েছে চল্লিশ দশকে যুদ্ধ ও মন্বন্তরের মধ্যে, তেমনি সংগ্রাম ও যুদ্ধের মধ্যেই বাংলাদেশের নাট্যকর্মীরা নিজেদের শক্তির সন্ধান করে নিয়েছে এক এক পর্যায়ে নির্মোহ চিত্তে। বাংলা নাটকের সঙ্গে বাংলাদেশের নাটকের যোগ বৃহত্তর আকর্ষণে সংলগ্ন। কিন্তু বিষয়ে, বিন্যাসে, সংলাপে ও জীবনমুখিতায় বাংলাদেশের নাটক অচিরেই তার নিজের ভূমিকা সন্ধান করে নিতে পেরেছে। বরেন্দ্র, সমতট, প্রাগ্‌জ্যোতিষ জনপদের বাংলাদেশ যেমন নদী মেখলা, তেমনি কৃষি নির্ভর। পীর আউলিয়ার প্রভাব, ইসলাম ধর্মে ব্যাপক প্রচার ও লোকজ কৃত্যের অনুশাসন এবং গারো, চাকমা, মারমা প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর লোক ঐতিহ্যের দেশ বাংলাদেশ। আর আছে সনাতন হিন্দু জনসম্প্রদায় এবং তার ধর্মীয় পুরাণ, লোকপুরাণ ও জীবনাচরণ।

তবে বাংলাদেশকে শত বৈচিত্র্যের মধ্যে এক করে বেঁধে রেখেছে দেশের একমাত্র ভাষা বাংলাভাষা। অঞ্চলে অঞ্চলে ভাষার গঠনে ভেদ আছে, এথনিক পর্যায়ে উপজাতিদের নিজের বুলি আছে, কিন্তু বাংলা ভাষার সর্বজনীন লিখিত ও পাঠের মান্যরূপ একটি জাতিকে সুসংহত করে রাখার কাজে ব্যাপক শক্তি দান করেছে।

বাংলাদেশের নাটকের স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনার পথ খোলা আছে তার এই স্বরূপ সন্ধানের মধ্যে। যে ধারাবাহিক লোকজীবন, সংস্কার, মিথ ও সংস্কৃতির জোরে বাংলাদেশ তার পরিচয়কে অনুভব করাতে পারে সে সব উপাদানের জোরেই বাংলাদেশের মৌলিক নাটক চলার পথ করে নিতে পারছে। এ পারাটা বাংলাদেশের নাটকের জন্য অপরিমেয় সুযোগ। আনন্দের কথা, পাঁচের দশক থেকেই এ জনপদের সচেতন নাট্যকর্মীরা তাদের লোকজ সম্পদ, লোকজ সৌন্দর্য এবং প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে।

এ সচেতনতার জন্যই এ দেশে মাতৃভাষার জন্য তোলপাড় করা সংগ্রাম হয়েছে। যুবকরা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে এবং জনগণ নিজের অঞ্চলের অধিকার সমুন্নত রাখার জন্য সদা জাগ্রত থেকেছে। ভাষা আন্দোলন ভিত্তিতে রচিত নাটক 'কবরী' রচনা করেছেন মুনীর চৌধুরী ; নাট্যকার কারাগারে বন্দি ছিলেন।

নাটকের ক্ষেত্র একটি গোরস্তান। অত্যাচারী শাসকরা ভাষার জন্য শহিদদের গোপনে কবর দিতে এনেছে। কিন্তু গোরস্তানের মূর্দা ফকির সে লাশ কবরে রাখতে দেবে না।

নাটকটি একাঙ্ক। কিন্তু বিষয়ে, শক্তিতে ও রাজনৈতিক স্পন্দনে এমনই গভীর যে তার মধ্যেই বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্য, ধর্মীয় চেতনার শক্তি ও আধুনিক জীবন বোধ উচ্চকণ্ঠে হয়ে উঠে।

ষাটের দশকের আরো দুটি নাটক 'বহিপীর' ও 'তরঙ্গভঙ্গ'। নাট্যকার ইউরোপীয় অসম্ভবী (absurd) নাট্য চেতনায় বিমুগ্ধ। চেতনায় ইউরোপীয় হলেও নাটক দুটির বিষয় সনাতন বাংলাদেশ। নাটকের চরিত্র নির্মাণ বাংলার লোকজ জীবনধারা থেকে আহরণ করা। দুটি নাটকেই পির সাহেব আছে, আছে গৃহত্যাগের কথা, আছে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কঠিন সংগ্রামের কথা।

লোকজ জীবন ও উপাখ্যান নিয়ে কাজে করেছেন কবি জসীমউদ্দীন। তাঁর 'বেদের মেয়ে', 'পদ্মাপার', 'পল্লীবধূ' গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত নাটক। নাট্যকার আজিমউদ্দীন আহমদ সরাসরি পালাগান থেকে কাহিনি সংগ্রহ করে রচনা করেছেন 'মহুয়া' এবং 'কাঞ্চন'। এভাবেই পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ময়মনসিংহ গীতিকা প্রভৃতি লোকজ কাহিনি বাংলা নাটকের জন্য অসামান্য সম্পদ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

বাংলা একাডেমীর সংগৃহীত লোককাহিনি উপাদান নিয়েই রচিত হয়েছে 'মাধবমালঞ্চী কইন্যা'র মতো অসামান্য জনপ্রিয় নাটক।

লোকজ সংস্কৃতি তো কেবল লোকাহিনি মাত্র নয়। দেশের নিরক্ষর সাধারণ মানুষ যে জীবনবোধকে আশ্রয় করে বেড়ে ওঠে, যে জীবনবোধের সম্পদই লোকসংস্কৃতির উপাদান। তাতে যেমন আছে গালাগাল তেমনি আছে রূপকথা, উপকথা, কিংবদন্তী, পুরাণ, জাদু, ছড়া, প্রবাদ, ধর্মীয় ও সামাজিক কৃত্য। আর আছে সমকালে ঘটে যাওয়া কোনো প্রভাব বিস্তার করা ঘটনা। আছে উৎসবের পার্বণের গান। তবে লোকজ সংস্কৃতি কোনো স্থায়ী বা অনড় জীবনবোধ নয়। সময়ের ধারাতে এবং কালের প্রবাহে বিভিন্ন কারণে বিবর্তিত জীবন যাপনে লোকজ সংস্কৃতির রূপান্তর ও বিবর্তন ঘটে। আবার কখনো কোনো মহৎ প্রতিভার স্পর্শে লোকজ উপাদান অবিনশ্বর ধ্রুপদী সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়। এমন বহুবার হয়েছে, সফোক্লেস, শেক্সপিয়ার, গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের হাতে লোকজ সম্পদ বিশ্বমান লাভ করেছে।

বাংলাদেশের লোকনাট্যে বিপুলভাবে জনপ্রিয় একটি কাহিনির কথা বলি, বাদশাহ একাব্বর নিঃসন্তান। তাঁর ধন ঐশ্বর্য সব আছে কিন্তু সন্তান নেই। আঁটকুড়ে বাদশাকে দেখলে প্রজারা আতঙ্কিত হয়। মনের দুঃখে বাদশাহ গেলেন অরণ্যে। কী হবে জীবন ধারণ করে। অরণ্যের সিদ্ধপুরুষ একাব্বরের দুঃখে সহানুভূতিশীল হলেন। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে এলেন বাদশাহ। আমের গাছে ঢিল মারলেন। অসময়ে একটি আম পড়ল। বেগম সে আমের চাটনি খেলেন, সন্তান সম্ভবা হলেন এবং যথাসময়ে পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। পুত্রের নাম রহিম। রহিম যেদিন নয় দিনের শিশু, একাব্বর শুনলেন দৈববাণী, দশদিনের শিশুকে দশবছরের কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে সে দম্পতিকে নির্বাসনে না পাঠালে রহিমের নির্ঘাত মৃত্যু হবে।

উজির সাহেবের কন্যা রূপবান নাচেগানে অসামান্য। তার বয়স দশ। জোর করে তার সঙ্গে শিশু রহিমের শাদি হল। বাসরঘর ছেড়ে নবদম্পতিকে যেতে হল অরণ্যে। সহায় নেই, সম্বল নেই। বাংলার মেয়ে শিশু স্বামীকে নিয়ে বনবাসী হল। দিনে দিনে দিন যায়। অরণ্যের পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষার জন্য যায় রহিম। সেখানে সাঈদ বাদশার কন্যা তাজেলের সঙ্গে রহিমের পরিচয় হল। প্রেমাকাঙ্ক্ষা জাগে তাদের চিত্তে।

এদিকে সাঈদ বাদশাহ রূপবানের পূর্ণ যৌবন রূপ দেখে মোহিত হন। তিনি রূপবানকে লাভের জন্য রহিমকে বন্দি করেন। একাব্বর বাদশাহ লোকলস্কর নিয়ে ছুটে এসে সাঈদ বাদশাহকে পরাভূত

করেন। তাজেলের সঙ্গে রহিমের বিবাহ স্থির হল। অভিশাপ মুক্ত রহিমকে নিয়ে একাব্বর রাজ্যে ফিরে এলেন। ধুমধামের সঙ্গে তাজেল ও রহিমের বিবাহ হল। আর বাসরঘর সাজানোর আদেশ পেল হতভাগিনী রূপবান। বাংলার রমণীর গোপন কান্না কেউ দেখতে পেল না।

রূপবান লোকনাট্য বাংলাদেশের সম্পদ। এ কাহিনির সঙ্গে লোক পদের যেমন নিবিড় যোগাযোগ, তেমনি বহুকাল আচরিত বাংলার জীবনের বিচিত্র সব অনুভব সংশ্লিষ্ট। এ কাহিনির অনুরূপ কাহিনি অনেক ছড়িয়ে আছে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে।

লোকনাট্যের সম্পদকে হুবহু মঞ্চে উপস্থিত করার দায়িত্ব আধুনিক নাট্যকর্মীর নয়। সে কাহিনিতে নবতর মাত্রা সংযোজন তাদের অন্যতম কাজ। সে কাজও শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের নাট্যকর্মে বিভিন্ন উপজাতীয় লোকনাট্য সংগ্রহের কাজ চলছে। সাঁওতাল, গারো, মারমা, চাকমা উপজাতির নাট্যকর্মের কিছু পরিচয় পাওয়া গেছে। বাংলা একাডেমী তিন খণ্ডে বাংলাদেশের লোকনাট্য সংগ্রহ প্রকাশ করেছে। আরো কাজ চলছে।

বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় লোকনাট্যের আঙ্গিক

আফসার আহমেদ

বাংলাদেশের নাটকের ইতিহাস রচনা করতে গেলে তার হাজার বছরের ঐতিহ্য অনুসন্ধান আবশ্যক। ঐতিহ্য-বিমুখ ঔপনিবেশিক মানসিকতা প্রসূত ধ্যান-ধারণার ফল হিসাবে বাংলা নাটক উনিশ শতকের সৃষ্টি এমন মতবাদের জন্ম সম্ভব হয়েছে। সময়ের দিক থেকে কিংবা অভিনয়রীতির দিক থেকেও বাংলা নাটকের একটি স্বতন্ত্র অবস্থান রয়েছে। এই স্বতন্ত্র ধারাটির ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ করে অতীতমুখী অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলে এ সত্য প্রতীয়মান হবে যে বাংলা নাটক উনিশ শতকে সৃষ্ট পরজীবী শিল্পমাধ্যম নয়। কারণ বিষয় ও অভিনয়রীতির দিক থেকে বিশ্বনাট্য ধারায় বাংলা নাটকের নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র অবস্থান রয়েছে। বিশ্বনাটকের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ধর্মীয় 'কৃত্য' সমূহ থেকেই নাটকের জন্ম। এই ধর্মীয় 'কৃত্য' মানুষের আদিম জীবন-যাপনের সাথে সম্পর্কিত। মানুষের প্রাত্যহিক ইচ্ছাপূরণের সহায়ক হিসেবে অতি লৌকিক কিংবা অলৌকিক শক্তির কাছে মানুষ তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। সেই ভক্তিমূলক অভিপ্রায়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে একটি কাহিনি। সেই কাহিনি প্রাচীন মানব গোষ্ঠীর বিশ্বাস থেকে জাত এবং তাদের জীবনাচরণের সাথে সম্পর্কিত বিধায় একসময় তা মানবজীবনের নৈমিত্তিকতার সাথে অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে।

প্রাচীন মিশরীয় নাট্যসাহিত্য তৈরি হয়েছে ওসিরিসের জীবনের করুণ গাথা অবলম্বন করে। ওসিরিস কৃষি জীবনের প্রতীক এবং মিশরীয়দের প্রধান দেবতা। কাজেই ওসিরিসের কাহিনি অভিনয়ের পেছনে ছিল দৈব আরাধনা কিংবা দেবতাকে খুশি করে শস্যের সমৃদ্ধি কামনা। প্রাচীন গ্রিসে দিওনিসুসকে কেন্দ্র করে যে ডিথিরাম্বের উদ্ভব হয় তার মধ্যেও কৃষি জীবনের অনুষঙ্গ লক্ষ করা যায়। এথিনীয়দের প্রধান অর্থকরী ফসল আঙুর চোলাই করে মদ তৈরি হত। মদ তৈরির পুরো প্রক্রিয়াটাকে এথিনীয়রা উৎসবের অন্তর্ভুক্ত করেছে। দেবতা দিওনিসুসের স্তব করা হত তাঁরই জীবন-কাহিনি বর্ণনা করে। এই স্তোত্রগুলোকে ডিথিরাম্ব নামে অভিহিত করা হয়েছে। সময়ের অনিবার্য প্রবাহে ডিথিরাম্ব থেকে গ্রিক কোরাস এবং পরে গ্রিক ট্র্যাজেডির জন্ম হয়েছে। কাজেই এ কথা সত্য যে, গ্রিক নাটকের উদ্ভবের পশ্চাদ্‌পটে ধর্মীয় 'কৃত্য' ক্রিয়াশীল এবং এই ধর্মীয় 'কৃত্য' সমষ্টিগত বিশ্বাস থেকে জাত। অনুরূপভাবে সংস্কৃত নাটকের ইতিহাসও ধর্মীয় কৃত্যসমূহের সাথে সম্পর্কিত। ধর্মীয় যাগযজ্ঞ, স্তোত্রপাঠ, লোকজ বিশ্বাস কিংবা প্রাত্যহিক জীবনাচরণের অনুষঙ্গে সংস্কৃত নাটকের বিকাশ ঘটেছে। গ্রিক নাটক যেমন ধর্মোৎসবের অংশ হিসেবে পরিবর্ধিত হয়েছিল তেমনি সংস্কৃত নাটকও যাগযজ্ঞের অঙ্গঅনুষ্ঠানরূপে বিবর্ধিত হয়েছিল। বৈদিক যুগে যে নাট্যক্রিয়ার উৎপত্তি লক্ষ করা যায় তা আসলে লৌকিক আনন্দানুষ্ঠানের অনুরূপ। আর এই লৌকিক আনন্দানুষ্ঠান লোকজ জীবনের উপর লোকমানসের দৈব বিশ্বাসের ফলমাত্র।

প্রাচীন বাংলা নাটকের উদ্ভবের পেছনেও এমনি লোক উপাদান ও লোকজ বিশ্বাস অঙ্গীভূত। বাংলা নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে অহীন্দ্র চৌধুরীর মন্তব্য এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য:

'প্রাচীনকালে সামাজিক কোন নৃত্যগীত অনুষ্ঠানে সমষ্টিগত গীতরচনার মধ্যে সমাজমানসের প্রতিফলন ঘটতো। ক্রমে সেই সকল লোকগীতি থেকে আখ্যায়িকা গীতি (Ballad) প্রভৃতি জন্মলাভ করে। মঙ্গলকাব্যসমূহের মধ্যেই সর্বপ্রথম পাওয়া গেল একটি পূর্ণাঙ্গ পরিণত কাহিনী। ইতিপূর্বে বিচ্ছিন্নভাবে নানাপ্রকার ছড়া গান প্রভৃতিতেই দেশ পরিব্যাপ্ত ছিল। এই সকল মঙ্গলকাব্য লৌকিক দেবতাকে পুরাণোক্ত দেবতার মর্যাদা দান করে জনগণ চিত্তে তার সুদৃঢ় আসন প্রতিষ্ঠা করার

উদ্দেশ্যেই রচিত হতো। পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায় যে দেবতার স্তুতিবাচক নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই মানস অভিব্যক্তির সর্বপ্রথম প্রতিফলন ঘটে। বাংলাদেশেও দেবতার লীলা বর্ণনামূলক পালাগান, গীতিকবিতা মঙ্গলকাব্য প্রভৃতির মধ্যেই শোনা গিয়েছিল নাট্য প্রচেষ্টার দূরাগত পদধ্বনি।'

মধ্যযুগের খ্রিস্ট বিষয়ক নাটকের উৎপত্তি আলোচনা করতে গেলেও দেখা যায় লোকজ জীবনে বাইবেলীয় ধর্মীয় অনুষঙ্গ ক্রিয়াশীল। গির্জার জনসাধারণের জন্য প্রার্থনাদির অনুষ্ঠান বিধি থেকে 'লিট্যারজিক্যাল প্লে'-র উদ্ভব ঘটেছে। 'লিট্যারজিক্যাল প্লে'-র বিবর্তন ঘটেছে মূলত কথনরীতি থেকে। এলারডাইস নিকল তাঁর 'ওয়ার্ল্ড ড্রামা' গ্রন্থে বলেন :

Thus was born the liturgical drama, that form of medieval play wherein the dialogue and the movement formed part of the regular liturgy or service of the day. Even from the very beginning it must have begun to expand in several ways; by the introduction of mimetic action, by the utilization of properties and appropriate dress; and by the expansion of the simple plot through the addition of related episodes.

'লিট্যারজিক্যাল প্লে'-র সংলাপ ও ক্রিয়া ধর্মীয় অনুষ্ঠানেরই অংশবিশেষ কিংবা অনুষ্ঠানই এখানে অভিনয়ের রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এখানে লিট্যারজিক্যাল প্লে-কে নাটক বলে স্বীকার করলে আমরা ভারতীয় কৃষ্ণযাত্রা, ধ্বজপূজা, মঙ্গলকাব্য, ময়মনসিংহ গীতিকার পালা, গাজীর গান, শূন্যপুরাণ প্রভৃতি গীতিধর্মী পালাগুলোর অভিনয়াত্মক উপস্থাপনা রীতিকে 'ধর্মীয় কৃত্য' থেকে উদ্ভূত বর্ণনাধর্মী নাট্যরীতির গোত্রভুক্ত বলতে পারি। গাজীর গান কিংবা ময়মনসিংহ গীতিকার মূল গায়েন আর দোহারদের ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা করলে এগুলোকে বাংলা নাটকের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে মানতে আর বাধা থাকে না।

চর্যাপদে কবি বলেছেন :

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই।

অথবা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ভূমিকায় কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী দেবীকে বন্দনা করে যে কথা বলেন :

বিশ্রাম দিবস আট শুনহ দেখহ নাট
আসরে করহ অধিষ্ঠান।

এতে প্রতীয়মান হয় যে নৃত্যগীত, কাব্য, দৃশ্য প্রভৃতি নাট্য উপাদান এ সকল রচনায় বিদ্যমান ছিল। ফলে মধ্যযুগের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা থেকে উদ্ভূত হলেও ও সকল রচনায় যে নাট্যরীতির প্রতিফলন ঘটেছে তা প্রাচীনকাল লোকজ সমাজে আদৃত, অভিনীত হতে হতে বাংলা নাট্যধারায় নিজস্ব রীতি ও উৎসের স্মারকচিহ্ন হিসেবে টিকে আছে।

এই নৃত্যগীত এবং দেশীয় রীতির অভিনয়ের মাধ্যমে ধর্মীয় বা লৌকিক আচার উৎসব উপলক্ষে অথবা কোনো উপলক্ষ ছাড়াই যে সমস্ত কাহিনি বা উপাখ্যান কাল পরম্পরায় বর্ণনাত্মক রীতিতে অভিনীত হয়ে আসছে তাই লোকনাটক। লোকজীবনের বিভিন্ন রীতি ও অনুষঙ্গ নির্ভর হাজার বছরের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ এই নাট্যধারা লিখিত রূপের অভাবে লুপ্তপ্রায় হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

বাংলাদেশের প্রাচীন নাটক ও মঞ্চরীতি সম্পর্কিত লুপ্ত সূত্রসমূহের সন্ধান এবং সাম্প্রতিক কালের বাংলা নাটকের পূর্ব ঐতিহ্য হিসেবে এই সকল হারিয়ে যাওয়া সূত্র ও তথ্যের সাথে সংযোগ স্থাপন সম্ভব হলেই বাংলাদেশের নাটকের তথা বাংলা নাটকের নিজস্ব অভিনয় ধারাটি অভিনয় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। মধ্যযুগের সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক এবং সংস্কৃতির প্রেক্ষাতে

লোকজ উপাদান-নির্ভর বাংলা নাটকের যে স্বকীয় ধারাটির বিকাশ ঘটেছিল তার উৎসমুখ বিখ্যাত নাট্যশাস্ত্রকার ভরত সমকালীন বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থে 'ওড্রমাগধী' রীতি বলে উপেক্ষিত বাংলা নাটকের রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ৪০০ খ্রিস্টাব্দে লিখিত চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের ভারতভ্রমণ বিষয়ক বর্ণনায় পালাগান অভিনয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, পালাগান, কৃষ্ণলীলা, বিভিন্ন অনার্য পূজা উৎসব, শিবের গাজন বিষয়ক লোককাহিনি, ময়মনসিংহ গীতিকা, গাজীর গান, বিষাদ জারি, রংজারি, হাস্তর গান, ভাসান যাত্রা, ঢপ, আলকাপ, গম্ভীরা, কবির লড়াই, লাঠিখেলা, পুতুল নাচ প্রভৃতি অসংখ্য লেখ্য কিংবা মৌখিক ঐতিহ্যবাহী রচনার মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলা নাট্যরীতি কালের প্রবাহ ও অভিজাতদের উপেক্ষায় লোকাচার বিশিষ্ট জীবনকে কেন্দ্র করে টিকে থাকল। অনার্য রীতি বলে ভরত তার নাট্যশাস্ত্রে যে রীতিকে উপেক্ষা করেছিলেন সেই উপেক্ষিত রীতিটি ক্রমবিকশিত হয়েছিল নিজস্ব ধারায়। সঙ্গীত, নৃত্য, বর্ণনাত্মক সংলাপ সমন্বিত বাংলা নাটকের প্রথম লিখিত নিদর্শন তাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে ধরা যায়। বাংলা নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার অন্তর্নিহিত সংগীত-ধর্মিতা। বর্ণনাত্মক সংলাপ এবং নৃত্যভঙ্গিমা। বাংলা নাটকের এই বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, চর্যার বুদ্ধ নাটকে কিংবা উল্লেখিত অসংখ্য লোককাহিনির সমৃদ্ধ উপাখ্যান ও উপাদানের মধ্যে।

বিশ্বনাটকের প্রাচীন প্রেক্ষিত ও বাংলা নাটকের উদ্ভব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে সুপরিকল্পিতভাবে বা লিখিত কোনো কাহিনি অবলম্বন করে নয় বরং দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন আর পরম বিশ্বাসের ভিত্তিতে পালিত আচার অনুষ্ঠান থেকে বাংলা লোকনাটক তথা লোকনাটকের কাহিনির উদ্ভব ঘটেছে। যে কারণে লৌকিক দেব দেবী, যেমন : মনসা, চণ্ডী, মাকাল ঠাকুর, বুনোবাবা, ইতুঠাকুর, বনদেবী, গাজীপীর, মানিকপীর এবং লৌকিক আচার বা ব্রতানুষ্ঠান ; যেমন : সেজুতি ব্রত, অশোকষষ্ঠী, সুবচনী ব্রত, মহরম প্রভৃতিকে বিষয়বস্তু করে লোকনাটক রচিত হয়েছে। কালের বিবর্তনে রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের ধারায় উপকথা ইতিহাস কিংবদন্তী সমকালের সামাজিক লৌকিক কাহিনি প্রভৃতি লোকনাটকে স্থান করে নিয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নাটকে আমাদের এই সমৃদ্ধ নাট্য-উপাখ্যান ও নাট্যরীতি বিপুলভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কেউ কেউ লোককাহিনি নির্ভর নাটক রচনা করেন। কেউবা লোকনাট্যরীতিতে নতুন বিষয়ের বিন্যাস ঘটালেন কেউ কেউ ব্যক্তিগত কিংবা দলগতভাবে লোকজ উপাদান থেকে বাংলা নাটকের ঐতিহ্যবাহী নাট্যাঙ্গিকের পুনর্নির্মাণে ব্রতী হলেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ঢাকা থিয়েটারের নাসিরউদ্দিন ইউসুফ এবং আরণ্যক নাট্যদলের মামুনুর রশীদ।

স্বাধীন বাংলাদেশের নাট্যকর্মীরা আত্মজিজ্ঞাসা ও শেকড়সন্ধানী অভিপ্রায় থেকে লোকনাট্য আঙ্গিকের দ্বারস্থ হয়েছেন। হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী বাংলা লোকনাট্যরীতির প্রয়োগের ফলে বাংলাদেশের সমকালীন নাটকের বিষয়বস্তু, আঙ্গিকমঞ্চরীতি ও পরিবেশন রীতিতে বহুমাত্রিকতা এসেছে। বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে আঙ্গিকের পাশাপাশি বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। লোক-ঐতিহ্য ইতিহাস বিদেশি কাহিনিসহ স্বদেশের আর্থ-সামাজিক বিপর্যয় ও মূল্যবোধ নাটকের বিষয় হিসেবে রূপায়িত হচ্ছে। এইসব নাটকে রূপকথা উপকথা জাতীয় লোক বিষয়ের উল্লেখযোগ্য প্রভাব না থাকলেও সময়ের দাবিতে সমকালীন লোকজীবনের বৈশিষ্ট্যগুলো স্থান করে নিয়েছে। সামাজিক ও স্থানিক বিষয় প্রধান এই নাটকগুলোতে প্রচলিত কাহিনি সংঘটিত ঘটনার পাশাপাশি নাট্যকারের সৃজনশীলতা সম্পৃক্ত হয়েছে। দশক দশক ধরে রচিত নগর জীবন ভিত্তিক কাহিনির পরিবর্তে এঁরা গ্রামীণ লোকজীবনকে বিষয় করে তাঁদের নাটক রচনা করেছেন। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার প্রকৃত রূপ যেখানে সেই গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে নাটক রচনা নিঃসন্দেহে লোকজীবনাশ্রয়ী শিল্পের অঙ্গীকার থেকে উদ্ভূত যা বাংলাদেশের নাটকের নিজস্ব ধারা ও রীতির অন্যতম পরিচায়ক।

বাংলাদেশের সমকালীন নাট্যচর্চায় সচেতনভাবে লোকনাট্য আঙ্গিকের দক্ষ প্রয়োগে নাটককে সমৃদ্ধ করেছেন সৈয়দ শামসুল হক, সেলিম আল দীন, মামুনুর রশীদ, মমতাজউদ্দিন আহমেদ, আবদুল্লাহ আল-মামুন, এস. এম. সোলায়মান। অপেক্ষাকৃত তরুণদের মধ্যে অবদুল্লাহ হেল মামুদ, মান্নান হীরা, সাজেদুল আউয়াল, সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক, সালাম সাকলাইন প্রমুখ নাট্যকারদের নাটকে লোকনাট্য আঙ্গিক ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'নূরলদীনের সারাজীবন' নাটক দুটির বিষয় নির্বাচন ও আঙ্গিক নির্মাণে লোকনাট্য আঙ্গিকের সুপ্রয়োগ লক্ষণীয়। তাঁর নাটকে পয়ারের দক্ষ প্রয়োগের ফলে বাংলা নাটকের অন্তর্নিহিত ছন্দস্রোত লোকনাটকের মূল বৈশিষ্ট্যের সাথে অন্বিত হয়েছে। সুপ্রাচীনকাল থেকে লোকনাটক সঙ্গীতধর্মী। গীতিময় ভাষাকে অবলম্বন করে সৈয়দ শামসুল হকের নাটক রচিত হয়েছে বলেই বিষয়বস্তু বিষয়াতীত ব্যঞ্জনা পেয়েছে। এলিয়টের বিবেচনায় গদ্যনাটক অস্থায়ী ও বহির্বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে, আর কাব্যে রূপায়িত হয় স্থায়ী ও অন্তর্গত বিষয়। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর নাটকের ছন্দবোধও লোকনাট্যের এই স্থায়ী ও অর্ন্তগত ব্যঞ্জনায় চরিত্রগুলোকে মহিমান্বিত করেছেন।

লোকনাটকের সংগীতাশ্রয়ী অমিত সম্ভাবনাকে সৈয়দ শামসুল হক তাঁর 'নূরলদীনের সারাজীবন'-এ ব্যবহার করেছেন। আঞ্চলিক ভাষার একটি লোকগীতিকে ভেঙে সৈয়দ হক নূরলদীনের পত্নী আম্বিয়ার কণ্ঠে যুদ্ধশেষে স্বামী প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত করেছেন যে তাতে ইতিহাস ও সমকালীনতা একই সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নাট্যকারের উক্তি :

'নূরলদীনের সারাজীবন'-এ আমি পাশ্চাত্যের রক মিউজিক্যাল নাটকের গঠন কৌশল আমাদের ময়মনসিংহ গীতিকার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছি।

ডিমলাতেহে আছে রাজা গৌরীমোহন চৌধুরী
কিষাণ কারিগরের গলায় মারিল তাই ছুরি
বাড়ী নিল নারী নিল গস্ত করিয়া
উয়ার গলা কাটিম এলা ঘচাং করিয়া
ওকি ঘচ্চাং কি ঘচ্চাং করিয়া।

সেলিম আল দীনের 'কিত্তনখোলা' বহুবিস্তারী ঘটনা-স্রোত দর্শকের বোধে ও মননে শেকড় সন্ধানী সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এনে দেয়। 'কিত্তনখোলা' নাটকের পাত্রপাত্রীরা সামাজিক রূপান্তরের অনিবার্য প্রবাহে বদলে যায়। 'কিত্তনখোলা' নাটকের রূপান্তর প্রক্রিয়ার উৎস ওভিদের মেটামরফসিস এবং বৌদ্ধজাতক। 'কিত্তনখোলা' নাটকের বিষয়বস্তু বিন্যাসে রচয়িতার চেতনায় এ দেশের লোক ঐতিহ্য সংস্থিত এবং সাম্প্রতিক জীবনভাবনা নাটকটির আদ্যন্ত বিস্তৃত। আবার এই ঐতিহ্যের বহুবর্ণিল উপাখ্যান নাটকের পাত্রপাত্রীগুলোর সামাজিক অবস্থানকে অলৌকিকতা কিংবা অবস্থার কল্পনার পশ্চাদমুখীন আকর্ষণে বৃন্তচ্যুত করে না কখনো। 'কিত্তনখোলা' নাটক আঞ্চলিক কথ্যভাষায় রচিত। লোকনাট্যের গীতল ভাষার আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে 'কিত্তনখোলা' নাটকের ভাষা শরীর। এ ছাড়া দৃশ্য বিভাজন পদ্ধতিতেও তিনি ইউরোপীয় নাটকের অনুবর্তন করেননি। বরং দৃশ্যের পরিবর্তে সর্গ বিভাজনে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি এসেছে। কাহিনির বিশালতা ও সংলাপের বর্ণনাধর্মিতার কারণে নাটকের প্রায় কোথাও চরম নাট্যিক উত্তেজনা দেখা যায় না। সংলাপের পাশ্চাত্য প্রভাবিত দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াটি অনুপস্থিত বলে দর্শকের কাছে ঘটনার আপাত গতিময়তার চাইতে কথকতার চিত্রময় দৃশ্যমানতা মুখ্য হয়ে ওঠে। পুরো 'কিত্তনখোলা' নাটকটি লোকনাট্য আঙ্গিকের বর্ণনাত্মক রীতিতে রচিত। এ নাটকে 'ফোক' সুর ব্যবহৃত হলেও তা অনুকরণ নয়। বাস্তব প্রেক্ষিত এবং চরিত্রসমূহের অর্ন্তগত বৈশিষ্ট্যের

সাথে এই সুর সঙ্গতিপূর্ণ। ফলে দর্শক প্রাচীনকালের নাট্যভিনয়ের মতো 'গীত' শুনেছে ও 'নাট' দেখেছে।

এ কথা সত্য যে ঢাকা থিয়েটার নাটক মঞ্চায়ন ও নাটকের প্রায়োগিক চিন্তা-ভাবনায় বিশাল বঙ্গদেশীয় ভূখণ্ডকে স্পর্শ করার প্রয়াসী। জাতীয় নাট্য আঙ্গিক নির্মাণের লক্ষ্যে নাটক মঞ্চায়নের পাশাপাশি তাই গ্রাম থিয়েটার কার্যক্রমে আত্মনিয়োগ করেছে এই দল। গ্রামীণ মেলা পত্তনের মাধ্যমে জাতীয় জীবনের একটি ক্যানভাস ক্রমশ নাট্যকর্মীদের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'কিত্তনখোলা' নাটকের বিষয়বস্তু ও মঞ্চকর্ম ঢাকা থিয়েটারের এই সচেতন অভীপ্সার ফল। ঢাকা থিয়েটার ইউরোপীয় নাটকের 'টেনশন' ও ক্ষিপ্রতার বদলে চিত্রল ও বর্ণনাত্মক অভিনয় রীতির প্রয়োগ করেছে লোকনাট্য আঙ্গিককে অঙ্গীকৃত করে। সেলিম আল দীনের 'মুনতাসীর ফ্যান্টাসি', 'কিত্তনখোলা', 'কেরামতমঙ্গল', 'হাত হদাই', 'চাকা' প্রত্যেকটি নাটকই লোকজ উপাদান সমৃদ্ধ। নাটকগুলোর মধ্যে যে লোকজ ভাষার ব্যবহার ঘটেছে তাও গদ্যের অন্তর্নিহিত সুরধর্মে বাঁধা। এ ছাড়া 'কেরামতমঙ্গল' নাটকের প্রধান চরিত্র কেরামত এ দেশের সাধারণ মানুষ। লোকগাথার বোকা বকাই চরিত্রের সহজাত সরলতা তার মধ্যে অঙ্গীকৃত হয়ে তাকে জাতীয় চরিত্রের মর্যাদা দিয়েছে। 'কিত্তনখোলা' নাটকের ভাষা ও অভিনয়রীতির সঙ্গে এ নাটকে যোগ হয়েছে লোকজ জীবনের বিপুল জীবন-ভাষ্য। হিন্দু, মুসলমান, গারো, হাজং, ক্যাথলিক খ্রিস্টান, মুনিঋষি, মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধোত্তর অবক্ষয়, অজস্র জাতি, উপজাতি, ধর্ম, মানুষ ও প্রসঙ্গ নিয়ে গড়ে উঠেছে নাটকটির বিশাল আখ্যানভাগ। এর সঙ্গে লোকজ উপাখ্যান, উপকথা, কিংবদন্তীর সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। লোকজ ভাষার দক্ষ প্রয়োগে নাটকটি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে একটি পুরো ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জীবনচিত্র তুলে ধরতে পেরেছে। বাংলা নাটকের কাহিনি বহুক্ষেত্রে দীর্ঘকাল যাবৎ পঞ্চাঙ্করীতির ভয়াবহ অনুবর্তনে ক্লিষ্ট। কিন্তু 'কেরামতমঙ্গল' নাটকে লোকজ নাট্য আঙ্গিক ও সমৃদ্ধ উপাখ্যানের ধারা একীভূত।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নাটকে লোক আঙ্গিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেলিম আল দীন মূলত এ দেশীয় ঐতিহ্যকে অঙ্গীকৃত করেছেন নতুন ও আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে। 'কিত্তনখোলা'র ধ্রুপদী রূপান্তরবাদ 'কেরামতমঙ্গল' সপ্ত দোজখের লৌকিক বিশ্বাস ও মানবজনের বিনষ্টি মঞ্চরূপে অভিযোজিত হয়েছে। 'হাত হদাই' নাটকে আরব্য রজনীর গল্পের মৃত্যুঞ্জয়ী গল্পরীতির সঙ্গে সুফি দেহবাদ আশ্রয়ে জীবনদর্শনের প্রাচ্যরূপ ধৃত হয়েছে। দেহবাদে বলা হয় মানবদেহে সপ্ত সমুদ্র, হাতের ভাগ্যরেখা অসংখ্য নদীনালার মতো। মানুষ সেই ভাগ্যের নদী অতিক্রম করতে চায় বারবার। নাটকের চরিত্রগুলো প্রতিনিয়ত এই সংগ্রামে লিপ্ত। এই অন্তর্গত প্রবণতাকে আরব্য রজনীর গল্প কথনরীতির সাথে অঙ্গীকৃত করেছেন নাট্যকার। মৃত্যুপথযাত্রী আনার ভাণ্ডারী গল্পবলার অনুপেরণা থেকে ধীরে ধীরে মৃত্যুবোধ অতিক্রম করতে থাকে। এভাবে প্রচলিত গল্প কথনরীতির মধ্য দিয়ে যে নাট্যরীতি নির্মিত হয় তার সাথে পরিপূর্ণভাবে অভিযোজিত হয়েছে বাঙালি ঐতিহ্য। 'হাত হদাই' নাটকে আমাদের 'প্রাগমেটিগ মোটিভ'-এর বহুবর্ণিল পরিচয় পাই। ভেড়ার লড়াই, মোরগের লড়াই, বলিখেলা প্রভৃতি ঐতিহ্যকে আমাদের স্মরণে আনে। কাছিম শিকারী নাড়ুর হাতে বিশাল কাছিমের খোলটি কূর্মাবতার ও প্রাচীন সৃষ্টির পুরাণকথাকে মনে করিয়ে দেয়।

সেলিম আল দীনের 'চাকা' নাটকে লোকনাট্য আঙ্গিকের ব্যবহার ভিন্ন বাঁকে মোড় নিয়েছে। কারণ 'চাকা' বাংলাদেশের '৯০-এর গণ অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত। এ সময় নামহীন ঠিকানাবিহীন বহু যুবক লাশে পরিণত হয়েছে। 'চাকা' নাটকের অনামা যুবকের লাশ তবু শেষ পর্যন্ত ক্ষেতমজুরদের ঘামে শ্রমে খোঁড়া কবরে আশ্রয় পায়। কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য না থাকলেও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তহীনতার বেদনাবোধ সক্রিয় ছিল নাট্যকারের মর্মমূলে। নাটকটিতে লোকজ বৈশিষ্ট্য সমুপস্থিত।

মঞ্চে খড়ের গাদা, গরুর গাড়ির অংশবিশেষ, চটের পর্দা, দর্শকের জন্য আসন বিন্যাস সবকিছুর সমন্বয় দেখে মনে হয় প্রাচীন কালের কোনো বর্ধিষ্ণু গ্রামের বড়ো বাড়ির উঠোনে গাজীর গান কিংবা অন্য কোনো পালা অভিনীত হওয়ার প্রস্তুতি পর্ব চলছে। যেন এক্ষুনি গায়েনের কণ্ঠে ধ্বনিত হবে— 'শুনহ গীত দেখহ নাট'। নাটকের কাহিনি গ্রন্থিত করে সূত্রধার। এই সূত্রধার গায়েনের পরিপূর্ণতায় অবয়বিত। সংস্কৃত নাটকের সূত্রধার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ সংস্কৃত নাটকে প্রথম থেকে শেষ অবধি সূত্রধারের স্থান নেই।

'চাকা' নাটকের সূত্রধার নাটকের পরিসমাপ্তিতেও বর্তমান। বর্ণনাত্মক নাট্যরীতি একটি নতুন আঙ্গিকে পরিণত হয়েছে এ নাটকে। গুণাঢ্যের 'কথাসরিৎসাগর'-এর গল্পরীতিকে তিনি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু 'চাকা' নাটকের গঠনরীতি ভিন্ন। 'কথাসরিৎসাগরে' কাহিনির বিভিন্ন শাখা-উপশাখা এবং অসংখ্য অনুকাহিনি রয়েছে। আর 'চাকা' নাটকের কাহিনির মধ্যে একটি অন্তর্গত সংযোগ পরিণামমুখী করেছে কাহিনিকে। আঙ্গিকের দিক থেকে কথাসরিৎসাগরের গল্প বিভাজন রীতি অনুযায়ী 'চাকা' নাটকের কাহিনি বিভাজনে 'কথামুখ' বা 'কথাপিঠ' এবং লম্বক ও তরঙ্গ বিভাগ অবলম্বন করা হয়েছে। ফলে নাট্যকার কথিত কথানাট্যরীতি একটি নৈয়ায়িক ধ্রুপদী রীতিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। 'চাকা' নাটকের সামগ্রিক প্রযোজনায় দেশজ রীতির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। গায়েন যেভাবে একটি কাহিনি উপস্থাপন করেন অভিনয়ে বর্ণনায় পাঠে সেভাবেই নাটকটির অভিনয়রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দলগত দিক থেকে নাগরিক প্রযোজিত নাটকেগুলোতে লোকজ নাট্য আঙ্গিক ব্যবহারের সচেতন প্রবণতা লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে নাগরিকের 'দর্পণ' নাটকটিতে লোকজ নাট্য আঙ্গিকের ব্যবহার নাটকটির চরিত্র, সংলাপ এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে চিরন্তন বাঙালি নাট্য ঐতিহ্যের সম্মেলন ঘটিয়েছে। তবে ফর্মের দিক থেকে লোকনাট্য আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য তেমনভাবে ব্যবহৃত হয়নি। তা সত্ত্বেও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় নাগরিকের নাট্য প্রযোজনায় বাংলাদেশের প্রাচীন নাট্য ঐতিহ্যের ব্যবহার স্মর্তব্য।

মামুনুর রশীদের নাটকের মধ্যে সামাজিক দ্বন্দ্ব তীব্রভাবে অনুভূত হয়। নাটকের বিষয়বস্তু ও চরিত্র আমাদের পারিপার্শ্বিকতা এবং চেনা জগৎ থেকেই আহরিত। আঞ্চলিক জনজীবন তাঁর নাটকে যেভাবে রূপায়িত হয় তাতে মামুনুর রশীদের সামাজিক 'কমিটমেন্ট' প্রতিফলিত হয়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের লোকনাট্য আঙ্গিক নিয়ে যাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন সাংগঠনিকভাবে মামুনুর রশীদ তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি মুক্তনাটক নিয়ে গ্রামে গেছেন। তাৎক্ষণিক বিষয় নিয়ে কোনো বাড়ির উঠোনে তাঁর নাটক অভিনীত হয়। দর্শকের সাথে অভিনেতার তাৎক্ষণিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। মামুনুর রশীদের মুক্তনাটক বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে নাটককে পৌঁছে দেওয়ার আন্দোলন। বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে আরণ্যকের আবির্ভাব সত্তরের দশকে। এই দলটি নাট্য প্রযোজনার সময় উপলব্ধি করে শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি নাটকের বিষয়বস্তুতে আন্দোলিত হয়, নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় ঠিকই কিন্তু নাটক শেষে তারা তাদের দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য থেকে ক্রমশ দূরে সরে যয়ে। ফলে নাটক মঞ্চসফলতা অর্জন করলেও বৃহত্তর প্রেক্ষিতে দর্শকমানসে রাজনৈতিক সফলতা অর্জিত হয়নি। কাজেই আরণ্যক তার প্রক্রিয়া পরিবর্তনের দিকে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তাঁরা গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের কাছে নাটক নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আরণ্যক কর্মীরা অভিনেতার ভূমিকা পরিত্যাগ করে 'এনিমেটরের' ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁরা অভিনেতা হিসেবে নিজস্ব ভাবমূর্তি তৈরির পরিবর্তে ভূমিহীন মজুরদের নিজস্ব নাটক নির্মাণে আগ্রহী করে তোলেন। আরণ্যকের মূল লক্ষ্য ছিল শ্রম এবং শিল্পের অদ্বৈত সত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

মুক্তনাটকের বিষয়বস্তু গ্রামীণ লোক-জীবনাশ্রিত ইম্প্রোভাইজিং পদ্ধতিতে এর যে অভিনয়রীতি তৈরি হয়েছে তাতে লোকনাট্যের মৌখিক রীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। কোনো শূন্য প্রান্তর, বিরাট

জমি কিংবা বাড়ির সুপরিসর উঠোনে মুক্তনাটক অভিনীত হয়। লোকনাটকের ক্ষেত্রে আসর পদ্ধতি প্রচলিত, মুক্তনাটকের অভিনয়েও আসর বসে। বিষয়বস্তু থেকে শুরু করে অভিনয় পর্যন্ত মুক্তনাটকে লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কাজেই মুক্তনাটকের শুধুমাত্র রাজনৈতিক অভিনয়ই মুখ্য নয় বরং লোকায়ত শিল্পমাধ্যমগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

মুক্তনাটকের পাশাপাশি ঢাকা থিয়েটারের গ্রাম থিয়েটার কার্যক্রমের আলোচনা করলে দেখা যায় লোকনাট্য উপাদান ও লোকনাট্য আঙ্গিকের যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে গ্রাম থিয়েটার একটি সাংগঠনিক কাঠামোয় অবয়বিত হয়েছে। লোকনাট্য আঙ্গিককে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে গ্রাম থিয়েটার কতকগুলো বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। যেমন ঐতিহ্যের অনুসরণ ও নবরূপায়ণ, চৌকোণ খোলা মঞ্চের নবায়ন, ইউরোপীয় মঞ্চ ও নাট্যরীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক সচেতনতার সৃষ্টি, নাটকে আঞ্চলিক ভাষার ও লোকজীবনের উপাদান ব্যবহার, লোকনাট্য আঙ্গিকের প্রামাণ্য সংগ্রহ ও ঐ রীতির প্রতিষ্ঠা, এ দেশের শ্রমজীবী মানুষের কাছে নাটককে ব্যাপকভাবে বিনোদন এবং সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমরূপে পরিচিত এবং জনপ্রিয় করে তোলা। এ লক্ষ্যে সারা বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে প্রায় ১৬০টির অধিক গ্রাম থিয়েটার।

গ্রাম থিয়েটার লোকনাট্য আঙ্গিকের ব্যবহারের ক্ষেত্রে দার্শনিক প্রেক্ষাপটের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ দেশকে ভালোবাসা শুধু একটি ভৌগোলিক সীমানাকে রক্ষা করার মধ্যেই সংকুচিত হতে পারে না। দেশকে ভালোবাসতে হলে জানতে হবে তার ইতিহাস, সংস্কৃতি। মানুষর কর্মের সাথে তার প্রাত্যহিক আনন্দের সংগ্রামের সম্মিলনে যে জীবনাচরণের প্রক্রিয়া উন্মোচিত হয়েছিল সহস্র বছর পূর্বে তার স্বরূপ আবিষ্কার এবং বর্তমানে সমাজে মানুষের জীবনসংগ্রামের গতিধারায় ভবিষ্যতের প্রত্নরূপ নির্ধারণের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে দেশকে ভালোবাসাই যথার্থ অর্থে দেশকে ভালোবাসা। বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় গ্রাম থিয়েটারও এই অকৃত্রিম সত্যে বিশ্বাস করে যে, আজকের সেই সামাজিক বন্ধ্যাত্বের মুহূর্তে যে পরিবর্তন ও গণতান্ত্রিক অধিকার আমাদের প্রত্যেকর প্রত্যাশিত তা বাস্তবায়নের জন্য অনিবার্যভাবে প্রয়োজন শ্রমজীবী মানুষের নেতৃত্বে ও সাংগঠনিক পরিচালনায় উৎপাদন শক্তি এবং হাতিয়ারসমূহের নতুন বিন্যাস। আজকের বন্ধ্যা সংস্কৃতির গর্ভে নতুন সংস্কৃতির দেবশিশুর আর্বিভাব সম্ভব হবে সমকালীন নাট্যচর্চার লোকজ উপাদান ও লোকনাট্য আঙ্গিকের নান্দনিক প্রয়োগের ফলে।

এভাবে দেখা যায় বাংলাদেশের সমকালীন নাট্যচর্চায় লোকনাট্য আঙ্গিকের ব্যবহার শুধু নাটকের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি, সাংগঠনিকভাবে লোকনাট্য আঙ্গিকের প্রয়োগের দিকে বাংলাদেশের নাট্যকর্মীরা মনোযোগী হয়েছেন। মুক্তনাটক, গ্রাম থিয়েটার আন্দোলনের পশ্চাদ্‌পটে ক্রিয়াশীল ঐতিহ্যমুখী দীপ্ত পদযাত্রা। বাংলাদেশের লোকনাট্যের যে অভিনয়রীতি সমগ্র বৎসর ধরে চলে আসছে তার মধ্যে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে কোনো ব্যবধান সৃষ্টি করেনি। মুক্তনাটকের তাৎক্ষণিক অভিনয় প্রক্রিয়ার মধ্যেও যেন সেই লোকনাট্যাভিনয়ের ঐতিহ্যকে স্পর্শ করার আকাঙ্ক্ষা। নাটক যেহেতু একটি শিল্প মাধ্যম, তাই দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে সম্পর্ক থাকা উচিত। বৃত্তায়িত কিংবা খোলামঞ্চে অভিনীত লোকনাট্যাভিনয়ের মধ্যে এই দর্শক অভিনেতার মধ্যে দূরত্ব নেই বরং পারস্পরিক অংশগ্রহণের ফলে ঘনিষ্ঠতাই স্থাপিত হয়েছে। 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'-এ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মঞ্চে প্রবেশ করেন দর্শকদের মধ্যে থেকে। 'রাজা অনুস্বারের পালা'-র নাট্যকার মমতাজউদ্দিন আহমদ মনে করেন: 'আমার দেশের লোকনাট্যের অসামান্য সম্ভাবনা ও যোগ্যতাকে পরিমাপ করার ইচ্ছা নিয়েই অনুস্বারের পালা রচনার উদ্যোগী হয়েছিলাম। এ পালাতে যা আছে তা সবই আমাদের লোকনাট্যে আছে। আর যা নেই তার অনেক বেশী সম্পদ আছে আমাদের স্বদেশী নাট্যভাবনায়।'

বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় লোকনাট্য আঙ্গিকের প্রয়োগগত আলোচনায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের লোকনাটকের দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় কথকতা, যাত্রা, পালাগান, কবির লড়াই, খোলামঞ্চ, দেহছন্দ, গল্পবলার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। লোকজ আঙ্গিকের আধুনিক মূল্যায়ন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে—বাংলা নাটকের বিষয়বস্তু, অভিনয়রীতি, মঞ্চরীতি আরও সমৃদ্ধতর হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাট্যচর্চায় লোক আঙ্গিকের ব্যবহারের ফলে। লোকনাট্য আঙ্গিকের ব্যবহারের ফলে বাংলা নাট্যাভিনয়ে একটি নিজস্ব অভিনয়রীতি গড়ে ওঠার লক্ষণ সূচিত হয়েছে। যে অভিনয়রীতি সম্পূর্ণই প্রাচ্যদেশীয়। প্রাচ্যদেশীয় অভিনয়রীতি মূলত গীতল বা কাব্যিক। প্রখ্যাত মূর্তিবিদ্যা বিশারদ আনন্দকুমার স্বামী তাঁর অনূদিত 'অভিনয় দর্পণ' গ্রন্থে বলেছেন যে, ধ্রুপদী রীতিতে এই কাব্যিক বা গীতল অভিনয়শাস্ত্রীয় মুদ্রায় পরিপুষ্ট বা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু প্রাকৃত নাটকের অভিনয়রীতি শাস্ত্রীয় মুদ্রা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হলেও তা কাব্যিক বা গীতল। রামায়ণ কথকতা, মঙ্গলকাব্য কিংবা গাজীর গানের অভিনয় রীতির উদাহরণ আমরা এ প্রসঙ্গে তুলে ধরতে পারি। অভিনয় যখন ঘটনা-সংঘাতের উত্তেজনা পরিহার করে চলে, তখন সঙ্গত কারণেই দর্শককে ঘটনার বদলে বাচিক অভিনয়ের সুর দ্বারা আবিষ্ট করে। আমাদের পূর্বপুরুষদের এই কৌশলটি হয়তো জানা ছিল বলেই লোকনাটকের কাব্যিক ব্যঞ্জনা ও গীতিধর্মিতা নাটকের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এতটা সুনিবিড়। এই গীতিধর্মিতা কিংবা কাব্যিক অভিনয় দর্শককে মঞ্চ থেকে অনেক দূরে ভাবের জগতে নিয় যায়। সংলাপ থেকে সংলাপে ভারতীয় নাটকে অভিনেতা যে দৃশ্য নির্মাণ করেন, যে ঘটনাপুঞ্জকে তুলে ধরেন তা দর্শককে ভাবিত করে; আপ্লুত করে এবং কখনো কখনো নাটক চলাকালীন তার বিচারবুদ্ধিকে নাড়া দেয়। লোকনাট্যের এই শাশ্বত প্রভাবকে অঙ্গীভূত করে বাংলাদেশের আধুনিক নাট্যচর্চাকে আরও সমৃদ্ধ ও বেগবান করা সম্ভব হলে আমরা বিশ্বনাট্যসভায় উপস্থাপন করতে পারব আমাদের নিজস্ব জাতীয় নাট্য আঙ্গিক। যার শুভ সূচনা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নাট্যচর্চায়।

পাঁচালির আঙ্গিকগত অনুপ্রেরণায়

সেলিম আল দীন

'বনপাংশুল' বাংলা পাঁচালির আঙ্গিকগত অনুপ্রেরণায় রচিত উপাখ্যানবর্তী নাট্য। অভিনীত কাব্যমাত্রই প্রাচীন ও মধ্যযুগে পাঁচালি, নাটগীত, গীতনাট, পদাবলি প্রভৃতি এবং কথকতা ধারায় রচিত আখ্যান পুরাণ নামে আখ্যাত হত। সেকালে বাংলা সাহিত্যের নন্দন নির্বাচনে দেশজ রুচির স্তরে স্তরে সর্বভারতীয় অভিজ্ঞতা আহৃত হয় এবং পাঁচালি ও নাট্যগীতের মতো শিল্পরীতি সর্বপূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য যথা উড়িষ্যা, আসাম, মিথিলা, নেপাল পর্যন্ত অনুকৃত এবং অনুসৃত হতে দেখা যায়।

পাঁচালি বাঙালির সর্বব্যাপ্ত শিল্পরসাস্বাদনের আধার। একই সঙ্গে নৃত্য, গীত, রাগরাগিণী, আখ্যানগত উপাখ্যান, চরিত্রাভিনয়, বর্ণনার একটি শিল্পগত ও অন্যান্য নৈয়ায়িকতার অনিবার্য সংশ্লেষ পাঁচালি। অর্থনীতি, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি, দর্শন, ইতিহাস, রাজ্য-রাষ্ট্র ও নিসর্গিতি স্বর্গমর্ত জুড়ে দেবকল্প মানুষের এ এক বিস্তারিত উপস্থাপন। পাঁচালি উপাখ্যান ও বর্ণনাত্মক নাট্যের একাঙ্গী শিল্পরূপ, বাঙালির দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পরুচির মহাকব্যিক গড়নের ধাঁচটাও পাঁচালিতে অন্বেষণ যোগ্য।

অরুণ সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সেমিনারে (ডিসেম্বর-১৯৯৯) বাঙালির স্ট্রাকচারাল এপিকের লক্ষণ বিষয়ে একটি বক্তব্য পেশ করি। তাতে উপস্থিত পণ্ডিতবর্গের কেউ কেউ মহাকাব্য সম্পর্কে বক্তার মুক্তধারণার বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁরা যা বলেছিলেন তা ব্যাখ্যা করলে এ রকম দাঁড়ায় যে, বক্তার ভাষায় ক্লাসিক্যালিটি, এপিক প্রভৃতি টার্মিনলজি নির্বিশেষে ব্যবহৃত হয়েছে।

আমি তথাকার গৌড়জনকৃত অভিযোগের যাথার্থ্য স্বীকার করি কিন্তু সর্বাংশে নয়। ক্লাসিক ও এপিকের প্রাচীন ও নৈয়ায়িক বিধিলিপি আর সে সম্পর্কে আধুনিককালে নান্দনিক ধারণার মধ্যে একটা বিরোধ থাকতেই পারে। বিশেষত তাকে একান্তরূপে সূত্রসংজ্ঞা ধার্যকৃত পন্থায় অন্বেষণ আমাদের দেশকাল ভূগোলে নিরর্থক বলে মনে করি। পাঁচালিকে মহাকাব্যের লক্ষণ সম্পন্ন বলাতে মহাকাব্যের ন্যায় শাস্ত্রের হানি হয় না, এবং আধুনিককালে কোনো শিল্পকর্মকে বিস্তার ও মৌলিকতা, নির্মাণ ও প্রবণতা বিচারপূর্বক এপিক লক্ষণাক্রান্ত বলবার একটি নান্দনিক উদারতা তো দেখাই যায়। আর শিল্পের ঔদার্যবোধেই আধুনিকতা। ক্লাসিক ও এপিক তত্ত্বনামে পার্থক্য আছে কিন্তু সে পার্থক্য অচিরাৎ বিচূর্ণিত হয় যখন কোনো লক্ষণসম্পন্ন রচনাকে আমরা ক্লাসিক প্রভৃতি গুণবাচক শব্দে বিভূষিত করি। তবে স্বীকার করা যায় যে, ক্লাসিকমাত্র এপিক না হলেও এপিকমাত্রেরই ক্লাসিক সম্ভাবনা কোনো না কোনো মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। নব্য ধ্রুপদীবাদী কর্নেই ক্লাসিক। কিন্তু লেসিদ (Le Cid) এপিক নয়। আবার রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' নিঃশর্ত এপিক এবং আমাদের বাঙালি মানসে তা একই সঙ্গে ক্লাসিকও হয়ে উঠেছে। বাঙালির স্ট্রাকচারাল এপিক, আমাদের দেশকালের রুচিতে ক্লাসিক রূপে গণ্য হতে পারে। সকল জাতিতেই এপিক আছে এবং তা কোনো একটি দেশের এবং কোনো একটি কালের ক্লাসিক নিয়মনীতির উপর ভর করা নাও হতে পারে। এপিক হয়ে ওঠার শিল্প, তা বানাবার জিনিস নয়। ক্লাসিক সূত্র সম্বন্ধিত, তার বৈয়াকরণের নৈয়ায়িকতা দৃশ্যমান। একটি আপন শক্তিতে জন্মে অন্যটি পূর্বজের যুক্তিকে আহরণপূর্বক নিজেকে অস্তিমান করে। এপিক বর্ণ শঙ্কিত নয়, ক্লাসিক বর্ণরক্ষায় সঙ্কল্পবদ্ধ। তথাপি কোনো এপিক, জাতিগোষ্ঠী বিশেষে শর্তবিরুদ্ধ পন্থায়ও ক্লাসিক হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ এ দুটি বিষয় দ্বৈত কিন্তু পরস্পর সম্পর্কে বহুস্থলে, নন্দনতত্ত্বের আধুনিকতার আবহে একার্থদ্যোতক। উদাহরণস্বরূপ কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রসঙ্গ উল্লেখিত হতে পারে—এই পাঁচালি

নিঃসন্দেহে এপিক এবং বাঙালি মানসে তা ক্লাসিকার্থকও বটে।

'বনপাংশুল'-এর ভূমিকায় এ কথাগুলো বলবার অধিকার আমার আছে এ জন্য যে, এ কাব্যে আমি পাঁচালি গঠন এবং এর বিস্তার দ্বারা পূর্ণাঙ্গরূপে অনুপ্রাণিত। এতদসঙ্গে আধুনিক বাঙালি পাঠক অনুধাবন করবেন যে, পাঁচালি গঠন-নির্দেশক তত্ত্বনামগুলো যথাযথভাবে পুনরুচ্চারিত, তাকে প্রত্নশোভন রূপে নয় বরং নৈয়ায়িক শৃঙ্খলায় প্রয়োগের চেষ্টা করেছি। পাঁচালির উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে মধ্যযুগের বাংলা নাট্যে বিস্তৃত আলোচনা আছে। আমার শিক্ষক আহমদ শরীফ মনে করেন এর উদ্ভব কাল দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক।

প্রায় সহস্র বৎসর ধরে বাহিত বাংলা সাহিত্যের এই ধারা কালের প্রয়োজনেই ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ে। আধুনিক বাঙালি মানসে নতুনের তাড়া সেই সঙ্কটে সমাহৃত ঔপনিবেশিক শিল্পরীতির মধ্যে আত্মপ্রকাশকে অবিকল্প করে তুলেছিল। এর সঙ্গে বাঙালির সাহিত্যরুচির ক্ষেত্রে ঘটল এক আকস্মিক মধ্যখণ্ডন। আমাদের পক্ষে দীর্ঘকালের দেশ কাল ভূগোল এবং ইতিহাসপুষ্ট শিল্পরীতির সঙ্কম-সঙ্গতি আর সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব হল না। কিন্তু এককালের অনিবার্য মধ্যখণ্ডনকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার প্রবণতা, ইংরেজ ঔপনিবেশের দুশো বছর পরও প্রশ্নাতীত থাকছে সেটাই শঙ্কাসঙ্কুল করে আমাদের কাউকে কাউকে। তখন অবশ্য নতুন করে প্রশ্ন জাগে অনেকগুলো,

এক. এ কোনো পুনরাবর্তনের প্রয়াস নয়তো যাতে চাকাটা পিছনে ঘুরে।

দুই. দেশজ শিল্পরীতির বিশিষ্টতা এতটা কী যে, তা ইউরোপীয় কিংবা পশ্চিমাশিল্পরীতির মুখোমুখি দাঁড় করানো যায়।

তিন. এ কোনো পুনরুজ্জীবনের কৃত্রিম প্রয়াস নয়তো, যার পরিণাম, সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ।

এ সব প্রশ্ন স্বাভাবিক । আর এর উত্তর বলা যায়, একজন বাংলা ভাষাভাষী লেখকের বিশ্বমুখীনতা উৎসবিহীন উৎকেন্দ্রিক উঞ্ছবৃত্তি নয়। উপনিবেশকালের মহৎ প্রণোদনার সঙ্গে সঙ্গে সেই উপপ্লবজাত মুদ্রাদোষটুকু আমাদের পক্ষে এখন পর্যন্ত একান্তরূপে মান্য ও স্বাভাবিক গণ্য করাটা অস্বাভাবিকতা। বরং বিশ্বমনে সে খুঁজে নেবে স্বভূমিজ শিল্পের উৎসার। আমাদের বিশ্ব অভিজ্ঞতাকে বাঙালি মডেলে গ্রহণ করার মধ্যে যে শিল্প কাণ্ডজ্ঞান তাকে বর্জন করা কেন্দ্রচ্যুত আধুনিকতা ও পশ্চাদপদ মানসিকতার অভিজ্ঞাপক সে তো আমাদের সমকালের পাণ্ডুবর্ণ শিল্পকর্মের দেহে মনে অবসাদে জড়ত্বে দৃশ্যমান।

যুগের প্রয়োজনে বাঙালির শিল্পনন্দন ভাবনা যদি একদা পাল্টে গিয়ে থাকে, তবে পরিবর্তনের পারম্পর্যে আজও অন্যরকমের জরুরি পরিবর্তন কাম্য। তাকে রুখতে গেলে স্বাভাবিকের হানি ঘটে! আপন জাড্যবশত ঔপনিবেশিক শিল্পমানসকে আজ লালন করার কোনো কালগত অর্থও দাঁড়ায় না।

'বনপাংশুল'-এ পাঁচালির গড়ন নির্বাচনের পশ্চাতে এই অন্বেষণ কাজ করেছে যে, বাংলা উপখ্যানের মডেলেই আধুনিকতা, সমকালীনতা, জীবন ও জগতের নানাস্তরের আন্তসম্পর্কের জটিল আবর্তসমূহের ধৃতি সম্ভব কিনা। উপরন্তু সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য নাট্যনির্মাণ কৌশলের অভিজ্ঞতায় পাঁচালির উপস্থাপনাকে একান্তরূপে কাব্য, উপন্যাস ও নাট্যের অনিবার্যস্থলে ন্যাস করা যায় কিনা তাও বুঝে নেওয়া।

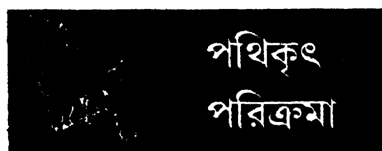
'বনপাংশুল' তাই নিরীক্ষানুধর্মী লেখা নয়, একান্ত বিশ্বাসে এর পাঁচালির আঙ্গিকে আধুনিক বাংলা শিল্প মডেলের অস্তিত্ব খুঁজে দেখা। এই উপাখ্যানবর্তী নাট্যে, আদি পাঁচালি (দাশরথি রায়ের নব্য পাঁচালি ব্যতিরেকে)-র সর্ববঙ্গাঞ্চলে প্রচলিত পরিভাষাসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে। একালের শিল্প প্রয়াসে প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাঁচালি নির্মাণ ও পরিবেশনা কৌশলের অদ্বৈত পরিভাষাসমূহ ব্যবহারের মধ্যে কোনো পিছুটান বা নিছক ঐতিহ্যপ্রীতি কাজ করেনি। বরং কোনো সুবিস্তৃত উপাখ্যানে, ওই সকল পরিভাষাকে নির্মাণের নানা স্তরে শীর্ষনাম রূপে ব্যবহারপূর্বক গল্প বুনন রীতিটাকে অধিকতর নিশ্চিতরূপে প্রকাশ করা যাবে এরকম বিশ্বাস ছিল। কথানাট্যের শুরুতে, সংস্কৃত কথাসরিৎসাগরের

গল্প বিভাজন থেকে মঙ্গলাচরণ বা উমাপতি বন্দনার ধাঁচ এবং লম্বক তরঙ্গ প্রভৃতি পরিভাষা গৃহীত হয়েছিল। পরে গড়নের ক্ষেত্রে একটা নিশ্চয়তা মিলেছিল বলে . . . 'যৈবতী কন্যার মন', 'হরগজ'-এ তা পরিত্যক্ত হয়। অবশ্য পাঁচালির দিশা, বোলাম, নাচাড়ি, শিকলি, পদ , কথা প্রভৃতি পরিভাষা, 'বনপাংশুল' পরবর্তী 'প্রাচ্য'-এ ও অনুসৃত হয়েছে। ভবিষ্যতে নির্মাণ কৌশলগত এই শব্দগুলির পরিচয় সুলভ হলে কাহিনির শরীর থেকে তা বর্জন করা যেতে পারে। কিন্তু পাঁচালির কৌশল, গঠন-পরিবেশন নির্দেশক কিছু শব্দ আছে যা বাদ দিলে একটা দুর্বোধ্যতা তৈরি হতে পারে। যেমন নাচাড়ি (নাচাড়ী বা নচরি), নাট্যগীত প্রভৃতি পরিভাষা পরিবেশন ও আঙ্গিক কৌশলসংক্রান্ত, সেগুলি পরিত্যক্ত হলে, পাঠক বা নির্দেশকের পক্ষে তার প্রকৃতি ও প্রয়োগ সর্বাঙ্গে বোধগম্য হবে না।

'বনপাংশুল'-এর ভাষায় বাংলা অর্ধযতি ও পূর্ণ যতির ব্যবহার আছে। 'চাকা' নাটকের ভাষায় কমা সেমিকোলন ব্যবহার না করার কারণ বলেছি। এটা একটা পরীক্ষাও আমার জন্য যে, কমা সেমিকোলন ব্যতিরেকে বাংলা বাক্যের অকুণ্ঠ প্রকাশ সম্ভব কিনা তা দেখা। তাতে সে সকল চিহ্ন অধ্যুষিত বাক্যের অভ্যস্ত পাঠকরা হঁচট খেতে পারেন। কিন্তু মনে করা যায় যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগে পয়ারের নানাবিন্যাসে বিচিত্র বিশাল ও সর্বব্যাপ্ত উপাখ্যানসমূহ অর্ধযতি আর পূর্ণ যতি দ্বারাই রচিত হয়েছিল। সেকালের বাংলা কাব্যে ভাষার পঠন চিহ্ন তো ছিলই, তাকে একালে নতুন করে ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হতে পারে। আমাদের ভাষার গড়নে ক্ষেত্রবিশেষে অর্ধ যতি ও পূর্ণ যতিই যথেষ্ট। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রধান দৃষ্টান্ত। গীতবিতানের অমৃতসম্ভব পদাবলি কমা সেমিকোলনের বক্রফোঁটা চিহ্ন পেরিয়ে অর্ধযতি এবং পূর্ণ যতিকেই স্বীকার করে নেয়।

'বনাপাংশুল' যাঁদের নিয়ে রচিত তাঁদের কারো কারো সঙ্গে আমার নিবিড় যোগাযোগ । এ লুপ্ত প্রায় নৃগোষ্ঠী যে ভগ্ন অরণ্যে থাকেন সেই স্থলের মাটি রং, অবর্তিত হেমন্ত, শীত বসন্ত শুরুর পাতা খসাবার দিনগুলির সঙ্গে আমার কত যে জানাশোনা। রাজেন্দ্র, অনিল, মালতীদের আমি দেখেছি। এই অঞ্চলে প্রথম যাঁর সুবাদে যাই তিনি আমার ছাত্র, বর্তমানে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি, লুৎফর রহমান। নাটকের লুৎফর চরিত্রটি ভেঙেচুরে শেষ অবধি লুৎফর রহমানেই। মান্দাইদের লুপ্ত ভাষা উদ্ধার বিষয়ে তাঁর সঙ্গে ১৯৯০-৯১ সালে অরণ্যপথ পরিভ্রমণে বিস্তর আলাপ হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত কল্যাণীয় আফসার আহমদ, আহমেদ সানি, ইস্রাফিল আহমেদ রঙ্গন এবং বিশেষত সাজ্জাদ আহসান বহু বিষয়ে আমাকে সহায়তা দিয়েছেন। নাটকটির নামকরণে মতামত প্রদান করেছেন আমার স্ত্রী বেগমজাদী মেহেরুন্নেসা ও অনুজপ্রতিম নাট্যকার মাসুম রেজা।

আমার দল ঢাকা থিয়েটার নাটকটি মঞ্চায়িত করেছে দলের সিকি শতকের স্মারক প্রযোজনারূপে। পাঁচালির অনুবর্তী কোনো কাব্যের মঞ্চস্থ হবার বিষয়ে একটা সংশয় তো ছিলই। কিন্তু নাসিরউদ্দীন ইউসুফের অসাধারণ শিল্পজ্ঞান, বাংলা মঞ্চে পাঁচালির অভিযাত্রাকে বাস্তবায়িত করে তুলল। 'বনপাংশুল'-এর আখ্যানবর্তী রূপটিকে অনেকটা যেন তিনি, মধ্যযুগের উপস্থাপক কবির কৌশলে দৃশ্যমান করলেন। অনন্তর নির্ণয় করি যে, এই নাট্যনির্দেশনায় ইউসুফের শিল্পদৃষ্টি , চিত্রকলা, সঙ্গীত, অভিনয় এবং বর্ণনার মাধ্যমে এক দ্বৈতাদ্বৈত পরিণাম লাভ করেছে। উপরন্তু এই নাট্যনির্দেশনায় ইউসুফের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এমন একটি স্বচ্ছন্দ সঙ্গতি ও পরিণাম লাভ করে যে তখন পাঁচালির লেখ্যরূপের মতোই 'বনপাংশুল'-এর টেক্সট প্রায় গৌণ হয়ে পড়ে।


পথিকৃৎ
পরিক্রমা



থিয়েটার স্কুল

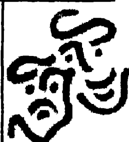
সুধী,

আগামী ১২ জুন, ২০০১ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে শওকত ওসমান মিলনায়তন (পাবলিক লাইব্রেরী) প্রাঙ্গণে থিয়েটার স্কুলের এক বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্সের একাদশ ব্যাচের সমাপনী আয়োজন ও সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠিত হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন দেশবরেণ্য শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী। সভাপতিত্ব করবেন থিয়েটার স্কুলের অধ্যক্ষ জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী।

দ্বিতীয় পর্বে একাদশ ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত ও তারক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা'- প্রযোজনা দুটি উপস্থাপিত হবে।

আপনার সানুগ্রহ উপস্থিতি কামনা করি।



আবদুল্লাহ আল-মামুন
উপাধ্যক্ষ

রামেন্দু মজুমদার
সম্পাদক

যোগাযোগ: ১৪৪ সিটি বেইলী রোড ঢাকা ১০০০ ফোন: ৯৩৪৩১৮৭

ক

মে দিবসের কাগজ





খ

নাগরিক ও বাংলাদেশের নবনাট্য

আবুল মোমেন

সংস্কৃতির কারণেই বাঙালি পাকিস্তান রাষ্ট্রের চোখে সন্দেহের পাত্র ছিল। সংস্কৃতির কারণে তাকে হিন্দু ও ভারত-পাকিস্তান রাষ্ট্রের এই দুই মৌল প্রতিপক্ষের প্রতি দুর্বলতার দোষে দায়ী করা হত। ফলে বাঙালির জন্যে পাকিস্তান হয়ে ওঠে বদ্ধদেশ, বদ্ধতার সকল বিকারসহ। বদ্ধঘরে একসময় প্রাণের মৃত্যু ঘটে। বাঙালিও মরতে বসেছিল। মরতে বসলেই বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠার প্রশ্ন ওঠে। বাঙালি পাকিস্তান নামক কারাগারটি ভেঙে মরিয়া হয়ে বেরিয়ে এসেছে বাঁচার জন্য। ভাবুন, সে একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বর কী মুক্তির নিশ্বাসটি ছেড়েছিল। আজকের নয়া পাকিস্তানে বসেও সেদিনটির কথা ভাবলে গা হাল্কা লাগে।

মুক্ত মানুষের কত কিছুই না করার কথা। যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় আবছা দেশ ও অপ্রাসঙ্গিক জনগণ হঠাৎই তার কাছে স্পষ্ট বাস্তব ও জীবন্ত রূপে ধরা দেয়; দেশ ও এর মানুষকে ঘিরে সৃষ্ট আবেগ তাকে দেয় মনের প্রফুল্লতা; তাকে সংসারের গণ্ডিতে বাঁধা পড়া ও চাপে শ্রান্ত হওয়ার পরিবর্তে পরিণত করে অনুপ্রাণিত মানুষে। অনুপ্রাণিত উদ্বুদ্ধ প্রফুল্ল প্রাণ কিছু না করে তো পারে না।

নাগরিক নামে নাট্যদল গঠিত হয়েছিল বটে পাকিস্তান আমলে, কিন্তু সে তখন ছিল সুপ্ত। ড্রামা সার্কল-এর মতো দলের বিচ্ছিন্ন প্রয়াস এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রণোদনায় ঢাকায় ও ঢাকার বাইরে কোনো কোনো জেলায় সূচিত নাট্য প্রয়াস সত্ত্বেও তখনও এ সামাজে একটি নাটক মঞ্চায়নই ছিল বহু আয়াসলব্ধ রীতিমতো ঘটনা বিশেষ—একটি নাটক একবার তৈরি ও মঞ্চায়নের সামাজিক ও আর্থিক ব্যক্তিক ধকল ছিল বিশাল ও প্রলম্বিত। নাগরিক পাকিস্তানকালের দুআড়াই বছরে একবারও মঞ্চে নামতে পারেনি।

বাহাত্তরে সমাজ যে যাদুস্পর্শে জেগে উঠেছিল যে যাদু মুক্তিযুদ্ধ। নতুন মানচিত্র, জাতীয় সঙ্গীত, বাঙালির নিজস্ব সরকার তো হলই, তার সাথে এল বহুদিনের বদ্ধ সমাজে মুক্তির হাওয়া—একেবারে আনকোরা তাজা, এবং তাতে ছিল মুগ্ধতা, মমতা, প্রেম, ছিল বুকে বল চোখে জল এবং তাতে আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাসের সমন্বিত বেগ। বহুকালের বদ্ধতার বিকার হওয়ায় হীনতার যাবতীয় গ্লানি ধুয়ে যে স্বাস্থ্যকর স্বাচ্ছন্দ্য এল তা মানুষকে দিল দল বাঁধার প্রাণ, দশে মিলে কাজ করার উদ্দীপনা।

এই উদ্দীপনায় তিয়াত্তরের গোড়ায় নিয়মিত মঞ্চায়নের অঙ্গীকার নিয়ে যে নাটক নাগরিক শুরু করল তার পেছনে মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত মুক্ত পরিবেশ ও আনুষঙ্গিক অর্জন ছাড়াও কলকাতার কিংবদন্তীতুল্য বাংলা মঞ্চনাটকের সাথে সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুবাদে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ।। নাগরিকই এ দেশে প্রথম শুরু করল নাটকের নিয়মিতো ও দর্শনীর বিনিময়ে মঞ্চায়ন। এটি বাংলাদেশের নাট্যেতিহাসের একটি মাইলফলক নিঃসন্দেহে। কিন্তু এ রকম, এবং আরও বহুরকমভাবে প্রাণধর্মে উজ্জীবিত হয়ে সদলে কিছু করার আকুলতা তখন প্রায় সবার মধ্যে সর্বত্র ছিল। তাই দেখি নাগরিকের প্রায় ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলে দ্রুত আরও নাট্যদল একইরকম সাফল্য—অর্থাৎ নিয়মিত ও দর্শনীর বিনিময়ে নাটক মঞ্চায়ন—লাভ করল। কেবল ঢাকায় নয়, চট্টগ্রাম এবং দ্রুত অন্যান্য জেলায়ও।

যে কোনো কিছু প্রথম করা বা শুরু করার গুরুত্ব অস্বীকার না করে এবং এর জন্যে প্রাপ্য সম্মানটুকু দিয়ে বলব যে, তিয়াত্তরের গোড়াতেই এ কাজে না নামলে নাগরিকের পক্ষে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন সম্ভব নাও হতে পারত। কথাটা এটুকু বোঝাতে বলা যে, সারাদেশে দলে মিলে কিছু

করার; সৎ উচ্চ উন্নত কিছু করার আকুলতা এমন ছিল যে নিয়মিত নাটক মঞ্চায়নের ধারা শুরু হতে তিয়াত্তরের চেয়ে বেশি দেরি হত না।

নাগরিকই যে এ কাজে ধাত্রী হয়েছে এ ঘটনাকে স্বাগত জানাই এ কারণে যে, নাগরিক বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে অনেকখানিই ধারণ করেছিল; এই ভূখণ্ড ও দেশবাসীর ঐতিহ্য ইতিহাসের প্রতিও তার আগ্রহ ও অঙ্গীকার ছিল সৎ ও দৃঢ়। দর্শনীর বিনিময়ে নিয়মিত নাটক মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে নাগরিকের খুব কাছ থেকে যারা এগিয়েছে তাদেরও সততা ও দক্ষতার অভাব ছিল না। ফলে তিয়াত্তরে শুরু হয়েই বাংলাদেশে অকস্মাৎ নবনাট্যের জোয়ার দেখা দেয়। নাটক মধ্যবিত্ত নাগরিকের সাংস্কৃতিক জীবনের আবশ্যিক বিষয় হয়ে ওঠে।

পচাঁত্তরে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা করল তা স্বাধীনতা পরবর্তী সাংস্কৃতিক মুক্তির আবহে ও ধারণায় আঘাত হানল। এ পরিবর্তন ছিল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে প্রতিক্রিয়ার শক্তির প্রত্যাঘাত—একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ। তবে '৫২ থেকে '৭১ পর্যন্ত দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতায় পোড়খাওয়া এ দেশের সংস্কৃতকর্মী শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের প্রতিরোধ-প্রতিবাদের শক্তি ও প্রণোদনার কোনোই অভাব ঘটেনি। বরং রাজনীতিককে ও টপকে গিয়ে তারা প্রতিরোধে প্রতিপক্ষের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এই আন্দোলনের ব্যাপ্ত সাংস্কৃতিক পরিসর থাকলেও তার সূচিমুখ অবশ্যই রাজনীতি। কিন্তু রাজনীতিকদের লজ্জাজনক ব্যর্থতার ঘাটতি পোষাতে ক্রমশ পেশাজীবী সংস্কৃতিকর্মীরাই আন্দোলনের অগ্রসেনায় পরিণত হন। নাটকে, যে কোনো শিল্পের মতোই, রাজনৈতিক দায়িত্ব অবশ্যই পালন করবে; সেই স্বাধীনতার হৃতস্বাদ ফিরে পাওয়ার; সেই সুপ্ত প্রাণময় বাতাবরণ পুনঃসৃষ্টির আন্দোলন যত প্রলম্বিত হয়েছে ততই আন্দোলন সংকুচিত হয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে এক দাবিতে। সে দাবি ক্ষমতা বদলের; ক্ষমতার রাজনীতির। নাটকও, বা বলা যায় নাটকই, নেতৃত্ব দিয়ে, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি অন্যান্য শিল্পমাধ্যম-সহ ক্ষমতার রাজনীতির একমুখী সংকীর্ণ খাতে সংস্কৃতিকর্মীদের টেনেছে বেশি। এতে নাটক, এবং তদ্রূপ অন্যান্য শিল্পের মাধ্যমে বৃহত্তর রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দায় মেটানো কঠিন হয়ে পড়ে। এ অনেকটা 'মানুষটা মদ খায় না মদে মানুষটাকে খায়' সেই রকম পরিণতি—নাটক ও অন্যান্য শিল্প কি রাজনীতিকে চরিত্র ও বেগ দেবে নাকি রাজনীতিই তাদের গ্রাস করে নেবে প্রশ্নটা এখানে এসে ঠেকে।

এই পথের সীমাবদ্ধতা নাগরিকই যেন বরাবর মনে রেখেছে। তাতে কপালে কোনো কোনো সতীর্থের সন্দেহ, এবং হয়তো আপসকামী পলায়নী মনোবৃত্তির সমালোচনা-লাঞ্ছনাও জুটেছে। কিন্তু এই বাহ্যযাত্রা আরও দীর্ঘ ও জটিল পথে। ইতিমধ্যে প্রথম শুরু করার সুবাদে আরও বেশ কিছু শংসাবচনও জুটেছে স্বভাবতই—এ দেশে কোনো নাটকের প্রথম রজতজয়ন্তী; মঞ্চায়নের প্রথম সুবর্ণ জয়ন্তী, প্রথম শত মঞ্চায়ন; দলীয় মঞ্চায়নের প্রায় হাজার রজনী ইত্যাদি সংখ্যাতাত্ত্বিক মাইলফলকগুলো তাঁদেরই দখলে। এতে দলটির সংহতি, শৃঙ্খলা, কাজের ধারাবাহিকতা, দর্শকপ্রিয়তা, অর্থাৎ নাটকের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে সাফল্যের প্রমাণ মেলে। পঁচিশ বছরে এ যাবত নাগরিক যে কটি নাটক মঞ্চায়ন করেছে তার সব দেখিনি, তবে বেশির ভাগই দেখার অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় তাদের প্রযোজনায় কোনোটিই অসফল নয়—এক্‌সেলেন্ট প্রযোজনা তো আছেই, সবকটিই কমপিটেন্ট প্রযোজনা। নাট্যনান্দনিক বিচার ঘাটতি-দুর্বলতা বা সংশোধন-পরিমার্জন-উন্নয়নের সম্ভাবনা অবশ্যই ছিল, কিন্তু তা সার্বিক সাফল্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার মতো নয়। এই সুখপ্রদ চিত্র নাগরিকের মনোপলি কিনা জানি না, কিন্তু এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, দেশে অসংখ্য দল মঞ্চে প্রচুর ভালো কাজ করে যাচ্ছে।

কিন্তু তারপরেও কোথায় যেন একটা দাঁড়ি-টানাগোছের ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে। নাট্যাঙ্গনেও, অন্য

অনেক ক্ষেত্রের মতো, মার্চ পাস্টের বদলে মার্ক টাইম চলছে। যদি নাগরিকের কথাই ধরা যায় তাহলে অনেক সাফল্যই দেখা যায়—একাধিক ভালো নাটক মঞ্চায়ন ও সমালোচক দর্শকদের বিপুল স্বীকৃতি লাভ, টানা বিশ বছর মোটামুটি একই উন্নত মান বজায় রেখে নাটক মঞ্চায়নের ধারাবাহিকতা, বাংলাদেশের বেশ ক-জন প্রথম সারির অভিনেতা-অভিনেত্রীসহ একঝাঁক মেধাবী নাট্যশিল্পীর সৃষ্টি, ও তাদের দলে লালন ধারণ, একাধিক নাট্যনির্দেশক সৃষ্টি, নাটকের দর্শক সৃষ্টি ও দর্শকের নাট্য বিষয়ে আগ্রহ বৃদ্ধিতে অব্যাহত প্রয়াস, দেশে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মুখধারায়ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকায় সম্পৃক্তি। ঠিক এমনটা না হলেও এ ধরনের সাফল্য আরও কোনো কোনো দলের রয়েছে।

তারপরেও এক জায়গায়—থেমে থাকা নয়—বিচরণের কথা বলছি। যে সাফল্য নাগরিক এবং বাংলাদেশের নবনাট্যের অর্জিত তা প্রথম দশ বছরের ভিতরেই ঘটে গেছে। বাংলাদেশে যে পরিমাণ দল ও নাট্যশিল্পী রয়েছে তার সাথে তুলনা টেনে যদি যোগ্য নাট্যকারের সংখ্যা, রচিত মৌলিক নাটকের মধ্যে উৎকৃষ্ট নাটকের সংখ্যা, ভাষান্তরিত-রূপান্তরিত নাটকের সাহিত্যমান, নাট্য সমালোচনার মান ও গুণী সমালোচকের সংখ্যা, সমাজে নাটকের শিল্পরূপ সম্পর্কে চেতনার ক্রমাগ্রগতি, যথার্থ নট ও সম্পূর্ণ নাট্যব্যক্তিত্বের উত্থান—এ সবই বিশ বছরেও শুধু আরব্ধই রয়ে গেল না, মনে হয়, এভাবে চললে, কোনোদিনই অর্জিত হবে না।

এর কারণটা একটু খতিয়ে দেখা দরকার। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হলেও সর্বার্থে স্বাধীন নয়। এ রকম একটি বদ্ধসমাজে যদি রাষ্ট্রশক্তি গোঁড়ামি ও সংস্কারের বশবর্তী হয়ে ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গণ্ডি টানতে ব্যস্ত থাকে তাহলে সে দেশে সৃজনশীলতার অনুকূল মুক্ত পরিবেশ অনুপস্থিত থাকে। বদ্ধকক্ষের ছাদের মতোই এ সমাজেও টানা আছে শক্ত নিশ্ছিদ্র ছাদের সীমা। আমাদের এই গণ্ডির ছাদ ছোঁয়া খুবই সহজ। এ অনেকটা ঘরের মধ্যে গ্যাস বেলুন ছেড়ে দেওয়ার মতো—সবকটা বেলুন ছাদে আটকে যাবে, তাতে কোনোটির কত উচ্চে ওঠা কত দূরে ওড়ার ক্ষমতা আছে তা বোঝা যাবে না। এর জন্য প্রয়োজন মুক্ত আকাশ। এখানেও দ্রুত বিরাজমান সাংস্কৃতিক সিলিংয়ে পৌঁছে যাচ্ছে যাদের সামান্য দক্ষতা আছে তারা। তাতে সামান্যে ও অসামান্যে ফারাক বোঝা দায়, কার কতটা সাধ্য যোগ্যতা সেটা বোঝার ও দেখার উপায় নেই, কে কতটা চ্যালেঞ্জ নিতে পারত ও কতটা চ্যালেঞ্জ সমাজকে ছুঁড়ে দিতে পারত তা বোঝার উপায় নেই। এই বদ্ধতার সংকট সম্পর্কে ক্ষমতাবান শিল্পীও যে সচেতন তা বলা যাবে না, কারণ সৃজনশীল-বেদনশীল মানুষমাত্রই যে সমাজ বাস্তবতার এই জটিল প্রক্রিয়া ধরতে পারবেন তা নয়। তার নির্ভর করবার কথা চর্চিত শিল্পের প্রতি অখণ্ড অভিনিবেশ ও সততা, ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা ও মানবতার প্রতি অঙ্গীকারের ওপর। কিন্তু বামন সমাজ তো তার দিকে ছুঁড়ে দেয় তার ভ্রান্ত বিকৃত পথে প্রতিষ্ঠার জবরদস্তি, যা সাধারণত সৃজনশীলতার বিনিময়েই মেলে ; যা ব্যতিক্রমী চিন্তা, নিরাপস স্বাধীনতা, দুঃসাহস, ধারালো আক্রমণাত্মক সকল প্রণোদনার আপসের মাধ্যমেই মেলে।

ক্ষমতাবান শিল্পী একদিকে সিলিংয়ে আটকে হাতাশ হয়ে থাকেন আর অন্যদিকে জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠা-স্বীকৃতির নানাফাঁদে পা দিতে ও জড়াতেও থাকেন। তাতে কোনো ক্ষেত্রেই যোগ্যতানুযায়ী এগুনো সম্ভব হয় না। যাঁর অভিনয় কুশলতায়, নাট্য-নির্দেশনায় বা সামগ্রিক দক্ষতায় নাট্য ব্যক্তিত্বে উন্নীত হওয়ার কথা তিনি পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন টিভি-নাটক নামক সিনথেটিক সোপ শিল্পের জনপ্রিয় তারকায়, কারও আবার 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' সাবান বা শ্যাম্পুর। শিল্পী, নাট্যশিল্পী রূপান্তরিত হন জনগণের বিনোদন তারকায়। ফলে তাঁর অবস্থান লক্ষ্য ও দক্ষতা সকল কিছুর মূল্যায়ন ভুল মানদণ্ডে হতে থাকে। এমনকী স্থানচ্যুত হয়ে মানুষটি শিল্পের দিক থেকে তাঁর সম্ভাবনা ও

কার্যকারিতা হারাতে পারেন। একটি বদ্ধসমাজে এ-ই হওয়ার কথা। এভাবেই চড়ামূল্যে ভ্রান্ত পরিচয়ে পাদপ্রদীপের আলোয় থেকে জনগণের মনে প্রাসঙ্গিক হওয়া সম্ভব। নতুবা এ সমাজে আড়ালে পড়ে থেকে হয় অবমূল্যায়িত নতুবা বিস্মৃত হয়ে থাকতে হয়।

সাংস্কৃতিকভাবে উন্নত কোনো দেশই বদ্ধ এবং এককেন্দ্রিক নয়, বহুকেন্দ্রিকতা তার মুক্তির পথ সুগম করে দেয়। এ রকম দেশে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয় স্ব-সীমানার মধ্যেই থাকে একাধিক—যেমন ভারতবর্ষে, অথবা সীমানা ডিঙিয়ে একাধিক—যেমন ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে। ইয়োরোপে হিস্পানি পিকাসো, রোমানীয় আয়োনেস্কু বা আইরিশ বেকেট পশ্চিম ইয়োরোপীয় সাংস্কৃতিক রাজধানী প্যারিসে বসে কাজ করেন। যে যেখানেই থাকুক, সে টুশকানি বা ট্যুবিঙ্গেন, হাইডেলবার্গ বা দ্য হেগ তার পক্ষে পশ্চিমা নাট্য ঐতিহ্য, পরম্পরা ও সমকালীন ধারার সাথে পরিচিত সম্পৃক্ত থাকা কঠিন নয়, কারণ সে এক মুক্ত সাংস্কৃতিক আবহে বাস করে।

বাংলাদেশ তার সাংস্কৃতিক বলয় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থেকে হাত বাড়াতে চায় পশ্চিমে, তাতে কিছু কৃত্রিম শৌখিন আন্তর্জার্তিকতা হয়, ভিতর থেকে শিকড়সহ বিবর্ধন সম্ভব হয় না। ভুল বোঝার সম্ভাবনা দূর করতে বলি, পশ্চিমা তথা বিদেশি নাটকের রূপান্তর-ভাষান্তর মঞ্চায়ন বা সরাসারি মঞ্চায়নের প্রতি কটাক্ষ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, চিরায়ত ধ্রুপদী ও উৎকৃষ্ট নাটক মঞ্চস্থ হবে, কিন্তু যা করা যাবে না—হওয়া উচিত নয়, তা হল নিজের নাট্য ঐতিহ্যধারা সংস্কৃতি বিনির্মাণের কাজ স্থগিত রাখা, ভুলবশত শিকড়বিহীন চর্যা বা এ কাজে ব্যর্থতা।

আমার অব্যবহিত নিকট সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল কোনোটি? অস্ট্রিয়ার যেমন জার্মেনিসহ পশ্চিম ইয়োরোপ, আমার তেমনি ভারতবর্ষ। যদি সৌরজগতের উপমা টানি, তাহলে বলতে হয় সেখানে যেমন পৃথিবী বুধ শুক্র মঙ্গল নিয়ে অভ্যন্তরীণ সৌরবৃত্ত (Inner Planets) আছে, আর বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস নেপচুন প্লুটো নিয়ে বহির্বৃত্ত (Outer Planets) রয়েছে, ঠিক তেমনি ভারতবর্ষ—যা আধুনিক কালের সার্ক—আমার সংস্কৃতির অন্তর্বৃত্ত আর পশ্চিম আমার বহির্বৃত্ত। আঙিনা এড়িয়ে কোনো গন্তব্যে পৌঁছানো যায় না। অথচ এ নিয়ে চরম ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির ফলে—অবশ্যই প্রধানত ক্ষমতাবান রাজনীতিবিদদের—আমরা ক্রমে কেবল নিঃসঙ্গই হয়ে পড়ছি না, বিকাশের সকল সম্ভাবনা হারিয়ে বদ্ধ প্রকোষ্ঠে আটকা পড়ে যাচ্ছি। রূপকথার গল্পে আছে যে, যেখানে ছিল মানুষগুলো দাঁড়িয়ে আছে যেন জীবন্ত, কেবল হাত দিয়ে ছোঁয়ার পরই হুড়মুড় করে পড়ে গিয়ে প্রমাণ করে যে তারা আসলে মৃত। আমাদেরও অবস্থা সেইরকম হতে যাচ্ছে, অকস্মাৎ এই বদ্ধ প্রকোষ্ঠে মুক্তপ্রাণের জোরালো হাওয়ার ধাক্কায় খাবি খেতে খেতে আমরাও হয়তো প্রমাণ করি যে আমরা মুমূর্ষু, ক্ষীণপ্রাণ।

নাগরিক দল হিসেবে, এবং এ দলের অনেকেই শিল্পী হিসেবে, এ সমাজের সাংস্কৃতিক সিলিংয়ে পৌঁছেছেন ন্যূনপক্ষে দশ বছর আগে। বেতনের সাথে তুলনা টেনে বলি, এই সিলিং ডিঙাতে না পারলে—প্রয়োজনে অবশ্যই ভেঙে—পরবর্তী ইনক্রিমেন্ট মিলবে না। অসন্তোষ, অতৃপ্তি, ক্ষোভ, হতাশা অথবা ভ্রান্ত বিকৃত খণ্ডিত প্রতিষ্ঠার নির্বোধ জয়ধ্বনি—উভয় পথে ক্ষয়ই অনিবার্য পরিণতি।

অতএব রজতজয়ন্তী বর্ষে নাগরিককে নিজস্ব উদ্যোগে এবং সতীর্থ অন্যদের সাথে মিলিতভাবে গণ্ডি ভাঙা, বাধা ডিঙানো এবং বদ্ধসমাজে মুক্তির হাওয়া আনার দায় আরেকবার স্মরণ ও স্বীকার করতে হবে।

বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনে আরণ্যক

বদরুদ্দীন উমর

কাহিনিকে একই সাথে দেখা ও কানে শোনার আগ্রহ মানুষের ইতিহাসে খুব প্রাচীন কাল থেকেই লক্ষ করা গেছে। ঐ আগ্রহ থেকেই জন্মলাভ করেছে নাটক। উপন্যাস বা ছোটোগল্প কাহিনি দেখা হয় ছাপার অক্ষরে এবং শোনা যেতে পারে অন্যের কণ্ঠ থেকে। কিন্তু সে কাহিনি মঞ্চে উপস্থিত করতেই হবে এমন কথা নেই। উপন্যাস ও ছোটোগল্প মূলত পড়ার জন্যই লিখিত হয়ে থাকে। নাটক এদিক দিয়ে একেবারে স্বতন্ত্র। নাটক লেখা হয় মূলত মঞ্চস্থ করার জন্যই । তাছাড়া যে নাটক মঞ্চস্থ করার মতো নয়, সেটাকে নাটক হিসেবে সাধারণত আখ্যায়িত করাই চলে না। তাই নাটকের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে তার মঞ্চসাফল্যের ওপর।

গল্প উপন্যাসের মতো নাটকেও নানাধরনের কাহিনি থাকে। এ সব কাহিনিতে সমসাময়িকতার একটা ছাপ অবশ্যই থাকে। কোনো সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে কাহিনি এতে না থাকলেও যে কাহিনীই থাকুক তাতে সমসাময়িক চিন্তার একটা ছাপ থাকবে। থাকবে, থাকতে হবেই। কারণ সমসাময়িকতার প্রভাব থেকে মানুষ, তিনি যত বড়ো প্রতিভার অধিকারী হোন না কেন মুক্ত থাকতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে একের সাথে অন্যের তফাত, ছোটোমাপের রচনার সাথে বড়োমাপের রচনার তফাত হয় একজন সমসাময়িকতার প্রভাব সত্ত্বেও সমসাময়িকতাকে উত্তীর্ণ হয়ে কতকখানি বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে কাহিনিকে উপস্থিত করতে পারেন তার ওপর। সে কারণেই শেক্সপিয়রের এত কদর এবং আদর। নাট্যকার হিসেবে শেক্সপিয়র যেমন নিজের কালকে অস্বীকার করে কোনো নাটক রচনা করেননি, তেমনি তিনি যেসব নাটক রচনা করে গেছেন সেগুলি হল কালজয়ী। এই কালজয়ী চরিত্রের জন্যই শেকস্পিয়র আজও শুধু ইংল্যান্ডে অথবা ইংরেজি ভাষা লোকেদেরই আদরণীয় নয়, শেকস্পিয়রের আদর সব দেশে। প্রাচীন গ্রিক নাট্যকারদের নাটক থেকে শুরু করে যুগেযুগে এ ধরনের নাটক লেখা হয়েছে। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, সমকালীনতার উর্ধ্বে উঠে কোনো নাটক যখন দীর্ঘদিন মানুষের কাছে আদরণীয় থাকে তখন সেটা সম্ভব হয় একদিকে তার বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে এবং অন্যদিকে তার শিল্পগুণের কারণে। শিল্পোত্তীর্ণ না হলে কোনো নাটকই যুগোত্তীর্ণ হতে পারে না, যেমন হতে পারে না কোনো শিল্পকর্মই।

প্রত্যেক নাটকের ওপর সমসাময়িকতার প্রভাব থাকলেও কোনো কোনো নাটক শুধু সমসাময়িকতার গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। সে কারণে অল্প কিছুদিন পরেই তার আবেদন আর থাকে না। সাধারণ কাহিনি অবলম্বন করে সাদামাটা নাটকের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে এ রকমটি ঘটে থাকে। এ ধরনের ঘটনায় সমসাময়িকতার প্রতিফলন হলেও তার জন্য কোনো বিশেষ ও জরুরি তাগিদ নাট্যকারদের মধ্যে থাকে না। গতানুগতিকতার কারণেই নাট্যকার এ ধরনের নাটক লিখে থাকেন। গতানুগতিকভাবেই এ ধরনের নাটক মঞ্চস্থ হয়ে থাকে।

কিন্তু আর এক ধরনের নাটক আছে যার ওপর সমসাময়িকতার প্রভাব থাকলেও সে নাটক লেখার জন্য সমাজে সৃষ্টি হয় জোরালো তাগিদ। এ তাগিদ আসে সমাজের অভ্যন্তরে সৃষ্ট পরিবর্তনের প্রয়োজন থেকে। যখন একটি সমাজে এমন পরিবর্তনের তাগিদ বিশেষভাবে অনুভূত হয় তখনই এই দ্বিতীয় ধরনের সমসাময়িক প্রভাবের অধীন নাটক রচিত হয়ে থাকে।

এই ধরনের নাটক রচনার তাগিদ যখন সমাজে সৃষ্টি হয় তখন এই ধরনের গল্প উপন্যাস কবিতা এবং অন্যান্য শিল্পসৃষ্টির তাগিদও লক্ষ করা যায়।

অর্থাৎ একটি সামাজিক তাগিদ চিন্তা ও শিল্পকর্মের সব ক্ষেত্রকেই প্রভাবিত করে। কিন্তু সমসাময়িক বিষয় নিয়ে রচনা শুধু পরিবর্তনের কারণেই হতে হবে অথবা একই রকম হতে হবে এমন কথা নেই। পরিবর্তনের তাগিদে যাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাদের মধ্যে এই তাগিদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হয় এবং এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে তারা সৃষ্টি করতে পারে প্রতিক্রিয়াশীল নাটক, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি।

যারা পরিবর্তনের পক্ষে তাদের মধ্যেও স্বার্থ ও চিন্তা-চেতনার পার্থক্য থাকে এবং পার্থক্যের কারণে তাদের সৃষ্টির মধ্যেও দেখা যায় পার্থক্য। কারণ যার পরিবর্তন চায় তারা যে পরিবর্তন বলতে একই রকম বোঝে অথবা একইভাবে সেটা চায় তা নয়। কেউ সে পরিবর্তন চায় সামান্য। কেউ অল্প-বিস্তর কেউ বা বড়ো ধরনের বা মৌলিক। কাজেই পরিবর্তনের তাগিদের প্রতিফলনও একই রকম ঘটে না।

বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনের সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে এ সব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা দরকার হল এ কারণেই যে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এখানে যে নাট্য আন্দোলনের সূচনা হয়েছে সে আন্দোলনের মধ্যে পরিবর্তনের একটা তাগিদ প্রথম থেকেই লক্ষ করা গেছে। এই তাগিদের ফলে বিদ্যমান সমাজের সমালোচনার দিকটাই প্রাথমিকভাবে প্রাধান্যে থেকেছে এবং এখানো আছে। কিন্তু সেটা থাকলেও এই সমালোচনার চরিত্র আবার সব ক্ষেত্রেই সব নাটকের বেলাতেই একই রকম নয়। একদিক দিয়ে বিভিন্ন নাট্যগ্রুপ বা দলের মধ্যে পার্থক্য আছে।

১৯৭২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি আরণ্যক নাট্যদল গঠিত হওয়ার পর থেকে এখনো তাদের নাট্যচর্চার মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মুনীর চৌধুরীর বিখ্যাত নাটক 'কবর' মঞ্চস্থ করার মধ্য দিয়েই আরণ্যকের যাত্রা শুরু। আরণ্যকের সর্বশেষ মঞ্চনাটক হল 'পাথর' যা এখন ঢাকায় মঞ্চস্থ হচ্ছে।

এই নাটকগুলির দিকে তাকালেই দেখা যাবে যে, এদের প্রতিবাদী চরিত্র খুব স্পষ্ট। সমকালীন সমাজের যে শোষণ-নির্যাতন আছে, সামাজিক অবিচার ও অন্যায় আছে শুধু তার স্থিরচিত্র এই নাটকগুলিতে থাকে না। এগুলির অধিকাংশই শোষণ-নির্যাতন, অবিচার ও অন্যায়ের সুনির্দিষ্ট চরিত্র উপস্থাপনের একটা প্রয়াসও সেই সঙ্গে দেখা যাবে। 'ওরা আছে বলেই' 'ইবলিশ' 'সাত পুরুষের ঋণ' থেকে 'পাথর' পর্যন্ত নাটকের বেলাতে এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

শুধু দেশের সমসাময়িক ঘটনাই নয়, আন্তর্জাতিক পরিবর্তন নিয়েও আরণ্যকের চিন্তাভাবনা নাটকের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। 'খেলা খেলা' হল এ ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই নাটকের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘটনাবলি এবং সে ক্ষেত্রে মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ইত্যাদি বিষয় বেশ ভালোভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। দুই থানার দারোগার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, আপস এবং একের কাছে অন্যের আত্ম সমর্পণের কাহিনির মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বন্দ্ব আপস ও আত্মসমর্পণের সঠিক বিষয়টি যেভাবে নাটকটিতে আনা হয়েছে তাতে নাটকটিতে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিল্পগুণ দুইয়েরই সমন্বয় সাধিত হয়েছে। এদিক দিয়ে নাটকটির সাফল্য উল্লেখযোগ্য।

আরণ্যকের সর্বশেষ প্রযোজনা 'পাথর'ও এ ধরনের প্রখর রাজনৈতিক চেতনাসৃষ্ট একটি নাটক। সম্প্রতি ভারতের অযোধ্যা শহরে বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও দাঙ্গা সৃষ্টি হয়েছে আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সেই বিষয়টিকে আনা হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার উল্টো পিঠের এক চিত্র উপস্থিত করে। সেই হিসেবে মসজিদের স্থানে কালীমন্দির,

রামের জন্মস্থানের পরিবর্তে কয়েক পুরুষ আগে সমাধিস্থ কোনো তথাকথিত ভুয়া সমাধি ইত্যাদিকে অবলম্বন করে এমন এক সাম্প্রদায়িক মতলববাজি ও হাঙ্গামার কাহিনি এই নাটকে বর্ণনা করা হয়েছে যে কাহিনী চরিত্রগতভাবে বাবরি মসজিদের ঘটনাবলিরই অনুরূপ এক কাহিনি।

উপরে যে নাটকগুলির উল্লেখ করা হল সেগুলিতে আমাদের দেশের ধর্মীয় সংস্কৃতি ও সামাজিক স্থিতিশীলতার নামে গ্রাম্য বর্বরতা এবং পুঁজিবাদী প্রগতিশীলতার নামে শ্রেণি শোষণ ও শ্রেণি আপসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চিন্তা-চেতনার এক প্রকার প্রতিফলন দেখা যায়। এই প্রতিফলন ঘটাতে গিয়ে নাটকগুলির শিল্পগুণ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ ও খর্ব হয়েছে এ কথা বলা চলে না। বিশেষ করে অন্য নাট্যদলের অন্য ধরনের নাটকের শিল্পোৎকর্ষতা শিল্পোত্তীর্ণতার সাথে তুলনা করলে এটা বলতেই হয় যে, সমসাময়িকতা ও প্রগতিশীলতার কারণেই নাটকগুলির শিল্পগুণ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে সেটা মনে করবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। এদিক দিয়ে একটি নাট্যদল হিসেবে আরণ্যকের সাফল্য উল্লেখযোগ্য।

শুধু মঞ্চে অধীন না রেখে নাটককে জনগণের সামনে খোলাখুলিভাবে উপস্থিত করার একটা চেষ্টা মুক্তনাটক আন্দোলন ও পথনাটকের মাধ্যমে আরণ্যক থেকে করা হয়েছে। নাটকের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে প্রগতিশীল চেতনার বিস্তার ঘটানোর ক্ষেত্রে মুক্তনাটক ও পথনাটকের বিশেষ ভূমিকা আছে। কারণ এভাবে নাটক হিসেবে শিল্প উৎকর্ষতা অর্জন অনেকাংশে অসুবিধাজনক হলেও এগুলির মাধ্যমে নাট্যশিল্পীরা সমাজের প্রতি গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারেন। সমাজের মধ্যে পরিবর্তনের যে তাগিদ বিদ্যমান রয়েছে সে তাগিদকে জোরদার করতে এবং পরিবর্তনের প্রগতিশীল দিকনির্দেশ করতে পারেন। এ কাজের সামাজিক মূল্য কম নয়।

এখানে অবশ্য বলা দরকার যে, এই সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে আরণ্যক মুক্তনাটক আন্দোলন যেভাবে শুরু করেছিল সেভাবে তার বিশেষ অগ্রগতি আর হচ্ছে না। কিছুদূর চলবার পর সে আন্দোলন আটকে গেছে। যদিও পথনাটকের চর্চা এখনো তাদের অব্যাহত আছে।

আরণ্যক নাট্যদলের বিশ বছর এখন পূর্ণ হল। এই বিশ বছরে আরণ্যকের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। কিন্তু একটি আন্দোলনের ক্ষেত্রে সাফল্য এমন একটা জিনিস যা কোনো বিশেষ পথ ভিন্ন সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। তাকে নতুন নতুনভাবে অর্জন করে যেতে হয়। সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এই নতুন অর্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই গুরুত্বের কারণেই আত্মতৃপ্তি বা আত্মসন্তুষ্টির কোনো সুযোগ কারো নেই, আরণ্যক ন্যাটদলের নেই। কাজেই আমরা আশা করি, প্রতিষ্ঠার বিশ বছরে উত্তীর্ণ হওয়ার পরও আরণ্যক সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন সাফল্য অর্জন করবে এবং তার মধ্য দিয়েই নিজেকে একটি জীবন্ত আন্দোলন ও জীবন্ত দল হিসেবে সচল রাখতে সক্ষম হবে।

থিয়েটার এবং ২৫ লালগোলাপ

আবদুল্লাহ আল-মামুন

ভাবতে বিস্ময় লাগে, থিয়েটার-এ আমি পাঁচ পাঁচে পঁচিশটি বছর কাটিয়ে দিলাম। আমাদের প্রাণের সম্পদ থিয়েটার এখন টগবগে যৌবন পাড়ি দিচ্ছে। আমি কিন্তু যৌবন পেরিয়ে এসেছি বহুকাল আগে। এখন প্রৌঢ়ত্বের মাঝামাঝি এসে পেছনের দিকে তাকালে দেখতে পাই, গত পঁচিশটি বছরে থিয়েটার আমাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে প্রায় অমরত্বের কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছে। থিয়েটার ছিল এবং দারুণভাবে আছে বলেই আমার অস্তিত্বে এখনও আকাঙ্ক্ষারা খেলা করে, প্রতিদিন নতুনভাবে আমি বেঁচে উঠি। গত পঁচিশ বছরে থিয়েটার আমাকে পৃথিবী চিনিয়েছে, মানুষ চিনিয়েছে, সুখদুঃখ, আশা-নিরাশা এবং চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে নিজেকে কর্মক্ষম রাখার কৌশল শিখিয়েছে।

থিয়েটার নাট্যগোষ্ঠীর শুরুটা কীভাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে আরেকটি প্রশ্ন, বাংলাদেশে গ্রুপ থিয়েটার চর্চার শুরুটা কীভাবে? দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর সবার জানা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং ফলশ্রুতিতে যে স্বাধীনতা, তারই একটি উৎকৃষ্ট ফসল বাংলাদেশের নাটক। স্বাধীনতার পরপরই সমমনা নাট্যপ্রেমীরা নাটকের জন্য ভালোবাসায় আপ্লুত হলেন। ভালোবাসার লালগোলাপ নিয়ে আমিও নাটকের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার সৌভাগ্য আমার লালগোলাপটির লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। আমি নাটক করার জায়গা পেয়েছি, পরিবেশ পেয়েছি, সবার উপরে পেয়েছি এই সুদীর্ঘ পঁচিশটি বছর আমার নাট্যজীবনকে টেনে আনার শক্তি। এই শক্তি আমাকে দিয়েছে থিয়েটার। থিয়েটার-এর কাছে আমার যে ঋণ তার তুলনা চলে পিতৃ কিংবা মাতৃঋণের সঙ্গে। পিতামাতার কাছে সন্তানের যে ঋণ, তা যেমন পরিশোধযোগ্য নয়, থিয়েটার-এর কাছে আমার দায়বদ্ধতার স্বরূপটিও তেমনি।

উনিশ শো বাহাত্তর সালেই আমরা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করি। আমরা কারা? অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, রামেন্দু মজুমদার, ফেরদৌসী মজুমদার, আহমদ জামান চৌধুরী, ইকবাল বাহার চৌধুরী, তবিবুল ইসলাম বাবু এবং আমি। আমাদের প্রথম নাটকটি হয় বাংলা একাডেমীতে, অমর একুশে উপলক্ষে মুনীর চৌধুরীর 'কবর'। পরবর্তীতে নিয়মিত নাট্যাভিনয়ে যেতে আমাদের বেশ কিছু সময় লাগে। উনিশ শো চুয়াত্তরে আমার নাটক 'সুবচন নির্বাসনে' দিয়ে থিয়েটার-এর নিয়মিত অভিনয়ের সূত্রপাত হয়। তারপর থেকে 'তাহারা তখন' পর্যন্ত থিয়েটার-এর এই যে পঁচিশ বছরেরও বেশি সময়ের পথ পরিক্রমা তা যেমনি ঘটনাবহুল তেমনি বিচিত্র সব অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। থিয়েটার নাট্যগোষ্ঠী যে কোনো গ্রুপ থিয়েটার সংগঠনের মতোই একটি পরিবার। এই পরিবারের সদস্যরা থিয়েটার-এর কাছ থেকে কে কতখানি পেয়েছেন সে হিসাবে না গিয়ে, আজ পঁচিশ বছরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমি একটা আত্মজিজ্ঞাসা করতে চাই। সেটা হল, থিয়েটার-কে আমরা কতখানি দিয়েছি? অর্থাৎ থিয়েটার আমাদের কাছ থেকে কতখানি পেয়েছে? উত্তরটা এভাবে দেয়া যায়। থিয়েটার 'কবর' থেকে শুরু করে 'তাহারা তখন' পর্যন্ত উনিশটি নাটক পেয়েছে। এইসব নাটক দর্শকদের উপহার দিয়েছে রকমারি বক্তব্য, বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রযোজনা আঙ্গিক এবং ঝাঁকে ঝাঁকে নবীন ও প্রবীণ কলাকুশলী। থিয়েটার শুরু থেকেই সমাজ ও গণমানুষের কাছে তার দায়বদ্ধতা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। এই দায়বদ্ধতা তার প্রতিটি প্রযোজনাকে শাণিত করেছে এবং দর্শক আলোড়িত করেছে। সমসাময়িক জীবন ও সামাজিক সমস্যাগুলো থিয়েটার-এর নাটকে বরাবর প্রাধান্য পেয়েছে। 'সুবচন নির্বাসনে' থেকে শুরু করে 'এখন দুঃসময়', 'চারদিকে যুদ্ধ', 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'সেনাপতি', 'এখনও ক্রীতদাস', 'তোমরাই', 'কোকিলারা', 'স্পর্ধা', 'দ্যাশের মানুষ', 'মেরাজ ফকিরের মা' এবং 'তাহারা তখন'

একনাগাড়ে বলে গেছে দেশের কথা, দেশের মানুষের সুখদুঃখের কথা এবং সর্বোপরি অন্যায় অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কথা। পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ. শেক্‌সপিয়ার, জাঁ আনুঁই থিয়েটার-কে অহরহই বাধিত করেছেন। থিয়েটার নাট্যগোষ্ঠী দেশের মানুষের ভালোবাসা পেয়ে ধন্য হয়েছে। আজকের দর্শক থিয়েটার-কে বিশ্বাস করেন, থিয়েটার-এর নাটকের প্রতি আস্থাশীল হন এবং আমাদের দুর্গম পথচলায় আমাদের সঙ্গী হন। থিয়েটার নাট্যগোষ্ঠীর অঙ্গন এখন তারুণ্যের পদচারণায় মুখর।

এই তো আমরা চেয়েছিলাম। পঁচিশ বছর আগে এই স্বপ্নই তো আমরা দেখেছিলাম, স্বপ্নটা হয়তো মাঝেমধ্যে ঝাপসা হয়ে গেছে, কখনো বা অপসৃতও হয়েছে, কিন্তু পুরোপুরি স্বপ্নভঙ্গ হয়নি কখনো। স্বপ্নটি বারেবারে ফিরে এসেছে, স্বপ্নটা এখনও চলছে।

একদিন হয়তো আমরা থাকব না, কিন্তু থিয়েটার থাকবে। আর থিয়েটারের হাতে থাকবে আমার লালগোলাপটি।

ঢাকা থিয়েটার : যাত্রাপথের আলোকসন্ধান

বিশ্ব রায়

সত্তরের দশকে নিজেদের দেশের নাম বাংলাদেশ বলতে দেশবাসী যখন অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, তখন পূর্ব পাকিস্তানে জন্মপ্রাপ্ত নাগরিক নাট্যসম্প্রদায় ভারতের নাটককার বাদল সরকারের 'বাকী ইতিহাস' মঞ্চস্থ করছে, কাজ করে চলেছে বহুবচন আরণ্যকের মতো নাট্যদল, ঠিক সেই মুহূর্তে ইংরেজির ২৯ জুলাই ১৯৭৩ আর একটি নাট্যদলের জন্ম হয়। দলটির নাম ঢাকা থিয়েটার। যার সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধ ফেরত, কেউ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠা নাট্যসংগঠন নাট্যচক্রে বহুদিন কাজ করেছেন। জন্মকালীন সময় থেকেই ঢাকা থিয়েটারের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ প্রমাণ করেছিল অচিরেই নাট্যদলটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চলেছে। দৃষ্টির অগোচরে থাকা আউটার স্টেডিয়ামেব দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঢাকা জেলা ক্রীড়া সমিতি মঞ্চে ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৩ থেকে টানা তেরো সপ্তাহ ধরে দুটি নাটক মঞ্চস্থ করে। প্রথমটি সেলিম আল দীন রচিত, নাসিরউদ্দীন ইউসুফ নির্দেশিত 'সংবাদ কার্টুন'। অন্যটি হাবিবুল হাসান রচিত নির্দেশিত 'সম্রাট ও প্রতিদ্বন্দ্বীগণ'। যদিও শুরু থেকে গ্রুপ থিয়েটারের মানসিকতার উপযুক্ত নিজেদের গড়ে তুলতে পারেনি ঢাকা থিয়েটার তবু দর্শক সমাগম আর পত্র-পত্রিকার সমালোচনা ছিল নাট্যদলটির এগিয়ে যাবার রসদ। সেই সাহসের উপর দাঁড়িয়েই ১৯৭৪-এর অক্টোবর মাসে ঢাকার ব্রিটিশ কাউন্সিল মঞ্চে আল মনসুর-এর রচনা ও নির্দেশনায় 'বিদায় মোনালিসা' মোট ছয়টি প্রদর্শন করে ঢাকা থিয়েটার। নিজেদের কর্মকাণ্ডের পরিচিতি সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দিতে হলে যে শুধু মাত্র ঢাকায় নাটক করলে চলবে না একথা অনুধাবন করেই চট্টগ্রামে স্থানীয় নাট্যদল অরিন্দমের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ৭৪-এই ৮, ৯ আর ১০ নভেম্বর সকাল-সন্ধ্যে মিলিয়ে মোট পাঁচটি অভিনয় করে আসে 'বিদায় মোনালিসা' এবং 'সংবাদ-কার্টুন'-এর।

কোলাজধর্মী নাটক 'সংবাদ কার্টুন'-এ রাজনৈতিক অস্থিরতা আর সুবিধাভোগীর ভোগবিলাসের মধ্যে ছাপোষা মানুষের দুর্দশার কথা যেমন ফুটে ওঠে ; ৭৬-এর ২৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ব্রিটিশ কাউন্সিল মঞ্চে 'জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন'-এ সেলিম আল দীনেরই রচনায়, নাসিরউদ্দীন ইউসুফের নির্দেশনায় তেমন দেখতে পাই শহর জুড়ে জন্ডিস ছড়িয়ে পড়ার পরও শহরবাসীর ঔদাসীন্যভাব। এমনকী, ১৯৭৬-এই নাসিরউদ্দীন ইউসুফের নির্দেশনায় সেলিম আল দীনের 'মুনতাসীর ফ্যান্টাসী' (২১ মার্চ ১৯৭৬) এবং হাবিবুল হাসানের 'কসাই' (৭ নভেম্বর ১৯৭৬)-তেও এমন সুপ্ত প্রতিবাদের ধারা লক্ষ করব। পাশাপাশি লক্ষ করলে আরো দেখব সেই সময় নাট্যদলটি বিশ্বনাট্যসম্পদের দ্বারস্থ হয়ে নিজেদের সমৃদ্ধ করছিল। তারই প্রতিফলন ঘটছিল প্রযোজনায় অ্যাবসার্ডধর্মী নাট্যপ্রকরণে।

তখনও পর্যন্ত কলোনিয়াল মানসিকতা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেনি ঢাকা থিয়েটার। তবে ১৯৭৯-তে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান গঠিত হয়ে উৎসবের আয়োজন করলে 'মুনতাসীর ফ্যান্টাসী'- অভিনীত হয় সেখানে। সেই সময় উৎসবের স্মারকগ্রন্থে ঢাকা থিয়েটারের বক্তব্য থেকে, স্পষ্টবোঝা যায়। দেশীয় ঐতিহ্য-সংগ্রাম মাটির স্পর্শে যে তারা ধন্য হয়েছে কিংবা 'মুনতাসীর' প্রযোজনাকে কেন্দ্র করে তাদের নামের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে যাওয়া 'প্রতিক্রিয়াশীল' বদনামটা মুছে দিতে তারা উদ্যোগী। তবে সে কাজ ১৯৭৭ এই শুরু হয়ে গেছে 'চরকাঁকড়ার ডকুমেন্টারি'-র মাধ্যমে। ১৩টির অধিক এর অভিনয় না হলেও ঢাকার বুকে ঢাকা-থিয়েটারই প্রথম পথনাট্যের সূত্রপাত ঘটায়। চরকাঁকড়াবাসী জব্বর আলীর ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেন হাবিবুল হাসান। তবে রাইসুল ইসলাম আসাদ ওই চরিত্রে কোনো অংশে কম লড়েননি মাটি বা পিচের মঞ্চে সূর্য লাইটের নীচে দাঁড়িয়ে। ১৯৭০-এর প্রলয়ের বীভৎসতার কথা জব্বারদের দুর্দশার কথা নাটককার সেলিম আল দীন নির্দেশক নাসিরউদ্দীন

ইউসুফ শহুরে বাবুদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। ফল হয় মারাত্মক। প্রশাসনের পুলিস রাজ টি এস সি-র নিকটবর্তী সড়ক দ্বীপে ঢাকা থিয়েটারের অভিনয় চলাকালীন সময় এগারো-বারোজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করে।

'চরকাঁকড়ার ডকুমেন্টারি'-র পরেই ঢাকা থিয়েটার আবার মঞ্চনাট্যে ফিরে এসেছিল 'কসাই'-এর মাধ্যমে এ কথা আগেই বলেছি। পরবর্তী নাটকটি ছিল 'শকুন্তলা'। নির্দেশক নাসিরউদ্দীন ইউসুফ সেলিম আল দীনের রচনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও প্রযোজনা হিসেবে গৌরব বোধ করেন না। সেলিম আল দীন সংস্কৃত নাট্যরীতির অনুসরণে রিক্রিয়েট করেন 'শকুন্তলা'। ফলে বক্তব্যও যায় পাল্টে। মানুষের শরীরের পচনশীলতা ও তার প্রতি ঘৃণাই ফুটে ওঠে নাটকের অন্তিমে। দুইখণ্ডে বিভক্ত এই নাটকের জাতীয় নাট্যোৎসবে অভিনীত রজনীতে (৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮) সর্বাধিক টিকিট বিক্রি থেকে জনগন কতটা নাটকটা গ্রহণ করেছিলেন তার স্পষ্ট চিত্রটা পাওয়া যায়।

সাজেদুল আউয়ালের কাব্যনাটক 'ফণীমনসা'-র মাধ্যমে ঢাকা থিয়েটার প্রথম মঞ্চ থেকে প্রেক্ষাগারে নেমে আসে। এক অসাধারণ সেট বানিয়েছিলেন সৈয়দ জামিল আহমেদ। শিমুল ইউসুফের সংগীত প্রতিভাও এতে স্বাক্ষর রেখেছে। তিতাসের নদীর কূলে জেলেদের জীবনকথা নিয়ে এই নাট্যকথা। মাত্র ২১টি প্রদর্শন হওয়া সত্ত্বেও মানুষ মনে রেখেছে প্রযোজনাটিকে নাসিরউদ্দীন ইউসুফের নির্দেশনার গুণে। হুমায়ুন ফরীদির ছিদাম চরিত্রে এখানেই প্রথম বড়োমাপের অভিনয়ের সূত্রপাত।

এরও আগে থেকে সেলিম আল দীন খুঁজছিলেন নিজস্ব শেকড়। সেদিনের প্রতিশ্রুতি তাই এই স্থানে উল্লেখ প্রয়োজন।—'আমরা বিশ্বাস করি পবজীব নাট্যচর্চা আধুনিকতার নামে জাতীয় আঙ্গিককে অবহেলা করছে, অবহেলা করছে দেশজ নাট্য বিষয়কে। আজ তাই নাট্যচর্চার দ্বিতীয় স্তরের বিকাশ ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য।' এই বাসনায় সেলিম আল দীন নাসিরউদ্দীন ইউসুফের নেতৃত্বে ঢাকা থিয়েটারের কর্মী বন্ধুরা ছুটে গেছেন গ্রামে গ্রামে। দৌলতপুর থানাধীন মানিকগঞ্জ জেলায় তালুকনগর অঞ্চলের মরহুম পীরখন্দকার আজাহার বয়াতির মাজারকে কেন্দ্র করে যে মেলার সূচনা তা থেকে সমৃদ্ধ হয়ে ১৯৭৮ থেকে ১৯৮০ তিন বছরের অভিজ্ঞতায় মেলাকেন্দ্রিক বর্ণনাত্মক নাট্যরীতিতে প্রথম নাটক রচনা করলেন সেলিম আল দীন 'কিত্তনখোলা'। দেওয়ানা মদিনা কাব্যের প্রস্তাবনা অবলম্বনে রচিত প্রস্তাবনা দিয়ে এ নাটকের শুরু। ক্রমে ক্রমে যাত্রা দলের মানুষের কথা, লাউয়া সম্প্রদায়ের দুঃখ দুর্দশা, ব্যবসায়ী কন্ট্রাক্টরদের লোভ সব কিছুই ধরা পড়ে এ নাট্যে। এ নাটক যেমন একটি নতুন রীতির পথ দেখায় বাংলা থিয়েটারকে, এই সময় থেকে ঢাকা থিয়েটার ও গ্রাম থিয়েটার আন্দোলনের সূত্রপাত করে গ্রামমুখী করে, তোলে নাট্যদলেদের। ১৯৮১ থেকে ঢাকা থিয়েটার তাদের প্রতীক চিহ্ন বদলে ফেলে, কয়েক বছরের মধ্যে সহযোগী নাট্যসংগঠনেরাও এই প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করতে শুরু করে। স্বাধীন বাংলাদেশে সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাওয়া নাটক প্রত্যক্ষ করেছিলেন ঢাকা থিয়েটারের নির্দেশক নাসিরউদ্দীন ইউসুফের মতো অনেক নাট্যপ্রেমী মানুষজন। ১৯৮৫তে কলকাতায় নান্দীকার আয়োজনে দ্বিতীয় জাতীয় নাট্যোৎসবে আমন্ত্রণ এলে গৌরবান্বিত হয়েছিল নাট্যদলটি। হাজার বছরের নাট্য ঐতিহ্যের অনুসন্ধানী ফসল 'কিত্তনখোলা' এই উপলক্ষে উপহার পশ্চিমবঙ্গ বাসীকে। এরপর আরো কয়েকবার কলকাতায় এসেছে নাট্যদলটি। ১৯৮৭তে 'কেরামত মঙ্গল' নিয়ে ; যাকে 'কিত্তনখোলা' পরীক্ষারই সম্প্রসারিত রূপ মনে করেন গবেষকেরা। ১৯৯৪-এ পদ্মা-গঙ্গা উৎসবে এবং ১৯৯৯-এ নান্দীকারের জাতীয় নাট্যোৎসবে 'হাত হদাই'-এর প্রদর্শন এবং ১৯৯৪-এই 'যৈবতী কন্যার মন'-এর প্রদর্শনের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ্য।

২০ জানুয়ারি ১৯৮২ ঢাকা থিয়েটার দোনা গাজীর 'সয়ফুলমূলক-বদিউজ্জামান' থেকে সেলিম আল দীন-কৃত নবতম নাট্যরূপটি ১৫-১৬ জনের মহিলা ব্যতীত একটি দল নিয়ে তালুকনগরে গিয়ে

অভিনয় করে আসে। নির্দেশক নাসিরউদ্দীন ইউসুফই এর পোশাক পরিকল্পক। মঞ্চে হ্যাজাক জ্বালিয়ে রফিক মাহমুদ এর আলোকসজ্জার পরিকল্পনা করেছিলেন।

১৯৮৪-৮৫ তে সেলিম আল দীন যখন 'কেরামত মঙ্গল' রচনায় মনোনিবেশ করেছেন তারই মধ্যবর্তী সময় 'বায়ান্নের শকুন' নাটকটি প্রযোজনা করে ঢাকা থিয়েটার। নামশুনে অনুমান করতে কষ্ট হয় না ১৯৫২-র ভাষা শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যেই এই প্রযোজনা।

১৯৮৫-র ত্রয়োদশতম প্রযোজনায় উপখণ্ড সহ মোট এগারোটি খণ্ডে বিভক্ত এবং বৃত্ত পরিকল্পনায় রচিত এপিকধর্মী 'কেরামত মঙ্গল' নাট্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সমাজে অচ্ছুৎ বলে উৎখাত, জমিদারের অত্যাচার, অর্ধনারীশ্বরদের জীবন সংগ্রাম, উপজাতি হাজং দের বিদ্রোহ, মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তীকালীন দেশের অবস্থা এমন নানা সংবাদ উঠে আসে।

ফরাজি আন্দোলনকে নেপথ্যে রেখে 'বাসন' নামে ১৯৮২- তে একটি নাটক লেখেন সেলিম আল দীন। ঢাকা থিয়েটারের ১৪ তম প্রযোজনা হিসাবে তা তালিকাভুক্ত। এ ছাড়াও গ্রাম থিয়েটারের অনেক দল তা অভিনয় করে। সেদিক থেকে বিচার করলে 'বাসন' সেলিম আল দীনের সবচেয়ে বেশি অভিনীত নাটক।

২৩ অক্টোবর ১৮৮৯ চূড়ান্ত মহড়ার মধ্যে দিয়ে ঢাকা থিয়েটারের সপ্তদশতম প্রযোজনা 'হাত হদাই' এর সূচনা হয়। শিল্পী কামরুল হাসান-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত ছিল এই প্রযোজনা। 'হাত হদাই'-এর জনপ্রিয়তা বর্তমানে এতটাই যে মাঝে 'সংকেত' আর 'গম্ভীরা পালা' নামে দুটি প্রযোজনা ঢাকা থিয়েটার করেছে তা মানুষ ভুলতেই বসেছেন। পদ্মাগঙ্গা উৎসব শুধু নয় এর আগে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর যৌথ আয়োজনে জাতীয় নাট্যোৎসবে (১৯৯১) এই প্রযোজনা হয়। প্রযোজিত হয় সেলিম আল দীনের পঞ্চাশতম জন্মজয়ন্তী (১৯৯৯) এবং নান্দীকারের জাতীয় নাট্যমেলায়। এর থেকে স্পষ্ট ধারণা করা যায় ঢাকা থিয়েটারও প্রযোজনাটিকে কতটা গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

সমুদ্র উপকূলবর্তী মানুষজনদের নিয়ে 'হাত হদাই' বা 'সাত সওদা'-র কাহিনি। ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধ আনার ভাণ্ডারীর জীবন এবং তাকে ঘিরে অন্যান্য চরিত্রের সম্পর্ক ও অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘিরেই এই সাত দরিয়ার কিস্‌সা। ষোলটি পর্বের এই নাটকে রয়েছে প্রত্যেকের জীবনের আলাদা আলাদা ঘটনা। চতুর্দশ পর্বে গিয়ে মৃত্যুঞ্জয় নাবিকদের সামগ্রিকতার সন্ধান পাওয়া যায়।

৩০ নভেম্বর ১৯৮৯-এ ঢাকার মহিলা সমিতি মঞ্চে গ্যেটে ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় ঢাকা থিয়েটারের ১৮তম প্রযোজনা 'ধূর্ত উই' মঞ্চস্থ হয়। শেকড়ের সন্ধানী এই নাট্যদল কেন এগিয়ে চলার পথে একটি বিদেশি নাটক মঞ্চায়ন করল প্রযোজনা সম্পর্কিত প্রচার পুস্তিকা বিশ্বনাট্যধারা : ১ থেকে তা জানা যায়। সুদূর জার্মানি থেকে আগত ক্লস কুসেনব্যর্গ এবং গুন্টার হেলউইগ ছিলেন যথাক্রমে এর নির্দেশক ও শিল্প নির্দেশক। যার ফলে প্রযোজনাটি এক অন্যমাত্রা পেয়ে যায়। দর্শকের আগ্রহ বাড়ে প্রযোজনাটিকে ঘিরে। আর নাট্যটি প্রত্যক্ষ করতে করতে তাঁরা অতি সহজেই আবিষ্কার করেন ফ্যাসিজিমের বাজার দখল কৌশল ও স্বৈরাচারর উত্থানের গতিপ্রকৃতি।

'কিত্তনখোলা' থেকে 'হাত হদাই'-এ ছিল বর্ণনাত্মক নাট্যরীতি, 'চাকা'-তে প্রথম কথানাট্যের সূত্রপাত। রচনার দিক দিয়ে সেলিম আল দীন যেমন নতুন রূপ আনলেন, ঢাকা থিয়েটারের প্রযোজনায়ও নির্দেশকের ভূমিকায় নতুন মুখ দেখা গেল। এতকাল মঞ্চ বা আলোক পরিকল্পনায় সবাই সৈয়দ জামিল আহমেদকে দেখেছিলেন, ১৯৯১-এর উনবিংশতম প্রযোজনায় তিনি নির্দেশক। ১৯৮৭-৮৮-র গণ অভ্যুত্থানে অসংখ্য তরতাজা নাম-ঠিকানা বিহীন যুবকের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ায় এই নাটকের জন্ম ;নাটককার পূর্বকথায় তা জানিয়েছেন। সেই কারণে নাটকটিকে স্বৈরাচার বিরোধী গণআন্দোলনের

মহান শহিদ নূর হোসেন সহ শত শহিদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ তাৎপর্য বহন করে।

২৪ নভেম্বর ১৯৯২ কলকাতায় 'ভূত' নাটক নিয়ে পদ্মা-গঙ্গা নাট্যোৎসবে ঢাকা থিয়েটারের প্রথম আগমন। একটি রাজস্থানী লোককথা থেকে আত্মবিশ্লেষক নাটক রচনা করেছিলেন তারিক আনাম খান। হুমায়ুন ফরীদি ছিলেন নির্দেশক। সম্ভবত সেটিই তাঁর প্রথম নির্দেশনা।

'এবার শেখার পালা'-র পরবর্তী প্রযোজনাটি ছিল 'একটি মারমা রূপকথা'। মারমা সম্প্রদায়ের এই লোককথাকে মঞ্চে আনার উদ্দেশ্য নৃতাত্ত্বিক প্রমাণের জন্য নয় নৃতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ নিয়ে কৌতূহল জন্মানোর মাধ্যমে ওই গোষ্ঠীর সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলা ভাষাভাষীদের পরিচয় ঘটানো। এই নৃগোষ্ঠী রূপকথা আশ্রিত প্রযোজনাটি উড়নির রং আর কঞ্চির রেখায় গবেষনা, রচনা, সংগীত, পোশাক, কোরিগ্রাফ এবং নির্দেশনার মাধ্যমে দর্শকের সামনে হাজির করেছিলেন সেলিম আল দীন এবং তাঁর উদ্যোগকে সফল করতে এগিয়ে এসেছিলেন ঢাকা থিয়েটারের কর্মীরা।

১৯৯৩-এ ঢাকা থিয়েটার দুটি নতুন নাটকের প্রদর্শন করে। প্রথমটি 'একাত্তরের পালা'। নাসিরউদ্দীন ইউসুফ এ নাটকের শুধু নির্দেশক নন, নাটককারও বটে। নাসিরউদ্দীন ইউসুফ তাঁর সঙ্গী-বন্ধুদের স্মৃতির উদ্দেশ্যেই এই প্রযোজনা নামিয়েছিলেন। সেই সময় 'একাত্তরের যিশু' নামে একটি কাহিনিচিত্র ও বানিয়েছিলেন তিনি। সেলিম আল দীন এই সময় শেষ করেন 'যৈবতী কন্যার মন', নাসিরউদ্দীন ইউসুফ ও নাটকটি ফেলে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। ১০ নভেম্বর ১৯৯৩, ঢাকার মহিলা সমিতি মঞ্চে প্রথম অভিনয়ের মাধ্যমে এ নাট্যের যাত্রা শুরু হয়। দুই খণ্ডের এই নাটকে প্রথম খণ্ডে মধ্যযুগের এক নারীব এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আধুনিককালের এক নারীর জীবনকথা নিয়ে অবতারণা। শিল্প ও জীবনকে এক বিন্দুতে মেলাতে চাওয়া যে অপ্রত্যাশিত আশা তা এই নাটকে স্পষ্টভাবে আমাদের চোখে তুলে ধরেছেন শিল্পনির্মাতারা।

মাঝে অনেকটা সময়। ১৯৯৭-এ নতুন প্রযোজনা নামায় ঢাকা থিয়েটার। আর একবার শিল্পস্রষ্টারা বিশ্বনাট্যের দ্বারস্থ হলেন। এবার তাঁদের প্রযোজনায় এলেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। শেক্সপিয়ারের 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস'-এর পোর্শিয়া, অ্যান্টোনিও, শাইলক সব ঠিকঠাক রেখেই বাংলা ভাষান্তর করলেন সুবর্ণা মুস্তাফা। সুবর্ণা মুস্তাফা শুধুমাত্র একজন অভিনেত্রী নন রচনাকার ও বটে এ নাটক তারই সাক্ষ্য বহন করে। নির্দেশক নাসিরউদ্দীন ইউসুফ তাই প্রমাণ করলেন।

৩০ জুলাই ১৯৯৮, ঢাকা থিয়েটারের প্রযোজনায় আবার সেলিম আল দীন ফিরে এলেন। 'বনপাংশুল' প্রযোজনার মাধ্যমে। ঢাকা থিয়েটারের পঁচিশ বছরে নব্যকালের এই পাঁচালি উপহার পেলেন দর্শকেরা। মান্দাই কোচ সম্প্রদায়ভুক্ত নরনারীদের এ এক রক্তাক্ত জীবন পদের পাঁচালি। উল্টোদিকে সমগ্র বাঙালি জাতির কদর্যরূপটি এতে প্রকট। অবশ্য পাশাপাশি কিয়দংশের চেতনা জাগ্রতের দিকপাত করেছেন রচনাকার। নাসিরউদ্দীন ইউসুফ নির্দেশিত মঞ্চরূপটি দেখে একজন গবেষক নিশ্চয়ই আবিষ্কার করতে পারবেন নাটক এবং নাট্যের পার্থক্যটিকে।

বাংলাদেশের নাট্যপ্রেমী মানুষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন জানান নির্দেশক প্রবীর গুহ তাঁর প্রযোজনা 'মৃত্যু সংবাদ'-এর মাধ্যমে। প্রবীর গুহ নামের সঙ্গে সঙ্গেই পথনাট্যের কথা মনে আসবে। বাস্তবিকই তাই, ঢাকা থিয়েটারের ২৭তম প্রযোজনাটি ছিল পথনাটক। ১মে ২০০০, শহিদ মিনারের পাদদেশে হল প্রথম প্রদর্শন। মিহির সেনের এক পৃষ্ঠার গল্প মরনমান্না-র থেকে এসেন্সটা নিয়ে এই পথনাট্যরূপ গড়ে তোলা। 'একটি মানুষের মৃত্যু তাতে প্রতিক্রিয়া'—ইম্প্রোভাইজেশনে, শারীরিক কুশলতায়, গানে গড়ে তোলা হয়েছিল। অবশ্য বাংলাদেশের পটভূমিতে এই পলিটিকাল স্যাট্যায়ারের অবতারণা।

২০০০ সালেই ঢাকা থিয়েটার নামায় আরো দুখানি নাটক। ১ অক্টোবর ২০০০ 'প্রাচ্য'। ১৫ ডিসেম্বর ২০০০ 'হরগজ'। সেলিম আল দীনের জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৮-এর রচনা 'প্রাচ্য' নাসিরউদ্দীন

ইউসুফের নির্দেশনায় প্রযোজনা করে ঢাকা থিয়েটার। মনসামঙ্গলের কাহিনির বিপরীত বিন্দুতে দাঁড়িয়ে পাঁচালির আশ্রয়ের জীবনের অনিবার্য খননের সন্ধান শিল্পস্রষ্টাদের। ১৯৮৯ সালে গ্রীষ্মকালে মানিকগঞ্জ জেলার হরগজে (একটি জায়গার নাম) প্রলয়দৃশ্য টর্নেডো হয়। তারই চিত্ররূপ ধরা পড়েছে 'হরগজ' নাটকে। এর আগে সেলিম আল দীনের 'চাকা' নাটকটি অ্যানটিওক থিয়েটার, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি (ইউ. এস. এ, ১৯৯১)-তে 'দি হুইল' নামে অভিনয় করে। এবার ঢাকা থিয়েটারে এলেন সুইডিশ নির্দেশক ইয়ান বানস্ট্রেন্ড ইয়াম 'হরগজ'-এর নির্দেশনা দিতে।

এভাবেই ঢাকা থিয়েটার বিশ্ব থিয়েটারের সঙ্গে যোগসূত্র বাড়িয়ে চলেছে। নাট্যদলের জন্মলাভের শুরু থেকে নাসিরউদ্দীন ইউসুফ এবং সেলিম আল দীনকে মধ্যে রেখে একদল নাট্যকর্মীর যে কর্মকাণ্ড চলেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানামুখের সারির বদল ঘটলেও, নতুন প্রজন্মদের নিয়ে আজও হাল ধরে আছেন দুই শিল্পস্রষ্টা। আঠাশ বছর অতিক্রান্ত একটি নাট্যদলের ইতিহাস জানার পাশাপাশি তাঁদের অঙ্গীকারও তাই বুঝে নিতে কোনো কষ্ট হয় না। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কেন্দ্রিক বাবুর ভাষার বিপরীতে পদ্মা-মেঘনা অববাহিত অঞ্চলের দেশীয় মানুষের লোকজ সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরতে উদ্বুদ্ধ ঢাকা থিয়েটার সেলিম আল দীন-কৃত আঞ্চলিক ভাষার মর্মমূল থেকে শব্দ চয়ন করা, রূপ রস গভীরতায় সমৃদ্ধ অর্থাৎ বাংলার নিজস্বতার বৈশিষ্ট্যে ঋদ্ধ (কথকতা, পাঁচালির ঢংয়ে) নাটক নিয়ে যাত্রাপথে আগুয়ান। বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপট এভাবেই তাঁরা উন্মোচিত হয় সম্প্রসারিত হয়। যার ফলে দর্শকেরা প্রতীক্ষায় থাকেন নতুন প্রযোজনাটি দেখার জন্যে। প্রত্যাশা আরো বেড়ে যায় নাট্যদলটিকে ঘিরে।


নাট্যচর্চা



ক



খ

চট্টগ্রামের গ্রুপ থিয়েটার চর্চা

শিশির দত্ত

স্বাধীনতার পর চট্টগ্রামে যে গ্রুপ থিয়েটার চর্চা শুরু হয়, তখন এর কোনো বিকল্প ছিল না। আজও নেই। কেন সম্ভব হয়েছিল তা, কিংবা কেন শুরু হয়েছিল এই গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন—তা নুতন করে ভাববার প্রয়োজন আছে কি? হয়তো আছে—কিংবা নেই।

প্রথমেই ভাবতে হয়েছিল কোথায় হবে এ নাটক। মঞ্চ যদিও ছিল একটি, তবু বিকল্প মঞ্চ খুঁজে নিতে হয়েছিল কেন? কারা হবেন এই নবনাটকের দর্শক? বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিনামূল্যের কার্ড নয়, টিকেট কীভাবে বিক্রি হবে? কাউন্টার থেকে নাটকের দর্শক টিকেট কিনবে কি-না, এমন হাজারো প্রশ্ন এসে ভিড় করেছিল সেদিন। আজ আর এ সব নিয়ে ততটা ভাবতে হয় না। সে জায়গা থেকে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি।

প্রশ্নটা তবে অন্যত্র। স্বাধীনতা-পূর্ব চট্টগ্রামের নাট্যচর্চার যে ঐতিহ্য তা থেকে কী পেয়েছি আমরা গ্রুপ থিয়েটারের শিল্পীরা? অভিনেতারা কীভাবে সংলাপ প্রক্ষেপণ করবে, কোন পাণ্ডুলিপিটি মঞ্চায়নের যোগ্য, আলোয় কখন কেন ডিমারের ব্যবহার হবে, কিংবা স্পট কেন মঞ্চে প্রয়োজন ইত্যাদি অনেক কিছু সম্পর্কেই আমাদের ধারণা ছিল অস্পষ্ট।

গ্রুপ থিয়েটারের নাটক। এখানে দর্শক, মঞ্চ, নাট্যকার, নির্দেশক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, আবহ-সঙ্গীত, আলো— সবকিছুই আলাদা, আবার আলাদা হয়েও এরা এক হয়ে যায় কীভাবে? এ সব নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাদের যাত্রা হল শুরু। অদ্ভুত রোমাঞ্চকর সেই অনুভূতি।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আমাদেরকে নিজস্ব যে বিষয়গুলো জানতে ও বলতে শিখিয়েছে তার মধ্যে নাটক বোধ করি অন্যতম। এর আগেও নাটক হত, যুক্ত ছিল অনেকেই সেই নাটকের সাথে, তবে তা গ্রুপ থিয়েটার চর্চার অনুরূপ নয়। বর্তমান নাট্যচর্চার শুরুতে অতীত নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কেউ ছিলেন না বললেই চলে। কেন এমন হল? সমাজ-রাজনীতি-দেশপ্রেম ইত্যাকার বিষয়গুলোর সাথে যুক্ত থেকেও তাঁরা কেন পারেননি? পারেননি, কারণ তাঁরা জানতেন না যে, সামাজিক নৈতিকতার মতো থিয়েটারেরও একটি নৈতিকতা আছে।

অতীতের নাট্যচর্চার মূল্যায়ন হবে। কিন্তু প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো— আজকের যে গ্রুপ থিয়েটার, তার উৎসাহ, শৃঙ্খলা, নৈতিকতা, পেশাদারি মনোভাব ইত্যাদি শিক্ষা অতীত নাট্যচর্চা থেকে প্রাপ্ত নয়। তাই চট্টগ্রামের সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদির যে গৌরবান্বিত অতীত— নাটক সেখানে অনেকটাই অস্বচ্ছ।

পঞ্চাশের দশকে চট্টগ্রামে প্রান্তিক নবনাট্যসংঘ-এর প্রতিষ্ঠা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যদিও পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে এই সাফল্যের কোনো স্পর্শ পায়নি নাটক। পুরো পাকিস্তানি শাসনামলেই মানুষকে উজ্জীবিত করার মহৎ কাজটি করতে পারেনি সে সময়কার নাটক। স্বাধীনতা - উত্তরকালের নাটক অনেক বেশি সমাজ-সচেতনতার ইঙ্গিত বহন করে। কারো কারো মতে, যতটা শিল্পমাত্রা ছুঁয়ে যেতে পারত— এ নাটক ততটা পারেনি। অনেকেই বলেন, বাংলাদেশের নাটক শিল্প-সংস্কৃতিতে অন্য শাখার তুলনায় অনেক বেশি এগিয়েছে। আমরাও বলতে চাই, কুড়ি বছর আগে যে নবনাট্যের সূচনা হয়েছিল সত্যিই তার অগ্রগতি আশাতীত। চট্টগ্রামের নাট্যকর্মীরাও তাদের সমস্ত রকম সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে নবনাট্যের এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের সাফল্যের যে ইতিবাচক দিক, তা হল—নাটককে আমরা কেবল মিলনায়তনের মধ্যেই

আবদ্ধ রাখিনি, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মানবিক ভূমিকাপালন করার পাশাপাশি পথনাটক, মুক্তনাটক ইত্যাদি নানা আঙ্গিকে নাটককে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছি।

১৯৭৩ সালে চট্টগ্রামে থিয়েটার ৭৩ প্রথম গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন শুরু করে। ১৯৭৪ সালে এসে এতে যোগ দেয় অরিন্দম, তির্যক, গণায়ন, লোকালয় ও আরো অনেক নাট্যগোষ্ঠী। বলা হয়, গোড়ার দিকে গণায়ন ও বর্তমান অঙ্গন থিয়েটারের একদল নাট্যকর্মী পথনাটকও শুরু করেছিল চট্টগ্রামে। এভাবেই এখানে সৃষ্টি হতে থাকে অতীত নাট্যচর্চা থেকে ভিন্ন এক নতুন নাট্যধারা।

ঢাকায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর উদ্যোগে প্রথম জাতীয় নাট্যোৎসব আয়োজিত হয়েছিল ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে। এ উৎসবে চট্টগ্রামের শীর্ষস্থানীয় তিনটি নাট্যদল—থিয়েটার'৭৩, অরিন্দম ও গণায়ন তাদের নাটকের সফল উপস্থাপনায় প্রমাণ করেছে ঢাকার পাশাপাশি চট্টগ্রামেও নাট্যচর্চা কত সজীব ও গতিশীল। দেশের বাইরেও (কলকাতায় ১৯৮৬ সালে) অরিন্দম নাট্যসম্প্রদায় নাটক মঞ্চস্থ করার করার সুযোগ পেয়ে চট্টগ্রামে নাট্যচর্চার সাফল্যের আর এক ধাপ সৃষ্টি করতে পেরেছে। এ সময় আমাদের নাট্যকর্মীরা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নাট্য-নির্দেশক হাবিব তানবীর, অশোক মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী প্রমুখের সঙ্গে কাজ করা এবং তাঁদের নাট্য-প্রযোজনার সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ পেয়েছে।

তবু কথা থেকে যায়—সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের নাট্যান্দোলনের যে সাফল্য তার মধ্যে চট্টগ্রামের অবস্থান কোথায়? চট্টগ্রামে এখন অনেক নাট্যদল, সারা বছর ধরে চলে কোনো না কোনো উৎসব, নিয়মিত-অনিয়মিত নাট্যদলগুলো উপস্থিত হয় শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তন কিংবা মুসলিম হলে। আমার জানা মতে, এ যাবত প্রায় দুইশত নাটক মঞ্চস্থ করেছে এখানকার গ্রুপ থিয়েটার। এদের সম্মিলিত প্রদর্শনী সংখ্যা প্রায় হাজার ছাড়িয়ে যাবে। তবু চট্টগ্রামে আশানুরূপ হারে নাটকের দর্শক-পৃষ্ঠপোষক তৈরি হয়নি কেন?

চট্টগ্রামে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন প্রাথমিক পর্যায়ে যাঁদের হাতে বলিষ্ঠতা পেয়েছিল তাঁদের মধ্যে অনেকেই শেষ পর্যন্ত আর নিজেদেরকে এখানে ধরে রাখতে পারেননি। অধ্যাপক জিয়া হায়দার শুরুর অল্প কিছুকাল পরেই প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন, অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ ও হাবিব আহসান (কোহিনুর) স্থায়ীভাবে ঢাকায় বসবাসের জন্য চলে যান, তরুণ মেধাবী নাট্যাভিনেতা ও নির্দেশক সদরুল পাশা (সদ্য প্রয়াত) পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটে বৃত্তি নিয়ে চলচ্চিত্র বিষয়ে উচ্চতর পর্যায়ে পড়াশুনা করার জন্য ভারত চলে যান এবং পরবর্তীকালে ফিরে এসে ঢাকায় স্থায়ী হন, শক্তিমান অভিনেতা খসরুল কবীর ও অভিনেত্রী রাহনুমা আফতাব স্থায়ীভাবে থাকার জন্য বিদেশে পাড়ি জমান, আবার অনেকে চট্টগ্রামে থেকেও শেষ পর্যন্ত এ জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। এরূপ নানাবিধ কারণে চট্টগ্রামে নাট্য আন্দোলন গড়ে ওঠার মুহূর্তেই কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও থিয়েটার অঙ্গনে আগত তরুণ নাট্যকর্মীরা অমানুষিক পরিশ্রমের বিনিময়ে নাট্যচর্চাকে সমুন্নত রাখতে চেষ্টা করে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় নাট্যোৎসব সমূহে চট্টগ্রামের দলগুলির অব্যাহত অংশগ্রহণ ও সাফল্য প্রদর্শন, ১৯৭৭ সালে চট্টগ্রামে প্রথম অরিন্দমের উদ্যোগে গ্রুপ থিয়েটার উৎসবের আয়োজন, ১৯৭৮ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় নাট্যোৎসবে থিয়েটার'৭৩-এর জিয়া হায়দার রচিত ও জিয়াউল হাসান নির্দেশিত 'এলেবেলে' নাটকের কৃতিত্বপূর্ণ প্রযোজনার জন্য বিশেষ পুরস্কার লাভ এবং একই নাটকে অভিনয়ের জন্য রাহনুমা আফতাবের উৎসবের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর (যৌথভাবে থিয়েটার-এর ফেরদৌসী মজুমদারের সঙ্গে) সম্মানলাভ, তির্যক নাট্যগোষ্ঠী প্রকাশিত রবিউল আলম সম্পাদিত 'তির্যক' নাট্যপত্রিকার আত্মপ্রকাশ, চট্টগ্রাম গ্রুপ থিয়েটার সমন্বয় পরিষদ গঠন ইত্যাদি একের পর এক সংঘটিত উল্লেখযোগ্য কার্যসমূহ এবং বিশিষ্ট

সাহিত্যিক হাসনাত আবদুল হাই-এর উদ্যোগে নাটকের জন্য শিল্প সাহিত্য পরিষদ মঞ্চ (বর্তমান শিল্পকলা একাডেমী মঞ্চ) নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ চট্টগ্রামে নাট্যকর্মীদের মধ্যে এক প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এ সময় চট্টগ্রামের নাটক যথেষ্ট পরিমাণ দর্শক আনুকূল্য পেয়েছে। অনেক নাট্যদল নিয়মিতভাবে একের পর এক নাট্যপ্রযোজনায় সাফল্য অর্জন করতেও সমর্থ হয়েছে।

আশির দশকের শুরু থেকে গ্রুপ থিয়েটার চর্চায় চট্টগ্রামে এক ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বস্তুত এ পরিবর্তন বাংলাদেশের সর্বত্রই ঘটে। এ সময় মঞ্চাভিনেতাদের অনেকেই মঞ্চের পাশাপাশি টেলিভিশনের সঙ্গে নিজেদের জড়াতে থাকেন এবং ব্যাপক প্রচার ও পরিচিতি লভে করে দ্রুত টিভি-স্টার বনে যান। টিভির দৌরাত্ম্যে ঢাকার বাইরে নাট্যচর্চা ক্রমশ দর্শক আনুকূল্য হারাতে থাকে। মঞ্চনাটককে ক্রমান্বয়ে এক অপ্রিয় অযাচিত প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয়। অপরদিকে শিল্পকলা একাডেমী কর্তৃক প্রতি বছর অনুষ্ঠিত জাতীয় নাট্যোৎসবের আয়োজনও হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে, ঢাকার বাইরের নাট্যদলগুলোর কাজের মূল্যায়ন আর হয় না। জাতীয় দৈনিকগুলো সাধারণত ঢাকা কেন্দ্রিক নাট্যচর্চাকে ফলাও করতে থাকে। সাপ্তাহিক ও সাময়িকীগুলো দায়-দায়িত্বের তোয়াক্কা না করে ব্যবসায়িক সাফল্যের প্রয়োজনে তারকানির্ভর নাট্যচর্চাকেই অধিক পৃষ্ঠপোষকতা করে।

চট্টগ্রাম-সহ সারা বাংলাদেশ জুড়ে সত্তর দশকের শুরুর দিকে নাট্যজগতে যে উদ্যম দেখা দিয়েছিল, দশ বছরের মাথায় তা অনেকটাই বিবর্ণ হয়ে আসে। প্রচুর দল গঠিত হল বটে, কিন্তু নাটক কিংবা নাট্যদলের পরিচিতির চেয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জনপ্রিয়তার ওঠা-নামার ওপর দলের ভাগ্য নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। ব্যক্তিগত সাফল্য থেকে শুরু হল ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব। ভাঙন হতে লাগল নানা দলে। পাশাপাশি যদিও নতুন নতুন দলের আত্মপ্রকাশ ঘটল, তথাপি নাট্যচর্চার গতি আগের মতো জোর পাচ্ছিল না কিছুতেই।

এ অবস্থায় চট্টগ্রামের বিভিন্ন অনিয়মিত সদস্যদের তালিকা ক্রমশ বাড়তে থাকে। অপেক্ষাকৃত তরুণ কর্মীদের অনেক বেশি দেশের চলমান বৈরী রাজনৈতিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়—শুরু হয় প্রতিবাদী নাট্যকর্ম। ফলশ্রুতিতে পথনাটকের দলের সংখ্যা বাড়তে থাকে, সহজ হয়ে আসে নাটক ও নাট্যচর্চা। খুব স্বল্প প্রচেষ্টায় মঞ্চে ও খোলা জায়গায় অধিক হারে রাজনীতি-নির্ভর নাট্যক্রিয়া শুরু হয়, যার কমবেশি ধারাবাহিকতা এখনও বহমান।

সবকিছুর পরও এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, চট্টগ্রামের গ্রুপ-নাট্যচর্চার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এখনও রয়েছে অনেক নিষ্ঠাবান নাট্যকর্মী, যারা সার্বক্ষণিক নাট্যকর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তারপরও বলা প্রয়োজন, চট্টগ্রামের নাটক ও নাট্যকর্মীদের অনেক বেশি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিতে হবে এই জনপদের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক জনজীবনের দিকে। তখনই হয়তো পৃথক এক মাত্রা পাবে চট্টগ্রামের গ্রুপ থিয়েটার। আলাদা করে চিহ্নিত করা যাবে চট্টগ্রামের নাটককে।

নাট্য আন্দোলনে বরিশাল

নিখিল সেন

১৮৫৩ সালে রচিত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকটিকে বাংলাভাষায় প্রথম সার্থক নাটক বলে গণ্য করা হয়। এর মাত্র ৩/৪ বছর পরই বরিশালে ডাঃ দুর্গাদাস কর রচিত 'স্বর্ণশৃঙ্খল' নাটক মঞ্চস্থ হয়। কলকাতার বাইরে মফস্বল অঞ্চলে এটাই যে প্রথম মঞ্চনাটক তা এখন নিঃসন্দেহে বলা যায়। এ প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যকলার ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

'মফঃস্বলে প্রথম নাট্যাভিনয়ের গৌরব বোধ হয় বরিশালেরই প্রাপ্য। ১৮৫৬-৫৭ সালের কাছাকাছি 'স্বর্ণশৃঙ্খল' নাটক অভিনীত হয়।'

এ সম্পর্কে 'ঢাকা প্রকাশ' সংবাদপত্রের সংবাদ নিম্নরূপ (ঢাকা, ৮ই আগস্ট, ১৮৬৯) :

'বরিশালে নাট্যাভিনয়, এই বরিশাল নগরে একটি নাট্যাভিনয় হইয়াছে...........অধিক গোল হইবে বলিয়া আহুত ব্যক্তিদিগের জন্য টিকেট করা হইয়াছিল। আমিও আহুত ব্যক্তিদিগের মধ্যে গৃহীত হইয়া অভিনয় স্থলে উপস্থিত ছিলাম।.....নাটকখানিতে গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেও সরকারী ডাক্তাররূপে বরিশালে অবস্থিত কালে ডাঃ দুর্গাদাস করই ইহা রচনা করেন। বরিশাল হইতে দুর্গাদাস বাবু ঢাকায় বদলি হন। তাহার সহকারী বৃন্দাবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৩ সনের জুলাই মাসে ঢাকায় নাটকখানি মুদ্রিত করেন। তিনি "বিজ্ঞাপন" পত্রে লিখিয়াছেন—প্রায় আট বৎসর হইল কতিপয় সুহৃদ বন্ধুর অনুরোধে অভিনয় করিবার নিমিত্ত বরিশালে এই নাটক লিখিত হয়।'

এ প্রসঙ্গে 'দৈনিক আজাদ পত্রিকা'য় প্রকাশিত আর একটি তথ্য : '১৮৫৬-৫৭ সালে বরিশালে প্রথম 'স্বর্ণশৃঙ্খল' নামীয় একখানি নাটক অভিনীত হয়। বরিশালের সরকারী ডাক্তার দুর্গাদাসবাবু নাটকটি রচনা করেন। নাটকটি অবশ্য পাণ্ডুলিপিতেই থাকে। ১৮৬৩ সালে ডাঃ দুর্গাদাসবাবুর সহকারী ডাঃ বৃন্দাবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম ইহা মুদ্রিত করেন....।' ভূপেশ ঘোষ, 'ঢাকায় প্রথম নাট্যাভিনয়'- "দৈনিক আজাদ", ঢাকা, ২০শে এপ্রিল ১৯৬৭। সুতরাং এ কথা নিশ্চিত যে, বরিশালে ১৮৫৬-৫৭ সালের কোনো এক সময়েই মঞ্চনাটক অভিনীত হয়েছে এবং সে নাটক হয়েছে দর্শনীর বিনিময়ে। এটাই মফস্বলের প্রথম নাটক। নাটকের ক্ষেত্রে বরিশালের এ ঐতিহ্য বরিশালের নাট্যশিল্পী, নাট্যামোদী ও সংস্কৃতিসেবীদের প্রেরণার বিষয়।

বরিশাল জেলার যাত্রাভিনয়ের ইতিহাস আরও অনেক পুরোনো। যাত্রামঞ্চই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পুরোপুরি নাট্যমঞ্চে রূপান্তরিত হয়েছে। তৎকালীন জমিদার শ্রেণি এবং কলকাতা প্রবাসী শিক্ষিত যুবসমাজ এ ক্ষেত্রে মূল উদ্যোগী ছিলেন। জমিদারদের নাটমন্দির বা নাট্যমণ্ডপই প্রাথমিক অবস্থায় নাট্যমঞ্চ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

বিভাগ-পূর্বকালে বানারিপাড়া, রহমতপুর, গৈলা, গাভা, ঝালকাঠি, কলসকাঠি, অভয়নীল, মানপাশা, কুশঙ্গল, খলিসাকোঠা, উলানিয়া, শ্যামেরহাট, উত্তর শাহবাজপুর, কীর্তিপাশা, মাহিলারা, মাধবপাশা, কলসগ্রাম প্রভৃতি গ্রামের জমিদার এবং ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকরাই নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এ ছাড়া শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত গ্রাম এবং বরিশাল শহরের বিভিন্ন পাড়ার সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোও নাটক মঞ্চস্থ করত। বরিশাল শহরের ঝাউতলা, আলেকান্দা ও বগুড়া এলাকা এ ব্যাপারে সবচয়ে অগ্রণী ছিল।

সেকালে জমিদার ও শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে হিন্দু ধর্ম সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সংখ্যাধিক্য

ছিল। ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা-পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠানের সময়. বিশেষ করে দুর্গোৎসবের দীর্ঘ ছুটি ভোগ করতে কলকাতার চাকুরীজীবীরা যখন দেশে ফিরতেন, তখন নাট্যাঙ্গন সরগরম হয়ে উঠত। লাখুটিয়ার জমিদারবাড়ির রাসপূর্ণিমার মেলার সময় পক্ষকাল ব্যাপী থিয়েটার ও যাত্রা দেখতে অন্য জেলা থেকেও হাজার হাজার লোকের সমাগম হত। অবশ্য তখনকার নাটকে অভিনয়ের সাথে হিন্দু-মুসলমান কোনো সম্প্রদায়েরই সাধারণ মানুষের বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না। তারা ছিল দর্শকমাত্র। সাধারণ গণমানুষের সাংস্কৃতিক জীবন যাত্রাগান, জারি, সারি, পুঁথি ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এ সময়ে বিভিন্ন স্থানে অভিনীত নাটকগুলো ছিল প্রধানত হিন্দু পৌরাণিক উপাখ্যান কেন্দ্রিক। নাট্যজগতে ধনী হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাধান্য এবং গণমানুষের সাথে তাদের বিচ্ছিন্নতাই এর অন্যতম কারণ। অবশ্য অর্থনৈতিক বৈষম্যজনিত শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও শ্রেণি সচেতনতা তখনও আমাদের সমাজে তেমনভাবে প্রভাব বিস্তার করেনি। এ পর্যায়ে অভিনীত নাটকগুলোর মধ্যে 'স্বর্ণশৃঙ্খল', 'বিল্বমঙ্গল', 'জনা', 'শর্মিষ্ঠা', 'কর্ণার্জুন', 'নৌকাবিলাস', 'পার্থসারথি', 'বীণাপাণি', 'শিশুপালবধ', 'লবকুশ', 'সীতাহরণ', 'কংসবধ', 'তরণীসেনবধ', 'সীতা-সাবিত্রী', 'রাবণবধ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ আমলের নাটক ছিল অনেকটা যাত্রার ধরনের। হ্যাজাক, পেট্রোম্যাক্স, গ্যাসলাইট, এমনকী ঝাড়লণ্ঠন দিয়েও চমৎকার আলোকসজ্জা করা হত। মঞ্চসজ্জায় কাপড়ে আঁকা দৃশ্যপট এবং নানা রং-বেরংয়ের কাপড় ও কাগজ ব্যবহার করা হত।

আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে কীর্তিপাশায় জমিদারবাড়ির নিজস্ব মঞ্চে নাট্যাভিনয়ের খবর জানা যায়। এ প্রসঙ্গে বরিশাল থেকে ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত মাসিক 'পথিক' পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য জমিদার ও লেখক রোহিণীকুমার রায় চৌধুরীর (যিনি পদবি সেন লিখতেন) জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

"সঙ্গীতজ্ঞ, চরিত্রবান রোহিণীকুমার স্বীয় আত্মীয় বন্ধুবর্গকে লইয়া শারদীয় উৎসব বা অন্য কোন উৎসবকালে নাটক অভিনয় করিতেন। এই নির্দোষ আমোদ তাঁহার অতীব প্রিয় ছিল। তিনি স্বীয় ভবনে সখের নাট্য সমাজ স্থাপন করেন। পুরানো ইতিহাসমূলক ধর্মভাবাপন্ন নাটক এইখানে অভিনীত হইত। দেবী মাহাত্ম্য, মহাভারত, ভাগবৎ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ অবলম্বনে তিনি নাটক রচনা করিতেন এবং তাহাই প্রায়শঃ অভিনয় করা হইত।...... তাঁহার রচিত 'রাজসূয়', 'দনুজদলনী', 'সুরথ সমাধি', 'উপহরণ', 'প্রভাবতী' প্রভৃতি নাটক সমস্তই তদীয় রঙ্গমঞ্চে কৃতিত্বের সাথে অভিনীত হইয়াছে। প্রবীণ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বয়ং রোহিণীকুমারের রচিত নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। সময়োপযোগী সাজসজ্জা, দৃশ্যপট ও অভিনয়ের জন্য তৎকালে কীর্তিপাশায় 'এঞ্জেল থিয়েটার' বঙ্গীয় নাট্য সমাজে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।'

চল্লিশের দশকে সামাজিক চেতনার পটভূমিকায় বরিশালের নাট্যজগতে পরিবর্তন দেখা দেয়। পৌরাণিক উপাখ্যান ও দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত নাটকের স্তর পেরিয়ে হিন্দুসমাজে তখন সামাজিক ও সমাজ-সংস্কার মূলক নাটকের দিকে পা বাড়ায়। এ সময়ে অভিনীত নাটকগুলোর মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ও 'সধবার একাদশী', গিরিশ ঘোষের 'প্রফুল্ল', নিশিকান্ত রায়ের 'পথের শেষে', শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিজয়া' (দত্তা), 'রমা' (পল্লীসমাজ) 'ষোড়শী' (দেনাপাওনা), 'মহেশ', 'পণ্ডিতমশাই', মাইকেলের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত, 'পুর্নজন্ম', মীর মোশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ', রামনারায়ণের 'কুলীন কুলসবর্স্ব', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন' প্রভৃতি অন্যতম।

এই দশকেই ধনী ও শিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নাটকের গতিধারা প্রবাহিত হয়। তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমি-বিশেষ করে শেরে-বাংলার অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ ও মহান

নেতৃত্বদান সমগ্র মুসলিম সমাজের চিন্তা-চেতনার ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে। প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম সমাজের অভিনীত নাটকগুলোও শুধুমাত্র মোগল-পাঠান ও ইরাক-তুরানীদের বীরত্ব-গাঁথা এবং তাদের অতীত কীর্তি, যুদ্ধ বিগ্রহ ও রাজ্য বিজয়ের কাহিনির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সে সময়ের অভিনীত নাটকগুলোর মধ্যে 'হাসান-হোসেন', 'সোহরাব-রুস্তম', 'এজিদ বধ', 'জয়নাল উদ্ধার', 'সিন্ধু বিজয়', 'মোগল সূর্য', 'বঙ্গবিজয়', 'নাদিরশাহ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কাল থেকে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে সব বাঁধ ভেঙে এক নবজীবনের চেতনা সমাজ জীবনে দেখা দেয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক বিভেদ সৃষ্টির শত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে হিন্দু-মুসলমান যুবক-ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক একযোগে স্বাধীনতা সংগ্রামে শরিক হয়। কর্মধারা ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে কোনো কোনো সময়ে মতপার্থক্য দেখা দিলেও সকলের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল—পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তি। এই রাজনৈতিক পটভূমিকায় বরিশালের নাট্যধারায় এক ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। ধর্মীয় ও পুরোনো ধ্যানধারণা ভিত্তিক নাটকের পরিবর্তে এমন সব নাটক মঞ্চস্থ হতে শুরু হয় যাতে স্বভাবতই জাতীয় চেতনা ও দেশাত্মবোধ উজ্জীবিত হয়। নাটমণ্ডপ এবং ধনী ও উচ্চশ্রেণির গণ্ডি ছাড়িয়ে সকল ধর্মের সাধারণ মানুষের মিলিত উদ্যোগে অভিনীত হতে আরম্ভ হয় 'সিরাজদ্দৌলা', 'টিপু সুলতান', 'মীরকাশিম', 'মহারাজ নন্দকুমার', 'ঈশা খান', 'চাঁদ রায়', 'কেদার রায়', 'প্রতাপাদিত্য', 'মেবার পতন', 'সাজাহান', 'শহীদ ক্ষুদিরাম', 'আগস্ট বিপ্লব', 'মহাবিদ্রোহ' (সিপাহী বিদ্রোহ), 'বঙ্গবিজয়', 'রাজমুকুট' ইত্যাদি। এই স্তরে এসেই বরিশালের নাট্যধারা প্রথম গণমুখীন হতে শুরু করে। মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা, তথা সমগ্র আঙ্গিকের পরিবর্তন হয়ে নাটক মঞ্চায়ন আধুনিক খাতে প্রবাহিত হতে আরম্ভ হয়।

১৯৪৫ সালে নিখিল বঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টি (বরিশাল শাখা)'র আমন্ত্রণে কলকাতার গণনাট্য সম্প্রদায় (আই. পি. টি. এ) বরিশাল শহরে পরপর দুদিন বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকখানি মঞ্চস্থ করে নবনাট্য আন্দোলনের ধারাকে বরিশাল জেলায় প্রতিষ্ঠিত করে। একই সালে দীপালি হলে (অভিরুচি সিনেমা হল) নটসূর্য নির্মলেন্দু লাহিড়ী ও তাঁর সম্প্রদায় দুদিনে 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'চরিত্রহীন' নাটক দুখানি মঞ্চস্থ করে বরিশালবাসীর মনে গভীর রেখাপাত এবং অন্তরে এক প্রচণ্ড আবেগের সৃষ্টি করেন।

১৯৪৭-এর স্বাধীনতা-পূর্বকাল পর্যন্ত বানারিপাড়ার হারান গুহঠাকুরতা (কলকাতার স্টার থিয়েটারের অভিনেতা), বরিশাল শহরের প্রমোদ রায়, রহমতপুরের জমিদারবাড়ির মেজোবাবু, উলানিয়ার চৌধুরী মোহাম্মদ আরিফ (ধনুমিঞা), পটুয়াখালির কালু সেন, উত্তর শাহবাজপুরের শ্যামেরহাটের অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ দে, আবদুস সামাদ মাস্টার, আহাদ আলী শাহবাজী, কলসকাঠির রাজেশ্বর রায় চৌধুরী ও আবুল হাসেম তালুকদার, বরিশাল শহরের অমিয় দাশগুপ্ত (মহারাজ) ও তার তিন বোন কণা দাশগুপ্তা, দুলা দাশগুপ্তা, ও ফুলু দাশগুপ্তা প্রমুখ শিল্পী, পরিচালক ও নাট্যামোদীরা বরিশালের নাট্যজগতের উজ্জল জ্যোতিষ্ক ছিলেন। নারী চরিত্রে পুরুষরাই অভিনয় করতেন। তবে কলকাতা প্রবাসী দু-একজন শিক্ষিতা মহিলা কদাচিৎ নাট্যমঞ্চে অবতীর্ণ হতেন। তবে এটা ব্যতিক্রমমাত্র। রহমতপুরের মেজোবাবু 'বৃত্রসংহার', আলী আহমদ (অ্যাডভোকেট) সাহেবের 'বঙ্গ বিজয়' রমেশ মুন্সীর 'অচল টাকা' ডাঃ সৈজুদ্দিন সাহেবের 'রাজমুকুট' ও নলছিটির রাইচরণ সরকারের লিখিত তিনখানা নাটক বরিশালে অনেকবার মঞ্চস্থ হয়েছে। নাটকগুলো মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৪২-এর শেষভাগে প্রখ্যাত অভিনেতা নির্মল পোদ্দারের উদ্যোগে বরিশাল শহরের হাটখোলায় মিলন নাট্যসংঘ নামে একটি নাট্যসংস্থা গঠিত হয়। এই সংস্থার সাথে যে সব শিল্পী জড়িত ছিলেন তন্মধ্যে সুশীল সরখেল, মনা বোস, সুনীল চৌধুরী, মাখন দাস, রাখাল কুণ্ডু, বিশ্বনাথ সাহা চৌধুরী,

আনন্দ বণিক ও জ্যোতিপ্রকাশ রায় (হিটলার)-এর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। এই সংস্থা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বহু খ্যাতনামা শিল্পী সমন্বয়ে প্রচুর নাটক সাফল্যের সাথে মঞ্চায়ন করে বরিশালের নাট্যাঙ্গনকে মুখরিত করে রেখেছিল। নতুন অভিনেতা সৃষ্টির ব্যাপারেও মিলন নাট্যসংঘের দান উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৬ সালে এ. পি. এম. জাহিদ জাহাঙ্গীরের প্রযোজনায় এবং আবদুল মালেক খানের পরিচালনায় তদানীন্তন জগদীশ থিয়েটারে (বর্তমান কাকলি) 'ঋণংকৃত্বা' ও 'মিশরকুমারী' নাটক দুটো সাফল্যের সাথে মঞ্চায়িত হয়েছিল। অভিনয়ের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন আঃ মালেক খান, মিঃ লোদী, মেঘা ঘোষ, আবদুর রাজ্জাক, পরাণ মিঞা, সৈয়দ আলতাফ প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ। বিভাগোত্তর কালে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বরিশালের নাট্যাঙ্গন ছিল খুবই স্তিমিত। হিন্দু সম্প্রদায়ের দলে দলে দেশত্যাগ এবং বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে নানা বিতর্কমূলক প্রশ্ন বরিশালের নাট্যধারার অগ্রগতিকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে। এই বন্ধ্যাত্বের মধ্যে ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত বি.ডি. হাবিবুল্লাহ সাহেবের প্রকাশিত 'পল্লীমঙ্গল' ও ১৯৫০ সালে প্রকাশিত 'মিলনচুক্তি' নাটক দুইখানি বরিশালে এক নবদিগন্তের সূচনা করে। পঞ্চাশের ভয়াল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিকায় রচিত এবং নতুন পথের দিশারী 'মিলনচুক্তি' নাটকখানি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সত্যিকারের মিলনচুক্তি রচনা করতে সক্ষম হয়েছিল। সার্বিক বিচারে বি.ডি. হাবিবুল্লাহ সাহেবের 'মিলনচুক্তি'ই বরিশালের সর্বপ্রথম শ্রেষ্ঠ গণনাটক।

১৯৫৯-এর শেষভাগে দীপালি সিনেমার (বর্তমান অভিরুচি সিনেমা) দোতলায় একটি মোমবাতি জ্বেলে বরিশালের বিপুল ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন শিল্পীসংসদ-এর গোড়াপত্তন হয়। নাটক, সংগীত, সাহিত্য তথা সাংস্কৃতিক সকল অঙ্গনেই শিল্পীসংসদের কার্যাবলি প্রসারিত ছিল। তবে নাট্যজগতেই এই সংগঠনের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি এবং আজ পর্যন্ত বরিশালে অতুলনীয়। আবদুল মালেক খান, কেশব চ্যাটার্জি, এস. আলী মোহাম্মদ, পরাণ মিঞা, আবদুর রাজ্জাক, মোঃ রুস্তম আলী, ফরিদউদ্দিন আহম্মেদ, এ.বি.এম. আশরাফ আলী খান চৌধুরী, আলী আশরাফ, মরহুম ইমাদুল্লাহ প্রভৃতি সংস্কৃতিসেবী শিল্পী ও নাট্যামোদীরা প্রাথমিক পর্বের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। আবদুল আজিজ তালুকদার ও মীর আনওয়ারউদ্দিন আহমেদ এই পর্যায়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এক বছরের মধ্যে কাকলি সিনেমা হলের চৌমাথার উত্তর-পূর্ব কোণের একটি টিনের ঘরের দোতলায় শিল্পীসংসদের কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে শহিদ আলতাফ মাহমুদ, শহিদ পিনাকী বসু, সংগীতশিল্পী নারায়ণ সাহা, গোলাম মোস্তাফা, মোশাররফ হোসেন (নানু), সেকেন্দার মিঞা, ও.সি. ওয়াজেদ আলী (বাঘা মিঞা), শেখ মালেক, সুধীর সেন, মোশাররফ হোসেন (মোচন), দেলোয়ার হোসেন, শহিদ মজিবুর রহমান (কাঞ্চন), জিয়াউদ্দিন আহমেদ, বরুণপ্রসাদ বর্মণ, নরেন রায় চৌধুরী, গোলাম কিবরিযা, রমিজুল হক (চুন্নু), আরব আলী মিঞা, মোহাম্মদ ইউসুফ (কালু), প্রমুখ শিল্পী ও সংগঠকরা সংগঠনের সাথে যুক্ত হন।

ইতিমধ্যে ১৯৫১ সালেই সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং সর্বরকম শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করে ঢাকায় চৌদ্দ দফা দাবি ভিত্তিক পূর্ব পাকিস্থান যুবলিগ নামক একটি অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল যুব সংগঠনের জন্ম হয়। যুব সমাজের সাংস্কৃতিক চেতনার মান উন্নয়নও এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। সমসাময়িক কালে (১৯৫১ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত) তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যুবলিগের প্রভাব ও ভূমিকা ছিল অপরিসীম। যুবলিগের বরিশাল শাখার তৎপরতা ছিল ব্যাপক। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পর এ সংগঠন আরও বিস্তৃতি লাভ করে। যুবলিগের সাংস্কৃতিক শাখা ও শিল্পী সংসদের মধ্যে সব সময়ই একটা সৌভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। শিল্পী সংসদের সাংগঠনিক উৎকর্ষতার পেছনে যুবলিগের পরোক্ষ অবদান ছিল

উল্লেখযোগ্য। দু'টি সংগঠনের আলাদা নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং আলাদা সত্তা থাকা সত্ত্বেও তারা বরিশালের নাট্যাঙ্গন ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের পরিপূর্ণ বিকাশে যৌথ প্রয়াসে চালিয়ে গেছে। মরহুম ইমাদুল্লাহ (সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান যুবলিগ), আলী আশরাফ (সভাপতি বরিশাল যুবলিগ- দৈনিক বাংলা পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক), আবদুল আজিজ তালুকদার, শহিদ মজিবুর রহমান (কাঞ্চন), গোলাম মোস্তফা (বাংলাদেশের চিত্রজগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী), মোশাররফ হোসেন নান্নু (যুবলিগের এককালীন জেলা সম্পাদক), নিখিল সেন (যুবলিগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক- পরবর্তীকালে জেলা কমিটির সভাপতি), সংগীতশিল্পী রমিজুল হক চুন্নু, সংগীতশিল্পী মামুনুর রশীদ, এস.আলম, এনাম চৌধুরী (পরিচালক, রেডিয়ো বাংলাদেশ), মোশাররফ হোসেন মোচন (যুবলিগের যুগ্ম সম্পাদক) , বরুণপ্রসাদ বর্মণ (সাংস্কৃতিক সম্পাদক, যুবলিগ) মোহাম্মদ ইউসুফ কালু, পুষ্প সোম (দত্ত), শান্তি সোম, বাসন্তী রায়, প্রভৃতি শিল্পী ও সংগঠকরা মূলত যুবলিগের মাধ্যমেই শিল্পীসংসদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন।

১৯৫৩ সালে শিল্পীসংসদ আর.সি. দাশগুপ্তের দালানের চারতলায় বর্তমানে যেখানে শিল্পকলা একাডেমীর দপ্তর, সেখানে স্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করে। শিল্পী ও পরিচালক আবদুল মালেক খান শিল্পীসংসদের মূল প্রাণকেন্দ্র ছিলেন। প্রতিটি নাটকই তাঁর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হত। মালেক খান সাহেবের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত অসংখ্য অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আজও বরিশাল এবং বাংলাদেশের সর্বত্র, এমনকী পশ্চিমবাংলায়ও ছড়িয়ে আছেন। বরিশালের নাট্যজগতে আঃ মালেক খান এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তিনিই বরিশাল নাট্যাঙ্গনের প্রধান স্থপতি। নাটক পরিচালনায় তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন কেশব চাটার্জি (বর্তমানে চিত্রনাট্যকার)। শিল্পীসংসদের সম্পাদক হিসাবে দীর্ঘদিন যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন আবদুর রশীদ খান (অবসরপ্রাপ্ত অ্যাকাউন্ট্যান্ট, বরিশাল কালেক্টরেট)। তৎকালীন চারজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এস. কে সেন, এম.এম. খান, মোস্তাফিজুর রহমান, এফ. করীম এবং আয়কর অফিসার এম. জামান শিল্পীসংসদের অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করেছেন। ফিরোজ খান নূন মন্ত্রীসভার মন্ত্রী আঃ আলীম দীর্ঘদিন সদস্য ছিলেন এবং বিভিন্ন নাটকে আভিনয় করেছেন। ফিরোজ খান নূন মন্ত্রীসভার মন্ত্রী আঃ আলীম দীর্ঘদিন শিল্পীসংসদের সভাপতি এবং বরিশালের তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার ওসমান সাহেব শিল্পীসংসদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাংলাদেশের অন্যতম বুদ্ধিজীবী প্রফেসর কবীর চৌধুরী, মালেক খান সাহেবের পরিচালনায় মহেন্দ্র গুপ্তের 'মালা রায়' নাটকে অভিনয় করেন। তিনি শিল্পীসংসদের সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

শিল্পীসংসদের সার্থক মঞ্চায়ন 'আগামী দিন', 'বিশ বছর আগে', 'কবর', 'মাটির ঘর', 'ভাড়াটে বাড়ী', 'তাইতো', 'দুই পুরুষ', 'পি. ডাব্লউ. ডি', 'মাকড়সার জাল', 'রজনীগন্ধা', 'মায়ামৃগ', 'আগন্তুক', 'সাজাহান', 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতি নাটক। সার্থক অভিনেতা-অভিনেত্রী ছিলেন আবদুল মালেক খান, কেশব চাটার্জি, উপেন্দ্রনাথ চাটার্জি, ফরিদউদ্দিন আহমেদ, আবদুর রাজ্জাক, পরাণ মিএগ, মোঃ রুস্তম আলী, এস. আলী মোহাম্মদ, সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া, এনাম চৌধুরী, শহিদ পিনাকী বসু, নরেন রায়, আবদুল মালেক (কানুনগো), ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এফ. করীম ও এম. জামান, পুষ্প সোম (দত্ত), শান্তি বাসন্তী রায়, নূরজাহান বেগম, সুলতানা রেবু প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ।

শিল্পীসংসদের 'আগামী দিন' বরিশালের সর্বপ্রথম নিরীক্ষাধর্মী এবং সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটক। সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দুর্নীতির চক্রান্ত এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের উপর ভিত্তি করে প্রবীণ সাহিত্যিক নূর আহাম্মদ সাহেব একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধটির মূল বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে 'আগামী দিন' নাটক রচনা করেন কেশব চাটার্জি (বর্তমানে চিত্রনাট্যকার)। তাঁকে সহায়তা দান করেন আবদুল মালেক খান। 'আগামী দিন' নাটকে দুর্নীতির ভূমিকায় আবদুয় মালেক খানের

অভিনয় বরিশালের অন্যতম সাড়া জাগানো অভিনয়। স্বর্গীয় জ্ঞানরঞ্জন বসু (কাকাবাবু) কর্তৃক 'আগামী দিন' নাটকের মঞ্চসজ্জা দর্শকদের চমৎকৃত করেছিল।

শিল্পীসংসদের সমসাময়িক সংগঠন ড্রামাটিক ক্লাব। এ সংগঠনের মূল সংগঠক ও পরিচালক ছিলেন মরহুম সিরাজুল হক (সুলতান মিঞা) এই সংস্থার সংগঠক হিসেবে ছিলেন মরহুম আবদুর রউস, মরহুম মীর মোয়াজ্জেম হোসেন, মরহুম কে. এস. রহমান সুলতান মিঞা এই সংগঠনের সাথে যুক্ত হন। ড্রামাটিক ক্লাব বেশ কয়েকটি উন্নতমানের নাটক মঞ্চস্থ করে সকল স্তরের জনগণের প্রশংসা অর্জন করেছে। সফল মঞ্চায়িত নাটকগুলোর মধ্যে 'টিপু সুলতান', 'কঙ্কাবতীর ঘাট ', 'অভিযান', 'পথের শেষে' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'টিপু সুলতান' নাটকে 'মশিয়ে লালী' এবং 'কঙ্কাবতীর ঘাট' নাটকে 'মিঃ মুখার্জি-র ভূমিকায় সুলতান মিঞার অভিনয় আজও বরিশালবাসীর স্মৃতিতে জাগ্রত আছে।

১৯৩৫ সালে প্রমথনাথ বিশীর 'ঋণংকৃত্বা' নাটকটির সফল মঞ্চায়ন করে ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ নাটক জগতে প্রথম সাড়া জাগায়। দেশ বিভাগের পর ১৯৫৩ সালে কলেজ ছাত্র সংসদ তারাশংকরের 'কালিন্দী' নাটকটি সাফল্যর সাথে মঞ্চস্থ করে সুধিজনের প্রশংসা অর্জন করেছিল। নাটকটি পরিচালনা করেন আবদুল মালেক খান। অভিনেতা হিসাবে রামেশ্বর চরিত্রে সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া ও অহীন চরিত্রে এনাম চৌধুরী দর্শকদের মনে গভীর রেখাপাত কবেছিল। পরবর্তীকালে কলেজ ছাত্র সংসদ প্রতি বছরই নাটক মঞ্চায়ন করে আসছে। এর মধ্যে 'শত্রু', 'বানরের পা', 'কেউ কিছু বলতে পারে না', 'অভিনয় নয়', 'কাঞ্চনরঙ্গ', 'ক্রোস রোডে ক্রোস ফায়ার' প্রভৃতি নাটক মঞ্চায়নের সফলতা স্মরণীয় হয়ে আছে। এর মধ্যে তিনখানা নাটক পরিচালনা করেছিলেন প্রবীণ পরিচালক ও অভিনেতা ফণী চক্রবর্তী। এর পর থেকে ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সব নাটকই পরিচালনা করে আসছেন অধ্যাপক সাইদুল ইসলাম সাহেব। বরিশালের নাট্যাঙ্গনে পরিচালক হিসাবে প্রতিভাবান প্রবীণ শিল্পী অধ্যাপক সাইদুল ইসলাম সাহেব যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত মিতালী নাট্যসংস্থার প্রধান ছিলেন এস, আলী, মোহাম্মদ ও আনিস আহম্মদ। এই সংগনের সাথে যুক্ত ছিলেন বিশ্বনাথ সাহা চৌধুরী, আনন্দ বণিক, হরিপদ কর্মকার, খাজা আলম প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ। এই সংস্থার সফল মঞ্চায়ন 'সিঁথির সিদুর', 'লালপাঞ্জা', 'ময়ূর মহল', 'বন্ধুর চরিত্র', 'বাঁশের কেল্লা' (তিতুমীর) প্রভৃতি। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে আবির্ভাব ঘটলেও ওই সংগঠনটির অস্তিত্ব বেশি দিন বজায় থাকেনি।

১৯৫৫ সালে কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা মহেন্দ্র গুপ্ত তাঁর সম্প্রদায় সহ বরিশাল জিলা প্রদর্শনী কমিটির আমন্ত্রণে এসে 'বেলস্‌পার্ক' প্রদর্শনীমঞ্চে 'সিরাজদ্দৌলা', 'কঙ্কাবতীর ঘাট' ও 'মিশরকুমারী' এই তিনখানা নাটক মঞ্চস্থ করে বরিশালে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেন।

১৯৫৬ সালে সাংবাদিক সংস্কৃতিবান ফখরুল ইসলাম খান সাহেবের আমন্ত্রণে কলকাতার সাড়াজাগানো চলচ্চিত্র-শিল্পী ও মঞ্চাভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্য তাঁর সম্প্রদায়-সহ বরিশাল আগমন করেন। ফখরুল ইসলাম সাহেব ধীরাজবাবুর বন্ধু ও সহযোগী ছিলেন। 'কালোছায়া' এবং আরও দুখানি ছায়াছবির পরিচালনায় তিনি ধীরাজবাবুর সহকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দুঃখের বিষয় ফখকল ইসলাম সাহেবের প্রতি ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও বিদ্বেষপোষণকারী কিছু লোক অযথা অপ্রীতিকর ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তারা নাট্যমঞ্চে হামলা চালিয়ে ধীরাজবাবু ও তাঁর সম্প্রদায়ের অভিনয় বানচাল করে দেয়। ব্যথিত চিত্তে ধীরাজ ভট্টাচার্য বরিশাল ছেড়ে চলে যান। বরিশালের নাট্যাঙ্গনের ইতিহাসে এই ঘটনা একটা কলঙ্কজনক অধ্যায়।

আয়ুব খানের সামরিক অভ্যুত্থানের পর শিল্পী সংসদের সাংগঠনিক কাঠামো ভেঙে যায়।

সংগঠনকে পুনরুজ্জীবিত করতে এগিয়ে আসেন অ্যাডভোকেট এনায়েত পীর খান (জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাবেক সম্পাদক) গোলাম কিবরিয়া (তৎকালীন বরিশাল 'ইউসিস' এর প্রধান), শহিদ পিনাকী বসু, জিয়াউদ্দিন আহমেদ, আবদুর রাজ্জাক, আবদুল হক, গোলাম সরওয়ার (পিরু), হরেন রায় চৌধুরী, নিখিল সেন, শেখ ছালেক, আরব আলী মিঞা, দেলোয়ার হোসেন, মোশারফ হোসেন (মোচন), মীর মুজতবা আলী, অধ্যাপক তৌহিদ হোসেন, সফর আলী মল্লিক, আনোয়ার ফিরোজ, আব্বাস হোসেন, হাবিবুল হক (পলু), আবু আল সাঈদ (নান্টু), বলহরি সাহা, হারুম প্রভৃতি শিল্পী ও শিল্পানুরাগীরা। আবদুল মালেক খানের নেতৃত্বে এবং এদের কর্ম-তৎপরতার শিল্পীসংসদ নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আরও এক দশক টিকে ছিল। ক্রমশ এই ঐতিহ্যবাহী সংগঠনটির বিলুপ্তি ঘটে।

শিল্পীসংসদের গৌরবসূর্য যখন অস্তাচলগামী তখন ১৯৬৩ সালে বরিশাল নাট্যনিকেতন-এর জন্ম হয়। এই নাট্যসংস্থা অদ্যাবধি বরিশালের নাট্যজগতে অবস্থান করছে। নাট্যনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা ও মূল সংগঠক ফখরুল ইসলাম খান। এ প্রতিষ্ঠান প্রচুর নাটকের সার্থক মঞ্চায়ন করার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। নাটকগুলোর অধিকাংশই পরিচালনা করেছেন এস আলী মোহাম্মদ। পরবর্তী স্তরে পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন আনোয়ার ফিরোজ ও হাবিবুল হক (পলু)। নাট্যনিকেতন তার নিজস্ব শিল্পী সমন্বয়ে ঢাকা ও খুলনা বেতারে মোট তিনটি বেতার নাটক অভিনয় করেছে। এই সংস্থাই বরিশালে সর্বপ্রথম বেতার নাটক করার গৌরব অর্জন করেছে। হাবিবুল হক (পলু), আনোয়ার ফিরোজ, মন্টু সাহা, জ্যোতিপ্রকাশ রায় (হিটলার), বলহরি সাহা, আনন্দ বণিক প্রভৃতি কৃতি শিল্পীরা নাট্যনিকেতন এর সাথে সংশ্লিষ্ট আছেন।

১৯৫৩ সালে মরহুম মোহাম্মদ শাজাহান, চলচ্চিত্রশিল্পী মরহুম মনিরুজ্জামান রাজ, আনোয়ারুল হক (কাঞ্চন) ও সুলতান আলম (নয়া মিঞা) এই চারজন দক্ষ শিল্পীর উদ্যোগে পাক আদ্য শিল্পীসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ হয় শিল্পীসংঘ। বর্তমানে শিল্পীসংঘের প্রধান সংগঠক ও পরিচালক সুলতান আলম (নয়া মিঞা) ও আবদুল আউয়াল। তাঁরা উভয়েই নিবেদিত প্রাণ শিল্পী। এই সংগঠন বেশ কিছু নাটকের সফল মঞ্চায়ন করেছে। 'কিন্তু নাটক নয়' নাটকটির মঞ্চায়নে বরিশালের মঞ্চে প্রথম 'ফ্রিজ' দৃশ্য দেখিয়ে এই নাট্যসংস্থা প্রচুর গৌরব অর্জন করেছে। নাটকটি পরিচালনা করেছেন সুলতান আলম (নয়া মিঞা)। দক্ষ শিল্পী ও পরিচালক আনোয়ারুল হক (কাঞ্চন) ও মিজান খসরু এই প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এসে যথাক্রমে চিত্র কাকলী ও বরিশাল থিয়েটার নামে দুটি নতুন নাট্যসংস্থা গঠন করেছিলেন। এ দুটি সংগঠন স্বল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল।

বরিশাল আইনজীবী সমিতির সদস্যরা কয়েকখানা সফল নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। এতে অভিনয় করে স্বর্গীয় অবনীনাথ ঘোষ, মরহুম মোয়াজ্জেম হোসেন খান, রবীন্দ্রকুমার বসু, উপেন্দ্রনাথ চাটার্জি, সুবোধ দে, আবদুল লতিফ প্রমুখ আইনজীবীরা সুধীমহলে প্রশংসাভাজন হয়েছেন।

ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ঝাউতলানিবাসী স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর দাশগুপ্ত বরিশালের নাট্যজগতে অনেক অবদান রেখেছেন। ১৯৬৪ সালে দেশত্যাগ করা পর্যন্ত তিনি ব্রজমোহন বিদ্যালয় এবং তাঁর এলাকা ঝাউতলায় বহু নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। তিনি প্রতিভাবান শিল্পী ও পরিচালক ছিলেন। চন্দ্রশেখরবাবুর অন্যতম সহযোগী ছিলেন ঝাউতলার সুধীব সেন ও ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুখরঞ্জনবাবু।

মোশাররফ হোসেন সাজাহান (এম.পি), প্রফুল্ল দাস, সতীন্দ্রনাথ বসু, জিয়াউদ্দিন আহমেদ, (সেক্রেটারি, বরিশাল পৌরসভা), রণজিৎ চক্রবর্তী, দ্বিজেন মালাকর এবং বরিশালের চিকিৎসকদের মধ্যে ডাঃ হাবিবুর রহমান (ডেন্টাল সার্জন), ডাঃ নওয়ার হোসেন, ডাঃ রাজ্জাক বিশ্বাস অভিনয়ে

বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে আসছেন। বরিশালের চিকিৎসকদের প্রযোজিত ও অভিনীত কয়েকখানা নাটকের সার্থক মঞ্চায়ন নাট্যামোদীদের যথেষ্ট আনন্দ দান করেছে।

দেশ বিভাগের পর অভিনেত্রীদের মঞ্চে আগমন ঘটে ১৯৫৩ সালে। সংগীতশিল্পী তোফাজ্জল হোসেন তাঁর স্ত্রী মিসেস বুলবুলকে নিয়ে মঞ্চে অভিনয় করেন। ১৯৫৪ সালে আবদুল মালেক খানের পরিচালনায় 'শোধবোধ' নাটকে চারজন অভিনেত্রী অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে বরিশাল মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা মেহের কবীর অন্যতম। পরবর্তীকালে পাকিস্তান আমলে পুষ্প সোম (দত্ত), শান্তি সোম, বাসন্তী রায়, বেগম শামসুন্নাহার (বেলা আলী), শিপ্রা সেন, মালা চৌধুরী তোড়া চৌধুরী, লীনা ব্যানার্জি, ডাঃ আজিমুন্নেছা ইসলাম (পান্না ইসলাম), ডাঃ হোসনে আরা (হাসি),নূরজাহান বেগম, দেবী চক্রবর্তী, সুলতানা রেবু, রাবেয়া খাতুন (রীনা), তাপসী দাশগুপ্তা, অপর্ণা দাশগুপ্তা সার্থক শিল্পী হিসাবে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেন।

পেশাদার অভিনেত্রী লীলা ব্যানার্জি, আভা কর্মকার, আলো কর্মকার, আরতি চক্রবর্তী এক যুগ ধরে বরিশালের নাট্যাঙ্গনকে সজীব করে রেখেছেন। এঁরা সকলেই দক্ষ শিল্পী এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

যে সব অভিনেতা নারী চরিত্রে অংশগ্রহণ করে অশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন পরাণ মিঞা, অনন্ত পাল (এ পি), সুশীল সরখেল, শান্তি বসু, রুণু দত্ত, সুখরঞ্জন এদবড়, গোলাম মুর্তাজা (টুলু), সেকেন্দার মিঞা, বরুণ বর্মন, নির্মল দাশগুপ্ত, গৌরাঙ্গ সমাদ্দার ও সৈয়দ আলতাফ হোসেন প্রমুখ। এঁদের সুখ্যাতি আজও অম্লান আছে। ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বরিশাল যুব সংঘ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এই প্রতিষ্ঠান ২১শে ফেব্রুয়ারি এবং অন্যান্য জাতীয় দিবসে প্রতিবছর ভ্রাম্যমাণ 'ট্রাক ড্রামা' করে এসেছে। বরিশালে যুব সংঘ-ই প্রথম ভ্রাম্যমাণ 'ট্রাক ড্রামা'র প্রচলন করে। এ ড্রামাগুলোর সবই তাদের নিজস্ব রচনা। অধ্যাপক সাধন ঘোষ, আবু আল সাঈদ (নান্টু), অধ্যাপক রবীন সমাদ্দার ও মিন্টু বসু প্রমুখ নাট্যকার নাটিকাগুলো রচনা করেছেন। 'ট্রাক ড্রামা' ছাড়াও এই সংগঠন কয়েকটি নাটক সাফল্যের সাথে মঞ্চস্থ করেছে। তন্মধ্যে 'সাজাহান', 'জনান্তিক' ও 'পঞ্চরত্ন' অন্যতম। যুব সংঘ-এর স্থায়ী কার্যালয় বরিশাল সদর রোডে অবস্থিত ছিল। সংস্থার মূল সংগঠন ও পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম হচ্ছেন এস সি রায়, মিন্টু বসু, বলহরি সাহা, এনায়েত হোসেন মিলন ও নজরুল ইসলাম চুন্নু।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যুব সংঘের কর্মীরা ১৯৭২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি এবং প্রথম স্বাধীনতা দিবসে মিন্টু বসুর 'বিপ্লবের মৃত্যু নেই' ও সাধন ঘোষের 'আলোর পথযাত্রী' নাটক দুটি ট্রাকের উপর মঞ্চ তৈরি করে শহরের বিভিন্ন স্থানে মঞ্চায়ন করে। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত যুব সংঘের এই কার্যক্রম চলেছিল। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এ নাটক দুটির প্রায় শতাধিক প্রদর্শনী হয়েছে। ১৯৯৩ সালে 'বিপ্লবের মৃত্যু নেই' নাটকটি ইতালিতে মঞ্চস্থ হয়েছে এবং সেখানের নাট্যোৎসবে এওয়ার্ড পেয়েছে।

আবহ সংগীতে সুনীল বসু, পবিত্র বসু, সুখেন দে, বিনয় বসু (কালু), সত্যভূষণ সেন (সতুদা), ওস্তাদ সুরেন রায়, কাঞ্চন মিঞা, ওস্তাদ আলী হোসেন, বাসুদেব দাস, গোলাম মুর্তজা টুলু, তোফাজ্জল হোসেন, আবদুল ওয়াহেদ, আবুল আল সাঈদ (নান্টু) নাট্যাঙ্গনকে এক সময় মুখরিত করে রেখেছিলেন। সে আমলে বেহালাবাদক অমিয় সরকার, গিটারবাদক ললিত দাস এবং সেতার বাদক আবদুল হামিদ আবহসংগীতের তিন স্তম্ভ ছিলেন।

মঞ্চসজ্জায় ও আলোকসম্পাতে চাঁদসীর স্বর্গীয় জ্ঞানরঞ্জন বসু (কাকাবাবু), শহিদ পিনাকী বসু, জিয়াউদ্দিন আহমেদ, নরেন রায় চৌধুরী, আনোয়ার ফিরোজ যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন।

স্বর্গীয় জ্ঞানরঞ্জন বসু কলকাতার স্টার থিয়েটারের মঞ্চব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ছিলেন। এই অভিজ্ঞ শিল্পী পঞ্চাশের দশকে মঞ্চসজ্জা ও আলোকসজ্জার ক্ষেত্রে বরিশালে এক নতুন ধারা সৃষ্টি করেন।

নাট্যকার হিসেবে বি ডি হাবিবুল্লাহ সাহেবের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। নাট্যকার মিহির দত্তের আটখানা নাটক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। মিহির দত্ত লিখিত নাটক 'এরা কারা' ফণী চক্রবর্তীর পরিচালনায় ১৯৫৭ সালে টাউন হলে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। সমীর দত্ত দুটো নাট্যরূপ দিয়েছেন এবং চারখানা নাটক রচনা করেছেন। সমীর দত্ত রচিত 'হাসপাতাল' নাটকে দুজন আমেরিকান নাগরিক অংশগ্রহণ করেছেন। তালুকদার শাজাহান (মোসাররফ হোসেন শাজাহান) এর 'নীড় ভাঙ্গা ঝড়', ওয়াহেদ তালুকদারের 'আঁধারে আলো', আবদুল মাজেদ তালুকদারের 'বন্ধুর চরিত্র' এবং অধ্যক্ষ সাদ জগলুলের 'শিল্পীর মৃত্যু নেই' প্রভৃতি নাটক বরিশালে মঞ্চস্থ হয়েছে এবং মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এস আলী মোহাম্মদ ও আনোয়ারুল হক (কাঞ্চন)-এর 'মাটির এ খেলাঘরে' বেতার নাটক ঢাকা বেতারে অভিনীত হয়েছে। অরূপ তালুকদারের পাঁচখানা বেতার নাটক ঢাকা ও খুলনা বেতারে অভিনীত হয়েছে। এর মধ্যে 'পাথরের চোখ' সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছে। অধ্যাপিকা বন্দনা ইন্দুর দুটি বেতার নাটক খুলনা বেতারে অভিনীত হয়েছে। ষাটের দশকে ৫টি নাটিকার সমন্বয়ে প্রকাশিত 'গণনাটক' বরিশালে নাট্যরচনার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। নাটিকাগুলির রচয়িতা আবু আল সাঈদ (নান্টু), মিন্টু বাবু, সাধন ঘোষ ও অধ্যাপক রবীন সমাদ্দার, সমরেশ বসুর ছোটোগল্প 'আবর্ত' নাট্যরূপ দান করে মানবেন্দ্র বটব্যাল প্রশংসা অর্জন করেছেন।

১৯৭৮-এর নভেম্বরে জেলা শিল্পকলা পরিষদ আয়োজিত পক্ষকালব্যাপী নাট্যোৎসবের তথা নাট্য প্রতিযোগিতায় এইসব নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ও সফল নাটক মঞ্চায়ন নাট্যামোদীদের চমক লাগিয়েছে। এ প্রতিযোগিতায় জেলার সকল স্থান থেকে মোট আঠারোটি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে। বিচারকদের বিচারে চৈতালী নাট্য বিতানের 'দুইবোন', শব্দাবলী-র 'চারদিকে যুদ্ধ', বরিশাল নাটক-এর 'আবর্ত' যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। এ ছাড়া দর্শকদের মনে গভীর রেখাপাত করেছে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের 'অন্ধকারের নীচে সূর্য', খেয়ালির 'কবর', গৈলা শহিদ স্মৃতিসংঘের 'চোর', পিরোজপুর নাট্যচক্রের 'চোর চোর', পিরোজপুর রূপান্তর নাট্যগোষ্ঠীর 'এখন দুঃসময়', বরিশাল শিল্পীসংঘের 'সিঁড়ি', বরিশাল ঝংকার নাট্যগোষ্ঠীর 'শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ' এবং ছায়ানট শিল্পকলা একাডেমীর 'সুবচন নির্বাসনে'। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন চৈতালী-র সঙ্গীতা রায়। বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে গৈলা শহিদ স্মৃতি সংঘের শিশুশিল্পী সালাউদ্দিন পারভেজ। শ্রেষ্ঠ পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন শব্দাবলীর পরিচালক অধ্যাপক সাইদুল ইসলাম সাহেব।

জেলা শিল্পকলা পরিষদের নাট্যোৎসব বরিশালের নাট্যাঙ্গনে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা জেলা শিল্পকলা পরিষদের সভাপতি ও জেলা প্রশাসক জনাব এম এ আউয়াল এবং সাধারণ সম্পাদক এনায়েত পীর খান ও সহ-সাধারণ সম্পাদক নাট্যশিল্পী সুলতান আলম (নয়া মিঞা) এবং কার্যকরী পরিষদের সকল সদস্য বরিশালের নাট্যামোদীদের কাছে অসীম কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। এই উৎসবের মাধ্যমে বহু অপেশাদার নতুন নাট্যসংস্থা নব উদ্যমে এগিয়ে যাবার প্রেরণা পেয়েছে। দর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখার দর্শক সৃষ্টি হয়েছে।

চল্লিশের দশকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দলোনর প্রেক্ষিতে যে জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয়েছিল তার প্রতিফলন বরিশালের নাট্যাঙ্গনেও লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬২-এর গণ-আন্দোলন, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন বাংলাদেশে বাঙালি জাতীয়তাবোধ যে নতুন চেতনা জাগ্রত করেছিল, সেই চেতনা প্রগতিশীল নাট্য-আন্দোলনের গতিকে বেগবান করে তোলে। শত বাধাবিপত্তির মধ্যেও নাট্যকর্মীরা তাদের প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনাকে

সমুন্নত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নাট্যশিল্পীদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বরিশালের নাট্যকর্মীরা এ ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রগতিশীল নাট্য-আন্দোলনের এই ধারাকে আরও গতিশীল বেগবান করে দেয় '৭৮-এর বরিশাল জেলা নাট্যোৎসব। সেই থেকে বরিশালে নাটকের জয়যাত্রা চলছে। বরিশালের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এখন নাটকের প্রাধান্য সুস্পষ্ট। জাতীয় দিবসগুলোর অনুষ্ঠানমালা থেকে শুরু করে যে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এখন নাটকই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। বহু নাট্যগোষ্ঠী বরিশালের নাট্যাঙ্গনে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। দর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখার মতো দর্শকও বেশ কিছু সৃষ্টি হয়েছে। সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার নাটক মঞ্চায়ন এখন আর বরিশাল শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। শহরের গণ্ডি ছাড়িয়ে তা গ্রামগঞ্জেও প্রসার লাভ করেছে। শহর বা মফস্বলের কোনো নাট্যগোষ্ঠীই এখন আর শুধুমাত্র বিনোদনের জন্যই নাটক মঞ্চস্থ করে না। বরিশাল জেলায় এখন যেখানে যে নাট্যসংগঠনই নাটক করুক না কেন—সে নাটক সত্যিকার অর্থেই 'জীবনের কথা বলে'। জীবনধর্মী এসব নাটকে থাকে সমাজের বাস্তব চিত্র। সাম্প্রদায়িকতা, স্বৈরাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিটি নাটক এখন প্রতিবাদের ভাষায় মুখর। নাটকের ভাষা এখন অন্যায় ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের ভাষা। নাটকের এই প্রগতিশীল গতিধারায় ছোটোবড়ো সকল নাট্যসংগঠনই কমবেশি অবদান রেখে চলছে। নাট্যকর্ম এখন যথার্থভাবেই নাট্য-আন্দোলনের রূপ নিয়েছে।

বরিশালের বর্তমান নাট্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রে খেয়ালী গ্রুপ থিয়েটার-এর অবদানের কথা প্রথমেই এসে পড়ে। ১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থানের সংগ্রাম মুখর দিনে এ সংগঠনের জন্ম। এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা আকবর হোসেন একজন দক্ষ অভিনেতা এবং নির্দেশক। নিবেদিত প্রাণ এই নাট্যকর্মীকে আজীবন সদস্যপদ দিয়ে পুরস্কৃত করেছে খেয়ালী। তবে সাংগঠনিকভাবে তিনি খেয়ালীর সাথে সংশ্লিষ্ট না থাকলেও নাট্যক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছেন। ১৯৭৩ সালে খেয়ালী দর্শনীর বিনিময়ে নাটক প্রদর্শনী শুরু করে সৃজনশীল নাট্যধারার প্রবর্তন করে। খেয়ালীর বর্তমান সভাপতি মিন্টু বসু এবং সম্পাদক গোলাম মাসউদ বাবলু। সাবেক সভাপতি অধ্যাপিকা বেগম ফিরোজা এই সংগঠনের অন্যতম স্তম্ভ। খেয়ালীর উল্লেখযোগ্য নাট্য প্রযোজনা মুনীর চৌধুরীর 'কবর'। আল মনসুরের 'বিদায় মোনালিসা', আবদুল্লাহ আল-মামুনের 'সুবচন নির্বাসনে', 'এখন দুঃসময়' মমতাজউদ্দিন আহমদের 'স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা', 'ফলাফল নিম্নচাপ', 'হরিণ চিতা চিল'; সেলিম আল দীনের 'সংবাদ কার্টুন' ইত্যাদি। এ সব নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন আকবর হোসেন। তাঁর নির্দেশনায় খেয়ালী মোট ২৪টি নাটক মঞ্চায়ন করেছে। এ নাটকগুলো বরিশালের নাট্যআন্দোলনে নতুন দিক নির্দেশনা করেছে। '৮০-এর দশকের শেষ পর্যায়ে মীর মুজতব আলীর নির্দেশনায় খেয়ালী শেখ আকরাম আলীর 'লাশ চুয়াত্তর' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন' ও মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজরক্ত' ব্রেশ্‌টের 'হিম্মতবাঈ' মঞ্চস্থ করেছে। এগুলো বরিশালের অন্যতম সাড়াজাগানো নাটক। '৯০-এর শুরু থেকে খেয়ালীর নির্দেশকের দায়িত্ব পালন করেছেন নাট্যকার মিন্টু বসু। সমকালীন রাজনীতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রেক্ষিতে মিন্টু বসু রচিত ও নির্দেশিত নাটকগুলো গণসচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। এ নাটকগুলো হচ্ছে 'ঢোল' 'জনতা আর একবার' 'ঘাতক চারিদিকে' 'সরাইখানা' 'ইদানিং স্বদেশ' 'বোমাতঙ্ক' 'বুকের ভেতর জ্বলন্ত প্রতিবাদ' 'ভোটার বিদ্রোহ' 'গৌরব গাথা' ও 'ঐ মহামানব আসে'। নিজস্ব নাটক ছাড়াও মিন্টু বসু মামুনুর রশীদের 'ইবলিশ', শুভঙ্কর চক্রবর্তীর 'মড়া' হুমায়ুন আহমেদের '১৯৭১' প্রভৃতি নাটকের নির্দেশনা দিয়েছেন। খেয়ালীর অপর নির্দেশক এটিএম ফারুকও কয়েকটি নাটকে নির্দেশনা দান করে সুনাম অর্জন করেছেন। খেয়ালী ১৯৯৩-এ রজত জয়ন্তী উৎসব-সহ মোট পাঁচটি নাট্যোৎসব করে বরিশালের নাট্যআন্দোলনকে সমৃদ্ধ ও বেগবান করেছে। ২৫ বছর পূর্তির

রজত জয়ন্তীতে এ সংগঠনটি বিভিন্ন অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বরিশালের বিশিষ্ট আট ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করেছে। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা আকবর হোসেন তার মধ্যে অন্যতম। খেয়ালী তাদের উৎসবে ঢাকার আরণ্যক, নাট্যকেন্দ্র, লোকনাট্যদল, নাট্যচক্র, ভারতের লহরী নাট্যগোষ্ঠী, কুমিল্লার যাত্রিক প্রভৃতি সংগঠনকে বরিশালে এনেছে। খেয়ালীর সর্বশেষ প্রযোজনা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'তোতারাম', মিন্টু বসুর 'ঐ মহামানব আসে' ও 'এ লজ্জা কোথায় লুকাবো' খেয়ালী সম্প্রতি আবৃত্তি ও অভিনয় শিক্ষাকেন্দ্র চালু করেছে।

১৯৭৩ সালে দর্শনীর বিনিময়ে প্রথম নাটক মঞ্চস্থ করে খেয়ালী বরিশালের নাট্য-আন্দোলনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। উল্লেখ্য ১৯৭৩ সালে ঢাকার নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ও দর্শনীর বিনিময়ে নাটক শুরু করে নাট্য-আন্দোলনে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে। আধুনিক ব্যবস্থাপনা ও আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রেও খেয়ালী বরিশালে সর্বপ্রথম নতুন ধারার প্রবর্তন করেছে।

বরিশালের অন্যতম নাট্য সংগঠন বরিশাল নাটক। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৭৭ সাল। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বরিশালের অন্যতম সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক বদিউর রহমান এবং প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন জালাল (অ্যাডভোকেট)। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ সংগঠনের নেতৃত্বে আছেন নিখিল সেন, মানবেন্দ্র বটব্যাল, নারায়ণ সাহা, সাজেদা মতিন প্রমুখ সাংস্কৃতিক সংগঠক। বর্তমানে এই সংগঠনের সভাপতি নিখিল সেন এবং সম্পাদক আবুল হোসেন লাবু। প্রগতিশীল চিন্তা চেতনায় উজ্জীবিত সাংস্কৃতিক কর্মীদের উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণায় বরিশাল নাটকের জন্ম। সাম্য, মৈত্রী ও গণতান্ত্রিক চেতনায় সমুন্নত এ সংগঠন তার আদর্শ ও লক্ষ্য ভিত্তিক নাটক মঞ্চায়ন করে চলেছে। সমাজ সচেতনতা ও আন্দোলনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি এই সংগঠনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

বরিশাল নাটক প্রযোজিত নাট্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দচ্ছে—আবদুল্লাহ আল-মামুনের 'সুবচন নির্বাসনে', মানবেন্দ্র বটব্যাল কর্তৃক নাট্যরূপান্তরকৃত সমরেশ বসুর 'আবর্ত', মনোজ মিত্রের 'সাজানো বাগান', মামুনুর রশীদের 'ওরা কদম আলী', মমতাজউদ্দিন আহমেদের 'জমিদার দর্পণ', রতনকুমার ঘোষের 'ভোরের মিছিল' 'পিতামহদের উদ্দেশ্যে', রাধারমণ ঘোষের 'অথঃ স্বর্গ বিচিত্রা', মনোজ মিত্রের 'নরক গুলজার', সৈয়দ শামসুল হকের 'নূরলদীনের সারাজীবন' 'যুদ্ধ এবং যুদ্ধ', নাজমুল হোসেন আকাশের 'সখিনা' ও নাট্যরূপান্তরকৃত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু', শ্যামাকান্ত দাস লিখিত ও মানবেন্দ্র বটব্যাল কর্তৃক রূপান্তরকৃত 'আলীবাবার পাঁচালী' ইত্যাদি। এ ছাড়া বরিশাল নাটক তার সহযোগী সংগঠন উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর সাথে যে সব উল্লেখযোগ্য গীতিনাট্য মঞ্চস্থ করেছে তা হচ্ছে—'মহারাজার অনুপ্রবেশ' 'দিন বদলের পালা', 'ইতিহাস কথা কও' ইত্যাদি।

বরিশাল নাটকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামাজিক অনাচার, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোড়ামি, সাম্প্রদায়িকতা, শোষণ, দুর্নীতি আর মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে নাটকীয় শিল্পকর্মের মাধ্যমে সংগ্রাম। এই সংগঠনের নাট্য মঞ্চায়ন ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তাদের উদ্দেশ্য লক্ষ্যের প্রতিফলন ঘটে চলেছে।

বরিশাল নাটকের মুখ্য নাট্য নির্দেশক হচ্ছেন বরিশালের প্রবীণ নাট্যকর্মী নিখিল সেন। নির্দেশনার ক্ষেত্রে তিনি ছাড়া দক্ষ সংগঠক মানবেন্দ্র বটব্যাল ৩টি, বিপ্লব ঘোষ ৩টি ও মোস্তাফা কামাল জাহাঙ্গীর ১টি নাটকের সফল নির্দেশনা দান করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন।

বরিশাল নাটকের দুটি নাট্যোৎসব বরিশালের নাট্য-আন্দোলনকে গতিশীল করতে সহায়তা করেছে। বিশেষ করে প্রথম নাট্যোৎসবে পশ্চিমবাংলার ঐতিহ্যবাদী নাট্যসংগঠন বহুরূপীর আগমন এবং 'নবান্ন' ও 'কিনু কাহারের থ্যাটার' মঞ্চায়ন বরিশালের নাট্যামোদীদের প্রেরণার বিষয়বস্তু হয়ে রয়েছে।

বরিশাল নাটক, নাট্যকর্ম ছাড়াও ১৯৮১ সাল থেকে একটি আবৃত্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করে

আসছে। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৭০০ ছাত্রছাত্রী আবৃত্তি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। বিগত ৩০শে ও ৩১শে জানুয়ারি বরিশাল নাটক পরিচালিত আবৃত্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যুগপূর্তি উৎসব বিপুল সমারোহে সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের কর্মকর্তাদের মতে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিই বাংলাদেশের প্রথম আবৃত্তি প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের অনেক ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন সময়ে জাতীয় প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পেয়েছে এবং নানাভাবে পুরস্কৃত হয়েছে।

বরিশালের নাট্য অঙ্গনের অন্যতম শক্তিশালী ও ঐতিহ্যবাহী সংগঠন শব্দাবলী গ্রুপ থিয়েটার। ১৯৭৮ সালে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বছরই জেলা নাট্য উৎসবে তারা তাদের প্রথম নাটক আবদুল্লাহ আল-মামুনের 'চারিদিকে যুদ্ধ' মঞ্চস্থ করে। প্রথম মঞ্চায়নই শব্দাবলী আলো ও মঞ্চের নতুনত্ব ও উন্নতমানের কলাকৌশল প্রয়োগ করে আলোড়নের সৃষ্টি করে। শব্দাবলী তার জন্মলগ্ন থেকেই নাট্য দর্শকদের চেতনা জাগ্রত করার জন্য শিল্পসম্মত ও প্রগতিশীল বক্তব্য প্রধান নাটক মঞ্চায়ন করে চলেছে। নাটকের দর্শক সৃষ্টিতে শব্দাবলীর কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি। শব্দাবলীর প্রতিটি নাটকে দর্শকের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি সংগঠনের সুদৃঢ়তার স্বাক্ষর বহন করে। শব্দাবলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক আবদুল হাই এবং প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন হুমায়ুন কবীর সেলিম। এই দুজনেই দক্ষ সংগঠক ছিলেন এবং এক বছরের মধ্যেই সংগঠনটিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

শব্দাবলীর মঞ্চসফল নাটকগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে—আবদুল্লাহ আল-মামুনের 'চারিদিকে যুদ্ধ' মনোজ মিত্রের 'চাকভাঙা মধু' ও 'মেষ ও রাক্ষস' সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' ও 'প্যাটের বিষ', মমতাজউদ্দিন আহমদের 'ক্ষতবিক্ষত', মামুনুর রশীদের 'নীলা' শাহনেওয়াজের 'দিন বদলের পালা' 'সবে শুরু' 'বাহান্নর চিঠি' ও 'লালচর' সৈয়দ দুলালের 'যুদ্ধ হবে আবার' 'জীবন্ত পোস্টার' 'একাত্তর এবং ইত্যাদি' সঞ্জীব বড়ুয়া রচিত ও দীপঙ্কর চক্রবর্তী কর্তৃক রূপান্তরকৃত 'বাজলো রাজার বারোটা', ফরহাদ মাহমুদের 'হনুমানের দেশে', মলিয়রের 'তিনি মুক্তিদাতা' ইত্যাদি।

শব্দাবলী বর্তমানে নাটকের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে এবং ধর্মব্যবসায়ী ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী ভূমিকা রাখছে। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জাগ্রত রাখতেও শব্দাবলী সদা সচেষ্ট।

শব্দাবলীর নাটকগুলোর নির্দেশক হিসেবে যাঁরা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক সাইখুল ইসলাম, অধ্যাপক আলমগীর হাই, শাহনেওয়াজ ও সৈয়দ দুলাল উল্লেখযোগ্য। শব্দাবলীর বর্তমান সভাপতি সৈয়দ দুলাল ও সাধারণ সম্পাদক গিয়াসুদ্দিন আহমেদ সাংগঠনিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তৎপরতার পরিচয় দিয়ে চলেছেন।

বরিশালের নাট্যাঙ্গনে শব্দাবলী গ্রুপ থিয়েটারর সবচেয়ে বড়ো অবদান তাদের নিজস্ব স্টুডিও থিয়েটার নির্মাণ। ১৯৮৮ সালের ৫ই মে শব্দাবলী প্রথম থিয়েটার গঠন করে। এ ব্যাপারে মূল উদ্যোক্তা ছিলেন সংগঠনের তৎকালীন নির্দেশক ও বর্তমান সভাপতি সৈয়দ দুলাল। উদ্বোধনী দিন থেকেই সাঈদ আহমেদের 'তৃষ্ণায়' নাটকটির মহড়া শুরু হয়। কিন্তু এই স্টুডিও থিয়েটারের মূল উদ্যোক্তা ও নাটকটির নির্দেশক সৈয়দ দুলাল ব্যবসায়িক কাজে জাপান যাওয়ায় নাটকটি আর মঞ্চস্থ হয়নি। তবে স্টুডিও থিয়েটার মঞ্চে ঠিকমত নাটকের মহড়া চলেছিল। ১৯৯১ সালে সৈয়দ দুলাল দেশে ফিরে ঐ বছরই শব্দাবলীর ৯০টি আসন বিশিষ্ট স্টুডিও থিয়েটারের উদ্বোধন করেন। তার নির্দেশনায় সেদিন স্টুডিও মঞ্চে মনোজ মিত্রের 'মেষ ও রাক্ষস' মঞ্চস্থ হয়। সেই থেকে শব্দাবলীর স্টুডিও থিয়েটার মঞ্চে প্রতি শুক্রবার, বর্তমানে প্রতি সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। সময়,

তারিখ ও বাস্তবতার আলোকে শব্দাবলী স্টুডিও থিয়েটারকেই বাংলাদেশের প্রথম স্টুডিও থিয়েটার বলা হয়। বাংলাদেশের নাট্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রে শব্দাবলীর এই সার্থক পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে বরিশালের গৌরবের বিষয়।

আশির দশকে বরিশালের আরও বেশ কয়েকটি শক্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠেছে। ১৯৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় কীর্তনখোলা থিয়েটার। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি গোলাম ছালেক ও সম্পাদক শওকত হোসন হিরণ। সংগঠনটি ইতিমধ্যেই আটটি নাটকের সফল প্রযোজনা করে ছাব্বিশটি প্রদর্শনী করেছে। বর্তমানে সিরাজ হায়দারের 'যুগে যুগে আবদুল' নাটকের প্রদর্শনী চলছে। সংগঠনটি বরিশাল শহরের গণ্ডি অতিক্রম করে গ্রামাঞ্চলেও তাদের কর্মকাণ্ড প্রসারিত করেছে। নাটক মঞ্চায়ন ছাড়াও নিয়মিত আবৃত্তি চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে এবং অনিয়মিত সাহিত্য পত্রিকা 'কীর্তনখোলা' প্রকাশ করেছে। নাট্যশিল্পী এস এম জামান বর্তমানে এই সংগঠনের নির্দেশকের দায়িত্ব পালন করছেন।

১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে নাট্য ও সংস্কৃতি চর্চা বিষয়ক সংগঠন পঞ্চসিঁড়ি শিল্পীসংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আলমগীর হোসেন ও সম্পাদক আলী হাসান। এই সংগঠন আজ পর্যন্ত কুড়িটি নাটকের প্রযোজনা করে মোট ৩৫টি প্রদর্শনী করেছে।

পঞ্চসিঁড়ির নির্দেশক খলিলুর রহমান ফারুক বরিশালের গৌরবচারণ কবি মুকুন্দ দাসের উপর নাটক রচনা করেন এবং তাঁর নির্দেশনায় নাটকটির সফল মঞ্চায়ন করে সর্বত্র প্রশংসিত হন। সংগঠন একটি অনিয়মিত সাহিত্য সংকলন প্রকাশ করে থাকে। পরে এ সংগঠনের নাম হয় পঞ্চসিঁড়ি গ্রুপ থিয়েটার।

১৯৮৯ সালের জুন মাসে সরকারি ব্রজমোহন কলেজের কয়েকজন তাজা তরুণ ছাত্রছাত্রী উত্তরণ নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি খান হেমায়েতউদ্দিন ও সম্পাদক আজমল হোসেন লাবু। এই সাংস্কৃতিক সংগঠনটি ব্রজমোহন কলেজ এবং কলেজের বাইরে প্রতিনিয়ত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। সংগঠন আবদুল্লাহ আল মামুনের 'তোমরাই' এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-র উপন্যাস অবসম্বনে নজমুল হোসেন আকাশ নাট্যরূপকৃত নাটক 'লালসালু'র সফল মঞ্চায়ন করেছে—এছাড়া সংগঠনের নিজস্ব লেখক মিন্টুকুমার করের রচনা ও গ্রন্থনায় 'লড়াই, লড়াই' গীতিআলেখ্যটি ইতিমধ্যে তিনবার মঞ্চস্থ হয়েছে। উত্তরণের নাটক ও আলেখ্য অনুষ্ঠানগুলোর নির্দেশনা দিয়েছেন আজমল হোসেন লাবু, মিন্টুকুমার কর, বাসুদেব ঘোষ, সারা তৈফুর রিয়া প্রমুখ। নতুন নাট্যশিল্পী ও প্রগতিবাদী সংস্কৃতিকর্মী সৃষ্টিতে উত্তরণের অবদান উল্লেখযোগ্য। উত্তরণ সৃষ্টির লগ্ন থেকেই বরিশালের সংস্কৃতিক্ষেত্রের উত্তরণ ঘটিয়ে চলেছে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে সভাপতি বাসুদেব ঘোষ এবং সাধারণ সম্পাদক জহিরউদ্দীন মোঃ বাবর। তাঁরা উভয়ই ব্রজমোহন কলেজের ছাত্র। তাঁদের সাথে সাথে আছে চেতনাদীপ্ত এক ঝাঁক ছাত্রছাত্রী সংস্কৃতিকর্মী।

১৯৮৯ সালের জুন মাসে ব্রজমাহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের কতিপয় সংস্কৃতিমনা ছাত্রছাত্রী ব্রজমোহন থিয়েটার সংক্ষেপে 'ব্রথি'র প্রতিষ্ঠা করে। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী ফেরদৌসী বেগম চামেলী ও সম্পাদক শ্যামল সেনগুপ্ত। প্রতিষ্ঠানটি স্বল্পকালের মধ্যেই বরিশালের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছে। ব্রজমোহন থিয়েটারের প্রযোজনা সংখ্যা ১০ এবং প্রদর্শনী সংখ্যা ৩৭টি। ব্রজমোহন কলেজের ছাত্রছাত্রীরাই এর অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং পরিচালক। তরুণ-তরুণীদের দ্বারা অভিনীত নাটকগুলোর মান যথেষ্ট উন্নত। ব্রজমোহন থিয়েটার নিয়মিতভাবে আবৃত্তি চর্চা করছে এবং সংগঠনটি বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের সদস্য। সুশৃঙ্খল ও স্বচ্ছ চেতনাবাদী এই সংগঠনটি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মী সৃষ্টিতে যথার্থ অবদান রেখে চলেছে।

১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে প্রজন্ম নাট্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনটির আহ্বায়ক ছিলেন শিবনাথ মণ্ডল। প্রথম সভাপতি আবদুস ছাবির খান সেলিম ও সম্পাদক আফজালুল করিম অ্যাডভোকেট। মাত্র দেড় বছরের মধ্যেই সংগঠনটি চারটি সফল প্রযোজনার ৩৫টি প্রদর্শনী করেছে। প্রজন্ম নাট্যকেন্দ্র একটি আবৃত্তি ও নাট্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনেব প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। মূলত প্রতিভাবান তরুণ শিল্পীরাই এ সংগঠনটি পরিচালনা করছে।

১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে বরিশালে চন্দ্রদ্বীপ থিয়েটার নামে একটি সম্ভাবনাময় নাট্যসংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রবীণ নাট্যশিল্পী এনায়েত পীর (অ্যাডভোকেট) সম্পাদক আবদুল সোহাবান বাচ্চু। সংগঠনটি ইতিমধ্যেই দুটি নাটকের সফল প্রযোজনা করে ৪টি প্রদর্শনী করেছে।

১৯৮৫-তে প্রতিষ্ঠিত বরিশাল থিয়েটার বরিশালের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশে গ্রাম থিয়েটারের সহযোগী সংগঠন হিসেবে এই সংগঠনটি গ্রাম এলাকায় তাদের কর্মকাণ্ড বিস্তৃত করে চলেছে। সকল জাতীয় দিবসে সাফল্যের সাথে নিত্য নতুন নাটক মঞ্চস্থ করে এই সংগঠনটি জননন্দিত হয়েছে। সংগঠনটির কর্মকর্তা, শিল্পী ও কর্মীবৃন্দ প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ। বরিশালের নাট্যাঙ্গনে এদের কর্মকাণ্ড আরও প্রসার লাভ করবে, মিজানুর রহমান আজাদকে আহ্বায়ক করে বরিশাল থিয়েটারের প্রথম আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়। এ পর্যন্ত তাদের মোট প্রযোজনার সংখ্যা ১৮ এবং মোট নাটকের প্রদর্শনীর সংখ্যা ২০৬। ১৯৮৮ সালে বরিশাল থিয়েটারে উদ্যোগে প্রথম নাট্যোৎসব এবং ১৯৮৯ সালে দ্বিতীয় নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া ১৯৯৩ সালে প্রথম পথ-নাট্যোৎসব এবং ১৯৯৪ সালে দ্বিতীয় পথ-নাট্যোৎসবের আয়োজন করা হয়। এতে বরিশালের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাট্য-সংগঠনগুলো অংশগ্রহণ করে। ১৯৮৮-তে নাট্যোৎসবে ঢাকা থিয়েটার এবং ১৯৮৯-র নাট্যোৎসবে ঢাকা পদাতিক অংশগ্রহণ করে।

১৯৯২, '৯৩ ও '৯৪ সালে অশ্বিনীকুমার হলে বরিশাল থিয়েটারের উদ্যোগে সাহিত্য প্রতিযোগিতা, প্রকাশনা উৎসব ও বইমেলার আয়োজন করা হয়। ১৯৯৪ সালের ২৯শে মার্চ স্বরূপকাঠি থিয়েটার আয়োজিত নাট্যোৎসবে বরিশাল থিয়েটার অংশগ্রহণ করে। ১৯৯৪ সালের ১১ই এপ্রিল 'উন্নয়ন উৎসবে ভোলা' শীর্ষক অনুষ্ঠানে নাটক মঞ্চায়ন করা হয়।

শব্দাবলীর স্টুডিও থিয়েটার আওতায় বরিশাল থিয়েটার শুভঙ্কর চক্রবর্তী রচিত 'ক্রোধ' নাটকের ৭টি প্রদর্শনী মঞ্চস্থ করে। বরিশাল থিয়েটারের সম্পাদক ও নির্দেশক শুভঙ্কর চক্রবর্তী বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলার সমন্বয়ে গঠিত শেরে বাংলা অঞ্চলের সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করছেন।

৭০ দশক থেকে পদক্ষেপ নাট্য সংগঠন বরিশালের নাট্যজগতে অবদান রেখে আসছে। এ ছাড়া ছায়ানট গণশিল্পী সংস্থা ও লেখক শিবির একসময় উন্নতমানের প্রগতিশীল নাটক মঞ্চস্থ করে নাট্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে।

বরিশাল শেরে বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের প্রতিষ্ঠিত 'শে বা চি ম নাটক' উন্নতমানের নাটক পরিবেশন করে চলেছে।

বিগত দেড় শতাব্দী ধরে বাঙালির ইতিহাস সাম্রাজ্যবাদ, স্বৈরাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস। এই সংগ্রামে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, তরুণ ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে বাংলার নাট্যকর্মীরাও একাত্ম হয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে।

নাট্যকর্মীদের মূল হাতিয়ার নাটক সমরাস্ত্রের চেয়েও শাণিত ছিল। এ কারণেই ব্রিটিশ আমলে এসেছিল 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন'। স্বাধীন বাংলাদেশেও এ আইনটি বাতিল হয়নি। এ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, সবচেয়ে শক্তিশালী লোকশিল্প নাটককে সব সরকারই ভীতির চোখে দেখেছে। কিন্তু

স্বাধীন বাংলাদেশের সচেতন নাট্যকর্মীরা বর্তমানে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের তোয়াক্কা না করে শোষণ, নিপীড়ন, স্বৈরাচার, ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সাহসী বক্তব্য রেখে চলেছে। সমতার ভিত্তিতে একটি সুখী, সুন্দর ও গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলাই নাট্যকর্মীদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। এবং অতীতের এই ঐতিহ্যের ধারাকে অক্ষুণ্ন ও অম্লান রেখে আগামী দিনগুলোতে তারা তাদের কর্তব্য পালন করে যাবে এ আশাবাদ নিঃসন্দেহে ব্যক্ত করা যায়। বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের চিন্তা-চেতনা ও সাধনার মধ্য দিয়ে বরিশালের নাট্যশিল্প আরও উন্নত, মার্জিত ও বেগবান হোক এটাই সকলের একান্ত কাম্য।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
২. বাংলাদেশেব নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, সুকুমার বিশ্বাস।
৩ বরিশালের ইতিহাস।
৪. বাকেরগঞ্জ জেলার ইতিহাস।মো. সাইফউদ্দিন।

তথ্য সরবরাহে :

১ সত্যভূষণ সেন (প্রযাত)
২ এস. আলী মোহাম্মদ।
৩. গোলাম রসুল পরান।
৪. আশরাফ আলী খান চৌধুরী।
৫. দৈনিক আজকের বার্তা পত্রিকায় মিণ্টু বসু লিখিত প্রতিবেদন—
'স্বাধীনতা পরবর্তী বরিশালের সাংস্কৃতিক আন্দোলন'।

রাজশাহীর নাট্যাঙ্গন ও তফাজ্জল হোসেন

মোহাম্মদ তালেবর আলী

কোত্থেকে শুরু করব ভাবছি। কারণ পরিচয় তো এক-আধদিনের নয়—দীর্ঘ সাড়ে চার দশকের পরিচয়। সেটা ১৯৪৮ সাল। নিউ স্টার ড্রামাটিক ক্লাব তখন রাজশাহী শহরের একমাত্র জীবন্ত ক্লাব। তারই ব্যানারে কী একটা নাটকের স্টেজ রিহার্সল হচ্ছিল অলকা রঙ্গমঞ্চে। সেখানেই পরিচয়। আগে শুনেছিলাম জনৈক তফাজ্জল হোসেন রানীনগর মুসলিম ড্রামাটিক ক্লাবের একটি নাটক পরিচালনা করছে।

দেখা হল পরে। প্রথম আলাপেই বোঝা গেল শুধু নাটকেই নয়, একেবারে নাটক পাগল। শুনলাম পশ্চিমবঙ্গের নাট্য পরিবেশের সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত। সেখানকার দিকপাল বহু নাট্য ব্যাক্তিত্বের অভিনয় তিনি দেখেছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ কয়েকদিনের মধ্যেই 'আপনি' থেকে 'তুই'তে নেমে এল। এ সময়টা হল নিউ স্টার ড্রামাটিক ক্লাবের অস্তমিত হওয়ার কাল। নিউ স্টার ভেঙে গেল নানা কারণে। তফাজ্জল হোসেনকে দল নিয়ে নতুনভাবে গড়ে তুললাম শহরস্থ টিকাপাড়া-বোসপাড়ার সঙ্গমস্থলে ফ্রেন্ডস্ ড্রামাটিক ক্লাব । কিন্তু পাড়ার লোকদের অসহযোগিতায় কিছুদিনের মধ্যেই ওখান থেকে হটতে হল। সেই সময় ঘোড়ামারা নিবাসী শ্রীহরিগোপাল রায়, সোনামণি ভাদুড়ী প্রমুখ কিছু নাট্যানুরাগী ব্যক্তি আমাদের টেনে নিল ওদের ঘুমিয়ে থাকা ঘোড়ামারা ড্রামাটিক ক্লাবটিকে পুনরায় জাগিয়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে। হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো আমরা যেন সেই আমন্ত্রণ লুফে নিলাম। এটা সম্ভবত ১৯৫০ সালের প্রথম দিকে। সেই থেকে নতুনভাবে শুরু হল আমাদের অভিযাত্রা। তফাজ্জল হোসেন হলেন স্থায়ী পরিচালক। তাঁরই নেতৃত্বে একের পর এক নাটক করে যেতে লাগলাম আমাদের নিজস্ব মহিলা শিল্পীদের নিয়ে। একমাত্র ঘোড়ামারা ড্রামাটিক ক্লাবই তখন ভদ্র পরিবার থেকে সংগৃহীত মহিলা শিল্পী নিয়ে নাটক করে।

বলতে ভুলে গেছি— নিউ স্টার ড্রামাটিক ক্লাব ভেঙে যাওয়ার পর আমরা গড়ে তুলি রাজশাহীর বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা, রাজশাহী কেন্দ্রীয় নাট্য সমিতি। উদ্দেশ্য এ অঞ্চলে নাট্যসংস্কৃতির মানোন্নয়ন, নাটক বাছাই হল 'কেদার রায়'। পরিচালনায় ছিলেন বিভাগপূর্বযুগের খ্যাতিমান নাট্যপরিচালক শ্রীঅনিলবন্ধু রায় ওরফে নাড়ুবাবু। এই নাটকের অন্যতম প্রধান এবং জটিলতম চরিত্র 'শ্রীমন্ত'র ভূমিকায় অভিনয় করেন তফাজ্জল হোসেন। তাঁর অভিনয় এতই সুন্দর ও যথাযথ হয়েছিল যা তাঁকে রাতারাতি খ্যাতির উচ্চশিখরে তুলে দেয়। রাজশাহী কেন্দ্রীয় নাট্য সমিতি মাত্র দুখানা নাটক—একখানা 'কেদার রায়', অন্যটি 'সাজাহান' মঞ্চায়ন করেই অস্তিত্বহীন হয়।

যাই হোক ঘোড়ামারা এগিয়ে চলে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। 'সাজাহান', 'সিরাজদ্দৌলা', 'টিপু সুলতান', 'পথের শেষে', 'মোগল-পাঠান', 'পলাশীর পরে', 'মহারাজ নন্দকুমার', 'বিশ বছর আগে', 'মাটির ঘর', 'এরাও মানুষ', 'মায়ামৃগ', 'উল্কা' প্রভৃতি নাটক সফল মঞ্চায়নের মাধ্যমে রাজশাহীর মানুষকে উদ্‌বেল করে তুলল। এবং প্রায় সব নাটকেরই পরিচালক ছিলন তফাজ্জল হোসেন। তিনি অভিনয়ও করতেন। তবে অভিনয়ের চেয়ে পরিচালনা করতেই তিনি বেশি ভালোবাসতেন।

তফাজ্জল হোসেন শুধু সফল পরিচালকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন, স্রষ্টা এবং শিল্পী গড়ার কারিগর। তাঁর হাতে তৈরি এমন অনেক শিল্পী আছেন—যাঁরা রাজধানীসহ দেশের অনেক স্থানে আজও তাদের অভিনয়শৈলী দিয়ে প্রয়াত গুরুর কীর্তির স্মারক হয়ে বিরাজ করছেন।

তফাজ্জল হোসেনের তত্ত্বাবধানে যে ইউনিটটি ১৯৫০ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত ঘোড়ামারার ব্যানারে নাট্যাভিনয় করে গেছে, তা রাজশাহীর ইতিহাসে কেবল অভূতপূর্বই নয়, এটা ছিল রাজশাহীতে নাট্যচর্চার একটা স্বর্ণযুগ। নাসিরুদ্দিন আহমেদ, ডাঃ গোলাম রাব্বানী, নৃপেন লাহিড়ী, হরিগোপাল রায়, নিত্যানন্দ রায়, সোনামণি ভাদুড়ী, নিয়াজউদ্দিন আহমেদ, মধুসূদন রায়, নির্মল পাল চৌধুরী, মোঃ কামারুজ্জামান প্রভৃতির মতো রাজশাহীর সেরা সেরা শিল্পীদের একত্র করে ঘোড়ামারাকে একটা পূর্ণ অবয়ব দান করার কৃতিত্বও তফাজ্জল হোসেনের। কারণ তফাজ্জল হোসেনের প্রতিভার স্পর্শে সব শিল্পীই উজ্জল হয়ে উঠেছেন তাঁদের নিজ নিজ অভিনয় দীপ্তিতে।

অভিনয়ের আকর্ষণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কলকাতা থেকে আনা হল মহিলা শিল্পী। তফাজ্জল হোসেনের হাতে পড়ে তাঁদের অভিনয় প্রতিভা হয়ে উঠল উজ্জ্বল। প্রতিটি মঞ্চায়ন হয়ে উঠল প্রশংসাধন্য। রাজশাহীর মতো একটা মফস্বল শহরের একজন অখ্যাত পরিচালকের পরিচালন দক্ষতা দেখে তারা হয়ে উঠল বিস্মিত। ভিনদেশি এক গুরুর প্রতি তাঁরা জানালেন আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

এভাবেই তফাজ্জল হোসেনের নাট্যচর্চা এগিয়ে চলল আরও কিছুদিন ঘোড়ামারার ব্যানারে। এর মধ্যে নিজস্ব সংস্থাগত নাট্যানুষ্ঠান ছাড়াও অনেক সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের বড়ো বড়ো অনুষ্ঠানও তাঁকে করতে হয়েছে ব্যবস্থাপনা-প্রধান হয়ে।

১৯৫৬ সালে গঠিত হল পাকিস্তান আর্টস কাউন্সিল। সেই সময়কার জেলা প্রশাসক—নাট্য ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ অনুরাগী জনাব কে এম শামসুর রহমান ডাক দিলেন সকল স্তরের নাট্য ও সঙ্গীত সংস্থাসমূহকে আর্টস কাউন্সিলে যোগ দিয়ে এর মাধ্যমে দেশের শিল্প ও সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে। তাঁর আন্তরিক আহ্বানে অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে ঘোড়ামারা ড্রামাটিক ক্লাব ও সদলবলে তার যাবতীয় মঞ্চসজ্জার সামগ্রী ও সরঞ্জামসহ আর্টস কাউন্সিলে যোগদান করে। এরপর থেকে আর্টস কাউন্সিলের উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং সর্বোপরি রাজশাহীতে একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ সম্বলিত প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে আমরা সমবেতভাবে উদ্যোগী হই। জেলা প্রশাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তফাজ্জল হোসেনের নেতৃত্বে আমরা একটা নাট্যদল নিয়ে সফর করি রাজশাহীর চারটি মহকুমা শহরে—সদর, নাটোর, নবাবগঞ্জ, নওগাঁ এবং নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে প্রচুর অর্থসংগ্রহ করি। এই অর্থ দিয়ে আমরা ক্রয় করি রানীবাজারস্থিত একটি বিরাট দ্বিতল বাড়িসহ এক বিঘার সম্পত্তি। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, রাজশাহীর শিল্পীদের ক্ষরিত স্বেদ ও রক্তের বিনিময়ে কেনা হল যে সম্পত্তিটি, জনাব কে এম শামসুর রহমানের পরের তৃতীয় জেলা প্রশাসক মহোদয় (পদাধিকার বলে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান) আমাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও কিছু স্বার্থান্বেষী এবং সংস্কৃতি বিরোধী ব্যক্তির যোগসাজসে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গোপন টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রি করে দেন। রাজশাহীতে শিল্পীদের নিজস্ব একটা প্রেক্ষাগৃহ লাভের যে স্বপ্ন তাঁরা দেখেছিলেন কতকগুলো বিকৃত রুচির মানুষের নোংরা চক্রান্তে তা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। এর ফলে রাজশাহীর শিল্প-সংস্কৃতি, বিশেষ করে নাট্যসংস্কৃতির যে ক্ষতি হল তার ক্ষতিপূরণ আজ দীর্ঘ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরেও সম্ভব হল না। এর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তারও অন্যতম নেতা ছিলেন তফাজ্জল হোসেন।

আর্টস কাউন্সিল ভেঙে গেল। নাটক-পাগল আমরা কজন মা-বাপহারার মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলাম এখানে ওখানে। শেষে ঠাঁই একটা পেলাম। আহমেদ হোসেন চৌধুরী নামক অন্য এক ব্যক্তির খেয়ালে গড়ে উঠল খেয়ালী সংঘ নামে একটি নতুন সংস্থা আলুপট্টির মোড়ের একটা ঘরে। জুটলাম সবাই—আমি, তফাজ্জল হোসেন, ডাঃ গোলাম রাব্বানী, মির্জা আবদুল গণি, আহমেদ হোসেন চৌধুরী প্রভৃতি। নাটকও হল কয়েকটি তফাজ্জল হোসেনের পরিচালনায়। বেশ নামও হল। কিন্তু ওই—যা হবার তা-ই হল। বছর দুয়েকের মধ্যে এও নিস্তেজ হয়ে পড়ল।

শুরু হল স্বাধীনতাযুদ্ধ। প্রায় একটি বছর কেটে গেল একটা উত্তেজনার মধ্যে। যুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত পরিবেশে যে নাট্যসংস্থাটি প্রথম মাথা তুলল, তা হল—রাজশাহী সাংস্কৃতিক সংঘ। তফাজ্জল হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে যোগ দিলাম এই সংঘে। সংঘ-সচিব মোঃ আমানুল্লাহ এবং অন্যান্য সদস্য সাদরে গ্রহণ করলেন আমাদের। নাটক মঞ্চস্থ হতে লাগল। নতুনের সঙ্গে পুরানোর রাখীবন্ধনে নতুন প্রত্যাশা জন্ম নিল। ইচ্ছার জয় হল। সকলের সমবেত চেষ্টায় গড়ে উঠল একটা ৩০০ আসনবিশিষ্ট মিনি রঙ্গমঞ্চ-কাম-প্রেক্ষাগৃহ। নাম 'পদ্মা'। গড়ে উঠল একটা সঙ্গীত-নৃত্য-নাট্য বিদ্যালয়, একটা নাট্যগ্রন্থ সংগ্রহশালা। প্রচণ্ড প্রাণশক্তির তাগিদে নিবেদিতপ্রাণ শিল্পীরা নিজস্ব গণ্ডির বাইরে ছড়িয়ে পড়লেন দেশের বিভিন্ন স্থানে, যথা—ঢাকা, ময়মনসিংহ, রংপুর, বগুড়া, নওগাঁ প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত নাট্য-প্রতিযোগিতায় এবং নাট্যোৎসবে অংশগ্রহণ করতে। সঙ্গে জীবন্ত প্রেরণা, তাঁদের গুরু, মাস্টার তফাজ্জল হোসেন। জয়ী হয়েছেন—লাভ করেছেন পুরস্কার ও সম্মান।

শুধু রাজশাহী সাংস্কৃতিক সংঘেরই নয়। সুদীর্ঘ সাড়ে চার দশক ধরে রাজশাহীর সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তার সাংস্কৃতিক অস্তিত্বে মাস্টার তফাজ্জল হোসেন যেন একাকার হয়েছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় হয়তো আমরা বুঝিনি। আজ আমরা বুঝছি। তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি দিতে গিয়ে তাঁকে আমরা সংবর্ধিত করেছি, সম্মানিত করেছি—'মাস্টার' উপাধিতে ভূষিত করে আজ থেকে ২৪ বছর আগে।

যেমন মঞ্চে তেমনি অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভা সমভাবে প্রদীপ্ত। রাজশাহীতে বেতারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আদিকাল থেকেই তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী ও প্রযোজক। তিনি এত বড়ো মাপের শিল্পী ছিলেন যে, তাঁর প্রতিভার পরিমাপ করা এত স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। নাটককে তিনি কতখানি ভালোবাসতেন এবং তার গভীরতা কতটুকু তা জানা যাবে ছোট্ট একটা ঘটনা থেকে। এলাকা মঞ্চে নাটক হচ্ছে ঘোড়ামারার ব্যানারে। পূর্ণ-প্রেক্ষাগৃহ। তফাজ্জল হোসেন উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে 'প্রমট' করছেন। হঠাৎ খবর এল তাঁর ছেলে মারা গেছে। ওঁকে জানানো হল। একবার। দুবার। তিনি শুনলেন। কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন না। যখন তাঁকে গায়ে ধাক্কা দিয়ে জানানো হল, তখন কেবল বার্তা বাহকের দিকে একবার চেয়ে বললেন, 'ঠিক আছে লাশ গোরস্তানে নিয়ে যাও আমি একটু পরে আসছি।'

দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে তাঁর সঙ্গে আমি মিশেছি। বহুভাবে তাঁকে দেখেছি। ছোট্টোখাট্টো-আপনভোলা-পাগলাটে ধরনের এই মানুষটির কী আছে। না বেশ-ভূষার পারিপাট্য, না আছে রূপ-লাবণ্যের চাকচিক্য। মাদকতাহীন-সাদামাটা একটা অতি সাধারণ মানুষ। তবুও যেন তাঁকে দেখে মাঝে মাঝে আমার হিংসা হত। এই মানুষের মধ্যে এই প্রতিভা। অনন্য সাধারণ প্রতিভার মালিক এই মানুষ। আমি অবাক হতেম আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমি অনেক দেখেছি। বহু অভিনেতাকে দেখেছি, দেখেছি অনেক নাট্য পরিচালককে। কিন্তু তফাজ্জল হোসেনের মতো প্রতিভাধর নাট্য-পরিচালক আমার চোখে কমই পড়েছে। এ দেশে সত্যিকারের গুণী ব্যক্তির মূল্যায়ন হয় না। হলে অনেক আগেই তফাজ্জল হোসেনকে চেনা যেত তাঁর জীবদ্দশায়। এই দীর্ঘদিন ধরে একসাথে কাটিয়েছি। নাটকের চরিত্র বণ্টন নিয়ে, চরিত্রের নাট্যায়ন বোধ নিয়ে, নাটক নির্বাচন প্রভৃতি বহু বিষয় নিয়ে তর্কাতর্কি হয়েছে, মতান্তর হয়েছে, রাগারাগিও হয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। পরক্ষণেই আবার যেমনকার তেমনি। নাটকের বাইরেও তাঁর অন্য একটা রূপ ছিল। পারিবারিক পরিবেশে তিনি ছিলেন প্রেমময় স্বামী, স্নেহময় পিতা এবং কর্তব্যপরায়ণ গৃহস্বামী। বাইরে ছিলেন পরোপকারী, বন্ধুবৎসল, সুবক্তা এবং সুরসিক একজন নিটোল ভদ্রলোক। আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শুধু বন্ধুত্বের নয়। তিনি ছিলেন আমার ভাই, আমার গুরু। যতদিন বেঁচেছিলেন বুঝিনি। আজ তিনি নেই আজ মর্মে মর্মে বুঝছি তফাজ্জল হোসেন আমাদের কে ছিলেন।

নাট্য আন্দোলনে রঙপুর

কাজী মহম্মদ এহিয়া আশুতোষ দত্ত

বাংলা মঞ্চনাটকের ক্রমবিবর্তনের ধারাবাহিকতা থেকে রঙপুর নাট্যাঙ্গনের অবস্থান ব্যতিক্রমী কোনো ঘটনা নয়, বরং বলাই চলে মঞ্চনাটকের দুশো বছরের ইতিবৃত্তের অংশমাত্র। আর তাই রঙপুরের নাট্য আন্দোলনের ইতিকথা বিবৃত করতে গেলে বিগত শতাব্দীর গোড়ার কথা এসেই পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও আমাদের কোনো মঞ্চ ছিল না। বাংলা মঞ্চনাটকের অস্তিত্বও ছিল না। ইংরাজের দু'টি মঞ্চ ছিল, দি প্লে হাউস ও দি ক্যালকাটা থিয়েটার বাঙালি নব্য-শিক্ষিত ও ইংরেজভক্ত সামন্ত শ্রেণি সে নাটক দেখতেন। তাদের বদ্ধমূল ধারণা বাংলা ভাষার নাট্যরচনা ও নাট্যাভিনয় বাঙালির দ্বারা আদৌ সম্ভব না।

এরূপ হীনমন্যতাবোধ ও আত্মশ্লাঘা শিক্ষিত ও ইংরাজানুগতদের চেতনার প্রতিক্রিয়া না জাগলেও আঘাত হেনেছিল এক বিদেশি পর্যটকের অনুভূতিতে। এ বিদেশি ছিলেন একজন রাশিয়ান। নাম হেরাসিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদেফ্। ২৫ নং ডোমতলা-(অধুনা এজরা স্ট্রিট) বেঙ্গলি থিয়েটার মঞ্চস্থাপন করেন। বাঙালি কুশীলব সমন্বয়ে ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২ ডিসেম্বর নাটক মঞ্চস্থ করান।

অবশেষে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে আমরা প্রাপ্ত হই মৌলিক বাংলা মঞ্চনাটক। আর সে নাটকের সূতিকাগার আমাদের এই রঙপুরেই। এ জেলার কুন্ডি পরগনার না জমিদার কালীচন্দ্ররায় চৌধুরী 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নামে একখানি বাংলা মঞ্চনাটক প্রণয়ন উল্লেখ করে ৫০টাকা পুরস্কার লাভের ঘোষণা দিয়ে 'রঙ্গপুর বার্তাবহ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় ১২৬০ বঙ্গাব্দের ৬ কার্তিক বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর রামনারায়ণ তর্করত্ন সে নাটক লিখে শ্রেষ্টত্ব প্রমাণ করে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা পাথুরিয়া চড়কডাঙ্গা-জয়রাম বসাকের বাড়িতে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক অভিনীত হয়েছিল। অতঃপর বাংলা মঞ্চনাটকে ঘটেছিল মণিকাঞ্চন যোগ। একই সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন - নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র এবং মহানট গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর বড়োলাট লর্ড নর্থব্রুক অধ্যাদেশ আইনে স্বাক্ষর দান করেন। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন মাথায় করেই গিরিশচন্দ্র স্থায়ীভাবে মঞ্চে আসেন। পরবর্তীতেও প্রজন্ম পরম্পরায় সে শাস্তি মাথায় করে চলতে হয়েছিল নাট্যদলকে। আমাদের দুশো বছরের নাট্যধারার পথ পরিক্রমা কুসুম কোমল ছিল না। ভাঙতে হয়েছিল অনেক চড়াই-উৎরাই। দেশের দুর্ভেদ্য অঞ্চলেও ধাওয়া করত অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন। পুলিশি জুলুমের অন্ত ছিল না। যখন তখন বন্ধ হয়েছে অভিনয়। নাট্যকর্মীদের হয়রানির জন্য থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বারবার। পাকিস্তান আমলে এ অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে সবচেয়ে বেশি। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক দিয়ে উদ্বোধন ঘটেছিল জাতীয় রঙ্গমঞ্চের; তা থেকে মাত্র ১৩ বছর অন্তর অর্থাৎ ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে রঙপুরে স্থাপিত হয়েছিল রঙপুর ড্রামাটিক এসোসিয়েশন 'আরডি এ' আরও সংক্ষেপে 'নাট্যসমাজ'। নাট্যসমাজের দল ছিল ঘর ছিলনা। ছিল না স্থায়ী ঠিকানা। পাড়ায় পাড়ায় অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে সখের নাটক করত। কে দেবে তাদের জমি, কে জোগাবে রসদ? কী ভাবে নির্মিত হবে নাট্যমঞ্চ? সে যুগে ছোটো চাকুরি করেও যারা প্রশাসনে ক্ষমতাধর ছিলেন তাঁরা ইংরেজ শাসক ও অনুগ্রহপ্রার্থীদের মধ্যে সেতুবন্ধের ভূমিকা পালন করতেন। আর এ কারণেই তাঁরা ছিলেন উভয় পক্ষের স্নেহাস্পদ। ছোটো চাকুরির কেরানির চাকুরি অবস্থায় অনেক সুবিধে গ্রহণ করলেও, ক্রীড়া কিংবা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের কাজে তাঁরা বেশ পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

তদানীন্তন বাংলা দেশে এমন কী ভারতের বহু স্থানে বাঙালি কেরানিরা টাউন ক্লাব ও নাট্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এ কথা অনস্বীকার্য।

রঙপুর টাউন ক্লাব (অধুনা টেবিল টেনিস ক্লাব) রঙপুর টাউন হল এবং সর্বোপরি রাজা রামমোহন ক্লাব কেরানিকুলের নিঃস্বার্থ অবদানের উজ্জ্বল নিদর্শন। রঙপুর নাট্যসমাজ তথা টাউন হল-এর প্রতিষ্ঠাতা কেরানিরাই করেছিলেন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা কালেক্টর ছিলেন মিঃ ফ্রান্সিস হেনরি স্ক্রাইন আই সি এস। সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই রঙপুর জেলার মর্যাদা ছিল প্রথম শ্রেণির! উচ্চপদে আসীন থাকতেন আই সি এস, আই পি এস ইংরেজ অফিসার। মিঃ স্ক্রাইন যেমন ছিলেন কড়া মেজাজের অফিসার তেমনি শিষ্টস্বভাব ও সংস্কৃতিমনা। একদিন তাঁর স্টাফরা এসে ধরে। বলেন, তাদের একটি নাট্যদল আছে ; কিন্তু নাট্যমঞ্চ নেই। নাট্যমঞ্চের জন্য একখণ্ড ভূমি চাই। প্রস্তাবটি স্ক্রাইন সাহেবের মনে ধরে। একটি প্রথম শ্রেণির শহর অথচ বিনোদনের জন্য স্থান নেই। চেষ্টা করব বলে তিনি তাদের বিদায় করেন। এখন যেখানে টাউন হল ওইখানে নির্মাণাধীন অবস্থায় ছিল কৈলাশরঞ্জন হাইস্কুল। কাকিনার রাজা মহিমারঞ্জন রায় প্রয়াত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৈলাশরঞ্জন রায়য়ের স্মৃতি রক্ষার্থে স্কুলগৃহনির্মাণের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। দায়িত্বভার দিয়েছিলেন মিঃ স্ক্রাইনকে। একদিন সুযোগমত মিঃ স্ক্রাইন রাজা বাহাদুরকে রঙপুরে একটি রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের যৌক্তিকতার কথা বলেন। রাজা বাহাদুর তখনই নির্মিয়মান স্কুল গৃহটি রঙ্গমঞ্চ করার অনুমতি দেন। স্কুলগৃহ অন্যত্র নির্মাণের কথা বলেন। করেও ছিলেন। নাট্যসমাজ ওই ভিতের ওপর খড়ের চালাঘর তুলে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে মাইকেলেব 'শর্মিষ্ঠা' দিয়ে শুভ উদ্বোধন করে। সেই সময় থেকে গণনা করলে নাট্যসমাজের শতবর্ষ পূরণ হয়েছে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে আগুন লেগে খড়ের প্রেক্ষাগৃহ পুড়ে ছারখার হয়। দরবার বসে পাকা দালান নির্মাণের। কিন্তু গোল বাধে মালিকানা স্বত্ব নিয়ে। প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ড। উত্তর প্রান্ত এলাকায় চিড়িয়াখানার প্রাচীর, দক্ষিণে স্টেশন রোড, পূর্বে এখনকার রঙপুর হাইস্কুলের রাস্তা, পশ্চিমে পুলিশ লাইনের পার্শ্বস্থ হনুমানতলা রাস্তা বরাবর বিশাল জায়গা। লালায়িত ব্যক্তির অনটন সে আমলে কম ছিল না। ধন্ধ উঠেছিল জমির প্রকৃত মালিককে নিয়ে। রঙপুর ড্রামাটিক অ্যাসোসিয়েশন না, জেলা প্রশাসক? রাজা মহিমারঞ্জন ভূমিখণ্ড দান করেছিলেন রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের জন্যে রঙপুর ড্রামাটিক অ্যাসোসিয়েশনকে, এটা স্পষ্ট উল্লেখ আছে দলিলে। অথচ দলিল সম্পাদন করেছিলেন জেলা প্রশাসক মিঃ ফ্রান্সিস হেনরি স্ক্রাইন এর নামে। রঙপুর জজ কোর্টে টাইটেল স্যুট মামলা রুজু হয়। নিস্পত্তি হয় না। মামলা ট্রান্সফার হয় কলকাতা হাইকোর্টে। অবশেষে আপসনামা হয়। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫ আগস্ট ২৪৩৫ নং দলিলে এভাবে নিষ্পত্তিনামা সম্পাদিত হয়। দলিলে স্বাক্ষর দান করেছিলেন সরকার পক্ষের রাষ্ট্রসচিব। আর আরডি-এর পক্ষে তাদের সভাপতি ও সম্পাদক। সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা এরূপ হয়েছিল— প্রেক্ষাগৃহের নাম হবে রঙপুর টাউন হল। মালিকানা স্বত্ব উভয় পক্ষের। অডিটোরিয়াম ইন্সটিটিউট ও টেনিস লনের দায়িত্ব বর্তাবে টাউন হল কমিটির উপর। বাকি সবটা থাকবে আরডি-এর পরিচালনাধীন। অডিটোরিয়াম টাউন হলের মালিকানাধীন থাকলেও তা ব্যবহার করবে নাট্যসমাজ। ব্যবসায়িক দায়-দায়িত্ব তাদের। লাভ লোকসানের ভাগিদার টাউন হল কমিটি হবে না। খাজনা ও ট্যাক্স ইত্যাদির পরিশোধনীয় কাজ নাট্যসমাজের। অডিটোরিয়ামের পূর্বাংশের বড়ো হলরুমটির নাম হবে রঙপুর ইন্সটিটিউট। সেটি ব্যবহৃত হবে নাইট ক্লাবরূপে। খেলাধুলা করবে টাউন হল কমিটি ও আরডি-এর সভ্যরা। ইনডোর গেম ছাড়াও তাদের একটি টেনিস লন ছিল। রোজ বিকালে সভ্যরা খেলাধুলা করতেন।

অডিটোবিয়াম টাউন হলের অধীনে থাকলেও তা ব্যবহার করবে নাট্যসমাজ। একটি বিধিনিষেধ এ ক্ষেত্রে অরোপিত ছিল-নাট্যসমাজ নিজেরা নাটক করবে। বাইরের কোনো নাট্যদলকে ভাড়ায়

নাট্যাভিনয় করতে দিতে পারবে ; কিন্তু কখনো, নাট্য কোম্পানি, যাত্রা, ম্যাজিক এবং কার্নিভ্যাল দলকে ভাড়া বা লিজ দিতে পারবে না। নিয়মভঙ্গ করলে সে ক্ষেত্রে টাউন হল কর্তৃপক্ষ ও এক্স-অফিসিও জেলা প্রশাসক অডিটোরিয়ামের দখলি-স্বত্ব নিজেদের অধিকারে নিতে পারবে। নিস্পত্তির পর অনেকে বছর অতিবাহিত হয়। কিন্তু নকশা মোতাবেক অট্টালিকা নির্মাণ শুরু হয় না। নির্মাণ ব্যয় টাউন হল বহন করবে না বিধায় দায়ভার নাট্যসমাজের। নির্মাণ কাজ চলে শম্বুক গতিতে। হঠাৎ টাকার সংস্থান হয়। তখন পুলিশ লাইন ছিল এখানকার জেলা পরিষদ ডাকবাংলোর পুরাতন ভবনের পূর্বাংশে। শহরে লোকবৃদ্ধির কারণে ওখানে পুলিশ লাইন রাখা সমীচীন নয় বিধায় স্বরাষ্ট্র বিভাগ বর্তমান পুলিশ লাইনের বিশাল অংশ মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করে। পূর্বাংশ গ্রহণ করে সাহিত্য পরিষৎ ও রঙপুর পাবলিক লাইব্রেরি। সাহিত্য পরিষদ অধুনা জাদুঘরের পেটে। আর্থিক সঙ্কট মুক্ত হলে টাউন হলের নির্মাণ কার্য দ্রুততর হয়। আজকের টাউন হলের অবস্থা দেখে অতীত যৌবন অনুমান করা কঠিন। অথচ একদিন তার বর্ণাঢ্য অতীত ছিল।

এ অট্টালিকা গথিক ভাস্কর্যে নির্মিত। মূল অট্টালিকার প্রধান ফটক দক্ষিণাংশের সমুখে ছিল রেলিংঘেরা গোলাকৃতি বাগিচা। নয়নাভিরাম পুষ্প সমাহার। মাঝ বরাবর নাতিদীর্ঘ বাঁধা প্লাটফর্ম। রোজ বিকালে সেখানে আরডি-এর কনসার্ট পার্টি বাদ্য বাদন করত। বাদকবৃন্দ সবাই ছিলেন অবৈতনিক। বেশিরভাগ জমিদারনন্দন। বাগানের পূর্বপ্রান্তে উত্তর-দক্ষিণ লম্বা টেনিস লন ছিল। সম্মুখের বাগান পরিবৃত করে একটি ৮ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, খোয়ার ওপর সুড়কি বিছানো। সোজা গিয়ে মিশেছিল স্টেশন রোডে। সীমান্ত প্রকাণ্ড ফটক। পাহারারত থাকত আরডি এ'র দারোয়ান। পথের দুপাশে সারিসারি কৃষ্ণচূড়া গাছ লাল থোকা থোকা ফুলের অপরূপ সমাহারে নান্দনিক শোভা বাড়াত।

আরডি-এ রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হয়েছিল কলকাতার রঙমহলের অনুকৃতিতে। রঙমহলের স্টেজ ম্যানেজার রঙপুরে এসেছিলেন। তাঁর নির্দেশ উপদেশে সজ্জিত হয়েছিল আরডি-এর মঞ্চসয্যা। প্রোসেনিয়াম, উইংগস্, স্কাই, দৃশ্যপট, ড্রপসিন সবই নির্মিত হয়েছিল রঙমহলের আদলে। এমনকী ড্রপসিন ওঠা-নামার কায়দাটিও নির্দিষ্ট হয়েছিল রঙমহলের ট্যাবলো সিস্টেমের অনুকরণে। স্টেজের বাইরে প্রোসিনিয়াম-এর দুই পার্শ্বে অর্ধগোলাকৃতি দুটি দেওয়াল ঘেরা ফাঁকা জায়গা আজও আছে। ওটা ব্যবহৃত হত অভিনয় রাতে। কনসার্ট পার্টির বাদকবৃন্দ সে রাতে প্রত্যেকে রয়াল ড্রেস পরিধান করে দুপাশে বসে বাদ্যবাদন করতেন। মঞ্চের উপরের বাঁশের ব্যবহার হত পৌরাণিক নাটকে। অপ্সরী উড়ে যাবার দৃশ্য, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের দৃশ্য ইত্যাদি দেখাতে ওটা 'ট্রিকস্'-এর কাজ করত। মঞ্চের মাঝ বরাবর স্থানটি কাষ্ঠনির্মিত। পশ্চাৎভাগে পাতাল প্রবেশের ব্যবস্থা ছিল। শিশিরকুমার ভাদুড়ী যেবার রঙপুর 'সীতা' নাটক করতে এসেছিলেন, পাটাতনের নিচে পাতালপুরীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সীতা অদৃশ্য হলে দর্শক অবাক বিস্ময়ে প্রচুর হাততালি দিতেন। মঞ্চের দক্ষিণ পার্শ্বে দোতলায় ওঠার একটা সিঁড়ি ছিল। সেখানে ছিল লম্বালম্বি কাঠের পাটাতন। অভিনয় রজনীতে দোতলায় ওঠা নিয়ম ছিল না। তখন সিফটাররা ওখানে দাঁড়িয়ে পর্দা ওঠানো নামানোর কাজ করত। লাইটম্যান আলোর প্রয়োজনীয় প্রক্ষেপণ করতেন। দোতলায় মেইন গেটের ওপরে চিলে কোঠামতো যে ঘরটি আজও নজরে পড়ে ওটা ছিল কনসার্ট পার্টির রেওয়াজের ঘর। ভারতের শ্রেষ্ঠ ক্লারিওনেট বাদক তুলসী লাহিড়ীর অনুজ গোপাল লাহিড়ী ঐ ঘরে প্রতিসন্ধ্যায় রেওয়াজ করতেন। ঐ ঘরে তাঁর একখানি বাঁধানো ছবি ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত ঝুলন্ত ছিল। চিলকোঠার লাগোয়া পশ্চিমাংশের স্বল্প পরিসর ঘরটি ছিল টাউন হল তথা আরডি-এর লাইব্রেরি ঘর। ৪/৫টি আলমারি ভর্তি ছিল নাটক, নাট্য ইতিহাস, অভিনয় সংক্রান্ত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক-মাসিক পত্রিকা। হাতে লেখা অজস্র পাণ্ডুলিপি। নাটক, কবিতা, সাহিত্য, এমন কী চর্যাপদ আমলের বহু লেখা। কবিবর সাহিত্যরত্ন ফজলুল করিম

সাহেবের লেখাও সংগৃহীত ছিল। একটি আলমারিতে সংরক্ষিত ছিল আরডিএ ও টাউন হল-এর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলপত্র। মেঝেতে বস্তাবন্দি পড়ে থাকত অজস্র হ্যান্ডবিল। সে আমলে আজকের মতো মাইকের ব্যবহার ছিল না। মুখে বড়ো চোঙ লাগিয়ে দরাজ কণ্ঠে নাটকের ঘোষণা ও হ্যান্ডবিল বিতরণ করা হত।

হ্যান্ডবিলে লেখা থাকত অভিনীত নাটকের নাম, পাত্রপাত্রী (কাস্টিং) দিন-ক্ষণ, তারিখ ইত্যাদি। মঞ্চের উত্তরাংশে লাগোয়া ঘরটি গ্রিনরুম। ঘরের উত্তর-দেওয়ালে সাঁটা ছিল বেলজিয়াম গ্লাসের বড়ো-মাঝারি ও ছোটো সাইজের আয়না। একাধিক মেকআপ টেবিল। পূর্বাংশে এখন যেখানে টিউবওয়েল ওখানে থাকত ময়ূর সিংহাসন। দরজার দক্ষিণাংশে ছিল মাঝারি সাইজ পিয়োনা। এখন যে স্থানটি বরাদ্দ হয়েছে-মেয়েদের বসন বদলের ঘর তখন ওটা ছিল ফাঁকা। সোফাসেটে সাজানো। অভিনেতারা ওখানে মেকআপ নিয়ে বসে বিশ্রাম করতেন। অনেক আগে ছিল টানা পাখার ব্যবস্থা, পরে ইলেকট্রিক ফ্যান ঝুলেছিল।

এখন যেটা টয়লেট ওটা ছিল তখন আরডিএ-র স্টোররুম। ৪/৫টা বড়ো বড়ো স্টিল ট্রাঙ্ক ভর্তি ছিল নানাধরনের শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট ও কুচলি (পয়োধর-সে আমলে পুরুশ মেয়ে সাজতো)। ছিল নানাপ্রকার উইগ। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সাধু, শঠ, টিকিআলা ব্রাক্ষ্মণ, ভেকধারী দরবেশ, নানা জাতীয় পরচুলা, দাঁড়ি-গোঁফ। ছিল শ'খানেক রয়াল ড্রেস (রাজকীয় পোশাক)। পিওর স্টিল মেড খাপসহ তরবারি ছিল প্রায় পঞ্চাশটি। আরও ছিল জরির কাজ করা ৩০/৪০ জোড়া নাগড়ার জুতো। মূল অট্টালিকা থেকে উত্তর প্রান্তে খালি জায়গায় পূর্ব পশ্চিম লম্বা দোচালা টিনের যে ঘরটি আজও প্রত্যক্ষগোচর ওটা ছিল আরডিএর রিহার্সাল রুম (মহড়া ঘর) পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে ছিল নাট্যসমাজের কিচেন। তখন রিহার্সাল রুমের একটি মাত্র দরজা ছিল। দক্ষিণ দিকে একাধিক জানালা ছিল-সম্ভবত উত্তর পার্শ্বে ছিল না। দেওয়াল ঘেঁষে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে সারিসারি আমলের চেয়ার। মাঝপথে গালিচা বিছানো। পূর্বপ্রান্তে অনেকটা জায়গা ফাঁকা। একপাশে নাট্য পরিচালকের বসার আসন। মেঝেয় আঁকা সাংকেতিক আঁকিবুকি। পরিচালকের নির্দেশনাবলী শিল্পীদের বোধগম্যতার নিমিত্ত। পূর্ব দেওয়ালের বাইরে ছিল একটি পানীয় জলের ইঁদারা, পাশে একটি দেশি কুলগাছ।

রঙপুর ইন্সটিটিউশনের পূর্বদিকের রুমটি বিলিয়ার্ড খেলার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হত। এখন যেটি গণগ্রন্থাগার, ওটা ছিল পার্কিং প্লেস। মোটর, ফিটন, এক্কা গাড়ি এসে দাঁড়াত। ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ির দাঁড়াবার অনুমতি ছিল না। যাত্রী নামিয়ে দিয়ে চলে যেত হত। দাঁড়িযে থাকত সদর গেটের বাইরে।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত হয় আরডি-এর প্রশাসনিক গঠনতন্ত্র। তবে এটা ঠিক আমরা আজ যত সহজে নাট্য আন্দোলনের কথা বলি, নাটককে সমাজ বদলের হাতিয়ার বলে ঘোষণা দিই ৭০/৮০ বছর আগে তা ছিল ভ্রান্তবিলাস মাত্র। রাজতন্ত্র, সামন্ত্রতন্ত্রের মতো অচলায়তন বাধা ডিঙিয়ে বিনোদনকে গণতন্ত্রায়ন করার সুযোগ খুব কমই ছিল। তবে এ কথা ঠিক আরডিএ-র গঠনতন্ত্র তার অপমৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ছিল নাট্যসমাজের স্বর্ণযুগ। রঙপুরের নাট্যভূমি, প্রায় একসাথে জন্ম দিয়েছিল একাধিক নাট্যপ্রতিভা, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : তিতুন মুন্সী (রাধারমণ মুন্সী), প্রবোধচন্দ্র মুখার্জি, ললিতচন্দ্র প্রামানিক, কাজী মুহম্মদ ইলিয়াস, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, তুলসী লাহিড়ী সহ আরও অনেক।

কলকাতা থেকে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী রঙপুর এসেছিলেন তাঁর 'সীতা' নিয়ে। এখানে আসার আগে সীতা ট্রুপসহ নাট্যাচার্য আমেরিকা গিয়েছিলেন। 'সীতা' রঙপুর মঞ্চে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। পক্ষান্তরে ঘটেছিল এক মর্মস্পর্শী বিয়োগান্ত কাহিনি। 'সীতা' রূপিণী প্রভাবতী দেবীর কন্যা

রমা এ সময় অকস্মাৎ এখানে মৃত্যুবরণ করেছিল। তাঁর সৎকার করা হয়েছিল রঙপুর মহাশ্মশানে। সেইখানে কংক্রিট স্ল্যাবে লেখা ছিল 'রমা মা ঘুমোয়'। ২০/২৫ বছর আগেও তা অক্ষুণ্ণ ছিল এখন অদৃশ্য। প্রভাদেবীর মানসিক অবস্থা বিবেচনায় এনে নাট্যাচার্য ঐ রাতে নাট্যাভিনয় বন্ধ ঘোষণার আলোচনা করতেই সদ্য কন্যাহারা মা গুরুর পা জড়িয়ে ধরে আকুতি জানিয়েছিলেন, 'নাটক বন্ধ করো না, আমি মরেই যাব'। সে রাতে শিশিরকুমার মঞ্চে দাঁড়িয়ে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, অভিনেত্রীদের আপনারা ঘৃণা করেন। সীতা ভালো লাগলেও প্রভাবতী আপনাদের কাছে অচ্ছুৎ। কিন্তু তার চেয়ে ব্যথার কিছুমাত্র ভিন্নতা নেই। সেও তো একজন মা। কন্যা শোকাতুরা মায়ের চোখের জল আপনাদেরই মতোই নোনা। প্রবোধ মুখার্জিকে নাট্যাচার্য বলেছিলেন 'To day's acting she is best of the best' সীতার অভিনয় বিশেষ করে নাট্যাচার্যের 'রাম' কাজী মহম্মদ ইলিয়াসকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। তিনি 'রাম' অভিনয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নাট্যসমাজ কাস্টিং শেষ করে।

বাইরে গোঁড়া হিন্দুরা এ নিয়ে ভীষণ প্রতিবাদ মুখর হয়। তবে কাজী ইলিয়াসের 'রাম'-এর ভূমিকায় অভিনয় সাবলীল হয়েছিল। রঙপুর নাট্যসমাজ অসংখ্য নাট্যাভিনয় করেছিল। শরৎচন্দ্রের অমর উপন্যাস 'দত্তা'র নাট্যরূপ দিয়েছিলেন প্রবোধচন্দ্র মুখার্জি। পরিচালনা করেছিলেন কাজী মহম্মদ ইলিয়াস। ভূমিকালিপি ছিল এরূপ- নরেন প্রবোধচন্দ্র মুখার্জি, বিলাস- কাজী মহম্মদ ইলিয়াস, রাসবিহারী-জিতেন চক্রবর্তী ও বিজয়ার ভূমিকা করেছিলেন ললিতচন্দ্র প্রামাণিক। নাট্যসমাজের অন্যতম হিট নাটক 'দত্তা' বহু রজনী অভিনীত হয়েছে। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সে সময়ে ছিলেন প্রাদেশিক জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি। সংগঠন সংক্রান্ত কাজে রঙপুর এসেছিলেন। সাথে ছিলেন সুভাষ বসু ও জে এম সেনগুপ্ত।

নাট্যসমাজ লেখককে এত কাছে পেয়ে 'দত্তা' অভিনয়ের আয়োজন করে। কিন্তু সবাইকে নিরাশ করে শরৎবাবু জানান, তিনি নাটক দেখবেন না। বিস্ময়ে হতবাক সবাই। লেখক তাঁর নিজের উপন্যাস ভিত্তিক নাট্যরূপ দেখবেন না, এ যে অসম্ভব কথা। শরৎবাবু সবার মনোভাব অনুমান করতে পেরে নিজেই জবাবদিহি করে বলেন, 'দেখ বাপু, ইতঃপূর্বে আমার একাধিক উপন্যাসের নাট্যরূপ দেখেছি। সবাই মিলে আমারা সৃষ্টিকে হত্যা করেছে। তোমরাই বল, নিজের সৃষ্টির অপমৃত্যু স্বচক্ষে দেখতে ভালো লাগে কারো ? সুভাষ বসু নাট্যসমাজের পক্ষে অনেক সুপারিশ করলে কথাশিল্পী কথা দেন, একটি মাত্র দৃশ্য দেখে চলে আসব-রাজি? অগত্যা! আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল, ডেক চেয়ার, পান-দোক্তা, গড়গড়া কাশীর সুগন্ধী তামাক। যথাসময় শরৎবাবুকে নিয়ে সুভাষ বসু এলেন, জে এম সেনগুপ্ত আসেননি। নাটক শুরু হয়েছে। দৃশ্য এগিয়ে চলেছে। শরৎবাবু ডেকচেয়ারে সোজা হয়ে বসেছেন। হাতে নল ধরা, টানছেন না। বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখ দু'টি মঞ্চে নিবদ্ধ। দৃশ্য শেষ। সবার মন খারাপ, এবার কথাশিল্পী চলে যাবেন। সুভাষ বসু ছুটে এসে বলেন, 'স্টার্ট সেকেন্ড সিন— শরৎবাবু নাটক দেখবেন।' দৃশ্যের পর দৃশ্য গড়িয়ে চলে, শরৎবাবু ঠায় বসে। তামাকদার নিয়মিত কল্কের পর কল্কে পাল্টায়। এক সময় নাটক শেষ হয়। শরৎবাবু ছুটে মঞ্চে আসেন, দর্শকদের বলেন, এরা আমাকে কি দেখালে? সমস্ত রাত উঠতে দিলে না। আশ্চর্য! আপন মনে বেরিয়ে যেতেই নজরে পড়ে বিজয়াকে। কাছে গিয়ে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন, মা লক্ষ্মী জীবনে আরও উন্নতি করো। সবাই হেসে ওঠে। একজন বলেন, উনি বাবা লক্ষ্মী। শরৎবাবু নিজেও হেসে ফেলেন, সুভাষ বসু, জে এম সেনগুপ্তকে ঘরে ফিরে বলেছিলেন, ভালো জিনিস মিস্ করলেন মিঃ সেনগুপ্ত You won't get it at Calcutta. They are class by themselves.

কাজী মহম্মদ ইলিয়াস বলেছিলেন, পরদিন সকালে আমরা ক-জন মিলে গিয়েছিলাম টেপা-

জমিদার বাড়ি (এখন যেটা সোনালী ব্যাঙ্ক)। কথাশিল্পী খুব সমাদর করে আমাদের বসিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বলেছিলেন। ললিতবাবুকে দেখে আবারও মিষ্টি করে হেসে বলেছিলেন, আমার বিজয়াকে তুমি মূর্ত করেছ। প্রবোধ মুখার্জিকে বলেছিলেন-নরেন যে একটা কেন্দ্রীয় চরিত্র হতে পারে লেখার সময় তা আমার ভাবনায় আসেইনি। আমি তিন ব্রাহ্ম চরিত্র, বিজয়া, রাসবিহারী আর বিলাস বিহারীকে নিয়েই দত্তাকে টেনে নিয়েছি, তুমি আমার ধারণাই পাল্টে দিয়েছ। কাজী মহম্মদ ইলিয়াসকে বলেছিলেন, আমার বিলাস তোমার মতো দীর্ঘদেহী নয়, স্থূলাঙ্গ। কিন্তু তোমার অভিনয় আমাকে সে বিচারের সুযোগই দেয়নি, মনে হয়েছে হাতে চাবুক নিয়ে সবাইকে তুমি দাবড়ে বেড়ালে। বিদায়কালে শরৎবাবু প্রবোধ মুখার্জিকে বুকের কাছটিতে টেনে নিয়ে বলেছিলেন- তুমি আমার সব গল্প উপন্যাসের নাট্যরূপ দিও কেবল, ছাপিও না। শুরু থেকে আরডিএ-র সভ্যতালিকায় অলিখিত একটি কনভেনশন চালু হয়েছিল। শিল্পী সভ্যরা অভিনয় করতেন। অ-শিল্পী সভ্যগণ অ্যাডমিনিস্টেশন পরিচালনা করতেন। কিন্তু আরিডএ-র সভ্যতালিকাভূক্তি হওয়াটাই ছিল অতিশয় কঠিন ব্যাপার। পাকিস্তান আমলে তা হয়ে উঠেছিল সু-কঠিন। তিরিশেব দশকের মধ্যভাগে কতিপয় নাট্যশিল্পী জরুরি হওয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন, গিরিন ঘোষ, কাজী মহম্মদ ইউনুস, অরুণ চক্রবর্তী, অরুণ সেন, সুরেন্দ্রলাল রায়, কাজী মহম্মদ এহিয়া, বিমল ভট্টাচার্য (বড়), অমল সান্যাল, যগলকিশোর বণিক, লালু মৈত্র, অমিয় সেন ও কাদেরিয়া প্রেসের মালিক শামসউদ্দিন মিঞা। পঁচিশের দশক থেকে চল্লিশের দশকের মধ্যবর্তী অর্থাৎ দেশভাগের আগ পর্যন্ত টাউন হল রঙ্গমঞ্চে আরডিএ প্রযোজিত এইসব নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল: 'চিরকুমার সভা' 'মহানিশা', 'বলিদান', 'প্রফুল্ল', 'শাজাহান', 'ব্যাপিকা বিদা', 'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদশী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'সিরাজদৌল্লা', 'য্যায়সা কা ত্যায়সা','কর্ণার্জুন', 'দত্তা', 'মানময়ী গার্লস স্কুল', 'মায়ের প্রাণ', 'ছেঁড়াতার' ইত্যাদি। শরৎবাবুর 'দত্তা'-র নাট্যরূপ প্রবোধ মুখার্জি যেমন অবিস্মরণীয় অনুরূপভাবে তাঁরই দেয়া নাট্যরূপ পল্লীসমাজে রমেশের ভূমিকায় আবল বজল তুলিপ অতুলনীয়।

বাংলাদেশের সর্বত্র যে নাটকের একাধিকবার অভিনয় হয়েছিল তার নাম 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল'। রচিয়তা রঙপুরের কৃতী সন্তান রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (রবি মৈত্র)। একাধিকবার নাটকের অভিনয় হয়েছিল। আর হয়েছিল তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার'। রবি মৈত্র অপরিণত বয়সে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি সম্ভবত একমাত্র নাট্যকার যাঁর 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' দ্বাদশ সংস্করণের শিরোপা লাভে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল। স্টার থিয়েটার মধ্যে আর্ট থিয়েটার ক'''' প্রথম অভিনয় রজনী ১১পৌষ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ। 'ছেঁড়াতার' নাটকের নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। একাধারে নট-নাট্যকার, কমেডিয়ান, খল চরিত্রাভিনেতা, গীতিকার, সুরকার ও চলচ্চিত্রকার। তাঁর বহুমুখী কর্মধারার কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা। তাই রঙপুর নাট্যসমাজে তাঁর উপস্থিতি ছিল সীমিত। 'ব্যাপিকা বিদায়'-নাটকে স্কার্ট ও হাইহিল জুতো পরিহিতা লেডিজ ছাতা মাথায় দজ্জাল শাশুড়ীর ভূমিকায় তুলসী লাহিড়ী প্রাণবন্ত অভিনয় করেছিলেন। ঐ একই নাটকে গিরিন ঘোষ মহিলা চরিত্রে ভালো অভিনয় করেছিলেন। নাট্যসমাজে গিরিন ঘোষের নাট্যকর্মের সংখ্যাও ছিল কম। বেশ কিছুদিন রঙপুরের বাইরে থাকায় পঞ্চাশের দশকের পর থেকে তাঁকে আবার মঞ্চে দেখা গিয়েছিল।

তিতু মুন্সী কেবল রঙপুরেই না, কলকাতা আর্ট থিয়েটারে শাজাহান অভিনয় করে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেও লোকচক্ষুর আড়ালে ছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীব প্রান্তভাগে কোথাওবা সামান্য পরে প্রত্যেক জেলা শহরে দু'টি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সর্বত্র দেখা গেছে। ১) ক্রীড়াক্ষেত্র টাউন ক্লাব ; ২) বিনোদন ক্ষেত্রে নাট্যসংস্থা। নাট্যগোষ্ঠীর অবস্থান ছিল নানা নামে: দু'টি প্রতিষ্ঠান ছিল প্রধান, আর দু'টিকে গিরে আবর্তিত হত একাধিক ছোটো ক্লাব বা সমিতি।

ভালো খেলোয়াড় ও প্রতিশ্রুতিশীল নট সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত প্রধান প্রতিষ্ঠানের প্রতি। ক্রীড়ামোদীদের লক্ষ্য কখন টাউন ক্লাবে খেলব, আর নাট্যশিল্পীদের আশা কবে প্রধান দলে অভিনয় করব।

মুন্সিপাড়া মিলন সংঘ নামে একটি ক্লাবে ছিল। মুন্সিপাড়া মুসলিম ছাত্রাবাস হেয়ার হোস্টেল-এর মাঠে (অধুনা মরিয়ম নেছা গালর্স হাইস্কুল) অস্থায়ী মঞ্চে তারা অভিনয় করত। তাদের মধ্যে পরবর্তীতে আইনজ্ঞ মহম্মদ হোসেন, কাজী মহম্মদ ইউনুস, আব্দুল মান্নান চৌধুরী ও কামাল কাছনার, অ্যাডভোকেট মাহাতাবউদ্দিন খান 'শাজাহান' নাটক করতেন। আর এক নাট্যপ্রেমিকের নাম জানা যায়, তহিরিমউদ্দিন আহমেদ। সেকালে মাহিগঞ্জে একটি নাট্যদল গড়ে উঠেছিল. নাম, 'মাহিগঞ্জ নাট্যসমিতি'। তাদের মঞ্চ ছিল সাজ-সরঞ্জাম সবই ছিল। দলের প্রাচীন সভ্যদের নাম ডাঃ নৃপেন মুখার্জি, ডাঃ বাহাউদ্দিন আহমেদ, মণীন্দ্রনাথ দাস, ফরমান আলী, মনোরঞ্জন দাস, রাজা মিএগ, বাবু মিএগ, আতাউর রহমান, ইয়াকুব মিএগ. খেলারাম মৈত্র, দীপক মৈত্র (নন্দ), বদিউজ্জামান, কালু মুখার্জি, মঙ্গল বোস ও প্রকাশ চৌধুরী।

এ সব নাটক মাহিগঞ্জ নাট্যসমিতির মঞ্চস্থ করেছিল: 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল', 'মহারাজ নন্দকুমার', 'কেদার রায়', 'বঙ্গেবর্গী', 'হায়দার আলি', 'টিপু সুলতান', 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতি। পরবর্তীতে এসেছিলেন জহর রায়, শৈলেন গিরি, মহম্মদ আলি মুহুরী, মাহিগঞ্জ নাট্যসমিতি মহাকালের বুকে হারিয়ে গেছে।

গোমস্তাপাড়া নাট্যসংঘ ছিল। পূজোয় তারা কিশোরী মোক্তারের মাঠে নাটক করত। ধাপে এরূপ নাট্যসংঘ ছিল। পানাপুকুর কাছারির মাঠে নাটক করত। ধাপ কটকিপাড়া হরিসভা অঙ্গনে নাটক হত।

তিরিশের দশকের শেষের দিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু। যুদ্ধের বিভীষিকাময় ক্ষত ও জনবল হতাহতের করুণ দৃশ্য খোদ ইউরোপবাসীকে যুদ্ধ বিরোধী অবস্থানে উপনীত করেছিল। ধ্বংস ও মৃত্যু তাদের মনে এই প্রশ্ন জাগরিত করে, তবে সর্বশক্তি মান কে? ঈশ্বর না মানুষ? যদি মানুষ তবে তারা জনসমষ্টি নয় ক্ষুদ্র অংশ। বৃহদংশ কেন তাহলে পারবে না ভগ্নাংশকে প্রতিরোধ করতে? সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে তারা বেছে নেয় নাটককে। যুগে যুগে সামাজিক বিপ্লবে হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হয়েছে নাটক ও গণসঙ্গীত। সারা ইউরোপ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নাট্য আন্দোলনে। এক বিরাট দর্শন। পৃথিবীর অন্যতম মনীষীরা এ দর্শন প্রতিষ্ঠায় একাত্ম হয়েছিলেন। বিশ্বযুদ্ধকেই তার পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় নিয়ে বিপ্লব শুরু করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফলকাম হতে পারেনি দুর্বোধ্যতা ও নাস্তিকতার কারণে।

কিন্তু চল্লিশের দশকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বাস্তবতার নিরিখে গণনাট্য আন্দোলনকে সাফল্যের শীর্ষদেশে পৌছে দিতে সমর্থ হয়েছিল। তাদের আন্দোলনে ধরা ছিল গণসম্পৃক্ততার প্রতিশ্রুতিমূলক অঙ্গীকার। গঠনতন্ত্রের মুখবন্ধে এরূপ লিখিত ছিল-(স্মৃতি থেকে) ক্ষুধা, দারিদ্র. সামাজিক পরাঙ্মুখতা ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জনে গণনাট্য সংঘ গণমানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ইত্যাদি।

গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত প্রথম নাটক 'আগুন'। কলকাতায় বিজন ভট্টাচার্য রচিত 'নবান্ন'-বাংলা মঞ্চনাটকের মূলধারাকে আলোড়িত করে। নতুনের অন্বেষা, নবচেতনার আস্বাদনে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। কলকাতার নাট্যমঞ্চে দুর্দিন ঘনায়মান হয়। সে আঁচ পরিবৃত হয় সর্বত্র, রঙপুর নাট্যমঞ্চেও। এখানে একটি কথা স্মরণযোগ্য ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন মঞ্চাভিনয়কে যে কীভাবে শৃঙ্খলিত ও পদানত করে রেখেছিল তা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কল্পনাতেও আনতে সক্ষম হবে না। আজ যত সহজে শ্লোগান দেয়া সম্ভব, 'নাটক সমাজ বদলের হাতিয়ার'- সে আমলে তা ছিল কল্পনার অতীত।

উল্লেখ্য, ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের পুলিশ অফিসার মিঃ ল্যাম্বার্ট-এর প্রেতাত্মারা ইংরাজ রাজত্বের শেষ দিন পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। জেলা শহর রঙপুর কলকাতা মহানগরীর তুলনায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। ফলে, একই বৃত্তে পুনঃপরিক্রমা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ঘুরে ফিরে 'দত্তা' ও 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' অভিনীত হয়েছিল। সেকালের ভূমিকালিপি ছিল এরূপ : দামোদর চৌধুরী-কাজী মহম্মদ ইউনুস, রাজু মোক্তার-অরুণ চক্রবর্তী ও ভজহরি করেছিলেন কাজী মহম্মদ এহিয়া। পরের বার দামোদর চৌধুরী-কাজী মহম্মদ এহিয়া। আব্দুল মজিদ, নটুবিহারী আশুতোষ দত্ত ও ভজহরি নাট্যকারের ভ্রাতুস্পুত্র দীপক মৈত্র নন্দ। স্বাধীনতা উত্তরকালে আবারও হয়েছিল সে কথা যথাসময়ে। দেশভাগের আগে রঙপুর মুন্সীপাড়া, রঙপুর থিয়েটার হল দুস্থানেই অভিনীত হয়েছিল তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান'।

বিভাগ পূর্ববর্তী সময়ে সে সময়ের বাঙালি পুলিশ নাটকের ব্যাপারে কট্টর মনোভাব কিছুটা পরিত্যাগ করেছিলেন। যার ফলে 'উলুখাগড়া'র মতো সরকার বিরোধী নাটকও রঙপুরে মঞ্চস্থ হতে পেরেছিল। ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭-এর দেশবিভাগ বাস্তব সত্যে পরিণত হয়। দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের অভ্যুদয় ঘটে। রাজনৈতিক ভাগাভাগির ফলে সমাজ জীবনে যে ধ্বস সৃষ্টি হয়েছিল আজও তার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থমকে দাঁড়িয়েছিল। 'টাউন হল'-এর দরজা বন্ধ। আলো জ্বলে না। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লিগ নেতৃবৃন্দের গোঁড়া অংশ বাদ দিলে বাকিরা দ্বি-জাতিতত্ত্বের পক্ষাবলম্বী হলেও বাঙালি সংস্কৃতি নিধনযজ্ঞের হোতা ছিলেন না। দেশভাগের ফলে টাউন হলের হিন্দু সভ্যরা চলে যাওয়ার যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তা পূরণ করেছিলেন মুসলিম লিগ নেতারাই।

কাজী মহম্মদ ইলিয়াসের আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্ত ছুটে এসেছিলেন অ্যাডভোকেট মোঃ আমিন, অ্যাডভোকেট মোঃ মহাতাবউদ্দিন খান, খান বাহাদুর আব্দুর রউফ, মহম্মদ আখতার, মহম্মদ আজহার আলি (পৌর ভাইস চেয়ারম্যান) শ্যামদাস রায় চৌধুরী (জমিদার প্রতিনিধি), বজলুর রহমান, মহম্মদ আজমল, আব্দুর রশিদ খান, মঃ হাফিজ উদ্দিন চৌধুরী (মালবাবু) ও শহীদ জররেজ মিঞা। পুনর্গঠিত হয়েছিল আরডিএ ও টাউন হল কার্যকরী পরিষদ। প্রায় একীভূত আকার ধারণ করেছিল। শূন্যতা নাট্যশিল্পীর। হাতে গোনা ক-জন নাট্যশিল্পী। তা দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ভূমিকালিপি সম্পাদন সম্ভব নয়। অথচ শিল্পীর অভাব নেই। পাড়ার থিয়েটার ক্লাবে ইতোমধ্যে অনেক প্রতিভাবান নাট্যশিল্পী বেরিয়েছে। কিন্তু আরডিএ-তে তাদের প্রবেশাধিকার নেই। অবরোধ সাংগঠনিক গঠনতন্ত্র। ছাত্ররা আরডিএ'র মেম্বার হতে পারবে না। তা সে স্কুল ছাত্রই হোক আর বিশ্ববিদ্যালয়ের হোক। কাজী মহম্মদ ইলিয়াস উপধারার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ছাত্র হলেও নাটকের প্রয়োজনে তাকে বা তাদেরকে সহযোগী সভ্য করে নেওয়া যেতে পারে। সহযোগী সভ্যের সমস্ত অধিকার থাকবে, কেবল ভোটাধিকার থাকবে না। এই উপধারা মতে নাট্যশিল্পীরূপে তালিকাভুক্ত হন পর্যায়ক্রমে আলতাফ হোসেন খান বাবু মিঞা, নুরুল ইসলাম (মিন্টু), আব্দুল গনি, মহম্মদ হাজেক, কে. এস. এ. জামান, মোবাশ্বের মিঞা, আব্দুল মজিদ, হেমেন মৈত্র, আবুল বজল তুলিপ, ডাঃ বিবেকানন্দ দাশগুপ্ত।

পরবর্তী পর্যায়ে ডাঃ আশুতোষ দত্ত, সবশেষে আব্দুল জব্বার মিঞা, মহম্মদ নাতেক ও তসনিন আহমেদ (মনু মিঞা)। অতঃপর আর কোনো নাট্যশিল্পী তালিকাভুক্ত হয়নি। আর এই সুত্রে বলাই চলে, কতিপয় প্রতিশ্রুতিশীল নাট্যশিল্পী যথাঃ কানু ঘোষ, সুফি মহিবুল হোসেন (হীরু), বিমল ভট্টাচার্য (ছোট), সেলিম চৌধুরী প্রভৃতি সভ্য তালিকাভুক্ত হতে সক্ষম হয়নি। '৪৭-থেকে '৫২ পূর্ববর্তী সময়ে নাট্যসমাজ নাট্য প্রযোজনায় তেমন সচেষ্ট হয়নি নানা কারণেই। এ সময়ে সম্ভবত 'দত্তা', 'পল্লীসমাজ', 'দুঃখীর ইমান' ও বিশেষভাবে 'ছেঁড়াতার' অভিনীত হয়েছিল। 'ছেঁড়াতারে' ফুলজানের ভূমিকায় গণির অপূর্ব অভিনয় দর্শকদের চমৎকৃত করেছিল।

দেশভাগের পর ব্যাঙ্কের গচ্ছিত ৪০, ০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকারও বেশি অঙ্ক নিঃশেষিত হলে কর্তৃপক্ষ সিনেমা কোম্পানিকে হল ভাড়া দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে আশঙ্কা করে সামনে রাখে কাজী মহম্মদ ইলিয়াসকে। মডার্ন সিনেমার সাথে আরডি-এর শক্ত শর্ত ছিল। পরিচালনা বোর্ডের ভরসা, তারা চুক্তিপত্র মেনে চলবে। মডার্ন সিনেমার সাথে চুক্তি মাসে চার শুক্রবার কোনো মাসে পাঁচ শুক্রবার তারা শো করতে পারবে না। ঐ দিন বরাদ্দ থাকবে নাট্যসমাজের নাট্যাভিনয়ের জন্যে। নাট্যসমাজ ঐ দিন নিজেরা অভিনয় না করলে বাইরের কোনো ক্লাব-এর দরখাস্ত পূর্বেই করা থাকলে তাদের হল বরাদ্দ বিধিবদ্ধ নিয়ম ছিল। নাটক সে সময়ে মার খাচ্ছিল সিনেমার কাছে।

রেভিনিউ অর্জনের লোভে পাকিস্তান সরকার ইন্ডিয়ান মেড ছবির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি। পশ্চিমবাংলা ও বোম্বের ছবি মঞ্চনাটককে কোণঠাসা করেছিল। অস্তিত্ব রক্ষার দায় হয়ে পড়ে। উপরন্তু পাশাপাশি অপর সিনেমা হলগুলো শুক্রবার নতুন ছবি 'গ্যালা রিলিজ' দেওয়ার কারণ দেখিয়ে মডার্ন-এব ম্যানেজার আরডিএ'র পরিচালক পর্ষদ সমীপে আবেদন করেন শুক্রবারের পরিবর্তে অন্যদিন তাদের হল ব্যবহার নির্ধারণ করতে। পরিষদ এক কথায় রাজি হয়। শিল্পীরা অশনিসঙ্কেত অনুমান করেন। তিক্ত বিরক্ত হয়ে কাজী মহম্মদ ইলিয়াস বলতে গেলে আরডিএর সাথে সম্পর্ক প্রায় ত্যাগ কবেন। শিল্পীবা অসন্তুষ্ট । বিশেষ করে নবাগতরা। আরডিএর নাটক নিয়মিত মঞ্চস্থ হয় না বিধায় তারা বাইবের দলে অভিনয় করতেন। কর্তৃপক্ষ সংবিধানের নিষেধাজ্ঞা তুলে দণ্ডদানের ভয় দেখাত। শিল্পীবা ধার ধারতেন না। কাজী মহম্মদ ইলিয়াসকে অসম্মাননার বিরুদ্ধে এটা নীরব প্রতিবাদ। বায়ান্ন-এর ভাষা আন্দোলন, ছাত্রহত্যা এবং জেলে বসে অধ্যাপক শহীদ মুনীর চৌধুরী রচিত 'কবর' দেশের নাট্যশিল্পীদের মনে প্রচণ্ড উদ্দীপনা জাগায়।

অতঃপর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন। মন্ত্রীসভা গঠন ও মওলানা ভাসানী আহুত কাগমারী মহাসম্মেলন বাঙালির জাতীয়তাবাদী ধারা উদ্দীপ্ত করে। সংস্কৃতিকে আশ্চর্যরকম বেগবান করে। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরডিএ কমিটি সৃষ্টি স্তূপীকৃত জঞ্জাল পরিষ্কার করতে প্রচুর ঘাম ঝরাতে হয়েছিল কাজী মোঃ ইলিয়াসকে। ঐ সময় টাউন হল মঞ্চে একটি নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছিল। নাটকের নাম 'প্রতিশোধ'। রঙপুর লোয়ার কোর্টের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট এর 'প্রতিশোধ' নাটক দেখে কাজী মহম্মদ ইলিয়াসের নাট্য প্রযোজনার ইচ্ছে জাগে। কাজী মোহম্মদ ইলিয়াস-এর প্রযোজনায় 'আলমগীর' নাটক মঞ্চস্থ হয় এবং এতে আলমগীরের নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন কাজী মহম্মদ এহিয়া। কাজী মহম্মদ ইলিয়াসের পরিচালনায় আর এক ক্লাসিক নাটক শিশিরকুমার ভাদুড়ী রচিত টকি অব টকিজ বাংলা নাম 'রীতিমত নাটক'। এ নাটকে ছিটগ্রস্ত অধ্যাপক দিগম্বর মিত্রের ভূমিকা করতেন শিশিরবাবু নিজে। নাট্যসমাজে কাজী ইলিয়াসের প্রশিক্ষণের গুণে অনুজ কাজী এহিয়া ভালো করেছিলেন।

ধ্রুপদ সঙ্গীতের মতো ক্লাসিক নাটকের প্রয়োজন সমজদার দর্শকের। রঙপুর নাট্যাঙ্গনে সে আমলে বোদ্ধা শ্রোতা ও দর্শক ছিল।

মিন্টু ও গনি। এরা ছিল সত্যিকার জাতশিল্পী। আর একজন আব্দুল মান্নান চৌধুরী। সংলাপহীন চরিত্রকে রঙ্গময় ও রসময় করা সম্ভব মান্নান চৌধুরী তাঁর অভিনয়ে একাধিকবার তার প্রমাণ রেখেছেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে। পূর্ব পাকিস্তান যুবলিগের জাতীয় অধিবেশন। ভেনু-রঙপুর জেলা বোর্ড-এর পিছনের ময়দান। অনুষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিকর্মী পরিষদ। তিন রাতের অনুষ্ঠান তন্মধ্যে দুরাতের প্রোগ্রাম, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, পল্লি সঙ্গীত, লোকজ সঙ্গীত, সাঁওতালি নৃত্যগীত ইত্যাদি। তৃতীয় ও শেষ রাত নির্দিষ্ট ছিল তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার' নাটক।

'ছেঁড়াতার' নাটকে বড়ো প্রাপ্তি শহরের সম্ভ্রান্ত চিকিৎসক ক্যাপ্টেন নঈম আহমদের দুই মেয়ে ডলি ও ডজির নাট্যাভিনয়ের অংশগ্রহণ। বিভাগ পূর্বকাল থেকে রঙপুরে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অবদান রেখেছেন। কালিন্দী দাশগুপ্তা, মীরা রায়ের পথ ধরে মানসী ও চিত্রা দাশগুপ্তার আগমন। ডলি-ডজির সমকালেই পাওয়া যায় মরহুম ডাক্তার এম,এ, হামিদের কন্যা ইরানীকে সেনপাড়ার অ্যাডভোকেট মকবুল হোসেনের কন্যা বেবীকে। আর ষাটের দশকে এসেছিলেন চায়না নিয়োগী, ইরা গুপ্তা ও সবিতা সেন।

৭ই অক্টোবর, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ সমগ্র পাকিস্তানে জারি হয়েছিল মার্শাল ল। সেনা ছাউনি থেকে বেরিয়েছিলেন বিংশ শতাব্দীর চেঙ্গিশ খান, জেনারেল আইয়ুব। ষাটের দশকের প্রতিষ্ঠিত হয় আর্টস কাউন্সিল।

ক'বছরের মাথায় টাউন হলের চালচিত্রের পরিবর্তন হল। আরডি'এর কর্মপরিষদ- সভ্যরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চরিতার্থ করতে নাট্যসমাজকে ব্যবহার করতেন, যা ছিল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আত্মঘাতী ব্যবস্থা। কাকতালীয় হলেও সত্য এ সময় একে মাথার ওপর অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের খড়গ, তদুপরি তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের কট্টর কমিউনিস্ট বিরোধী মনোভাব। আর দুয়ে মিলে নাট্যসমাজের ভাগ্যকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা। ডি আই বি'র ওয়াচ শুরু হয়।

নাট্যসমাজ সজাগ হয়। নাট্যায়নে সক্রিয় হয়। 'দত্তা', 'পল্লীসমাজ', 'ষোড়শী', 'মানময়ী গার্লস স্কুল', 'পথের শেষে', 'রূপালী চাঁদ', 'বারোঘণ্টা, 'ভাড়াটে চাই' ও কল্যাণ মিত্রের 'কুয়াশা কান্না' প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ হয়। 'দত্তা'য় পরেশের ভূমিকায় সম্প্রতি প্রয়াত মতলুব অভিনয় করেছিল। 'কুয়াশা কান্না'য় শহীদুর রহমান বিশু অভিনয় করেছিল সহযোগী শিল্পীরূপে। এত করেও পুলিশি আক্রমণের হাত থেকে রেহাই মেলে না। 'স্মাগলার' মঞ্চস্থ হল। একাধিক স্মাগলার মঞ্চস্থ হয়েছিল। খোরশেদ চৌধুরী করলেন কাজী মহম্মদ এহিয়া। 'স্মাগলারের' এটাই শেষ অভিনয়। খোরশেদ চৌধুরীর সেক্রেটারির ভূমিকায় বরাবরের মতো এবারও করেন শহিদ ভিকু চৌধুরী। মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা থেকে রঙপুরে পালিয়ে আসার পথে তিনি ও তাঁর স্ত্রী কাজী মোঃ ইলিয়াসের জ্যেষ্ঠা কন্যা মিলি চৌধুরীকে পাক পশুরা গুলি করে হত্যা করেছিল।

এবারের নাটকে চাকরের চরিত্রে বিমল ভট্টাচার্য, দুই চামচার চরিত্রে গনি ও মহম্মদ হাজেক আর চৌকিদারের চরিত্রে আব্দুল মান্নান চৌধুরীর অনবদ্য অভিনয় ভুলবার নয়। তারা কেউ বেঁচে নেই। অতীতের বুকে অম্লান হয়ে আছে তাঁদের অমর স্মৃতি। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও আরডিএ-কে রক্ষা করা সম্ভব হল না। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে টাউন হল সিনেমা কোম্পানিকে ভাড়া দেওয়ার অপরাধে (violation of consititution) আরডিএ-কে উৎখাত করা হয়েছিল-কিন্তু তা ছিল violation of court agreement. আরডিএ'র সংবিধানে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল টাউন হলের অডিটোরিয়াম যা নাট্যসমাজ জিম্মাদার সূত্রে প্রাপ্ত, তা একমাত্র নাট্যাভিনয় ছাড়া বিশেষ করে কার্নিভাল, ম্যাজিক, যাত্রা ও সিনেমা কোম্পানিকে কখন লিজ কিংবা মৌখিক চুক্তি বলে ভাড়া দেওয়া এমন কী সাময়িক ব্যবস্থায় ব্যবহার করতে দেয়া যাবে না। নিষেধ অমান্য করলে সেক্ষেত্রে টাউন হলের প্রেসিডেন্ট তথা জেলা প্রশাসক নাট্যসমাজের সাথে চুক্তি বাতিল করতে পারেন। কিন্তু সংবিধানে এ কথা লিখিত ছিল না যে এই অপরাধে নিজস্ব অংশ থেকে তাদের উৎখাত করা যাবে। কার্যত ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে সাংবিধানিক ধারা খেলাপের অপরাধে টাউন হলের প্রেসিডেন্ট তাই করেছিলেন। নাট্যসমাজেকে উৎপাত করে ন্যায্য অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করেছিল। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে থেকে একটানা সাতাত্তর বছরের নাট্যসমাজের নাট্যকর্মের এখানেই যবনিকাপাত।

টাউন হল আজও আছে। প্রতিদিন জরাগ্রস্ত হচ্ছে। নতুন নতুন দল আসছে। নাটক প্রবেশাধিকার

বিচ্যুত নাট্যশিল্পীরা বিভিন্ন সংগঠনে যুক্ত হয়ে ভালো নাট্য প্রযোজনায় সার্থক হয়েছিল। পঞ্চাশের দশকেই নাট্যসমাজের বাইরে অনেক নাট্যসংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নাট্যসমাজের নবীন ও প্রবীণ সভ্য কেউ কেউ তাদের সাথে যোগদান করেছিল।

আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব মূলত ক্রীড়া সংঘ। নাট্যসমাজের গিরিন ঘোষ ও মহম্মদ নাতেক যোগ দেন। তাঁদের নাট্য প্রযোজনায় উদ্বুদ্ধ করে। তাঁরা অভিনয় করে কতিপয় ঐতিহাসিক নাটক, যার মধ্যে সুনাম অর্জন করেছিল 'সিরাজদ্দৌলা'। আর এ 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক জন্ম দিয়েছিল চিত্রনায়ক হিসেবে মহম্মদ আনসারকে। মহম্মদ নাতেক ও তসনিন আহমেদ (মনু মিঞা) রঙপুর নাট্যসমাজের শেষ সভ্য। কাজী মহম্মদ ইলিয়াসের শেষশিষ্য নাট্যাঙ্গনে সুনাম অর্জন করেছিলেন। একাধিক নাটকে পদক প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

প্রগতিসংঘ একটি উচ্চমানের নাট্য সংগঠন ছিল। মূলত অলক সান্যাল এ সংঘের ছিলেন প্রাণপুরুষ। নাট্যসমাজের চৈতন মৈত্র (হেমেন মৈত্র) ছিলেন। আরও ছিলেন অম্বর সরকার, শিবু সরকার, মনীষ মৈত্র, মাণিক সরকার, চৈতন ঘোষ ও তারাকান্ত বণিক প্রভৃতি যুবাবৃন্দ। এদের অভিনীত 'কেরানীর জীবন' নাটকে গিরিন ঘোষ, কানু ঘোষ ভালো অভিনয় করেছিলেন। এদের 'উল্কা' নাটকে আশুতোষ দত্ত অংশগ্রহণ করেছিলেন। সুফি মহিবুল হোসেন হীরু 'নাগরিক শিল্পীগোষ্ঠী' সংগঠনের পক্ষ থেকে শচীন সেনগুপ্তের 'কঙ্কাবতীর ঘাট' নাটক করেছিলেন।

অন্য আর এক অ্যাথলেটিক সংঘ ডারহাম ক্লাব ফুটবল খেলার পাশাপাশি নাট্যাভিনয় করত। এদের দলে প্রধান ছিলেন প্রয়াত কার্তিক গাঙ্গুলি, মহম্মদ ওয়ারেস, রউফুল চৌধুরী, মহম্মদ বরিস, সেলিম, গণি মিঞা উল্লেখযোগ্য। এঁদের অভিনীত নাটকের মধ্যে 'স্মাগলারে'র কথা উল্লেখযোগ্য। কাজী মহম্মদ ইলিয়াস এ নাটক পরিচালনা করেছিলেন। ডাঃ জুন এবারেই প্রথম তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিমল ভট্টাচার্য (মাস্টার) এর পরিচালনায় কিছু নাটক হয়েছে। মান্নান মিঞা ও প্রয়াত জোহা চৌধুরী, ছানাবাবু ও মহম্মদ সফি, দাইমুর রহমান মিলে নাট্যদল গঠন করে একাধিক নাটক করেছে। এ দলে তোসাদ্দেক হোসেন জুয়েল, এম আর মণ্ডল অভিনয় করছেন। আলী মহসীন রাজা নামে কবিতা, গল্প, ফিচার ইত্যাদি প্রকাশিত হত। কিন্তু অনেকেই জানত না এরা তিনজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কিন্তু রচনায় নাম থাকত আলী মহসীন রাজা।

এদের লেখা নাটক 'শঙ্কামারীর ঘাট'- রঙপুর টাউন হলে মঞ্চায়িত হয়েছিল। অধ্যাপক প্রয়াত হাবিবুল্লা ও অধ্যাপক দেলওয়ার হোসেন তদসহ স্বাধীনোত্তর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রধান তৈয়বুর রহমান ও কাইয়ুম মিয়া। প্রয়াত এ. কে চৌধুরীর নামটি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। ইনি পেশাগতভাবে একজন ব্যবসায়ী হলেও মনেপ্রাণে ছিলেন নট-নাট্যকার ও পরিচালক। সর্বোপরি নাট্যাঙ্গনে তিনি ছিলেন এক দুঃসাহসিক কর্মী। যিনি তাঁর গোটা পরিবারকে পাকিস্তান আমলে নাট্যাঙ্গনে জড়িত করেছিলেন। তাঁর নিজের লেখা 'সমাধান' নাটক তিনি স্বয়ং পরিচালনা করেছিলেন। এ নাটকে তিনি তাঁর বড় ছেলে নাজমুল হাসান পান্নু ও দুই কন্যা নিগার সুলতানা ও নিলুফার সুলতানাকে দিয়ে অভিনয় করিয়েছিলেন। নাটকের জন্য তাঁর অকালমৃত্যু ঘটেছিল। মুক্তিযুদ্ধের কালে পাক আর্মি তাঁর বাড়ি তল্লাসি করতে গিয়ে 'দুর্ভাগা বাঙলি'-পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি পায়। তাঁকে এই অপরাধে বন্দি করা হয়। অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। ধকল সামলাতে পারেননি, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে তিনি স্বাধীন বাংলার মাটিতে চিরতরে ঘুমিয়ে পড়েন। আজকের প্রজন্মের কাছে এ ঘটনা কি আদৌ গর্বের নয়?

আইয়ুবি আমলে কল্যাণ মিত্রর পপুলারিটি নাট্যাঙ্গনের কুজ্ঝটিকা ঘুচিয়েছে। মঞ্চকে চলমান রেখেছে নবাগত নাট্যকারদের উজ্জীবিত করেছে নাট্যরচনায়। ডাঃ শাহদাত হোসেনের 'ছোট মা'

টাউন হল মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়ছিল। নবীন লেখক আব্দুল খালেক জোয়ারদার-তাঁর একাধিক নাটক যথা: 'নীরব কান্না', 'আঁকাবাঁকা', 'ভুল পথে', 'পথের দিশা', 'জেহাদের ডাক', 'কেন?', 'অভিনেত্রী' ইত্যাদির মধ্যে কোন কোন নাটক টাউন হল মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে থেকে শিখা সংসদ প্রথম নাট্যদল যারা ভারতের পশ্চিম বাংলায় অনুষ্ঠিত ব্রতী নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

রঙপুর বিটিসিতে চাকরি করতেন ফয়েজ আহমেদ। তার রচিত নাটক : '৪নং কেবিন', 'মুক্তাহার' ইত্যাদি বহুল অভিনীত হয়েছে। প্রবীণ নট গিরিন ঘোষের নাটক 'সুরের সমাধি'। তাঁর স্ত্রী সুষমা ঘোষ রচিত 'লাল বিবি ও বাকের জং' নাটক অভিনীত হয়েছে।

নুরুল ইসলাম ছাত্রজীবন থেকে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে জড়িত হন। সঙ্গীতেও অনন্য। তাঁর লেখা একাধিক নাটক-'সোজাপথ', 'ইদানীং ক্লিওপেট্রা', 'বর্গীয়জ বিভ্রাট', 'ফকির বিদ্রোহ' ইত্যদি রঙপুর টাউন হল মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। এঁর রচিত 'অনেক তারার আশা' ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে রঙপুর বেতারের প্রথম নাটক। তিনি দীর্ঘদিন রঙপুর শিল্পকলা একাডেমির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

ষাটের দশকে চিত্রজগৎকে নিয়ে বড় ন্যাক্কারজনক কাণ্ডকারখানা চলছিল। সেই পটভূমি অবলম্বন করে আশুতোষ দত্ত প্রথম নাটক লেখেন 'ছায়াছবির অঙ্গনে'। পরবর্তীতে তুলিপ এসে সে নাটকের পাণ্ডুলিপি নিয়ে চলে যায়। নাটকটি নারায়ণগঞ্জে মঞ্চস্থ হয়েছিল।

'পাহাড়ী ফুল' নাটকটি প্রযোজনা করে রঙপুর কালেক্টরিয়েট ড্রাইভারস অ্যাসোসিয়েশন। ঢাকা থেকে যোগদান করে সিরাজদ্দৌলা খ্যাত আনোয়ারা হোসেন ও আনোয়ারা।

মজিদের নাটকে ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যম। 'পাহাড়ী ফুলে'ও ব্যত্যয় ঘটেনি। মঞ্চজুড়ে মাটির কৃত্রিম পাহাড়। মজিদ একরাতে দুটি শো-এর প্রচলন প্রবর্তন করেছিলেন।

অধ্যাপক এ হাদি মঞ্চে এলেন সাফোক্লিসের 'ইউপাস' নাটক নিয়ে। এ নাটকে অভিনয় করতে ঢাকা থেকে আসেন প্রখ্যাত মঞ্চ ও চিত্রাভিনেত্রী রাণী সরকার। সাথে আসেন চিত্রনায়ক ও রঙপুরের কৃতি অভিনেতা মহম্মদ আনসার। পুবানোদের মধ্যে অভিনয় করেন, নুরুল ইসলাম মিন্টু, গাজীউর রহমান।

'ছায়াছবির অঙ্গনে' আগাগোড়া কাস্টিং নাট্যসমাজের উদ্বাস্তু শিল্পীদেব নিয়ে, সাথে এ হাদি, মহম্মদ আনসার। সঙ্গে অতিশয় নবীন নগেন বর্মণ, আ়ু ও মকসুদুল হক। মকসুদ অবশ্য বাইরে বেশ জনপ্রিয়, তবে সিনিয়রদের সাথে এই প্রথম তাদের মঞ্চাবতরণ। এ নাটকে ঢাকা থেকে এসেছিলেন, চিত্র পরিচালক সুভাষ দত্ত, চিত্র নায়িকা আনোয়ারা ও রাজিয়া চৌধুরী। এসেছিলেন সঙ্গীত পরিচালক সত্য সাহা। তাঁর সহ পরিচালক ছিলেন রঙপুরের আশরাফুজ্জামান সাজু মিঞা (প্রয়াত)।

'ছায়াছবির অঙ্গনে'র পরেই অভিনীত হয় মীর আলতাফ আলী রচিত 'পুতুল নিয়ে খেলা'। প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী সাজেদার রহমান (অকাল প্রয়াত) প্রযোজিত নাটক 'ষোড়শী'তে আলতাফ অংশগ্রহণ করেন। তিতুদা, প্রবোধদা, শ্যামাদাস, ডাঃ জুন সহ অভিনয় করেছিলেন এ হাদি, মহম্মদ নাতেক, বিমল ভট্টাচার্য (মাস্টার). নূরুল ইসলাম মিন্টুসহ আরো অনেকে। কিছু চমক দান করেছিল দেওয়ান মাসদার রহমান রহমান (জুন। অপূর্ব-অনন্য সাধারণ তার প্রতিভা। নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন গাজীউর রহমান। কতিপয় প্রাক্তন আরডিএর সভ্য'র মনোগত ইচ্ছা—সবাইকে নিয়ে বিকল্প নাট্যসংস্থা গঠনের। প্রয়াত মহম্মদ আনসার উদ্যোগ নিয়েছিলেন কিন্তু সফলকাম হয়নি। পর্যায়ক্রমিক 'পাহাড়ী ফুল', 'ইডিপাস', 'ছায়াছবির অঙ্গনে'ও 'পুতুল নিয়ে খেলা'র উন্নতমান নাট্যকর্ম দর্শক মনে যে জাগরণ ও নাট্যান্দোলনের যে পরিবশে সৃষ্টি হয়েছিল তা আর গতিশীল থাকে না। এ সময় এটিএম মকুবল আলী হঠাৎ করেই দু'টি নাটক লেখেন 'প্রেমের জেফলিন' 'পার্টিশনের পরে'।

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ২৩ মার্চ রঙপুরে নাট্য সংগঠন শিখা সংসদের জন্ম। তরুণ নাট্যকর্মীদের উদ্যোগে এ সংগঠনটি শক্তিশালী সংস্থারূপে আত্মপ্রকাশ করে। সামসুজ্জোহা বাবলু-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। এছাড়া ছিলেন আহমেদ নূর টিপু, যাদবচন্দ্র সরকার, কিরণ সরকার প্রমুখ।

স্বাধীনতা উত্তর রঙপুরে 'শতাব্দীর আহ্বান' প্রথম নাট্য সংগঠন। শতাব্দীর আহ্বান নাটকের পাশাপাশি সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। শতাব্দীর আহ্বান একাধিক নাটক মঞ্চস্থ করেছে। তাদের প্রথম নাটক 'কবর থেকে বলছি' আর শেষ-'ক্যাপ্টেন হুররা'।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে মাহিগঞ্জে কতিপয় কিশোর মিলে একটি নাট্যসংস্থা গঠন করে। নাম দেয় সেবা সংসদ। দল প্রধান নবীন নাট্যকর্মী সিরাজুল ইসলাম সিরাজ। সাথে বাবুল ওয়াহিদ, মঞ্জুর আলম, চাষী মমতাজ, নূরুল আমিন মুরাদ, নওয়াব আলী নবাব, ডাঃ আউয়াল, আব্দুর রশিদ প্রমুখ নাট্যকর্মী। সিরাজুল ইসলাম সিরাজ প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রূপে দায়িত্ব পালন করে। এদের ঘর ছিল না-ঠিকানা ছিল না। এমনকী নামটি পর্যন্ত নাট্যদল বলে সহসা অনুমতি হত না। মাহিগঞ্জেরই এদের নাট্যকর্মী সীমাবদ্ধ ছিল। এপাড়ায় ও পাড়ায় অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে নাটক করত।

স্বাধীনোত্তর রঙপুরের রঙ্গজগতের বেহাল-অবস্থা। স্বাধীনতার শত্রুরা যখন হৃতশক্তি ফিরে পেয়ে বলবান, কিঞ্চিৎ শক্তির অধিকারী ঠিক সেই সময় মোনাজাতউদ্দিন, মুকুল মোস্তাফিজ ও একদল প্রাণবন্ত তরুণ নিয়ে নবীন প্রবীণের মেলবন্ধন ঘটানোর লক্ষ্যে রঙপুরে প্রথম পহেলা বৈশাখ উদযাপনের আয়োজন করে। আসর বসে পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে। বহুদিন পরে এ উৎসবে ধারণাতীতরূপে বিপুল দর্শকের আগমন ঘটেছিল। সাংস্কৃতিক জগতে সাড়া জাগে। সাজ সাজ রব ওঠে নাট্যজগতে। অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে শিখা সংসদ মাসব্যাপী নাট্যোৎসবের আয়োজন করে। এ উৎসবে রঙপুরসহ বাইরের অনেক নাট্যদলও যোগদান করে।

নাট্যাঙ্গনে শিখা তার নিজ আলোকে আলোকিত হয়েছিল। ইতোমধ্যে তারা দেশে ও দেশের বাইরে সফলতা অর্জনের স্বাক্ষর অক্ষয় করেছিল। শিখার ছিল একাধিক দক্ষ অভিনেতা।

নাট্যসমাজের পর শিখাই একমাত্র দল, যাদের ছিল ভক্ত দর্শক। শিখার নামেই আগমন ঘটত নাট্যপ্রিয় দর্শকের। ক্ষুদ্র পরিসরে তাদের নাট্যকর্মের যাবতীয় কার্যকরণ বিস্তৃত বিবরণ সম্ভব নয় বিধায় তাদের শ্রেষ্ঠ অভিনয় সংবলিত দুটি নাট্যাভিনয়ের কথা স্মরণীয়। 'নহবত' (নাট্যকার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং 'নেপেন দারোগার দায়ভার'। মূল গল্পকার সৈয়দ শামসুল হক। নাট্যরূপ আশুতোষ দত্ত।

শিখা স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে সর্বপ্রথম দর্শনীয় বিনিময়ে নাটক প্রদর্শিত করে।

শিখা অভিনীত নাটক 'নহবত' উচ্চমানসম্পন্ন। বিশেষ করে মিলিটারি জ্যাঠা সামসুজ্জোহা বাবলু, বড় জামাই বিপ্লবপ্রসাদ, প্রথম ব্যাচে খেয়ে নেবার করিতকর্মা রবাহুত মনোয়ারা হোসেন, ঠিকে চাকর বেণীমাধব বণিক রেল স্টেশনে পুটলি ফেলে আসা অব্যক্ত বেদনা কাজের ফাঁকে ফাঁকে পীড়াদায়ক যন্ত্রণা প্রকাশ ও চোররূপী নগেন বর্মনের অভিনয় দর্শক নন্দিত হয়েছিল বড়ো জামাইয়ের প্রতিবন্ধী ছেলের ভূমিকা। তার সে অনবদ্য অভিনয় দৃশ্য আজও দৃশ্য আজও অম্লান, অবিস্মৃত।

শিখার অন্য নাটক 'নেপেন দারোগোর দায়ভার' তাঁদের জন্যে বহন করে এনেছিল খ্যাতি ও একাধিক পুরস্কার। প্রখ্যাত নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর নাটক ও 'ছেঁড়াতার' বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রদর্শন করে শিখা সংসদ যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে।

মাহিগঞ্জের নাট্য প্রতিষ্ঠান 'সেবা সংসদ'-এর পরিবর্তিত নামকরণ হয় 'সারথি'। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে সারথি দু'টি গ্রুপে বিভক্ত হয়। একটি অংশ সারথি সিরাজুল ইসলাম সিরাজের নেতৃত্বে মাহিগঞ্জ থেকে নাট্য আন্দোলনে অংশ নেয়। বিভক্তির পূর্বে সারথির উল্লেখযোগ্য নাটক-'খোয়াড়' 'রূপসীর

ইতিকথা' 'জেল সড়ক' প্রভৃতি। সারথির আর একটি অংশে যোগ দেন মোনাজাতউদ্দিন, মুকুল মোস্তাফিজ, সাখাওয়াত রাংগা, আজিজ মণ্ডল, মুজিবর রহমান, বাবুল ওয়াহিদ, নবাব আলী নবাব, নুরুল আমিন মুরাদ, সারোয়ার আলম, ডাঃ মোঃ আউয়াল, জাহাঙ্গির আলম ও ওয়াজেদ জাফর অটো প্রমুখ। এ অংশ তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এ অংশের উল্লেখযোগ্য নাটক- 'কঞ্জুস', 'নৈশভোজ', 'হয়বদন' 'সিসিফাস', 'কোজাগরী' 'নাকফুল'। নাট্যকার নাসিমুজ্জামান-এর মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নাটক 'নাকফুল' বেশ কবার মঞ্চে প্রদর্শিত হয়েছে। মঞ্চনাটক হিসাব 'নাকফুল' বাংলাদেশ টেলিভিশনে সরাসরি প্রদর্শিত হয়েছে।

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে নব্বইয়ের দশক অবধি যেসব নাট্যদল আত্মপ্রকাশ করেছে তাদের নাম পর্যায়ক্রমিকভাবে তুলে ধরা হল:

রঙপুর নাগরিক: প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক-সেকেন্দার রহমান (দুদু)।

রঙপুর থিয়েটার: শ্রেষ্ঠ নাটক 'ওরা কদম আলী'। দলীয় প্রধান নিজামুল ইসলাম বাবলু। রঙপুর থিয়েটারের প্রেসিডেন্ট অ্যাডভোকেট হোসেন আরা লুৎফা ডালিয়া।

রঙ্গলোক সাংস্কৃতিক ও নাট্য সংসদ : এঁদের শ্রেষ্ঠ নাটক 'প্রেক্ষিত শাজাহান ও একাল' বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী স্বপনকুমার, আফজালুল হোসেন।

রঙপুর পদাতিক : শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা 'মানুষ'। এই সংগঠনের প্রাণ তপু প্রসাদ, নসু এবং আরো অনেক।

নাট্যচক্র : শ্রেষ্ঠ নাটক 'লড়াই'। অভিনেতা হাসান আলী, আব্দুল কাইয়ুম আবদুল্লা ও আকমল হোসেন।

বিকল্প নাট্যকেন্দ্র : শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা 'মানসিংহের গল্প'। নাট্য ব্যক্তিত্ব হাসান আলী প্রধান। বিকল্প নাট্যকেন্দ্রের প্রাণপুরুষ আরিফুল হক রুজু।

চেতনা নাট্যগোষ্ঠী : প্রথমে এ দলটি সোনালী নামে পরিচিত ছিল। তখন সংযুক্ত ছিলেন অসিত ভট্টাচার্য, মনসুর রহমান বাবলু ও প্রমথেশ দাশগুপ্ত ওরফে মনা। পরবর্তীতে সোনালী ভেঙে রসিক নামে পরিচিত লাভ করে। তখন এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন মনা ও দিলীপ ব্যানার্জি। অতঃপর রসিক বিলুপ্ত হয়। নতুন নাম ধারণ করে চেতনা নাট্যগোষ্ঠী। প্রথম নাটক 'এবার রাজার পালা'। প্রতিষ্ঠাতা মনসুর আলী বাবলু, মাখন বণিক ও মোসাদ্দেক হোসেন চান্দু প্রমুখ। 'এবার রাজার পালা'র রচয়িতা উৎপল দত্ত ও পরিচালনায় অসিত ভট্টাচার্য।

উদীচী-রঙপুর : প্রযোজিত শ্রেষ্ঠ নাটক 'অতঃপর জনার্দন'। অভিনেতা আসিফ রহমান, মেহের কামাল, জুলমাত অপু ও দেওয়ান মাহফুজ এ মণ্ডল।

এমদাদুল হক ফারুক একজন নাট্যশিল্পী ও নাট্যকার। ১৯৭৪ থেকে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁর লেখা মঞ্চায়িত নাটকগুলো হল 'নাটক নিয়ে নাটক', 'ত্রিমোহিনীর আর্তনাদ', 'জবান', 'সংঘাত', 'ধিক্কার', 'ছোবল' ইত্যাদি।

সর্বশেষ প্রতিষ্ঠান রঙপুর নাট্যকেন্দ্র। পৃষ্ঠপোষক কাজী মোঃ জুন্নুন ও প্রধান অভিনেতা ও পরিচালক রাজ্জাক মুরাদ। এঁদের প্রথম অভিনীত নাটক 'মেরাজ ফকিরের মা' কৃতিত্বের দাবিদার।

এ সব নাট্যসংস্থার বাইরে ভিন্ন জগতের মানুষ, যাঁদের সাধারণ মানুষ অভিনেতা হিসেবে চেনেন না, তাঁরাও নাটক করেছেন। পাকিস্তান আমলে রঙপুর পুলিশ লাইনের আর আই মনসুর সাহেব, কাজী দারোগা, মরহুম মুস্তাফিজার রহমান, সিরাজ মিয়া নাটক করেছেন। পুলিশের এস. আই. আব্দুল গনি 'বিভ্রম' নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল পুলিশ ক্লাবে। পরিচালনা করেছিলেন তিতু মুন্সী।

পেশাজীবী ও চাকুরিজীবী ডাক্তাররা মিলে একটা নাটক করেছিলেন রঙপুর টাউন হল মঞ্চে। প্রযোজনা করেছিল বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-রঙপুর শাখা। তবে যে দুটি নাটক টাউন হল মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল তার নাম 'সত্য মারা গেছে' ও 'মানময়ী গালর্স স্কুল'।

আগে মহিলা নাট্যশিল্পী পাওয়া ছিল অসাধ্য সাধন ব্যাপার। এখন সে অভাব মিটেছে। সবিতার পাশাপাশি এসেছিল মীরা ও স্বপ্না দত্ত। এসেছিল সম্ভাবনাময়ী শিল্পী পারুল। পারুলের প্রায় গাঁটছাড়া বেঁধে এসেছিল মঞ্জুরী, আক্তার মহসীনা, হোসেনে আরা, লিলি, গৌরী দাশগুপ্তা, গীতা, শীলা মনসুর, মণি, সীমা, ঝুমা প্রমুখ।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কিছু তরুণ নাট্যকার এসেছেন, যাঁদের মধ্যে প্রয়াত মোনাজাত উদ্দিন, মানস সেনগুপ্ত, জহিরুল হক রনজু, সিরাজুল ইসলাম সিরাজ, আব্দুর রাজ্জাক, হামিদুল হক, আরিফুল হক রুজু উল্লেখযোগ্য। মানস সেনগুপ্তের 'থেটার বাবু' ও হামিদুল হকের 'স্বর্গের উপসর্গ'। সিরাজুল ইসলাম সিরাজ-এর 'জেল সড়ক', 'স্পেশাল ট্রেন', 'সমাধি', 'খোয়াড়', 'রূপসীর ইতিকথা', 'মরা মানুষের মিছিল'। আব্দুল রাজ্জাক-এর মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নাটক 'ময়নার বিয়ে' ও 'রক্তে আঁকা মানচিত্র'। জহিরুল হক রনজু রচিত দু'টি নাটক : 'শীতের পাহাড়' ও 'অসম্ভব প্রজাপতি'। প্রয়াত চারণ সাংবাদিক মোনাজাত উদ্দিনের রচিত নাটক—'বাক্স নম্বর ১', 'বাক্স নম্বর ২', 'বাক্স নম্বর ৩' জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল।

হামিদা সরকারকে কবি হিসেবে অনেকেই চেনেন কিন্তু তিনিও নাট্যকার। ষাটের দশকের তাঁর লেখা আলোরা পথে মঞ্চস্থ হয়েছিল।

আর একজনের নাম উল্লেখ্য, তিনি রঙপুর সেটেলমেন্টে একসময় কর্মরত ছিলেন। নাম আব্দুল মোত্তালেব। তিনি একাধিক নাটক রচনা করেছিলেন।

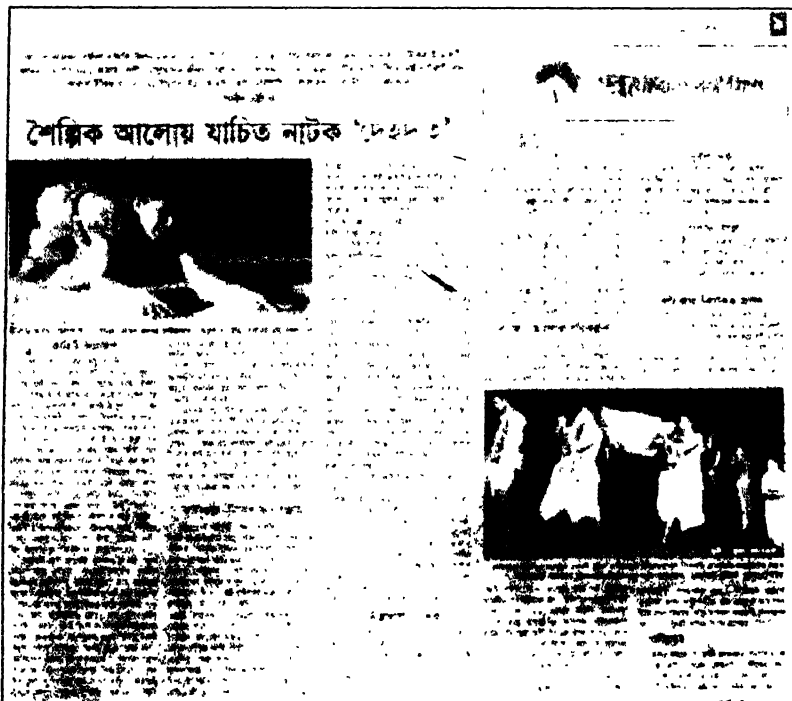
অনেক নাট্যগোষ্ঠীর সফল পদচারণায় রঙপুরের সাংস্কৃতিক অঙ্গন পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আলোচনায়
সমালোচনা





ক



শৈল্পিক আলোয় যাচিত নাটক

খ

মঞ্চ '৯৮ : আশা-নিরাশার ইতিবৃত্ত

কামালউদ্দিন কবির

অনেক আনন্দ আর আশা নিয়ে শুরু হয়েছিল আমাদের নিয়মিত নাট্যচর্চা। অথচ আজ সাতাশ বছর অতিক্রমের পর সার্বিক হিসেবের ফলাফলে যতটা না আনন্দ তার চেয়ে বেশি বিষণ্নতা এবং আশার বদলের হতাশার চালচিত্র ফুটে ওঠে। এর অন্যতম প্রমাণ হল, আজও আমরা নাট্যমঞ্চ তৈরি করতে পারিনি! মঞ্চ তৈরি করা না করা প্রসঙ্গে মস্ত যুক্তিতর্ক বা সন্দর্ভ করা যেতে পারে। সে প্রসঙ্গে না গিয়ে নাট্যপ্রয়োগ বা প্রযোজনা বিষয়টির দিকে লক্ষ করলে, আমরা কী দেখি? নাটক রচনার রূপরীতি থেকে শুরু করে তার বিষয়, ভাষ্যে এবং প্রয়োগ-আঙ্গিকের ক্ষেত্রে সিংহভাগ নাট্যপ্রযোজনা এখনও গতানুগতিকতা ও প্রথাবদ্ধতার বৃত্তে আবদ্ধ। বাংলাদেশের নাট্যসৃজন মণ্ডলে নবতর বিষয় ও আঙ্গিকচর্চার বিষয়টি যেন নিঃসঙ্গ পথ তৈরি করে চলছে। হোক সে পথ ক্ষীণ বা সংক্ষিপ্ত ; অবজ্ঞার নয় কোনোমতেই। বরং সৃজনশীলতার দিক দিয়ে গৌরব ও গর্বের শীর্ষভূমিকা তারই প্রাপ্য।

দুশো বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার প্রভাব বা সৃজনশক্তির সংকট যা-ই হোক আমাদের নাট্যচর্চাতে নিজস্ব বা দেশজ নাট্যঅভিজ্ঞান যুক্ত হতে স্বাধীন বাংলাদেশেও প্রায় দু-যুগ সময় লাগল। নাটক রচনার ক্ষেত্রে যেমন অন্ধভাবে ইউরোপীয় ঢংকেই অনুকরণ করা হচ্ছিল, তেমনি উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও ইউরো-মার্কিন রীতি-পদ্ধতির অনুসরণই ছিল মুখ্যকর্ম। এই সেদিনও নিজস্ব নাট্যনির্মাণের প্রত্যয়কে অনেকেই বাহুল্যজ্ঞান করেছেন। বলেছেন, এ অনাবশ্যক। বলেছেন — নাটক তো নাটকই, এর আবার দেশ অঞ্চল বিভাজন কেন? অথচ সামান্য বিশ্লেষণেই দেখা যাবে, দেশ অঞ্চল এবং জাতিভেদে বোধ বিশ্বাস তথা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা রয়েছে এবং সে যুক্তিতেই ভিন্নতর নাট্য নির্মাণের প্রসঙ্গটি যুক্তিসিদ্ধ করা সম্ভব। নাটক বা নাট্যের স্বাতন্ত্র্যময় শিল্প-বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা জানি। পাশাপাশি এ-ও আমরা নিশ্চয়ই মানব যে, দেশ-কাল ভেদে এর প্রকৃতি প্রকরণ স্থির গণ্ডিবদ্ধ বা গতানুগতিক হতে পারে না। কিন্তু বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে দুশো বছরের যে আরোপিত ইতিহাস আমরা মেনে আসছিলাম, তাতে একদিকে আমরা স্বঐতিহ্যকে উপেক্ষা করছিলাম, অন্যদিকে নাট্যবিষয় ও আঙ্গিকের একঘেয়ে সীমাবদ্ধ উপস্থাপনা শৈলীর চর্চাতে ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত হচ্ছিলাম। সুখের বিষয়, আমাদের সমকালেই স্বল্পায়তনে হলেও, নতুন ও শক্তিমান পথ-পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করলাম। নাটক রচনা ও প্রয়োগ যথার্থই প্রযুক্ত হল ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। এবং একই সাথে রয়েছে তা সমকালের শিল্পশর্তে সনিষ্ঠ। সাম্প্রতিক নাট্যচর্চার দিকে চোখ ফেরালেই এ সত্য মিলবে।

২. সংক্ষিপ্ত সালতামামি

উনিশশো আটানব্বইয়ের মার্চ-এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হল জাতীয় নাট্যোৎসব। গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর যৌথ আয়োজনে উদ্‌যাপিত হল এ উৎসব। আঠারো দিন ব্যাপী জাতীয় নাট্যোৎসবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নাট্যপ্রযোজনা উপস্থাপিত হয়েছে। মোট পঞ্চান্নটির মধ্যে রাজধানীর বাইরের ছিল সাতাশটি প্রযোজনা। এ উৎসবের উল্লেখযোগ্য দিকগুলোকে এভাবে চিহ্নিত করা যায় : ক. উৎসবের সামগ্রিক আয়োজন ছিল খুবই দায়সারা ; খ. প্রচার-প্রচারণা ছিল গৌণ রকমের, ফলে দর্শকের উপস্থিতি চিত্র ছিল বড়ই করুণ ; দশজন, বিশজন, পঁচিশজন এ রকম সংখ্যক দর্শক এসেছেন শিল্পকলা ও গাইড হাউস মঞ্চে ; মহিলা সমিতি মঞ্চে দর্শক সংখ্যা ছিল তুলনামূলক ভালো ; গ. উৎসবে রাজধানীর নাট্যকর্মী-নাট্যজনদের উপস্থিতি ছিল নগণ্য ; ঘ. 'জাতীয় নাট্যোৎসব' - অথচ এ উপলক্ষে হয়নি কোনো সেমিনার বা মুক্ত আলোচনা বা প্রাসঙ্গিক অন্য কোনো অনুষ্ঠান।

থিয়েটার (বেইলি রোড) এর 'মেহেরজান আরেকবার' দিয়ে নাট্যোৎসবের উদ্বোধন হয়েছিল। যে নাট্যদলটি অনেক উৎকৃষ্ট প্রযোজনা উপহার দিয়েছে সারাদেশকে, সেই থিয়েটার, নাটকের বিষয় আঙ্গিকের বহুবিচিত্র নিরীক্ষা ও প্রয়োগের এই কালে অতি নাটকীয় ও চটুল প্রসঙ্গবহুল 'মেহেরজান' দিয়ে আমাদেরকে এক নৈরাশ্যের প্রান্তরেই ফেলে রাখে। চট্টগ্রামের খ্যাতনামা দল অরিন্দম-ও আমাদের হতাশ করেছিল। তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রযোজনা 'সাজন মেঘ'। অরিন্দম-এর পূর্ব প্রযোজনা দেখার অভিজ্ঞতা যাদের আছে 'সাজন মেঘ' দেখার পর দলটির টিম স্পিরিট তাদের সংশয়ী করে তোলে। 'সাজন মেঘ'-এর নিরাভরণ মঞ্চবিন্যাস ও দৃশ্যান্তরে পেইন্টিংয়ের ব্যবহার যেমন আধুনিক শিল্পশর্তকে মনে করিয়ে দেয় তেমনি পাশাপাশি দৃশ্যান্তরে আলো নেভানোর জন্য ফ্রিজ হয়ে যাওয়ার সেই গতানুগতিক রীতি আধুনিক প্রযোজনাশৈলীকে অনেকটাই ম্লান করে দেয়।

'কিনু কাহারের থেটার' করেছে রাজশাহীর অনুশীলন নাট্যদল। আঙ্গিক ও সৌষ্ঠবের দিক থেকে এটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। মনোজ মিত্র রচিত এবং মলয় ভৌমিক নির্দেশিত এই 'কিনু কাহারের থেটার'-এ আগ্রাসী ঔপনিবেশিক শক্তির স্বরূপ এবং 'গরিব মানুষের এক রংতামাশার দলে'র মর্মগাথা উপস্থাপনে অনুশীলনের শিল্পীবৃন্দ সার্থক হয়েছেন। রাজশাহী থিয়েটারের 'দেওয়ানা মদিনা'ও ছিল একটি আকর্ষণীয় প্রযোজনা। নানাবিধ লোকআঙ্গিক যেমন, কিস্‌সা, নৌকা বাইচের গান, জারি, বায়োস্কোপ, গ্রামীণ কবিতা, যাত্রাপালা, পুঁথি উপস্থাপনরীতি প্রয়োগ করে ময়মনসিংহ গীতিকার এই 'দেওয়ানা মদিনা' নির্দেশনা দিয়েছেন নিতাইকুমার সরকার।

উৎসবে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় ছিল চট্টগ্রামের তরুণ নাট্যশিল্পী আহমেদ ইকবাল হায়দারের নির্দেশনায় পাঁচটি প্রযোজনা ওই নাট্যোৎসবে উপস্থাপিত হওয়া। তাঁর নিজ দল তির্যক প্রযোজিত 'রক্তকরবী' দর্শককে কমবেশি মুগ্ধ করলেও প্রত্যাশার চূড়া তিনি আমাদের স্পর্শ করাতে পারেননি। তবে প্রযোজনাটির মঞ্চ ও আলোর বৈচিত্র্যপূর্ণ বিন্যাসসহ নন্দিনী চরিত্রের অভিনয়শিল্পীর অভিনয় এবং একাধিক চরিত্রে আহমেদ ইকবাল হায়দারের প্রাণবন্ত অভিনয় দর্শকরা দারুণ উপভোগ করে।

এই জাতীয় নাট্যোৎসবটি যে দায়সারাভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে তার অন্যতম প্রমাণ হল, এই উৎসবের স্মারক প্রকাশনা আয়োজকরা বের করেননি। অথচ জাতীয় সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রকাশনার গুরুত্ব নেহাত কম নয়। আটানব্বইয়ের নাট্যাঙ্গনে 'জাতীয় নাট্যশালা' একটি বিশেষ সংবাদ হতে পারত। সংবাদ কিছুটা হয়েছিল, তবে তা পুরোটাই নেতিবাচক। বেশ দীর্ঘ একটা সময় অপেক্ষার পর নাট্যকর্মীদের মনে আশার সঞ্চার হয়েছিল ১৯৯৬-এর শুরুতে নাট্যশালা নির্মাণের কাজ শুরু হওয়াতে। কিন্তু তা-ও বহু বিচিত্র ঘটনা দুর্ঘটনার বেড়াজালে বন্দি হয়ে মন্ত্রণালয়ের তদন্ত ফাইলে আটকা পড়ে নির্মাণ প্রক্রিয়া এখন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। মঞ্চনাটকের দর্শক সংখ্যা আজ যে করুণ দশায় এসে দাঁড়িয়েছে, তার জন্য অন্যান্য সংকটগুলোর মধ্যে মঞ্চসংকটই অন্যতম। রাজধানীর বহুল পরিচিত মহিলা সমিতি ও গাইড হাউস মঞ্চ দুটিতে আধুনিক শিল্পশর্ত রক্ষা করে নাট্যনির্মাণ যে কতোখানি ঝক্কি-ঝামেলার ব্যাপার তা ভুক্তভোগী নাট্যজনমাত্রেই জানেন। দর্শকের অভিজ্ঞতার ঝুলিতে নতুনতর নান্দনিক অভিজ্ঞানই যদি না মেলে তবে কেন বারংবার (দর্শক) নিজেকে টেনে নিয়ে যাবেন একঘেয়ে ক্লান্তিকর পরিবেশে? প্রতিবেশী দেশ ভারতে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে সেখানকার প্রতিটি জেলায় সরকারি উদ্যোগে স্থাপন করা হয়েছে রবীন্দ্র মঞ্চ। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে আমাদের এখানেও নির্মাণ করা যেত স্বাধীনতা স্মারক মঞ্চ - স্বাধীনতা মঞ্চ। এতে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় বিষয়টি স্মরণের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হত আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য।

উনিশো সাতানব্বইয়ে রাজধানী ও রাজধানীর বাইরে বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক

নাট্যোৎসব আমরা পেয়েছি। হাবীব তানভির, রতন থিয়াম, শাঁওলী মিত্র. ঊষা গাঙ্গুলি, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, গৌতম হালদার প্রমুখ বিশিষ্ট নাট্যজনের নাট্যসমাবেশে মুখর ছিল আমাদের নাট্যাঙ্গন। আটানব্বইয়ে তেমন উৎসবের আয়োজন হয়নি। ব্রিটিশ কাউন্সিলের সৌজন্যে ওয়াটার মিল থিয়েটার কোম্পানির প্রযোজনা শেক্সপিয়ারের 'হেনরি দ্য ফাইভ' উপভোগ করা গেল। ভারতীয় দূতাবাসের সৌজন্যে কলকাতা থেকে উৎপল দত্তের 'তিতুমীর' নিয়ে এসেছিল পিপলস লিটল থিয়েটার। আমাদের অভিজ্ঞতার ঝুলিতে বিশেষ সঞ্চয় হয়ে রইল সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, সমীর মজুমদারের অনন্য অভিনয়। বের্টোল্ট ব্রেখটের 'মাদার কারেজ' (হিম্মতমাঈ) নিয়ে এসেছিলেন ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর অনন্য নির্দেশনা ও অভিনয়শৈলীতে মুগ্ধ হলাম হাজার দর্শক।

উল্লেখযোগ্য উৎসবের আয়োজন না হলেও দেশের প্রধান সারির প্রায় সব কটি দল এবার (১৯৯৮) ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে উৎসবে অংশগ্রহণ করেছে। এই অংশগ্রহণে তারা সুনাম-দুর্নাম দুই-ই অর্জন করেছে। মমতাজউদ্দীন আহমেদ রচিত নির্দেশিত ও অভিনীত 'খামাখা খামাখা'র উদ্বোধনী প্রদর্শনী হয় কলকাতায়। নাটকটি নিয়ে সেখানকার নাট্যপত্রিকায় বিরূপ (বা বলা চলে আক্রমণাত্মক) সমালোচনা প্রকাশিত হয়। অবশ্য দেশেও মমতাজউদ্দীন আহমদের আটানব্বইয়ে প্রযোজিত দুটি নাটকই ('খামাখা খামাখা' এবং 'হাস্য লাস্য ভাষ্য') বিরূপ সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের উদ্যোগে গঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার সেপ্টেম্বর '৯৮-এ যোগ দিয়েছিল ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা নাট্যোৎসবে। নাট্যকলার শিক্ষার্থীদের প্রযোজনা 'কমলা রাণীর সাগর দীঘি' এবং 'টোবাটেক সিং' প্রযোজনা দুটো বিপুল দর্শকের প্রশংসা পেয়েছে। 'কমলা রাণীর সাগর দীঘি' সাতানব্বইয়ের ডিসেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত চতুর্দশ নান্দীকার নাট্যমেলায় প্রদর্শিত হয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। কিশোরগঞ্জের পালাকার ইসলাম উদ্দিনের প্রশিক্ষণে এবং ড. সৈয়দ জামিল আহমেদ-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছে লোকনাট্য 'কমলা রাণীর সাগর দীঘি'। সাদাত হাসান মান্টোর গল্প নিয়ে নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষক ড. ইস্রাফিল শাহীন নির্দেশনা দিয়ে তৈরি করেছেন 'টোবাটেক সিং'। এ দুটি প্রযোজনার বেশ কটি প্রদর্শনী করা হয়েছে নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের স্টুডিয়ো থিয়েটারে। এবং তা বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

আটানব্বই সালে পূর্ব প্রযোজনার মধ্যে ঢাকা পদাতিকের 'বিষাদ সিন্ধু', আরণ্যকের 'জয়জয়ন্তী', থিয়েটার আর্টের 'কোর্টমার্শাল' ও 'গোলাপজান', জাহাঙ্গিরনগর থিয়েটার-ঢাকা-র 'সক্রেটিসের জবানবন্দী-র প্রদর্শনীতে দর্শকের সমান আগ্রহ লক্ষ করা গেছে।

৩. আটানব্বইয়ের আশা জাগানিয়া প্রযোজনা

নতুন প্রযোজনা আটানব্বইয়ে খুব একটা কম হয়নি। যদিও সবগুলো প্রযোজনা বর্তমান আলোচকের দেখা সম্ভব হয়নি। যতগুলো দেখেছি তার মধ্য থেকে বিষয় (content), আঙ্গিক (form) ও উপস্থাপনার (performance) গুণগত মান মূল্যায়ন যেগুলোকে উল্লেখ করা যায়, সেগুলো : ঢাকা থিয়েটারের 'বনপাংশুল', নাট্যকেন্দ্রের 'ক্রুসিবল', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যকলা বিভাগের 'এ ডল্স হাউস', আরণ্যকের 'প্রাকৃতজন কথা', প্রাচ্যনাটের 'সার্কাস সার্কাস'।

৩.১ বনপাংশুল

ঢাকা থিয়েটারের রজত জয়ন্তী স্মারক প্রযোজনা 'বনপাংশুল'। পাশ্চাত্য রীতি নির্ভর সংলাপ, দৃশ্যবিভাজন, বর্ণনার যে ধারা বাংলা নাট্যে বিরাজ করছে, তার মুখোমুখি দেশজ নাট্যের অনন্য সম্ভার নিয়ে মঞ্চ আলোকিত করে চলেছে ঢাকা থিয়েটার। বাংলা নাটক ও নাট্যের সুলুক সন্ধানী নাটককার

ডঃ সেলিম আল দীন বাংলা নাট্যতত্ত্ব বা দর্শনের ক্ষেত্রে একাধিক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। 'হাত হদাই', 'চাকা' ও 'যৈবতী কন্যার মন' নাটকের ভেতর দিয়ে যে বর্ণনাত্মক নাট্যরীতি, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পচিন্তা প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে সে ধারার সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'বনপাংশুল'। সেলিম আল দীন 'বনপাংশুল' রচনার পর অবশ্য এই ধরনের আরও একটি নাটক রচনা করেছেন। নাম 'প্রাচ্য' (পাক্ষিক 'শৈলী'তে প্রকাশিত বর্ষ ৪, সংখ্যা ৫, ১৬ এপ্রিল ১৯৯৮)। একটি ব্যাপার, বলা বা লেখার ক্ষেত্রে আমরা 'নাটক' বা 'নাট্য' অভিধা প্রয়োগ করলেও সেলিম আল দীন একে অভিষিক্ত করেন 'উপাখ্যান' নামে। 'চাকা' 'যৈবতী কন্যার মন'-কে সরাসরি নাটক না বলে বলেছেন 'কথানাট্য'। তাঁর বিশ্বাস, 'বিশ্বসাহিত্যে একবিংশ শতাব্দী শিল্প বিষয়ে এক আঙ্গিক ও পদ্ধতিগত সংকটে নিপতিত হবে'। তাই তিনি আশা প্রকাশ করেন 'বাংলা কথানাট্য বা পাঁচালির রীতিটা সে ক্ষেত্রে বিশ্বসাহিত্য বা বিশ্বনাট্যে নতুন পথের সন্ধান দিতে সক্ষম'। পাঁচালি, যা কিনা বাঙালির অভিনয় অনুষ্ঠানের (performance) চিরায়ত আঙ্গিক। পাঁচালি এমন একটি নাট্যআঙ্গিক যেখানে উপন্যাস, গান, নৃত্য, নাটক সবটাই এক সঙ্গে জড়িত আছে। এই পাঁচালি রীতিতেই রচিত হয়েছে 'বনপাংশুল'। নির্দেশক নাসিরউদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু এই প্রযোজনাতে এসে একেবারেই আলাদা কাজ করেছেন। তিনি মনে করেন যে, প্রাচ্যের যে অভিনয়রীতি আছে, বাঙালির যে রীতি আছে, 'বনপাংশুল'-এ এসে তিনি এই রীতির সফল প্রয়োগ করতে পেরেছেন। মান্দাই নামের লুপ্ত প্রায় এক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন যাপনের জগৎ নিয়ে তৈরি এই নাট্য 'বনপাংশুল'। প্রায় তিনঘণ্টা ব্যাপী দর্শকের সামনে পরতে পরতে খুলতে থাকে জীবন্ত এক নৃতত্ত্ব। সত্যি, নাট্যকার এবং শিল্পীদলের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে। দেশের আদি নৃ-গোষ্ঠী নিয়ে শিল্পমাধ্যমে তো দূরের কথা, গণমাধ্যম ও শিক্ষা ব্যবস্থায় যেখানে প্রাসঙ্গিক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বিরাজ করছে নানা অনীহা, সেখানে নাটকের এই মানুষগুলো জাতির এই গুরুদায়িত্ব পালন করছেন, তাঁদের মতো করে।

মান্দাইদের পূজা-পার্বণ, তাদের বিশ্বাস, মিথ, প্রাচীনের সঙ্গে নতুনের দ্বন্দ্ব, বাঙালি মহাজনদের সঙ্গে সংঘর্ষ, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সুযোগে ধর্ম বিশ্বাসের টানাপোড়েন, নরনারীর প্রণয়, বিচ্ছেদ এবং সর্বোপরি মান্দাই অরণ্য, সে অরণ্যের বৃক্ষডালে ছুটে বেড়ানো দুই বানর . . . সবই উঠে আসে মঞ্চে। মহিলা সমিতি মিলনায়তনের প্রায় গোটা জায়গা জুড়ে করা হয়েছে 'বনপাংশুল'-এর অভিনয় ক্ষেত্র। যে জন্য দর্শক সংখ্যাও রাখতে হচ্ছে সীমিত। সমগ্র উপস্থাপনাটি দর্শক ঘনিষ্ঠতায় সম্পন্ন হয়। মঞ্চের এই পরিবেশে একদিকে গ্রামীণ অভিনয় আসর শর্ত যেমন থাকল, তেমনি আবার অ্যাকটিং-স্পেসের আধুনিক নিরীক্ষাধর্মিতা রইল।

এই প্রযোজনায় সংগীতের বিশেষত্ব উল্লেখ করতেই হয়। শিমুল ইউসুফ-এর সুর ও গায়নে বিশেষ নান্দনিক ব্যঞ্জনা তৈরি হয়। যদিও মান্দাইদের ভাষা বা তাদের নিজস্ব সুর সংগীতের কোনো আভাসই আমরা পাই না। শুদ্ধ ভাষা এবং উচ্চাঙ্গের বিভিন্ন রাগ সমবায়ে যে সংগীত এবং আবহ তৈরি হয়েছে তাতে আমাদের নাটকের বিষয় বা ঘটনা প্রবাহ এবং চরিত্রসমূহের আনন্দ আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা মূর্ত হয়ে ওঠে।

পোশাকের ক্ষেত্রেও মান্দাইদের নিজস্ব পোশাকের কোনো প্রতিফলন না থাকলেও, এ ক্ষেত্রে নবতর নান্দনিক অভিজ্ঞানের সাক্ষাৎ মেলে। প্রকৃতির সাহচর্যে বেড়ে ওঠা বনবাসীদের পরিধেয় বস্ত্রাদির বাস্তব অনুকৃতি যে হয়নি তা সহজেই বোঝা যায়। মেয়েদের পোশাকে শরীরের রঙে রং মিলিয়ে ব্লাউজ, বাহুতে সাদা ফুল এবং সাদা রঙের শাড়িতে লাল সবুজের পাড়। পুরুষ শিল্পীদের চরিত্রানুগ পোশাকের ইঙ্গিতপূর্ণ প্রয়োগসহ সকল অভিনয়শিল্পীর পোশাক রং রেখার সাযুজ্য ইত্যাদি সব মিলিয়ে পাওয়া যায় পোশাক পরিকল্পনার আধুনিক কৃতি। পরিকল্পনার নেপথ্যে মেধা মননের যে

নিবেদন অনুধাবন করা যায়, তা নবীন নাট্যশিল্পীদের অনুপ্রেরণার বিষয় হয়ে থাকবে। তবে একটি সুনির্দিষ্ট নৃ-গোষ্ঠীর জীবন-কৃষ্টি নিয়ে এই যে নাট্য, তাতে ভাষা, সুর, পোশাক ইত্যাদি প্রয়োগে উক্ত নৃ-বৈশিষ্ট্য অনুধাবন আমাদের নাগালের বাইরে থেকে যায়।

'বনপাংশুল'-এর মূল পাঠ বজায় রাখলে এটি তিন খণ্ডের তিনটি প্রযোজনা তৈরি হতে পারত। এবং সে রকমটি সত্যিই হলে, তা হত বাংলাদেশের এবং নাট্যাঙ্গনের গৌরবময় কীর্তি।

৩.২ ক্রুসিবল

আর্থার মিলারের নাটক 'ক্রুসিবল'। তাহমিনা আহমেদের অনুবাদে এটি মঞ্চে এনেছে নাট্যকেন্দ্র। নবতর ধারণা পাওয়া যাবে বা চিন্তা ও মননের ছাপ আছে এমন প্রযোজনার যখন বড়োই আকাল আমাদের নাট্যাঙ্গনে, তখন নির্দেশক তারিক আনাম খান নাট্যবিষয় ও প্রয়োগের ঐশ্বর্যময় এক সম্ভার নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হলেন। 'তুঘলক', 'হয়বদন'-এর পর প্রায় তিনবছর বিরতি দিয়ে আটানব্বইয়ের শেষ দিকের প্রযোজনা এই 'ক্রুসিবল'।

প্রায় তিনশো বছর আগেকার এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে মিলার ১৯৫৩ সালে রচনা করেছেন 'দ্য ক্রুসিবল' (The Crucible)। সপ্তদশ শতাব্দীতে নিউ ইংল্যান্ডের সালেম শহরে কুসংস্কার এবং গোঁড়ামির প্রবল প্রতাপে এক মস্ত সামাজিক ধস নেমেছিল। ওখানকার প্রথা অনুযায়ী লেখাপড়া, নাচ-গান-নাটক এ সব কিছুই ছিল অর্থহীন আনন্দ উপভোগ। সমাজের ক্ষমতাধর, স্বার্থপর, লোভী আর ধূর্ত ব্যক্তিরা ঈশ্বর এবং শয়তানের চিরায়ত দ্বন্দ্বকে নিয়ে ভয়ংকর খেলায় মেতে উঠত। সেই করাল গ্রাস থেকে সরল, সুন্দর শান্তিপ্রিয় ধর্মঅন্তঃপ্রাণ কেউই রক্ষা পেত না। প্রকৃতির ছন্দে মেতে ওঠা শিশু-কিশোররাও ছাড় পেত না। তাদের নাচ-গানকে ডাইনি বা শয়তান আরাধনার সাথে এক করে অপব্যাখ্যা করা হত। ইতিহাসের এমন এক অদ্ভুত এবং ভয়ংকরতম অধ্যায় থেকে রসদ সংগ্রহ করে রচিত হল 'ক্রুসিবল'।

কালের ধারাবাহিকতায় আজও সেই অন্যায় অনাচার আমাদের সামনে প্রতিনিয়তই চলছে। আর এ প্রেক্ষিতেই নাট্যকেন্দ্রের 'ক্রুসিবল' প্রযোজনার প্রাসঙ্গিকতার ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যায়।

'ক্রুসিবল'-এর উদ্বোধনী প্রদর্শনী (২৬ এপ্রিল ১৯৯৮) মুগ্ধচিত্তে উপভোগ করেছিলাম। অবশ্য অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে দেখা যাবে, ওই মুগ্ধতার আড়ালে আক্ষেপ বা ঘাটতির বহরও নিতান্ত কম নেই। কাঠামোগত দিক দিয়ে 'ক্রুসিবল' একটি কন্ডিশন্‌ড নাটক · অর্থাৎ অভিনয়শিল্পী কোত্থেকে, কোন দরজা দিয়ে, কীভাবে মঞ্চে এসে মুভমেন্ট করবে ইত্যাদির সবিস্তারে নির্দেশনা দিয়ে রেখেছেন আর্থার মিলার। কোথায় বেঞ্চি, কোথায় টেবিল, এবং এমনকী কোন জানালা দিয়ে কতটুকু আলো মঞ্চে পড়বে তারও নিখুঁত বর্ণনা আছে পাণ্ডুলিপিতে।

পাণ্ডুলিপির নির্দেশনা সমূহের নিখুঁত রূপায়ণ আমরা প্রথমেই লক্ষ করি 'ক্রুসিবল'-এর মঞ্চ পরিকল্পনায়। যথার্থই রচনা করা হয়েছে 'সালেম শহরের রেভারেন্ড প্যারিসের ওপরতলার একটি স্বল্প পরিসরের শোবার ঘর, বাঁ দিকে একটি অপ্রশস্ত জানালা। জানালার পাল্লার ভেতর দিয়ে ভোরের সূর্যালোক প্রবেশ করছে। ডানদিকে বিছানার পার্শ্বে মোমবাতি . . .'। সবই সুচারু সংস্থাপিত হয়েছে মঞ্চে, এমনকী 'ছাদের কড়িকাঠ বাইরে আছে এবং কাঠের রং ধূসর ও কাঁচা'।

প্রায় প্রত্যেক অভিনয়শিল্পী মনোগ্রাহী অভিনয় উপস্থাপন করেছেন। অর্থাৎ সার্থকতার সঙ্গেই সকলে মঞ্চমায়া তৈরি করতে পেরেছেন। কিন্তু কথা হল, আধুনিক শিল্পরুচির পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যাভিনয়ে 'মায়া' বা 'ইল্যুশন' তৈরি করা কতোখানি যুক্তিযুক্ত। সরাসরি 'সেই সময়ের আবহ' রচনার বদলে সময় এবং পারিপার্শ্বিকতার বিশ্লেষণই তো কাম্য। বাস্তবানুগ বিষয়ের নাট্যউপস্থাপন

মানে তো হুবহু অনুকরণ বা উপস্থাপন নয়। বরং সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার অন্তর্নিহিত নানাস্তর, না বলা কথা ইত্যাদিসহ বিচিত্র মাত্রাকে পরিস্ফুট করে দর্শকের কল্পনাকে চাড়িয়ে দেয়াই তো মুখ্য হওয়া উচিত। এতে করে বাস্তবের অন্তর্নিহিত সত্য এবং অনুভূতিরাজি মূর্ত হয়ে উঠতে পারে।

'ক্রুসিবল' প্রযোজনায় অভিনয়শিল্পী সমাবেশের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, এখানে যশস্বী অভিনয়শিল্পীদের পাশাপাশি বেশ কজন নবীন নাট্যশিল্পী প্রায় সমান তালে, এমনকী বলা যায়, দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন।

ভালো নাটক, ভালো দর্শকের বর্তমান সংকটকালে নাট্যকেন্দ্রের 'ক্রুসিবল'-কে একশোভাগ পরিচ্ছন্ন ও মানসম্পন্ন প্রযোজনা হিসেবে চিহ্নিত করা অসঙ্গত হবে না।

৩.৩ নাটমণ্ডলে 'এ ডল্স হাউস'

দেশের নাট্যাঙ্গনে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ। প্রাতিষ্ঠানিক নাট্য অধ্যয়ন বা চর্চার জন্য একটি নিজস্ব নাট্যগৃহ প্রতিষ্ঠিত হল আটানব্বইয়ের নভেম্বর। বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সংলগ্ন বৃত্তাকার ভবনটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বদান্যতায় এবং রাজকীয় নরওয়েজিয়ান দূতাবাসের সহায়তায় অত্যাধুনিক নাট্য আয়তনে রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলা নাট্যের ঐতিহ্যবাহী মঞ্চধারণার সূত্র ধরে এর নাম রাখা হয়েছে 'নাটমণ্ডল'।

নাট্যকলা বিষয়ের স্নাতকোত্তর প্রথম পর্বের শিক্ষার্থীদের শ্রেণি প্রযোজনা হেনরিক ইবসেন রচিত 'এ ডল্স হাউস' মঞ্চায়নের মাধ্যমে নাটমণ্ডল উদ্বোধন করা হল। প্রযোজনাটির শিক্ষক-নির্দেশক ড. ইসরাফিল শাহীন। ইবসেন 'এ ডল্স হাউস' রচনা করেছিলেন ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে। সেই থেকে শুরু করে ইউরোপ হয়ে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র মঞ্চায়িত হয়ে আসছে নাটকটি। দেশ বা অঞ্চলভেদে নাটকটির অনুবাদ বা রূপান্তরে অনেক ক্ষেত্রে মূল প্রেক্ষাপটে বিভিন্নতাও এসেছে। যেমন শম্ভু মিত্রের অনুবাদে (রূপান্তরে) নাটকটি কলকাতার একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রেক্ষাপটে 'পুতুলখেলা' নাম হয়েছে। ইতোপূর্বে রাজধানীর নাট্যদল কণ্ঠশীলন খালেদ খানের নির্দেশনায় 'পুতুল খেলা' মঞ্চে এনেছে। সম্প্রতি চট্টগ্রামে কুন্তল বড়ুয়ার রূপান্তর ও নিদের্শনায় 'এ ডল্স হাউস' মঞ্চে এসেছে 'খেলাঘর' নামে। নাট্যকলা বিভাগ তাদের স্নাতকোত্তর শ্রেণি প্রযোজনায় সরাসরি অনুবাদ 'এ ডল্স হাউস' নামেই মঞ্চে এনেছে। প্রযোজনার প্রকাশনায় (ফোল্ডারে) যদিও অনুবাদকের নাম উল্লেখ করা হয়নি, তবুও সহজে বোঝা যায় তারা বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশিত, খায়রুল আলম সবুজ অনূদিত 'নোরা'-র পাঠ (text) নিয়েই কাজ করেছেন। যেহেতু এটি একটি শ্রেণি প্রযোজনা, তাই এর প্রযোজনা কার্যক্রমে অত্যন্ত কঠোরভাবে বাস্তবানুগ অভিনয় (realistic-naturalistic) শৈলী অনুসৃত হয়েছে। প্রযোজনা কার্যক্রমে ব্যতিক্রমী একটি দিক হল সকল শিক্ষার্থীর বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করা। নাটমণ্ডল উদ্বোধনের পর একটানা সাতদিন নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এই সাতদিন নোরার চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাতজন শিক্ষার্থী শিল্পী। হেলেনা, মিসেস লিন্ডে, অ্যানা মারিয়া, ডা. র‍্যাংক ও পোর্টার চরিত্রে ভিন্ন ভিন্ন জন অভিনয় করেছেন। হেলমার এবং ক্রোগস্ট্যাডের ভূমিকায় একজন করে অভিনয় শিল্পী ছিলেন। অভিনয় শিল্পীদের প্রত্যেকের কাজেই দীর্ঘদিনের মনোযোগ ও শ্রমের ছাপ লক্ষ করা যায়। ন্যাচারালিস্টিক অভিনয় নির্মাণে শিল্পীর মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতি এবং অভিনয় চরিত্রের ভাবনা, ক্রিয়া বা সামগ্রিক পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ততা যে কত জরুরি, তা এই প্রযোজনা দেখলে সহজেই অনুধাবন করা যাবে।

৩.৪ আরণ্যকের প্রাকৃতজন কথা

'বহিরাগতদের বিরুদ্ধে আমাদের যে বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের এক গৌরবময় ইতিহাস আছে সেদিক এবার দৃষ্টি ফেরানো দরকার। আত্মসম্মানজ্ঞান সম্পন্ন কোনো জাতি তার আত্মপরিচয় বিস্মৃত হয় না, হতে পারে না। . . .' এই ভাবনা থেকেই আরণ্যক মঞ্চে এনেছে নাটক 'প্রাকৃতজন কথা'। নাটকটি রচনা করেছেন আব্দুল্লাহ হেল মাহমুদ এবং নির্দেশনা দিয়েছেন মামুনুর রশীদ।

হাজার বছর আগেকার ভারতবর্ষের এক জনপদের গৌতমবুদ্ধের অনুসারী সংঘবাসী ভিক্ষু এবং প্রাসাদবাসী সামন্ত স্বৈরশাসকদের দ্বন্দ্বের আবর্তে তথা কিছু প্রাকৃত নরনারীর সুখ-দুঃখ ও সংগ্রামের কাহিনি বিবৃত হয়েছে 'প্রাকৃতজন কথা' নাট্যে। গৌতমবুদ্ধের অনুসারী সংঘবাসী ভিক্ষুদের আশ্রমে ত্যাগে, প্রজ্ঞায়, সহিষ্ণুতায় ও দায়বদ্ধতায় প্রোজ্জ্বল এক তরুণ ভিক্ষু সর্বানন্দ। প্রাকৃতজনদের ওপর সামন্তপ্রভুদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে সর্বানন্দ দ্রোহ প্রকাশ করেন। সতীর্থ ভিক্ষুবৃন্দ এবং মহাস্থবিরের সিদ্ধান্তে তাঁকে আশ্রম ত্যাগ করতে হয়। সর্বানন্দের কণ্ঠ ধ্বনিত হয় মানবিক শক্তির শঙ্খধ্বনি : আমিও মানুষ - তাই অন্যায়কে অন্যায় বলতে চাই। নাটকের শেষপর্বে সংঘবাসী ভিক্ষু প্রাকৃতজনদের বঞ্চনা, ক্ষোভ এবং দ্রোহের পক্ষে অবস্থান নিলে নাটকটি আর হাজার বছর আগের কাহিনির চিত্রায়ণই শুধু থাকে না, অবলীলায় তা হয়ে ওঠে কাল থেকে কালান্তরের যাবতীয় নিগ্রহ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ।

৩.৫ প্রাচ্যনাট এবং সার্কাস সার্কাস

প্রাচ্যনাট। স্বাতন্ত্র্যসূচক এই নামটির কারণে শুরু থেকেই দলটির প্রতি আমাদের আগ্রহ তৈরি হতে থাকে। সেই অনেকটা সময় ধরে আমাদের নাট্যাঙ্গনে নাটকের বিষয় ও আঙ্গিকে গতানুগতিক রীতি-পদ্ধতি বা প্রথাবদ্ধতা জেঁকে বসেছে। মাঝে মাঝে ব্যতিক্রমী দু-একটি ভিন্ন উদ্যোগ আমাদের আগ্রহ আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রটি তৈরি করেছে। আমরা আশা করতে পারি, সেলিম আল দীনের দেওয়া নাম (প্রাচ্যনাট) নিয়েই কেবল নয়, ওই বিশিষ্ট নাট্যজনের গবেষণায় যে নিজস্ব বা দেশজ নাট্যরীতির কথা আমরা জানলাম, তার যথার্থ প্রয়োগ চর্চাতেও প্রাচ্যনাট এগিয়ে আসবে। তবেই সাংগীতিক নামটির স্বাতন্ত্র্যময় ব্যঞ্জনা কার্যকররূপে প্রমাণিত হবে।

প্রাচ্যনাট বেশ স্বল্প কার্যকালে চারটি প্রযোজনা দর্শকের সামনে এনেছে। 'সার্কাস সার্কাস' তাদের চতুর্থ প্রযোজনা। রচনা ও নির্দেশনা আজাদ আবুল কালাম। আটানব্বইয়ের এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে 'সার্কাস সার্কাস' মঞ্চে এসেছে।

প্রাচ্যনাট সংগঠনটির গোড়াপত্তন একটু অন্যরকম। দুটি সাজানো বা জৌলুসের ঘর থেকে দুদল তরুণ গড়ে তুলেছে প্রাচ্যনাট। দলছুট এই তরুণরা বেশ সহজেই একই নামের ব্র্যাকেটবন্দি আরো দু-একটি দলের জন্ম দিতে পারতেন। নতুন দল গঠন করার জন্য মলিয়েব থেকেই হোক বা নিজেদের 'বিশেষ প্রতিভা' খাঁটিয়ে হোক, 'হাসির নাটক', 'দম ফাটানো হাসির নাটক' মঞ্চে এনে হইহুল্লোড়ও করতে পারতেন। তাঁরা তা করেননি।

'সার্কাস সার্কাস'-এর শুরুতে মঞ্চ জুড়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলি, সার্কাসের খেলোয়াড়দের বিভিন্ন দেহভঙ্গিমার স্থির দৃশ্যরূপ - এরই মধ্যে সহসা কথা বলে ওঠেন সার্কাস দলের প্রধান সাধন দাস। এরপর একে একে উন্মোচিত হতে থাকে দুটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া অভিন্ন ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়ার ঘটনা এবং দৃশ্যমালা। নাটকের অন্তিমে গিয়ে বোঝা যাবে যে, শেষ দৃশ্য দিয়েই নাটকের শুরুটা হয়েছিল।

দুটো স্বতন্ত্র ঘটনার প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'সার্কাস সার্কাস' নাট্যাবয়ব।

মুক্তিযুদ্ধকালে বরিশালে এবং বিশ বৎসর পরে কক্সবাজারে ঘটে যায় প্রায় সমান ঘটনা। ১৯৭১-এ মৌলবাদীদের তাণ্ডব থেকে রক্ষা পায়নি বরিশালের কিংবদন্তী সমান লক্ষ্মণ দাসের সার্কাস। বিশ বছর পরও যেন সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটে স্বাধীন বাংলার আর এক জনপদে। এখানেও (কক্সবাজার) সেই মৌলবাদীরা অসামাজিক কার্যকলাপের দোহাই দিয়ে রাতের অন্ধকারে পুড়িয়ে দেয় সার্কাস প্যান্ডেল। নৃশংসতার এই দুটি অধ্যায়কে আজাদ আবুল কালাম নিপুণভাবে মঞ্চে তুলে এনেছেন। বরিশাল, খুলনাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে সরল কথনভঙ্গিমায় এক একটি চরিত্র প্রাণবন্ত নাট্যমুহূর্ত নির্মাণ করেছে।

প্রায় প্রত্যেক অভিনয়শিল্পীর একাধিক ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের চরিত্ররূপায়ণ এই প্রযোজনার বিশেষ একটি দিক। বিশেষ ভাষা-ভঙ্গি এবং অভিনয়ের বিভিন্ন ধরন প্রত্যেকটি চরিত্রকে স্পষ্ট ব্যঞ্জনা দিয়েছে। প্রযোজনাটির প্রায়োগিক অন্যান্য দিক (মঞ্চ, আলো, পোশাক ও সংগীত) নিয়ে সবিস্তারে আলোকপাত বর্তমান পরিসরে সুযোগ নেই। তবে নির্দ্বিধায় এ কথা বলা যায় যে, বর্তমানকার আপাত স্থবির নাট্যাঙ্গনে প্রাচ্যনাট্যের এ নাট্য অভিযাত্রা আমাদেরকে আশান্বিত করে।

সামগ্রিকভাবে আটানব্বইয়ের নাট্যাঙ্গনকে হয়তো অনেকে নৈরাশ্যের চোখে দেখে থাকবেন। সে দেখাতে সত্যই আছে। কিন্তু আরো সত্য এই যে, গভীর প্রাণবন্ত মগ্নতায় নির্মিত 'বনপাংশুল', 'ক্রুসিবল', 'এ ডল্‌স হাউস', 'প্রাকৃতজন কথা', 'সার্কাস সার্কাস' বা এরকম আরো দু-একটি প্রযোজনা যাবতীয় স্থবিরতায় আক্রান্ত নাট্যকার্যক্রমের বিপরীতে অনেক বেশি শক্তিমান হয়ে প্রতিভাত হয়ে আমাদেরকে আশার আলো দেখায়।

বিষাদ সিন্ধুর পাঁচালি

আহমেদ আবিদ

নিজ অবস্থান থেকে . . .

সীমার চরিত্রাভিনেতা ঢাকা পদাতিকের নাট্যকর্মীটি এখন সস্ত্রীক মার্কিন মুলুকের অধিবাসী। দীর্ঘদিন যাবত গ্রুপ থিয়েটার নাট্যচর্চায় আত্মানুসন্ধানী পরিশ্রমসাধ্য প্রযোজনার অন্যতম (আমার মতে একমাত্র) ইতিবাচক দৃষ্টান্ত **'বিষাদ সিন্ধু'**-র দ্বিতীয় পর্বের মঞ্চায়ন সম্ভব হচ্ছে না। অভিনেতার সময়ের অভাবে প্রথম পর্বের মঞ্চায়নও প্রায় বন্ধ হতে বসেছে। প্রায় দু দশকের নাট্যচর্চার সুবাদে আমার মাকে যা দু-একটি মঞ্চনাটক দেখাতে পেরেছি সেগুলো সবই আমার অভিনীত দুর্বল ও ক্লিষ্ট উপস্থাপন মাত্র। কিন্তু নাট্যচর্চার কারণে আমার মাকে অনেক আঘাত-অত্যাচার সইতে হয়েছে। এমনকী আমার প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্তও। তাই অপদার্থ ছেলেটির একান্ত ইচ্ছে ছিল দেশের নাট্যচর্চার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তের নমুনা **'বিষাদ সিন্ধু'** একটি সন্ধ্যায় মাকে দেখিয়ে আনা। তাহলে হয়তো আমার মায়ের মনে শান্তি হলেও হতে পারত-ছেলেটি যা করছে তার সাথে ধর্ম ও সত্যের কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু গত কয়েক বছর চেষ্টা করেও আমার মাকে **'বিষাদ সিন্ধু'**-র প্রথম পর্বটি দেখাতে পারিনি। তার সুস্থতা-অসুস্থতা, আর আমার ব্যস্ততা মিলিয়েই সম্ভব হয়নি। আব এখনতো **'বিষাদ সিন্ধু'** বন্ধই হবার উপক্রম হয়েছে। তাই আমার মাকে আর হয়তো দেখানো হল না নাট্যচর্চার শ্রেষ্ঠ নমুনাটি। আর এখান থেকেই বিচার করতে হবে দীর্ঘদিনের নাট্যচর্চায় কী করেছি আমরা?

অর্জনের রেখাচিত্র . . .

নতুন শতাব্দীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাংলাদেশে তিন দশকের নাট্যচর্চার অর্জন মন্দ নয়। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর) -এ পূর্ণাঙ্গ নাট্যকলা বিভাগ, ক্যাট, বিটা, টি সি এস ডি এরূপ সংক্ষিপ্ত নামকরণে থিয়েটারকেন্দ্রিক কিছু বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও, গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান, আই টি আই-এর মতো নাট্যকর্মীদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম, গুলিস্তানে মহানগর নাট্যমঞ্চ, নির্মাণাধীন জাতীয় নাট্যশালা, সংস্কৃতিকর্মী কল্যাণ ট্রাস্ট এ সব ছাড়াও একের পর এক নাট্যোৎসব ও মানসম্পন্ন প্রযোজনা এসেছে নাট্যচর্চার ধারায়। এ ছাড়া দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষিত ডিগ্রিধারীরা শয়ে শয়ে নাট্যকর্মীসহ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানভুক্ত সক্রিয়ও নামসর্বস্ব ১৭৫টি নাট্যদল (এদের মধ্যে প্রায় অর্ধশত দলের বছরের পর বছর কোনো কার্যক্রম নেই) এর সাথে সব মিলিয়ে সারা দেশে প্রায় অর্ধ সহস্র নাট্যদলের অন্তত্পক্ষে দশ সহস্র সক্রিয় নাট্যকর্মী। অর্থাৎ বারো কোটি গণমানুষের মাঝে দশ সহস্র মঞ্চসৈনিক। সর্বোপরি পথনাটক পরিষদ থেকে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট পর্যন্ত নানান ছোটোবড়ো সংস্কৃতিকর্মীদের প্রতিষ্ঠান বা ফোরাম সবই আমাদের তিন দশকের নাট্যচর্চার অর্জন। সবচেয়ে বড়ো অর্জন হল দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন সমূহকে নাট্যকর্মীদের সক্রিয়তা। আশির দশকের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন থেকে তা দানা বেঁধে নব্বুই-এর গণ আন্দোলন ছাড়িয়ে '৯৫-এর আন্দোলন পর্যন্ত এক ইতিবাচক বিস্ফোরণ।

ভেতরে বাহিরে অন্তরে . . .

বাংলাদেশে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের পঞ্চদশ জাতীয় সম্মেলন হল গত ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর'৯৯। 'মঞ্চআঙিনায় গড়ি মৈত্রী' শ্লোগান দিয়ে এ সম্মেলনে নির্বাচিত হল নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ। ১৯

বছর আগে (৮০ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর প্রথম আহ্বায়ক কমিটি গঠনের মাধ্যমে) প্রথম গঠিত হয়েছিল নাট্যকর্মীদের এ সংগঠন। ২৩শে আগস্ট '৮১ সালে প্রথম বার্ষিক সম্মেলন হয় সংগঠনটির। তখন সংগঠনটির যে উদ্দেশ্য ছিল তার কিছু কিছু এখন অর্জিতও হয়েছে। নাটকের মান উন্নয়ন, ১৮৬৭ সালের কালাকানুন অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল, অভিনয় উপযোগী মঞ্চ তৈরি করা এ সব ক্ষেত্রে যদিও ফেডারেশানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়েছে বলে ধারণা হয় না।

কেন এমনটি হল? এর চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন অভিনেতা-নির্দেশক নাট্যজন আতাউর রহমান, 'নাটক করার পাশাপাশি ফেডারশানের একটি মহৎ অভিপ্রায় ছিল, তা হল দেশের সকল রাজনৈতিক সামাজিক সংকটে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করা।... মৌলিক কাজের তুলনায় এই দেশ উদ্ধারের কাজটি ফেডারেশান সবচেয়ে ভালোভাবে লালন করেছে এবং দেশের সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে এ দেশের নাট্যকর্মীরা ভালো নাটক করার চেয়েও বেশি সময় ব্যয় করেছেন।.. এতে করে আসল কাজ, অর্থাৎ নাটকের মান উন্নয়ন ব্যাহত হল।'

আচ্ছা সেটা না হয় ভালো কাজ। দেশ উদ্ধার করতে গিয়ে নাটকের মান উন্নয়ন হয়নি। কিন্তু অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন-ঐতিহাসিক কালাকানুনটি বাতিল হয়নি কেন? ৪ সেপ্টেম্বর রিকাউন্সিলিং চলাকালে নির্দেশক-সংগঠক নাট্যজন নাসিরউদ্দিন ইউসুফ এই বিষয়ে এক রহস্যময় ঘটনা তুলে ধরেন। মন্ত্রী পরিষদ সম্মত হয়েছে আইনটি তুলে নেবার ব্যাপারে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়ে। আইনটি তুলে দিলে যে শূন্যতা তৈরি হবে সেটা কীভাবে পূরণ হবে সেটাও ঠিক করতে হবে। তাহলে বিলটি সংসদে তোলা হবে কি না সেটাও পরিষ্কার না। আর বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির ক্রমাবনতি হরতাল—মৌলবাদ-সন্ত্রাস ইত্যাদির কারণে আদৌ বিলটি সংসদে তোলার সুযোগ এ সরকারের হবে কিনা সে সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত নয়। যদিও সরকারের নেতৃবৃন্দের সাথে সংস্কৃতিকর্মী নেতাদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। তারপরও এ কালাকানুনটি কোনো দাস্ত কারখানায় আটকে পড়ল কেউ বলতে পারবেন কি? না। কারণ খুব সোজা। সেটিও বলেছেন নাসিরউদ্দিন ইউসুফ সম্মেলনেই, 'সিংহভাগ রাজনীতিকেব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বিশ্বাস নেই'। কেন বিশ্বাস থাকবে? কারণ আমরাও তো সে বিশ্বাস অর্জন করতে পারিনি। আমাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও বিশ্বাসই অবলুপ্ত হতে বসেছে আমাদের কারণে। একে তো গ্রুপ থিয়েটার চর্চার কোনো লক্ষ্য বা ধারণা পরিষ্কার ছিল না। তাতে ব্যক্তিস্বার্থ জড়িয়ে যাওয়ায় মঞ্চ হল কলুষিত-অন্ধকার-শূন্যতল। কীভাবে হল সেটাই মজাব বিষয়।

গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান বাংলাদেশের সক্রিয় নাট্যদলগুলোকে একই ছাদের নীচে আনতে পারল ঠিকই কিন্তু প্রকৃত সমন্বয় সাধন করতে পারল না। দলভাঙাভাঙি অব্যাহত গতিতে চলতে লাগল, একই নামে একই 'লোগো' ধারণ করে তিনটি দল পাশাপাশি তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে লাগল, ফেডারেশান কোনো নিন্দা করতে পারল না। অবশেষে যে নিষ্পত্তি করল সেটাও ধোঁয়াশামুক্ত নয়।[২]

তবে ফেডারেশান করে নাট্যচর্চায় যেমন দেখা গেছে ইলেকশান ক্যারিকেচার তেমনি দল ভাঙনের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণভাবে কাপ পিরিচ পর্যন্ত বণ্টন কবা গেছে।[৩] অবশ্য হল বা মিলনায়তন বরাদ্দের একটি নীতিমালাও ফেডারেশান করে দিয়েছে দলগুলোকে। এ সম্পর্কে বর্তমান সেক্রেটারি লিয়াকত আলী লাকী নির্বাচনপূর্ব এক সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট বলেছেন।

'চার বছর পর নির্বাচন হচ্ছে ফেডারেশানের। যে দলগুলোর ৪টি প্রযোজনা আছে তারা হয়তো মাসে হল পাচ্ছে একটা, আবার কোনো দলের হাতে নাটক নেই তারা এখন হল পাচ্ছে মাসে ২টা। নির্বাচনে ভোটার ঢাকা লিট্‌ল থিযেটারের মতো দলেব ২ বছর যাবত কোনো কার্যক্রম নেই। অনেক

সক্রিয় নাট্যদল মেম্বার না হওয়ার কারণেই এ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বাইরে রয়ে গেছে।'[৪]

ফেডারেশানের নির্বাচন নিয়ে নাট্যকর্মীরা প্রতারণা ও কৌশলের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আসছে তা বলিহারি। '৯৫-এর নির্বাচনে মাহমুদ বাবু গংদের এ কৌশলে ৪০ টি দলের নির্বাচনী সমঝোতা মোর্চার নামে প্রতারণা এর একটি। এ প্রতারণার অভিযোগ করে নির্বাচন কমিশনারের নিকট পত্রও জমা পড়ে। নির্বাচন কমিশনার তা বেমালুম চেপে যান অথবা ফেডারেশান নিজেই। আর এবার নির্বাচনে এমন সব দলের প্রার্থীরা নির্বাচিত হয়েছেন যেসব দলের নাম বিগত ৫ বছরে আর শোনাও যায়নি।

তারপরও ফেডাবেশানেব অবদান কম নয়। নাট্যকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ এবার থেকে ফেডারেশান পদক প্রদান করেছে। '৯৭ সালের প্রথম পদক পেয়েছেন ১১জন। কেশব চট্টোপাধ্যায়, শ্রী কালিপদ সেন, সাঈদ আহমেদ, নিখিল সেন, মণি ইমাম, গোলাম মুস্তাফা, জিয়া হায়দার, মোঃ আব্দুর রশীদ, গীতা দত্ত, শ্যামল ভট্টাচার্য এবং সবিতা সেনগুপ্ত পেয়েছেন এ স্বীকৃতি। এ ছাড়া দল ভাঙা সমস্যার সমাধানে এবং সদস্যপত্র প্রদানেব জটিলতা নিরসনে ধারা-১২ সংযোজন হয়েছে। দলে কোনো বিভক্তি দেখা দিলে নির্বাচনী পরিষদ যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে বিভক্ত কোনো একটি অংশকে বা উভয় অংশকে পববর্তী ছয় মাসের কার্যক্রমের ভিত্তিতে সদস্যপদ প্রদান করবেন অথবা সংশ্লিষ্ট দলের সদস্যপদ বাতিল করবেন।

তবে এতে করেও রক্ষা হয়নি। এবাবেব নির্বাচনে ফেডারেশানের তদন্ত রিপোর্টের অভাবে নাগরিক নাট্যাঙ্গন (লাকী ইনাম) নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। অথচ 'থিয়েটার' একই নাম ও লোগো নিয়ে ৩টি দল নির্বাচান সদস্য হিসেবে ভোট দিয়েছে।

তাই ফেডারেশান যেমন দল ভাঙাভাঙির সমস্যার নিষ্পত্তি কবতে পারেনি, তেমনি পারেনি নাট্যকর্মীর অধিকাব নিশ্চিত করতে। তাই দেখা গেছে লাথি খেযে বেরিয়ে আসা কোনো নাট্যকর্মী নতুন দল গড়েছে। ফেডারেশানের কাছে আদতে নেতাদের কাছে দল থেকে বেরিয়ে আসার কারণে বেধড়ক মাব বা পিটুনি খাওয়া নাট্যকর্মীরা পাযে পাযে ঘুরেও কোনো সহানুভূতি পায়নি। সুবিচার তো দূরের কথা। ফলে সে নাট্যকর্মী হযেছে চিরতরে নাট্যচর্চা বিমুখ। আর সাম্প্রতিককাল ঘটে গেছে নাট্যকর্মীর অধিকারহীনতার শ্রেষ্ঠ নাটক। অসামাজিক কার্যকলাপের দায়ে গ্রেফতারের কারণে। তরুণ নাট্যকর্মী দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন চিরতরে।[৫] আজ এক নাট্যকর্মীর আত্মপক্ষ সমর্থনের কিংবা দলের অধিকার নিশ্চিত করার কোনো উপায় নেই। ৮৫ সাল থেকে শেকড়বিহীন পথনাট্য উৎসব করে ফেডারেশান অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিলের প্রয়াস চালিয়ে আসছে। 'আমাদের মঞ্চ আমরাই গড়বো' শ্লোগান দিয়ে একটি তহবিল তৈবি করেছে। তবুও শিল্পকলা একাডেমীর সাথে মিলে মুক্তিযুদ্ধের ২০ বছর শীর্ষক জাতীয় নাট্যোৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় নাট্যশালা নির্মাণের অঙ্গীকারও ফেডারেশানের কারণেই সম্ভব হয়েছে। যদিও জাতীয় নাট্যশালা নির্মাণ কমিটি থেকে নাট্যকর্মীরা বাদ পড়েছে এবং নির্মাণাধীন নাট্যশালা পরপর তিনবার ভেঙে পড়েছে তবুও হয়তো এ নাট্যশালার নির্মাণকাজ একদিন শেষ হবে। কিন্তু সেটা মেয়র হানিফের কথা রক্ষা করার মতো অদ্ভুতুড়ে মহানগর নাট্যমঞ্চের মতো জিনিস হবে না এমনটি নিশ্চিত করে বলা যায় না। ৯৫-এর জুন মেয়র মহানগর মঞ্চের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ফেডারেশানের সম্মেলন উদ্বোধনকালে। '৯৯তে মঞ্চটি পাওয়া গেছে, ফেডারেশানের অফিসও সেখানেই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মঞ্চটি নাটকের উপযোগী হয়নি বলেই নাট্যজনরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

তবুও ফেডারেশান আছে বলেই একের পর এক উৎসব হচ্ছে। এবারে আরজু স্মারক নাট্যোৎসব। কিংবা গত বছর (৯৮ সালের মার্চে) একই সাথে ৩টি মিলনায়তন শিল্পকলা একাডেমী, মহিলা সমিতি,

গাইড হাউসে ৫৫টি দলের অংশগ্রহণে দ্বিতীয় জাতীয় নাট্যোৎসব। এছাড়া ৯৬ সালে নতুন স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি ক্ষমতায় আসার পর ফেডারেশান আবারও ২৩ দফা দাবি পেশ করেছে। পূর্ত মন্ত্রণালয়ের সুদৃষ্টি পেলে হয়তো ফেডারেশান পেয়ে যাবে একটি পরিত্যক্ত ভবন। নাট্যচর্চার স্তিমিত হয়ে আসা ধারাকে বেগবান করতে ফেডারেশান দেশব্যাপী কর্মশালার আয়োজন দাবিও ৯৭' সালের শেষ থেকে টেলিভিশনে মঞ্চ নাটক প্রচারের কার্যক্রমও নিয়েছে। কিন্তু এতে করেও দর্শক কমে যাচ্ছে দিনকে দিন।

পালাবার পথ নেই . . .

'নাট্যচর্চা এখন শুধুমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট ও ছাত্র সমাজের একটি নির্দিষ্ট অংশের ক্ষোভ, ক্রোধ, ব্যর্থতা প্রকাশের মাধ্যম আত্মতৃপ্তির নিরাপদ আশ্রয়।'[৬]

১। আমাদের নাট্যচর্চা বিচ্ছিন্ন নাটচর্চা এবং নাটক এখনও দর্শকদের কাছে পৌঁছায়নি।

২। 'কাঙ্ক্ষিত দর্শক হল সর্বস্তরের সব শ্রেণির সাধারণ মানুষ'।[৭]

৩। নাটকের দর্শকদের শতকরা ২২জন সরাসরি নাট্যচর্চার সাথে জড়িত এবং অন্যান্য সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে জড়িত শতকরা ৩৮ জন।[৮]

৪। নাটক মঞ্চায়নের ব্যাপারটি আরো এক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছে। সেটা শ্রেণির। গরিব মানুষ নাটকের মঞ্চ থেকে এখনও অনেক দূরে। দর্শনীর বিনিময়ে মঞ্চাভিনয়ে কি ঘটছে না ঘটছে এ প্রশ্ন তাদের জন্য অবান্তর। তাদের জীবনে সাধারণ আলোই নেই, পাদপ্রদীপের আলো জ্বলবে কি করে।[৯]

৫। পুরো নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে 'কঞ্জুস' একটি দৃষ্টান্ত। মাত্র ১০ হাজার টাকার সবচেয়ে স্বল্প বাজেটের প্রযোজনা এ নাটকটি ১৬ লাখ টাকা মুনাফা অর্জন করেছে। বড়ো কথা টাকাটা এসেছে দর্শকের কাছ থেকেই। সুতরাং নাট্যচর্চার সংকট বলে যারা দর্শক শূন্যতার কথা বলে তাদের মুখ বন্ধ করে দেয় 'কঞ্জুস'।[১০]

৬। বাংলাদেশের নাট্যকর্মীরা অনেকে সচ্ছল, অনেকের হাতে সেলুলার ফোন, অনেকে গাড়ি চড়ে এসে নাটক করে, অনেকেই প্রভাবশালী, এদের সমন্বিত চেষ্টায় অন্তত ঢাকা শহরে একটি অভিনয় উপযোগী মঞ্চ কি হতে পারত না? অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় যে, এ ব্যাপারে নাট্যকর্মীদের সদিচ্ছার অভাব আছে। ফেডারেশান এ ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারত। দেশের নাট্যস্রোত এখন ভীষণ শীর্ণ, কালেভদ্রে ভালো নাটক প্রযোজিত হয়, সত্তর-আশির দশকের নাট্যচর্চার সে রমরমা দিনগুলো আজ পলাতক। নাট্য প্রযোজনার মান বর্তমানে নিম্নগামী, সুরুচি, নান্দনিক বোধ ও সুষ্ঠু নাট্যবুদ্ধির দুর্ভিক্ষ দেশের নাট্যাঙ্গনকে গ্রাস করেছে। তবুও নাটক নিয়ে রাজনীতি করাটা অব্যাহত রয়েছে। এই অবস্থার অবসান অচিরেই কাম্য।[১১]

এই আধডজন টীকা-তথ্যে যে চিত্রটি পাওয়া যায় তা মোটেই সুখকর নয়। এ অবস্থাগুলো নাট্যকর্মীদেরই তৈরি। অতএব পালাবার পথ নেই।

বিষাদ সিন্ধুর পরে . . .

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে বাংলাদেশে যে গ্রুপ থিয়েটার চর্চার কোরাস ধারা তৈরি হয়েছিল তা নাট্যকর্মীদের সততার অভাব আর ব্যক্তিস্বার্থের কারণে বিকশিত হতে পারেনি। থিয়েটারকে যে যার মতো করে ব্যবহার করেছে। কেউ বিজ্ঞাপনী প্রতিষ্ঠান, কেউ পণ্যের মডেল, কেউ আদম পাচার, কেউ এনজিও আবার ইদানিংকালে কেউ কেউ প্যাকেজ নির্মাণের প্রোডাকশন হাউসসহ নানান ফিকির -

ফায়দা করছে। গ্রুপ থিয়েটারে যে সমানভাবে কাজকরা সে ধারণাটি এখন পর্যন্ত পরিষ্কার না নাট্যকর্মীদের নিকট। কিন্তু উৎসব, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, জন্মোৎসব ইত্যাদি নানাভাবে মেধা শ্রম ও অর্থ ব্যয় করেছে নাট্যকর্মীরা বছরের পর বছর। লক্ষ্যটা এভাবে। পেশাদারিত্বের বিষয়টি তো ভাবেইনি। বরঞ্চ নেতারা নিরুৎসাহিত করেছে। দর্শক তৈরির কথা ভাবেইনি বলতে গেলে।

তবুও ব্রেশট, মলিয়ের এর রসালো রূপান্তরের কারণে প্রযোজনা হাউসফুল গেছে-যাচ্ছে। এরই মাঝে পাওয়া গেছে 'টেম্পেস্ট' 'গ্যালিলিও'-এর পাশাপাশি 'চাকা' 'বিষাদ সিন্ধু'র মতো আধুনিক ধ্রুপদ নাট্য প্রযোজনা। 'বিষাদ সিন্ধু' এবং 'চাকা' এ দুটি নাটকের উপস্থাপনায় জামিল আহমেদও বাংলা নাট্যরীতির সারসত্যে পৌঁছবার তাগিদ ও জিজ্ঞাসার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।[১২]

গ্রুপ থিয়েটার থেকে পাওয়া সবচেয়ে বড়ো ইতিবাচক ও সম্ভাবনাময় দৃষ্টান্ত এটুকুই।

কিন্তু থিয়েটারের সম্ভাবনার সীমা নেই। মানুষের নাড়ির সমস্যাকে নাড়া দেওয়াই থিয়েটারের কাজ। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলতে পারে থিয়েটার। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য তা হতে পারে একই সাথে শিক্ষা ও মনোরঞ্জনের মাধ্যমে। সে পথটিও হাতেকলমে নির্দেশ করেছেন নাট্যবিদ জামিল আহমেদ। 'আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের প্রয়োজনের তৃতীয় দাবি, অর্থাৎ মনোরঞ্জন করা, হৃদয়স্পর্শী হওয়া ও বিস্ময়ে মগ্ন রাখার দাবি মেটানো যেতে পারে ইসলামী মৌল উপাদানে সমৃদ্ধ জাতীয় নাট্য আঙ্গিক নির্মাণের মাধ্যমে।[১৩]

কিন্তু গ্রুপ থিয়েটার চর্চা কতদুর এগোবে সেটাই ভাবার বিষয়। পেশাদারিত্বের প্রশ্ন ছাড়াও যে মৌলিক সমস্যাটি বড়ো সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন নাট্যবিদ জামিল আহমেদ। 'গ্রুপ থিয়েটার সব সময় ভাসমান অভিনেতা ও কর্মীর সমন্বয়। এ থেকে একটি নির্দিষ্ট খাতে দক্ষ অভিনেতা তৈরী সম্ভব নয়'।[১৪]

সমস্যা ও সম্ভাবনাকে যাচাই করে কাজ করে যাওয়ার মানসিকতা সম্পন্ন নাট্যকর্মীরাই পারবে নতুন শতাব্দীতে জাতীয় নাট্য আঙ্গিক নির্মাণ করতে।

কিন্তু তার আগেই চাই দর্শক।

সেটাও তৈরির কাজ চলছে। ইউনিভার্সাল থিয়েটারের তরুণ কর্মীরা বিগত অর্ধ যুগ ধরে প্রায় প্রতি সপ্তাহে বন্ধের দিনে রমনা পার্কের শতায়ু অঙ্গনে বিকেল বেলায় প্রদর্শন করে আসছে পথনাটক। পার্কের বাদামওয়ালা চাওয়ালা মালি নিয়মিত ভ্রমণকারী প্রত্যেকেই জানে সে খবর। যদিও সেলুলার কিংবা মোবাইল হাতে গাড়ি হাঁকানো নাট্যকর্মীর কাছে পৌঁছায়নি সে খবর। কিন্তু রমনা পার্কের সাধারণ মানুষের মাধ্যমে সে খবর ছড়িয়ে যাচ্ছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

নাটক হল একই সাথে শিক্ষা ও মনোরঞ্জনের মাধ্যম। এই তথ্যটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সামনে তুলে ধরাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ। এই মুহূর্তে। আর দর্শকহীন নাট্যচর্চা হবে পণ্ডশ্রম। এ কথাটি নাট্যকর্মীদের জানতে হবে।

তথ্যসূত্র :

১. আতাউর রহমান। গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান ও দেশের নাট্যচর্চার বর্তমান অবস্থা। মঞ্চ অভিনয় গড়ি মৈত্রী, গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের পঞ্চদশ জাতীয় সম্মেলন প্রকাশনা, পৃঃ ১৬

২ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬-১৭

৩. আহমেদ আবিদ। নাগরিক থিয়েটার এর স্বপ্নবাজ।। সাপ্তাহিক চলতিপত্র। বর্ষত, সংখ্যা ৪৫। ১নভেম্বর, ১৯৯৯। পৃঃ৩১/ চিরায়ত কলাম।

৪. আহমেদ আবিদ। 'কঞ্জুস' গ্রুপ থিয়েটার নাট্যচর্চার ফিলহাল। দৈনিক বাংলার বাণী, (শেষের পাতার ফিচার), ১ সেপ্টেম্বর'৯৯।

৫. আহমেদ আবিদ। থিয়েটার এর স্বপ্নবাজ। সাপ্তাহিক চলতিপত্র। ১নভেম্বর, '৯৯। পৃঃ৩১
৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যকলা বিভাগের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক নাট্যচর্চা ফোরাম 'নিরীক্ষা' আয়োজিত ৬ ডিসেম্বর '৯৪-এ আমাদের নাটাচর্চা ঃ কাঙ্ক্ষিত দর্শক, সম্ভাবনা ও সংকট, শীর্ষক সেমিনাব রিপোর্ট।
৭. প্রাগুপ্ত।
৮. 'নিবীক্ষা' আয়োজিত সেমিনাবের জন্য ১২০ জন নাটকের দর্শক, ঢাকায় বিভিন্ন এলাকায় ১৬৩ জন বিভিন্ন পেশাদারিসহ ২০ জন বুদ্ধিজীবীব ইন্টারভিউ এর-প্রাপ্ত রিপোর্ট।
৯ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। আলে এবং দেয়ালে। সংবাদ স্বাধীনতা দিবস। ২৬ মার্চ '৯৭।
১০. লেখক। দৈনিক বাংসার বাণী, ১ সেপ্টেম্বর'৯৯
১১. আতাউর রহমান। গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান ও দেশের নাট্যচর্চাব বর্তমান অবস্থা। ফেডারেশানেব পঞ্চদশ জাতীয় সম্মেলন প্রকাশনা, পৃঃ ১৭
১২. মফিদুল হক। আমাদের মঞ্চ নাটকে বিবর্তন। আবহমান বাংলা। পৃঃ ২৮৫
১৩ জামিল আহমেদ। ইসলাম থিয়েটার এবং জাতীয় নাট্য আঙ্গিক। বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন-১৪০০। পৃঃ ১৪০
১৪ ১১ অক্টোবব'৯৫-নাট্যকেন্দ্র আয়োজিত সেমিনারে 'থিয়েটারেব সঙ্কট ও জাতির গণমাধ্যম'-এ বক্তব্য।

টি ভি প্যাকেজ ও স্যাটেলাইট মিডিয়ার বর্তমান প্রেক্ষিতে মঞ্চনাটক

অনন্ত হিরা

কিছু লোক থিয়েটার করবে সত্যিকারের নিষ্ঠা নিয়েই' অগ্রজ নাট্যজন শ্রদ্ধেয় মামুনুর রশীদ 'থিয়েটারওয়ালা'-র প্রথম সংখ্যায় 'অদ্ভুত আঁধার'- শিরোনামে একটি মূল্যবান প্রবন্ধে এমন একটি তীব্র বাস্তব সত্য জানিয়েছেন। আমি তাঁর অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার কাছে শিশুতোষ জেনেই 'সত্যিকারের নিষ্ঠা' কথাটি নিয়ে আমার সামান্য অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির কথা প্রকাশের স্পর্ধা করলাম।

ফেরা যাক একটু পেছনে, এ কথা তো অনেক আগে থেকেই বিতর্কের উর্দ্ধে একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, স্বাধীনতার পর আমাদের শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে ফলবান বৃক্ষটি হচ্ছে মঞ্চনাটক। যেসব দল এবং ব্যক্তি বিশেষের শ্রম আর মেধায় ওই ফলবান বৃক্ষের পরিচর্যা এবং যার সার্থক পরিণতিতে আমাদের মঞ্চনাটক আশির দশকের শুরুর দিকটা পর্যন্ত একটা মহীরূহে পর্যবসিত, তাঁদের অনেককেই বিভিন্ন আলোচনা, সেমিনার, প্রবন্ধ রচনা এমনকী ব্যক্তিগত আলোচনায়ও বলতে শুনেছি যে তাঁরা একেবারে শূন্য থেকে শুরু করেছিলেন। কিন্তু শিক্ষা বা অভিজ্ঞতায় শূন্য থেকে শুরু করলেও 'সত্যিকারের নিষ্ঠায়' যে তাঁরা পরিপূর্ণ ছিলেন, সে কথা পুরো সত্তর দশক জুড়ে তাঁদের কাজই প্রমাণ করে। কী সেই প্রমাণ? হতে পারে নিম্নরূপ :

১. এই সময়ে দর্শনীর বিনিময়ে দর্শক নাটক দেখতে অভ্যস্ত হয়েছে।

২. 'নাটক মঞ্চায়ন' কথাটির পরিবর্তে 'নাট্যচর্চা' (যা একটি নিয়মিত অনুশীলনের বিষয়) বিষয়টিকে উপলব্ধি করে তা একটি দলগত বা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উপর দাঁড় করানো।

৩. এ সময় বেশ কিছু ভালো নাটক লেখা হয়েছে। যার সার্থক মঞ্চায়ন দেখেছি আমরা মঞ্চে। যেখানে নাট্যকার, প্রয়োগকর্তা (পরিচালক) মঞ্চপরিকল্পনা ও আলোক পরিকল্পনার সুচিন্তিত আধুনিক ব্যবহার, অভিনেতা অভিনেত্রীদের দক্ষতা সব কিছুই চমৎকৃত করেছে দর্শককে, ফলে দর্শক সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে উত্তরোত্তর।

৪. প্রথম দিকে সপ্তাহে একদিন, তারপর দুই, তিন এই প্রক্রিয়ায় মাসে ত্রিশদিন এক থেকে একাধিক মঞ্চে নাটক মঞ্চায়ন একটা নিয়মিত প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে।

৫. নিয়মিত নাট্যচর্চার বিষয়টি ঢাকা থেকে বিভিন্ন বিভাগ, জেলা শহর পেরিয়ে থানা বা উপজেলা পর্যন্ত পৌঁছেছে।

৬. দেশি নাট্যকারদের ভালো নাটকের সফল মঞ্চায়নের পাশাপাশি আমরা বিশ্ববিখ্যাত কজন নাট্যকারদের বেশ কিছু নাটকেরও সফল মঞ্চায়ন দেখেছি।

৭. আই. টি. আই. বাংলাদেশ কেন্দ্র এবং অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই বাংলাদেশের নাট্যকর্মীদের ভারতবর্ষসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করে মঞ্চে আধুনিকতম অভিনয় ও প্রয়োগ চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটেছে। আবার বিভিন্ন সময় বিদেশি অভিজ্ঞ নাট্যদল, নাট্যনির্দেশক ঢাকায় এসেছেন এবং তাদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ ঘটেছে নাট্যজনদের। বিগত সাতাশবছর ধরে এই প্রক্রিয়াটিও সমৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ করেছে আমাদের নাট্যজনদের।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের যাঁরা 'সত্যিকারের নিষ্ঠা' নিয়ে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে শূন্য হাতে শুরু করেছিলেন, তাঁদেরই হাতে, তাঁদেরই মেধা, শিক্ষা, সৃজনশীলতা, শ্রম ও 'সত্যিকারের নিষ্ঠায়' মঞ্চনাটক আমাদের শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে ফলদায়ক বৃক্ষতে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতার পর গত সাতাশবছর ধরে আমাদের মঞ্চে যে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলেছে বা চলছে সেখানে সুদূর মফস্বলের একজন নাট্যকর্মী থেকে শুরু করে ঢাকার কোনো একটি শীর্ষস্থানীয় নাট্যদলের

কর্ণধার—সকলের অবদান সম্মানের সার্থেই স্বীকার্য। তবুও মাধ্যমটি যেহেতু সৃজনশীলতার, তাই বিগত সাতাশবছরের কর্মপ্রক্রিয়ায় কয়েকজন পরিচালক, কিছু অভিনেতা - অভিনেত্রী, কয়েকটি নাট্যদল নিজস্ব সৃজনশীলতায় স্বতন্ত্র অবস্থানের দাবিদার। এ প্রসঙ্গটির এ কারণেই অবতারণা স্বাধীনতার পর মঞ্চনাটকের সাফল্যের যে বিভিন্ন দিক তা এ আলোচনায় পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখন ওই সাফল্যের ভিত্তি বা মূলস্তম্ভ হিসেবে যদি আমরা কিছু মঞ্চসফল নাটককে ধরি তাহলে দেখব যে ঘুরেফিরে পাঁচ অথবা ছয়টি দল, চারজন নাট্যকার (বাংলাদেশের) এবং আট থেকে দশজন নাট্যপরিচালকের হাতেই ওই কর্মটি সাধিত হয়েছে। যেহেতু স্বাধীনতার পর আমাদের নাট্যদলগুলোই সকল কাজের কেন্দ্র, তাই লক্ষ করা গেছে যে উল্লিখিত পাঁচ, ছয়টি দলের আট থেকে দশজন নাট্যপরিচালকের হাতেই সৈয়দ শামসুল হক, সেলিম আল দীন, মামুনুর রশীদ, আবদুল্লাহ আল-মামুন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, শেক্‌সপিয়ার, ব্রেশট, মলিয়ের, বেকেট, ইবসেন সার্থকভাবে মঞ্চায়িত হয়েছে আমাদের মঞ্চে। একদা যাঁরা শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার শূন্যহাতে শুরু করেছিলেন আশির দশকের শুরু পর্যন্ত মঞ্চ নাটকের বিরাট সফলতা তাঁদের 'সত্যিকারে নিষ্ঠাকে'ই প্রমাণ করে। যদিও পরবর্তীতে উল্লেখ করার মত ভালো নাটক সংখ্যায় কম হলেও মঞ্চায়িত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। তবু আশির দশকের শেষে যে গুঞ্জনটি মৃদুভাবে শুরু হয়েছিল যে, মঞ্চনাটকের মান নিম্নগামী, দর্শককে নতুন কিছু দেওয়া যাচ্ছে না, মঞ্চনাটকের দর্শক কমে যাচ্ছে, সেটা নব্বই দশকের শেষে ১৯৯৮ সালে এসে প্রকাশ্য সরব আলোচনা (মৌখিক এবং পত্র-পত্রিকা সহ) ও সেমিনারের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বিগত ১৮ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র - শিক্ষক কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে কালচারাল রিপোর্টার্স ফোরাম 'মঞ্চনাটকে দর্শক কেন কমে যাচ্ছে?' শীর্ষক একটি গোল টেবিল বৈঠক আয়োজন করে। এর কয়েকদিন পূর্বে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন আয়োজিত গ্রুপ থিয়েটার দিবসেও বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। কালচারাল রিপোর্টার্স ফোরাম আয়োজিত বৈঠকে সমস্যাটির গুরুত্ব অনুধাবন করে বিভিন্ন ধরণের মত এসেছে। জনাব রামেন্দু মজুমদার বলেছেন 'বেইলি রোডের গাইড হাউস বা মহিলা সমিতিতে প্রতিমাসে যে ৩০টি করে নাটক হচ্ছে তার ১৫টি দেখার অযোগ্য'। জনাব মানুনুর রশীদ দীর্ঘ সাতাশ বছরে ঢাকায় একটি মঞ্চ না হবার জন্য আক্ষেপ করেছেন। যদিও গত দুই দশক ধরে এই আক্ষেপ শুনতে শুনতে নাট্যকর্মীরা ক্লান্ত। হ্যাঁ, কোনো সরকারই মঞ্চ করে দেয়নি এটা যেমন সত্য, এর চেয়ে বড়ো সত্য কোনো সরকারই মঞ্চ করে দেবে না, কারণ মঞ্চে সত্য উচ্চারিত হয় সেটা কোনো সরকারের জন্যই স্বস্তিকর নয়। এ কথা আমাদের শ্রদ্ধেয় নাট্যজনেরা উপলব্ধি করেন না এ কথা বলার স্পর্ধা আমার নেই। কোনো সরকার মঞ্চ করে দেয়নি এটা যেমন সত্য, তেমনি সত্য কোনো সরকারের কাছ থেকে মঞ্চ আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে মঞ্চকর্মীরা। আবার এক সময় 'নিজেদের মঞ্চ নিজেরাই গড়বো' শ্লোগান দিলেও বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। এখানে অগ্রজ নাট্যজনদের সদিচ্ছা, প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের অভাবও সমগুরুত্বে আলোচনার দাবি করে পরবর্তী প্রজন্ম। মঞ্চ হয়নি কিন্তু মঞ্চের অনেকেরই অনেক কিছু হয়েছে বিষয়টি বেশ কয়েক বছর যাবতই আলোচিত। এবং এটা আলোচিত হতেই থাকবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পরিচালক ভারতের রতন থিয়াম ঢাকায় নাটক করতে এসে মঞ্চের করুণতম অবস্থা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন। ঢাকায় যাঁরা নাটক করেন তাঁদের অধিকাংশেরই দামি গাড়ি, হাতে সেলুলার ফোন। দর্শকের অভাব নেই। দর্শকরা দামি গাড়িতে করে নাটক দেখতে আসে অথচ এদের মঞ্চ নেই কেন? রতন থিয়ামের বিস্ময়ের কারণটি ভেবে দেখবার মতো। বাংলাদেশে বর্তমানে একটি নির্বাচিত দল রাষ্ট্রক্ষমতায়। বিরোধীদলে থাকা অবস্থায় ওই দলের প্রধান থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নাট্যকর্মীদের মঞ্চের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। লক্ষণীয়, বর্তমান সরকার প্রধান ও

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রভাবশালী মন্ত্রীদের সঙ্গে অনেক অগ্রজ নাট্যজনেরই সুসম্পর্ক রয়েছে। তাঁরা অনেকেই (আলাদা আলাদাভাবে) ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক কারণে সরকার প্রধান ও মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু মঞ্চ প্রতিশ্রুতির কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে একত্রিত হয়ে গত তিন বছরে অগ্রজ নাট্যজনরা সরকার প্রধানের কাছে যাবার সময় করতে পেরেছেন এমনটা শোনা যায়নি।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অর্থে শিল্পকলা একাডেমীতে একটি আধুনিক মঞ্চ গড়া হচ্ছে। যদিও তিন বার ধসে পড়ার পর বর্তমানে কাজ আবার বন্ধ। এটাকে নিয়ে অনেক নাট্যজন ও নাট্যকর্মীকে বেশ আনন্দিত হতে দেখা যাচ্ছে। আমর ধারণা শিল্পকলা একাডেমী চত্ত্বরের মঞ্চটি তৈরি হলেও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, সবকার নির্ধারিত ভাড়া, সব মিলিয়ে ওই মঞ্চ থেকে যাবে মঞ্চকর্মীদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে - যেমনটি ছিল শিল্পকলা একাডেমীর আগের মঞ্চ। এবং যে কারণে গত সাতাশ বছরেও নাট্যকর্মীরা শিল্পকলা একাডেমীকে আপন বা বন্ধু প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনি। শিল্পকলা একাডেমী মঞ্চে নাটক করতে গেলে একাডেমির স্টেজকর্মীদের হাতে টাকা না দিলে যে স্টোর থেকে লাইট বের হয় না বা মঞ্চের কাজেও সহযোগিতা পাওয়া যায় না এ কথা অন্ততঃ ঢাকার নাট্যকর্মীমাত্রই জানেন। এই সকল নানাবিধ অব্যবস্থা ও দুর্নীতির কারণে বিগত কয়েক বছরে বেশ ক'বারই শিল্পকলা একাডেমী কর্মচারীদের সাথে নাট্যকর্মীদের অপ্রীতকর ঘটনা ঘটেছে যা কখনও কখনও হাতাহাতি থেকে মারামারির পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে শিল্পকলা একাডেমীতে নাটকের একটি মঞ্চ হচ্ছে ভেবে যাঁরা আহ্লাদিত হচ্ছেন তাঁরা যে কল্পনারাজ্যে বিচরণ করছেন এ কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বরং ওই মঞ্চ যে নাট্যকর্মীদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকবে বিগত দিনের অভিজ্ঞতা তাই বলে।

বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন নামে একটি সংগঠন আছে যার জন্ম ২৯শে নভেম্বর ১৯৮১ সাল। প্রতি দুবছর পরপর একটি সম্মেলনের মাধ্যমে নেতৃত্বের পরিবর্তন এবং সেটাকে কেন্দ্র করে দুমাস ধরে কে আগামী নেতৃত্বে যাবে তার জন্য গ্রুপিং, লবিং, প্রতিবছর বিশ্বনাট্য দিবসে দায়সারা গোছের একটি র‍্যালি, দেশের রাজনৈতিক বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিবৃতি প্রদান ইত্যাদি ছাড়া মঞ্চনাটকের সৃজনশীল মান উন্নয়নের জন্য গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন কী করেছেন এ প্রশ্ন বাংলাদেশের হাজারো নাট্যকর্মীর। লক্ষণীয় যে, উক্ত ফেডারেশনের নেতৃত্বে ক্রমশ সৃজনশীল নাট্যজনদের উপস্থিতি কমে তা একটা নাম মাত্র ফোরামে পরিণত হচ্ছে। যেখানে কোনো বড়ো দলও মাসে এক বা দুই দিনের অধিক বুকিং পায় না নাটক মঞ্চায়নের জন্য। সেখানে প্রতি মাসে ১৫টি সন্ধ্যায় এমন নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে যেগুলো অগ্রজ নাট্যজন রামেন্দু মজুমদারের মতে দেখার অযোগ্য। প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে বর্তমান এই ভয়াবহ মঞ্চ ও বুকিং সংকটের কালে ওই নাটকগুলো মঞ্চস্থ হচ্ছে কেন? প্রতিমাসে ১৫ দিন ওই দেখার অযোগ্য নাটকগুলো দেখে দর্শক যদি মঞ্চনাটক থেকে মুখ ফেরায় তাহলে সে দায়িত্ব কে নেবে? বাংলাদেশে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন কি পারে না এ প্রক্রিয়াটি বদলে কোনো কার্যকর ভূমিকা নিতে কিংবা প্রতিমাসে দেখার অযোগ্য যে ১৫টি দলকে হল বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে সেটা বন্ধ করে যে সব দল ভালো নাটক করছে, যে সব নাটক দেখে দর্শক মঞ্চ থেকে মুখ ফেরাবে না তাদের নাটকগুলো বেশি মঞ্চায়নের সুযোগ সৃষ্টি করতে? যাঁরা মানসম্পন্ন নাটক দর্শককে দিতে পারছে না তাদের নাট্যচর্চাকে বন্ধ করে দিতে হবে এমন কথা আমি মোটেই বলছি না। বরং ফেডারেশন ওই দলগুলো যাতে ভালো নাটক করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ বা অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমিকা নিতে পারে। একটি নিয়মিত মনিটরিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ যখন মনে করবেন যে ওই দলগুলোর নাটক আর দেখার অযোগ্য নয় বা ওই নাটকগুলো দেখে দর্শক মঞ্চ থেকে মুখ ফেরাবে না তখনই তারা বেইলি রোডে নাটক মঞ্চায়নের সুযোগ পাবে এমন একটি

পরিবেশ সৃষ্টি করা আশু প্রয়োজন নয় কি?

সাম্প্রতিককালে মঞ্চনাটকের দর্শক কমে যাওয়া, মানসম্পন্ন ভালো নাটক মঞ্চস্থ না হওয়ার জন্যে অনেকেই টি ভি প্যাকেজ নাটক ও স্যাটেলাইটের ডিস কালচারকে দায়ী করেছেন। যেমন, জামালউদ্দিন হোসেন সম্প্রতি কালচারাল রিপোর্টার্স ফোরাম আয়োজিত মত বিনিময় সভায় অভিযোগ করেছেন, তরুণ নাট্যকর্মীদের কোনো কমিটমেন্ট নেই। প্রয়োজনীয় পড়াশুনার অভাব, সকলেই প্যাকেজের পেছনে ছুটছে। জনাব জামালউদ্দিন হোসেনের মতো করে এই অভিযোগটি আমাদের অগ্রজ অনেক নাট্যজনই করে থাকেন। একজন তরুণ নাট্যকর্মী হিসেবে এই অভিযোগের সকল দায় স্বীকার করেই বলছি টিভি বা প্যাকেজ নাটকে কাজ কি শুধু তরুণরাই করছে? আমাদের অগ্রজরা কি এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত নন। জনাব জামালউদ্দিন হোসেন নিজেও কি একজন অভিনেতা এবং নির্মাতা হিসেবে যখন ওই মাধ্যমে কাজ করছেন তখন কি তার তরুণ অভিনেতা - অভিনেত্রীদের দরকার হচ্ছে না? তিনি কি তরুণদের নিয়ে কাজ করছেন না? তাহলে একতরফা কেন তরুণরা প্যাকেজে ছুটছে এমন অভিযোগ? বাংলাদেশে প্যাকেজ নাটক নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে মাত্র চারপাঁচ বছর টিভি নাটক যদিও অনেক আগে থেকেই ছিল। বাংলাদেশের মঞ্চনাটকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভালো কাজ হয়েছে পুরো সত্তর দশক জুড়ে এবং আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। টিভি নাটক তখনও ছিল। সুতরাং টি.ভি. নাটক বা প্যাকেজ নাটক এসেই মঞ্চের সর্বনাশ করেছে, তরুণরা সব প্যাকেজে ছুটছে-মঞ্চনাটকের দুরাবস্থার জন্য এগুলো বোধ হয় কোনো বড়ো বা মূল কারণ নয়। প্রসঙ্গত দুজন অগ্রজ নাট্যজনের কথা উল্লেখ করা যায়, যাঁরা মূলত মঞ্চের লোক হয়েও বিগত সাতাশ বছর টেলিভিশন মিডিয়াতে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছেন। এখনও করছেন। তাঁরা হলেন জনাব মামুনুর রশীদ ও আবদুল্লাহ আল-মামুন। জরিপ করলে হয়তো দেখা যাবে যে ওই দুজন ব্যক্তিই গত সাতাশ বছরে মিডিয়াতে সবচেয়ে বেশি কাজ করেও ঢাকার অন্যতম দুটি নাটকের দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন, দলের জন্য নাটক লিখেছেন এবং পরিচালনাও করেছেন। এবং মঞ্চের জন্য তাদের 'সত্যিকারের নিষ্ঠা' ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। ঢাকার একটি অন্যতম প্রধান নাট্যদলের কর্ণধার জনাব নাসিরউদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু এক সময়ে একজন দক্ষ টিভি প্রযোজক ছিলেন। তাতে করে তাঁর মঞ্চ নাটকে 'সত্যিকারের নিষ্ঠায়' অন্তত: সত্তর দশক বা আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোন ব্যত্যয় ঘটেছে তাঁর কাজ তা প্রমাণ করে না। তাই টিভি প্যাকেজ বা স্যাটেলাইট বড়ো সমস্যা নয়, বড়ো সমস্যা আমাদের অগ্রজরা যে 'সত্যিকারের নিষ্ঠা' নিয়ে মঞ্চনাটক শুরু করেছিলেন সেখানে একটা ক্ষয়ের শুরু হয়েছে সেই আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে। কারণ স্বাধীনতার পর প্রথম পনেরো বছর মঞ্চনাটকে যে সাফল্য তার মূল অংশীদার যে ছয়টি নাট্যদল, চারজন নাট্যকার বা আটজন পরিচালক তাঁরা দু-একজন ব্যতিক্রম ছাড়া কোনো দল, কোনো নাট্যকার বা পরিচালকই সৃজনশীলতায় নিজ নিজ কাজকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। প্রসঙ্গত সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সম্পাদক জনাব গোলাম কুদ্দুসের একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কালচারাল রিপোর্টার্স ফোরামের সভায় তিনি বলেছেন, 'আমরা, মঞ্চকর্মীরা ঠিক আগের জায়গায় আছি কিনা ভাবা দরকার, স্বাধীনতার পর যে বিশ্বাস নিয়ে মঞ্চনাটক শুরু হয়েছিল আজ তা নেই। এক সময় যাঁরা মঞ্চ কাঁপিয়েছেন তাঁরা এখন অন্য কাজে ব্যস্ত'। জনাব গোলাম কুদ্দুসের 'অন্য কাজ' কথাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে। এ জন্য যে, স্বাধীনতার পর আমাদের যে সব অগ্রজ নাট্যজন 'সত্যিকারের নিষ্ঠা' নিয়ে নাট্যচর্চা শুরু করেছিলেন, সত্তর দশক জুড়ে এবং আশির দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আমাদের মঞ্চনাটকের যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান অর্জন তা যাঁদের হাতে, যে কটি দল, যে কজন নাট্যকার ও পরিচালকের হাতে অর্জিত, তাঁরাই এখন পর্যন্ত বিভিন্ন দলে নীতি নির্ধারণী কর্তৃত্ব থেকে শুরু করে দলের সকল কর্মকাণ্ডে কমবেশি

যুক্ত আছেন। উল্লিখিত দলগুলোতে নতুন বা তরুণ প্রজন্মের নাট্যকর্মীদের কাজ করার সুযোগ তৈরি হয়নি নীতি নির্ধারণ ও নাটক পরিচালনার ক্ষেত্রে। দুএকটি ব্যতিক্রম হয়তো আছে। আমাদের অগ্রজরা কাজের মধ্য দিয়েই নিজেদের তৈরি করেছেন, শিক্ষা আর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছেন। সেই কাজ করার সুযোগটা নতুনদের জন্য তৈরি হয়নি। তথাপি যে কজন পরিচালক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে তাদের মধ্যে খালেদ খান নিজ দলে এবং দলের বাইরে রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা', ইবসেনের 'পুতুল খেলা' এবং 'ভৃত্যরাজকতন্ত্র' পরিচালনার মধ্য দিয়ে পরিচালক হিসেবে তাঁর সৃজনশীলতা প্রমাণ করেছেন। এ ছাড়াও শামসুল আলম বকুল, ফয়েজ জহির, আলী মাহমুদ, আশীষ খন্দকার, ইশরাত নিশাত, আজাদ আবুল কালাম, তৌকির আহমেদ, গাজী রাকায়েত নতুন বা তরুণ প্রজন্মের যারাই নাটক পরিচালনার সুযোগ পেয়েছেন প্রত্যেকেই তাঁদেব প্রথম কাজে সৃজনশীলতা প্রমাণ করেছেন। তাই তরুণরা শুধুই প্যাকেজের প্রতি ছুটছে, তরুণদের কমিটমেন্ট নেই পড়াশুনা নেই জাতীয় ঢালাও মন্তব্য না করে বরং অগ্রজদের অভিজ্ঞতায় ছায়ায় ধরা যাক প্রথিতযশা নাটকার সৈয়দ শামসুল হকের কথাই যিনি এক সময় 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'নূরল দীনের সারাজীবন', 'ঈর্ষা'-র মতো মঞ্চসফল দর্শকনন্দিত নাটক একের পর এক তুলে দিয়েছেন মঞ্চকর্মীদের হাতে। তিনিই কি বিগত এক দশক জুড়ে বঞ্চিত করে চলেছেন না মঞ্চকর্মী সর্বোপরি দর্শককেও? একজন সৈয়দ শামসুল হক গত এক দশকে পারেননি নিজেই নিজেকে অতিক্রম করতে। এই সাদৃশ্য, যেসব দল ও পরিচালকদের হাতে স্বাধীনতার পর নাটকের সবচেয়ে মূল্যবান অর্জনগুলো, তাঁদের প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য, দুএকটি ব্যতিক্রম হয়তো আছে। প্রায় সকল দল বা পরিচালকই গত এক দশকে সৃজনশীলতায় নিজেরাই নিজেদের অতিক্রম কবতে পারেননি। এ পরিস্থিতি কি এটাই প্রমাণ করে না যে, 'সত্যিকারের নিষ্ঠা' নিয়ে এক সময় নাট্যচর্চা শুরু হয়েছিল কমবেশি সকলেই সেখান থেকে বর্তমানে দূরে অবস্থান করছেন। বিপরীত চিত্রটাও সকল নাট্যকর্মীর জানা। আমরা কি একজন সৈয়দ শামসুল হক আমাদের অনেক অগ্রজ নাট্যজনকে গত এক দশকে রাজনৈতিক মঞ্চ, রাজনৈতিক কলাম রচনা, ব্যক্তিগত ব্যবসা, রাজনৈতিক পরিচয়ের সুবাদে বিভিন্ন কমিটি উপকমিটিতে নিজেদের অবস্থান সংহত করার কাজে বেশি ব্যস্ত থাকতে দেখিনি। এবং এ সব কারণে মঞ্চ কি বঞ্চিত হয় নি তাঁদের কাছ থেকে প্রাপ্য প্রয়োজনীয় সময় ও মনোযোগ থেকে? সময়ের প্রয়োজনে সময়ের দাবিতে এক সময় যেমন জাদু এসেছে, সার্কাস এসেছে, এসেছে সিনেমা, একই সময়ের আবর্তনে এসেছে টি ভি প্যাকেজ ও ডিশ কালচার। এটা সময়ের প্রয়োজন এটাকে পৃথিবীর কোথাও অস্বীকার করা যায়নি, বাংলাদেশেও যাবে না। এক সময় যখন সিনেমা এসেছিল, তখন এমন কথা উঠেছিল, যে মঞ্চনাটককে টিকিয়ে রাখা যাবে না। কিন্তু মঞ্চ তার নিজস্ব শক্তিতেই টিকে আছে এবং থাকবে। টি ভি প্যাকেজ বা ডিশ কালচার মঞ্চের বর্তমান দুরবস্থা বা দর্শক কমে যাওয়ার একটা কারণ এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কারণ এই সময়ে যতটা 'সত্যনিষ্ঠ' হয়ে মঞ্চের কর্মীদের দাঁড়ানো দরকার ছিল নানাবিধ কারণে তা সম্ভব হয়নি। আমরা সে সমস্যা গুলোকে পাশ কাটিয়ে বর্তমানে অধিকাংশ নাট্যজন, টি ভি-প্যাকেজ আর ডিশ কালচারের সমালোচনায় সভা, সেমিনার আর বেইলি রোডের চায়ের দোকানে ঝড় তুলে এক ধরনের আত্মতুষ্টি লাভের চেষ্টায় ব্যস্ত। এ প্রসঙ্গে অগ্রজ নাট্যজন শ্রদ্ধেয় নাসিরউদ্দীন ইউসুফ বাচ্চুর একটি উক্তি স্মরণযোগ্য। কালাচারাল রিপোটার্স ফোরামের আলোচনায় তিনি বলেন, 'মঞ্চনাটকের দর্শক কমে গেছে এ কথা ঠিক। তবে নাটক শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে মঞ্চেই। বহু বছর পূর্বের কথা ভাবুন, জাদু এসেছে, সার্কাস এসেছ, সিনেমা এসেছে। ভাবা হয়েছিল এই বুঝি থিয়েটার টিকলো না। কিন্তু থিয়েটার টিকে গেছে। ইদানিং কেউ কেউ বলেন ডিশ মঞ্চনাটকের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। আমি এ কথার সাথে একমত নই। থিয়েটারের

জায়গা কেউ দখল করতে পারবে না। কারণ একসময় ফিল্মের দর্শক টি ভি তে এসেছে। অচিরেই টিভির দর্শক মঞ্চে ফিরে আসবে। তবে এ জন্য আমাদের আরও আন্তরিক হতে হবে। যাঁরা বলেন তারকা ছাড়া নাটক জমে না, আমি তাঁদের সাথেও একমত নই। আমি তারকা পরিচয়বিহীন নাট্যকর্মীদের নিয়ে নাটক করে প্রমাণ করেছি দর্শক ভালো কাহিনির পাশাপাশি ভালো অভিনয় দেখতে চায়'। আমি মনে করি অগ্রজ নাসিরউদ্দীন ইউসুফ বাচ্চুর উপলব্ধিতেত সেই 'সত্যিকারের নিষ্ঠার' কথাই পুনর্ব্যক্ত হয়েছে। স্বাধীনতার পর যে 'সত্যিকারের নিষ্ঠা' নিয়ে নাট্যচর্চা শুরু হয়েছিল, আবারও 'সত্যিকারের নিষ্ঠা' নিয়ে শুরু করতে পারলেই সম্ভব মঞ্চনাটকের বর্তমান অন্ধকারকে জয় করা।

সবশেষে একজন তরুণ নাট্যকর্মী হিসেবে 'তরুণদের পড়াশুনা নেই, কমিটমেন্ট নেই, সবাই প্যাকেজের প্রতি ছুটছে' এ ধরনের ঢালাও মন্তব্যের প্রেক্ষিতে একটু কৈফিয়ত দেবার দায় অনুভব করছি। তরুণরা যে প্যাকেজের প্রতি ছুটছে এ প্রবণতাকে আমি অস্বীকার করছি না। টেলিভিশন একটি ভিন্ন জনপ্রিয় মাধ্যম, সেখানে কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রী একটি নাটকে কাজ করলে ন্যূনতম তিনকোটি দর্শক ওই অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে দেখে এবং চেনে। মহিলা সমিতি হাউসফুল হলে সর্বাধিক তিনশো দর্শক উপস্থিত হয়। আমাদের যে অগ্রজরা আজ 'তরুণরা প্যাকেজের প্রতি ছুটছে' বলে অভিযোগ তুলছেন, তাঁরা যখন তরুণ ছিলেন এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনে যখন সাপ্তাহিক ও ধারাবাহিক নাটক শুরু হয় তখন তাঁরাও কি টেলিভিশনে নাটক করতে ছোটেননি? তাঁরাও কি টেলিভিশন মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় হয়ে সে পরিচয়কে ব্যক্তিগত প্রয়োজন, ব্যবসা ইত্যাদিতে ব্যবহার করেননি? প্রত্যেক অভিনেতা - অভিনেত্রীই চায় অধিক সংখ্যক দর্শকের সঙ্গে পরিচিত হতে। এটাতো একটা স্বাভাবিক প্রবণতা। এ বাস্তবতাও তো অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে মঞ্চকর্মীটি জীবনের অনেক ত্যাগের মধ্য দিয়ে মঞ্চনাটকেটিকে আছে। ভালো অভিনয় করে হয়তো দশ বা পনেরো বছর ধরে মঞ্চে কাজ করছে। বাবা -মা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলেই জানে অমুক নাটক করে। এ অভিজ্ঞতা আমার মতো হয়তো হাজারও নাট্যকর্মীর 'কিরে কত বছর নাটক করিস, টি ভিতে ক্যান দেখি না? কী নাটক করিস' জাতীয় প্রশ্ন কি আহত করে না একজন সিরিয়াস মঞ্চকর্মীকেও? ধরা যাক অমুক দলে 'ক' মঞ্চে একজন নিবেদিত নাট্যকর্মী এবং খুব ভালো অভিনয় করে কিন্তু টেলিভিশনে কখনো কাজ করেনি কিন্তু 'খ' মঞ্চে নিবেদিত নয়, অভিনয়ও ভালো করে না। কিন্তু নানা উপায়ে সে টেলিভিশনে কয়েকটি নাটকে অভিনয় করে পরিচিত ও জনপ্রিয়, দুজন একই দলে কাজ করে। ঢাকায় বা ঢাকার বাইরে দলের একটি মঞ্চায়নে দুজন এক সঙ্গে গেলে দেখা যায় দশজন তরুণ - তরুণী এসে 'ক' কে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল 'খ' এর অটোগ্রাফ নিতে বা সঙ্গে একটি ছবি তুলতে। ঢাকার সংস্কৃতিচর্চার প্রাণ কেন্দ্র টি এস সি তে আমার নিজ চোখে অভিজ্ঞতা আছে কিছু ছাত্রছাত্রী বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নাট্যনির্দেশক অভিনেতা যিনি এ দেশের নাট্যচর্চার পথিকৃত দের একজন তাঁকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে খালেদ খান ও অপু নামের একজন তারকার সঙ্গে ছবি তুললো। আমি জানি না সেদিনের ওই মুহূর্তটা শ্রদ্ধেয় আতাউর রহমান কীভাবে নিয়েছিলেন। এই যখন বাস্তব অবস্থা তখন মঞ্চের মহামানব যাঁরা তাঁদের হয়তো মিডিয়াতে কাজ করার মোহ না থাকতে পারে কিন্তু যারা মানুষ তারা মিডিয়াতে কাজ করতে চাইবেই। এ কথাও তো সত্যি যে গত সাতাশ বছর ধরে টেলিভিশন মাধ্যমে যাঁরা অভিনেতা - অভিনেত্রী হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁদের নব্বই শতাংশই হচ্ছেন মঞ্চের লোক। তারকা কিন্তু গত সাতাশ বছরে হাজারে হাজারে এসেছে এবং হারিয়ে গেছে।

টি ভি অথবা প্যাকেজ কাজ করার প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার পেছনে আর একটি কারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেটা অর্থনৈতিক। অগ্রজ জনাব মামুনুর রশীদের একটি উক্তি আবারও স্মরণ করতে হয়।

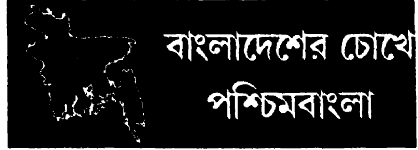
কালচারাল রিপোর্টার্স ফোরাম আয়োজিত সভায় তিনি বলেছেন, 'দীর্ঘ সাতাশ বছরে, ঢাকায় একটি মঞ্চ হলো না অথচ পাড়ায় পাড়ায় স্টেডিয়াম হচ্ছে। এই বাস্তবতায় আমরা যে মঞ্চ নাটক টিকিয়ে রেখেছি এটাই বড়ো কথা। মঞ্চের কর্মীরা নিজেদের পকেট থেকে পয়সা দিয়ে নাটক করে! একজন নাট্যকর্মী প্রতিমাসে যাতায়ত বাবদ অন্তত দুই হাজার টাকা খরচ করে, প্রতিটি দল বছরে অন্তত ৫০ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা ভর্তূকি দেয়'। এর বিপরীত চিত্রটি হচ্ছে টি ভি বা প্যাকেজে। এখন পর্যন্ত নব্বই শতাংশই মঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কাজ করছেন এবং টি ভি ও প্যাকেজে কাজ করে মঞ্চে সকলেই হয়তো নন কিন্তু অনেকেই বেশ বড়ো অঙ্কের টাকা পাচ্ছেন। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের হাতছানিকে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে ছোটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। সময়ের এই সংকট শুধু ঢাকাতেই নয় কলকাতাতেও সমানভাবে বিরাজমান। যে কারণে বহুরূপীর দেবেশ রায় চৌধুরীর মতো নিবেদিত মঞ্চকর্মীকেও ডি ডি মেট্রোর টি ভি সিরিয়ালে ব্যস্ত থাকতে হয়। এ সংকট ওই বঙ্গেও প্রায় সকল মঞ্চকর্মীর। আমি ব্যক্তিগতভাবে এটা নিয়ে দেবেশ রায় চৌধুরীকে প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তর একটাই - 'দাদা বাঁচতে তো হবে'। তারপরও দেবেশ রায় চৌধুরী মঞ্চে কাজ করেছেন। আমাদের এখানেও মঞ্চনাটক হচ্ছে। তরুণ প্রজন্মের অভিনেতা - অভিনেত্রীদের মধ্যে আমার ধারণা বিপাশা হায়াত এবং তৌকির আহমেদ জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি টি ভি এবং প্যাকেজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও বিপাশা এখনও মঞ্চনাটককে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তৌকির আহমেদও নাট্যকেন্দ্রের কোনো কাজ থাকলে সেটাকেই গুরুত্ব দেন। নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের মহড়ায় বিপাশা হায়াতকে আমি শুটিং ফ্লোর থেকে মেকআপ নেওয়া অবস্থায় উপস্থিত হতে দেখেছি। মহড়া ও মঞ্চায়ন, এগুলোকে টি ভি- প্যাকেজের তুলনায় বেশি গুরুত্ব দিতে দেখেছি। এই 'সত্যিকারের নিষ্ঠা' ছোটো করে দেখবার কোনো কারণ নেই। কেউ কেউ আছেন যারা সব সময় টি ভি প্যাকেজকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। আমার ধারণা এই প্রভেদ কমবেশি সব দলেই বিদ্যমান। তাই কোনো মিডিয়াকে দোষারোপ নয়, প্রত্যেক মঞ্চকর্মীর 'সত্যিকারের নিষ্ঠা'ই পারে মঞ্চনাটককে তার সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে। ঢাকায় বর্তমানে প্রথম শ্রেণির নাট্যদলগুলোও প্রতিমাসে বেইলি রোডের গাইড হাউসে ও মহিলা সমিতিতে দুটির বেশি বুকিং পায় না। এ অবস্থায় একজন নিবেদিত প্রাণ নাট্যকর্মীরও মাসে দুটো শোতে অভিনয় করা, দুটো মহড়াতে সন্ধ্যায় দুঘণ্টার জন্য উপস্থিত হওয়ার চেয়ে বেশি ব্যস্ত থাকার সুযোগ নেই। এ ছাড়া বছরে বা দুবছরে দল একটি নতুন নাটক ধরলে হয়তো দুতিন মাস সান্ধ্যকালীন ব্যস্ত থাকা সম্ভব হয়। তারপরও কথা থাকে বড়ো দলগুলোতে সব প্রযোজনায় সবার কাজ করার সুযোগ থাকে না। এ অবস্থায় মঞ্চের একজন নিবেদিত কর্মী তাঁর কাজের ক্ষুধা মেটাতে যদি তার বাড়তি বা অবশিষ্ট সময়টুকু বেইলি রোডের চায়ের আড্ডায় নষ্ট না করে টি ভি বা প্যাকেজ নাটক করাতে ব্যয় করে সেটা বোধ হয় অযৌক্তিক বা অন্যায় কিছু নয়। মঞ্চের প্রতি 'সত্যিকারের নিষ্ঠা' থাকলে মিডিয়াতে কাজ করেও যে মঞ্চ কাজ করা যায় সেটা অগ্রজ আবদুল্লাহ আল-মামুন ও মামুনুর রশীদ সহ অনেকেই প্রমাণ করেছেন। বর্তমানে অনেক তরুণও তা প্রমাণ করছেন।

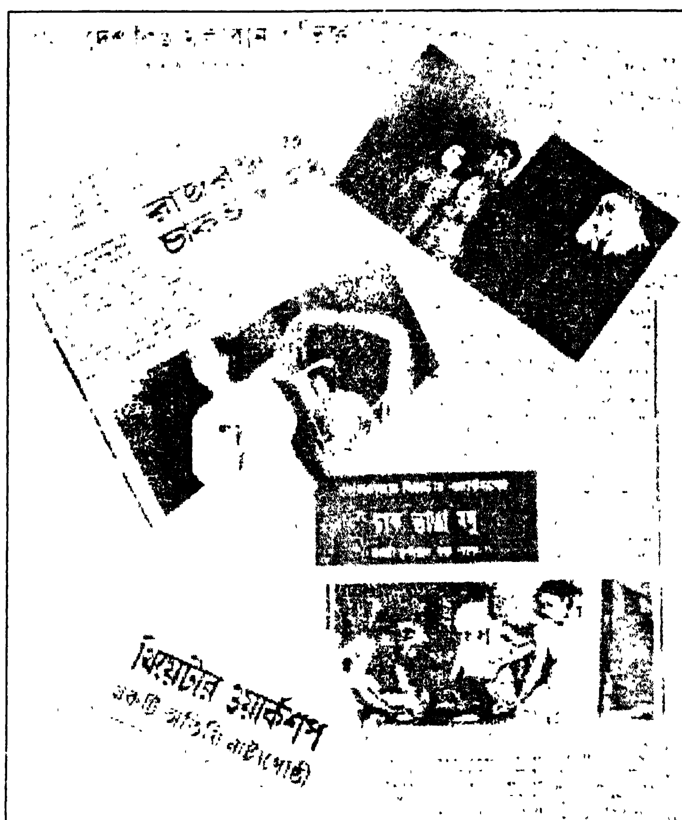


ক



খ


বাংলাদেশের চোখে
পশ্চিমবাংলা



ক



খ

পশ্চিমবঙ্গের গণনাট্য নবনাট্য গ্রুপ থিয়েটার ও উৎপল দত্ত

রাহমান চৌধুরী

রাজনৈতিক নাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসাবে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ভারতে জন্মলাভ করেছিল উনিশ শো তেতাল্লিশ সালে। উনিশ শো তেতাল্লিশ সালেই বাংলায় গণনাট্যকে ঘিরে রাজনৈতিক নাট্যধারা আরম্ভ হয়েছিল যা পরবর্তীকালে ব্যাপক আকার নিয়েছিল। গণনাট্য সংঘ মার্কসবাদী রাজনীতির সংস্পর্শেই জন্ম নিয়েছিল, যদিও শুরুতে তা উচ্চকিত ছিল না। উদারনৈতিক ও প্রগতিশীল ব্যক্তিরাও যাতে গণনাট্যের সাথে যুক্ত হতে পারেন সে জন্য মূল রাজনীতির দিকটা প্রচ্ছন্ন ছিল। যদিও একেবারে প্রথম থেকেই গণনাট্য আন্দোলনের অধিকাংশ কর্মী মার্কসবাদী রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গণনাট্যের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের মূল নাট্যধারাই হয়ে দাঁড়াল রাজনৈতিক এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তার পক্ষে এক শক্তিশালী সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

ভাবতীয় গণনাট্য আন্দোলনের মূলে রয়েছে সোভিয়েত দেশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে ভারতে সাম্যবাদী দলের কার্যক্রমের নেপথ্য প্রেরণায় প্রগতি লেখক সংঘ তথা ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ এবং রবীন্দ্রনাথেব যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখালেখির প্রভাব। সর্বোপরি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভূমিকা ও শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাব। গণনাট্য সৃষ্টির পেছনে প্রত্যক্ষ কারণ ছিল প্রগতি লেখক সংঘ বা ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক সংঘের কার্যক্রম। উনিশ শো ছাব্বিশ সালে রম্যা রঁলার সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষাৎকার ঘটে। রঁলার সাথে এই সাক্ষাৎকারের পর যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ জোরালো সমর্থন দেন। ভারতের তরুণ সমাজকে তা বিশেষ উদ্বুদ্ধ করে। বিলাতের সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ ও প্রগতিশীল তরুণ-লেখকরা তখন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের আন্দোলন গড়ে তোলে, এ ঘটনাও অনেক ভারতীয় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের অনুপ্রাণিত করে। ফলে ভারতের প্রগতিশীল লেখকগণ নিজেদের সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন।

উনিশ শো ছত্রিশ সালে লখনউ শহরে সর্বভারতীয় লেখকদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মুন্সি প্রেমচাঁদ। জন্ম নেয় প্রগতি লেখক সংঘ। উনিশ শো আটত্রিশ সালে কলকাতায় সংঘের সর্বভারতীয় দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় সংঘের রাজনৈতিক সংকল্প ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে কোনো পক্ষকেই সমর্থন না করা। ইতিমধ্যে সংঘের কোনো উদ্যমী কার্যক্রম না থাকায় সংঘের সদস্যরা কিছুদিনের জন্য স্তিমিত হয়ে পড়েন। এই সময় একদিকে বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল, আর একদিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভারত ছাড়ো আন্দোলনের তরঙ্গ শীর্ষে ঘটে একটি দুঃখজনক ঘটনা। উনিশ শো বিয়াল্লিশের আটই মার্চ ক্ষমতাশীল তরুণ-লেখক, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী সোমেন চন্দ ঢাকায় পঞ্চম বাহিনীর হাতে ছুরিকাঘাতে নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ড বাংলার শিল্প ও সাহিত্য জগৎকে ভীষণভাবে নাড়া দেয় এবং তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে, এমন একটি অবস্থা দাঁড়িয়েছে যখন শিল্প ও ব্যক্তিগত সততাকে রক্ষা করতে হবে। প্রগতি লেখক সংঘ এ সময় ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ নাম নিয়ে পঞ্চম বাহিনী ও তাদের ফ্যাসিস্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফ্যাসিস্তদের যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার করাই তখন সংঘের মূলনীতি হয়ে দাঁড়ায়। পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিও আস্থা স্থাপন করা ছিল মূল লক্ষ্য।

মার্কসবাদ বিকাশে সব চেয়ে বেশি সাহায্য করেছিল ভারতের শ্রমিক কৃষক আন্দোলনগুলো। জগদ্দল চটকল শ্রমিকদের ব্যাপক ধর্মঘট, বোম্বাই, আহমেদাবাদ ও কানপুরের সুতোকল ও কাপড়ের

কলগুলোতে শ্রমিক ধর্মঘট, দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে ধর্মঘট, টাটা ইস্পাত কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট, কলকাতায় গাড়োয়ান ধর্মঘট, আসামের চা বাগানে কুলি ধর্মঘট ভারতে মার্কসবাদ বিকাশে প্রভূত সাহায্য করেছিল। সেই সাথে সোভিয়েত রাশিয়ায় বলশেভিকদের জয় সারা পৃথিবীতে মুক্তিকামী মানুষের সঙ্গে ভারতবাসীকেও অনুপ্রাণিত করেছিল নতুন রাজনৈতিক এই দর্শন গ্রহণে। জাতীয়তাবাদী ও সন্ত্রাসবাদী যে সব বাঙালি ব্রিটিশের কারাগারে দণ্ডিত ছিলেন, তাঁদের অনেকেই, বিশেষ করে তরুণদের অনেকেই মার্কসবাদী চিন্তা-ভাবনায় ভাবিত হচ্ছিলেন। মার্কসবাদীদের প্রভাবেই কৃষক শ্রেণির মধ্যেও এ সময় একটা নতুন চেতনা আসে। জোতদার ও মহাজনের শোষণ থেকে মুক্তি পাবার জন্য তাঁরাও সংঘবদ্ধ হতে থাকেন। জাতীয় কংগ্রেসও নীতিগতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য হয় লাঙ্গল যার জমি তার। যদিও শ্লোগানটি কমিউনিস্টদের। কিন্তু বাংলার পেশাদারি নাট্যমঞ্চে এর কোনো চিত্রই সেদিন ধরা পড়েনি। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে কলকাতার পেশাদার নাট্যশালার সঙ্গে রাজনীতি, জীবন ও সমাজের বাস্তব কোনো সম্পর্ক ছিল না।[১] রোমান্টিক নাটক কিংবা ধর্মাশ্রিত নাটক রচনা ও মঞ্চায়নে তখনও তারা ব্যস্ত। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তখন দুর্মর হয়ে উঠেছে, আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল কংগ্রেস দল। কংগ্রেসের আপসমুখী দোদুল্যমান নীতি জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করবে, বহুজনই আর এ বিশ্বাস রাখতে পারছিল না। স্বভাবতই, এ অবস্থায় মার্কসবাদীদের যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সাংস্কৃতিক জগতেরও বিপুল সংখ্যক মানুষকে আকৃষ্ট করল।

বিশ শতকের চল্লিশের দশক সত্যিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দশক। যুদ্ধের রসদ জোগাতে গিয়ে ব্রিটিশ ভারতের শস্যভাণ্ডার শেষ। বিবেকশূন্য কালোবাজারিরা, মানুফাখোর-মজুতদাররা, চোরাকারবারিরা ব্রিটিশ সরকারের বাহিনীকে খাদ্য জোগাতে সাহায্য করে টাকার পাহাড় বানাল কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য বয়ে আনল, দুর্ভিক্ষ, অভাব-অনটন। মানুষের সৃষ্ট সেই মন্বন্তর যা বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তর বলে চিহ্নিত। সেই মন্বন্তর বাংলাদেশের পনেরো লক্ষ দরিদ্র নরনারী সর্বনাশের সম্মুখীন হয়েছিল।[২] পঞ্চাশ হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল। কিন্তু সে ব্যাপারে বাংলার পেশাদারি নাট্যশালায় তার কোনো প্রতিধ্বনি নেই। পেশাদারি থিয়েটার তখন গন্ডিবদ্ধ হয়ে পুরানো চক্রের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, কিছুতেই সে চক্র ভেঙে বের হয়ে আসতে পারছে না। মিলনায়তনের বাইরের জগৎটাকে যেন সে দেখতেই চাইছে না। পুরানো চিন্তার মধ্যেই বুঁদ হয়ে আছে। পেশাদারি থিয়েটারের দর্শকও তখন কমে গেছে, কিন্তু দর্শকদের টেনে আনবার জন্য কোনো চিন্তা তারা উদ্ভাবন করতে পারছে না। যেন নতুন এক থিয়েটারকে জায়গা করে দেবার জন্য ইতিহাস এ অনিবার্যতাকে সৃষ্টি করেছে।

তেতাল্লিশ সালে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের জড়তা, পৌনঃপুনিকতা আর স্থূলতাকে ভাঙার জন্য, ভেঙে নতুন নাটককে জায়গা করে দেবার জন্য ঘোষিত হয়েছিল গণনাট্য সংঘের কর্মসূচি। গণনাট্যের ঘোষণাপত্রে বিষয়বস্তু নির্ধারণের প্রশ্নে বলা হয়েছিল সমাজের যে শ্রেণিদ্বন্দ্বগুলি প্রধান সেগুলি সঠিকভাবে দর্শকদের সামনে তুলে ধরাটাই হবে গণনাট্যের কাজ। নাট্যকারদের দায়িত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, শ্রমিক-কৃষক এই দুই প্রধান শ্রেণির আন্দোলনের পটভূমিকায় নাটক রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকারদের সমধিক গুরুত্ব দিতে হবে। শ্রমিক-মালিকের দ্বন্দ্ব ও কৃষক-জোতদার, জমিদারের দ্বন্দ্বগুলিই স্বাভাবিকভাবে প্রাধান্য পাবে। কিন্তু যেহেতু এই মূল দ্বন্দ্ব ছাড়াও শ্রেণি বিভক্ত সমাজে নানা ধরনের দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব বর্তমান, সেহেতু শ্রমিক ও কৃষক এই দুই প্রধান শক্তি ছাড়াও অসংখ্য মেহনতি মানুষ প্রতিনিয়ত একচেটিয়া পুঁজিবাদ, সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল হচ্ছে ; তাদের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংগ্রামের কাহিনিও নাটকের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া দরকার।[৩]

চল্লিশ দশকে এবং তারপরেও যেখানেই সাধারণ মানুষ অত্যাচার আর অন্যায়ের মুখোমুখি হয়েছে, সেখানেই গণনাট্য জনগণের সংগ্রামের পাশে দাঁড়িয়েছে। বাংলার কৃষক যখন তেভাগার

দাবিতে ধানের মঞ্জুরি হাতে বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়েছে, গণনাট্য সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা জাগাবার উদ্দেশ্যে মঞ্চের প্রতিটি আঙ্গিককে যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত করেছে। আবার সাতচল্লিশ সালের পর স্বাধীন ভারতের বুকে শোষণ যখন নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে তখন বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে বাংলার গণনাট্য মঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে নির্ভীকভাবে তার প্রতিবাদ করেছে। বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনগণের জন্য সংস্কৃতির এই বিরাট দায়িত্ব গণনাট্য গ্রহণ করেছিল বলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রাম, মফস্বল শহর সর্বত্রই এই গণনাট্যকে মানুষ গ্রহণ করল সাদরে। জনগণ সম্পৃক্ত হল গণনাট্যের উদ্যোগের সাথে। মঞ্চান্দোলনে সাধারণ মানুষের যোগদান—এ ছিল সে যুগের এক অভূতপূর্ব দিক। শুধুমাত্র শহরতলির কিছু বোদ্ধা দর্শক নয়, গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-মাঠে সাধারণ জনগণের উৎসাহ ও উদ্দীপনা এর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। গণনাট্যের মাধ্যমেই মার্কসবাদের প্রসার ও প্রচার শুরু হল গ্রামে গঞ্জে খেটে খাওয়া মানুষদের মধ্যে।

বাংলাদেশের অন্তর্গত ময়মনসিংহের হাজং অঞ্চলে রাজশাহীর নাচোলে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। সেই সব দীর্ঘকালীন কৃষক বিদ্রোহে শুধু জমিদার-জোতদার নয়, শাসক গোষ্ঠীর ঘুম ছুটে গিয়েছিল। কৃষকদের তেভাগার সংগ্রামে প্রথম সারিতে এসে দাঁড়িয়েছিল ময়মনসিংহের হাজং চাষিরা, মালদহ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি জেলা আর দক্ষিণ বাংলার কাকদ্বীপ সোনারপুর ও ভাঙরের লক্ষ লক্ষ বর্গাচাষি আর ক্ষেতমজুর। গোটা চাষি সমাজই এই সংগ্রামে সামিল হয়েছিল। অধিকার রক্ষা, অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তারা অবলীলাক্রমে রাইফেলের সম্মুখীন হয়েছিল। প্রচণ্ড শক্তির সঙ্গে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত তারা জয় লাভ করতে পারেনি। কিন্তু তাদের সেই সংগ্রাম রেখে গিয়েছিল নতুন পথের ঠিকানা। সেই সব আন্দোলনের কোনোটাই গণনাট্য আন্দোলনের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। সেই সব বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে 'উদয়াস্ত', 'ডাক', 'তরঙ্গ', 'ঢেউ', 'এই মাটিতে', 'গায়েন', 'বাঘের খেলা' নাটকগুলো।

কৃষক বিদ্রোহের ওপর আর একটি উল্লেখযোগ্য নাটক 'বিদ্রোহী বীর তিতুমীর'। কৃষক অভ্যুত্থানের লড়াকু কৃষকরা স্থান পেল এ নাটকে। বত্রিশ সালে মালদহ দিনাজপুরের সাঁওতাল কৃষকরা জমিদার জোতদারদের বিরুদ্ধে তাদের অধিকার রক্ষার সংগ্রাম করে। সেই প্রেক্ষাপটে রচিত হয় 'সাঁওতাল বিদ্রোহ'। স্বাধীনতার পর জোড়াডাঙ্গার কৃষকরা যখন তাদের ন্যায্য দাবি নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করল, পুলিশ তখন সামন্ত প্রভুদের রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এলো। কৃষকরা বাধা দিল এবং নিহত হল তারা বহু সংখ্যায়। সেই ঘটনা নিয়ে অনিল ঘোষের 'নয়া পুর' নাটক। জমির জন্য কৃষকদের লড়াইকে ভিত্তি করে লেখা হয় এই নাটক। পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বীরভূম জেলার পটভূমিতে আদিবাসী ও সাঁওতাল চাষীদের কৃষক লড়াইকে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে 'দেবীগর্জন'। উনিশ শো পঞ্চাশ সালে ঢাকঢোল পিটিয়ে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করা হয়। উচ্ছেদের জন্য আইনও করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল আইনের ফাঁক গলিয়ে জোতদার জমিদাররাই কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ করছে। জমির জন্য কৃষকদের সেই সংগ্রামের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'আমার মাটি'। গোবিন্দ চক্রবর্তীর 'আবাদ' নাটকেও জোতদারদের বিরুদ্ধে চাষিদের সংগ্রাম বিবৃত হয়েছে। সামন্তবাদের সঙ্গে জনগণের দ্বন্দ্বের পটভূমি আছে এখানে। কৃষক বিদ্রোহের ওপর আরো প্রচুর নাটক লেখা হয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মেঘ কাটার পালা', 'খাদ্যচোর', 'ফেরার', 'পাকা ধানের বাস', 'শঙ্খচূড়' ইত্যাদি। কিন্তু পরবর্তীকালে মূলত জোরটা বেশি দেখা যায় শ্রমিক আন্দোলনের দিকেই।

শ্রমিক শ্রেণির নিজস্ব রাজনৈতিক পার্টি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের পর এ দিকে নতুন যুগের লেখকদের দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রমিকদের নিয়ে নাটক লেখার তেমন কোনো উদাহরণ নেই দীর্ঘদিন পর্যন্ত। শ্রমিক চরিত্র এবং শ্রমিকদের জীবন নিয়ে নাটক লেখা বৃদ্ধি পায় স্বাধীনতার পর। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতের জনগণের সাথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বটাই ছিল প্রধান। স্বাধীনতার

যন্ত্রণাই তখন সমগ্র চিন্তাকাশ জুড়ে ছিল। ফলে স্বাধীনতার পূর্বের নাটকগুলোতে কৃষকরাই প্রাধান্য পেয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়। শ্রমিক শ্রেণি ও বুর্জোয়াদের দ্বন্দ্ব মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। এই সময়ই থেকে শ্রমিক শ্রেণি এবং শ্রমজীবী জনগণের উপর বুর্জোয়াদের চাপিয়ে দেওয়া নির্মম শোষণের দিকে বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি পড়ে। নাট্যকাররা শ্রমিকদের নিয়ে বেশি করে নাটক লিখতে আরম্ভ করেন। ছাঁটাই বিরোধী ধর্মঘট, মালিকের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার নিয়ে ধর্মঘট, যেমন নাট্যরচনা ও প্রযোজনায় প্রাধান্য পেল, তেমনি মালিক শ্রেণির শ্রেণি চরিত্রকে নগ্ন করে তোলা হল যাতে তাদের বিরুদ্ধে দর্শকের শ্রেণি ঘৃণা জাগ্রত করা যায়। শ্রমিক শ্রেণিকে নিয়ে অমর গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন 'দ্বান্দ্বিক' এবং মমতাজ আহমেদ খাঁ ও রনেন ঘোষ দস্তিদার রচনা করেন 'ইস্পাত'। ধর্মঘট চলার সময় শ্রমিকদের দুরবস্থা এবং তার জন্য তাদের হতাশা, অন্নের জন্য হাহাকার প্রভৃতি 'ইস্পাত' নাটকে এবং কিছুটা 'দ্বান্দ্বিক' নাটকেও প্রধান হয়ে উঠেছে। শ্রমিক শ্রেণির সমস্ত সংগ্রাম ক্রমশই রাজনৈতিক সংগ্রামের চেহারা নেয়, শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে পরিণত হয়। শ্রমিক শ্রেণির এই বৈশিষ্ট্যসূচক দিক নিয়ে বাংলার গণনাট্য যে কয়টি নাটক মঞ্চস্থ করেছে তার মধ্যে বাসুদেব বসুর 'মুক্তির অন্তরালে' একটি। 'মুক্তির অন্তরালে' শ্রমিক শ্রেণীর এই সচেতন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অতি উচ্চ গুণমানে প্রকাশিত হয়েছে। উনিশ শো পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি সালে দুর্গাপুরে শ্রমিক শ্রেণি খাদ্য বন্দিমুক্তি ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে বিরাট আন্দোলন করে, দিলীপ ঘোষালের 'আগুন রাঙ্গা ইস্পাত' নাটক তারই এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।

বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'আঁতাত' নাটকে দেখানো হয়েছে শ্রমিক আন্দোলনের চেহারা। নাটকেও ফুটে উঠেছে ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বহারা শ্রেণির সংগ্রাম। শ্রমিক শ্রেণির নিয়ে লেখা অন্যান্য নাটকের মধ্যে রয়েছে 'কিমলিস', 'আলোয় ফেরা', 'লেবার অফিসার', 'ফুলের রঙ লাল', 'ছাঁটাই' ইত্যাদি নাটক। উনিশ শো চুয়াত্তর সালে এক ব্যাপক রেল ধর্মঘট দেখা দেয়, রেল শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সরকার মাস্তান লেলিয়ে দেয়। তার বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলনের ভিত্তিতে রচিত নাটক, 'রেল কি ভেলকি', 'এ প্রাণ রাতের গাড়ি', 'বেইমান মা'। 'বেইমান মা' নাটকে দেখা যায় শ্রমিকদের সাথে মহিলা ও শাসকের গুন্ডাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। শ্রমিক আন্দোলনের ধর্মঘট ও অন্যান্য বহুবিধ সমস্যার প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে 'মৃত্যু নাই', 'সূর্যগ্রাস', 'মশাল', 'মোকাবিলা', 'নাগপাশ', 'দাবি ইত্যাদি নাটকে। বস্তিজীবনের লাঞ্ছনা এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, বস্তি উচ্ছেদের চক্রান্তের প্রতিরোধের ওপর নাটক 'পূর্ণগ্রাস', 'ভাঙাগড়ার খেলা'। বিচারের নামে প্রহসনের নাটক 'বিচার'। তন্তুবায় বিদ্রোহের নাটক 'চন্দনডাঙার হাট'। জীবন যন্ত্রণা, পিছুটান, অন্ধ সংস্কার, সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ মাড়িয়ে সুস্থ সুন্দর জীবন প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামী নাটক 'গাঙ্গুলী মশাই', 'নবজন্ম', 'ইঙ্গিত', 'কিংবদন্তী', 'নাটক নয়', 'পান্থশালা', 'নীলদরিয়া' প্রভৃতি। ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস ও স্বৈরতন্ত্রের স্বরূপ উদঘাটনের নাটক 'পাগলাঘন্টী', 'রক্তে ধোয়া দিন', 'পথ', 'সমুদ্র মন্থন'; সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে 'মড়া', 'নয়াবসত' ইত্যাদি।

দীর্ঘ ত্যাগ তিতিক্ষা সত্ত্বেও গণনাট্য বাংলার তথা পশ্চিমবঙ্গের মূলধারা হিসাবে টিকে থাকতে পারেনি। পশ্চিমবাংলার নাট্য আন্দোলনের মূল ধারা হয়ে দেখা দেয় গ্রুপ থিয়েটারগুলো। তিরানব্বই সাল পর্যন্ত এক হিসাবে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের সতেরোটি জেলায় গণনাট্যের মোট তিনশো বারোটি শাখা রয়েছে, গড়ে প্রায় প্রতিটি জেলায় আঠারোটি করে শাখা।[৪] কিন্তু গণনাট্যর এই শাখাগুলোর বাইরে সারা পশ্চিমবঙ্গে নাটক মঞ্চায়ন করে চলেছে ন্যূনতম তিন হাজার গ্রুপ থিয়েটার বা বিভিন্ন নাট্যদল।[৫] যার কর্মীরা সবাই যে মার্কসবাদী, বা দলগুলো যে মার্কসবাদী রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সম্পৃক্ত তা নয়, কিন্তু গণনাট্যের প্রভাবে, গণনাট্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রচার করে চলেছে, শ্রমিক-কৃষকদের পক্ষে কথা বলছে। গণনাট্যের বাইরে নাটকের যে মূলধারা তাই গ্রুপ

থিয়েটার। পঞ্চাশ ষাটের দশকে যা ছিল সৎনাট্য বা নবনাট্য আন্দোলন সত্তর দশকে এসে তা গ্রুপ থিয়েটার হিসাবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে কাজের ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য ধরা পড়েছিল বলেই। নাট্যদল বা নাট্যবোদ্ধারা এখন গ্রুপ থিয়েটার শব্দটিই বেশি ব্যবহার করে থাকেন। সেই গ্রুপ থিয়েটার জন্মের পেছনের কারণটা আগে অনুসন্ধান করা যাক, যার ভিতর দিয়ে দুটো ধারার মূল পার্থক্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

নিরপেক্ষ সংস্কৃতির পরিবর্তে গণনাট্য ছিল সমাজতন্ত্রের, শ্রেণি সংগ্রামের প্রচারক। গণনাট্যের ঘোষণায় স্পষ্ট বলা হয়েছিল—গণনাট্য গড়ে উঠবে বিভিন্ন গণআন্দোলনের মাধ্যমে এবং শ্রমিক কৃষক ও অন্যান্য সংগ্রামী শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের যে গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই তার সঙ্গে যুক্ত থেকে। সেখানে সমাজচেতনার মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী নাট্যকাররা বুঝেছিলেন, সামাজিক সংঘাতগুলো আসলে শ্রেণিসংগ্রাম ছাড়া কিছু নয় এবং এ সংগ্রামে জয়লাভের জন্য রাজনীতি হল প্রধান হাতিয়ার। স্বভাবতই সে সময়কার বৃহৎ রাজনৈতিক দল কংগ্রেস-এর চিন্তার সাথে গণনাট্যের মিল ছিল না। গণনাট্যের নাটকে মূলত মার্কসবাদী আদর্শই প্রচারিত হত, যা ছিল ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেস দলের বিরোধিতারই নামান্তর। ব্রিটিশ শাসক বা কংগ্রেস দুপক্ষের কেউ এটাকে ভালো চোখে দেখেনি। কিন্তু তাহলেও গণনাট্যের ওপর প্রথম দিকে সরাসরি কোনো আক্রমণ আসেনি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে ব্রিটিশ শাসক ও কংগ্রেস দলে বিরোধ চরম আকার নেয় ভারতের স্বাধীনতা লাভের পবিপ্রেক্ষিতে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি চেয়েছিল কৃষক-শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ শক্তিকে ভারত থেকে তাড়াতে আর কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশদের সাথে আপোসবক্ষার মাধ্যমে স্বাধীনতালাভ। জমিদার ও ধনিকদের দ্বারা প্রভাব বিস্তারকারী কংগ্রেস জানত দীর্ঘ গণযুদ্ধেব ভিতর দিয়ে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করলে দেশের কর্তৃত্ব তাদের হাত থেকে চলে যাবে প্রলেতারিয়েতদেব হাতে। বিশেষ করে স্বাধীনতার প্রশ্নে দেশভাগের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিল কমিউনিস্ট দল। সেই সব কারণে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিস্টদের মতপার্থক্য এমনি প্রবল হয় যে উনিশ শো ছেচল্লিশ সালে কংগ্রেস নেতারা জেল থেকে বার হওয়ার পর তাদের প্ররোচনায় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় অফিস ভাঙচুর করা হয় এবং বহু কমিউনিস্ট নেতা ও বুদ্ধিজীবী দৈহিক আক্রমণের শিকার হন।

গণনাট্য সংঘের ভিতরেও ছিল নানাসমস্যা। শিল্প-সাহিত্য ও সমাজ প্রগতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে মতপার্থক্য থেকে গণনাট্য সংঘ ভিতর থেকেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। গণনাট্য পার্টি সংগঠকদের দ্বারা তৈরি হলেও ওটা পুরোপুরি পার্টি সভ্যদের দ্বারা গড়া ছিল না। দ্বিতীয়ত পার্টির বাইরেকার কিছু লোক এই সংগঠনে ছিলেন যাঁরা সমাজতন্ত্রে ঘোরতর বিশ্বাসী হলেও কমিউনিস্ট পার্টির দৈনন্দিন নীতি মেনে চলার দায় বোধ করতেন না। গণনাট্যের মঞ্চে শ্রেণি সংগ্রামই ছিল প্রধানতম বিষয়। ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো দ্বিমত দেখা না দিলেও যুদ্ধ শেষে শ্রেণি সংগ্রামের আদর্শে অনেক সদস্যই অবিচল থাকতে পারলেন না। সমস্ত শিথিলতা ও পিছুটান সরিয়ে ফেলে সংগ্রামী শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তের লড়াইয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, সংগ্রামী মানুষের বাঁচার লড়াইয়ের ময়দানে নামতে হবে—শিল্পের মধ্যে এ ধরনের রাজনীতি বা শ্রেণি সংগ্রামের যে বিশ্লেষণ, নাট্যকর্মীদের অনেকের তা ভালো লাগেনি। পার্টি নেতৃত্ব শিল্প নিয়ে মাথা ঘামাতে এলে নাট্যদলের প্রতিষ্ঠিত কর্মীরা তা প্রায়ই পছন্দ করতেন না। অধিকাংশ কর্মীর মধ্যেই সংস্কৃতি আন্দোলনের তাৎপর্য পরিষ্কার ছিল না।

সে সময়ে পুরনচাঁদ যোশী কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। গণনাট্য শিল্পীদের নিয়ে সারাদেশের জনগণের কাছে যাওয়ার চাইতে, তিনি সব শিল্পীকে বোম্বেতে এনে, তাঁদের নগরকেন্দ্রিক শিল্প প্রযোজনার দিকে উৎসাহ দিতে থাকেন।[৬] পরবর্তী সময় অনেকেই যোশীর এই সিদ্ধান্তকে

সমালোচনা করেন। যোশীর এই সিদ্ধান্তের ফলে গণনাট্যের কার্যক্রম গ্রাম-গঞ্জ থেকে শহরমুখী হয়ে ওঠে। যার ফলাফল হয়ে দাঁড়ায় মারাত্মক। গণনাট্যের শিল্পীদের মধ্যে শহরমুখী সাংস্কৃতিচর্চার স্বপ্ন বাসা বাঁধে। মূল ভাবনা থেকে সরে গিয়ে তথাকথিত প্রতিষ্ঠানগত খ্যাতি ও উচ্চাশা তাই অনেককেই সেই সময় হাতছানি দিয়েছিল। কিছু নাট্যকর্মী শ্রেণিসংগ্রামের সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে সমঝোতার পথে পা বাড়াবার কথাও ভাবছিলেন। অনেকের মধ্যেই যে গণনাট্যের মূল ভাবাদর্শ গভীরভাবে কাজ করেনি এটাই তার প্রমাণ। ফল কী দাঁড়াল? গণনাট্যকর্মীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আত্মত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের যে ব্রত নিয়েছিলেন তা কয়েক বছরের মধ্যেই ভেঙে পড়ে। যার ফলে গণনাট্যের সেই চোখ ধাঁধানো অরুণোদয় অচিরেই মেঘম্লান হয়ে যায়। যতই সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক দর্শনে উদ্বুদ্ধ হোক না কেন, মূলে অর্থাৎ নেতৃত্বে সত্যিকারের শ্রমিক শ্রেণি না থাকলে মধ্যবিত্তরা কিংবা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর দল অন্তরের গভীর গভীরতর স্তরে ওৎপেতে থাকা মধ্যবিত্তসুলভ সুবিধাবাদ ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব তথা অহংবোধ নিয়ে কতদূর এগোবেন বা এগুতে পারেন?[৭] চল্লিশের দশকের শুরুতে যে রাজনৈতিক সামাজিক চেতনা গণনাট্যের ভিত্তিভূমি রচনা করেছিল, রাজনৈতিক বিরোধ ও সাম্প্রদায়িক টানাপোড়েন এবং কিছু কিছু ব্যক্তির মধ্যবিত্তসুলভ বিভ্রান্তিতে তা ক্ষয় হতে শুরু করেছিল এ সময় থেকেই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তখনও স্বাধীনতার জন্য লড়তে হচ্ছিল বলে সে বিরোধ সাময়িকভাবে চাপা পড়েছিল। স্বাধীনতার পর তা আর চাপা থাকে না, স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

স্বাধীন দেশে কংগ্রেসি সরকার গণনাট্য সংঘের সাথে এমন ব্যবহার আরম্ভ করল যেন একটা বেআইনি সংস্থা। সাম্রাজ্যবাদী আমলে যেমন এই নাটকের দলটিকে সহ্য করা হয়নি, স্বাধীন ভারতের শাসকদলও এঁদের সহ্য করলেন না। ব্যবসায়ী, ধনিক ও জমিদারদের প্রতিনিধি কংগ্রেস তার শ্রেণিস্বার্থেই গণনাট্যকে স্তব্ধ করতে চাইল। গণনাট্য স্তব্ধ করার জন্য তারা দ্বিমুখী আক্রমণ চালাল। একদিকে গণনাট্য কর্মীদের ওপর আক্রমণ, জেলে পাঠানো, নাট্যাভিনয়ের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া, নাটক নিষিদ্ধ করা প্রভৃতি চলতে লাগল, তেমনি অন্যদিকে গণনাট্য কর্মীদের প্রলোভন দিয়ে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে তাদের অনুগত কর্মীতে রূপান্তরের প্রচেষ্টাও অব্যাহত রইল।[৮] স্বাধীনতার পরপরই পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়, পার্টির সকল দপ্তর সরকারের দখলে চলে যায় এবং পার্টির প্রেস ও সমস্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়। পাশাপাশি গণনাট্যের ওপরেও চলে আক্রমণ। পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার মাসখানেক পূর্বে উনিশ শো আটচল্লিশ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি গণনাট্যের তৎকালীন সম্পাদক চারুপ্রকাশ ঘোষের বাড়িতে গণনাট্য কর্মী সুশীল মুখোপাধ্যায় এবং সমর্থক ভবমাধব ঘোষ শত্রুর অতর্কিত আক্রমণে নিহত হন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যুব প্রতিনিধিদের সম্মানে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে রাত্রির অন্ধকারে এই আক্রমণ ঘটেছিল। আক্রমণকারীরা বিদ্যুৎ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে স্টেনগান নিয়ে আক্রমণ করে এই হত্যাকারীদের পরিচয় গোপন থাকেনি, কংগ্রেস শিবিরে তাদের বারবার দেখা গেছে।[৯] নাটকে তারা রাজনীতির গন্ধ পেয়েই শঙ্কিত হয়েছিলেন। গণনাট্যের নাটক যে মানুষকে শ্রেণিসংগ্রামের পথে উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারে সেটা বুঝতে পেরেই তারা গণনাট্যের মতো বলিষ্ঠ সংগঠনকে ভাঙবার কাজে সচেষ্ট হয়েছিল।

পার্টিকে এ সময়ে ভিন্ন পথ ধরতে হয়, সে পথ সশস্ত্র সংগ্রামের পথ। কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সংঘর্ষ কাকদ্বীপ ও তেলেঙ্গানাতে সশস্ত্র রূপ ধারণ করে তখন গণনাট্য সংঘের নামও কংগ্রেস সরকারের দ্বারা অবৈধ বলে ঘোষিত হয়েছিল। গণনাট্য সংঘের সাথে জড়িত যে সব নাট্যকর্মীরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিল না তাঁরা এ সময় দ্বিধান্বিত ছিলেন। নিজেদের ওপর আক্রমণের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। নাটক করব, হাততালি কুড়োব, অভিনয় চাতুর্য দেখাব,

পারলে মানবিকতার খাতিরে জনগণের সুখ-দুঃখের কথাও বলব; ভালো কথা। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে বে-আইনি একটি সংগঠনের হয়ে এসব করতে গেলে, জীবনের ঝুঁকি থেকে যায়।[১০] গণনাট্যের নাটকের লক্ষ্য ছিল শ্রেণিসংগ্রাম প্রচার করা। কিন্তু নাট্যশিল্পীদের অনেকেই এ সময় নাটককে সুন্দরভাবে করার দিকে জোর দিলেন, বক্তব্যের চেয়ে নাট্যশিল্পের দিকে জোর দিতে চাইলেন গণনাট্যের মূলদাবিকে অস্বীকার করে। নাটকটাই প্রধান হয়ে উঠল, জনগণ নয়, শিল্প যে গণসংগ্রামের হাতিয়ার এমন ভাবনা তারা আর ভাবতেই চাইছিলেন না। জনগণের কাছে যাওয়া তো দূরের কথা, সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইলেন সরকারি আক্রমণের ভয়ে। গণসংস্কৃতির ময়দানে যাঁরা শৌখিন মজদুরি করতে এসেছিলেন- তাঁরা এই সকল ঘটনার পর গণনাট্যে থাকা নিরাপদ মনে করলেন না।[১১] কমিউনিস্ট আক্রমণের মুখে গণনাট্য সংঘ আর দাঁড়াতে পারবে কিনা সে প্রশ্ন নিশ্চয় তাঁদের কাছে প্রাধান্য পেয়েছিল। স্বাধীনতার পূর্বে মধ্যবিত্তের যে শক্তি শ্রমিক কৃষকদের সংগ্রামে শরিক হয়েছিল স্বাধীনতার পর সেই মধ্যবিত্ত অংশ কি রাজনীতিতে, কি শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে হল বিপর্যস্ত, বিভক্ত ও বিভ্রান্ত।

মধ্যবিত্ত মানসিকতার দুর্বল বিপ্লবী চেতনার ফলে গণনাট্য সংঘ শ্রমিক-কৃষকদের সংগ্রামী স্বার্থে নাটক মঞ্চস্থ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেও এর নেতৃত্ব ছিল দোদুল্যমান। ফলে বিপ্লবের প্রতি সংগঠনের প্রতি তাদের আনুগত্য দৃঢ়বন্ধনে বাঁধা ছিল না। সে জন্যই সত্যিকারের লড়াইয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শিল্পীদের সব ব্যক্তিগত শ্রেণি-বৈশিষ্ট্য, সংস্কার, পিছুটান, উচ্চবিত্ত জীবনেব আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিতে লাগল। কিন্তু এঁরাই ছিলেন একদিন গণনাট্য সূচনার অগ্রণী বাহিনী। সেদিন সুবিধাভোগী এবং সুবিধাবাদী চরিত্রের এই মানুষগুলোই শ্রেণি বিভক্ত সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটাবার চিন্তার সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছিলেন। কিন্তু পার্টি ও গণনাট্য সংঘের রাজনৈতিক দুর্যোগে এঁরাই আবার প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে হাত মেলালেন। অনেকে হয়ে পড়লেন নিষ্ক্রিয়, আবার একদল গণনাট্য সংঘকে বিলুপ্তির পথে নিয়ে যাবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন।[১৪]

রাজনৈতিক সন্ত্রাস, দাঙ্গা, দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা প্রায় পর পর এসে গেল। স্বাধীনতা পাওয়ার বছর ঘুরতে না ঘুরতেই গণনাট্য আন্দোলনেও চিড় ধরল। ক্ষোভ অভিমান আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যাপার তো ছিলই, অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি হল গণনাট্য কর্মীদের আর্থিক দুর্দশা। যাঁরা মাসোহারা পেতেন গণনাট্য সংঘ কংগ্রেসি আক্রমণের মুখে পড়ে সেটাও বন্ধ হবার জোগাড়। গণনাট্য থেকে বিজন ভট্টাচার্য একশত টাকা, শম্ভু মিত্র পঁয়তাল্লিশ টাকা এবং তৃপ্তি ভাদুড়ি সত্তর টাকা পেতেন। শম্ভু মিত্রের কোনো চাকরি ছিল না। তৃপ্তির ভাতা রিহার্সেলের বাড়তি ব্যয় সমেত ব্যয় হত প্রায় আটশত টাকা।[১৩] শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মহম্মদ ইসরাইল, তৃপ্তি মিত্র প্রমুখরা এই সময়ই গণনাট্য থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করেন। গণনাট্য সংঘের সেই দুর্দিন আরো অনেক শিল্পীই সেদিন শিবির পরিত্যাগ করেছিলেন। শুধু ব্যক্তিগত উচ্চাশা এবং অর্থনৈতিক কারণ নয়, রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণের ভয়ও ছিল অনেকের মধ্যে।

গণনাট্য সংঘে এসেই তাঁরা পেয়েছিলেন আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ, সম্মান ও খ্যাতি। প্রতিষ্ঠানের দুরবস্থার দিনে সে সব ভুলে গেলেন। মধ্যবিত্ত মানসিকতায় ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার চিন্তা যাবে কোথায়।[১৪] দ্বিধাগ্রস্থ বেপথগামীদের চড়াদামে কিনে নিতে তারা যথেষ্ট তৎপর হল।[১৫] গণনাট্য ভাঙল। শুরু হল এক অর্থহীন শব্দ 'নবনাট্য' নামে আন্দোলন।[১৬] কায়েমি পুঁজিবাদী স্বার্থ তার এস্টাবলিশমেন্টের সমস্ত পশরা নিয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে এলো। গণনাট্য বাদ দিয়ে যাঁরা নবনাট্যের প্রবর্তক হয়ে উঠেছিলেন নানাভাবে তাদের কেনাবেচা চলতে লাগল।[১৭] মধ্যবিত্তের পাওনা গন্ডা বুঝে নিতে তাঁরাও সে পথে পা বাড়াল। যেমন বলেছিলেন যোসেফ স্তালিন, 'বুদ্ধিজীবীরা, কবি-শিল্পী-সাহিত্যকরা কিংবা

তাঁদের অনেকেই অনেক অলীক আশা আর স্বপ্ন নিয়ে বিপ্লবের সমর্থনে ঝাঁপিয়ে পড়তে চান। পরবর্তী অধ্যায়ে পথের বন্ধুরতা দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। আশাভঙ্গের হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে বিলাপ করতে থাকেন, কেউ বা আত্মবিনাশের পথও বেছে নেন।'

শিল্পী কিংবা রাজনীতিক যখন লক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাস খুইয়ে নৈরাজ্যবাদী হয়ে পড়েন, তখনই তিনি বা তাঁরা সন্ধান করেন তাঁদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার। যাঁরা নিজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আসেন তাঁরা তো সব কিছুকেই তাঁর প্রতিষ্ঠার সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করতে চান। সেই তাঁরাই গণনাট্য চর্চার নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ছত্রছায়ায় তার সাংগঠনিক সুবিধাদি গ্রহণ করে নিজেদের প্রতিষ্ঠা লাভের পর চরম সুবিধাবাদীদের মতো সংগঠন ছেড়ে চলে গেলেন। শ্রেণিহীন সমাজ আদর্শে উদ্বুদ্ধ মধ্যবিত্ত জীবন, বিপ্লবী চেতনা নিয়ে কতটা তারা এগোতে পারে আর কতটা পারে না, তারই এক দলিল হয়ে থাকল বাংলার এই অপেশাদার থিয়েটার আন্দোলনের বিশিষ্ট অধ্যায়টি।[১৮]

যাঁরা একদা প্রগতি লেখক সংঘের ঘোষণাপত্রে সংযোজিত 'মানুষের জন্য শিল্প' কথাটি মেনে নিয়েছিলেন পরবর্তীকালে তাঁদের অভিযোগ ছিল শিল্প-সাহিত্য হয়ে উঠছে প্রচারধর্মী এবং কমিউনিজমের প্রাধান্য'। শম্ভু মিত্র প্রমুখরা মনে করতেন যে গণনাট্য প্রকৃত পক্ষে শ্লোগান মঙ্গারিং করে যাচ্ছে। সে সব বাদ দিয়ে শিল্পের দিকে জোর দেয়া দরকার।[১৯] যাঁরা ডিক্লাসড হতে চেয়েও সদা সচেষ্ট আপার ক্লাসে উঠতে, সেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের খ্যাত শিল্পীরা নবনাট্য নামক নতুন নাট্যচিন্তার প্রবর্তন করলেন। নামের মোহই সেখানে উঁকিঝুঁকি মারছিল। কিন্তু যাঁরা চলে গেলেন তাঁদের পক্ষ থেকে অবশ্য অজুহাত দেখান হল পার্টির সংগঠকদের সাংগঠনিক অযথা হস্তক্ষেপের ।

পার্টির হস্তক্ষেপের এই ব্যাপারটা ঠিক ছিল কিনা বা কতটা সত্য ছিল তা বিচার্য বিষয়। বিভাস চক্রবর্তী এ সম্পর্কে বলছেন, 'গণনাট্য সংঘের ভাঙনের পেছনে পার্টির হস্তক্ষেপের প্রশ্ন ছিল, কিন্তু সে প্রশ্নে কোনও কদর্যতা ছিল না'।[২০] গণনাট্যের সেল সম্পাদক চারুপ্রকাশ ঘোষ উনিশ শো ছেচল্লিশ সালের আগস্ট মাসে যে প্রতিবেদন পাঠান সে প্রতিবেদন দেখা যায় পার্টির প্রাদেশিক কমিটি যখন জেলা কমিটির কয়েকজন গণনাট্য কর্মীকে গণনাট্যের প্রাদেশিক স্কোয়াডে নিয়ে নেয়ার প্রস্তাব করলেন বাকিরা সেটা মেনে নিলেও শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্য শুধু এর বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত বাকিদের বোঝানোর ফলে তাঁরা ব্যাপারটি মেনে নিলেন কিন্তু এটাকে তাঁরা উপরওয়ালাদের হস্তক্ষেপ বলে মনে করলেন।[২১] পার্টি হস্তক্ষেপ সম্পর্কে কুমার রায়ও অভিযোগ তুলেছিলেন এই বলে যে, তাঁরা শোষণের বিরুদ্ধে তাঁদের দর্শকদের সংগ্রামই নাটকের একমাত্র বিষয়বস্তু বলে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং হুঁসিয়ারি দিয়েছেন যে 'কেন্দ্রীয় মূলনীতি' তাঁদের অধীনস্থ দলগুলি মানতে বাধ্য।[২২]

পার্টির হস্তক্ষেপ বলতে তাঁরা যেটা বোঝাতে চেয়েছিলেন সেটা আসলে তাদের ইচ্ছামাফিক চলবার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। সাধারণত সম্পাদক চারুপ্রকাশ ঘোষের প্রতিবেদন থেকে সে কথার প্রমাণ মেলে। ঘোষ লিখেছেন যে, কলকাতায় পর পর সাতদিন 'নবান্ন' নাটক মঞ্চায়ন হওয়ার পর মঞ্চ মালিকরা গণনাট্যের 'নবান্ন'কে ব্যবসায়িক থিয়েটারের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গণ্য করে কোনো শর্তেই আর মঞ্চ ভাড়া দিতে রাজি ছিল না। তা সত্ত্বেও অন্য কোনো মঞ্চে 'নবান্ন' প্রদর্শনী হতে পারত। কিন্তু নাটকের গতি শ্লথ হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় শম্ভু মিত্র ঘূর্ণায়মান মঞ্চের জন্যই জিদ ধরলেন। পরবর্তী সময় আবার যখন বাংলার বন্যা বিধ্বস্ত নবনারীর সাহায্যকল্পে পার্টি থেকে একটি চ্যারিটি শো করতে অনুরোধ করা হয়, তখন সেই সময়কার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ সভ্য 'নবান্ন' পুনরায় মঞ্চস্থ করতে চাইলে কেবলমাত্র শম্ভু মিত্র এর বিরোধিতা করেন। শম্ভু মিত্র 'নবান্ন' বা 'জবানবন্দী' বা অন্য কোনো নাটক মঞ্চায়ন করতে রাজি ছিলেন না এই যুক্তিতে যে, স্বল্প সময়ের প্রস্তুতিতে তা করতে গেলে নাটকের মান পড়ে যাবে। শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য ও জ্যোতিরিন্দ্র প্রমুখরা

প্রযোজনার ক্ষেত্রে আঙ্গিকের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং নাটকের উচ্চমান রক্ষার জন্য দরকার হলে নিষ্ক্রিয় বসে থাকতে রাজি ছিলেন।[২৩]

'নবান্ন' যাঁরা ঘূর্ণায়মান আধুনিক উন্নত মঞ্চের বাইরে মঞ্চস্থ করতে বেঁকে বসেছিলেন, কালক্রমে দেখা গেল তাঁরাই জনগণের সংগ্রাম থেকে শিল্পকে বিচ্ছিন্ন করার মধ্যে দিয়ে সংস্কারবাদী ধ্যান-ধারণাকে প্রশ্রয় দিলেন এবং অবশেষেক সৎনাট্য, নবনাট্যের শ্লোগান তুলে গণনাট্যের পতাকাকে ধুলায় টেনে নামাতে চাইলেন। চারুপ্রকাশ ঘোষের সেই প্রতিবেদন থেকেই জানা যায়, তাঁরা মনে করতেন প্রতিভা বিকাশে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দরকার। শিল্পকলার ব্যাপারে পার্টির কোন নির্দেশ দেয়াটাকেও তাঁরা সঠিক মনে করতেন না। নাটকের শখে যাঁরা নাটক করতে চান তাঁরা স্বভাবতই বিশেষ রাজনৈতিক ভাবাদর্শের আওতায় হাঁফিয়ে পড়বেন।[২৪]

পার্টির হস্তক্ষেপের ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করেই আর একটি বিষয় এখানে আলোচিত হওয়া দরকার। 'নবান্ন' নাটক দিয়েই যদিও গণনাট্য সংঘ প্রথম সাফল্য লাভ করে কিন্তু তা সত্ত্বেও 'নবান্ন' কি যথাযথ গণনাট্য ছিল। সে ব্যাপারেও তখন প্রশ্ন দেখা দেয়। 'নবান্ন' কমিউনিস্টদের একাংশের কাছে বিপ্লবের সহায়ক বা যথার্থ গণনাট্য বলে মনে হয়নি। 'নবান্ন' নাটকের মূল বিষয়বস্তু ছিল পঞ্চাশের মন্বন্তর। সেই মন্বন্তর সৃষ্টির পেছনে মূলত দায়ী ছিল ব্রিটিশ সরকার, কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে এটা ঘটেনি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে 'নবান্ন' নাটকে শেষোক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ জনগণের মূল শত্রু অনুপস্থিত এবং বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে ব্রিটিশ শাসকদের কোনো প্রতিনিধিই নাটকে নেই। নাটকে জনগণের সংগ্রামের চেয়ে হতাশাই বেশি পরিস্ফুটিত। 'নবান্ন' যখন প্রথম অভিনীত হয় তখনই এ প্রশ্ন উঠেছিল। কয়েকজন কমিউনিস্ট নেতা এ নাটক বন্ধ করে দিতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু পার্টিব সাধাবণ সম্পাদক যোশী ছিলেন এর বিরুদ্ধে। তিনি মত দিয়েছিলেন গণনাট্যের আদর্শ যাঁরা মেনে নিয়েছেন তাঁদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। প্রথম ভুল ত্রুটি হবে, কাজের মধ্যে দিয়ে সেটা সংশোধনও হবে। কিন্তু চাপিয়ে দিতে গেলে কর্মপ্রেরণা নষ্ট হবে।[২৫] দেখা যাচ্ছে যে পার্টির হস্তক্ষেপ বা চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। বরং বলা যায় পার্টির হস্তক্ষেপ সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের ওপর খুবই জরুরি। বুদ্ধিজীবীদের কাজের ওপর পার্টির নিয়ন্ত্রণ যদি না থাকে তবে সেগুলি ক্রমশই যে এক একটি গোষ্ঠীতন্ত্রে পরিণত হয়, পাটি শৃঙ্খলা ও আদর্শের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়, পরবর্তী ইতিহাস সে কথা প্রমাণ করেছে।[২৬]

পার্টির হস্তক্ষেপের ব্যাপারটা যে অজুহাত সেটা বোঝা যায় শম্ভু মিত্রের একটি চিঠির বক্তব্যে। সে চিঠিতে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশীর নিকট প্রস্তাব রেখেছিলেন যে, পার্টি তাকে অর্থ দেবে নাটকের দল গড়ার জন্য এবং তিনি তার বুদ্ধিমতো প্রগতিশীল নাটক করবেন - যাতে তাঁর বিবেচনায় প্রগতিশীল আন্দোলনকে সাহায্য করা হবে।[২৭] কিন্তু গণনাট্য আন্দোলন কোনো ব্যক্তির নিজস্ব প্রতিভা ও ক্ষমতা দেখানোর ব্যক্তিগত জায়গা ছিল না। গণনাট্য সংঘ কোনো ব্যক্তি বিশেষের দ্বারাও গঠিত হয়নি, এটা ছিল জনগণ কর্তৃক জনগণ সমন্বিত জনগণের জন্য।[২৮] সেখানে শম্ভু মিত্রের উল্লেখিত দাবিটি ছিল সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। পার্টির হস্তক্ষেপ যদি শম্ভু মিত্রের পছন্দ না হয় তাহলে তিনি পার্টির সাধারণ সম্পাদকের কাছে এ ধরনের সুবিধা চাইবেন কেন কিংবা বাষট্টি নির্বাচনে তিনি কংগ্রেস প্রার্থী হুমায়ুন কবির নির্বাচনী প্রচারেই বা অংশগ্রহণ করবেন কেন? পঞ্চাশের দশকে হুমায়ুন কবীরের নির্বাচনে শম্ভু মিত্রের সমর্থনসূচক পক্ষপাত নিয়ে প্রভূত বিতর্ক হয়েছিল।[২৯] সরকারের মন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের কাছে শম্ভু মিত্র কী পরিমাণ দরবার করতেন তা সেদিনের 'যুগান্তর' পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা অমিতাভ চৌধুরীর রচনায় বিস্তৃতভাবে দেওয়া আছে।

যাঁরা সেদিন গণনাট্য ছেড়ে চলে যান এবং নবনাট্য বা সৎনাট্য আন্দোলন শুরু করেন তাঁরা পার্টির হস্তক্ষেপেই দোহাই দিলেও তাঁদেরই একজন নেতৃস্থানীয় সহযাত্রী সুধী প্রধান, যিনি পরে গণনাট্য ছেড়ে আসেন তাঁর বক্তব্য, 'গণনাট্যের সংঘের ভেতর যতদিন ছিলাম এই কথা নিশ্চয় বলবো যে, শিল্পগত ব্যাপারে জবরদস্তি বা সংখ্যাধিক্যের দ্বারা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করানো হয়নি'।[৩০] পার্টির হস্তক্ষেপ বিষয়ে উৎপল দত্তর বক্তব্য ছিল, লিটল থিয়েটারের উত্থানের পেছনে মহত্তম ভূমিকা, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির। কখনো কোনো হস্তক্ষেপ পার্টি করেনি, নিঃস্বার্থভাবে শুধু প্রচার করেছে, আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে, সারা বাংলার মানুষের কাছে লিটল থিয়েটারকে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে। কোনোদিন মাস্টারি করেনি, কিন্তু শিখিয়েছে সর্ব সময়ে। কখনো কিছু চায়নি, শুধু দিয়েছে।[৩১]

গণনাট্য সংঘ ভাঙনের পেছনে বহু কারণের পাশাপাশি অন্য একটি রাজনৈতিক ও আদর্শগত প্রশ্ন ছিল, পার্টি থিয়েটারকে নিয়ন্ত্রণ করবে কি না।[৩২] পার্টির রাজনীতি প্রচারের চেয়ে পেটি বুর্জোয়া 'প্রতিভাবান' লেখক শিল্পীরা যখন 'নতুন রীতি' বা 'নবনাট্য' নাম নিয়ে শিল্পের কনটেন্টের চেয়ে ফর্মকে আরো সূক্ষ্ম ও পরিমার্জিত করার দিকে ঝুঁকলেন, সহজেই বুর্জোয়া-বড়ো বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন পেলেন। গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে গিয়ে শম্ভু মিত্র প্রতিষ্ঠা করলেন বহুরূপী সম্প্রদায়। বহুরূপী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বললেন, ভালোভাবে ভালো নাটক করা। নাটকের সামাজিক বৃহত্তর দায়িত্বকে এড়িয়ে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়া সংস্কৃতিরই ধারক হয়ে উঠলেন। পরপর যে কয়টি নাটক তিনি করলেন সবগুলোই সাফল্য পেল প্রযোজনার গুণেই। গণনাট্য ছেড়ে নতুন যে নাট্যধারা তিনি চালু করলেন তার নামকরণ করা হল 'নবনাট্য' বা 'সৎনাট্য'। 'গণ' এর জায়গায় 'নব' শব্দটি এল। গণ হারিয়ে গেল নামকরণে এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনে। বহুরূপী এসেই দর্শক হৃদয় জয় করল। কিন্তু নাটকের বিষয়বস্তু সরকার, কিংবা দলের ওপর আক্রমণ আসতে পারে এমন কারো বিরুদ্ধে যায়নি। বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনো শত্রুপক্ষ তিনি নির্ধারণ করেননি।

গণনাট্যের ওপর তখনও সরকারি আক্রমণ চললেও ব্যবসায়িক সংবাদপত্র এবং সরকার দুহাত তুলে এঁদের আশীর্বাদ করলেন। কিছু কিছু সংবাদপত্র এঁদের নিয়ে এত প্রচারে মাতলেন যে পেশাদারি থিয়েটারগুলো পর্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়ল।[৩৩] যেমন 'বিভাব' সম্পর্কে 'দেশ' পত্রিকায় লেখা হলো, 'মনে হয় সুযোগ পেলে এরা নাট্যজগতে বিপ্লব ঘটাবার শক্তির অধিকারী। নাট্যকার শচীনবাবু দেশের নাট্যরসিক জনসাধারণের কাছে 'বহুরূপী' বাঁচিয়ে রাখবার জন্য যে আবেদন জানালেন আমরা তা সমর্থন করি।'[৩৪] আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হল বহুরূপী নাম দিয়ে যে দলটি নিউ এম্পায়ার মঞ্চে তিনটি নাটক অভিনয় করেছেন তার মধ্যে 'ছেঁড়াতার' দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। কিছুটা দেখেই চলে আসব বলে গিয়েছিলুম. কিন্তু অভিনয়ের চমৎকারিত্বে শেষ পর্যন্ত না দেখে উঠতে পারিনি। এ অভিনয় যিনি দেখবেন তিনিই বুঝতে পারবেন বাংলা নাটক অভিনয়ে এঁরা অভিনবত্ব এনেছেন। তাদের অভিনয় আদর্শের উপযোগী নাটক বাংলায় এখন পাওয়া কঠিন।[৩৫]

খেয়াল করতে হবে যে বিষয়বস্তু নয় অভিনয়ই প্রধান হয়ে উঠেছিল নাটকে। যেমন শম্ভু মিত্র নিজেই লিখছেন, 'নাটকের অভিনয়ের গুণে ছেঁড়াতার জমে গেল।[৩৬] যেমন 'পথিক' নাটকের অভিনয় সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকার সমালোচনা ছিল, শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র এবং এক উদ্ভট চরিত্র যুবকের ভূমিকায় শ্রী শম্ভু মিত্র প্রথম শ্রেণির অভিনয় করলেন। রসোত্তীর্ণ এই নাটকখানি অভিনয় নৈপুণ্যে সার্থক হয়ে ওঠে।[৩৭] কিন্তু পত্রিকাগুলোর প্রশংসা যে মিথ্যা ছিল তাও নয়। শম্ভু মিত্র রাজনীতি থেকে সরে গেলেও, গণনাট্য ত্যাগ করলেও বাংলা নাটক মঞ্চায়নে নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি করেছিলেন ঠিক উৎপল দত্তের মতোই। সেই আঙ্গিক পরবর্তীকালে রাজনৈতিক নাটক মঞ্চায়নে প্রভূত সাহায্য করেছিল। বহুরূপীর 'রক্তকরবী' দেখে উৎপল দত্ত লিখেছিলেন, 'শম্ভুবাবুর সূক্ষ্ম রসবোধ এবং প্রয়োগ

কৌশলের অভিনবত্ব এমন এক নাটক সৃষ্টি করেছে যা বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রকৃত ঐতিহ্যকে ধরে তাকে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। বিগত পঁচিশ বৎসরে বাংলা দেশে কোনো নাটক এ করতে পেরেছে বলে জানা নেই।'[৩৮] শম্ভু মিত্র গণনাট্য ত্যাগ করে যেমন নাটক তথা সারা বাংলা নাটকের উপকার সাধন করেছিলেন। রাজনৈতিক নাট্যধারার সাথে শত্রুতা করেও তিনি মিত্র হবার মতো কিছু কাজ করে গেলেন। শম্ভু মিত্রর পথ ধরে সেদিন আরো বহুজন বের হয়ে এসেছিলেন, যাঁরা বাংলা রাজনৈতিক নাট্য আন্দোলনে ভাঙন ধরালেও, বাংলা নাটককে আধুনিক একটি রীতি দেয়ার ব্যাপারে স্ব স্ব অবদান রেখে গেলেন। সে কারণেই লেনিন বলেছিলেন, বুর্জোয়া সভ্যতার সমস্ত সৃষ্টির ভালো দিকগুলো সর্বহারা শ্রেণিকে গ্রহণ করতে হবে।

যাঁরা গণনাট্য ছেড়ে নবনাট্য বা সৎনাট্য করতে চলে যান তাঁদের কাজে যে আঙ্গিক প্রাধান্য পেয়েছিল, সেটার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁদের প্রযোজনাগুলোতে। উৎপল দত্ত বহুরূপীর নাটক সম্পর্কে লিখছেন, 'উলুখাগড়া, পথিক ও ছেঁড়াতার নাটক হিসাবে কোনটাই আমার ভাল লাগেনি। কিন্তু প্রযোজনার দিক থেকে মনে হলো নতুন বাংলা নাট্যশালাব জন্ম হচ্ছে।'[৩৯] পরবর্তী দীর্ঘ সময় ধরে নবনাট্যের সাথে গণনাট্যের এই পার্থক্য উল্লেখযোগ্য। একদলের কাছে বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে প্রধান, প্রচারটাই সেখানে মুখ্য এবং লক্ষ্য গ্রামগঞ্জের দর্শক, অন্যদলের কাছে গুরুত্ব পাচ্ছিল আঙ্গিক এবং লক্ষ্য শহুরে দর্শক। গণনাট্য ও নবনাট্যেব এই পার্থক্য সর্বদাই স্পষ্ট। গণনাট্য প্রধানত কৃষক, শ্রমিক জীবন থেকে তার চরিত্রগুলোকে আহরণ করতে চেয়েছে। কিন্তু নবনাট্য চাইছিল বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য। গণনাট্য আন্দোলনের একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল। নবনাট্য আন্দোলন সেই রাজনৈতিক লক্ষ্যবর্জিত গণনাট্যের একটা পাল্টা আন্দোলনরূপে গড়ে উঠল।

নবনাট্যের কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃস্থানীয় সংগঠন না থাকায় যে যার স্বাধীন বোধ বুদ্ধি এবং শিল্পকর্ম অনুযায়ী এক একটা লক্ষ্য ঘোষণা করতে লাগল। বক্তব্যের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো গন্ডির মধ্যে তারা আটকে থাকতে চাইছিল না। মোট কথা গণনাট্যের যে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যটি ছিল, নবনাট্য সেখান থেকে সরে দাঁড়াল। শ্রেণিদ্বন্দ্বের নিরন্তর সংগ্রামে যে শ্রেণিহীন সমাজের প্রতিষ্ঠায় গণনাট্যের আন্দোলন তার নাটক ও বিষয়বস্তুকে নিয়োজিত কবেছিল, নবনাট্য আন্দোলনে কর্মীরা তা থেকে সরে এসে অবক্ষয়ী সমাজের হতাশা, ব্যক্তিজীবনেব ট্র্যাজেডি, রোমান্টিক মানবিকতা, নাটকীয় কলাকৌশলের সূক্ষ্মশিল্প মাধ্যমে প্রচার করতে লাগলেন। রবীন্দ্র প্রযোজনায় অবশ্য নবনাট্যের একটা পৃথক ঐতিহ্য তৈরি হল। যখন গণনাট্য তথা গণনাট্য আন্দোলন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঐতিহ্য সৃষ্টি করছে, তখন তার পাশাপাশি সংগঠনের মধ্যে ও বাইরের নাট্যজগতে নবনাট্যের প্রবক্তারা যে সব তত্ত্ব হাজির করলেন তার দ্বারা আর যাই হোক জনগণকে তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সমস্যাগুলির কারণ ও সমাধান সম্পর্কে সচেতন করা যায় না।[৪০] ঋত্বিক ঘটক লিখছেন, 'গণনাট্য আন্দোলন করতাম, ঠিক ভুল যাই করি নিজের হদিসটা ঠিক ছিল। সামাজিক, রাজনৈতিক দিক নির্দেশে সময় সময় ভুল হয়েছিল, কিন্তু কোন্ শক্তির শরীক আমরা, কার প্রতি আমাদের দায়িত্ব, সে সব বোধে কোন ধোঁয়াটে ভাব ছিল না।'[৪১] কিন্তু নবনাট্যে ব্যক্তিজীবনের প্রতিষ্ঠার লড়াইটা বড়ো হয়ে উঠল।

নবনাট্য জানত কেন তারা নাটক করছে। সে ব্যাপারে তাদের বক্তব্য ছিল, 'সত্যিকারের দেশপ্রেমের মহৎ নাটক করে দেশ গড়ার কাজে সাহায্য করা' কিন্তু কার জন্য বা কোন শ্রেণির পক্ষে তারা নাটক করছে সে ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট বক্তব্য ছিল না। 'দেশপ্রেম' বা 'দেশগড়া' ব্যাপারটা খুবই আপেক্ষিক, হিটলারও দেশগঠনের জন্য যুদ্ধ নেমেছিলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও নিজ দেশগড়ার কাজে যথেষ্ট অবদান রেখেছিল কিন্তু কার স্বার্থে সেটাই বড়ো কথা। রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য এই প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নবনাট্যের পথিকৃৎরা কী করলেন? শ্রেণিসংগ্রামের সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

পরিত্যাগ করে শ্রেণি সমঝোতার পথে পা বাড়াবার কথা ভেবেছিলেন এবং এই ভাবেই কর্তৃপক্ষ শ্রেণির স্বার্থরক্ষার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। ঋত্বিক ঘটকের ভাষায়, সাহস, মেরুদণ্ড, আঘাত সহ্য করবার ক্ষমতা, অপ্রিয় সত্যভাষণের পরম প্রসাদ-এগুলো নেই। তাই নবনাট্য আন্দোলন।[৫১] সৎনাট্য, নবনাট্য প্রভৃতি অভিধার মধ্যে যেমন নিহিত ছিল মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার বীজ তেমনি 'আমরা ভালোভাবে ভালো নাটক করব' এ জাতীয় ঘোষণায় এক ধরনের অস্বচ্ছতা ও ধোঁয়াটে ধ্যান ধারণা প্রবেশ করল নাট্য আন্দোলনে। কিন্তু গণনাট্য সংঘের বিরুদ্ধে অজস্র অভিযোগ এনে তার অসারতা প্রমাণ করতে যে 'নবনাট্য' নামক আন্দোলনের জন্ম হল যে আন্দোলন কিন্তু পরবর্তী সময়ে গণনাট্যকে ছাপিয়ে কোনো বলিষ্ঠ আদর্শ অথবা প্রত্যয় মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারল না।[৫৩]

কিছুদিনের মধ্যেই নবনাট্য ধারা তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে বিচ্ছিন্ন অ্যাবস্ট্রাকট নাটকের গাড্ডায় গিয়ে পড়ল। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার অবক্ষয়ী সংস্কৃতির চোয়ানো ঢেকুর উদগীরণ হতে থাকল নবনাট্যের ধারায়।[৫৪] নবনাট্য পথিকৃৎরা গণনাট্য সংঘ ছেড়ে আসার সময় পার্টির হস্তক্ষেপের প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু নবনাট্য আন্দোলনে কী ঘটল। মূলত এক একজনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠল দলগুলো। কেননা ব্যক্তির শিল্পভাবনা মনন ও মনস্বিতাকে রূপ দেবার তাগিদেই নবনাট্যের সৃষ্টি। ফলে দলে সাংগঠনিক চরিত্র ধামাচাপা পড়ে সেখানে ব্যক্তিই প্রধান হয়ে ওঠেন। পূজনীয় হন। দলের নেতা যা বললেন সবাই তাতে হ্যাঁ মেলালেন। নেতা যেন কোনো মোহান্ত। বাকিরা কর্মী, পদসেবক। তাঁদের শ্রম অর্থ ত্যাগে গড়ে ওঠে কোনো না কোনো প্রযোজনা। সে প্রযোজনা সার্থক হলে দলপ্রধান নামীব্যক্তির মর্যাদা পান। দলের কর্ণধার দুধের সরটি খান আর তার নামের জ্যোতির ছত্রছায়ায় বাকিরা তাদের শ্রমদান করে সেই মহান ব্যক্তির কাছে কৃপা বা করুণা প্রার্থনা করেন। কিন্তু নামী প্রতিভার পাশে থেকে দিনের পর দিন কি নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া যায়। ফলে যার কিছুটা প্রতিভা আছে তিনি আবার বের হয়ে এসে নিজে ভিন্ন দল গঠন করেন।

গণনাট্য সংঘে এই ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার, ব্যক্তি অহমের সুযোগ ছিল না। শম্ভু মিত্র গণনাট্য ছেড়ে চলে এসেছিলেন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের প্রশ্ন তুলে, নাটক সেখানে শ্লোগান হয়ে যাচ্ছিল বলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বহুরূপীতে থাকলেন না, নাটকের সাথেই আর নিজেকে জড়িত রাখলেন না। তিনি তাঁর তিরিশ বছর আয়ুষ্কালে মাত্র তেইশ বছর যুক্ত ছিলেন বহুরূপীতে। হিংসুটে কেরানিদের নিয়েই তো গ্রুপ থিয়েটার বেঁচে আছে - এই ধারণার বশবর্তী হয়ে স্বেচ্ছায় নাটকের জগৎ থেকে সরে দাঁড়ালেন নানা অভিমানে। কিন্তু উৎপল দত্ত তাঁর চৌষট্টি বছর আয়ুষ্কালে নাট্যকর্মে জড়িত ছিলেন পয়তাল্লিশ বছর, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত। কোনো ধরনের অভিমানে তিনি নাটক ছেড়ে চলে যাননি। শ্রমিকশ্রেণির প্রতি ভালোবাসার কারণেই কারো ওপর অভিমানে নাটক ছেড়ে চলে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, জনবিচ্ছিন্ন শম্ভু মিত্র যা পেরেছিলেন। শ্রমিক শ্রেণি বা জনগণের প্রতি কোনো দায়দায়িত্ব শম্ভু মিত্র বোধ করেননি। ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া, রাগ-অভিমানই তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। শম্ভু মিত্রের স্পর্শে বহুরূপীর প্রযোজনায় বাংলা থিয়েটার আধুনিকতার পরশে সমৃদ্ধ হয়েছে। তিনি নিজে এবং বহুরূপী খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার শিখর ছুঁয়েছেন, কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু নবনাট্য আন্দোলনের হোতা শম্ভু মিত্র স্বাভাবিক ভাবেই কোনো-আন্দোলনের নেতা হয়ে উঠতে পারলেন না, হয়ে উঠলেন কিংবদন্তি থিয়েটার স্টার। একদা নবনাট্য বা গ্রুপ থিয়েটারের লড়াই ছিল এই স্টার সিস্টেমের বিরুদ্ধে।

২

গণনাট্য সংঘ থেকে যখন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, কলিম শরাফি, মহম্মদ ইসরাইল প্রমুখরা বের হয়ে আসেন সেটাই ছিল গণনাট্য ভাঙনের প্রথম পর্ব। পরবর্তী সময়

বা কিছুদিন পরে উনিশ শো পঞ্চাশ সালে উৎপল দত্ত গণনাট্যে যোগ দেন এবং সেখানে বেশ কিছু সময় কাজ করেন। গণনাট্য সংঘে উৎপল দত্ত পরিচালিত নাটকগুলো হচ্ছে পানু পালের 'ভাঙাবন্দর', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন', ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল' পানু পালের 'ভোটের ভেট' ও 'অভিসার' ইত্যাদি। কিন্তু খুব শীঘ্রই পার্টি তাকে ভুল বোঝে এবং ট্রটস্কিপন্থী বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে। উৎপল দত্ত গণনাট্য ছেড়ে চলে আসেন। গণনাট্য সংঘে যোগ দেবার পূর্ব থেকেই যেহেতু উৎপল দত্ত নিজ দল লিটল থিয়েটার গ্রুপে নাটক করে আসছিলেন, ফলে তিনি আবার সেখানে ফিরে আসেন। ফিরে এসে তিনি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করতে শুরু করলেন। গণনাট্য সংঘে কাজ করার দিনগুলো ছিল তাঁর জন্য রাজনৈতিক নাটক সম্পর্কে শিক্ষালাভের কাল।

পূর্বে লিটল থিয়েটার বেশির ভাগই ইংরেজি ভাষায় নাটক করত। গণনাট্য থেকে ফিরে এসে উৎপল দলের সকলের সাথে বসে, পরামর্শ করে বাংলায় নাটক করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বাংলার নাটক মঞ্চায়ন করা নিয়ে উৎপল দত্তের নিজের বক্তব্য ছিল, 'ইংরেজি নাটক করবা মুষ্টিমেয় বুদ্ধিবাজের স্বার্থে আর বৈপ্লবিক নানা তত্ত্ব কপচাবো - এ দুটো যে এক সংগে চলতে পারে না, এ বোধ আমাদের অবশেষে হলো।'[৪৫] 'নাটক হবে বাংলায়, নাটক হবে অসংখ্য সাধারণ মানুষের জন্য, নাটক কইবে সংগ্রামের কথা-সর্বস্তরের সংগ্রাম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ।'[৪৬] লিটল থিয়েটার গ্রুপ থেকে এরপর উৎপল দত্ত পরপর অনেকগুলো নাটক মঞ্চায়ন করলেন। উনিশ শো উনষাট থেকে উনিশ শো আটষট্টি সাল পর্যন্ত তার প্রযোজিত 'অঙ্গার', 'ফেরারী ফৌজ', 'কল্লোল', 'অজেয় ভিয়েতনাম', 'দিনবদলের পালা', 'মানুষের অধিকারে' সবগুলোই ছিলো চূড়ান্ত রাজনৈতিক নাটক। নাটকগুলো কিন্তু বেশির ভাগ পেশাদারি মঞ্চেই মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। নাটকগুলো ভারতবর্ষে ভীষণভাবে সাড়া জাগিয়েছিল।

পার্টির বিশ্বাস থেকে, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নাটক প্রযোজনা করেও যে উন্নতমানের শিল্পরচনা করা যায়, দর্শকদের মুগ্ধ করা যায় উৎপল দত্তের উল্লিখিত নাটকগুলো তারই উদাহরণ। বিশেষ করে উৎপল দত্তের 'অঙ্গার' ও 'কল্লোল'-এর সাফল্য ছিল আকাশচুম্বী। কয়লাখনির শ্রমিকদের জীবন নিয়ে 'অঙ্গার', উনিশ শো উনষাট সালে মিনার্ভা মঞ্চে সে নাটক ইতিহাস সৃষ্টি করে।[৪৭] 'অঙ্গার' নাটক মঞ্চায়নের পরপরই রাজনৈতিক নাটকের দিকে সকলের দৃষ্টি নতুনভাবে প্রসারিত হয়। পরের উল্লেখযোগ্য নাটক 'কল্লোল' যা বামপন্থী নবজাগরণের সূচনা করে। 'কল্লোল'-এ প্রথমবার উৎপল রাজনৈতিক একটি দল হিসাবে কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার এক জ্বলন্ত চিত্র আঁকলেন। সে সময় গোটা বামপন্থী আন্দোলনই যেন একটা ভাটার টান চলছিল। 'কল্লোল' তার বলিষ্ঠ বক্তব্যে, দুরন্ত পরিচালনার গুণে সারাদেশকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।[৪৮] এই নাটক শীঘ্রই কংগ্রেস সরকারের রোষানলে পড়ল। নাটকের বক্তব্য ও সংলাপ মোটেই তাদের জন্য সুখকর ছিল না। নাট্যকার উৎপল দত্ত গ্রেফতার হলেন। চব্বিশে সেপ্টেম্বর সমস্ত সংবাদপত্রে ঘোষণা করা হল 'কল্লোলের বিজ্ঞাপন ছাপা হবে না'। 'কল্লোল' কিন্তু বন্ধ হল না, আরো দ্রুত গতিতে চলতে থাকল। পশ্চিমবাংলার শহর গ্রাম ভেঙে পড়ল 'কল্লোল' দেখার জন্য। কোনো বিজ্ঞাপন ছাড়াই নাটক চলল হৈ হৈ করে।[৪৯] 'কল্লোল' ভারতের নাট্য ইতিহাসে বিশেষ করে রাজনৈতিক নাট্য ইতিহাসে বিশাল এক ইতিহাস হয়ে রইল।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের সময় উৎপল ঝুঁকে পড়লেন নকশালপন্থী আন্দোলনের দিকে। চারু মজুমদারের সাথে সংলাপ করার পর নাটক লিখলেন 'তীর'। উনিশ শো উনসত্তর সালে তা মঞ্চস্থ হল মিনার্ভাতে। নাট্যকারের তীব্র শ্রেণি-ঘৃণা ও ক্রোধ এ নাটকে সোচ্চারে প্রকাশ পেয়েছে। নাট্যকারের চোখে সমাজের শ্রেণিগত পঙক্তি-বিন্যাসের মূল যে নিয়ামক শ্রেণিস্বার্থ তা গোটা নাটকে স্পষ্টভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। নাটকটি ভীষণভাবে তখন কলকাতার মধ্যবিত্ত সাধারণ দর্শকদের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল।

দর্শকদের উদ্দেশ্যে তখন রাস্তায় রাস্তায় লেখা থাকত 'তীর' চিহ্নিত পথে এগিয়ে চলুন। সেই পথ ধরে এগুলেই মিনার্ভ থিয়েটারে পৌঁছে যেত দর্শক যেখানে মঞ্চস্থ হচ্ছিল উৎপল দত্তের 'তীর' নাটক। কলকাতা শহরের নানাপ্রান্তে বাড়ির দেওয়ালে নিজ উদ্যোগেই এই পোস্টার সেঁটে দিয়েছিলেন দর্শকরা বা কলকাতার জনগণ। রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়েও যে জনপ্রিয় নাটক প্রযোজনা করা যায় এবং সে নাটকের দুর্দিনে জনগণই যে তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে সেই সত্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।

নকশালবাড়ির ঘটনার পর সারাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে, বিশেষত যুবমানসে যুগান্তকারী পরিবর্তনের দোলা লাগল। অন্যদিকে উৎপল দত্ত, জোছন দস্তিদারের নেতৃত্বে সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা সেই রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের কালে রাজনৈতিক নাট্যচর্চার একটা ঝড়ো হাওয়া ওঠাল। সে প্রেক্ষাপটেই উৎপল দত্তের উল্লিখিত নাটকগুলো দেখে অনেকেই তখন নতুন করে রাজনৈতিক নাটক করবার প্রেরণা লাভ করেন। যেহেতু উৎপল দত্ত গণনাট্যের বাইরে থেকেই এই রাজনৈতিক নাট্যধারা তৈরি করেছিলেন, ফলে গণনাট্যের বাইরের অনেক দলই তাঁর পথ অনুসরণ করেন। আবার নতুন নতুন দলও জন্ম নেয় নতুন সংকল্প নিয়ে। শহর কলকাতার থিয়েটার তার প্রভাব যতটা না পড়েছিল তার শতগুণ প্রভাব পড়েছিল মফস্বলের ছোটো ছোটো নাট্যদলে। উৎপল দত্তের রাজনৈতিক নাটকগুলোর সাফল্যের প্রেরণাতেই নবনাট্য নতুন করে দানা বাঁধে, সেখানে নতুন চিন্তার সূত্রপাত ঘটে। সেখানে রাজনীতিহীনতার নামে যা চলছিল উৎপল দত্তের নাটক থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে একদল তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। আরো নতুন নতুনদের আগমনে ঘটে নাট্যজগতে বিপ্লব ঘটাবার জন্য। মূল প্রেরণা উৎপল দত্ত ও তাঁর নাটক। মিনার্ভা থিয়েটারের দোতলায় প্রতিদিন বিকেলে ভিড় করত অসংখ্য তরুণ নাট্যকর্মী, সংস্কৃতিকর্মী। নতুন এক ঝাঁক নাট্যগোষ্ঠী, নাট্যকার অভিনেতা, কলাকুশলীব আবির্ভাব হল। রাজনীতি প্রচারে এদের কোনো আপত্তি ছিল না। ভীতিও ছিল না। ধীরে ধীরে উৎপল দত্ত নিজেই এক বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হচ্ছিলেন। যেখানে উৎপল দত্ত, সেখানে হাজার হাজার মানুষ, নতুন দিনের স্বপ্ন, দুর্বার শপথ। যুব, ছাত্র, তরুণরাই ছিল তাঁর প্রিয় আমজনতা। তিনিই ছিলেন তারুণ্য, স্পর্ধা, দুঃসাহস আর প্রদীপ্ত মেধার প্রতীক।

গণনাট্য পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক নাট্যধারার সূচনা করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু নানারকম ভাঙনের মধ্যে দিয়ে গণনাট্য যখন দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছিল, সেই দুর্দিনে উৎপল দত্ত রাজনৈতিক নাটককে নতুন পথ দেখালেন। গণনাট্য তার নাটকে রাজনীতিকে বিষয়বস্তুর দিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিল কিন্তু তার শিল্পগত দিক বা নাটকের আঙ্গিক গুরুত্ব পায়নি, নবনাট্য আবার নাটকের শিল্পরীতি ও আঙ্গিককে যতটা গুরুত্ব দিয়েছিল সেক্ষেত্রে রাজনেতিক বিষয়বস্তুকে একেবারেই গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু উৎপল দত্তর নাটকে সব কিছুই সমান গুরুত্ব পেয়েছিল। যেমন রাজনৈতিক বিষয়বস্তু, তেমনি আঙ্গিক, উন্নত অভিনয়, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা সব ব্যাপারেই তিনি সমান নজর রাখতে পেরেছিলেন। এই সময় আরো অনেকগুলো ঘটনা ঘটে। পশ্চিমবঙ্গের নাট্যজগতে তার প্রতিক্রিয়া হয় মারাত্মক এবং রাজনৈতিক নাটকের ক্ষেত্রে তা নতুন দিগন্তের সূচনা করে। বাষট্টি সালে চীন-ভারত যুদ্ধ, পঁয়ষট্টি সালের পাক-ভারত যুদ্ধ ছিল এর মূলে।

বাষট্টি সালে চীন-ভারত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে গণতান্ত্রিক মানুষের ওপর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সর্বব্যাপী আক্রমণ নেমে আসে। চীন-ভাবত সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে তথাকথিত দেশপ্রেমের জোয়ার বইয়ে দিল শাসক শ্রেণি। কমিউনিস্টদের একাংশকে 'চীনের দালাল' এবং দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করা হল। কমিউনিস্টরা চীনপন্থী অতএব দেশদ্রোহী, এই দাবিতে জাতীয় কংগ্রেসি সরকার সবরকম দমনপীড়ন পার্টির ওপর চালাতে থাকে। এই বছরেই পশ্চিমবঙ্গে নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল' ৬২ ঘোষিত হয়। সে বিল অনুযায়ী সরকারি অনুমোদন ছাড়া কারো নাটক করার অধিকার ছিল না।

সরকারি চাপের মুখে উৎপল দত্তের 'অঙ্গার' নাটক বন্ধ করে দিতে হল। প্রগতিশীল নাট্য সংগঠনগুলো কোনোরকম মুখ খুলতে পারছিল না। নবনাট্য এ সময় চাপের মুখে পড়ে। বাষট্টি থেকে চৌষট্টির এপ্রিল মাস পর্যন্ত নাট্যজগতে একটা দারুণ দুর্যোগের কালো ছায়া পড়েছিল।

পঁয়ষট্টি সালে শুরু হয় পাক-ভারত যুদ্ধ। পাশাপাশি অর্ধাহার অনাহার-জনিত মৃত্যু, ছাঁটাই, কলকারখানা বন্ধ হওয়া নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। সারাদেশ জুড়ে এক ব্যাপক ও তীব্র চাকুরি সংকট যুব সমাজকে এক ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন করে। ছেষট্টি সালে যা আরো মারাত্মক আকার নেয়। ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গ আলোড়িত করে তুলেছিলে। সারা রাজ্যজুড়ে এত ব্যাপক খাদ্য আন্দোলন আগে কখনো হয়নি। প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, মুনাফাবাজি মানুষের ধৈর্যের সীমা বিপর্যস্ত করল। ব্যাপক এ প্রত্যক্ষ আন্দোলনের ভেতব দিয়ে দেশের সাধারণ মানুষ স্পষ্ট রাজনৈতিক বোধে উপনীত হলেন। এ আন্দোলনকে দমন করার জন্য শঙ্কিত সরকার তেড়ে সন্ত্রাস চালালেন। বামপন্থী নেতারা যেমন বন্দি হলেন, বন্দি হলেন বেশ কিছু সাহিত্যিক ও নাট্যকর্মী।

নিরাপত্তা আইন, নিবর্তন-মূলক আটক আইন, প্রভৃতি দমন মূলক আইনগুলির দ্বারা খেয়ালখুশি মতো জনগণের অধিকার খর্ব করা হচ্ছিল। জনগণের সামান্যতম প্রতিবাদের বিরুদ্ধে সরকারী নিপীড়ন শুরু হলো, নিষ্ঠুরতম পাশবিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ দমন করে দেশে পুলিশি রাষ্ট্র ব্যবস্থা পত্তন করা হল। কিন্তু শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত মানুষ এই অবস্থাকে নির্মূল করতে চাইল। শহরে গ্রামাঞ্চলে তারা প্রতিরোধ সংগ্রামে সামিল হল। শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরাও হাজারে হাজারে প্রতিবাদ সংগঠিত হলেন। গণনাট্য সংঘের মধ্যে তখন ভাঙাগড়ার চরম খেলা চলছে। এই অবস্থার মধ্যেও গণনাট্য সংঘের কর্মীরা গণনাট্যের পতাকাকে ঊর্দ্ধে তুলে ধরতে মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবিতে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি র প্রতিবাদে, অভূতপূর্ব খাদ্য সমস্যার প্রতিকার এবং সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের মোকাবেলায় গণনাট্য সংঘ শ্রমিক-কৃষকদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দেখা গেল এই সংগ্রামে গণনাট্য সংঘ একা নয়, সাথে যুক্ত হয়েছে আরো অনেক নাট্যদল এবং শিল্পী ও সাহিতিক। অগ্নিগর্ভ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে সূচিত হল প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের আর এক নতুন অধ্যায়।

বিশুদ্ধ শিল্পচর্চার ঝোঁক কেটে গিয়ে আবার আত্মপ্রকাশ করল সমাজ সচেতন, শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত রাজনৈতিক নাটক। তৎকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডল ছিল এর পশ্চাতে সক্রিয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই যে উৎপল দত্তই ছিলেন এর অন্যতম পথপ্রদর্শক।[৫০] গণনাট্য থেকে সরে গিয়ে যাঁরা এতদিন পলায়নপর মনোভাব নিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই নাটক নিয়ে এই সময় নতুন চিন্তার মুখোমুখি হয়। দেখা যায় রাজনৈতিকভাবে পলায়নপর মনোবৃত্তি কেটে যাচ্ছে অনেকের। নতুন নাট্যচিন্তায় রাজনীতিও প্রাধান্য পেল। সরকারি শাসনতন্ত্রের চেহারা এমন নগ্নভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল, নাট্যকর্মীরা বুঝতে পারল রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজেদের গা বাঁচানো যাবে না। ফলে সরকারি নির্যাতনের সামনে দাঁড়িয়ে ষাট দশকের মাঝ থেকে নবনাট্য আন্দোলন নতুন চরিত্র লাভ করল। এই পর্যায়ে এসেই গণনাট্য সংঘ বহির্ভূত নাট্যদলগুলি গ্রুপ থিয়েটার নামে পরিচিত হতে শুরু করে।

পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে একটি বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে তা হল, সমাজ ও জনগণের জন্য শিল্প নয়, 'শিল্প শিল্পের জন্য'—এই কথা আর কেউ বলছে না। এমন কি যারা প্রতিক্রিয়াশীল তাঁরাও নয়। কিন্তু জনগণ ও সমাজের জন্য নাটক করব, নিজেদের প্রগতিশীল পরিচয় অক্ষুন্ন রাখব, অথচ গণনাট্য করব না- এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিকল্প কিছুর পরিচয় সেদিন প্রয়োজন হয়ে পড়ল। গ্রুপ থিয়েটার নামে অভিহিত হবার মধ্যে দিয়ে সম্ভবত এই সমস্যার সমাধানে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল।[৫১]

সেই সময় বহু দলকেই রাজনৈতিক নাটকের দিকে ঝুঁকে পড়তে দেখা যায়। থিয়েটার কমিউনের 'কিংকিং', 'বিভুর বাঘ', 'জুলিয়াস সিজারের শেষ সাতদিন', সমীক্ষকের 'স্বদেশী নকশা' সবগুলোই রাজনৈতিক নাটক। শূদ্রকের নাটকেও কম বেশি রাজনীতি ছিল। থিয়েটার ওয়ার্কশপ রাজনৈতিক ভাবনা মাথায় নিয়েই নাটক আরম্ভ করেছিলেন। যেমন 'রাজরক্ত', 'মহাকালীর বাচ্চা', 'বেলা অবেলার গল্প', 'শোয়াইক গেল যুদ্ধে'। চেতনার 'মারীচ সংবাদ', 'স্পার্টাকাস', 'মা', 'সমাধান', 'জগন্নাথ', ' 'রোশন' নাটকে রাজনীতি এসেছে প্রবলভাবে। চার্বাকের 'পদ্য গদ্য প্রবন্ধ', 'কর্নিক', 'উত্তর পুরুষ', 'এ এক ইতিহাস' সবই রাজনৈতিক নাটক। আরো বহু বহু দলের প্রযোজনায় রাজনীতির প্রচার দেখা গেছে। সেসব দলেরও দু-একটি করে স্মরণীয় প্রযোজনা পাওয়া গেছে। কিন্তু তারপরেই শুরু হয়েছে দিগভ্রষ্ট হবার পালা। যার প্রধান কারণ মার্কসীয় চিন্তা সম্পর্কে নাট্যকর্মীদের স্বচ্ছ ধারণার অভাব।

গ্রুপ থিয়েটার আসলে কী, সে প্রশ্নের জবাব বহুজন বহুভাবে দেবেন, বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যাও মিলবে। কিন্তু স্পষ্ট কোনো জবাব পাওয়া যাবে না। সেই প্রেক্ষিতে যাঁরা থিয়েটারকে একটি গোষ্ঠীভিত্তিক আন্দোলনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে চান সেই সব ভারতীয় তথা বাংলা থিয়েটারকে গ্রুপ থিয়েটার বলা যায়। যাঁরা গণনাট্যের মূল আদর্শ শ্রেণিসংগ্রাম বা শ্রেণি দর্শন গ্রহণ করতে পারেননি কিন্তু আবার প্রগতিশীল লড়াইয়ের আন্দোলন থেকেও সরে দাঁড়াননি। যাঁরা সরাসরিভাবে গণনাট্য আন্দোলন নাম নিয়ে কিংবা গণনাট্য আন্দোলনের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে কাজ করেন না, কিন্তু গণনাট্যের আদর্শকে কোনো না কোনোভাবে বহন করে চলেছেন। শাসক শ্রেণির শ্রেণিস্বার্থ দুষ্ট শাসননীতির বিরুদ্ধে যাঁরা তাঁদের নাটকে সোচ্চার। শাসক শ্রেণির গণতন্ত্র হত্যার বিরুদ্ধে যারা নিরন্তর আক্রমণরত। গ্রুপ থিয়েটার সম্পর্কে যেমন সজল রায় চৌধুরী লিখছেন 'যে থিয়েটার কমিউনিস্ট আন্দোলনের মার্কায় মার্কিত হতে চায় না অথচ কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধী নয়, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত তাই গ্রুপ থিয়েটার'।[৫২] তিনি এ কথাও স্বীকার করছেন, জনগণের গণতান্ত্রিক চৈতন্য সংগঠনে গ্রুপ থিয়েটার কথিত নাট্যসংস্থাগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

গ্রুপ থিয়েটারের একটি বৃহৎ অংশ সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে চান কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দলের অধীনে নয়। যার ফলে দলগুলো গোষ্ঠীতন্ত্রে পরিণত হয়। মুশকিল বেঁধেছে, গোষ্ঠীতন্ত্র কী আদর্শে কী প্রযোজনায় কী সংগঠনে গোষ্ঠীবাদেরই জন্ম দেয়। ব্যক্তিবাদ সেখানে ধীরে ধীরে মুখব্যাদান করে। আদর্শবোধে ঘটে বিচ্যুতি। গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের ক্ষেত্রেও বারবার ব্যক্তিবাদের প্রাধান্য ও সর্বহারার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ঘটনাও লক্ষ করা গেছে। কিন্তু গণনাট্যের পাশাপাশি রাজনৈতিক নাটকের ধারাও এঁরা রক্ষা করে চলেছেন। গ্রুপ থিয়েটারগুলির বিগত দশ-পনেরো বছরের প্রযোজনার ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে প্রায় নব্বই শতাংশ দল তাঁদের সৃষ্টিকর্মে সমাজকে স্বীকার করেছেন, সমাজের মানুষের মর্যাদা দিয়েছেন, সমকালের ঘটনাবলিকে তুলে ধরেছেন, জীবনের আর্তিকে প্রকাশ করেছেন।[৫৩] এই সব গ্রুপ থিয়েটার, যারা তাঁদের প্রযোজিত শিল্পকর্মের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্ত শাসক চক্রের মুখোশ খুলে দিয়েছে বারবার, বিভিন্ন নাট্যকর্মের মাধ্যমে জনগণের অধিকার রক্ষার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গেছে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের লক্ষ্যে অবিচল থেকে।[৫৪] স্বৈরশাসনের সময়ে এই সব গ্রুপ থিয়েটারের একটা অংশ অসম সাহসে বুক টান করে দাঁড়িয়েছিল। আঘাত তারা কম পায়নি। কিন্তু কর্তব্যকর্ম বাদ দিয়ে চলতি ব্যবস্থার সঙ্গে আপোস করতে তার অনীহা দেখিয়েছে।[৫৫] কিন্তু গোষ্ঠীস্বাতন্ত্র্য আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পাশাপাশি কয়েকটা উদ্ভট জটিল প্রশ্নের ঘূর্ণাবর্তে পাক খেতে খেতে তারাও আজ এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে যার ফলে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে যথার্থ নাট্য আন্দোলনে আজও তারা শামিল হতে পারছে না। যদি গ্রুপ থিয়েটার গণনাট্য আন্দোলনের আদর্শকে কম বেশি বহন করে চলেছে। কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবই

সবচেয়ে বড় দুর্বলতা গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের পথে। সে কারণেই গ্রুপ থিয়েটার আজ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত।[৫৬]

মেনে নিতেই হবে যে স্বাধীনতা-উত্তরকালে এই গ্রুপ থিয়েটারই বামপন্থী সাংস্কৃতিক চেতনা ও মতাদর্শের প্রধান বাহক হয়ে উঠেছিল। আবার এই গ্রুপ থিয়েটার আপাদমস্তক মধ্যবিত্তের থিয়েটার, যে মধ্যবিত্ত জীবনের সর্বসময়ে সর্ব পরিস্থিতিতে সুবিধাবাদী জীব হয়ে সমাজে ঘুরে বেড়ায়। আবার এই মধ্যবিত্তই অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণ বলে অপরের দুঃখে কখনও কখনও অতিমাত্রায় বিচলিত হয়, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, বিপ্লবের হাতছানিতে সাড়া দেয় এবং অন্যতর সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখে।[৫৭] সন্দেহ নেই, গ্রুপ থিয়েটার সত্তরের দশক থেকে রাজনীতির এক ঝড়ো হাওয়া বইয়ে দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের নাটকে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য বাংলা রাজনৈতিক নাটকের, দেড় শতকের মধ্যেই আবার সেখানে ভাটার টান লক্ষ করা যায়। কারণ গণনাট্যের নাটকে যে ধরনের অঙ্গীকার ছিল গ্রুপ থিয়েটারগুলোর তা ছিল না। দ্বিতীয়ত পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসায় নাট্যদলগুলো এটাকে নিজেদের বিজয় মনে করে। বিজয়ের পর অবচেতনে তাদের মধ্যে যে ব্যাপারটা প্রাধান্য পায় তা হল সরকারের কাছ থেকে নানা সুযোগ সুবিধা লাভ। নাটকের উন্নয়নের স্বার্থে সাংগঠনিক ভাবে, কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবেও নানা সুযোগ সুবিধা লাভ করেছেন কিন্তু তাতে রাজনৈতিক নাট্যধারার লাভ হয়নি। বরং রাজনৈতিক নাটকের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। যার অন্যতম একটি কারণ, বামফ্রন্টকে যেহেতু তারা নিজেদের পক্ষ মনে করতেন, সে জন্য নাট্যকর্মীরা ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারেননি এরপর লড়াইটা কার বিরুদ্ধে। মধ্যবিত্ত মানসিকতার আর একটি সমস্যা হল কেন লড়াই তারা বেশিদিন চালিয়ে যেতে পারে না। আর যে কোনো লড়াইয়ে তার ব্যক্তিগত স্বার্থটা প্রধান হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনে সেটা স্পষ্ট। গণনাট্য সংঘ স্বভাবতই জনগণের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, কিন্তু গ্রুপ থিয়েটারগুলির সে বাধ্যবাধকতা ছিল না। রাজনৈতিক ঘটনাবলির মূল্যায়নে, শ্রেণি চরিত্র বিশ্লেষণে, শ্রেণি শত্রুকে চিহ্নিত করার প্রশ্ন, এমনকী নাটক রচনা ও প্রযোজনার আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও অনেক গ্রুপ থিয়েটারগুলির চিন্তা-ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে গণনাট্য সংঘের চিন্তার মিল রয়েছে, তেমনি অনেক ব্যাপারে মতের ও চিন্তার অমিলও রয়েছে। যদিও গ্রুপ থিয়েটার দানা বেঁধেছিল বামপন্থী বোধের দিকে পাল্লাভারী করেই।[৫৮] কিন্তু গণনাট্যে যেমন সরাসরি রাজনীতি প্রচার করে, গ্রুপ থিয়েটার মধ্যে আছে তেমন পাশ কাটাবার চেষ্টা। শ্রেণি সংগ্রাম গ্রুপ থিয়েটারের আদর্শ নয় কিন্তু সুবিধা বা দরকার মতো তারা তা নাটকে ব্যবহারও করে। গ্রুপ থিয়েটারের কেউ কেউ মার্কসবাদী চিন্তার ধারক-বাহক হলেও বড় একটা অংশ সংকীর্ণতাবাদেরও পরিচয় দিয়ে থাকে। কিছু কিছু দলের মধ্যে আছে নৈরাজ্যবাদী ধারা। গ্রুপ থিয়েটার মূলত তার প্রতিবাদী চরিত্র লক্ষণের কারণেই দর্শকদের নজর কেড়েছিল।[৫৯] কিন্তু সেই প্রতিবাদ কীসের জন্য, কার বিরুদ্ধে সে ব্যাপারে সকলের দৃষ্টিভঙ্গি একরকম ছিল না।

গ্রুপ থিয়েটার সম্পর্কে 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকার সম্পাদক নৃপেন্দ্র সাহার বক্তব্যটি খুবই মূল্যবান। তিনি বলেছেন, গ্রুপ থিয়েটার, যে থিয়েটার পিপল্স থিয়েটারকে স্বাধীনভাবে লালন করার জন্য জন্ম নিয়েছিল যার সংখ্যা খুব কম করে হলেও সহস্রাধিক - তারা কি পৃথক কোনো আন্দোলন করতে পারে? যাকে আমরা গণ আন্দোলন বলি, সেই গণ আন্দোলনের পর্যায়ের কোনো আন্দোলন? সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে যখন কোনো স্বতস্ফূর্ত গণবিক্ষোভকে গণ আন্দোলনের পর্যায়ে সংগঠিত করা হয় তখনই তা গণ-আন্দোলনের চরিত্র পায় নচেত স্বতঃস্ফূর্ততায় গণবিক্ষোভ কেবল ধূমায়িতই হয়; কার্য-কারণ সূত্রে কিছুতেই তা লক্ষ্যস্থলে উপনীত হতে পারে না। বিরুদ্ধ শক্তির দ্বারা স্বভাবতই তা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কুক্ষিগত হয়ে যায়, অবদমিত হয়ে পড়ে। তিনি আরো বলেছেন, ইতিহাস

যখন এই কথাই বলে, তখন স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ততায় গড়ে ওটা কিছু গ্রুপ থিয়েটার, নেতৃত্ব যেখানে স্পষ্ট সোচ্চার সঠিক কোনো দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করে না, একদলের নেতৃত্বের সঙ্গে অপর দলের নেতৃত্বের মৈত্রীর পরিবর্তে বিরোধই যেখানে বড়, সেখানে সংখ্যায় সহস্রাধিক হয়েও গ্রুপ থিয়েটার পৃথক কোনো আন্দোলন হতে পারে না। গ্রুপ থিয়েটার সেখানে সমাজ কাঠামোর উপরিতলে, গণ আন্দোলনের বাতাবরণ রচনা করতে পারে মাত্র, গণ আন্দোলনের সহায়ক শক্তি হতে পারে মাত্র, নিজেরা পৃথক কোনো গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন গড়তে পারে না। এটাই বাস্তব সত্য।[৬০] যার প্রমাণ আমরা পরে পেয়েছি। যে অঙ্গীকার নিয়ে গ্রুপ থিয়েটারের জন্ম, সেই প্রতিশ্রুতি এখন লোপাট হয়ে যাচ্ছে। যাঁরা একটা নাটক মঞ্চায়নে রাজনীতিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তাঁরা এখন ভিন্ন কথা বলছেন। রাজনীতি বাদ দিয়ে তাঁরা এখন লোকনাটকের পেছনে ধাওয়া করছেন। গ্রুপ থিয়েটার না পেশাদারি থিয়েটার কোনটাকে গুরুত্ব দেবেন সে নিয়ে বিতর্ক জুড়ে দিয়েছেন। হঠাৎ তাঁরা প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠেছেন। আর সেটা তাঁরা করছেন তাঁদের আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বার্থে।

গ্রুপ থিয়েটার বা নবনাট্য এই ধারার সাথে যাঁরা জড়িত তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লাভের ব্যাপারটা সর্বক্ষেত্রেই প্রকট। ঘুরপাক খেয়ে তারা বারবার সেই একই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তাতে বোঝা যায় মধ্যবিত্ত মানসিকতায় শম্ভু মিত্র একা নন, এঁদের প্রত্যেকের কাছেই নাটকের চেয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠা লাভই ছিল প্রধান। তাঁদের মধ্যে সত্যিকার নাট্য প্রেমিক ছিল না বা কেউই কোনো অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করতে চাননি ব্যাপারটা তা নয়, কিন্তু যখন তাঁদের সামনে বিলাসী জীবন বা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্ন এলো, মধ্যবিত্ত মানসিকতার কারণেই তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার পথে পা বাড়ালেন। ব্যাপারটা শুধু সেখানে থেমে থাকল না, নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদীদের চিন্তার কাছে নাটককে বিক্রি করে দিলেন। নিজের পূর্ব প্রচারিত আদর্শের বিরুদ্ধেই নিজেচলে গেলেন সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল এক চরিত্র নিয়ে। কিন্তু ইতিহাসের চমৎকার দিকটা হল এই যে, সেই প্রতিক্রিয়াশীল চেহারাটা সম্পূর্ণভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা সত্ত্বেও বাংলা নাটককে দিয়ে গেছেন এমন কিছু, যে কোনো মার্কসবাদী নাট্যকর্মী তার সেই শিক্ষা থেকে নাটককে শ্রমিক শ্রেণির পক্ষেও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। বিশেষ করে অভিনয়ের ক্ষেত্রে গ্রুপ থিয়েটারের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা তো বটেই, আরো অনেকে সৃষ্টি করে রেখে গেছেন মার্কসবাদীদের জন শিক্ষণীয় বহুকিছু। ইতিহাস এভাবেই এগোয়। বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে তার অবদান রেখে যায় - প্রতিক্রিয়াশীলদেরও অবদান থাকে সেখানে।

সত্যিকার অর্থে গণনাট্য তার সমস্তরকম ত্যাগ ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও বাংলা নাটককে শক্ত কোনো ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পারেনি। বাংলা নাটকের সেই ভিত্তি তৈরি হয়েছে গ্রুপ থিয়েটার চর্চার মাধ্যমেই, ইতিহাসের শেষ বিচারে যাদের ভূমিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল। যে প্রসেনিয়ামকে ঘিরে এই গ্রুপ থিয়েটারের নাট্যকর্মীরা নাট্য জগতে নানাধরনের বিপ্লবী ঘটনা ঘটিয়েছেন নাট্য মঞ্চায়নে - বিপ্লবী বিষয়বস্তু আমদানি করেছেন তাঁদের নাটকে, এমনকী সেই বিপ্লবী বিষয়বস্তু দ্বারা দর্শকও আকর্ষণ করেছেন, দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন তাঁদের অভিনয় প্রতিভা দিয়ে, সেই তাঁরাই প্রসেনিয়ামের বিরুদ্ধে লড়তে নেমেছেন লোকনাট্যচর্চার ধোঁয়া তুলে। যেন গত অর্ধশতাব্দী প্রসেনিয়াম থিয়েটার যা কিছু অর্জন করেছে, যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করেছে তার সবই যেন আজ মিথ্যা, নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার কারণে এঁদের অনেকেই আজ নিজেদের অতীতের সুকীর্তিটাও দেখতে পাচ্ছেন না।

গ্রুপ থিয়েটারের নাট্যকর্মীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার মানসিকতা ধরা পড়ে তাদের আজকের নাট্য প্রযোজনা ও জীবনযাত্রার দিকে তাকালে। সাম্রাজ্যবাদী মাদকদ্রব্য সেবন করে লোকনাট্যের নেশায় যেমন তাঁরা বুদ হয় আছেন, তেমনি একক অভিনয়ের প্রযোজনা তাদেরকে গ্রাস করছে। যার

ফলশ্রুতিতে বহুরূপীর 'অপরাজিতা', 'পঞ্চম বৈদিকের' 'নাথবতী অনাথবৎ'-এর পর দেখতে পাই নান্দীকার, থিয়েটার কমিউন, গান্ধার-এর একক প্রযোজনাগুলো। বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়ের 'শকুনির পাশা'ও এই দলভুক্ত। ইতিহাসকে তারা পিছনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন, সেই এস্কালাইসের যুগে- যখন নাটকে মাত্র একজন অভিনেতার আবির্ভাব ঘটেছিল। বুর্জোয়া হাতছানির কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্যই এসব ঘটে। বুর্জোয়া চাকচিক্যের সামনে তাঁরা আর নিজের বিশ্বাসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। দিকভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি শুরু করেছেন বুর্জোয়ার ঐতিহ্যে ভাগ বসাবার জন্য। সেখানে একমাত্র ব্যতিক্রম উৎপল দত্ত। দোষত্রুটির ঊর্ধ্বে তিনি নন, কিন্তু নাট্যকর্মে মার্কসবাদী অঙ্গীকার থেকে সরে দাঁড়াননি কখনো। রাজনৈতিক নাটক থেকে দূরে থাকেননি, মধ্যবিত্তের মানসিকতা দ্বারা আচ্ছন্ন হননি। মার্কসবাদের প্রতি তিনি নিজে যেমন অবিচল থেকেছেন, অন্যদের মধ্যেও সেই বিশ্বাস ধরে রাখবার জন্য বা নতুন করে উৎপন্ন করার জন্য নিজেকে ও লেখনীকে ব্যবহার করে গেছেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘ নাট্য ইতিহাসে উৎপল দত্তই একমাত্র ব্যক্তি যাঁকে অনুসরণ করা যায়, যাঁর চিন্তাকে গ্রহণ করলে পা পিছলে যাবার ভয় থাকে না। চল্লিশ বছর যিনি একটানা রাজনৈতিক নাটক করে গেছেন।

মার্কসবাদী শিল্পচিন্তার প্রাথমিক শর্ত অনুসরণ করেই গড়ে উঠেছিল উৎপল দত্তের থিয়েটার। তিনি জানতেন ধনতান্ত্রিক শোষণ শাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির পক্ষে নিপীড়িত সর্বহারার পক্ষে তার সংগ্রাম। উৎপল দত্ত ছিলেন আপাদমস্তক একজন রাজনৈতিক নাট্যকার।[৬১] তিনি তাঁর থিয়েটারকে বিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবেই ব্যবহার করেছেন। তিনি মার্কসবাদী এ কথা ঘোষণা করতে কুণ্ঠা বা কোনো সংকোচ ছিল না তাঁর। তিনি নিজেকে বলতেন একজন প্রোপাগান্ডিস্ট, একজন অ্যাজিটেটর। মার্কসবাদের প্রচারই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি জোর গলায় তা স্বীকার করতেন, নাটকের মাধ্যমে বক্তৃতার মাধ্যমে আমি আদর্শ প্রচার করে যেতে চাই। তিনি বলে গেছেন, মার্কসবাদের দ্বান্দ্বিকতা ছাড়া এ যুগের কোনো থিয়েটারই জনগণের হতে পারে না। বিষয়বস্তু বা নাট্যরচনার প্রশ্নে তিনি মনে করতেন নাট্য আন্দোলনের কর্মীদের প্রাথমিক কর্তব্য হল জনতার কাছে রাজনীতি পৌঁছে দেওয়া। উৎপল দত্ত নিজের জীবনেও তার প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। রাজনৈতিক সংগ্রামে বিশ্বাসী উৎপল দত্ত শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়ে সমাজ বদলের ক্ষুধা জাগিয়েছেন জনসাধারণের মধ্যে। জনসাধারণকে বিদ্রোহী করে তুলতে চেয়েছেন, বিপ্লবী করে তুলতে চেয়েছেন।[৬২]

তিনি যেমন বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্তের প্রগতিশীল সংগ্রামের কাহিনি বিবৃত করেছেন তাঁর নাটকে তেমনি শ্রমিক কৃষক সংগ্রামও এসেছে বারবার বহু নাটকে। ফলে আফগানিস্তানের আত্মনিয়ন্ত্রণের জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ, জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তাক্ত অধ্যায়, আজাদ হিন্দু ফৌজের দুঃসাহসিক কার্যক্রম, স্বাধীনতার জন্য সন্ত্রাসবাদী আত্মত্যাগ, ভারতের নৌ বিদ্রোহ, গান্ধীর জাতীয়তাবাদী রাজনীতি যেমন তাঁর নাটকের বিরাট অংশ দখল করে আছে, তেমনি বাঁশের কেল্লার তিতুমীরের লড়াই, আঠারশো সাতান্ন সালের কৃষক-সিপাহিদের বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নকশাল বাড়ির কৃষক বিদ্রোহ - সবকিছুই স্থান লাভ করেছে তাঁর নাট্যরচনায়।[৬৩] তিনি যেমন বিশ্বাস করতেন থিয়েটারের প্রতিটি সচেতন কর্মীর কর্তব্য হল দেশপ্রেমিক সংগ্রামের প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি শ্রমিক সংগ্রামের উত্থান- পতনের ঘটনা দেশের প্রতিটি কোণায় থিয়েটারের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া দরকার, তেমনি নিজেই তিনি সে দায়িত্ব কাঁধেও তুলে নিয়েছিলেন। গোটা বিশ্বের সংগ্রামী মানুষের মরণপণ সংগ্রামের ঘটনাগুলি তাঁর নাটকে ধরা পড়েছে, গভীর ইতিহাস বীক্ষার আলোকে।[৬৪]

বাংলার মাটিতে তথা সারা ভারতবর্ষে বামপন্থী রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার দুর্জয় সংকল্প নিয়েই উৎপল কাজ করেছেন। তিনি দেখা করেছেন পাহাড়ে জঙ্গলে সংগ্রামরত কৃষকদের সঙ্গে। কথা

বলেছেন, বুঝতে চেষ্টা করেছেন তাঁদের সমস্যাকে। ছাত্র যুবাদের নিয়ে আলোচনার আসর বসিয়েছেন তাঁর বাড়িতে, থিয়েটারে। দিনের আলোচনা শেষ করে ছুটে গেছেন কোনো উদ্বাস্তু কলোনিতে সারারাতের বিতর্ক সভায়। এ সবই করেছেন মানুষকে বোঝা এবং জানার জন্য। সম্যক রাজনীতির সাথে পরিচিত হবার জন্য। জনগণের কাছ থেকে শেখার আগ্রহ নিয়ে। তিনি বিশ্বাস করতেন জনগণকে সত্যিকারভাবে কিছু শেখাতে গেলে আগে তাঁদের কাছ থেকে শিখতে হবে।[৬৫] তিনি বলতেন, থিয়েটার করতে গেলে প্রধান যে তত্ত্বটা আমাদের আয়ত্ত করতে হবে সেটা থিয়েটারের তত্ত্বের চেয়েও বড় আর তা হচ্ছে মার্কসবাদ, লেনিনবাদ। নাটকের সকল তত্ত্বের চেয়ে ঢের বেশি প্রয়োজনীয় যে কোনো নাট্যকর্মীর জন্য মার্কসবাদ। কিন্তু সে মার্কসবাদ শিখবে এই জন্য নয় যে, সব নাটকে মার্কসবাদের তত্ত্ব ঢুকিয়ে দিয়ে নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করবে, মার্কসবাদ শিখবে সে জগৎকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার জন্য। বিপ্লবী নাটক মানুষের চিন্তার জগৎকে নাড়া দেবে, জগৎকে পাল্টাতে সাহায্য করবে এবং সব সময় সর্বহারা শ্রেণির পাশে দৃঢ়ভাবে জায়গা করে নেবে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান নাট্য প্রযোজনার দিকে তাকালে মনে হয় উৎপল দত্তের সেই নাট্যচিন্তায় বিশ্বাসীদের সংখ্যা কমে গেছে। ব্যক্তির ব্যক্তিগত সাফল্যলাভই সেখানে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। নাট্য আন্দোলনের জন্য যা সত্যিই দুর্ভাবনার কথা।

তথ্যসূত্র :

১। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যচিন্তা, শিল্প জিজ্ঞাসা, ইম্প্রেশন সিন্ডিকেট, কলকাতা ১৯৭৮, পৃ. ৩৩২
২। দর্শন চৌধুরী, 'গণনাট্য আন্দোলন', অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ৩১
৩। শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসংগ গণনাট্য, পৃ. ৫৩
৪। গণনাট্য পঞ্চাশ বছর, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির নির্বাচিত সংকলন, ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃ ২৯৫-২৯৬
৫। হীরেন ভট্টাচার্য, 'গণনাট্য আন্দোলনের ধার ও গ্রুপ থিয়েটার', নাট্যচিন্তা, বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৬-১২, এপ্রিল-অক্টোবর ১৯৯৯, পৃ. ২৪৯
৬। দর্শন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮
৭। অসিত বসু, '৫০ বছর : ডান বাম মধ্যপন্থা' নাট্যচিন্তা, পূর্বোক্ত পৃ. ১১৯
৮। দর্শন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ ৬১
৯। কল্পতরু সেনগুপ্ত, 'গণনাট্যের আদর্শে গ্রুপ থিয়েটার' গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, পূর্বোক্ত, পৃঃ-৮২
১০। দর্শন চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০
১১। সুধী প্রধান, গণ-নব-সৎ-গোষ্ঠীনাট্য কথা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ১৯৯২, পৃ. ২৩
১২। শিশির সেন, 'গ্রুপ থিয়েটার ও গণনাট্য', নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৯২
১৩। সুধী প্রধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭
১৪। দর্শন চৌধুরী, 'থিয়েটার আন্দোলন' গ্রুপ থিয়েটার, বর্ষ ১ম সংখ্যা ২য়, পৃ ৪০
১৫। শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ ৩
১৬। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য গ্রুপ থিয়েটার' গ্রুপ থিয়েটার বর্ষ ১ম, সংখ্যা ১ম, পৃ. ১০
১৭। দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, 'গ্রুপ থিয়েটার গণনাট্য ও স্বাধীন থিয়েটারের বৃত্তে', গ্রুপ থিয়েটার, বর্ষ ১ সংখ্যা ২য়, পৃ. ৫১
১৮। নৃপেন্দ্র সাহা, 'সম্পাদকীয় খসড়া' গন্ধর্ব, আশ্বিন ১৩৮৪, পৃ. ৪
১৯। খালেদ চৌধুরী, 'শিল্পের শর্ত' যোগসূত্র, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯২
২০। বিভাস চক্রবর্তী, 'গ্রুপ থিয়েটার ভাঙছে কেন' নাট্যচিন্তা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৬
২১। সুধী প্রধান, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৫-৬৬
২২। শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৪
২৩। সুধী প্রধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫, ৬৮,৭০
২৪। দর্শন চৌধুরী, 'দর্শক ও গণনাট্য এবং বিজন ভট্টাচার্য' গন্ধর্ব, আশ্বিন ১৩৮৪, পৃঃ-৫৭
২৫। চিত্তরঞ্জন ঘোষ, 'নাটক নবান্ন' গন্ধর্ব, আশ্বিন ১৩৮৪, পৃ. ২২-২৩

২৬। শান্তিময় গুহ, 'সর্বহারার সাংস্কৃতিক বিকাশে কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত', গ্রুপ থিয়েটার, বর্ষ ৫ম, সংখ্যা ২য়, পৃ. ২০
২৭। সুধী প্রধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২-৭৩
২৮। রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ ৫১
২৯। কুন্তল মুখোপাধ্যায়, 'গ্রুপ থিয়েটাব রাজনীতি ও অর্থনীতি' নাট্যচিন্তা, পূর্বোক্ত, পৃ ২৬২
৩০। সুধী প্রধান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬
৩১। উৎপল দত্ত, 'লিটল থিয়েটার ও আমি' এপিক থিয়েটার, উৎপল দত্ত স্মাবক সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৪, পৃ. ৫৪
৩২। বিভাস চক্রবর্তী, 'আদর্শহীন রাজনীতি আর ভণ্ডামী মূল কাবণ' নাট্যচিন্তা, পূবোক্ত, পৃ ২৭৬
৩৩। দর্শন চৌধুরী, 'থিয়েটারে আন্দোলন' পূর্বোক্ত, পৃ.৩৯ , আবো দ্রষ্টব্য বিষ্ণু বসু, 'গ্রুপ থিয়েটারের সংজ্ঞা' পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮-১৯
৩৪। দেশ, ২১ মে ১৯৫১
৩৫। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ জানুয়ারি ১৯৫১
৩৬। উদ্ধৃত, ডঃ স্বাতী লাহিড়ী, গ্রুপ থিয়েটারেব উৎস সন্ধানে, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা ১৯৯৫. পৃ ৮০
৩৭। আনন্দবাজাব পত্রিকা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০
৩৮। উৎপল দত্ত, 'বহুরূপী ও রক্তকরবী' নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর, পূর্বোক্ত, পৃ ৭০
৩৯। উৎপল দত্ত 'সমাজ বিপ্লব গণনাট্য' নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর. পূর্বোক্ত, পৃ ১৯৫
৪০। শিশির সেন, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৯০-৩৯১
৪১। ডঃ স্বাতী লাহিড়ী, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৭-৬৮
৪২। বিদ্যুৎ নাগ, 'গ্রুপ থিয়েটাবের দ্বন্দ্ব' নাট্যচিন্তা, পূর্বোক্ত, পৃ ১১৫
৪৩। রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাব নাট্য নিয়ন্ত্রণ ও বল প্রযোগেব বৃত্তান্ত' নাট্য আকাদেমি পত্রিকা-৬, মার্চ ১৯৯৯, পৃ ২২১
৪৪। শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ ৭
৪৫। উৎপল দত্ত, 'লিটল থিয়েটার ও আমি' পূর্বোক্ত পৃ. ৪৯
৪৬। পূর্বোক্ত পৃ. ৫১
৪৭। কুমার রায, 'উৎপল দত্ত এক প্রবল নাট্য ব্যক্তিত্ব' এপিক থিয়েটার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮
৪৮। তাপস সেন, 'নাট্য নির্দেশক উৎপল দত্ত', এপিক থিয়েটাব, পূর্বোক্ত, পৃ ১১০
৪৯। সুনীল দত্ত, নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর, পূর্বোক্ত পৃ. ২৪১
৫০। তাপস সেন, পূর্বোক্ত, পৃ ১০৯
৫১। সুস্নাত দাশ, 'নকশাল বাড়ি ও গ্রুপ থিয়েটার' নাট্যচিন্তা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১
৫২। সজল রায় চৌধুরী, 'গ্রুপ থিয়েটার কি কেন" ক ভাবে', গ্রুপ থিয়েটার, বর্ষ ১ম সংখ্যা ১ম, পৃ. ১২৪
৫৩। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০
৫৪। বিপ্লবকেতন চক্রবর্তী, 'গ্রুপ থিয়েটার ও গ্রুপ থিয়েটাব' গ্রুপ থিয়েটার, বর্ষ ১৩ সংখ্যা ২য়, পৃ.
৫৫। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১
৫৬। সম্পাদকীয়, নাট্যচিন্তা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬
৫৭। সম্পাদকীয়, নাট্যচিন্তা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬
৫৮। অসিত বসু, পূর্বোক্ত, পৃ ১২৩
৫৯। সলিল সরকার, 'গ্রুপ থিয়েটারের বিস্তার' নাট্যচিন্তা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
৬০। নৃপেন্দ্র সাহা, সম্পাদকীয়, গ্রুপ থিয়েটার, বর্ষ ২য়, সংখ্যা ৩য়, পৃ. ১৩
৬১। সুস্নাত দাশ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১
৬২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২
৬৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, 'অনন্য প্রয়োগশিল্পী উৎপল দত্ত', এপিক থিয়েটার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২
৬৪। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত তাঁর থিয়েটার, পৃ. ১২
৬৫। নৃপেন্দ্র সাহা, বাংলার রাজনৈতিক থিয়েটারে উৎপল দত্ত, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ১৯৯৮, পৃ. ৪৪

রাজনীতি এবং থার্ড থিয়েটার

কামালউদ্দিন নীলু

ষাটের দশক। ভারতের ইতিহাসের এক জটিল অধ্যায়। জটিল অধ্যায় যেমন ইতিহাসে, তেমনি সংস্কৃতিতে। আর্থ-সামাজিক কাঠামো থেকে শুরু করে সমাজের সকল কাঠামো বাঁধা পড়েছিল জটিলতার বেড়াজালে। কোথাও ছিল না কোনো মিল। এক অর্থে এটা ছিল ভাঙনের দশক। ১৯৬০-৭০ খ্রিস্টাব্দ। আন্দোলন, ধর্মঘট, বিক্ষোভ সমাবেশ, ভাঙন, যুদ্ধ, হত্যা, মৃত্যুর বছর। ১৯৬০-এ বস্ত্রকল ও নারকেল শিল্প কারখানায় ধর্মঘট। ১৯৬১-তে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ভাঙন। ১৯৬২-তে ভারত-চীন সীমান্তে যুদ্ধ। ১৯৬৩-তে নেহেরু সরকারের পদত্যাগ দাবি এবং কমিউনিস্ট পার্টির মহামিছিল। ১৯৬৪-তে মেহনতিদের নিয়ে গণ-আন্দোলন শুরুর আহ্বান, ২০ ফেব্রুয়ারি ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের অনশন ধর্মঘট, ৭ মার্চ কলকারখানার সামনে স্থায়ী প্রতীক বিক্ষোভ, ২৪-২৮ আগস্ট আইন অমান্য আন্দোলন 'মহা সত্যাগ্রহ' শুরু হয়। ১৯৬৫-তে একদিকে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের উদ্যোগে রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ে সংগ্রাম পরিষদ প্রতিষ্ঠা এবং অন্যদিকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। ১৯৬৫-৬৭-তে খরার ফলে দেশে অর্থনীতি দীর্ঘ ও মারাত্মক পতনের মধ্যে প্রবেশ করে, ফলে দ্রব্যমূল্য ও মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পায়। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান নেমে আসে। ১৯৬৭-তে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনের পর রাজ্য কংগ্রেসের ভাঙন। ১৭টি রাজ্যের নির্বাচনে ৯টিতে কংগ্রেস তার অবস্থান হারায়, ফলে রাজ্যগুলোতে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। ১৯৬৮-তে পশ্চিমবঙ্গে চরমপন্থীদের নেতৃত্বে কৃষকরা সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দেয়। ১৯৬৯-এ চরমপন্থীরা কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ত্যাগ করে এবং তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী লেনিনবাদী) গঠন করে। অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেস বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৬৯-৭০-এ কৃষাণ সভা ও ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন বলপূর্বক জমি দখলের আন্দোলন শুরু করে।

জটিলতা যেমন রাজনীতিতে তেমনি সংস্কৃতিতে। যেহেতু সংস্কৃতি এই সার্বিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ, সেহেতু সংস্কৃতি, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। এই সংস্কৃতিরই একটি অংশ থিয়েটার, যা প্রতিটি যুগের প্রতিটি সময়ের প্রতিটি পর্বে ছিল মানুষের সাথে, আছে মানুষের সাথে। ষাটের দশকে রাজনৈতিক জটিলতার পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই জটিলতা থিয়েটারেও। ১৯৬২-৬৪তে নাট্যজগতে ছেয়ে পড়েছিল দুর্যোগের কালোছায়া। অনেক প্রগতিশীল নাট্য সংগঠন মুখ খুলতে পারছিল না সরকারের চাপে। 'প্রগতিশীল নাটক' অভিনয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। লিটল থিয়েটারের 'অঙ্গার' সরকারের চাপে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬৩-তে প্রস্তাবিত পশ্চিমবঙ্গ নাট্যানুষ্ঠান বিল-এর প্রতিবাদ ওঠে। ১৮৭৬ সালের আইনে ১৯৬৩ সালে সরকার নাট্য আইন প্রয়োগ করে নাটকের আবার কণ্ঠরোধ করে। ১৯৬৬-র ১ এপ্রিল পৌর কর্তৃপক্ষ অপেশাদার নাট্যদলের উপর কর আরোপ করে এবং একই বছর এর প্রতিবাদে আন্দোলন ও বিক্ষোভ হয়। ১৯৬৬-র ৯ মে জাতীয় নাট্যশালার দাবিতে বিক্ষোভ ও সমাবেশ। ১৯৬৭তে সরকার পুলিশের সাহায্যে 'অমর ভিয়েৎনাম' নাটকের অভিনয় বন্ধ ঘোষণা করে। ১৯৬৯-এ 'নাটক বাঁচাও' আন্দোলন শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের এগারো হাজার নাট্যদলের কর্মীরা।

একদিকে 'নাটক বাঁচাও' আন্দোলন অন্যদিকে নাটকের সংকটকাল। ফলে কোথাও ধরা পড়ছিল না তার পরিপূর্ণতা, তার নিজস্বতা। দলগুলো ঘুরে ফিরে অভিনয় করছিল হয় পুরানো দেশাত্মবোধক সামাজিক নাটক, নয় বিলেতি ছাঁচে গড়া রিয়্যালস্টিক নাটক কিংবা ঐতিহাসিক মেলোড্রামা বা

শেক্সপিয়রের নাটকের বিকৃত রূপ। আরেক শ্রেণির দলগুলো (পেশাদার গোষ্ঠী) দর্শক আকর্ষণের জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করেছিল, যার মধ্যে প্রধান ছিল যৌন আবেদনমূলক নাটক। এ সবের পাশাপাশি কিছু দল (গ্রুপ থিয়েটার) অভিনয় করছিল ইবসেন, স্ট্রিন্ডবার্গ, আন্তন চেখব, ও'নিল, টেনিসি উইলিয়ামস, আর্থার মিলার, পিরানদেল্লো, আর্থার পিনেরো, হাক্সবেরি, বেকেট, আইনেস্কো, গোর্কি এবং ব্রেখটের নাটক। দেশের নাটক থেকে বেশি মাতামাতি চলছিল বিদেশি নাটক নিয়ে। ট্রাউজারের সাথে পাঞ্জাবি, ধুতির সাথে বিলেতি কোট গায়ে দিয়ে কফি হাউসে প্রদেশের থিয়েটার নিয়ে হই হুল্লোড় চলছিল। অনেকটা বুঝতে মুশকিল হয়ে পড়ত এ কফি হাউসটি পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থানের কোন জায়গায় অবস্থিত।

এ ধরনের একটি দীনতার মধ্যে নাট্যজগতে প্রবেশ করলেন বাঙালি এক ইঞ্জিনিয়ার। বাদল সরকার। যিনি বাংলার নাট্যাঙ্গনে থার্ড থিয়েটারের প্রবক্তা। ১৯৬৫-তে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' দিয়ে যিনি বাংলা নাটকে সংযোজন করলেন এক নতুন ধারা। যার প্রভাব পূর্ব-ভারত থেকে উত্তর-ভারত, সেখান থেকে মধ্য ভারত হয়ে একেবারে দক্ষিণ-ভারতে নিয়ে পড়ল। শম্ভু মিত্র বললেন, 'এই দ্রুত পরিবর্তনের মধ্যে আমাদের নাট্যের ছন্দ ধরা অতো সহজ ছিলো না, কিন্তু যেদিন আমি প্রথম 'এবং ইন্দ্রজিৎ' পড়লুম মুগ্ধ হয়ে গেলুম। মনে হলো, এই এতোদিন প্রতীক্ষার পর একটা আধুনিক নাট্যকার পাওয়া গেল।'

বাদল সরকার বাংলা তথা সারা ভারতে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' দিয়ে নাট্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেও তাঁর নাট্যচর্চার শুরু ষাটের দশকের শুরু থেকে। সে সময়ে তাঁর নাটকের বিষয় ছিল মূলত হাস্যরসাত্মক। নাটকগুলো হচ্ছে, 'সারা রাত্তির', 'প্রলাপ', 'যদি আর একবার', 'বড়ো পিসিমা', 'রাম শ্যাম যদু'।

১৯৬৫-৬৭ অবধি তাঁর রচনা ধারা ছিল ইউরোপীয় অ্যাবসার্ড নাটকের কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাঙালি সমাজের অ্যাবসার্ডিটিকে ধরা। সে ধরার ফসলই ১৯৬৫-তে 'এবং ইন্দ্রজিৎ', ১৯৬৭-তে 'বাকি ইতিহাস'। নাটক দুটির মধ্যে ক্লান্তি, অবসাদ, শূন্যতাবোধ, আত্মহত্যা-প্রবণতা প্রভৃতি অ্যাবসার্ড জীবন দর্শনের লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের যেখানে আরম্ভ সেখানেই তার পরিণতি। অমল, বিমল, কমল এবং ইন্দ্রজিৎ ও মানসী—এইভাবে মানুষের সংখ্যা বেড়ে চলে—এরা জন্মায়, লেখাপড়া শেখে, চাকরি করে, তারপর মরে যায়। এরা অসংখ্য আবর্ত রচনা করে ঘুরতে থাকে উদ্দেশ্যহীন কক্ষপথে, শূন্যগর্ভ পরিণামের দিকে। নাটকে কাহিনি নেই, কোনো স্থানে ভাষাও নেই, আছে ইঙ্গিত। এই অসঙ্গতি ও অর্থহীন ইঙ্গিতের গভীরে জীবনের এক সত্য দর্শনের আভাস পাওয়া যায়। সে 'সত্য' আর কিছুই নয়, 'জীবনটাই' নিরর্থক বলা। কিন্তু বেকেটের 'ওয়াটিং ফর গোডো' নাটকে জীবন দর্শনে নিছক শূন্যতা নেই, শূন্যতার মধ্যে আছে আশা, আছে বিশ্বাস। বাদল সরকারের 'উদ্ভট' নাটক লেখার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল সম্ভবত ১৯৬৪-তে 'বঙ্গীয় নাট্য সংসদ' প্রযোজিত আয়োনেস্কোর 'গন্ডার' নাটকের প্রযোজনা। নাটকটি ভাষান্তরিত করেন সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী। 'বাকি ইতিহাসে'র মধ্যেও ক্লান্তি, অবসাদ, শূন্যতাবোধ, আত্মহত্যার প্রবণতা প্রভৃতি অ্যাবসার্ড জীবন দর্শনের লক্ষণগুলি দেখা গেলেও এ নাটকের অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বধর্মী নাটক বলাই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত। নাটকটি আবার পিরানদেলোর 'সিক্স ক্যারেকটার্স ইন সার্চ অব অ্যান অথর'-এর প্রভাবে প্রভাবিত। পিরানদেলোর নাটকে কতকগুলি চরিত্র, যারা প্রত্যেকেই একই পরিবারের, যারা প্রত্যেকেই একটা সমস্যার আবর্তে ঘুরছিল, প্রত্যেকেই অন্তর্দ্বন্দ্বে দগ্ধ। এরা একটি মহলা-কক্ষে ঢুকে পড়ে এবং তাদের জীবনের কাহিনি বলতে শুরু করে। 'বাকি ইতিহাসে' দেখা যায় খবরের কাগজে একটি আত্মহত্যার কাহিনি অবলম্বনে প্রথম অর্ধে বাসন্তী এবং দ্বিতীয় অর্ধে শরদিন্দু দু'টি নাটক রচনা করে। বাসন্তী তার নারীসুলভ দৃষ্টি দিয়ে আত্মহত্যার কারণ বিশ্লেষণ করে। কিন্তু শরদিন্দু উগ্র সত্য

ভাষণে পুরুষোচিত সাহস দিয়ে বিকৃত মনস্তত্ত্বের জগতে আত্মহত্যার কারণ সন্ধান করে। নাটকটির তৃতীয় অঙ্কে সতীনাথের মুখে আমরা যখন শুনি, 'এগারো বছর? এগারো শতাব্দী? এগারো হাজার বছর? রাশি রাশি বছরের অর্থহীনতার ইতিহাস।' তখন অ্যাবসার্ড বক্তব্য প্রচণ্ডভাবে স্পষ্ট হয়ে যায়। এ স্থানে এসে অ্যালবির 'দ্য জু স্টোরি' নাটকের সংলাপকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৯৬৭-৬৯ পর্যন্ত শতাব্দী নাট্যদল গঠন এবং একে সামনে রেখে নানা ধরনের পরীক্ষা- নিরীক্ষার সময়কাল। কখনও বাংলার গ্রামীণ ফর্ম ধরার চেষ্টা, কখনও পাশ্চাত্যের ঢংয়ে সাংকেতিকতায় ফিরে যাওয়া, আবার কখনও কখনও পুরোনো নাট্যকারদের নাটক নিয়ে ভাঙচুর করা। এ সময়ের নাটক— 'কবিকাহিনী', 'বল্লভপুরের রূপকথা', 'সলিউশন এক্স', 'লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী', 'পরে কোনদিন', 'শেষ নেই', 'আবু হাসান', 'বীজ' ইত্যাদি।

১৯৬৯-৭১ বাদল সরকারের আজকের ইউরোপ ও আমেরিকার নাট্যধারার সঙ্গে পরিচিতি লাভের কাল। সূত্রটি ছিল ১৯৬৯ সালের কালচারাল এক্সচেইঞ্জ প্রোগ্রাম। অভিজ্ঞতা হয়েছিল প্যারিস এবং লন্ডনের থিয়েটার ইন-দ্য-রাউন্ড-এর প্রযোজনা, প্রাগে ইয়ারির মূকাভিনয়, পোলান্ডে গ্রোটোভস্কির 'অ্যাপক্যালিপসিস কাম ফিগারস' দেখা এবং গ্রোটোভস্কির সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ। নিউইয়র্কে রিচার্ড শ্যাখনারের সঙ্গে কাজ করা, 'দ্যা লিভিং থিয়েটারে'র পরিচালক জুলিয়ান বেগ ও জুডিথ মেলিনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা।

১৯৭১ থেকে আজ প্রসেনিয়ম মঞ্চকে উপেক্ষা করে সরাসরি দর্শকের মাঝে চলে এলেন নাটক নিয়ে। ঝেড়ে ফেললেন থিয়েটারের দীর্ঘদিনের প্রথা। সেটের বদলে প্রয়োজনীয় করে তুললেন এক খণ্ড ভূমিকে। ঝকমকি ব্রকেড জাতীয় থিয়েটারি কস্টিউমের বদলে ব্যবহার করলেন সাধারণ কাপড়ের বা চটের তৈরি কস্টিউম। মেকআপের প্রয়োজনীয়তা বাদ দিলেন একেবারে। ফ্রেনাল বা বেবির বদলে ব্যবহার করলেন ফ্লাড লাইট এবং হ্যালোজেন শুধু অভিনেতাদের দৃশ্যায়িত করবার জন্য। রইল না কোনো রঙের ছোঁয়া। এ অনেকটা আলবেয়ার কাম্যুর 'নো স্টাইল ইজ দ্যা বেস্ট স্টাইল!' এ ব্যবস্থাকে সামনে রেখেই বাদল সরকার লিখলেন নতুন ধরনের নাটক— 'সাগিনা মাহাতো';'স্পার্টাকাস'; 'ত্রিংশ শতাব্দী';'মিছিল';'ভোমা';'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস' ;'খটমট ক্রিং';'জন্মভূমি আজ' ইত্যাদি। এ ধরনের নাটক লেখার পাশাপাশি ১৯৭২ সালের ১২ নভেম্বর প্রতিষ্ঠা করলেন 'অঙ্গন মঞ্চ', যার মধ্য দিয়ে তিনি খুঁজতে চেয়েছিলেন তাঁর 'তৃতীয় থিয়েটার-এর রূপ। যে রূপকে তিনি দেশ থেকে বিদেশের নাট্যকর্মীদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁর 'দ্য থার্ড থিয়েটার', 'দ্য চেইনজিং ল্যাংগুয়েজ অব থিয়েটার' এবং 'থিয়েটারের ভাষা' তিনটি বইয়ের সাহায্যে।

বাদল সরকারের 'তৃতীয় থিয়েটারে'র পিছনে যে চিন্তা কাজ করেছে তা হচ্ছে, 'আমি বিশ্বাস করি না যে, শিল্প সংস্কৃতির কোন বিশুদ্ধ বিচ্ছিন্ন স্বয়ম্ভর রূপ আছে। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি যেমন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, একটি দেশের শিল্প সংস্কৃতিও তেমনি সেই দেশের যুগের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক কাঠামো বদলায়, রাজনীতি বদলায় সেই সঙ্গে, সমাজ ব্যবস্থা এবং সমাজের মানুষগুলির পারস্পরিক সম্পর্কও বদলায়, শিল্প-সংস্কৃততেও রূপান্তর ঘটে।'

থিয়েটারের প্রশ্নে বাদল সরকার মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। যে পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর নতুন কল্পনা 'তৃতীয় থিয়েটারে-এর মধ্যে। এই 'তৃতীয় থিয়েটার-এর সঠিক রূপ দিতে গিয়ে তিনি এ দেশের থিয়েটারকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। ভাগগুলো—এ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো, সামাজিক অবস্থান ও মানুষের জীবনবোধকে বিশ্লেষণ করে প্রশ্ন রেখেছেন—'আমার থিয়েটারে কি বলতে চাইছি? কেন বলতে চাইছি? কাকে বলতে চাইছি?'

সম্ভবত এ সকল প্রশ্নের উত্তরের সপক্ষে থিয়েটারকে তিনি সরাসরি দুটি অঞ্চলে ভাগ করে প্রথমত দুধরনের থিয়েটারের কথা বলেছেন। প্রথমটি, দেশজ লোকনাট্য যা গ্রামকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এই দেশজ লোকনাট্যকে বলেছেন 'ফার্স্ট থিয়েটার'। যে থিয়েটার নিজস্ব নাম ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্ব-স্ব অঞ্চলে বেঁচে আছে। যেমন—বাংলার 'যাত্রা', উড়িষ্যার 'ছোউ', আসামের 'অঙকিয়া নাট এবং ভান', গুজরাটের 'ভাওয়াই', উত্তর প্রদেশের 'রামলীলা' এবং 'নৌটঙ্কি', মহারাষ্ট্রের 'তামাশা' কর্নাটকের 'যক্ষগান', কেরালার 'কথাকলি', তামিলনাড়ুর 'থেরুক্কুটু' এবং 'কুটিআট্রম', অন্ধ্র প্রদেশের 'কুচিপুড়ি'। এগুলো সবই বাদল সরকারের ভাষায় ফার্স্ট বা প্রথম থিয়েটার।

দ্বিতীয় থিয়েটার বা সেকেন্ড থিয়েটার বলতে তিনি বলেছেন 'পাশ্চাত্য দেশ থেকে আমদানিকৃত থিয়েটারকে। যেটা শহরকেন্দ্রিক, যাকে নগর থিয়েটার বলা হয়।' যে থিয়েটার এ দেশে এসেছে ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে। যার প্রভাব ১৭৯৫ এর ২৭ নভেম্বর থেকে বর্তমান অবধি নগরের প্রসেনিয়াম মঞ্চে ছেয়ে আছে। যে থিয়েটার থেকে কোনোভাবেই মুক্ত হতে পারছে না এ দেশের থিয়েটার। ইংরেজি শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফসল এই বাংলা থিয়েটারকে আলাদা করবার কথা ভেবেছেন রবীন্দ্রনাথ, শিশিরকুমার থেকে বর্তমান বাংলাদেশের সেলিম আল দীন পর্যন্ত অনেকেই। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে থাকার সময়ে এই বিদেশি থিয়েটারের বিপক্ষে 'প্যারালাল থিয়েটার' দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছিলেন। পাশ্চাত্য থিয়েটারের বিপক্ষে মত দিতে গিয়ে 'রঙ্গমঞ্চ' নামক প্রবন্ধে বলেছেন, 'কলাবিদ্যা যেখানে একেশ্বরী সেইখানে তাহার পূর্ণ গৌরব। সতীনের সঙ্গে ঘর করিতে গেলে তাহাকে খাটো থাকিতেই হইবে। বিশেষতঃ সতীন যদি প্রবল হয়।'

এই নগর থিয়েটারকে আবার বাদল সরকার তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন—প্রথমত 'পেশাদারি বা ব্যবসায়িক থিয়েটার', দ্বিতীয়ত, 'শৌখিন বা অফিসপাড়ার থিয়েটার', তৃতীয়ত 'গ্রুপ থিয়েটার'। এই তিনটি থিয়েটারকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পেশাদারি বা ব্যবসায়িক থিয়েটার : পেশাদারি কারণে মঞ্চশিল্পীরা বা মঞ্চকুশলীরা পারিশ্রমিক পান। ব্যবসায়িক কারণে ব্যক্তিগত মালিকানায় ব্যক্তিগত মুনাফার জন্যে এ থিয়েটার চালানো হয়। মুনাফার উৎস টিকেটের বিক্রয়লব্ধ অর্থ। এ ধরনের থিয়েটারকে 'কোম্পানি থিয়েটার' বলা যেতে পারে। এ ধরনের থিয়েটার কলকাতায় বর্তমান। যেমন স্টার, বিশ্বরূপা থিয়েটার ইত্যাদি।

শৌখিন বা অফিসপাড়ার থিয়েটার : অফিস কর্মীদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, পাড়ার ক্লাব সদস্যরা বছরে একবার দুবার এরকম থিয়েটার করে। প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের মাসিক চাঁদার টাকায় এই থিয়েটারের খরচ চলে। দর্শকরা সাধারণত নিমন্ত্রিত। কোনো নির্দিষ্ট মূল্যের টিকেট বিক্রির রেওয়াজ নেই। নাটক মঞ্চায়নের স্থানও নির্দিষ্ট থাকে না। এ ধরনের থিয়েটারকে 'অ্যামেচার ক্লাব থিয়েটার' বলা যেতে পারে।

গ্রুপ থিয়েটার : এ দেশে এসেছে পাশ্চাত্য থেকে ১৯২৯ সালে। নিউইয়র্কে হ্যারল্ড ক্লারম্যান, চেরিল ক্রোফোর্ড প্রমুখ কয়েকজন তরুণ নাট্যকর্মী 'গ্রপ থিয়েটার' নাম দিয়ে একটি নাট্যদল গঠন করেন। এদেরই অনুসরণে লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আরেকটি 'গ্রুপ থিয়েটার' ১৯৩৩-এ। যদিও এই কনসেপ্টের প্রথম উন্মেষ ঘটে উনিশ শতকের আটের দশকে। এই থিয়েটারের উদ্দেশ্যে :

'principles of group acting'. 'object of presenting modern non-commercial and experimental plays','a membership society', 'ideas in freedom', 'cultural value', 'truth beauty and property', 'political consciousness'.

সাংগঠনিক অর্থে এ থিয়েটার শৌখিন, কারণ মুনাফা এখানে উদ্দেশ্য নয়। শিল্পী ও কুশলীরা টাকা না দিয়ে বরং উল্টো নিজেরা কিছু দিয়ে সংগঠিত করেছে এই থিয়েটার। যদিও বর্তমানে এই ব্যবস্থার কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। যেহেতু 'গ্রুপ থিয়েটার' দাঁড়িয়ে আছে কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে

রেখে সেহেতু এই থিয়েটারকে আলাদা জাতে ফেলবার প্রয়োজন রয়েছে। এই থিয়েটার যারা গড়ে তুলেছে তাদের অনেকেই প্রচণ্ড অর্থাভাব সত্ত্বেও জীবিকার জন্য বা আর্থিক উন্নতির আশায় থিয়েটারে আসেনি। এসেছে একটি বিশেষ সামাজিক উদ্দেশ্য নিয়ে । আক্ষরিক অর্থে এটাই 'গ্রুপ থিয়েটারে'র ইতিহাস। 'গ্রুপ থিয়েটার' আন্দোলনের মধ্য দিয়ে থিয়েটার হয়ে উঠল 'সমাজ প্রগতির অন্যতম বাহন'। এই থিয়েটারকে 'শৌখিন আদর্শ থিয়েটার'ও বলা যেতে পারে।

নগর থিয়েটার বিভাজনের ক্ষেত্রে বাদল সরকার তিনটি জাতিগত বিভক্তির কথা বললেও আরেকটি থিয়েটার স্বভাবতই এসে যায়, সেটি 'রেপারটরি থিয়েটার'। ভারতে এর জন্ম ষাটের দশকে হলেও শব্দটি ইংরেজি ভাষায় ব্যবহার হতে শুরু হয়েছে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। তারপর আইরিশ থিয়েটার আন্দোলন এবং ইংল্যান্ডে রেপারটরি থিয়েটার আন্দোলনের সাথে শব্দটি সবার কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে। মিস হ্যার্নিম্যান ডাবলিন ১৯০৭-এ ম্যানচেস্টার নিউল্যান্ডের থিয়েটারকে সামনে রেখে গ্রেট ব্রিটেন প্রথমে আধুনিক 'রেপ্যারটরি' আন্দোলন হচ্ছে থিয়েটার বিকেন্দ্রীকরণের আন্দোলন। এই থিয়েটারের দর্শন হচ্ছে, (ক) দলগত মেজাজ। তারকা পদ্ধতি বহির্ভূত। প্রত্যেক সদস্যকে নানাধরনের ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য প্রস্তুত থাকা। (খ) একই নাটক দীর্ঘদিন ধরে অভিনয় করা চলবে না। (গ) ব্যবসায়িক স্বার্থে নাটকে নিম্নরুচি আমদানি করা চলবে না। তা দর্শক সংখ্যা যতই কম হোক।

ভারতে বেশ কিছু প্রদেশে 'রেপারটরি' থিয়েটার বর্তমান। দিল্লি ন্যাশানাল স্কুল অব ড্রামার সঙ্গে যুক্ত 'রেপার্টরি থিয়েটার' 'কেরালা রেপার্টরি থিয়েটার' মনিপুরের 'কোরাস রেপার্টরি থিয়েটার', 'ভূপাল রেপার্টরি থিয়েটার', 'আসাম রেপার্টরি থিয়েটার', 'কলকাতা রেপার্টরি থিয়েটার'।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন আসতে পারে ভারতে এতগুলো থিয়েটার থাকা সত্ত্বেও কেন এই 'থার্ড থিয়েটার'? এ ক্ষেত্রে বাদল সরকারের উত্তর, 'লোকনাট্য আজও গ্রামাঞ্চলে জনপ্রিয়, কিন্তু সেই লোকনাট্যের বিষয়বস্তু প্রধানত পিছিয়ে থাকা অথবা প্রতিক্রিয়াশীল মূল্যবোধে ভারাক্রান্ত। দেবদেবীর জয়গান, রাজারাজড়ার উপাখ্যান সেখানে। অর্থাৎ এ জীবনে উপবাস অত্যাচার অবিচার সবই ঈশ্বরের লীলা বা পূর্বজন্মের কর্মফল বলে ধরে নিয়ে সহ্য করা পরলোকে বা পরজন্মে মুক্তি আছে , সুখ আছে। অথবা রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, রাজভক্তি পরমধর্ম, সুতরাং রাজা খারাপ হলে একমাত্র পথ হল ভাল রাজা আনা। এবং সেটাও ঈশ্বর করবেন, প্রজাদের কিছু করবার নেই। এছাড়া আছে সতীসাধ্বী স্ত্রী ও সর্বসহা মাতার উজ্জ্বল চিত্র এঁকে এদেশের মেয়েদের অবস্থাটা পুরুষ-পদানত, নিকৃষ্ট, গৃহবন্দী, সামাজিক ক্ষেত্রে অবস্থাটা সুন্দর মোড়কে ঢেকে রাখা। ....তাহলে দেখা যাচ্ছে গ্রামের লোকনাট্যে পশ্চাদপদ মূল্যবোধ প্রচারিত হচ্ছেই।' অন্যদিকে নগর থিয়েটার প্রসঙ্গে বললেন, 'নগর থিয়েটারে প্রগতিশীল মূল্যবোধ ও ভাবধারার প্রসার বাড়তে লাগলো। কিন্তু এ থিয়েটারের দর্শক বলতে গেলে মধ্যবিত্তরাই। কিন্তু আজকের প্রতিযোগিতামূলক সমাজ ব্যবস্থায় মধ্যবিত্তের আসল চেষ্টা সর্বদাই নিজেকে আর এক ধাপ উপরে তোলা। এই ক্ষুদ্র স্বার্থ তাকে বৃহত্তর স্বার্থ সম্বন্ধে অন্ধ করে রাখে, তাই সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে সামগ্রিক মুক্তির পথে না গিয়ে সে অন্যকে ডিঙ্গিয়ে একা একা উপরে উঠবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়। ফলে শহরের থিয়েটারে প্রগতিশীল ভাবধারার প্রকাশ যতোই হোক, মধ্যবিত্ত দর্শকের মনে বড়োজোর একটা মানসিক উত্তেজনা ওঠে, বিবেকের তুষ্টি ঘটে, বিশেষ কোন সক্রিয় ভূমিকা সে নিতে পারে না সমাজ পরিবর্তনের কাজে।'

এ প্রসঙ্গে বাদল সরকারের মতামত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শহরের থিয়েটার প্রগতিশীল মূল্যবোধ প্রচার করলেও তা সীমাবদ্ধ থাকছে তাদের মধ্যে যারা প্রগতিশীল কাজে নামতে অক্ষম অথবা বিমুখ। অন্যদিকে যাদের মুক্তির প্রয়োজন এবং যারা মুক্তি আনতে পারে, সংগ্রাম করে, তাদের

কাছে লোকনাট্য মারফত যাচ্ছে মুক্তি বিরোধী অর্থাৎ মুক্তির সঙ্গে সম্পর্কহীন বাণী অথবা প্রগতি বিমুখতা।

বাদল সরকার উপরোক্ত দুটি থিয়েটার বিশ্লেষণ করে প্রয়োজন অনুভব করেছেন এ দেশের জন্য একটি বিকল্প থিয়েটারের। যে থিয়েটার প্রথম থিয়েটার লোকনাট্য নয়, নয় দ্বিতীয় থিয়েটার নগর থিয়েটার। প্রয়োজন 'তৃতীয় থিয়েটার'।

এই 'তৃতীয় থিয়েটার' কী। বাদল সরকারের উত্তর, 'এই তৃতীয় থিয়েটার হচ্ছে একটা দর্শন, একটা দৃষ্টিভঙ্গি, একটা ভাবধারা এবং সেই কারণেই স্বভাবতঃই এই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ একটা আন্দোলন। মাঠে ঘাটে পরীক্ষিত যুগের ও সমাজের প্রয়োজনে গড়ে ওঠা এক বিস্তীর্ণ আন্দোলন এই বিকল্প থিয়েটারের ভিত্তি।'

যেহেতু তাঁর 'থার্ড থিয়েটার-এর ভিত্তি হচ্ছে সমাজের প্রয়োজনে গড়ে ওঠা এক বিস্তীর্ণ আন্দোলন, সেহেতু এই থিয়েটারকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্টা করবার জন্যে জোরাল যুক্তি দেবার চেষ্টা করেছেন, 'আমাদের কাছে 'থার্ড থিয়েটার' কোন আঙ্গিকের পরীক্ষা নয়। আমাদের আরম্ভ বিষয়বস্তু থেকে। সেই হিসাবে কোন বিশেষ আঙ্গিক বা স্টাইল বা ফরম আমাদের লক্ষ্যবস্তু নয়। কোনো বিশেষ ফরমের প্রতিই আমারা কমিটেড নই। আমাদের কমিটমেন্ট বিষয়বস্তুতে, আঙ্গিকে নয়। আমাদের বিষয়বস্তু স্টাইলকে ডিকটেট করে। এবং সেই কারণেই প্রায় নাটক থেকে নাটকে আঙ্গিকের বদল ঘটে আমাদের থিয়েটারে।'

দেখা যাচ্ছে বাদল সরকার ফর্ম, স্টাইল ইত্যাদি শব্দকে বিয়োগ করে যে শব্দটির উপর বারবার জোর দিয়েছেন সেটি হচ্ছে বিষয়বস্তু। বিষয়বস্তু এই থিয়েটারে সর্বত্র অধিকার বিস্তার করে থাকবে একটি কারণেই, যেহেতু তাঁর ভাষায় থিয়েটার সমাজ পরিবর্তনের জন্য। সমাজ পরিবর্তনের জন্য কিছু একটা করবার দরকার যাঁরা মনে করেন তাঁদের জন্য এই থিয়েটার। যে কারণে তিনি তাঁর 'থার্ড থিয়েটার'কে বলেছেন 'থিয়েটার ফর সোস্যাল চেইঞ্জ'। পরিবর্তনের জন্য যেহেতু একটা অ্যাকশনের প্রয়োজন সেহেতু এই থিয়েটারকে আবার 'থিয়েটার অব অ্যাকশন' নামেও অভিহিত করেছেন। 'থিয়েটার ফর সোস্যাল চেইঞ্জ', 'থিয়েটার অব অ্যাকশন' বলার পর আবার 'থার্ড থিয়েটার'কে 'থিয়েটার অব ফিলিংস'ও বলেছেন। 'থিয়েটার অব ফিলিংস' বলার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বাদল সরকার বলেন, 'যেহেতু যে কোন আর্ট ফর্মের মতো থিয়েটারে কমিউনিকেশন মুখ্যত হয় ইমোশনের মাধ্যমে, বুদ্ধি বা ইনটেলেকটের মাধ্যমে নয়, সেই জন্যে এটাকে থিয়েটার অব ফিলিংসও বলা যেতে পারে।'

যেহেতু সামাজিক দায়িত্ববোধকে সামনে রেখেই থিয়েটার করতে হবে সেহেতু এই 'থার্ড থিয়েটার'-এর প্রশ্নে থিয়েটারকর্মীদের একটি নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে বেঁধে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এই থিয়েটার কখনই সকল নাট্যকর্মীদের জন্য নয়। যারা নাট্যশিল্পকে বিক্রয় করে বা এই শিল্পের মাধ্যমে যারা নিজেদের অবস্থান তৈরী করতে চায় বা থিয়েটারকে সামনে রেখে যে সকল নাট্যকর্মী জীবনবোধ, সমাজবোধ মানবাতাবোধের মধ্যে দিয়ে একটা পরিবর্তনের কথা বলবে, যারা থিয়েটারকে কার্যত পরিবর্তনের হাতিয়ারে পরিণত করাবে শুধুমাত্র সেই কর্মীর হাতিয়ারই হচ্ছে এই 'বিকল্প থিয়েটার'।'

আমরা 'থার্ড থিয়েটার'-এর দর্শনগত দিক থেকে দেখতে পাচ্ছি, একটা পরিবর্তন। পরিবর্তন একটা নতুন সমাজের আশায়। ফরম-এর বদলে বিষয়বস্তু। এই বিষয়বস্তু পৌঁছাতে হবে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে। যে জনগোষ্ঠীর একটি বিপ্লবে সরাসরি অংশগ্রহণ করবে একটা আমূল পরিবর্তনের জন্য। যেখানে থাকবে না কোনো ব্যক্তিগত ইন্টারেস্ট। ইচ্ছাটা অবস্থান করবে সামগ্রিকতায়।

সমাজ পরিবর্তন এবং বৃহত্তর জনগণের জন্য প্রয়োজন 'থার্ড থিয়েটার'। বৃহত্তর জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্যে এই থিয়েটারের রূপের প্রশ্নে বাদল সরকারের বক্তব্য :

১। যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থায় করা যায়, অর্থাৎ 'ফ্লেক্সিব্‌ল্' বা নমনীয় ;

২। যা সহজে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া যায়; অর্থাৎ 'পোর্টেবল' বা বহনীয় ;

৩। যা টাকার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল নয়, অর্থাৎ ইন-এক্সপেন্সিবল্ বা সুলভ।

আজকের থিয়েটারে যে সকল উপকরণ ব্যবহার করা হয় যথা দৃশ্যপট, মঞ্চ, পোশাক, মেকআপ, আলো, শব্দ ইত্যাদি সব কিছুর সরলীকরণের মধ্যে দিয়ে এই তিনটি শর্ত পূরণ করা যেতে পারে।

'থার্ড থিয়েটার-এর কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য :

১। খোলা প্রশস্ত জায়গায় অভিনয়যোগ্য, দর্শক মূলত চারপাশে বসবে ;

২। যেহেতু দর্শক মঞ্চের চারদিকে বসবে সেহেতু আলো, সেট-সেটিং, মেকআপ, মাইক্রোফোন, পোশাক ইত্যাদির অতিরিক্ত সহায়তা নিয়ে এ থিয়েটার বাস্তবের বিভ্রম বা মায়া তৈরি করবে না ;

৩। সকল উপকরণের অভাব পূরণ করবে অভিনেতার দেহ ও তাঁর কণ্ঠস্বর।

সকল কিছু বিয়োগ করে অভিনেতার দেহ ও তাঁর কণ্ঠস্বরের বিষয়টি পরিষ্কার করা যেতে পারে বাদল সরকার প্রযোজিত কয়েকটি নাটকের উপস্থাপনাকে সামনে রেখে।

'স্পার্টাকাস' নাটকে রোমান সিনেটরদের আসন হিসেবে বাদল সরকার স্লেভ চরিত্রগুলোকে ব্যবহার করেছিলেন। নাটকের শুরুতেই ক্রুশ হিসেবে দাঁড়িয়েছিল এই চরিত্রগুলো। এখানে বাদল সরকার শুধুমাত্র সেট বা প্রপসের প্রয়োজনীয়তা মেটাননি, এর মধ্যে দিয়ে নাটকের অন্তর্নিহিত অর্থকে অর্থবহ করে তুললেন। সেটা হচ্ছে রোমান সভ্যতার ভিত দাস ব্যবস্থার উপরে গড়ে উঠেছিল এবং সে সমাজে শোষণের মাত্রা কী ভয়ংকর ছিল সেটা দর্শকের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা।

বার্টল্ট ব্রেখটের 'ককেশিয়ন চক সার্কেল' নাটকের রূপান্তর 'গণ্ডি'-তেও অভিনেতাদের শরীর দিয়ে রেকর্ডের সাউন্ড-এর প্রয়োজনীয়তা মিটিয়েছিলেন। বিশেষ করে নদী পার হবার দৃশ্যে এর ব্যবহার ছিল চমৎকার।

'মিছিল', 'ভোমা', 'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস' নাটকের প্রযোজনাতেও একই ধরনের কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন।

৪। এ থিয়েটারের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রক্তমাংসের দর্শকের সঙ্গে রক্তমাংসের অভিনেতাদের জীবন্ত যোগাযোগ ;

৫। যে কোনো ধরনের নাটক এই ফর্মে করা যেতে পারে ;

৬। উপকরণ বর্জিত বলেই যেখানে সেখানে নাটক মঞ্চায়িত করা যেতে পারে। অভিনয়ের জন্য ঘটা করে মঞ্চনির্মাণের প্রয়োজন হয় না। মঞ্চায়নের ব্যয় যত সামান্য, টিকেটের হার কম রাখা যায়, বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন পড়ে না ;

৭। রাজনৈতিক বক্তব্যনির্ভর নাটকের জন্য এই থিয়েটার সব চাইতে শক্তিশালী বাহন হতে পারে। এ প্রশ্নে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় 'ঋতম' (প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা) পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'অঙ্গন মঞ্চ : রাজনৈতিক বিবেচনা' প্রবন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রবন্ধে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বাদল সরকারকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন দিতে গিয়ে গ্রুপ থিয়েটার এবং অঙ্গন মঞ্চের একটি সুন্দর পার্থক্যের সাথে এদেরকে কতটা কার্যত রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দিচ্ছে সে বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

নাটকে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা প্রকাশের জন্য প্রাসেনিয়ম মঞ্চের চেয়ে অঙ্গন মঞ্চ অনেক বেশি উপযুক্ত। তার কারণ :

ক. অঙ্গন মঞ্চ অভিনেতাদের কলাকৌশল দেখানোর আখড়া নয়, তার একটি সামাজিক ভূমিকা আছে ;



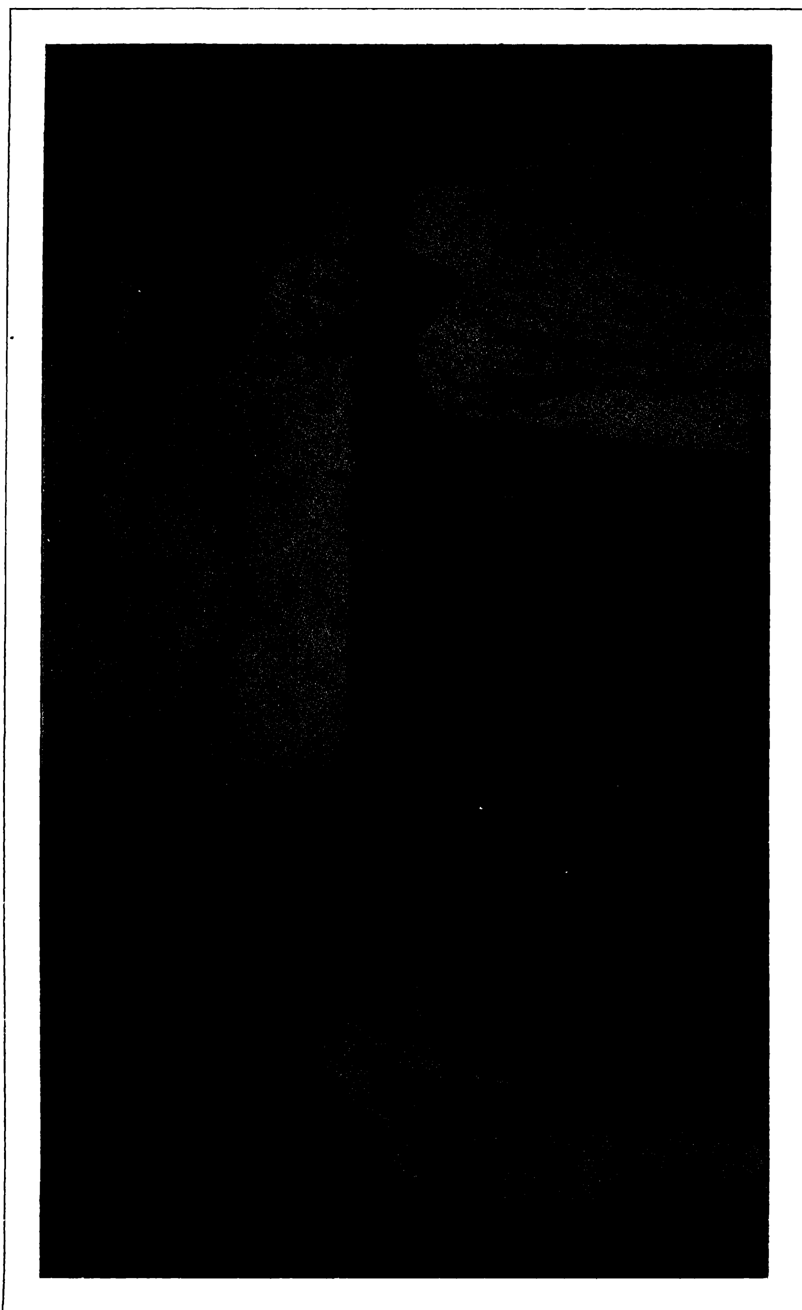
চিত্র ১৮



চিত্র.১৫



চিত্র ২০



চিত্র ২১

খ. প্রসেনিয়ম মঞ্চনগর-বদ্ধ, অঙ্গন-মঞ্চস্বচ্ছন্দে শহর থেকে শহরতলি. শহরতলি থেকে গ্রামে যেতে পারে। গ্রাম এবং শহরের ব্যবধানকে অঙ্গন মঞ্চযত সহজে ভাঙতে পারে প্রসেনিয়ম মঞ্চতত সহজে পারে না। শ্রমজীবী এবং কৃষিজীবী মানুষের কাছে অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতি-ইতিহাস ও বর্তমান ব্যাখ্যা পৌঁছে দিতে একমাত্র অঙ্গন মঞ্চই পারে ;

গ. গ্রুপ থিয়েটারগুলো ব্যবসায়িক থিয়েটার না হলেও পরোক্ষভাবে ব্যবসার গেরোতে তাদের আটকে পড়তে হয়। নাটক করে টাকা ফেরত আনতে না পারলে পরবর্তী নাটক করা সম্ভব হয় না। দর্শকের চাহিদাকেও সামনে রাখতে হয় তা সে আলো, পোশাক, মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি কায়দাকানুন হোক বা গান, নাচ বা অন্য কোনো চটক হোক। অস্তিত্ব রক্ষার জন্যেই গ্রুপ থিয়েটারগুলোকে খানিকটা ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি গড়ে তুলতে হয়, লাভ-লোকসানের কথা ভাবতে হয়। অঙ্গন মঞ্চকে এতসব ভাবতে হয় না ;

ঘ প্রসেনিয়ম বদ্ধ দলকে চালাবার জন্যে নির্ভর করতে হয় সরকার বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপর। সে ক্ষেত্রে নাটকের বক্তব্যের প্রশ্নে তাদের নমনীয় হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। 'যে থিয়েটার সামাজিক অসাম্য ও অন্যায়কে আক্রমণ করে, সে থিয়েটার স্বভাবতই প্রাতিষ্ঠানিক দাক্ষিণ্য আশা করতে পারে না, শত্রুর কাছে হাত পেতে শত্রুকে আঘাত করা যায় না।'

প্রসেনিয়াম মঞ্চে দর্শক ও অভিনেতাদের মধ্যে একটা দূরত্ব থেকে যায়। প্রাচীনপন্থীরা তাকে 'শৈল্পিক' দূরত্ব বলে থাকেন। অঙ্গন মঞ্চের লক্ষ্য ঠিক উল্টো। সে আনতে চায় দর্শককে পাত্রপাত্রীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে, যাতে জনসংযোগ হয়ে ওঠে মানুষে মানুষে, দর্শক অভিনেতার প্রত্যক্ষ সংলাপ সংযোগে।

ঙ. প্রসেনিয়ম থিয়েটারের আমদানি হয়েছিল ভারতে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ হিসেবে। তাই ভারতীয় সংস্কৃতিতে গ্রাম-শহরের যে বৈষম্য তা ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অবদান, সেই বৈষম্যের উপরই দাঁড়ায় আমাদের থিয়েটার। এই থিয়েটার একদিকে যাত্রা, নৌটংকি', তামাশা, ভাওয়াই এর ধারাকে সম্পূর্ণত অস্বীকার করল, অন্যদিকে নিজেকে এমনই অস্বাভাবিক আকর্ষণীয় করে তুলতে থাকল যে, শহরের থিয়েটার হল গ্রামের বিত্তবানদের চোখ ধাঁধিয়ে দেবার সার্কাসের তাঁবু। থিয়েটারের এই ইতিহাসের মধ্যে এমন কিছু ছিল যা গ্রামীণ অভিজ্ঞতাকে বা গ্রামীণ চেতনাকে থিয়েটারে প্রবেশই করতে দেবে না। গ্রাম যদি বা কখনও এই থিয়েটারে আসে, তাও আসে শহরের মানুষের ধারণার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে, নয়তো শহরের মানুষ গ্রামকে যে রূপে দেখতে চায়, সেই রূপের আদলে। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বাদল সরকারের 'থার্ড থিয়েটারে'র সমর্থনের মধ্যে দিয়ে এটাই বের করে এনেছেন যে, রাজনৈতিক নাটকের জন্যে অঙ্গন মঞ্চ সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। এই মঞ্চকে এবং থিয়েটারকে কেন্দ্র করে আজকে যে কোন স্থানে অর্থাৎ মাঠে-ময়দানে, হাটে-বাজারে, শহরে-গ্রামে রাজনৈতিক বা প্রতিবাদী নাটক করা সম্ভব। যার মাধ্যমে একটি স্পষ্ট চিন্তাধারা এবং রাজনৈতিক আদর্শ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। যে গোষ্ঠীর চেতনায় আঘাত করবে নাটক। যার মধ্য দিয়ে বেজে উঠবে একটি সমগ্র পরিবর্তনের প্রথম সুর।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় এর পক্ষে যেমন বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তেমন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অনেকে এর বিপক্ষ মতামত ব্যক্ত করেছেন বিভিন্নভাবে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 'থার্ড থিয়েটার' বা তৃতীয় থিয়েটার সম্পর্কে বলেন, 'থার্ড থিয়েটার হচ্ছে মধ্যবিত্তের আরেক নয়া খেলনা'।

অভিজিৎ করগুপ্তের ভাষায়, 'বাদলবাবুর তৃতীয় থিয়েটার সামাজিক দায়বদ্ধতার থেকেও পিকনিক উদ্দীপনাই বেশী।'

প্রভাতকুমার গোস্বামী এই 'থার্ড থিয়েটার'-কে বিচার করেছেন ফিফ্‌থ থিয়েটার হিসেবে। 'ভরত বর্ণিত থিয়েটার হচ্ছে প্রথম, দ্বিতীয় লোকনাট্য, তৃতীয় প্রসেনিয়ম, চতুর্থ গণনাট্য, পঞ্চম হচ্ছে 'থার্ড থিয়েটার' বা 'অঙ্গনমঞ্চ'। এই তথাকথিত থার্ড থিয়েটার পোস্টার ড্রামার সঙ্গে ডিগ্রীর তফাৎ।'

আলী যাকের 'সুন্দরম্' ভাদ্র-কার্তিক, ১৩৯৪ সংখ্যাতে লিখেছেন, 'যিনি যেমন ভাবেন, যিনি যেমন বোঝেন সেইভাবে। আজকের বাঙলা নাটক বিশেষ করে কোলকাতা-ভিত্তিক নাট্যচর্চায় এই রকম একটি মতবাদ হ'ল তথাকথিত থার্ড থিয়েটার।'

আমার ব্যক্তিগত অভিমত এটা একটা মিশ্র থিয়েটার। যা ওদের নয়, নয় আমাদের। এটা গ্রামের একজন সাধারণ কৃষকের গায়ে জোর করে কোট, টাই, ট্রাউজার পরিয়ে দেবার মতো একটি ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ প্রাচ্যের শরীরে পাশ্চাত্যের জ্যাকেট।

এই থার্ড থিয়েটার-এর রূপ, কাঠামো, বৈশিষ্ট্যে প্রভাব পড়েছে পাশ্চাত্যের অনেক তাত্ত্বিকের তত্ত্ব। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পোল্যান্ডের·'থিয়েটার ল্যাবরেটরির' প্রতিষ্ঠাতা, তাত্ত্বিক, নির্দেশক, চিত্রশিল্পী, 'পুওর থিয়েটার' এর প্রবক্তা গ্রোটোভস্কির 'অ্যাপক্যাপিসিস কাম ফিগারস' এর।

বাদল সরকার কোনো ভাবেই মেনে নিতে চাননা তাঁর 'থার্ড থিয়েটার'-এ গ্রোটোভস্কির প্রভাবের কথা। এ বিষয়ে তাঁর মত, 'যাঁরা ওঁর নামের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে বলেন, আমার ধারণা তাঁরা গ্রোটোভস্কিও জানেন না, আমাদের থিয়েটারও জানেন না।....গ্রোটিভস্কির থিয়েটারের সঙ্গে আমাদের থিয়েটারের যে ফান্‌ডামেন্টাল ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে..., ওর থিয়েটারে থিয়েট্রিক্যাল কমিউনিকেশন ব্যাপারটাই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে এবং তা শরীরের মাধ্যমে। বিষয়বস্তু ওঁর থিয়েটারে মুখ্য নয়। আর আমাদের থিয়েটার শুরুই হচ্ছে বিষয়বস্তু থেকে, ফরম যেখানে গৌণ। এখানেই গ্রোটোভস্কির অ্যাপ্রোচের সঙ্গে আমাদের মূলত পার্থক্য।'

বাদল সরকার যতই অমিলের কথা বলুন, গ্রোটোভস্কির 'পুওর থিয়েটার'-এর গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায় অমিলের থেকে মিলের পরিমাণ অনেক অনেক বেশি। এ ক্ষেত্রে বাদল সরকারের 'থার্ড থিয়েটার' এবং গ্রোটোভস্কির 'পুওর থিয়েটার'কে পাশাপাশি রাখলে দেখা যাবে, এরা একে অপরের থেকে ভিন্ন নয়।

পুওর থিয়েটার	থার্ড থিয়েটার
1. Theatre can exist without makeup, without autonomic costume and scenography, without a seperate performance area (stage), without lighting and sound effects, etc.	১। আলো, সেট-সেটিং, মেকআপ, মাইক্রোফোন, পোশাক ইত্যাদির সহায়তা নিয়ে এ থিয়েটার বাস্তবের বিভ্রম বা মায়া তৈরি করবে না।
? Physical, plastic and vocabulary is more than set, costume, makeup, light and sound.	২। খোলা প্রশস্ত জায়গায় অভিনয়যোগ্য, দর্শক মূলত চারপাশে বসবে।
3. It cannot exist without the actor-spectator relationship of perceptal, direct, 'live' communication.	৩। সকল উপকরণের অভাব পূরণ করবে অভিনেতার দেহ ও তাঁর কণ্ঠস্বর।
	৪। রক্তমাংসের দর্শকের সঙ্গে রক্তমাংসের অভিনেতার জীবন্ত যোগাযোগ। যেহেতু থিয়েটার একটা জীবন্ত কলা মাধ্যম. 'লাইভ শো'। থিয়েটার হচ্ছে এখন এখানে। থিয়েটার মানুষে মানুষে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ।

আজ সারা বিশ্বে থিয়েটার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। কেউ ভাঙছে শেক্‌সপিয়রকে, কেউ সফোক্লিসকে, কেউ বা ইবসেনকে। আবার কেউ বা ছুটছেন নতুন নতুন কনসেপট-এর পিছনে, ঘুরছেন ঐতিহ্যের খোঁজে, ভাঙচুর করছেন মহাকাব্য, পরাচ্ছেন লোকনাট্যের দেহে আধুনিক পোশাক। এরই মধ্যে দিয়ে থিয়েটার এগিয়ে চলেছে, কখনও জনগণকে সাথে নিয়ে, কখনও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। এটাই থিয়েটারের ইতিহাস। থিয়েটার কর্মীদের প্রতি সময়ে যুদ্ধ করতে হয়েছে, হচ্ছে শোষক গোষ্ঠীর সাথে, পাল্লা দিতে হচ্ছে টিকে থাকবার প্রয়োজনে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির সাথে। প্রতিনিয়ত আধুনিক হতে হচ্ছে থিয়েটারকে। আর সে জন্যে ও দেশে থেকে এ দেশে চলছে ভাঙচুর। প্রত্যেকেই ফিরে যেতে চাইছে স্ব-স্ব শিকড়ে, যার সাথে দেশেব প্রতিটি মানুষের জীবনযাত্রা তথা সমাজ কাঠামোর সম্পর্ক। সে সম্পর্ককে বাদ দিয়ে কি থিয়েটার সম্ভব? তাহলে সে থিয়েটার আবার হয়ে যাবে নির্দিষ্ট শ্রেণির থিয়েটার। যাতে ঘটবে না সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ, থাকবে না তাদের সম্পর্ক। এই সম্পর্কের উপর ভিত্তি করেই ব্রেখটের 'এপিক থিয়েটার', আরউইন পিসকাটরের 'পলিটিক্যাল থিয়েটার', জোসেফ চাইকিনের 'ওপেন থিয়েটার', মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'লিভিং থিয়েটার' 'লামামা', 'ব্রেড অ্যান্ড পাপেট' গ্রোটোভস্কির 'পুওর থিয়েটার'। তেমনি বাদল সরকারের 'থার্ড থিয়েটার'। উদ্দেশ্যগত দিক থেকে তাঁর এই থিয়েটার আর সব থিয়েটারের মতোই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চেতনায় বুদ্ধিমত্তায় আঘাত করতে চায় একটি পরিবর্তনের লক্ষ্যে।

বাদল সরকার তাঁর থিয়েটারকে, 'থিয়েটার অব অ্যাকশন', 'থিয়েটার অব চেঞ্জ', 'থিয়েটার অব ফিলিংস', 'তৃতীয় থিয়েটার', 'অঙ্গনমঞ্চ বা 'থার্ড থিয়েটার', যে নামেই অভিহিত করুন না কেন বিষয়টি দুই বাংলার নাট্যকর্মীদের কাছে বেশ আগ্রহের সঞ্চার করেছে এর তত্ত্ব ও প্রয়োগগত গুণ থেকে, এর বিষয়গত বিতর্কের কারণে।

'থার্ড থিয়েটার' নামটি বাদল সরকারের দেওয়া মনে হলেও আসলে এই শব্দটির প্রথম ব্যবহার আমরা দেখতে পাই মার্কিনি নাট্য সমালোচক ব্রুস্টাইন এর 'থার্ড থিয়েটার' বইয়ে, প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। প্রসঙ্গত, চলচ্চিত্রের বিষয়ে এই নামটি ব্যবহৃত হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আর্জেন্টিনার ফার্নান্দো সোলানাস এবং অক্তোভিও গেতিনোর রচনা 'তৃতীয় চলচ্চিত্রে'র লক্ষ্যেতে। এরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর আর্জেন্টিনায় হলিউডের ধাঁচে নির্মিত চলচ্চিত্রকে 'প্রথম চলচ্চিত্র', ইউরোপীয় চলচ্চিত্র যা সাহিত্যশ্রয়ী মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ভরপুর, সামাজিক বুর্জোয়া চলচ্চিত্রকে 'দ্বিতীয় চলচ্চিত্র' এবং এদের বিকল্প ব্যবস্থাকে 'তৃতীয় চলচ্চিত্র' বলেছেন, যা র‍্যাডিক্যাল ধ্যান-ধারণারই স্বাক্ষর।

এ থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, 'থার্ড থিয়েটার' নামটিও পাশ্চাত্য থেকে আগত। এই থিয়েটারের কাঠামো, বৈশিষ্ট্য ও দর্শনে ছোঁয়া লেগেছে যেমন পাশ্চাত্যের বেশ কয়েকজন নাট্যতাত্ত্বিক, সমালোচক ও প্রয়োগকর্তার, তেমনি প্রাচ্যের 'কাবুকি', 'নো', 'পিকিং অপেরা'সহ ভারতের বেশ কিছু নাট্য ফরমের ফিজিক্যাল দিক। যে কারণে খুব সহজেই বলা যায় এই 'থার্ড থিয়েটার' হচ্ছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের থিয়েটারের বিভিন্ন উপাদানের সহযোগে তৈরি একটি মিশ্রধারা, একটি মিশ্র থিয়েটার।

'থার্ড থিয়েটারে'র শারীরিক গঠনে পাওয়া যায় প্রাচ্যের লোকনাট্য ও ট্রাডিশনাল থিয়েটারকে। 'থার্ড থিয়েটার' যেমন সিনিক উপকরণ বর্জিত, তেমনি লোকনাট্যেও বিশেষ করে ভারতের কিছু অঞ্চলের লোকনাট্য, যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, দৈনিক উপকরণ বিহীন।

'লোকনাট্য ও ট্রাডিশনাল থিয়েটার' যেমন অভিনেতার শরীর ও কণ্ঠস্বরের উপর নির্ভরশীল, 'থার্ড থিয়েটার'ও অভিনেতার উপর নির্ভরশীল।

'লোকনাট্য ও ট্রাডিশনাল থিয়েটার' যেমন সহজেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে, 'থার্ড থিয়েটার'ও সেটা পারে। অর্থাৎ উভয় থিয়েটারই ফ্লেক্সিব্ল্।

'লোকনাট্য ও ট্রাডিশনাল থিয়েটার'-এর চারদিকে বা নিকটে যেমন দর্শক আসন, 'থার্ড থিয়েটার'-এর চারদিকেও তাই। •

উভয় থিয়েটারে কমিউনিকেশটাই মুখ্য। যেহেতু এদের পিছনে নির্দিষ্ট আদর্শ ও উদ্দেশ্য কাজ করে। পার্থক্য উদ্দেশ্যগত দিকে। একজন ইহজগতের কর্মফলকে পুঁজি করে পরকালের সুখদুঃখের কথা বলে। অন্যজন সমাজ পরিবর্তনের কথা শোনায়।

উভয় থিয়েটারেরই ঝোঁক উপাদানের সরলীকরণের দিকে।

'থার্ড থিয়েটার'-এর ক্রিয়ামূলক উপাদানে পাওয়া যায়, দুলাঁর 'রিদম এক্সসারসাইজ', দেলসারৎ-এর 'ইনভেস্টিগেসন্স অব এক্সট্রোভারসিভ অ্যান্ড ইনট্রোভারসিভ রিঅ্যাক্শন', স্তানিস্লাভস্কির 'ফিজিক্যাল অ্যাকশন', মায়ারহোল্ডেব 'বায়োমেকানিক্যাল ট্রেনিং', আর্তুদের 'থিয়েটার অব ক্রুয়েল্টি', গ্রোটোভস্কির 'অ্যাপক্যালিপসিস কাম ফিগারস্'।

বাদল সরকার দাবি করেছেন তাঁর এই 'থার্ড থিয়েটার' দিতে পারবে এ দেশের মানুষের মুক্তির পথ। যে থিয়েটার হয়ে উঠতে পারে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার সে থিয়েটার প্রথম থিয়েটার লোকনাট্য এবং দ্বিতীয় থিয়েটার নগর থিয়েটার থেকে ভিন্ন। এই তৃতীয় থিয়েটারের প্রয়োজনে তিনি বাতিল করেছেন প্রথম দুই থিয়েটারকে।

প্রথম থিয়েটার লোকনাট্যের বিষয়বস্তু প্রধানত পিছিয়ে থাকা অথবা প্রতিক্রিয়াশীল মূল্যবোধে ভারাক্রান্ত বলে তিনি মনে করেন। লোকনাট্য সম্পর্কে বাদল সরকারের এ মন্তব্য কতখানি যুক্তিযুক্ত সেটা ভাববার প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমত তিনি এই থিয়েটারকে একটি রেখার দ্বারা বেঁধে ফেলেছেন। অথচ আজকে পৃথিবীর সর্বত্রই থিয়েটারের একটি নিজস্ব রূপকল্পে তাত্ত্বিক থেকে শুরু করে প্রয়োগকর্তারা বিভিন্ন দেশের লোকনাট্যের বিভিন্ন উপাদান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছেন এবং সেখান থেকেই একটি নির্দিষ্ট থিয়েটার গড়বার কথা ভাবছেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ফর্মগুলোকে প্রয়োগকর্তারা ব্যবহার করে থিয়েটারকে যত দ্রুত দেশ এবং বিদেশের দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে পারছে, বাদল সরকার কিন্তু তেমনটি এতদিনেও করে উঠতে পারেননি। এই না পারার কারণ বাদল সরকারের 'থার্ড থিয়েটার' কোনোভাবেই ভারতীয় নয় এবং এর মধ্যে কোনো নিজস্বতা নেই। অপরদিকে বিজয় মেহেতা, পি. এল. দেশপাণ্ডে, বিজয় তেনডুলকার, হাবিব তানভীর, দীনা গান্ধী, শান্তা গান্ধী, বি. ভি. কারনথ্, রতন থিয়াম—এঁরা প্রত্যেকে স্ব-স্ব অঞ্চলের লোকনাট্যের সাহায্যে ভারতে তথা বিশ্ব থিয়েটারের ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করতে পেরেছেন। তাঁদের পথই আজকের থিয়েটারের জন্য সঠিক পথ বলে গৃহীত হয়েছে সর্বত্র।

বিংশ শতকের যুগচেতনা ও নানা আন্দোলন দ্বারা মুকুন্দ দাসের লোকনাট্যগুলো প্রভাবিত ছিল। বিশেষভাবে স্বদেশি প্রচার ও জনজাগৃতির জন্য তিনি 'যাত্রা'কে প্রধান বাহন হিসেবে গ্রহণ করে পল্লিবাংলায় এক নতুন ভাবোন্মাদনা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। হিন্দু মুসলমান ঐক্য, অস্পৃশ্যতা বর্জন, পণ্যবর্জন, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয় তাঁর 'পল্লিসেবা' ও 'কর্মক্ষেত্র' পালায় স্থান পেয়েছে। স্বদেশি ভাবধারায় রচিত 'মাতৃপূজা', 'পথ' ও 'সাথী' পালাগুলো তৎকালীন সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। মুকুন্দ দাস ছাড়াও কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় ও হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'মাতৃপূজা' ও 'রনজিতের জীবনযজ্ঞ' সমসাময়িক রাজনৈতিক চেতনা দ্বারা প্রভাবিত। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকার সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় ব্রজেন্দ্রকুমারের 'আকালের দেশ' রচিত হয়েছিল। তৎকালীন সমাজবিরোধীদেব অসঙ্গত ক্রিয়া-কলাপ ও জমিদারের অত্যাচারের সঙ্গে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের পরিচয়

পাওয়া যায় কানাইলাল শীলের 'দেশের দাবি' নাটকে। বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'বেইমান' পালায় খাদ্যাভাব, প্রজাপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। জিতেন্দ্রনাথ বসাকের 'মানুষ'-এ জাতিভেদ সমস্যা, অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের 'রঘু ডাকাত' পালাতে ধনিক শ্রেণির শোষণের সক্রিয় প্রতিবাদ প্রকাশিত। এই জাতীয় শ্রেণি সংগ্রামের পরিচয় পাওয়া যায় নন্দগোপাল রায়চৌধুরীর 'শহীদ বীর', বিনয়কৃষ্ণের 'ভুলের কাজল', প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'বিক্তানদীর বাঁধ' পালাতে। বর্তমান কালের যাত্রা পালাগুলো আরেক ধাপ এগিয়ে এসেছে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে। পালাগুলো 'লেনিন', 'হিটলার', 'ফাঁসির মঞ্চে', 'পথের ছেলে', 'বারুদ', 'রাইফেল', 'মৃত্যুঞ্জয় সূর্যসেন', 'আগুন নিয়ে খেলা', 'এক টুকরো রুটি' ইত্যাদি। এ সব পালার মধ্যে বেশ কিছু পালা শত থেকে হাজার রজনী মঞ্চস্থ হয়েছে বিভিন্ন দলের সাহায্যে। জনগণ প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে পালাগুলো দেখেছেন। ভালো পালাগুলো প্রতিটি দর্শকের কাছে একইভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। এ থেকে খুব সহজেই বলা যেতে পারে বাংলার মানুষের কাছে 'যাত্রা' অনেক বেশি সহজ ও গ্রহণযোগ্য বাদল সরকারের 'থার্ড থিয়েটার' থেকে।

চীনের বিপ্লবে তাদের ঐতিহ্য 'অপেরা' জনজাগরণে যে ভূমিকা পালন করেছিল, সে বিষয় আলোচনা করবার প্রয়োজন রয়েছে লোকনাট্য প্রসঙ্গে। চীনের সাংস্কৃতিক কামানের প্রথমে যে গোলাটি নিক্ষেপিত হয়েছিল সেটি একখানি নাটক, নাম—'হায়রুই-এর পদচ্যুতি'। নাট্যকারের নাম উহান। মুক্তিপূর্ব চীনেও নাট্যকলা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং এর মধ্যে প্রধান অপেরা। মুক্তিযোদ্ধারা এই প্রাচীন অপেরার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটান, অপেরাগুলোর মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপিত করতে থাকেন। এই জন্যেই ইয়েনান পিকিং অপেরা দল যখন 'লিংশান পর্যায়ে বিদ্রোহী' মঞ্চস্থ করে তা দেখার পর মাও সে তুং অপেরা দলকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন ১৯৪৪-এ ৯ জানুয়ারিতে। চিঠিটি হচ্ছে, 'জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে। তবুও পুরোনো দিনের অপেরা জনসাধারণকে এমনভাবে উপস্থাপিত করে যেন তারা আবর্জনা স্বরূপ। মঞ্চগুলোতেও অভিজাত শ্রেণীর প্রভু ও প্রভুপত্নী এবং তাদের আদরের দুলাল দুলালীদেরই আধিপত্য ছিল। এখন আপনারা ইতিহাসের এই বিপরীত ধারাকে পাল্টে দিয়েছেন। আপনারা ইতিহাসের সত্যের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন। এইভাবে প্রাচীন অপেরার সামনে এক নতুন জীবনের উৎস উন্মুক্ত হলো। এই জন্যেই এটা অভিনন্দন যোগ্য।'

বিভিন্ন দেশে, যুগে, সময়ের বিশ্লেষণে প্রশ্ন জাগে বাদল সরকার লোকনাট্য সম্পর্কে যে সব যুক্তি দেবার চেষ্টা করেছেন তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য। এ সব যুক্তি তাঁর এই বিকল্প থিয়েটারকে জোর করে দাঁড় করাবার জন্যেই দেওয়া। লোকনাট্যের বিষয়বস্তু যে প্রতিক্রিয়াশীল মূল্যবোধে ভারাক্রান্ত, এটা না বলে আমরা বলতে পারি লোকনাট্যের মাধ্যমে আমাদের মতে পশ্চাদপদ দেশের জনগণকে সচেতন করে তোলা সবচাইতে সহজ। যেহেতু লোকনাট্যের সাথে প্রতিটি দেশের, সমাজের, মানুষের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। এটাকে ভর করে বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটিয়ে খুব সহজেই মানুষকে উত্তেজিত করা সম্ভব একটা পরিবর্তনের লক্ষ্যে। যেটা কোনোদিনই সম্ভব হবে না বাদল সরকারের 'থার্ড থিয়েটারে'র পক্ষে। এটা যেখান থেকে শুরু হয়েছিল সেখানেই স্থির। অর্থাৎ এ থিয়েটার পরিবর্তনের কথা বললেও, কোনো ভাবে এদেশের জনগণকে স্পর্শ করতে পারেনি। যেটা পেরেছে ভারতের 'যাত্রা', 'তামাসা', 'নোটঙ্কি', 'ভাওয়াই' 'যক্ষগান', বা চীনের 'অপেরা', বিগতদিনের স্ব-স্ব দেশের বিপ্লব আর আন্দোলনের সময়।

বাদল সরকারের নাটকগুলো দেশের সাধারণ জনগণকে স্পর্শ না করার কারণ মূলত যাদের জন্য এ থিয়েটার তাদের শিক্ষার অভাব, দ্বিতীয়ত তিনি যে ভাষারীতি প্রয়োগ করেছেন তা কোনোভাবেই সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর 'ভোমা', 'মিছিল' 'ভারতের মুখপাঠ্য ইতিহাসে'

বিষয়বস্তুর ভিন্নতা থাকলেও নাটকগুলোর যে উপস্থাপনা তা মূলত কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের ভাষায়। যে কারণে নাটকগুলোতে কলকাতা ভিত্তিক জীবনের ছোঁয়াই বেশি আমাদের চোখে ধরা দেয়। এই মধ্যবিত্ত জাতীয় ছোঁয়া লাগার পিছনে কাজ করেছে সম্ভবত বাদল সরকারের শ্রেণি চরিত্র। সত্তর দশকের সময়কার নাটকগুলোতে কোনো গল্প নেই, আবেগ নেই, আছে কতগুলো শব্দ। এর ফলে দর্শকের কাছে পুরো ঘটনাটি নীরস হয়ে যায়, এবং যা গ্রামবাংলার মানুষের কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য হয়নি। অথচ এ দেশেই আবার শেক্‌সপিয়র, সোফোক্লিস, মলিয়ের, ইবসেন, ব্রেখট্‌ অনেক বেশি অভিনীত, অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। এর কারণ এ সব নাট্যকারের নাটকের কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ ও বিষয়বস্তুর সরলতা। যা ও দেশের মানুষের কাছে যেমনভাবে গ্রহণীয়, একই ভাবে আমাদের দেশের মানুষের কাছেও। এ সব প্রশ্নেই বাদল সরকার অচল। শুধুমাত্র দেখার জন্যেই দেখা হয়ে যায় তার নাটকগুলো, কিছু একটার জন্যে দেখা নয়। সে জন্যে মনে হয় বাদল সরকারের 'থার্ড থিয়েটার' সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি দিলেও, দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে এন্টারটেনমেন্ট হিসাবে।

অন্যদিকে বাদল সরকার 'নগর থিয়েটার' সম্পর্কে বলেছেন, 'এ থিয়েটার প্রগতিশীল ভাবধারার প্রকাশ যতই হোক, মধ্যবিত্ত দর্শকের মনে বড়জোর একটা মানসিক উত্তেজনা উঠে, বিবেকের তুষ্টি ঘটে ঠিকই কিন্তু বিশেষ কোন সক্রিয় ভূমিকা সে নিতে পারে না সমাজপরিবর্তনের কাজে। . . . তাহলে দেখা যাচ্ছে শহরের থিয়েটারে প্রগতিশীল মূল্যবোধ প্রচার করলেও তা সীমাবদ্ধ থাকছে তাদের মধ্যে যারা প্রগতিশীল কাজে নামতে অক্ষম অথবা বিমুখ।'

এ প্রসঙ্গে তাঁর যুক্তির গুরুত্ব কতখানি রয়েছে সেটা ভাববার অবকাশ থেকে যায়। কেননা বিগত দিনে এ দেশের থিয়েটার আমাদের অন্য কিছু বলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হতে স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গ-ভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলন, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, অসহযোগ আন্দোলন, বিদেশি পণ্যবর্জন, অস্পৃশ্যতা বর্জন, ভারত ছাড় আন্দোলন, নীলচাষ বিরোধী আন্দোলন, জমিদার বিরোধী আন্দোলন, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে এ দেশের নগর থিয়েটারে।

উল্লিখিত আন্দোলনগুলো বিষয়বস্তু হিসেবে এসেছে এ দেশের নাট্যকারদের নাটকে। ১৮৬০ সালে 'নীলদর্পণ', ১৯৪২-এর পর 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন', 'দুঃখীর ইমান', 'ছেঁড়াতার' নাটকগুলো কেবল নতুনভাবে আর্ট হিসেবেই প্রশংসিত নয়, দুঃস্থ ও নিপীড়িত মনুষ্যত্বের প্রতি যে বেদনা জাগ্রত করে তার মূল্য অনেক। চল্লিশ দশকের নাটকগুলোকে সামনে রেখেই 'গণনাট্য সংঘ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকেই এ দেশের নাট্যধারা নতুন দিকে চলতে শুরু করে। বিশ্ববিপ্লবের ইতিহাস থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন আন্দোলনের ছোঁয়া নগর নাট্যকারদের নাটকে বিষয়বস্তু হিসেবে স্থান পাবার ফলে প্রতিনিয়ত শাসকগোষ্ঠীর বাধার শিকার হয়েছে, জীবন দিতে হয়েছে নাট্যকর্মীদের।

বিপ্লব, আন্দোলনকে বিষয়বস্তু করে যে সকল নাট্যকার নাটক লিখেছেন তাঁরা হচ্ছেন, বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্র সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়, সলিল সেন, বিধায়ক ভট্টাচার্য, কিরণ মৈত্র, সলিল দত্ত, সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, রমেন লাহিড়ী, শৈলেশ গুহ নিয়োগী, উৎপল দত্ত, মনোজ মিত্র, রতনকুমার ঘোষ, মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই এ দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের একটি অংশ। এই প্রবন্ধের আলোচিত তাত্ত্বিক এবং নাট্যকার বাদল সরকার নিজেও এই প্রক্রিয়ারই ফল এবং তিনি এই শ্রেণির একজন।

এতসব কথা, এতসব উদাহরণ টানবার পিছনে যে কারণটি কাজ করেছে, সেটা হল এই 'থার্ড থিয়েটার' জাতীয় নামের মধ্যে দিয়ে যদি থিয়েটারকে বেঁধে ফেলা হয় তাহলে থিয়েটারের গতি হয়ে

উঠতে পারে একমুখো। প্রতিবাদী থিয়েটার বা সমাজ পরিবর্তনের নামে থিয়েটারের শরীরে যদি নির্দিষ্ট কোনো পোশাক পরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে থিয়েটারের গতি অবশ্যই ব্যাহত হবে। থিয়েটারের গতিকে ব্যাহত না করবার জন্যেই আমরা দেখি সোভিয়েত বিপ্লব-উত্তরকালে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তরকালে সোভিয়েত সোশালিস্ট বাস্তবতার অজস্র নাটকের পাশাপাশি, মস্কো আর্ট থিয়েটার প্রযোজনা করছিল শেরিডানের 'দ্যা স্কুল ফর স্ক্যান্ডাল', ১৯৪২-সালে মস্কোতে মালি থিয়েটার প্রযোজনা করছিল বার্নার্ড শ'র পিগমিলিয়ন', মলিয়রের 'ডন জুয়ান', ১৯৪০-৪৪ শেক্সপিয়রের 'রোমিও এ্যান্ড জুলিয়েট', 'অ্যান্টনিও অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা', 'টুয়েলফ্‌থ নাইট', লালফৌজের নিজস্ব দল মস্কো সেন্ট্রাল থিয়েটার অভিনয় করেছিল 'দ্য টেমিং অব দ্যা শ্রু' এবং গোল্ডস্মিথের 'শি স্টুপ্‌স টু কংকার' যুদ্ধের ফ্রন্টে গিয়ে। জার্মান দখলদার বাহিনীর প্যারিস দখল করে থাকার সময় সেখানকার রেডিওতে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' অভিনীত হয়েছিল।

বলা যায় রাজনৈতিক থিয়েটার এগিয়ে যাবে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনকে সামনে রেখে এবং সেটাই হবে থিয়েটারের জন্যে সবচেয়ে বড়ো প্রগতি। এর জন্যে এই ধরনের 'থার্ড থিয়েটার' নাম দিয়ে তাকে বাঁধবার প্রয়োজন নেই। তাকে বাঁধতে গেলেই বাধবে সব গোল। ব্যাহত হবে আন্দোলন। তাছাড়া থিয়েটারের একার পক্ষে সম্ভব নয় কোনো বিপ্লব বা কোনো একটি সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটানো। তাহলে পৃথিবীতে যত বার শেক্সপিয়র, মলিয়ের, চেখব, ইবসেন, ব্রেখ্‌ট মঞ্চস্থ হয়েছে ততবার সমাজ পরিবর্তন হত। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন থিয়েটার আন্দোলন বা বিপ্লবের সার্বিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ। সে শুধু মাত্র বিপ্লব করবাব জন্য মানুষের চেতনায় আঘাত করতে পারে, প্রস্তুত করাতে পারে জনগণকে বিপ্লবে শরিক হবার জন্যে, ইঙ্গিত দিতে পারে আসন্ন বিপ্লবের। এর থেকে থিয়েটার বা এই জাতীয় মাধ্যমের পক্ষে আর কিছুই করা সম্ভব নয়।

বাদল সরকারের 'থার্ড থিয়েটার' বলতে গেলে একটি 'কনসেপ্ট', এই 'কনসেপ্ট' সমগ্র বাংলার তথা ভারতের কিছু নাট্য বিশারদ বা তাত্ত্বিকদের কলমের খোরাক হলেও সার্বিক নাট্য আন্দোলন বা নাট্যচর্চার তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। এটা থিয়েটারের একটি সময়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি অংশ। এই 'থার্ড থিয়েটারে'র শরীরে চেপে আছে, পাশ্চাত্যের জ্যাকেট। যে জ্যাকেট বাংলা তথা সমগ্র ভারতের থিয়েটারকর্মীদের কাছে এবং দর্শকদের কাছে যতখানি না গ্রহণযোগ্য তার চেয়ে অনেক বেশি বিতর্কিত। তবু তাঁর এই চেষ্টা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাব। বাদল সরকার এবং তাঁর 'থার্ড থিয়েটার' সম্পর্কে বলা যেতে পারে এইভাবে, Every creative work is an experimental work. but all experimental work is not a creative work

গ্রন্থ নির্দেশ :

প্রসঙ্গ : নাট্য ঃ শম্ভু মিত্র, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

থিয়েটারের ভাষা : বাদল সরকার, নবগ্রন্থ কুটির, কলিকাতা।

The Third Theatre, Badal Sirkar, Naba Grantha Kutir, Calcutta

Stage In The Revolution : Political Theatre In Britain since, 1968, Catherine Itzin, Eyre Methun, London.

চতুরঙ্গ, এপ্রিল '৮৭, তৃতীয় থিয়েটার এবং বাদল সরকার, অভিজিৎ করগুপ্ত।

লোকনাট্য সমীক্ষা, ডঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা।

Towards A Poor Theatre, Jerzy Grotowsky, Methun, London

The Political Theatre, Erwin Piscator, Eyre Methun, London.

The Theatre of Meyerhold, Revolution on The Modern Stage, Edward Braun, Drama Book Specialist, N.Y.

China on Stage, Snow, Lois, W.N.Y.

The Theory of The Modern Stage, Eric Bentley, Penguin Books.

The Dramatic Event, Eric Bentley, Beacon Press, Boston.

বাকী ইতিহাস, বাদল সরকার, নবগ্রন্থ কুটির, কলিকাতা।

এবং ইন্দ্রজিৎ, বাদল সরকার, নবগ্রন্থ কুটির, কলিকাতা।

ভোমা, বাদল সরকার, নবগ্রন্থ কুটির, কলিকাতা।

সুখ পাঠ্য ভারতের ইতিহাস, বাদল সরকার, নবগ্রন্থ কুটির, কলিকাতা।

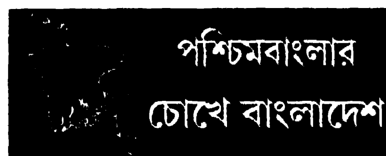
মিছিল, বাদল সরকার, নবগ্রন্থ কুটির, কলিকাতা।

স্পার্টাকুস, বাদল সরকার, নবগ্রন্থ কুটির, কলিকাতা।

গন্ডি, বাদল সরকার, নবগ্রন্থ কুটিব, কলিকাতা।

Traditional Indian Theatre, Kapila Vatsyayan, National Book Trust, India, New Delhi.

নাট্য বিষয়ক নিবন্ধ, জিয়া হায়দার, মুক্তধারা, ঢাকা, বাঙলাদেশ।


পশ্চিমবাংলার
চোখে বাংলাদেশ



ক



খ

বাংলাদেশ বাংলা নাটক

নিখিলরঞ্জন দাস

সে অনেকদিন আগে এ দেশ ছেড়েছিলাম। সবে তখন গাছপালা, পাখি, ফুল, নদী— এ সব চেনাব বযস। এক সকালে ভালো কবে কিছু বোঝাব আগেই দেখলাম আমাদের জিনিসপত্তব সব ঘাটে বাঁধা নৌকোয়। নদীপাবে সাবা গাঁয়েব মানুয। পালতোলা নৌকো থেকে স্টিমাব, তারপব রেলগাড়ি— অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে। ক্লাসে ভূগোল পডতে গিযে জেনেছি আমাব জন্মভূমি, কলকাতা থেকে কত দূবে, কোনদিকে। ওখানকার মেঘ এখানে, এখানকার বাতাস ওখানে কেমন অবাধ— স্মৃতির গাছপালায় দোলা দেয়, জল ঝরায।

কিন্তু ওই যে দু-দেশের মাঝখানে এক কাগুজে প্রাচীব। বিনা ছাড়পত্রে টপকানো অসাধ্য। কখনও এ দেশের ওপর দিযে যেতে যেতে দেখেছি, রুপোলি নদীব ফিতেয় জড়ানো এক সবুজ মোড়ক— মহার্ঘ এক উপহাবের মতো কেবলই আমায আকর্ষণ করেছে। ওখানে সেই সব মানুষ আছেন, যাঁরা বাংলায় কথা বলাব অধিকারের জন্য লড়াই কবেছেন, অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য যুদ্ধ কবেছেন— করবেন।

দেখতে ইচ্ছে করে সেই মানুষদের ঘনিষ্ঠ হয়ে। তাঁদের সাহিত্যে-শিল্পে কেমন বিধৃত হযে আছে সেই অবিস্মরণীয় সংগ্রাম? গল্পে-কবিতায় লেখা যা হচ্ছে, ওপার থেকেও তার কিছু আভাস পাই। কিন্তু নাটক? বহু মানুষের শিল্পসৃষ্টিব আয়োজন আকুলতা, যা প্রতি মুহূর্তেই ফুটছে? যার প্রতিটি উচ্ছ্রিত আবেগে দর্শক শিল্পী প্রত্যেককে অংশ নিতে হয— উপকবণ হয়ে উঠতে হয়— সেই নাটক? এই জটিল আশ্চর্য শিল্পকর্মকে তো কাগজের পাতায় পুরে দূবান্তে পাঠানো যায না! এর কাছে যেতে হয়— ভেতবে ঘনিষ্ঠ বসতে হয়। তাই নীল ছাডপত্রটা হাতে পেতেই কলকাতা থেকে ঢাকার দূরত্ব ছোটো হয়ে গেল, বহন-বাহনের কষ্ট নিতান্তই তুচ্ছ মনে হল। ঢাকায পৌঁছেই প্রথম খোঁজ— কবে কোথায় নাটক! সুযোগ য়া'ক বলে! আজই সন্ধ্যায় নাটক।

আলোয় ঝলমল করছে মহিলাসমিতি। ঢাকা শহবে নাট্যপ্রেমীদের মিলনায়তন। ভেতরেব বন্দোবস্তে নয়, মেজাজে একে কলকাতাব একাডেমি বলা চলে। সামনে, এখানে ওখানে, নানা দলের প্রযোজনার সুদৃশ্য বিজ্ঞাপন, বোর্ড স্ট্যান্ডে সাঁটা, নাটকেব পত্র-পত্রিকার স্টল, নাটকের খুচরো আলোচনা, কফি-কর্নার। বেশ জমজমাট। দর্শক চবিত্রও প্রায কলকাতার একাডেমিব দর্শকদেব মতো।

নিদারুণ নৈরাশ্যবাদীও বলেন, ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের পব সবচেয়ে বেশি করে যেখানে প্রাণস্পন্দন অনুভব করা যাচ্ছে— সে হল প্রগতিশীল নাটক। 'স্বাধীনতা বাংলাদেশকে দিয়েছে নাটকের প্রতি অনুগত একগুচ্ছ ঋজু মেরুদণ্ড নির্ভর কর্মী, স্বাধীনতা দিয়েছে নিয়মিত নাটকাভিনয়।' স্বাধীনতা দিয়েছে গণমুখী নাটক।

স্বাধীনতার আগেও বাংলাদেশে নাটক হত। ঢাকার ড্রামা সার্কেল প্রাক-স্বাধীনতা যুগেই মঞ্চস্থ করেছিল বার্নার্ড শ অবলম্বনে মুনীর চৌধুরীর 'কেউ কিছু বলতে পারে না,' রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী', 'রাজা ও রাণী', এবং 'তাসের দেশ', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'বহিপীর', সৈয়দ আলী বাসান অনূদিত সোফোক্লিসের 'ইডিপাস', বজলুল করিম অনূদিত বার্নার্ড শ-র 'আর্মস অ্যান্ড দ্য

ম্যান' এবং ইসকাইলাসের 'সপ্ত শূরের থিবি আক্রমণ', সঈদ আহমেদের 'কালবেলা' ও আনিস চৌধুরীর 'মানচিত্র'। কিন্তু ড্রামা সার্কেল ছিল মহাসমুদ্রে একক অভিযাত্রী। ফলে তার পক্ষে নাট্যচর্চার ধারা তৈরি করা সম্ভবত হয়নি। কিন্তু স্বাধীনতার পর যে প্রাণবেগ এলো নাটকে, তাতে বিনোদনের জন্য নাটক করার সাময়িক শখ, কিংবা নাট্যবোদ্ধাদের নিতান্তই একাডেমিক আগ্রহে নাটক করার ভিরিক্কিপনা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। শিল্পমাধ্যম হিসেবে নাটককে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যম দেখা গেল এবারে। ঔপনিবেশিক সমাজে রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতিতে বিচরণকারী একদল মানুষ, এক রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের দ্বারা, দীক্ষা পেয়েছে তাঁদের অন্তরের আবদ্ধ অভিব্যক্তির সরব, অবাধ এবং প্রাণবন্ত বহিঃপ্রকাশের। ঢাকার শীর্ষস্থানীয় একটি নাট্যদলের শ্লোগানই ছিল 'অস্ত্র ছেড়ে মঞ্চে নেমেছি'। নাটক করার লক্ষ্যমুখ এর চেয়ে বেশি আর কোন ভাষাতে তীক্ষ্ণ প্রকাশ পাবে? স্বাধীনতা বাংলাদেশের নাট্যকর্মীদের দিয়েছে বৃহত্তর শিল্পবোধ ও জীবনবোধ, যে বোধের বাস্তবায়ন আজকের মঞ্চ-ক্রিয়ার।

আজকাল ঢাকাতে সপ্তাহের যে কোনোদিন ইচ্ছে করলেই নাটক দেখতে পাবেন, কোনো কোনোদিন সকাল সন্ধ্যা— দুবেলাও পাবেন। নাট্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকারের পূর্বেকার দৈন্যদশা ঘুচেছে স্বাভাবিক কারণেই। প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার হিসেবে এ দেশের স্বাধীন সমাজে কাজ করছেন সৈয়দ শামসুল হক, সেলিম আল দীন, আবদুল্লা আল-মামুন, মমতাজউদ্দিন আহমদ, রশীদ হায়দার, আল মনসুর, হাবিবুল হাসান. মামুনুর রশীদ, কাজী জাকির হাসান প্রমুখ।

বাংলাদেশে নাট্যদলের সংখ্যা শতাধিক এবং তা ক্রমবর্ধমান। তাই প্রশ্ন এসেছে সংহতির। ১৯৮১-তে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন। বেশির ভাগ নাট্যদলই এর সদস্য। ফেডারেশনের আপাতত লক্ষ্য— নাট্যচর্চা ক্ষেত্রের প্রতিবন্ধকগুলি যৌথ উদ্যোগে অপসারিত করা।

দর্শকের সাড়াও আশাব্যঞ্জক। বেশির ভাগ দিনেই হল-ভর্তি দর্শক, যাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই পকেটের পয়সা খরচ করে নাটক দেখতে আসেন। দর্শনী মূল্যও নেহাত কম নয়— বাংলাদেশি মুদ্রায় দশ ও বিশ টাকা। দলগুলির প্রযোজনার ব্যয় সংকুলান হয়ে যায় ওতেই, ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি করতে হয় না। কম কথা নয় মোটেই।

কিন্তু তাই বলে বাংলাদেশে নাট্যচর্চার জোয়ার এসে গেছে— উচ্ছ্বসিত হয়ে এ কথা বলা ঠিক হবে না। 'সহসা স্তিমিত জলে আবেগ সঞ্চার' হয়েছে— দুই কূল আশার সংগীতে সরব সচেতন হয়ে উঠেছে— এইটুকু বলা যায়। আট কোটি বঙ্গভাষাভাষী মানুষের এই বিপুল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, মাত্র একশতাধিক নাট্যদল এবং হাজার দশেক নাট্যকর্মী জোয়ার আনবেন কী, সকলের তৃষ্ণা মেটাতেই অপারগ। শুধুমাত্র রাজধানী ঢাকা এবং প্রধান প্রধান শহরগুলিতে নিয়মিত অভিনয়ে সীমাবদ্ধ থাকা কোনো কাজের কথাই নয়। ঢাকা শহরের অবস্থাই বা কী! মহিলা সমিতির মঞ্চে সাকুল্যে শ'চারেক দর্শক আসন। যদি ২০টি প্রদর্শন কোনো নাটকের হয়, তবে সেটা ভালোই চলেছে মনে করা হবে। ধরে নিই পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ। তবে দর্শক দাঁড়াল মোট ৮ হাজার। রাজধানীর ৩৪ লাখ লোকের তুলনায় এ তো কিছুই নয়, তা ছাড়া মুখ্য প্রশ্ন, গ্রামপ্রধান এই বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই পড়ে আছেন গ্রামে— দূরান্ত পল্লিতে। তাদের নতুন যুগের নতুন ভাবনায় উজ্জীবিত করতে চায়— আরও অনেক— অনেক নাট্যদল, আদর্শনিষ্ঠ নাট্যকর্মী, নাট্যমঞ্চ সারা দেশে থাকবে ছড়ানো।

প্রতিবন্ধক আছে আরও। বেশ কয়েকজন নাট্যকার আছেন। কিন্তু তাঁরাও, নাট্যচর্চার যে আবেগ বাংলাদেশে সঞ্চারিত, তার অনুকূলে পর্যাপ্ত সংখ্যক নাটক এখনও সরবরাহ করতে পারছেন না। এ দেশে অভিনীত নাটকের তিন চতুর্থাংশই বিদেশি নাটকের সরাসরি প্রযোজনা নয়তো সামান্য বদবদল করে হাজির করা কিংবা স্বদেশি করে নিয়ে মঞ্চস্থ করা। তাই আরও নাট্যকার প্রয়োজন—

সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা— মাটির সঙ্গে মিশে থাকা, এ দেশের কণ্টকিত সমস্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিশে থাকা নাট্যকার— যাঁরা সমস্যাব সঠিক বিশ্লেষণ কবতে পারবেন, দেখিয়ে দিতে পারবেন সমস্যা সমাধানের বিজ্ঞানসিদ্ধ পথ।

এত বড়ো শহর ঢাকা। রাতারাতি পেল্লায় পেল্লায় ইমারত মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। অথচ নাট্যচর্চার গৌরবময় দশ-দশটা বছব কেটে গেল, তবু একটা ভালো মঞ্চ তৈরি হল না আজও। সুসজ্জিত আধুনিক মঞ্চ একটাও নেই। নাট্যদলগুলির একমাত্র ভরসা ঐ মহিলা সমিতি মঞ্চ— নিতান্ত সাধারণভাবে সজ্জিত— কোনোমতে কাজ চালানোর মতো। সাড়ে চাব শো আসনে ঠাসাঠাসি ভিড়, চাব শোয়ে দম ফেলা যায। পাশেই গার্লস গাইড মঞ্চ সম্প্রতি পাওয়া যাচ্ছে। তাতেও অবস্থান্তর হবে না। অন্যান্য শহবেব অবস্থা অনুমেয়, সঙ্গীন। হয়তো মান্ধাতার আমলেব ইংরেজদের নাচঘর ছিল (যেমন রংপুরে), বদবদল করে কাজ চালানো হয— হচ্ছেও।

অবশ্য ১৯৭২ থেকে ৮৩— এগাবো বছর একটি জাতির ইতিহাস তৈরির ক্ষেত্রে কিছুই নয। সেদিক দিয়ে বিচার করলে বাংলাদেশের নাট্যচর্চার অগ্রগতিকে আদৌ খাটো কবে দেখা যাবে না— সে কী নাট্যদলের সংখ্যায়, কিংবা নাটকের ও তার প্রযোজনাগত মানে।

রাজধানী ঢাকার গোটা আটেক দল মোটামুটি নিযমিত অভিনয় করে যাচ্ছেন। এঁবা হলেন নাগরিক, থিয়েটার [বর্তমানে দ্বিধা বিভক্ত কিন্তু একই নামে ক্রিয়াশীল] ঢাকা থিযেটাব, আরণ্যক, ড্রামা সার্কেল, বহুবচন, প্রতিদ্বন্দ্বী ও নাট্যচক্র।

অনেকগুলি ভালো নাটক ঢাকার মঞ্চে উপহাব দিয়ে নাগরিক বাংলাদেশেব প্রথম সারির নাট্যদল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এঁদের সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'নূবলদীনেব সাবাজীবন'। এটি নাগরিকেব ষোড়শ প্রযোজনা। দুর্দান্ত বিদ্রোহী কৃষক নূবলদীনেব সারাজীবনেব বীবগাথা এখন ঢাকার মঞ্চে দেশপ্রেমের এক উদাত্ত আহ্বান।

'পলাশীর রণক্ষেত্রে একটা যুদ্ধের অভিনয় কবিয়া ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রেব সাহায্যে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভাবতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ দুইটি প্রদেশ— বাংলা ও বিহার অধিকাব করিয়া বসে.... প্রাচীন গ্রামসমাজের ভিত্তি ভাঙিয়া চুরমার করিতে আরম্ভ করে।.... সেই বিবাট ধ্বংসস্তূপের অনন্ত শূন্যতার মধ্যে পরাজিত ও পদদলিত ভারতবাসী— ভারতের কৃষক— শ্বাসরুদ্ধ হইয়া অসহনীয় শোষণ ও যন্ত্রণায় উন্মাদ হইয়া উঠে।.... অনিবার্য ধ্বংস, অথবা বিদ্রোহ ও বিপ্লবেব দ্বাবা ইহার উচ্ছেদ সাধন। ভারতের কৃষক দ্বিতীয়টিকেই একমাত্র পথ বলিয়া গ্রহণ কবিল।

অবর্ণনীয় শোষণ উৎপীড়নের প্রত্যক্ষ পবিণতি হইল ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দেব রংপুর বিদ্রোহ।.... বিভিন্ন অঞ্চলেব কৃষকগণ সকলে সমবেত ভাবে নূরল উদ্দিন নামক এক ব্যক্তিকে তাহাদেব পবিচালক নির্বাচিত কবিয়া তাহাকে নবাব বলিয়া ঘোষণা কবিল।'

ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ বায়ের 'ভাবতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' গ্রন্থেব ঐ সব বিবরণ এবং শৈশবে শোনা রংপুরের এক সাধারণ কৃষকের অসাধারণ বিদ্রোহ-ভাস্বর জীবন নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হকের প্রাথমিক প্রেবণা। তাবপব লন্ডনে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে নথিপত্র দলিল ও বইপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি, যার ফলশ্রুতি ১৯৮১-ব শেষদিকে লেখা কাব্যনাটক 'নূরলদীনের সারাজীবন'।

'নূবলদীনের সারাজীবন' ঐতিহাসিক নাটক নয়। নাট্যকাব সে রকম করতেও চাননি। কিছু ঐতিহাসিক চবিত্র ও ঘটনার সঙ্গে কিছু কাল্পনিক চবিত্র ও ঘটনাব সন্নিবেশ ঘটিযে এ নাটক। এ দেশের শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের ঐতিহাসিক ধাবাবাহিকতাব সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শ্রেণি সংঘর্ষেব যে চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন, তাতে ইতিহাসের মূল সূত্রটিই বিশ্বস্তভাবে সন্নিবেশিত। 'যে করিছে শোষণ হামাক, শোষণকাবী তাঁই, আবেক জাতি আমবা হনু গবীব বলিযাই।'— এই ধ্বনেব

সংলাপের স্ফুলিঙ্গ যখন ছুটে আসে, তখন নাটক আর দুশো বছরেব পুরানো কাহিনি-নির্ভর থাকে না, বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী চিন্তায় আলোকিত এই শতকের নাটক হয়ে ওঠে এক মুহূর্তে। 'বাংলাব সাধারণ মানুষ— কৃষক শ্রমিক ছাত্র, উনিশ শো একাত্তরেই যে গেরিলা হয়েছে তা নয়, এই গেরিলা হয়ে যাবার একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা আছে, এটা উপলব্ধি করতে না পারলে আমরা একাত্তরেব মুক্তিযুদ্ধকে কেবল লঘু কবে যেতে থাকব।'— নাট্যকারের এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে 'নূবলদীনের সাবাজীবন'-এ মুজিবর রহমানের ছায়াপাত ঘটেছে। এ নাটক প্রযোজনা প্রসঙ্গে পরিচালক আলী যাকের তো অপকটে স্বীকাবই কবেন, মুজিবেব প্রতি তাঁর যে ঋণ, তা কিঞ্চিৎ শোধ করাব চেষ্টায় এ নাটক প্রযোজনা।

এমন একটা আন্তবিক গবজ আছে বলেই হয়ত আলী যাকের বংপুরেব আঞ্চলিক ভাষায় রচিত এ কাব্যনাটকটিকেও মঞ্চে অত স্বচ্ছন্দ গতিময় কবে তুলতে পেরেছেন— দেশপ্রেমে জাতিপ্রেমে, উদ্বুদ্ধ করতে পেবেছেন 'নূরলদীনেব সারাজীবন'-এব দর্শকদেব।

মঞ্চে কোনো পর্দার ওঠা-নামা নেই। প্রসেনিযম ছেড়ে বাইবে বেশ খানিকটা দূর পর্যন্ত প্রসারিত ক্রমাবনত তিনটি ধাপ সংযুক্ত হয়ে একটা মালভূমিব প্রতিভাস, যার দিগন্তে একটি নিষ্পত্র শীর্ণগাছ, তার পাশে পূর্ণিমার মস্ত চাঁদ ওঠে, তারই জ্যোৎস্নায় কৃষকের অঙ্গন, বিদ্রোহীদের বনভূমি, শাসনকর্তাদের প্রমোদ উদ্যান আলোকিত হয— পুবো নাটকটাই এই পটভূমিতে— যেন প্রকৃতির অপার করুণার নিচে মানুষের শোষণের বীভৎসা, শোষণ মুক্তিব দুর্বার সংগ্রাম।

দুর্বার সংগ্রামের নাটকে যে গতি দেওযা দরকার, সেটা মনে রেখেই আলী যাকের নাটকের প্রযোগ পরিকল্পনা করেছেন। অথচ যেখানে গতির রাশ টেনে ধরা দরকার নূরলদীন ও তার স্ত্রী আম্বিয়ার একান্ত দৃশ্যে, কোম্পানির কর্মচারীদের দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণেব দৃশ্যে— আলী যাকের সজাগ।

একজনও অভিনেতার দুর্বলতায় এ গতিময় নাটক মুখ থুবড়ে পড়তে পারত। কিন্তু অভিনেতারা তাঁদের মুনশিয়ানা ও অনুশীলনে সে আশঙ্কাকে শত হস্ত দূরে রেখেছেন। নূরলদীনের ভূমিকায় দীর্ঘকায় প্রশস্ত-বক্ষ অভিনেতা আলী যাকের চলনে-বলনে এক মুহূর্তের মধ্যেই নেতৃত্বের আসনে নিজেকে যোগ্য প্রমাণিত করেন। বলার গুণে কোনো কোনো জাযগায় অনবদ্য আব্বাস-বেশী আসাদুজ্জামান নূর, লাকি ইনাম গ্রাম্য রমণী আম্বিয়া চরিত্রে বিশ্বাসযোগ্য অভিনয় করেছে। অন্যদিকে সারা যাকের লিসবেতোর অহমিকা ও পরিশীলিত রূপটি নৈপুণ্যের সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

দলগত অভিনয়ের গুণে শিল্পীরা অষ্টাদশ শতাব্দের শেষাংশ, তার মানুষজন, গণবাহিনী এবং নূরলদীনের রক্তাক্ত দেহে আবার দুশো বছর পরে প্রাণ ফিরিযে এনেছেন, আর ফিরিয়ে এনেছেন সেই প্রত্যয়— যতদিন না শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়, ততদিন নূরলদীনেবা বারবার বেঁচে ওঠেন—

এক এ নূরলদীন যদি চলে যায়,
হাজার নূরলদীন তবে আসিবে বাংলায়।

১৯৭২। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর স্বাধীনতা। বাংলাদেশে নতুন রাষ্ট্র। উপরন্তু বাংলা রঙ্গালয়ের শতবর্ষ পূর্তির বছর ১৯৭২। এমনি তাৎপর্যময় সময়কে থিয়েটার সৃষ্টির লগ্ন হিসেবে বেছে নিলেন কয়েকজন নাটক প্রিয় মানুষ। ৭২-র নভেম্বরে মুনীর চৌধুরী স্মারক সংখ্যা হিসেবে নাট্য ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'থিয়েটার' প্রথম প্রকাশিত হল। প্রথম থেকেই প্রস্তুতি চললেও, থিয়েটার '৭৪-এর ২১ শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস উপলক্ষে প্রথম নাটক মঞ্চস্থ করল— মুনীর চৌধুরীর লেখা 'কবর'। এ বছরেই এদের আবও দুটি প্রযোজনা 'সুবচন নির্বাসনে' এবং 'এখন দুঃসময়'। '৭৬-এর প্রযোজনা তিনটি— 'চারিদিকে যুদ্ধ', 'চোর চোর', এবং 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'। শেষোক্ত এই নাটক থিয়েটাবেব শ্লাঘাব বস্তু, কারণ সৈয়দ শামসুল হক বচিত আবদুল্লা আল-মামুন পবিচালিত এই

কাব্যনাটক নিয়েই এঁরা ১৯৮২-তে ৫ম তৃতীয় বিশ্ব নাট্যোৎসবে অংশগ্রহণ কবেন। থিয়েটার-এব অন্যতম সফল প্রযোজনা রবীন্দ্রনাথের 'দুই বোন' প্রথম মঞ্চস্থ হয় '৭৮-এ। '৭৯ ও '৮১ সালে প্রযোজিত হয় যথাক্রমে 'সেনাপতি' এবং 'ওথেলো'। '৮২-এ মঞ্চস্থ হয় 'অবক্ষিত মতিঝিল'।

'৮২-তে এসে পরিণত দল থিয়েটাব দ্বিধা বিভক্ত। দুটি দলই দশ বছরেব ঐতিহ্যমণ্ডিত নাম 'থিয়েটাব'-এব দাবিদাব। দাবিদাব মনোগ্রামেব— দশ বছবেব জীবনকাল ও কীর্তিব। শুধু দাবি করেই কেউ ক্ষান্ত নন, বাস্তব ক্ষেত্রেও দু-দলই থিয়েটাব-এব নামে নাটক মঞ্চস্থ কবছেন এখন। দাবিব রায দেওয়া আমাদেব কাজ নয়। কিন্তু, যে বায আমবা এখুনি নির্দ্বিধায় দিতে পাবি তা হল, দু-দলই বর্তমান প্রযোজনার উৎকর্ষের নিরিখে ঢাকাব প্রথম সাবিব নাট্যদল হিসেবে পূর্ব সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম। দল ভাঙাভাঙিব সূত্রে দর্শকদের এটা কম লাভ নয়।

থিযেটারেব যে পক্ষে প্রযোজনা-অধিকর্তা রয়েছেন বামেন্দু মজুমদাব এবং পবিচালক আবদুল্লা আল-মামুন, তাঁবা ইতিমধ্যেই প্রযোজনা করেছেন, 'পুরানো পালা' এবং 'এখানে এখন'। আপাত সহজ কাব্যনাটক 'এখানে এখন'-এব ওপরে কাব্যিক মায়াজাল এতই দুর্ভেদ্য যে বেশিব ভাগ দর্শকেব মাথা ঘেমে যায়। তবে সবাই বসে থাকেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো— আদ্যন্ত। সেখানেই প্রযোগের মুনশিয়ানা, অভিনেতাদেব চমৎকার অভিনয় চাতুর্য। বিশেষ কবে বফিকের ভূমিকায আবদুল্লা আল মামুন ও সুলতানার চরিত্রে ফেরদৌসী মজুমদারেব অনবদ্য অভিনয। মঞ্চসজ্জা, আলো, সঙ্গীত ও কোবাসেব ব্যবহার বীতিমতো প্রশংসনীয়। ছবির মতো প্রযোজনা। কিন্তু সময়েব দাবি পূবণের যে দায় নাট্যকাবেব থাকে, সৈয়দ শামসুল হকের লেখা 'এখানে এখন'-এ সেটি যেন কিঞ্চিৎ উপেক্ষিত মনে হল। উপবন্তু বঞ্চনাকারী ও বঞ্চিতের শ্রেণি বিভাজনও অস্পষ্ট লাগে। অথচ নাগরিক প্রযোজিত 'নূবলদীনের সারাজীবন'-এ এই নাট্যকাবই সময়ের দাবি সম্পর্কে কত বেশি মনোযোগী ও তীক্ষ্ণ। সময়েব দাবির প্রতি সম্মান জানিয়েই থিয়েটার তাঁদের '৭৪-এ পুরোনো প্রযোজনা 'এখন দুঃসময়'-কে পুনর্মঞ্চায়িত করেছেন। শুধুমাত্র সুদক্ষ পবিচালক ও অভিনেতা নন একজন সমাজ সচেতন নাট্যকার হিসেবেও আবদুল্লা আল-মামুন স্বীকৃত। ষাটের দশক থেকেই ইনি বেতার ও দূরদর্শনের জন্য নাটক লিখছেন। মঞ্চের জন্য 'শপথ' নামে একটি কাব্যনাট্যও লিখেছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তব কালে থিয়েটার-এব প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে আল মামুন মঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যুক্ত হন এবং লেখেন 'সুবচন নির্বাসনে', 'এখন দুঃসময়' সেনাপতি' ও 'অরক্ষিত মতিঝিল'। কোনো কোনো সমালোচকের মতে দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া 'সুবচন নির্বাসনে' ও 'এখন দুঃসময়'-এর মতো এমন নিপুণভাবে আর কোথাও বাংলাদেশের সমসাময়িক জীবন চিত্রিত হয়নি।

বন্যা এলো দেশে। প্লাবনে বিপন্ন হল লক্ষ লক্ষ মানুষ। প্রকৃতির এই নিষ্করুণ বিপর্যয়কেও, সামন্ত ও বুর্জোয়া শাসিত সমাজের রীতিনীতি অনুসারেই সুযোগ সন্ধানীর দল স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাল। বিবব থেকে বেরিয়ে এলো মুনাফালোভী নারীদেহ লোলুপ কালোবাজারির দল। কিন্তু তাদেব কদর্য তাণ্ডবই শেয কথা নয়। শেষ কথা পীড়িত মানুষের প্রতিরোধ— যার খরস্রোতে ভরাডুবি হয় শোষকের। ১৯৮৩-র বাংলাদেশে বন্যা নেই কিন্তু আজ নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বাংলাদেশেব মানুষের জীবনে সত্যিই এখন দুঃসময়— স্বাধীনতার এগারো বছর পরেও এই দুঃসমযেও দেশের মানুষকে পণ্য করে মাত্র কতিপয় সুবিধাভোগী কালোবাজাবি, আর্ত মানুষের ব্যাপাবির দল। ১৯৭৪-এর নাটককে নতুন করে '৮৩-তে মঞ্চস্থ করার সার্থকতা এখানেই। কোথাও দুর্বোধ্যতা নেই, স্বচ্ছন্দগতির, দেশেব মানুষের প্রত্যহের কথকতাব নাটক 'এখন দুঃসময়'। এ প্রযোজনাটি মূলত ধবে রেখেছেন বেপারির চরিত্রে আবদুল্লা আল মামুন এবং জারিনার ভূমিকায় ফেবদৌসী মজুমদাব। দীর্ঘ কাল বাদে পুনর্মঞ্চায়িত হওযায অনেক অভিনেতার নৈপুণ্যে সেদিন (২৫ জুন '৮৩) জড়তা দেখা গেলেও এঁবা দুজনে স্বচ্ছন্দ। এরও নির্দেশনা আবদুল্লা আল-মামুনের।

থিয়েটার-এর অন্যপক্ষ যেখানে প্রযোজনা অধিকর্তা তফিকুল ইসলাম এবং নির্দেশক আরিফুল হক, তাঁদের বর্তমান প্রযোজনা 'জমিদার দর্পণ'। একশো দশ বছব আগে ১৮৭২ সালে মীব মশাববফ হোসেনেব লেখা নাটক বিষয়গুণেব জন্য আজও মূল্যবান এবং বাংলাদেশের মতো যেখানে আজও সামন্ততান্ত্রিক শাসন শোষণ এবং তার আনুষঙ্গিক অনাচার বিদ্যমান, সেখানে এ নাটকের মঞ্চায়ন খুবই সময়োপযোগী। শুধু মীব সাহেবের লেখায অতীতেব কৃষক সমাজের যে সমাজচেতনাব স্তব, শতাধিক বছর পেরিয়ে তা থেকে আজকেব কৃষিজীবী মানুষ অনেকটা এগিয়েছে। এগিযেছি আমবাও। এই অগ্রবর্তী কালেব মানসে 'জমিদাব দর্পণ'কে স্থাপন কবার প্রযোজনেই কিছু পবিবর্জন ও সংযোজন আবশ্যক। সে দিকে সজাগ থেকেই নাটকটিব সফল নবনাট্যায়ন ঘটিয়েছেন মমতাজউদ্দীন আহমদ। প্রাক-স্বাধীনতা যুগ থেকে লিখছেন মমতাজউদ্দীন। বযসে প্রাচীন হলেও স্বাধীনতা-উত্তর কালের নতুন যুগেব নবীন প্রাণেব দাবিকে তিনি উপলব্ধি করেছেন। স্বাধীনতা-যুদ্ধ-ফেরত তরুণদের হতাশা ও দিশেহারা অবস্থাকে তিনি উপলব্ধি করেছেন। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'ফলাফল নিম্নচাপ'। নতুন যুগের দাবিকেই মর্যাদা দিযেছেন মমতাজউদ্দীন 'জমিদার দর্পণ'-এব নবনাট্যায়নে। তাঁর কথা অনুসরণে বলা যায মীর সাহেবকে সর্বতোভাবে সংরক্ষণ করেও তিনি সংলাপ নির্মাণে ও চরিত্র বিশ্লেষণে স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। প্রস্তাবনা ও উপসংহাবে 'জমিদার দর্পণ'কে এ কালের রুদ্র আবহাওয়ায় পবিপ্লুত করেছেন। কেননা ইতিমধ্যেই বাংলার কৃষক বিদ্রোহের সোয়া শো বছরের ইতিহাস আমাদের অন্তর্লোকে শক্তি সঞ্চার কবেছে এবং শ্রেণিসংগ্রামের চেতনাটি আমাদেব কাছে আর অপরিজ্ঞাত নয়। ফলে মীর সাহেবের যে নিপীড়িত কৃষকপ্রজা আবু মোল্লা লম্পট জমিদারেব পাশবিক-ধর্ষণে-মৃত-পত্নীর শোকে বিষাদসাগরে নিমজ্জিত, নতুন রূপে সেই আবু মোল্লা শাসক শ্রেণিব কুক্ষিগত মিথ্যা বিচারব্যবস্থার যূপকাষ্ঠে আত্মদানকারী। মমতাজউদ্দীনের আবু মোল্লা বিষাদ সিন্ধুর নায়ক নয়— বিদ্রোহী যমুনার কণ্ঠস্বর। তাঁর এ পরিবর্তনের সাহসটি বিষযগত নয়, বিশ্লেষণগত।

এই নতুন রূপে এমন তেজি কর্কশ বর্বব ও উদ্ধত সংলাপ আছে যা মীর সাহেবেব কালে ছিল অভাবনীয়। কিন্তু একালেব মঞ্চে এবং লোকালয়ে সে সব অতিশয প্রয়োজন দ্বাবা সিদ্ধ এবং কর্ণমূলে অবিবাম ধ্বনিত।

মীরেব জমিদার লম্পট, নাবীদেহ তাব লক্ষ্য। এখানে জমিদাবের লক্ষ্য কৃষকের জমি, তাব শ্রম, নারীব দেহ এখানে উপলক্ষ মাত্র। মীব সাহেবেব নাটকে শাসক একজন অন্যাযকাবী বিচাবক। এখানে শাসক একটি বাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেব অধীশ্বব। এই অলঙ্ঘনীয অধীশ্ববেব বিরুদ্ধে আবু মোল্লার অসহায বোদন মীব সাহেবেব অন্তর্দেশকে বিব্রত কবেছিল। মমতাজউদ্দীন সেই বিব্রত অন্তরকে বিদ্রোহীব উপাদানে উৎসাহিত কবেছেন। আবু মোল্লাব হাতে প্রতিবোধেব অস্ত্র তুলে দিযেছেন। এ সব কাবণের জন্য নবনাট্যায়নে নাট্যকাব মশাববফ অক্ষুণ্ণ থাকেননি কিন্তু সত্যবাদী এবং ভূমি সংলগ্ন মীব মশাররফ হোসেন সসম্মানে সংস্থাপিত, ফলে 'জমিদার দর্পণ' মমতাজউদ্দীন আহমদের কলমে নবনাট্যাযিত হযে নতুন যুগেব পক্ষে অর্থবহ হয়ে উঠেছে।

এবং থিয়েটার 'জমিদার দর্পণ' প্রযোজনাকে বর্তমানে সমযের পক্ষে সঙ্গত করে তুলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আরিফুল হকের প্রয়োগ পরিকল্পনা, সঙ্গীত ও ধ্বনির ব্যবহারে প্রযোজনা নান্দনিক মর্যাদা পেয়েছে। উল্লেখ্য অভিনয দক্ষতার স্বাক্ষব বেখেছেন কেরামত মাওলা, রিফাতুল হক ও আরিফুল হক। অতি-অভিনযেব ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও দারোগাব চবিত্র মনোজ্ঞ। নুকুন্নাচারের ভূমিকায় তাবানা হালিমের চমৎকাব অভিনয দীপ্তিব পাশে আবু মোল্লাব ভূমিকায় গোলাম রব্বানী যেন কিছুটা ম্লান।

বাংলা রঙ্গমঞ্চে একশো দশ বছব পরে 'জমিদ'র দর্পণ' এল। দর্পণে বাংলার একাল ও সেকাল দেখিয়ে মীব মশাববফ হোসেনের কণ্ঠে বাংলার সংলাপ শুনিয়ে থিয়েটার সকলের ধন্যবাদ কুড়োবেন এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। সেই সঙ্গে সাধুবাদ প্রাপ্য মমতাজউদ্দীন আহমদের।

শুধু নাটক প্রযোজনা নয়, এক বিশাল সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ঢাকা থিয়েটাব যুক্ত। এঁদের পুস্তিকা 'গ্রামীণ মেলা ও নাটক প্রসঙ্গে' থেকে বিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যাক ·

'আমাদেব সমাজে সত্যিকার অর্থে কোন বৈপ্লবিক পবিবর্তন আসে নাই। এ দেশেব শিল্প সাহিত্য ও বাজনীতি সব সময়ই বৃহত্তব জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেছে।.. একদিন একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়াব স্বপ্ন নিয়েই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তরুণ-তরুণীরা মঞ্চে নাটক কবতে নেমেছিল। কাজেই তাদেব স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে, গ্রামেব শতকবা ৯০ জন লোকের কাছে নাটককে নিয়ে যেতে হবে।.... তাই শহবের নিয়মিত নাটকেব মঞ্চায়নেব পাশাপাশি, এ দেশেব গ্রামেগঞ্জে নাট্যচর্চাব বিকাশ ঘটাতে হবে।.... লক্ষ্য হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষেব সংস্কৃতিকে জানা এবং বর্তমান সমাজেব জীবনধাবাকে বৈজ্ঞানিকভাবে পবিবর্তনেব চেষ্টা কবা।.... সে সময়ে নাটকের মাধ্যমে তাদেব কাছে জীবন ও সমাজ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য পৌছানো সহজ হবে।... নাটক দেখে যেন একজন কৃষক বা শ্রমিক সমাজে তাব অবস্থানকে চিহ্নিত কবতে পাবে। এবং বুঝতে পাবে তাবা ধনীদের দ্বারা শোষিত।.... এই দেশকে জাগাতে হবে। এ দেশের দুঃখী মানুষদেব ভাগ্য পবিবর্তনেব লড়াইতে প্রেরণা দিতে হবে।'

সাংগঠনিক কাজ শুরু হযে গেছে গতবছর থেকে, মেলা পত্তনও হযেছে— 'আজহাব বয়াতিব মাঘী মেলা'; বিশেষ ধবনের লেখা, বিশেষ আঙ্গিকে প্রযোজিত হযেছে এদের নাটক 'সযফুল মুলুক'— যার বক্তব্য কিসমতেব চেযে হিম্মত বড়ো। গড়ে তোলা বিভিন্ন এলাকায় গ্রামীণ নাট্য সংগঠনগুলিকে নিযে '৮৪-তে এক মহাসম্মেলনেব আযোজন কবাব পবিকল্পনা বয়েছে এঁদের।

নাটকেব বিষয়বস্তু নির্ধাবণে ঢাকা থিয়েটাবেব দৃষ্টিভঙ্গিও ঘোষিত। 'বাংলাদেশ একটি জাতিব নাম। একটি সংগ্রাম-ক্ষুব্ধ অকুতোভয় জনপদের নাম।... হাজাব বছবের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আমবা লড়াই কবছি। পদ্মা, মেঘনা, তিস্তা, আত্রাই, ধবলাব কূলে কূলে নামহীন গোত্রহীন মানুষেব সংগ্রামী জীবন হোক আমাদেব নাটকের বিষয়বস্তু।' ঢাকা থিযেটাবেব বর্তমান প্রযোজনা 'কিত্তনখোলা' এমনি এক বিষয়বস্তুকে নিয়ে বচিত। প্রযোগ- কৌশলেব দিক দিযেও এদেব এই দশম প্রযোজনাটি ঢাকাব থিয়েটার জগতের সাম্প্রতিক নাটকেব মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার কবে আছে। বিশিষ্ট স্থান নাট্যকার সেলিম আল দীনেবও।

'কিত্তনখোলা' নামে একটি মেলাব ক্যানভাসে বাংলাব পল্লিজীবনেব বৈচিত্র্যময এক সুবিশাল ছবি মেলে ধবা হয়েছে। এখানে বিধৃত হযেছে, নযাযুগ অপেবা দলেব জীবন— জীবন-সংগ্রাম-নিগ্রহ, তাড়িব দোকানেব বিষাক্ত ছোবল, কবিব লড়াই ও মাঝি-মাল্লাদেব পুঁথিগান, লাওয়া ও বেদে মানুষদেব জীবন-জীবিকা, সবার ওপবে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ— কৃষক শ্রেণির ওপব সামন্ততান্ত্রিক শোষণেব ও শোষণমুক্তির সংগ্রামেব এক বিশ্বস্ত ছবি— সব কিছুই বাংলাব আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিতে নিবদ্ধ। 'কিত্তনখোলা'য একটি শোষণমুখী সমাজেব রূপান্তর প্রক্রিযাকে তুলে ধরাব চেষ্টা কবা হযেছে। তবে এই পবিবর্তন বহুলাংশে ব্যক্তি রূপান্তবে শেষ হয়ে যাচ্ছে— সামাজিক পালাবদল— যা সংগঠিত সমাজ বিপ্লবেব দ্বারাই কেবল মাত্র সম্ভব, সেই বৃহত্তব পালাবদলে আভাসিত হতে পাবছে না। ব্যক্তি হত্যা নয়, অত্যাচাবী শোষককে সামাজিকভাবে চিহ্নিত কবা, বিচ্ছিন্ন কবা প্রতিরোধ কবাব মূল ক্ষেত্র বচনা কবেনি। হযতো এই ক্ষেত্র ও সংগঠিত প্রতিবোধ বাংলাদেশে এখনই বাস্তব অবস্থা নয়, তবুও যেহেতু শিল্প মানুষেব অগ্রগামী ভাবনার ফসল, তাই সঠিক পথেব উদ্দীপক নিশানা অত্যন্ত জরুরি।

জোতদার মহাজনের চক্রান্তে নিজের জমি থেকে প্রায় ছিন্নমূল ভীরু চাষি সোনাই বয়াতির মরণ আঘাত খাওয়ার শেষ পর্যায়ে, প্রথমে সাহসী ও পরিশেষে দুঃসাহসী মানুষে রূপান্তর। এটাই আসল গল্প। এর সঙ্গে এসে জুড়েছে অনেক উপগল্প, যার সবগুলি আসল কাহিনির অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠেনি। মাঝে মাঝে এমনও মনে হয়, নাটকের গতি শ্লথ হয়ে এলো, মূল গল্পের সূত্র হারিয়ে গেল, তবু নিজস্ব গুণে সেগুলি আকর্ষণীয়।

নয় সর্গে সমাপিত 'কিত্তনখোলা' গ্রাম বাংলার বিচিত্র জীবনের কথাকাহিনিকে ব্যাকুল আগ্রহে তুলে আনার দুনির্বার প্রয়াস। ফলত, এর নাট্যশৈলীর মাঝে মহাকাব্যিক বিস্তার-ব্যঞ্জনা অনিবার্যভাবেই এসে পড়েছে।

'ঢাকা থিয়েটার এ দেশের নাটকের প্রকৃত প্রবাহটি সৃষ্টি করতে চায়।.... আধুনিক নাট্যকলার সঙ্গে বাংলাদেশের নিজস্ব নাট্য আঙ্গিকের সমন্বয় সাধনে বদ্ধ পরিকর।' এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই 'কিত্তনখোলার' প্রয়োগ-পরিকল্পনাটি অভিনব— দশ বছর বয়েসি গ্রুপ থিয়েটারের কাছে প্রায় অপ্রত্যাশিত।

'কিত্তনখোলার' পুস্তিকা, ভূমিকা-লিপি, ছোট্ট একটি তাসের আকারের প্রবেশপত্র— তিনটিতেই পল্লিবাংলার কারু-ঐতিহ্যের প্রতিলিপি— নকশিকাঁথা। আকর্ষণীয় রুচিশীলতার সাক্ষর। মঞ্চে প্রসেনিয়ম কার্টেন নেই। সামনে বিসর্পিত প্রায় ৪৫ ফুট গভীরতা ও ৩০ ফুট প্রস্থের মঞ্চসজ্জা— নির্দিষ্ট মঞ্চ ছেড়ে প্রায় ফুট কুড়ি অডিটোরিয়ামের ভেতরে এগিয়ে এসেছে। এতেও কুলোয় না। মাঝে মাঝেই পাশের বা সামনে দর্শক চলাফেরার পথ দিয়ে অভিনেতারা অবাধ অধিকারে অভিনয় করে যাচ্ছেন। দর্শক আর অভিনেতাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য এঁরা রাখছেন না।

'চলো যাই কিত্তনখোলা' সমবেত গান দিয়ে নাটক শুরু হতেই দেখা গেল, পিলপিল করে 'দ্যাশ গেরামের লোক কিত্তনখোলার দিকে মেলা করছে।' চলেছে নরনারী আবালবৃদ্ধবনিতা, অসংখ্য মানুষ— বাযনা-ধরা-কিশোর-নাতির-হ্যাঁচকা-টানে হুমড়ি খেতে খেতে প্রায়ান্ধ বৃদ্ধ, শাড়ি পরা ফুলের মতো সুন্দর ছোট্ট নাতনির হাতধরা দাদু, অন্ধ ভিখারির দল, দোকান-পশারিরা, নয়াযুগ অপেরার লোকজন, মাঠ-ঘাট নদী-খাল সাঁকো পেরিয়ে কিত্তনখোলাভিমুখী। প্রথম দৃশ্যেই আশ্চর্য প্রাণপ্রবাহ। তারপর বিরাট মেলা প্রাঙ্গণের এখানে ওখানে সব দৃশ্য— জীবনের বিচিত্র দিক। ক্রেতাবিক্রেতার দর কষাকষি, বায়োস্কোপ, নাচগান জাল-জুয়া, পান-মত্ততা, মারামারি হৃদ্যতা বন্ধুত্ব, প্রেম, প্রীতি ত্যাগ-নিগ্রহ, কান্না-আত্মহনন— শোক, লোভীর আগ্রাসন ভীরুর রূপান্তর ও অস্ত্রধারণ। ছেচল্লিশ জন অভিনেতা-অভিনেত্রীর দুর্দান্ত টিমওয়ার্কে এক প্রবহমান জীবন জগৎ প্রতিভাসিত। তবুও তারই মধ্যে কয়েকটি চরিত্র বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভয়ংকর শীতল বাচন ভঙ্গিমায় ইদু কনকদারের দুরভিসন্ধি-সর্বস্ব চরিত্রটি প্রাণবন্ত। অনুতোষ সাহা রবিদাসকে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ডালিমন চরিত্রে শিমূল ইউসুফ ও বনশ্রীর ভূমিকায় সুবর্ণা মুস্তাফা মনে রাখার মতো। সোনাই বয়াতি যেহেতু কেন্দ্রীয় চরিত্র, তাই জহিরুদ্দিন পিয়ারকে আরও যত্নবান হতে হবে, যাতে তাঁর ভূমিকা অন্যান্য অভিনেতাদের ভিড়ে হারিয়ে না যায়।

অভিনব মঞ্চ-নির্মাণ ও শিল্প নির্দেশনার জন্য জামিল আহমেদ প্রশংসার দাবি রাখেন। এ দাবি শিমূল ইউসুফেরও, সুর ও আবহসঙ্গীত নির্দেশনার জন্য। এত সব কথা বলার পরও, সমগ্র প্রযোজনার যিনি কর্ণধার, সেই নির্দেশক নাসিরউদ্দিন ইউসুফের সম্পর্কে আলাদা করে কিছু বলতে হবে নাকি?

আজ ২৫শে জুন, '৮৩ সকালেও একটা নাটক দেখেছি। আজ সন্ধেবেলায়ই আছে মহিলা সমিতির মঞ্চে আরণ্যকের 'সাত পুরুষের ঋণ'। নাটক আছে কাল পরশু, তার পরের দিনগুলোতেও। কিন্তু আজই সন্ধ্যার বাস আমাকে সীমান্তে নিয়ে যাওয়ার কথা। কত জায়গায় কত

ভাবেই না আমরা বাঁধা। ছাড়াই সাধ্য কী! বাংলার পবিবেশে— বুকের ভাষায়— মুখের ভাষায় লেখা নাটক দেখতে দেখতে এই কদিন একবারও তো তার মনে হয়নি পববাসী আমি! আমাকে যেতেই হবে, এ বাস্তব। আবার কবে আসা যাবে? জীবনেব কত কাজই তো আমরা ইচ্ছে করে হেলায় নষ্ট করি। কিন্তু ইচ্ছে হলেও সে কাজ কবা সহজ অধিকার থাকবে না, এটাই পবাধীনতা। এটাই কষ্টেব। ওপারে গিয়ে নাটকপ্রিয় বন্ধুদের, পরদেশি এই মাতৃভাষার নাটক নিয়ে উচ্ছ্বসিত গল্প বলব, যেমন বলেছি ওপাবের নাটক সম্পর্কে এপাবে বন্ধুদেব সঙ্গে। শুধু গল্পই— আর তো কিছু করা যাবে না এ দৃশ্যকাব্য নিয়ে! একই ভাষা-ভাষী দুই দল মানুষেব সংস্কৃতিব সবচেয়ে জীবন-ঘনিষ্ঠ এই শিল্পকর্মগুলি কণ্টাকাকীর্ণ সীমান্তরেখার দুই পারে দাঁড়িয়ে অবাধ গমনাগমনেব ব্যর্থ বাসনায় দীর্ঘশ্বাস ফেলবে.... তাব উষ্ণ নিশ্বাস এসে লাগবে আমাদেব মুখে, বুকে। প্রকৃতির নদী, মাঠ, গাছ, ফুল, পাখিব মায়া ছাড়িয়ে মানুষ আব মানুষের সৃষ্টি এখন বড়ো বেশি করে মন জুড়ে স্মৃতিতে থাকবে। এপার ওপার দুই-পারে একাকার হবে।

প্রতিবেদনের উপকরণ :

১ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

২. আলী যাকের, সৈয়দ শামসুল হক, সুপ্রকাশ বায ও বামেন্দু মজুমদাবের প্রবন্ধ।

৩. ঢাকার গ্রুপ থিয়েটারগুলিব প্রকাশিত নানা পত্র-পত্রিকা।

দুই বাংলার থিয়েটার সেলিম আল দীন ও ঊষা গাঙ্গুলি

অরুণ সেন

তারিখটা বোধ হয় এ বছরের ৩১জুলাই হবে, রঙ্গকর্মী-র ঊষা গাঙ্গুলি, যার সঙ্গে আত্মীয়োপম সম্পর্ক বহুকালের, তার ফোন পেলাম হঠাৎ, খুবই উত্তেজিত গলা। ঢাকা থেকে ফিরেছে গতকাল, থিয়েটার করতেই গিয়েছিল এবং সেই থিয়েটার বিপুল সমাদৃত হয়েছে সেখানে, কিন্তু সে কথা নয়, পরিচিত হয়েছে বাংলাদেশের নাট্যকার সেলিম আল দীনের সঙ্গে, তাঁর নাটক কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে ঢাকা থিয়েটারের রিহার্সাল রুমে গিয়ে, সেলিমের সঙ্গে কথা বলে সেলিমের টেক্সটের ইতস্তত কিছু কিছু পাঠ শুনে। তাঁর মনে হয়েছে, একটা বিরাট ব্যাপার, যার তুলনা নেই। এই আবিষ্কারেই অস্থির হয়ে পড়েছে সে। ওখানে বসেই এবং কিছুটা ফিরে এসেই জানতে পেরেছে, সেলিমের নাটকের আমিও একজন দুশ্চিকিৎস্য ভক্ত। এখানে তেমন কথা বলতে পারছে না ঊষা কারোর সঙ্গে সেলিম বা তার নাটক সম্পর্কে খোঁজ রাখেন এমন মানুষকে পাওয়াই দুঃসাধ্য। তাই সকাল বেলাতেই ওই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার তাগিদে এই ফোন। ঊষা-র মনের ভাবটা আমি খুবই বুঝতে পারি। মনে আছে, সেলিম আল দীনকে আবিষ্কার করে আমিও ঠিক এভাবেই উত্তেজিত হয়েছিলাম এবং মনে মনে জানাতে চাইছিলাম আমার নান্দনিক অনুভবের কথাগুলো।

ব্যাপারটা তবে গোড়া থেকে বলি। বাংলাদেশের থিয়েটার সম্পর্কে জানাজানি আমার অল্প কিছুকাল আগেও প্রায় ছিল না। এলোমেলোভাবে কোনো কোনো দলের কোনো কোনো নাটক কলকাতায় আসে, সময় সুযোগমতো তার কোনোটা দেখি- ভালো লাগে বা লাগে না, তারপর হারিয়ে যায়। আবদুল্লাহ্ আল-মামুন, রামেন্দু ও ফেরদৌসী মজুমদার, মামুনুর রশীদ, আতাউর রহমান, আলী যাকের প্রমুখের নাম শুনি, মুগ্ধ হই, কিন্তু বোধ হয় এর বেশি নয়। ১৯৯৪-এ পদ্মাগঙ্গা উৎসবে সেরকমই একটা সুযোগ এসে যায় বাংলাদেশের কয়েকটি নাটক একসঙ্গে দেখার। তখনই খানিকটা অপ্রস্তুতভাবেই রবীন্দ্রসদনে ঢুকে সেলিম আল দীনের নাটক এবং নাসিরউদ্দীন ইউসুফের নির্দেশনায় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই এ একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা আমার। নাগরিক বা থিয়েটার বা অন্য কোনো দলের কোনো কোনো প্রযোজনায় আমি কমবেশি আলোড়িত হয়েছি আগেও। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও ভেবেছি, কলকাতায় বেশ কিছু নাট্যগোষ্ঠী আছে যাঁরা সমতুল্য। (বা অনেক সময় হয়তো আরো সার্থক) প্রযোজনা করতে পারেন বলে বিশ্বাস করা যায়। নৈপুণ্য সত্ত্বেও অভাবিতপূর্ব কোনো অভিজ্ঞতায় নিয়ে যাচ্ছেন ওঁরা, এরকম নিঃসন্দেহে বলা যাবে না। কিন্তু ঢাকা থিয়েটার-এর 'হাতহদাই' এবং 'যৈবতী কন্যার মন' দেখে মনে হল, এরকম প্রযোজনা তো কলকাতায় সম্ভব নয় (বস্তুত বিশ্বে কোথাও সম্ভব নয়)। এপিকের বাঙালিয়ানায় কিংবা বাঙালিয়ানার এপিক বিস্তারেই হয়তো সেই অনন্যতা। তবে, এর ভিত্তি বা আবহ একান্তভাবে বাঙালি সে জন্যই শুধু নয়, এই নাটক সাহিত্যগুণে এবং এই প্রযোজনা শিল্পসৌকর্যে যে তুলনাহীনতায় পৌঁছে দিয়েছে, তা যেন এর আগে কখনো ঘটেনি। মুগ্ধতা প্রকাশ করে একটা লেখাও লিখে ফেলেছিলাম—তার শিরোনামেও ছিল 'আবিষ্কার' শব্দটি— 'সেলিম আল দীন, আবিষ্কার'। দুদিক থেকেই আমি আক্রান্ত হয়েছিলাম। সেলিমের টেক্সট আমাকে আলাদাভাবেই উদ্‌বেল করেছিল, মনে হয়েছিল বাংলা নাটকে সাম্প্রতিকে এরকম অর্থক্ষেপ ও সংকেত, বিরল এক অভিজ্ঞতা। তা ছাড়া এই প্রযোজনা নাসিরউদ্দীনের প্রযোজনা—সেও এক চমৎকৃত হওয়ার মতোই ব্যাপার। সেলিম ও নাসিরউদ্দীনের মেলবন্ধনই তো এক আশ্চর্য ঘটনা। নাটক দেখা এবং আমার সেই মুগ্ধ সমালোচনার সূত্রেই ওদের দুজনের সঙ্গে আমার আলাপ হয়,

ঘনিষ্ঠতা হয়, খুব কাছের থেকে জানতে পারি ছাত্রজীবন থেকেই উভয়ের নিবিড় বন্ধুত্বের কথা। শিল্পকর্মের যোগাযোগের কথা। সেলিম ও নাসিরউদ্দীনের শিল্পগত যুগ্মতা ও পারস্পরিক নির্ভরতাই তো বিস্মিত হওয়ার মতো। সেলিমের নাটক নাসিরুদ্দীন ছাড়া প্রায় কেউই মঞ্চস্থ করেননি- নাসিরউদ্দীন বা ঢাকা থিয়েটারও যে-কটি নাটকের প্রযোজনা করেছেন, তার প্রায় সবই সেলিমের লেখা। এটা নিছক বন্ধুত্ব নয়, কোনো আপতিক ঘটনাও নয়, এ এক নান্দনিক পরিপূরকতার অভিযান। সেলিম, নাসিরউদ্দীন, শিমুল এবং আরো অনেককে নিয়েই একটি যৌথসৃষ্টি। প্রতিভার এ রকম সমাবেশ উভয় বাংলাতেই এর আগে কখনো ঘটেছে কি?

আমার এই উচ্ছ্বাস হয়তো আমারও নান্দনিক নির্বাচনের পরিণাম। ইউরোপীয় মডেল ছাড়া বাংলার নিজস্ব নাট্যভাবনার ধারাবাহিকতায় সেলিম আল দীন যে তত্ত্ববিশ্ব তৈরি করেন এবং তার ওপরই ভর করে বাংলার নিজস্ব নাট্য-ইডিয়মকে খোঁজেন, তাতে শিল্প সাহিত্যগত রুচিতে আমারও স্ফূর্তি মেলে। ঋত্বিক ঘটকের ফিল্ম দেখতে দেখতে বারবারই যে মনে উঠত এপিক-চৈতন্যের প্রসঙ্গ, তারই স্বরূপ যেন সেলিমের সাম্প্রতিকতম 'বনপাংশুল'-এর প্রযোজনাতেও এবার ঢাকায় গিয়ে পরপর দুই সন্ধ্যার অভিজ্ঞতায় এই কথাই শুধু মনে আসে। শিল্পের শুদ্ধি ও মানবিকতার এত বড়ো আয়োজন, মনে হয় যেন ঋত্বিকের ফিল্মেই শুধু দেখেছি, সেই ঋত্বিক যাঁর মধ্যে বিষ্ণু দে খুঁজে পেতেন 'দীর্ঘস্থায়ী শিল্প রচনাতে......সংলগ্ন সামগ্রিকতা।'

নাসিরউদ্দীন ইউসুফ সেবার যখন সেলিমের নাটক দুটি নিয়ে এসেছিলেন, তখন তাঁর ওই কল্পনার দুঃসাহস, আপসহীন ডায়লেক্টের উচ্চারণ, নাট্যভাবনার অপরিচয় সত্ত্বেও, তারিফ জোটেনি এমন নয়। নাট্য জগতের কেউ কেউ প্রশংসামূলক রিভিউও লিখেছিলেন। মুখের কথাতেও টের পেয়েছি আরো কারো কারো অনুমোদন। কিন্তু যে প্রযোজনায় সেলিম-নাসিরউদ্দীনের নান্দনিক সাফল্যে আপ্লুত হয়ে আমি তাদের সহমর্মী হতে চাই, খুচরো নিন্দা-প্রশংসায় তার তৃপ্তি নেই। যে বন্ধুদের সঙ্গে সেই বিনিময় ঘটতে পাবে ভাবি তাঁরাও ওঁদের কাজ দেখেননি— এতই দুর্লভ ও ক্ষণস্থায়ী সেই সুযোগ এবং কলকাতা ঢাকার যাতায়াত এতই সীমিত। তাই শুধু মৌখিক বিবরণে বা এমনকী নাটকের টেক্সট হাতে নিয়ে এই থিয়েটারের মহিমা আঁচ করা যায় না। ফলে, সেলিম আল দীনের নাটক পড়ে কিংবা নাসিরউদ্দীন ইউসুফের নেতৃত্বে ঢাকা থিয়েটার-এর প্রযোজনা দেখে আমার যে মহত্ত্বের অনুভব, তা কাউকে পৌঁছে দিতে পারি না, শুধু মাত্র প্রবন্ধ লিখে যাঁরা দেখেননি তাঁদের সমর্থন জোটানো যায় না। ফলে আমার অভিজ্ঞতা যেন খানিকটা নিঃসঙ্গই হয়ে থাকে, অন্তত এই বাংলায়। এ অবস্থায় ঊষা-র কিছু বলার তাগিদের কারণটা আমি যেন বুঝতে পারি-তেমন আমার নিঃসঙ্গতাও যেন কিছুটা ঘোচে ওর উচ্ছ্বাসের ধরনে।

প্রশ্ন অবশ্য আসে সঙ্গে সঙ্গে, কী করে ঊষা বুঝতে পারল সেলিমের নাটকের অসামান্যতা? কথায় কথায় জানতে পারি, ঢাকা থিয়েটারের কোনো প্রযোজনাই সে দেখেনি, কিছুক্ষণ রিহার্সাল দেখে কতটা আন্দাজ করা যায়? সেলিমের সবকটি নাটক পড়েওনি সে, এমনকী যে নাটক বা নাটকগুলো নিয়ে সে মুখর তাও সে শুনেছে ঢাকা থিয়েটার-এর এক কর্মীর পঠনে। সেলিমের সাহচর্য নিশ্চয়ই তাঁর নাট্য ব্যক্তিত্বকে চিনতে সাহায্য করেছে, কিন্তু তা থেকে কতটুকু জানা যায়? কিন্তু আচ্ছন্নতা এতটাই যে ঢাকায় বসেই স্থির করে ফেলতে পারে সে, সেলিমের নাটক হিন্দি রূপান্তরে মঞ্চস্থ করবে। থিয়েটারে ঊষার ক্ষমতা ও যোগ্যতা আমি খুবই মানি। রঙ্গকর্মী-র প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই তাঁকে আমি চিনি, রঙ্গকর্মী-র প্রতিষ্ঠার পর থেকে লক্ষ করছি কীভাবে শিল্পী হিসেবে সে বেড়ে উঠেছে, অর্জন করেছে তার স্বচ্ছ নাট্যব্যক্তিত্ব। কীভাবে হিন্দিভাষী হয়ে, হিন্দিতে নাটক করে সে বাংলার সংস্কৃতির শরিক হয়ে গেছে। অল্প সময়ের মধ্যে কতখানি অভিজ্ঞতাকে সে মুঠোর মধ্যে ধরেছে। সেই

অভিজ্ঞতায় সেলিমকে চকিতে চেনা সম্ভবও হতে পারে তার পক্ষে।

বিশেষত যখন দেখি, অভিনয়ের জন্য সেলিম আল দীনের যে দুটি নাটক সে বিবেচনার মধ্যে রাখে, তার একটি 'শকুন্তলা', আরেকটি 'হরগজ'। সেলিমের অন্য নাটকগুলো যেমন 'কিত্তনখোলা' বা 'হাত হদাই' বা 'যৈবতী কন্যার মন'-এসব যে তার জমি নয়, সে বুঝেছিল। উত্তর প্রদেশের মেয়ে উষা নাচে-গানে লোকায়ত মেজাজকে কতখানি ধরে রাখতে পারে তা তার বহু থিয়েটারেই টের পাওয়া যায়। কিন্তু সেই উষা-র পক্ষেও বাংলাদেশের মাটির সঙ্গে জড়ানো সেলিমের নাটকের উপভোগ একজন পরিপূর্ণ যোদ্ধা হিসেবে যতখানি সম্ভব, তাকে নিজের প্রযোজনায় কতখানি নিয়ে আসা যাবে, সে ব্যাপারে সন্দেহ রাখাটা উষা-র অনুভব শক্তিরই প্রমাণ। কিন্তু, সংস্কৃত নাটকের প্রেক্ষাপটে 'শকুন্তলা'-র নতুন ব্যাখ্যাকে হৃদয়ঙ্গম করা, কিংবা তার চেয়েও বেশি 'হরগজ'-এর শৈল্পিক অ্যাবস্ট্রাকশন বা মননের অভিযান বা সমকালীনতার বিন্যাস অনুধাবন করা তার পক্ষে যে স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে তাই ভেবেছে কি সে?

'চাকা' এবং 'হরগজ' সেলিম আল দীনের নাট্যধারার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কথানাট্যের বিধি লক্ষণ নিয়ে যা বলেছেন তার প্রতি পক্ষপাতও এই সন্দেহ ঘোচায় না যে এর প্রয়োগ সম্ভাব্যতা নাটকের টেক্সট দেখে ঠাহর করা মুশকিল। 'হরগজ'-এর অভিনয় হয়নি, কিন্তু 'চাকা'-র অভিনয় হয়েছে বাংলাদেশের আরেক প্রতিভাবান নির্দেশক সৈয়দ জামিল আহমেদের নেতৃত্বে। আমি সেই অভিনয় দেখিনি, বিবরণ ও সমালোচনা পড়েছি এবং শুনেছি—কিন্তু তাতেও আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি টেক্সটের সঙ্গে প্রযোজনার সম্পর্ক কত দূর ছিল। টেক্সটকে ব্যবহার করা, ভেঙে সাজানো, পুনর্নির্মাণ ইত্যাদির অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই আমরা জানি এবং তাতে নির্দেশকের অধিকারও হয়তো নিঃসন্দেহে গ্রাহ্য, কিন্তু 'চাকা' বা 'হরগজ'-এর নির্দেশনায় সেই সীমাও লঙ্ঘিত হতে বাধ্য কিনা, সেই আমার জিজ্ঞাসা। অন্তত সেলিমের অন্য নাটকগুলিতে, এমনকী শেষতম 'বনপাংশুল'- এও তা অনুসৃত হয়নি। এ দুটি হয়ে থাকে সেলিমের tour de force । তার একটা প্রমাণ, অন্তত আমার কাছে, নাসিরউদ্দীন দুটোর কোনোটাই প্রযোজনা করেননি, সেলিমের নাটক নিয়ে তাঁর যে আদ্যন্ত সহানুভূতি এ দুটোতে তা জন্মায়নি বলেই মনে হয়। দ্বিতীয় প্রমাণ, সেলিমও আর এ-পথে এগোননি—তাঁর 'বনপাংশুল' ও 'প্রাচ্য'-র ভিন্নতাই তার সাক্ষ্য।

কিন্তু সেই 'হরগজ'-ই উষাকে আকৃষ্ট করল কেন? অন্য নাটক ছেড়ে 'হরগজ' (এবং 'শকুন্তলা') বাছাইয়ের একটা যুক্তি আগে আলোচনা করেছি। কিন্তু তবু 'হরগজ'-ই বা কেন? একটা কারণ অবশ্যই হতে পারে, 'হরগজ' যে কেউ প্রযোজনা করার সাহস দেখাননি বা তাগিদ অনুভব করেননি, সেটাই তার কাছে, তার প্রযোজক-সত্তার কাছে, একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে আসতেই পারে, কিন্তু, সবটা তাও নয়। উষা-র সঙ্গে ফোনে কথা বলতেই শুনে ফেলি সেই প্রাসঙ্গিকতা। যখন এই সব কথা হচ্ছে, তখন সারা ভারত জুড়ে, বিশেষত বাংলায় (দুই বাংলাতেও) খরা এবং বন্যা গ্রাস করেছে (দুটো তো একই জিনিস)। সে তাই বলে, এ তো আমাদের কাথিয়াবাড় হতে পারে, মালদহ হতে পারে, আবার হরগজও হতে পারে। একই সঙ্গে এই নাটকের পাঠস্মৃতি পোখরানে আণবিক বোমার পরীক্ষা আরো একবার হিরোশিমার আণবিক বিস্ফোরণের দুঃস্বপ্নকে জাগিয়ে তুলছে। 'হরগজ' সূত্রে এই দুটি অভিজ্ঞতার প্রণোদনাই খুব স্বাভাবিক। সেলিম নিজেও বলেছেন আণবিক বিস্ফোরণকল্প ঝড়ের কথা। নাটকটি পড়তে পড়তে সমকালীনতার এই চিহ্নগুলিও উষাকে ত্বরিত গতিতে ঠেলে দিয়েছে 'হরগজ'-এর দিকে।

এর পরও কয়েকদিনই উষা-র সঙ্গে কথা হয় আমার, বোঝা যায় সেলিম আল দীন সম্পর্কে এবং 'হরগজ' সম্পর্কে তার উৎসাহ তাৎক্ষণিক নয়, সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আরো অনেক কিছু জানতে চায়।

এবং তার প্রতি কথাতেই ঝরে পড়ে ওই ভবিষ্যৎ প্রযোজনার ইচ্ছাটা। কথায়-কথায় বুঝতে পারি, তা নিয়ে ভাবনার কাজ শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে খবর পাই, রঙ্গকর্মী-র যে পাঠচক্র আছে, তাতে সেলিমের 'শকুন্তলা' এবং 'হরগজ' পড়া হয়েছে। সমস্ত সদস্যরা ঘিরে বসে সেই পাঠ শুনছেন এবং নাটক দুটি নিয়ে যে যাঁর কথা বলেছেন। এটা নাকি তাঁদের বহুদিনের রেওয়াজ।

এরই মধ্যে একদিন ঊষা জানায়, এই পাঠচক্রেই সেলিম আল দীনকে নিয়ে, তাঁর সমস্ত নাটক নিয়ে এবং তারই ধারাবাহিকতায় 'হরগজ'- কে নিয়ে রঙ্গকর্মী-র কর্মীদের সামনে বলতে হবে আমাকে। বোধ হয় আমার অপরাধ, সেলিমের সবকটি নাটক (গোড়ার দিকে দু-একটি বাদে) আমি পড়ে ফেলেছি, নাসিরউদ্দীনের প্রযোজনা কয়েকটি দেখেছি এবং সেগুলো একজন পাঠক ও দর্শক হিসেবে বেজায় ভালো লেগে গেছে, আমার মতো নিতান্ত নাটকের বাইরের লোককে ডাকার আর কী কারণ থাকতে পারে? সেলিম বা নাসিরউদ্দীন তো এখানে তত পরিচিত নন এখনো, সেটাই হয়তো আমার পক্ষে গেছে। না করার উপায় ছিল না। শুধু সেলিম বা নাসিরউদ্দীনের কারণেই নয়. ঊষা-র কারণেও। ঊষা-র প্রতি নান্দনিক পক্ষপাতিত্ব আমি বেশ কয়েকটি লেখায় ইতিমধ্যেই প্রকাশ করে ফেলেছি, ফলে দীর্ঘ ব্যক্তিগত হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বের বাইরেও ভোক্তার দায় একটা গড়ে ওঠে। ফলে, সেলিম এবং ঊষা-র শিল্পগত সংযোগের একটা সম্ভাবনায় আমরা ভূমিকার যদি সামান্য প্রয়োজনও হয়, তা থেকে আমি পিছিয়ে থাকি কী করে?

আশ্চর্য লেগেছিল, রঙ্গকর্মী-র ওই পাঠক্রম যে গোলমালের পরিবেশে আহৃত হয়েছিল, সেই গোলমালকে ছাপিয়ে নাট্যকর্মীদের মনোযোগ। সেদিনের কথাবার্তার যে ক্যাসেটটি রঙ্গকর্মী-র বন্ধুরা আমার হাতে পৌঁছে দিয়েছিলেন পরে, তা থেকে গোলমাল ভেদ করে কথাকে উদ্ধার করা খুবই দুরূহ বোধ হচ্ছে এখন অথচ সেদিন যখন বিনিময় ঘটেছিল তখন তা একটুও টের পাইনি, এতই মগ্ন ছিলাম আমরা বিষয়ের মধ্যে।

ঊষা সংক্ষেপে বাংলাদেশে তার অভিজ্ঞতার কথা জানাল। সেলিমের কথা, নাসিরউদ্দীনের কথা, শিমুলের কথা, হুমায়ুন কবীর বা হিমু-র কথা, রিহার্সাল রুমের কথা, ঢাকা থিয়েটার-এর অন্য বন্ধুদের কথা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশের কথা, সেলিমের সঙ্গে 'ভোরের কাগজ' পত্রিকায় সাক্ষাৎকারের কথা, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সব সঙ্গপরিবেশের মধ্যে থেকেই উঠে আসছিল সেলিমের নাট্যভাবনা, নাসিরউদ্দীনের প্রযোজনা কৌশল, ঢাকা থিয়েটার-এর সদস্যদের নিষ্ঠা, এইসব সম্পর্কে তার আন্দাজগুলো। হিমু-র সাহচর্যেই তার সেলিম-পাঠ। সেই হিমু, যার সম্পর্কে ঊষা-র মনে হয় 'ভীষণ ভিতর থেকে বুঝেছে সেলিমকে'। আর এরকম ভাবেই সে আত্মস্থ করে ফেলে ওঁদের অনন্যতা।

সেলিম আল দীনের সমগ্রতা বিষয়ে আমি যতটুকু জানি, তা বলতে বলতেই পেলাম, শুধু ঊষা নয়, রঙ্গকর্মী-র প্রায় প্রতিটি সদস্যই কীভাবে সেলিমের নাটকের গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছেন, বুঝলাম তাঁদের আগ্রহে, মনোযোগের প্রশ্নোত্তরে।

'শকুন্তলা' সকলের ভালো লেগেছে, কিন্তু যেহেতু 'হরগজ' প্রযোজনার কথাটা রঙ্গকর্মী মূলত ভাবছে, তাই ওই নাট্যকটির কথাই বেশি করে উঠছিল এবং তাতে অংশ নিচ্ছিলেন দলের প্রায় প্রতিটি নাট্যকর্মীই। অভিভূত হবার মতোই ঘটনা। শুনতে শুনতেই ভাবছিলাম, সেলিম বা নাসিরউদ্দীন কী জানতে পারবেন, মধ্য কলকাতার স্কুলের একটি ঘরে, কোনো এক সন্ধ্যায়, এতগুলি তরুণ, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দিভাষী, তাঁরা 'হরগজ' নিয়ে এত খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে প্রায় শব্দ ধরে ধরে, আলোচনা করছেন, বিনীতভাবে নিজেদের ধ্যানধারণা প্রকাশ করেছেন। এ রকম কী ঢাকাতেই ঘটেছে?

বলতে দ্বিধা নেই, 'হরগজ'-এর প্রযোজনার সমস্যা নিয়ে আমার সংশয় এখনো কাটেনি। যে

বিবৃতি উপন্যাসে সাজে, সেই বিবৃতিই কি নাটকেও অবিকল উচ্চারিত হবে? কতখানি সম্পাদনা করা হবে, কতখানি তা সংলাপে রূপান্তরিত হবে, অর্থাৎ প্রায় সংলাপহীন বিবৃতি কীভাবে নাট্যে হাজির হবে তা যে অনুমান করতে পারি না, তাতেই নিশ্চয়ই বোঝা যায়, আমি নাটকের লোক নই। তবু, আমার মনে গাঁথা এই সমস্যাগুলোই প্রশ্নের আকারে তুলছিলাম সেখানে, ওঁদের ভাবনাকে উস্‌কে দেওয়ার জন্য।

বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করছিলাম, এ নিয়ে ঊষা-র তো বটেই, অন্য নাট্যকর্মীদের প্রায় অনেকেরই তেমন সংশয় নেই, বরং এক ধরনের নিশ্চয়তাই আছে। নিজের নিজের মতো করে তাঁরা ভেবেও রেখেছেন অনেকটা। ফলে, কিছুটা তর্কাতর্কির আভাসও পাওয়া গেল। ঠিক ওই ভাবেই কথাটা উঠেছিল; উপন্যাসোপম এই নাটকে সিংহভাগ জুড়ে আছে বর্ণনা যা দৃশ্যে রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়, সংলাপেও নয়। তা নিয়ে ফিল্‌ম হতে পারে, নাট্য প্রযোজনা কী সম্ভব? তার উত্তরে কেউ একজন বললেন অন্যান্য পরিচিত নাটকে একটা ডিজাইন তৈরি করার তাগিদ থাকে, কিন্তু এখানে অভিজ্ঞতাটা ঠিক উলটো, যেন ডিজাইনটাই আছে, এবার তাকে ভরিয়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ ডিজাইনটুকু ধরে নিয়েই নাটক করতে হবে। ফলে পাল্টা প্রশ্ন উঠল, তবে কি যে নাটক প্রযোজিত হবে, 'হরগজ' শুধু তার ডিজাইন? সেই 'বীজ' যা থেকে জন্মাবে? প্রযোজক মূর্তি দান করবেন। প্রযোজক হিসাবে ঊষা বা অন্য কেউ তাতেই উৎসাহিত হতে পারেন, কিন্তু নাটকের লিখিত রূপের গঠন নিয়ে যাঁর অনুসন্ধান, তিনি কী ভাববেন?

ঊষা সমাধান খোঁজে এই ভাবে, নাটককে তো প্রাচ্যে দৃশ্যকাব্য বলা হয়, সেলিমের ওই শক্তিশালী ভাষায় তৈরি শক্তিশালী ইমেজের টানে চলে আসবে সংলাপ।

'রুদালি' করার সময়ও তার ওই ইমেজের ভাবনা সবাই মিলে তৈরি করেছিলেন এক একটা অংশ; রচনা করছিলেন সংলাপ। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে সেটা তো ছিল গল্প থেকে তৈরি করা নাটক। 'হরগজ' ফিলমও নয়, গল্প নয়। যদিও কোনো কিছুতেই আপত্তি নেই সেলিমের। 'হরগজ'-এর নাট্য-স্ক্রিপ্ট কি সেই স্বাধীনতা দেবে, দেওয়া উচিত? পাঠকের সমস্যাটাও ঊষা বোঝে না তা নয়, কিন্তু তার নজর প্রযোজনা নিয়ে। বরং তার মনে হয়, 'হরগজ'-এর বাধাটাই তাকে সৃজনে উদ্বোধিত করবে।

কয়েকজন নাট্যকর্মী পরপর যা বললেন, তাকে সাজানো যায় এই ভাবে : আমরা যে নাটক দেখি বা পড়ি, তার সবেতেই ঘটনার বা চরিত্রের বিকাশমানতার ছবি দেখি, কিন্তু 'হরগজ'-এ কিছুই ঘটছে না, ঘটবে না, যে ঘটনা ঘটে গেল তাকেই দেখছি শুধু. চোখ ফিরিয়ে তারই প্রতিক্রিয়া শুধু। আবিদের যে প্রতিক্রিয়া সে তো সাধারণ মানুষেরই প্রতিক্রিয়া, তাকে যেখানে যেখানে দরকার সংলাপের কাজে নিয়ে যাওয়া যায় এবং বর্ণনাগুলো থেকে যেখানে সম্ভব রূপান্তরিত করা যায় দৃশ্যগ্রাহ্যতায়। হয়তো অনেকগুলো ইমেজ 'হরগজ' থেকে তুলে এনে মনে করিয়ে দেওয়া যায়, সেগুলো বীজের চেয়ে, ডিজাইনের চেয়ে অনেক বেশি। ঊষা যখন কীভাবে নাটক শুরু হতে পারে তার আন্দাজ দিচ্ছিল, সূত্রধারের কথা বলে, কিংবা আবিদকেই সূত্রধার হিসেবে গণ্য করে, তখন কেউ একজন চাইছিলেন হরগজ-কে দিয়েও কথা বলাতে। ফলে, নাটকের সংজ্ঞা নিয়ে পুরোনা প্রশ্নগুলিই আবার ফিরে আসতে চাইছিল। তবে 'হরগজ'-এর ভাষার জোর, তার জোরালো ইমেজ, নানা কৌতূহলোদ্দীপক চরিত্র ইত্যাদিকে নিয়ে কিছু একটা করা যাবে, এই প্রত্যয় ক্রমশই দানা বাঁধছিল কথাবার্তার মধ্যে। তবে থিয়েটারের গ্রাহ্য ও সম্পূর্ণ নতুন উপকরণ ও প্রকরণকে নিয়ে আসতে হবে এই বাস্তব ও অতিবাস্তব আবহকে ফুটিয়ে তুলতে, সে বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত হলেন।

গোটা নাটকটির অভিঘাতে, কল্পনার সমগ্রতায়, যে নিশ্চয়তা প্রকাশ পাচ্ছিল, তা অবশ্যই দৃশ্য রূপায়ণের খুঁটিনাটির ভাবনায় পৌঁছোয়নি এখনো, বলাই বাহুল্য। তা নিয়ে ধ্যানের সময়ই বা পাওয়া

গেল কোথায়? ঊষা-র কথায় বোঝা গেল, অনেক ভাবনা পরামর্শ ও যোগ -বিয়োগের অপেক্ষায় আছে সে। সেই অনুভবেই এলোমেলো অনেক কথা হতে পারল। ঢাকা শহরের বিলাস-পরিবেশে, হয়তো শৌখিন সেবা সাহায্য সংস্থার পরিমণ্ডলের মধ্যেই নায়ককে কীভাবে উপস্থাপন করবেন, কী বাদ দেবেন, কী রূপান্তর ঘটাবেন, গ্রাম থেকে মানিকগঞ্জের গ্রাম হরগজে যাওয়ার অ্যাম্বুলেন্স-অভিযান কীভাবে পরিকল্পিত হবে এই সবকিছু নিয়ে, ঘরের মধ্যে বসেই ঊষা এবং তাঁর সহকর্মীরা নিজেদের ভাবনায় তলিয়ে যেতে পারেন। তাঁদের শোনাতে ইচ্ছে হয়, 'চাকা' নাটকটির অভিজ্ঞতার কথা যার অভিনয় আমি দেখিনি, বিবরণ শুনেছি।

হরগজ গ্রামে গিয়ে ত্রাণকর্মীদের সেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতা যেখানে প্রকৃতি ছিন্নভিন্ন, মানুষ খণ্ডবিখণ্ড, প্রকৃতি-মানুষ সবই তাদের আকার হারিয়ে ফেলেছে- সেই নিরাকৃতির জগৎকে কীভাবে তুলে আনা হবে? তখনই 'হরগজ' নিয়ে আলোচনাটাও আরো ইচ্ছাপূরণের হয়ে যায়। ঊষা চুপ করে শোনে। বোঝা যায় সে তৈরি হচ্ছে। এই স্বাধীনতার হাওয়াতেই আমার পক্ষে বলা সম্ভব হয় ছায়া অভিনয়ের কথা।

শৈশবে উদয়শংকরের ছায়ানৃত্য দেখার অভিজ্ঞতা থেকেই এর জোর আমার কাছে যেহেতু অবিস্মরণীয় হয়ে আছে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার যে বীভৎস ছবি ভেসে ওঠে এই নাটকে, তারই সূত্রে পিকাসো-র 'গুয়েরনিকা'-র কথাও উচ্চারণ করি। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় ফ্রাঙ্কোর বোমায় বিধ্বস্ত গুয়েরনিকা শহরের ছবিতে ধ্বংসের প্রতিমা এঁকেছিলেন পিকাসো এভাবেই। সেই 'গুয়েরনিকা'-কেও কি ব্যবহার করা যায় কোনো ভাবে? উত্তর দেওয়ার সময় এখনো আসেনি, শুধু ইচ্ছেমতো কল্পনাকে ভাসিয়ে দেওয়া যায়।

চিত্রকলা ব্যবহারেব কথা যে তার মাথায় আছে, তা ইঙ্গিতে আগেই জানিয়েছিল ঊষা। কোনো একজন চিত্রশিল্পীকে পড়তেও দেওয়া হয়েছে 'হরগজ'। সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বলে সে, এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে, বাঁধাধরা প্রথাবদ্ধ রূপে ফেলতে পারবে না 'হরগজ'-কে, তেমনি শৌখিনভাবেও কিছু করা চলবে না। এই সুযোগে জানিয়ে দিই আমি পুনর্সৃষ্টি করতে হলে সেলিমের পথ ধরেই করতে হবে। সেলিমের অন্য নাটকে নাচগান মিলিয়ে যে লিরিক-এপিকের মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে, তার বদলে এখানে ঘোব তিমিরাচ্ছন্ন বাস্তব। এই কারণেই কি কেউ করতে চাননি এই প্রযোজনা?

ঊষা বোধ হয় ঠিকই বলে, একদিক থেকে ভালোই তো হয়েছে, আমরা সেলিমের কোনো নাটকের প্রযোজনাই দেখিনি- তাই যে কোনো রকম স্বাধীনতা নিতে আমাদের বাধবে না। সেলিমও নাকি সেই স্বাধীনতাতেই প্ররোচিত করেছেন তাঁদের।

হিন্দি অনুবাদ করতে দেওয়া হয়েছে 'হরগজ'-এর। তা নিয়ে বসবেন সকলে মিলে। শুধু একটা কথাই বারবার বলতে শুনি ঊষাকে, 'হরগজ' করবই আমি, অন্তত প্রথমে ছোটো একদল দর্শকের সামনে। এটা আমার জেদ।

কেন এই জেদ, তাও বুঝে নিতে পারি তার তদ্গত অস্ফুট উচ্চারণে। বুঝতে পারি, শুধু সেলিম নয়, তাঁর অন্যান্য নাটকও নয়, 'হরগজ'-এর বাণীই ঊষাকে আলোড়িত করেছে। সে তাই কথা বলতে বলতে সেই জায়গায় চলে যায়। পরিবেশের ধ্বংসের দৃশ্য তাকে যেমন একদিকে বিনাশের ভাবনায় নিয়ে যায়, অন্যদিকে আবার জীবনের যে ছোটো দিক, স্বার্থের দিক তার পরিণাম দেখিয়েই যেন সম্বিত ফিরিয়ে আনা চলে। বস্তুবাদের চাপ, ছোটো অর্থে বড়ো হওয়ার লোভ, অবসন্ন করে দেয়, জীবনের তাৎপর্য হারিয়ে যায়। সেখানে দাঁড়িয়েই জীবনের দুঃসহ দৃশ্যগুলো দেখতে পায় মানুষ।

একজন তরুণ নাট্যকর্মী খানিকটা ক্ষুব্ধভাবেই প্রশ্ন তুললেন নাটকের শেষাংশটি পড়ে শুনিয়ে এটা সেলিমের মর্বিডিটি কিনা, এভাবে শেষ করা কেন নাটকটি? প্রায় সমস্বরে প্রতিবাদ উঠল। ঊষা-র গলা

সবচেয়ে উঁচুতে, বাস্তবে যদি এই অন্ধকার থাকে, তবে তাকে এড়ানোই তো পাপ। যে জীবনকে নিত্যই দেখছি, ছদ্মরূপে দেখছি। তার বাইরের যে বড়ো-জীবন, তাকেই নাটকে দেখাতে চেয়েছেন সেলিম। এই দার্শনিক গড়নটাতেই উষা আকৃষ্ট হয়েছেন। তার দলেরই কেউ একজন যখন কথার পিঠে বলেন, 'হরগজ' পড়তে পড়তে জীবনের প্রতি যে মমতা আছে তা যেন ভেঙে যায়- উষা সোৎসাহে সমর্থন জানায়। বলে, তার ভিত্তিতেই তো জন্মাবে সমাজ সচেতনতাবোধ ও অখণ্ডতার স্বপ্ন।

আমারও মনে পড়ে যায়, অনেক সময় অন্ধকারকে দেখানোটাও শিল্প সাহিত্যে কীভাবে হয়ে যায় প্রতিবাদেরই একটা ধরন। 'হরগজ'-ও সেই প্রতিবাদ—আজকের অপরিকল্পিত অসাম্য-নির্ভর রাষ্ট্রব্যবস্থা ও যুদ্ধবাজ চক্রান্তের বিরুদ্ধে। ধ্বংসের যে চিত্র—বন্যা, খরা, প্রকৃতির মুছে—যাওয়া সেখানে দাঁড়িয়েই জীবনকে নতুনভাবে দেখা, জীবনের অর্থ খুঁজতে চাওয়া।

জানি না শেষ পর্যন্ত উষা গাঙ্গুলি 'হরগজ' হিন্দিতে করবেন কিনা. আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অভাবিত পূর্ব বাধা তো থাকে অনেক। উষা-র প্রতিজ্ঞাদৃঢ় মুখ ও উচ্চারণের স্বরক্ষেপে মনে হয় না কোনো বাধাই শেষ পর্যন্ত টিকবে। কিন্তু আপাতত ওই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতেই হবে। কিন্তু, আমার কাছে অনেক প্রাপ্তি বলেই মনে হয়, ওই-বাংলার 'হরগজ'-কে নিয়ে এই বাংলার নির্দেশক ও নাট্যকর্মীরা এতটা ভাবছেন, দুই বাংলার থিয়েটারের মধ্যে একটা গভীর যোগসূত্র তৈরি হচ্ছে।

বাংলাদেশের নাট্যচর্চাক্রম

আশিস গোস্বামী

বাংলাদেশের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ কী কেবল পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বতন্ত্র হয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র করে নেবার যুদ্ধ ? নাকি আরও অনেক স্বপ্ন ছিল প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার মনের গোপনে। ভূমির পুনর্বণ্টন হবে, সামন্তবাদী কাঠামো ভেঙে ফেলা হবে, দেশের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হবে দেশেরই মানুষ—হয়তো এ রকম অনেক স্বপ্নও লালিত ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার লাভের পর সাড়ে সাত কোটির একটা দেশের মানুষের কোনো স্বপ্নই সফল হয়নি কেবলমাত্র নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রমাণটুকু ছাড়া। গ্রামীণ কাঠামোর কোনো পরিবর্তন হয়নি, দেশের অর্থনীতিতে বিদেশের নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ বেড়েছে আর একচেটিয়া মুনাফা লাভ করছে সংখ্যালঘু মুৎসুদ্দিরা। স্বপ্নভঙ্গ হল। কিন্তু স্বপ্নটা তো বুকের মধ্যে উথাল-পাতাল করতে থাকে। কাব্য-সাহিত্যে সেই স্বপ্নহীনতার কথা আছে কিন্তু চ্যালেঞ্জ জানাল নাটক। নাটক যে স্পষ্ট রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে—বাংলাদেশের নাট্যপ্রেমী মুক্তিযোদ্ধারা সেটা বুঝে নিয়েছিলেন সত্তরের কলকাতার রাজনৈতিক থিয়েটার দেখে। উত্তাল, অসংলগ্ন কলকাতাও তখন রাজনৈতিক হোলিখেলায় মত্ত। তারই মধ্যে কলকাতার থিয়েটারের ভূমিকা বাংলাদেশের থিয়েটারকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

আমাদের থিয়েটারের, গণনাট্য আন্দোলন বা 'নবান্ন' প্রযোজনার কোনো প্রভাব তখনকার বাংলাদেশে পড়েনি। 'রক্তকরবী'-র থিয়েটারের ভাষা সেখানে পৌঁছয়নি। তখনও সেখানে মোটাদাগের যাত্রাধর্মী নাট্যের শৌখিন প্রবাহ বহমান। সাতচল্লিশের আগে অবিভক্ত বাংলার নাট্যচর্চা সাতচল্লিশ পরবর্তী আমাদের এপার বাংলায় যে নতুন দিক মোড় নিল সেই পালাবদল ওপার বাংলায় হয়নি। এই না হওয়ার মূল হয়তো পূর্বপাকিস্তানের একনায়কতন্ত্রী সরকার যেমন দায়ী তেমনি ছিল মৌলবাদীদের দাপটে পদচারণা। হয়তো সেদিনই চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল, পূর্ববাংলা থেকে বাঙালি জাতির বিচ্ছিন্ন হবার ইঙ্গিত। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনে সেই স্বাধীনতার বীজ প্রথম বপন করেছিলেন তাঁরা। একটা জাতি বারবার তার ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ায়, সংগ্রামের রক্তক্ষয়ে নিজেদের সংস্কৃতি নিয়ে, নাট্য ঐতিহ্য নিয়ে এগিয়ে যাবার অবকাশই পেল না। সেই অবকাশ যখন এল তখন নাটকে সংগ্রামের নতুনতর ভূমিকা নিতে হল তাকে। সেই ভূমিকা গত তিরিশ বছরে কতখানি পালিত হয়েছে সেটাই আলোচ্য বিষয় হলেও একটু পিছিয়ে দেখে নেওয়া প্রয়োজন। অন্তত সাতচল্লিশ থেকে সত্তরের মধ্যেকার নাট্যচর্চার ইতিহাস বুঝে নেওয়া জরুরি। কারণ সত্তর পরবর্তী নাট্যচর্চার বীজ তার আগেই রোপণ হয়েছে বলে মনে করি।

শামসুল হক সম্পাদিত 'বাংলা সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জি, ১৯৪৭-১৯৬৯'-এ বাংলায় প্রকাশিত নাটকের একটি তালিকা পাওয়া যায়। সেই তালিকায় পাঁচশো একচল্লিশটি নাটকের উল্লেখ রয়েছে। তাতে দেখা যায় ১৯৪২ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে ১১টি নাটক প্রকাশিত হয়েছে। অনুরূপভাবে দেখা যায়, ১৯৫১ থেকে ১৯৫৫-র মধ্যে ৫২টি, ১৯৫৬ থেকে ১৯৬০-এ ৯৬টি, ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫-তে ১৬৩টি, ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯-এ ২১৯টি নাটক প্রকাশিত হয়। নাটকের রচনা ও প্রকাশিত এবং সর্বোপরি নাট্যচর্চার এক ক্রমবিকাশ লক্ষণীয়। রচিত ওই নাটকগুলি ছাড়াও আরো অনেক বেশি নাটক রচিত হয়েছে, এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। গুণগত উৎকর্ষে হয়ত তাতে অনেক খামতি ছিল, আধুনিকতার স্পর্শ তেমন ছিল না, কিন্তু নাট্যচর্চার ধারাটিকে ওই ভাবেই প্রবহমান রাখা সম্ভব হয়েছিল, ওই প্রয়াসের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল পরবর্তী নাট্যচর্চার পথ। বরেণ্য নাট্যকার মুনীর চৌধুরী সেই নবীন পথের ইশারার কথা জানিয়েছিলেন এইভাবে—'আরো অধিক সংখ্যক নাটক পাণ্ডুলিপি

থেকেই মঞ্চস্থ হয়েছে। বছরের পর বছর সামাজিক অবস্থা বিশেষের প্রতি দর্শকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে, কেননা নাটক সমকালীন জীবনধারার মূলীভূত মানবিক দোষগুণ এ সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরেছে। ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জিমূলক নাটক স্পষ্টতঃ হ্রাস পেয়েছে, যদিও কখনো কখনো নাট্যকারগণ নতুন ও নিকট কিছুকে গৌরবান্বিত করার মানসে পুরনো কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এসব নাটকের হয়তো লক্ষণীয় কোনো পরিপূর্ণতা আসেনি, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, এদের মধ্যে মহৎ ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দুর্নিরীক্ষ্য নয়।'

১৯৪৭ পরবর্তী নাট্যে ঐতিহাসিক-সামাজিক দিকের আবেগময় প্রকাশের আধিক্য ছিল বেশ কিছুকাল। তার কারণ স্বাধীনতা লাভের আবেগ; এ পারের ঘরছাড়া মানুষ ও তো ওপারে গিয়েছিল বাস্তুচ্যুত হয়ে। সেই বেদনার আবেগও হয়তো প্রকাশিত হয়েছিল নাটকের মধ্যে। তাই উল্লেখিত নাটকের সত্তর ভাগ রচিত হয়েছে সামাজিক সমস্যা নিয়েই। স্বাধীনতা লাভের আবেগ কেটে যেতেই একটু একটু করে ফুটে উঠেছিল দৈনন্দিন সমস্যাগুলি ; পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবধানটাও বাড়ছিল। কেবলমাত্র ধর্মভিত্তিক দেশভাগ বাংলাদেশের মানুষকে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দিলেও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যের শিকড় জুড়ে ছিল এপারের বাঙালির ঐতিহ্যের সঙ্গে। তাই আরও একটা স্বাধীনতার জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরও চব্বিশ বছর। এই মধ্যবর্তী প্রায় পঁচিশ বছরে বাংলা দেশের নাট্য ঐতিহ্য সংখ্যাগত দিক থেকে ক্রমবর্ধমান হলেও ফলপ্রসূ নয়। কয়েকজনের ব্যতিক্রমী প্রয়াসই স্মরণীয় করে রেখেছে ওই সময়কে।

'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাই দেখা গেল আমাদের কোনো রঙ্গমঞ্চ নেই, নেই পেশাদার বা সৌখিন কোনো নাট্য-সম্প্রদায়। শক্তিশালী নাট্যকার, পরিচালক বা অভিনেতা স্বভাবতই দুর্লভ। আছে নাটকের প্রতি সন্দিগ্ধ রক্ষণশীল সমাজ, জীবনের সঙ্গে যোগবিহীন কিছু নাটক, মান্ধাতার আমলের মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যপট ও আলোক ব্যবস্থা। শুরুতে যে অবস্থা দেখা গেল তার সঙ্গে স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের মঞ্চ ও অভিনয়ের তুলনা করলে দেখায়, পূর্ব পাকিস্তানে নাটক ও অভিনয় তখন গিরিশ যুগের পেছনে।' এর কারণ স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের অধিকাংশ নাটকের মানুষেরা এপার বাংলায় চলে এসেছিলেন। তাই শূন্যতাটাও প্রকট হয়ে উঠেছিল। ক্রমে ধাতস্থ হয়ে একটু একটু নাট্যচর্চা বাড়ছিল। পূর্বোক্ত হিসেবে তাই বলে। ১৯৫০ সালে ডক্টরস ক্লাব এবং তারপরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সংসদ ও ড্রামা সার্কেল নাট্যচর্চায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। এঁদেরই উদ্যোগে একদিকে যেমন শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া' জাতীয় নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে, অন্যদিকে বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী', তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক', 'ছেঁড়াতার' মঞ্চস্থ হয়েছে। পাশাপাশি মুনীর চৌধুরীর 'কেউ কিছু বলতে পারে না', নূরুল মোমেনের 'নেমেসিস', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 'বহিপীর' ইত্যাদি নাটক ও মঞ্চস্থ হয়েছে। ১৯৫৬ সালে সাতদিন ব্যাপী এক নাট্যোৎসবের আয়োজন হয়েছিল—যার প্রত্যক্ষ ফসল মুনীর চৌধুরীর 'কবর'।

আগেই লিখেছি বাংলাদেশের গত তিরিশ বছরের নাট্যচর্চার বীজ রোপণ করা হয়েছিল স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশেই। অনেক নঞর্থক দিকের মধ্যেও সদর্থক ছিল এটাই যে, ওই সময়ের নাট্যচর্চার মধ্য দিয়েই স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছে—মমতাজউদ্দীন আহমেদ, আবদুল্লাহ্ আল-মামুন, আতাউর রহমান, রামেন্দু মজুমদার, এনামুল হক চৌধুরী, ফেরদৌসী মজুমদার, জিয়া হায়দার, মামুনুর রশীদ, আলী যাকের প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্বদের। এঁদেরই হাতে মূলত গড়ে উঠেছে স্বাধীন বাংলাদেশের নাট্যচর্চার ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধের ফসল নয় এই সাতচল্লিশে, বিভ্রান্ত হয়েছিল বায়ান্নোয় আবার একাত্তরের পর ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত হবার সুযোগ এনে দিয়েছিল। গত তিরিশ বছর সেই নাট্যচর্চারই ইতিহাস। মামুনুর রশীদ এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই লেখেন—'বহুদিন ধরে অনেক বন্ধুকে বলতে শুনি আমাদের নাটক মুক্তিযুদ্ধের ফসল। কথাটা শুনে ভালো লাগে। কারণ মুক্তিযুদ্ধের সাথে আমাদের

আবেগ জড়িত। কিন্তু আবার একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে কথাটার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। নাটক তো কোনো ভুঁইফোঁড় ব্যপার হতে পারে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে নাট্যচর্চা হয়ে থাকে। সেখানে থেকে একটা নাট্যচর্চা গড়ে ওঠে, এই নাট্য-সংস্কৃতি গড়ে ওঠার কালের সমাজে অভিনেতা-নির্দেশক-নাট্যকার-কলাকুশলীরা গড়ে ওঠে।'

দুই

স্বাধীন বাংলাদেশের নাট্যচর্চার প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল নাগরিক, ঢাকা থিয়েটার, আরণ্যক, বহুবচন থিয়েটার—মূলত এই পাঁচটি নাট্যদল। প্রায় একই সময়ে ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামে থিয়েটার '৭৩ গড়ে ওঠে। নতুন নাট্যধারার পথিক এরাই। নতুন বলছি এই কারণে যে, স্বাধীন বাংলাদেশে নাটকের প্রতি উৎসাহ শৃঙ্খলা-নৈতিকতা-পেশাদারি মনোভাব ইত্যাদি অতীতে তেমন ভাবে ছিল না। তথাকথিত গ্রুপ থিয়েটার মনোভাব এবং দর্শনীর বিনিময়ে থিয়েটার নিয়মিত দর্শকের কাছে পৌঁছে দেবার প্রচেষ্টার মধ্যেই এই থিয়েটারের নতুনত্ব। শুরুর কয়েক বছরের মধ্যেই এই দলগুলি উল্লেখযোগ্য কতগুলি প্রযোজনা করতে পেরেছিল বলেই নাট্যচর্চায় নেতৃত্বের আসন নিতে পেরেছিলেন তাঁরা। নাগরিক বাদল সরকারের 'বাকী ইতিহাস' প্রযোজনা শুরু করে দর্শনীয় বিনিময়ে, এরপর একে একে মঞ্চস্থ করে মলিয়রের 'বিদগ্ধ রমণীকুল', রশীদ হায়দারের 'তৈল সঙ্কট', আলবেয়র কাম্যুর 'ক্রস পারপাস', এডওয়ার্ড এল্‌বির 'এই নিষিদ্ধ পল্লীতে', সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের 'বহিপীর'; ঢাকা থিয়েটার প্রযোজনা করেছে, সেলিম আল দীনের 'সংবাদ কার্টুন', 'জণ্ডিস ও বিবিধ বেলুন', হাবিবুল হাসানের 'সম্রাট ও প্রতিদ্বন্দ্বীগণ, আল মনসুরের 'বিদায় মোনালিসা',থিয়েটার প্রযোজনা করেছে, আবদুল্লাহ আল-মামুনের 'সুবচন নির্বাসনে', 'এখন দুঃসময়'। বহুবচনের প্রযোজনা, ফরহাদ মাসহারের 'প্রজাপতির লীলাহাস্য', সালেহ্‌ আকরামের 'প্রজাপতি ফিরে এসো' সেলিম আল দীনের 'সর্প বিষয়ক গল্প' ; আরণ্যক প্রযোজনা করেন 'ওরা কদম আলী', 'ওরা আছে বলেই', 'এখানে নোঙব', 'সাত পুরুষের ঋণ' ইত্যাদি।

এই নাট্যপ্রযোজনাগুলির মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের নাট্যচর্চার কয়েকটি ধারা গড়ে উঠেছে—যা গত তিরিশ বছরে আরও অনেক সম্পদশালী হয়ে উঠেছিল। যেমন—

'নাগরিক' আন্তর্জাতিক নাটকের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগসূত্র স্থাপন করেছে। তাঁদের নাট্যকারের তালিকায় বার্টোল্ট ব্রেখট্‌, শেক্‌সপিয়ার থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল হয়ে বাদল সরকারের দীর্ঘায়ত।

থিয়েটার মধ্যবিত্তের জীবনবোধ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়েই পদচারণা করেছেন ; তাঁদের 'এখন ক্রীতদাস', 'কোকিলারা' 'মেরাজ ফকিরের মা' ইত্যাদি নাটকে মধ্যবিত্তের মূল্যবোধই প্রধান্য পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, ফ্রানস জাভ্যাব ক্রোৎস, ক্রিস্টোফার মার্লো, প্রফুল্ল রায়—এদের উপন্যাস নাটক নিয়ে কাজ করলেও মূল পথ মধ্যবিত্তের জীবনেই মধেই।

আরণ্যক শ্রেণি সংগ্রাম ও অধিকারহীন মানুষের কথা বলতে চেয়েছেন তাঁদের নাট্যে স্পষ্ট রাজনৈতিক বিশ্বাস প্রতিফলিত। 'ওরা কদম আলী', 'ইবলিশ, 'এখানে নোঙর', 'পাথর' 'প্রাকৃতজন কথা' ইত্যাদি নাট্য প্রযোজনা সেই বিশ্বাসের সুরেই সরব।

ঢাকা থিয়েটার প্রসেনিয়ামকে ভেঙে লোকজ ধারাকে তার আঙ্গিক সহ ধরার চেষ্টা করেছেন বারবার। এক অনন্য স্বাতন্ত্র গড়ে উঠেছে তাঁদের নাট্যে। 'কিত্তনখোলা', 'কেরামতমঙ্গল', 'হাত হদাই', ইত্যাদি প্রযোজনায় বাংলা নাট্যের লোকজ পরম্পরার সঙ্গে আধুনিকতার এক যোগসূত্র স্থাপন করেছে।

পথনাট্যের সূত্র ধরে ঢাকা থিয়েটারের 'গ্রাম থিয়েটার' ও আরণ্যকের 'মুক্তনাটক'-এর চর্চা

বাংলাদেশের নাট্যচর্চার নতুন এক সম্ভাব্য তুলে ধরেছে।
বাংলাদেশের শিশুনাট্যের চর্চাও ক্রমবর্ধমান।

তিন

এই ধারাগুলিকে আলাদা আলাদা করে আলোচনা করলেই আমরা গত তিরিশ বছরের নাট্যচর্চার একটি প্রাথমিক ধারণা পেতে পারি। যেমন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের নাট্যচর্চার যে পদচারণা নাগরিক শুরু করেছিল তা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশের নাট্যচর্চায়। অনুবাদ ও রূপান্তরিত নাটকের চর্চা নতুন সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে সেই নাট্যধারায়। কবীর চৌধুরী, জিয়া হায়দার, মমতাজউদ্দীন আহমেদ, শওকত ওসমান, সৈয়দ শামসুল হক, আতাউর রহমান, আসাদুজ্জামান নূর, আলী যাকের, মহিদুল ইসলাম, মুজিবুর রহমান দিলু, খাইমল আলম সবুজ, শাহেদ ইকবাল প্রমুখদের অনূদিত ও রূপান্তরিত নাটকগুলো বাংলাদেশের মঞ্চে অন্যতর আস্বাদ এনে দিয়েছে। শেক্সপিয়ারের 'জুলিয়াস সিজার' অবলম্বনে সৈয়দ শামসুল হকের 'গণনায়ক' বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডো' অবলম্বনে কবীর চৌধুরীর 'গডোর প্রতীক্ষায়', চেখভের 'দি সোয়ান সঙ' অবলম্বনে মমতাউদ্দীন আহমেদের 'যামিনীর শেষ সংলাপ', মলিয়েরের 'ইনটেলেকচুয়াল উওমেন' অবলম্বনে আলী যাকেরের 'বিদগ্ধ রমণীকুল', প্রিস্টলির 'অ্যান ইন্সপেক্টর কলস্' অবলম্বনে লাকী ইনামের 'খোলস', ব্রেখটের 'হের পুন্টিলা অ্যান্ড হিজ ম্যান মাট্টি' অবলম্বনে আসাদুজ্জামান নূরের 'দেওয়ান গাজীর কিস্সা' এবং একই নাট্যকারের 'দি লাইফ অফ গ্যালালিলিও' এবং 'মাদার কারেজ' অবলম্বনে আতাউর রহমানের 'গ্যালিলিও' এবং 'হিম্মতী মা', 'থ্রি পেনি অপেরা' অবলম্বনে মুজিবুর রহমান দিলুর 'জনতার রঙ্গশালা', ইবসেনের 'ওয়াইল্ড ডাক' অবলম্বনে 'বুনোহাঁস', মার্লোর 'দি ট্রাজিক্যাল হিস্ট্রি অফ ফস্টাস' অবলম্বনে জিয়া হায়াদের 'ডক্টর ফস্টাস' এমনি বহু নাটকের উল্লেখ করা যায় বিদেশি নাট্যকারের কাছ থেকে নেওয়া হলেও তাদের বাংলা দেশের জলমাটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

হুবহু অনুবাদ যেমন আছে তেমনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মধ্যবিত্তের দ্বিধা নিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে বারবার। সৈয়দ শামসুল হকের 'গণনায়ক' সম্পর্কে জিয়া হায়দার লিখেছেন—'সৈয়দ হকের 'গণনায়ক' নাটকটির কথাও বলতে হয়, বিশেষত এর বিষয়বস্তুর জন্যে। শেক্সপিয়ারের জুলিয়াস সিজার নাটকের অনুপ্রেরণায় লিখিত এই নাটকে জুলিয়াস সিজার এবং শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের মধ্যে একটা সাদৃশ্য অঙ্কন করা হয়'। আবার বহুদিন বাদে 'জনতার রঙ্গশালা' সম্পর্কে জামালউদ্দীন হোসেন লেখেন—'এই গল্পের কি আশ্চর্য মিল খুঁজে পাই আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থা এবং সমাজপতিদের ক্ষমতার আরোহণের অন্ধকারাচ্ছন্ন কাহিনির সঙ্গে। আর তাই অতি সহজেই জোনাথান পীচাম হয়ে যায় সেলিম শেখ, ম্যাকহীথ হয়ে যায় ক্যাপ্টেন আনোয়ারউদ্দীন আনার (অবঃ) ওরফে কালু এবং টাইগার ব্রাউন হয়ে যায় বাঘা সালাম। বাঙলাদেশের পটভূমিতে এই কাহিনির পিছনে আর একটি কাহিনির ছায়া বড়ো হয়ে দেখা দেয়। তা হল বঙ্গবন্ধু হত্যার পর বাঙলাদেশের রাজনীতিতে উর্দির অনুপ্রবেশ ও উত্থানের কাহিনী।' কেবলমাত্র পাশ্চাত্য নয় ভারতীয় নাটকও বহু অভিনীত হয়েছে ওপার বাংলায়। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে বাদল সরকারের কথা। এছাড়া মনোজ মিত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক ও বহু অভিনীত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় অন্য ভাষার নাটক, পশ্চিমবঙ্গে যার অনুবাদ ও অভিনয় হয়েছে, সেইসব নাটকও বাংলাদেশে বহু অভিনয় হয়েছে। যেমন, স্বদেশ দীপকের নাটক সলিল সরকারের অনূদিত 'কোর্ট মার্শাল' বা ভীষ্ম সাহানীর নাটক আশিস গোস্বামীর অনূদিত 'মাধবী'ব বহু অভিনয় হয়েছে।

চার

থিয়েটার এবং আবদুল্লাহ আল-মামুন মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত জীবনকেই নানাভাবে দেখেছেন। 'বিবিসাব'-এর মতো নাটক স্বামী ও পুত্রহারা মরিয়ম বিবির ক্রোধ আর কান্নার সুরেই অনুপ্রাণিত। তবে এ ধরেনের নাটকে মুক্তিযুদ্ধই জীবনের চেয়ে বড়ো হয়ে দেখা দেয়। বরং 'এখন ক্রীতদাস' বা 'তোমরাই' মুক্তিযুদ্ধের চেয়ে সামাজিক জীবনের অবক্ষয়কে দেখিয়েছে অনেক সহজভাবে। কোনো আঙ্গিকগত পরীক্ষা বা বিদেশীয় নাট্যের আলোকে নিজের সমাজকে দেখতে চাননি থিয়েটার এবং আবদুল্লাহ আল-মামুন। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের নাট্যচর্চার এই ধারণাটি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। 'আয়নায় বন্ধুর মুখ' নাটকের রাণার মতো চরিত্রকে খুঁজে পাওয়া কোনো কঠিন কাজ নয়। স্বাধীন বাংলাদেশে যে রাণা সমাজবিরোধীর ভূমিকা নিয়ে নব্যধনীদের তালিকায় নিজের নাম লিখিয়েছে-সেই রাণাকেই রঞ্জু হিসেবে পেয়ে যাই আর একভাবে 'তোমরাই' নাটকে-রঞ্জু সেখানে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির হাতে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্বাধীনতার চেতনাকে পঙ্গু করে দিতেই রঞ্জুরা এ ভাবে ব্যবহৃত হয়। রঞ্জু, রাণাদের সঙ্গে নিজেদের অবস্থানগত সমস্যা মিল খুঁজে পাওয়ার যায় বলেই এই পথ পরবর্তী নাট্যচর্চার এক বিশিষ্ট পথ হয়ে উঠেছিল। সৈয়দ শামসুল হকের 'এখানে এখন' বশীর আল হেলালের 'স্বর্গের সিঁড়ি', আতিকুল হক চৌধুরীর 'দূরবীন দিয়ে দেখুন', গোলাপ অম্বিয়া নূরীর 'কুমারখালির চর', ফরহাদ মজহারের 'ঘাতক দেশকাল' ইত্যাদি নাটকে আছে সমসাময়িক সমাজ ও জীবন, তার দ্বিধাদ্বন্দ্ব, অন্ধকারের দিক।

এই ধরনের নাটকে সর্বদাই রাজনীতির সোচ্চার প্রকাশ নেই যা বলা যায় রাজনৈতিক চেতনার পথেই আলোচ্য অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এই আশাবাদ নেই। মানবিকতার বোধ থেকে জাত বেদনার প্রকাশই উপরোক্ত নাটকগুলোতে রয়েছে। কিন্তু আরণ্যক এবং মামুনুর রশীদ স্পষ্ট রাজনৈতিক বোধ থেকে নাটককে গড়ে তোলেন। তাই তাঁদের নাটকে গাঙ্গেয় অববাহিকায় সর্বহারা শ্রেণিচরিত্রই মুখ্য, মুখ্য তাদের সংগ্রামী চেতনা। মামুনুর রশীদের 'ইবলিশ', 'এখানে নোঙর', 'গিনিপিগ', 'পাথর' প্রভৃতি নাটক শ্রেণিসংগ্রামের চেতনাতেই উদ্বুদ্ধ। কেননা, মামুনুর বিশ্বাস করেন, টিকে থাকে মানুষ আর তার শ্রেণিসংগ্রাম এবং সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস। আবদুল্লাহ আল-মামুন মানবিক বোধ থেকে বেশির ভাগ নাটক লিখলেও 'এখন ও ক্রীতদাস'-এর মতো নাটক শোষকের বিরুদ্ধে সর্বহারা মানুষের রুখে দাঁড়াবার মতো নাটকও লিখেছেন। সেলিম আল দীন আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যস্ত থাকলেও 'করিম বাওয়ালীর শত্রু অথবা মূল মুখ দেখা' যা 'কিত্তনখোলা'-য় এই প্রতিবাদী সংগ্রামকেই প্রধান্য দিয়েছেন। হয়তো মামুনুরের মতো রাজনৈতিক দীক্ষা থেকে এই নাট্যভাষ্য রচনা করেননি কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক নাট্যচর্চায় আবদুল্লাহ আল-মামুন এবং সেলিম আল দীনের এই প্রয়াস অবশ্য স্বীকার্য।

একই সঙ্গে উচ্চারিত হতে পারে মমতাজউদ্দীন আহমেদের নাম। তাঁর লেখা 'সাত ঘাটের কানাকড়ি', রাজীব হুমায়ুনের 'নীল পানিয়া', আবদুল মতিন খানের 'মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব', 'সম্মেলন', কবীর আনোয়ারের 'জনে জনে জনতা' ও 'পোস্টার', এস.এম. সোলায়মানের 'ইঙ্গিত' ও 'এই দেশে এই বেশে', মান্নান হীরার 'খেলা খেলা', 'আগুন মুখা', 'একাত্তরের ক্ষুদিরাম', 'ভাগের মানুষ', আজাদ আবুল কালামের 'সার্কাস সার্কাস' ইত্যাদি নাটক বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় রাজনৈতিক থিয়েটারের ধারাকে সজীব রেখেছে গত তিরিশ বছর ধরে। রাজনৈতিক ভাবনার সঙ্গে কখনো মিশেছে ইতিহাস, পুরাণ ও লোককথা। তারই আলোকে কখনো কখনো রাজনীতির ভাষাই রচনা করেছেন নাট্যকার। সৈয়দ শামসুল হকের 'নূরলদীনের সারাজীবন' সঈদ আহমেদের ' শেষ নবাব', সেলিম আল দীনের 'অনিকেত অন্বেষণ' এবং আবদুল্লাহ হেল মাহমুদের 'প্রাকৃতজন কথা' সবিশেষে উল্লেখ্য।

পাঁচ

গত তিরিশ বছরে বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় ঐতিহ্য অনুসন্ধান এবং আঙ্গিকের স্বকীয়তা নির্মাণের প্রয়াস লক্ষণীয় ঢাকা থিয়েটারের নাট্যকর্মে। প্রযোজনা স্বতন্ত্র এক ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এঁরা। নাট্যকার সেলিম আল দীন মনে করেন, নাট্যচর্চার এই ইতিহাস লুকিয়ে আছে বাংলাদেশের মঙ্গলকাব্য, পাঁচালির আর লোকগানের মধ্যে। তাই সেই নাট্যনির্মাণের প্রয়াসই কাম্য সেলিম আল দীনের। নাট্যরচনার এই নবীনত্বকে থিয়েটারের ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন নাসিরুউদ্দীন ইউসুফ এবং ঢাকা থিয়েটার। তাঁদের প্রযোজিত 'কিত্তনখোলা', 'কেরামত মঙ্গল', 'হাত হাদাই' যৈবতী কন্যার মন', 'বনপাংশুল' ইত্যাদি নাটকের মধ্যে কাব্য বর্ণনাত্মক নাট্যরীতি, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ শিল্পচিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করছেন। ঐতিহ্যে আধুনিক নির্মাণে আরও যারা সমৃদ্ধি এনেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম সৈয়দ জামিল আহমেদ, মীর মশারফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' উপন্যাসের বিপ্লব বালা-কৃত নাট্যরূপের নাট্যনির্মাণে তিনি অসামান্যভাবে সফল হয়েছেন। তাছাড়া, এস.এম. সোলায়মানের 'এই দেশে এই বেশে' নাটকে উত্তর বাংলার গম্ভীরা গান নির্ভুল সংলাপ রচনা ও মমতাউদ্দীন আহমেদের 'রাজা অনুস্বারের পালা' ময়মনসিংহ গীতিকার রূপকল্প ব্যবহারে স্বতন্ত্র রূপনির্মাণে সমর্থ হয়েছে, গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের নাট্যচর্চার সমর্থ একটি ধারা।

ছয়

অন্যদিকে রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ অথচ আঙ্গিক সর্বস্বতা-বর্জিত নাটকের এই ধারাও বহমান। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করার জন্যে, আকাঙ্ক্ষাকে দমন করে যে শ্রেণি, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে পৃথিবীর বহু দেশেই মঞ্চের বাইরে নাটককে নিয়ে আসা হয়েছে। পথনাটকই নতুন প্রজন্মের কাছে পাল্টা সংস্কৃতির গড়ার প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলাদেশের পথনাটকের চর্চা নতুন মাত্রা সংযোজন করছে। ১৯৭৬-এ চট্টগ্রামে মিলন চৌধুরীর 'যায় দিন ফাগুন দিন' এবং ১৯৭৭-এ ঢাকায় সেলিম আলদীনের 'চর কাঁকড়ার ডকুমেন্টরি' দিয়েই সম্ভবত পথনাটকেব চর্চা শুরু। তার পর থেকে পথনাটকের চর্চা নিয়মিত হতে থাকে। ১৯৮৮সালে প্রথম যে পথনাটক উৎসব হয় তাতে অংশগ্রহণকারী দলের (নাটকের) নাম উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে সারাদেশ জুড়েই পথনাটকের চর্চা কেমন প্রবাহমান: নারায়ণগঞ্জের পদাতিক নাট্যসংস্থা ('মহারাজার অবস্থান'), ঢাকার পদাতিক নাট্যসংসদ ('রাজা ক্যানিয়ুট),ফরিদপুরের সুনিয়ম নাট্যচক্র ('কাকলাস'), ঢাকা পদাতিক ('খ্যাপা পাগলার পাঁচালি'), মুন্সীগঞ্জের অনিয়মিত নাট্যগোষ্ঠী ('টোকাই এবং ধোকাই'), ঢাকা লিটল থিয়েটার ('সন্ত্রাস'), বরিশালের শব্দাবলী ('যুদ্ধ হবে আবার'), লায়ন থিয়েটার ('স্বাধীনতার ময়না তদন্ত'), মহাকাল ('মাকড়সার জাল ছেঁড়ার পালা'), ঢাকার সংলাপ গ্রুপ থিয়েটার ('পদধ্বনি'), ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাহিত্য একাডেমি ('পথে পথে প্রতিধ্বনি'), বরিশাল গ্রুপ থিয়েটার ('বোমাতঙ্ক'), আরণ্যক ('নীলা'), খুলনা থিয়েটার ('পাবলিক সার্ভেন্ট'), ফরিদপুর বৈশাখী নাট্যগোষ্ঠী ('সবুজ সেই ছোটো গ্রাম'), ঢাকা বির্বতন ('হাজার দিনের একদিন'), চট্টগ্রামের গণায়ন নাট্যসম্প্রদায় ('অবশেষে জেনারেল'), নাট্যচক্র ('রিমোট কন্ট্রোল'), রঙপুরের সারথী ('ভেড়ার পাল'), প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যগোষ্ঠী ('রাজকাহিনী'), সুবচন নাট্যসংসদ ('পাঁচ শয়তানের ব্লাড প্রেসার'), ঢাকা নাট্যম ('গণতন্ত্র'), সিরাজগঞ্জের দুর্বার নাট্যগোষ্ঠী ('কাকলাস'), লোকনাট্যদল ('রথযাত্রা'), থিয়েটার (কুরসী), কারক নাট্য সম্প্রদায় ('জাগে লক্ষ নূর হোসেন')। ও দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং মৌলবাদের প্রাধান্যের জন্যই পথনাটক এবং পথের অন্য নাট্যধারার প্রসার বেড়েই চলেছে। উল্লেখিত নাট্যদলগুলো ছাড়াও বহু দল আছে যাদের চর্চার বিষয় পথনাটক এবং এর সঙ্গে গ্রাম থিয়েটাব ও মুক্ত

নাটক। এই ত্রয়ী এক ধরনের রাজনৈতিক তাৎপর্য এনে দিয়েছে। সব মিলিয়ে 'খোলা নাটক' একটি বিশিষ্ট ধারা হিসেবে পরিচিত। সাজেদুল আওয়াল একটি প্রবন্ধে লিখেছেন—'পাল্টা সংস্কৃতি নির্মাণের জন্য খোলা নাটক সবচেয়ে ফলদায়ক ও প্রভাব বিস্তারকারী মাধ্যম। খোলা নাটক বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে সেই নাটকের কথা, যে নাটক অডিটোরিয়ামের বাইরে যে কোনো জায়গায় অভিনীত হয়। সে হতে পারে কোনো বাড়ির আঙিনায়, কোনো পথের মোড়ে, ফসল তুলে নেওয়া মাঠে'। প্রক্রিয়াগত ভাবে সামান্য ভিন্নতা থাকলেও উদ্দেশ্যগতভাবে এই ত্রয়ীর চরিত্র একই। পথনাটকের সঙ্গে ঢাকা থিয়েটারের গ্রাম থিয়েটার বা আরণ্যকের মুক্তনাটক ভিন্নতর কোনো ধারা নয়। শহরের মধ্যবিত্ত মানুষের বাইরে বৃহত্তর মানুষের কাছে থিয়েটারকে পৌঁছে দেওয়ার এবং অধিকারহীন মানুষকে অধিকার-সচেতন করে তোলাটাই এই থিয়েটারের উদ্দেশ্য। ঢাকা থিয়েটার ও আরণ্যকের এ বিষয়ের বক্তব্য হল :

ঢাকা থিয়েটার—'শুধু শহরে নয়, এদেশের গ্রামে গঞ্জে নিয়মিত নাট্যচর্চার বিকাশ ঘটাতে হবে। নাটককে যদি গ্রামে নেওয়া যায়, যদি কৃষক শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের জীবনকে ঘিরে গড়ে ওঠে আমাদের নাটক, নাটকের চর্চা তবেই এদেশের সামাজিক পরিবর্তনের পথ সুগম হবে।'

আরণ্যক—'মুক্ত নাটক যদি জনজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধি করতে না পারে, তাহলে তা কাজ করবে জনগণের শত্রুর অস্ত্র হিসেবে।'

পথনাটকের চর্চায় সফদর হাশমির অনুপ্রেরণা ছিল অপরিসীম। সফদরের নাটক প্রযোজিত হয়নি এমন কোনো জেলা নেই। পাশাপাশি এই ধারার নাট্যকার হিসেবে মান্নান হীরা যথেষ্ট সফল। তাঁর লেখা 'ক্ষুদিরামের দেশে', 'ফেরারী নিশান', 'ঘুমের মানুষ', 'মৃগনাভি', 'আদাব', 'শেকল', 'ইঁদারা', 'বৌ', 'জননী বীবাঙ্গনা', 'মণিমুক্তা', 'একাত্তরের রাজকন্যা' বহু অভিনীত ও দর্শক নন্দিত হয়েছে। গ্রাম থিয়েটারের এবং মুক্ত নাটকের এমন কোনো তালিকা উল্লেখ করা যাবে না। কারণ তাৎক্ষণিক সমস্যা ও প্রতিক্রিয়া থেকেই এই নাটকের সৃষ্টি। ফলে সুনির্দিষ্ট কোনো পাণ্ডুলিপি নেই। প্রয়োজনের দিক থেকে অত্যন্ত উপযোগী হওয়ায় এই নাট্যধারায় জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শোষক ভয় পেতে শুরু করেছে। তারই প্রমাণ মেলে পাবনা জেলায় দুজন নাট্যকর্মীকে দশদিন ধরে বন্দি করে রাখার মধ্যে এবং ঊনত্রিশ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করার মধ্যে।

মঞ্চনাটকের পাশাপাশি 'খোলা নাটক'-এর এই জোয়ারও কিন্তু নতুন করে থিয়েটারের দর্শক গড়ে তুলতে পারেনি—অথচ খোলা নাটকের চর্চার এটাও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। যে উচ্চবিত্তের দর্শকের মধ্যে বাংলাদেশের থিয়েটার পড়ে আছে, তার বাইরে থিয়েটারকে হয়তো সামান্য হলেও পৌঁছে দেওয়া গেছে, কিন্তু থিয়েটারের সার্বিক ক্ষেত্রে দর্শক আনুকূল্য জোটেনি। হয়তো এই অভাব থেকেই আগামী থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে শিশুনাট্যচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন সকল থিয়েটার কর্মী ; তার ফলে শিশুনাট্যচর্চার সমৃদ্ধ এক ধারা গড়ে উঠেছে।

সাত

বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় একটি বিশিষ্ট ধারা শিশু-কিশোর নাট্যচর্চা। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই এই নাট্যচর্চা শুরু হয়ে যায়। ১৯৭৩ সাল থেকেই শিশু-কিশোর নাট্যচর্চার কথা জানা যায়। মুন্সীগঞ্জের অনিয়মিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ওই বছর থেকে তাদের কাজ শুরু করে। তবে ঢাকায় ১৯৭৮ সালে ব্যতিক্রম চিলড্রেন থিয়েটার নিয়মিত কাজ করে শুরু করে দেয়, সরকারিভাবে ১৯৭৭ সাল থেকেই শিশু-কিশোর জাতীয় নাট্যোৎসবের আয়োজন করা হয়। তারপর দীর্ঘদিন এ ধরনের কোনো উৎসব হয়েছে বলে জানা না গেলেও ছোটো ছোটো উৎসব বেসরকারি ভাবে হচ্ছে।

তবে ১৯৯৫ থেকে নিয়মিত এক বছর অন্তর এই জাতীয় নাট্যোৎসবের আয়োজন চলছে। ১৯৯৫-এ ২১ টি, ১৯৯৭-এ ২৫ টি এবং ১৯৯৬-এ ৪৬টি নাট্যদল অংশগ্রহণ করেছে। একটি হিসেবে জানা যায় এখন প্রায় ৭০ টি নাট্যদল কমবেশি নিয়মিত শিশু-কিশোর নাট্যচর্চা করছে। এই উৎসবের প্রধান ভূমিকা যাঁর সেই লিয়াকত আলী লাকী এই ধরনের নাট্যচর্চার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন—
'শিশুদের মুক্ত জীবনের জন্য নাট্যচর্চা এক সময় অপরিহার্য নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে। শিশু নাট্যচর্চার সাথে জড়িত থেকে শিশুরা যেমন সমৃদ্ধ হতে পারে তেমনি সংস্কৃতির এ ধারাকে সমৃদ্ধ করতে পারে। শিশুরা বড়ো হবে, বড়ো হয়ে গ্রুপ থিয়েটারকে সমৃদ্ধ করবে। নিজেকে সুন্দর মানুষ করে গড়ে তুলবে। তারা চায় তারা গড়বে সুন্দর দেশ। সুন্দর দেশে, সুন্দর সংস্কৃতি ও সুন্দর মানুষ নিয়ে মোকাবেলা করবে একবিংশ শতাব্দীকে।' সুতরাং বাংলাদেশের মূল নাট্যচর্চা থেকে শিশু-কিশোর নাট্যচর্চাকে কোনোমতেই আলাদা করে নেওয়া যাবে না। মূল নাট্যচর্চার ভিন্ন ভিন্ন স্রোদের সঙ্গে এই স্রোতটিকেও মিলিয়ে দেখতে হবে। নচেৎ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বিগত তিরিশ বছরের বাংলাদেশের নাট্যচর্চার ইতিহাস।

আট

এই ইতিহাসের সঙ্গে বাংলাদেশের নানা প্রান্তের নানা নাট্যদল সক্রিয় উদ্যোগে জড়িয়ে আছে। শিশু-কিশোর নাট্যচর্চায় যেমন ঢাকা, যশোর, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী প্রভৃতি জেলার দলগুলো কাজ করে চলেছে তেমনি মূল নাট্যচর্চায় উল্লিখিত নাট্যদলগুলো ভিন্ন ভিন্ন নাট্যদর্শনের ধারাকে বয়ে নিয়ে চলছে। আলোচ্য প্রবন্ধে সেই সব দলের উল্লেখ থাকাটাও জরুরি। নব্বইয়ের দশকে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে এমন কয়েকটি দলের অন্যতম। ঢাকার সুবচন, মতিঝিল, থিয়েটার, রঙ্গনা নাট্যগোষ্ঠী, শৈবাল নাট্যচক্র, ঢাকা নাট্যম, দেশনাটক, নান্দনিক, ঢাকা পদাতিক, নাট্যচক্র, লোকনাট্যদল, সি. এ. টি, প্রাচ্যনাট্য ইত্যাদি ; চট্টগ্রামের অরিন্দম নাট্যসম্প্রদায়, গণায়ন নাট্যসম্প্রদায়, থিয়েটার ইউনিট, তির্যক নাট্যদল, তির্যক নাট্যগোষ্ঠী, থিয়েটার '৭৩, নারায়ণগঞ্জ থিয়েটার, রঙপুরের সারথী, সিলেটের কথাকলি, বরিশাল নাটক, ফেনীর সুবচন নাট্যদল, রাজশাহীর অনুশীলন নাট্যদল '৭৯, খুলনা থিয়েটার, কুষ্ঠিয়ার অনন্যা '৭৯, সিরাজগঞ্জের তরুণ সম্প্রদায়, বগুড়া থিয়েটার, কুমিল্লার জনান্তিক সম্প্রদায় ইত্যাদি।

নয়

ঢাকার বাইরে অন্য দলগুলির নাট্যচর্চার পথ কিন্তু এতটা মসৃণ নয়। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামের নাট্যচর্চায় দর্শক এবং আর্থিক সুবিধা কিছুটা সহজলভ্য হলেও অন্যত্র খুব কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে নাট্যচর্চা করতে হয়। সেখানেও দশটির বেশি একটি নাটকের মঞ্চায়ন খুব কম নাট্যদলের ভাগ্যে জোটে : সেখান্যে নাট্যকর্মীর অভাব, অভিনেত্রীর অভাব খুব প্রকট না হলেও আছে। দর্শককে ধরে আনতে হয়, আছে অর্থ সংকট এবং মঞ্চ সংকট। সর্বোপরি মঞ্চোপযোগী নাটকের অভাব। পশ্চিমবঙ্গের মফস্বল নাট্যচর্চার সঙ্গে কলকাতা কেন্দ্রিক নাট্যচর্চার যে অবস্থানগত বাস্তব প্রভেদ ওপার বাংলাতেও তাই। হতাশা দানা বাঁধছে সেখানকার নাট্যকর্মীদের মধ্যে। এই হতাশা কেবলমাত্র ঢাকার বাইরের জেলাতেই নয়, বর্তমানে ঢাকাতেও একই অবস্থা। গুটিকয় দল ছাড়া অন্যরা দর্শকশূন্য অবস্থায় নাটক করেন (লেখক নিজেও সাক্ষী। সি. এ. টি. প্রযোজনা এম. কে. রায়নার 'বুনোহাঁস' প্রযোজনাটি দেখেছি জনাদশেক দর্শকের মাঝে)। বিশ্বকাপ ক্রিকেটের একমাস সময়ে সমস্ত থিয়েটার বন্ধ ছিল। কোনো নাট্যদল হল নেয়নি, দর্শক হবে না ভেবেই।

কেন এই দর্শকহীনতা? ঢাকার মতো থিয়েটারের পীঠস্থানের সিনেমা-টিভির জনপ্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রীরাও পারছেন না দর্শক টানতে। আসলে স্বাধীনতা পরবর্তী মুক্তিযুদ্ধের আবেগ যে নাট্যআন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল তা এখন নেই। সেই সময়ের যে দর্শক আবেগ নিয়ে নাটকের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল আজ আর সেই দর্শক নেই, নেই সেই নাটকের আবেগও। নতুন প্রজন্মের দর্শকের কাছে পৌঁছবার মতো নাটক নেই মঞ্চে। এমনকী স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময়েও নাটকের যে জোয়ার এসেছিল বর্তমানে তা-ও নেই। মুক্তিযুদ্ধ ফেরত যে সব মানুষ নাটককে বেছে নিয়েছিলেন হাতিয়ার হিসেবে তাঁরা এখন অনেক বেশি ব্যস্ত জীবিকার তাগিদে, বৈভবের কাছে, তাদের সময় নেই সময় নষ্ট করবার। নাটকের তরণী বেয়ে তাঁরা এখন প্রথম শ্রেণির নাগরিক; বৈভব বিলাসে অস্ত গেছে মুক্তিযুদ্ধের আবেগ। নাট্যে আর ফিরে আসে না কোনো আগুনের ফুল। ফলে নতুন প্রজন্মের নাট্যকর্মীর কাছে তারা কোনো 'আইডিয়াল ক্যারেকটার' নয়। দল ভাঙছে, নতুন দল তৈরি হচ্ছে, বড়োদের প্রতিষ্ঠার প্রতি লালসায় নিজের ক্ষমতার বিচার না করেই প্রতিষ্ঠার জন্যে, বৈভব আহরণের জন্যে, বিদেশে পাড়ি দেবার জন্যে চেষ্টাটাকেই মুখ্য করে তুলছে। ফলে নতুন প্রজন্মের নিষ্ঠার অভাবে রক্তহীনতায় ভুগছে আজকের বাংলাদেশের নাট্যচর্চা। একটি-দুটি ব্যতিক্রমী কাজের কথা হয়তো শোনা যায়, কিন্তু থিয়েটারের প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসে না কোনোমতেই।

অন্যদিকে থিয়েটারের এই দীনতার জন্য স্বাধীনতা পরবর্তী নাট্যধারার জনকদের সরাসরি দায়ী করছেন একশ্রেণির নবীন প্রজন্ম; আবদুল্লাহ আল-মামুন সম্পর্কে এঁদের বক্তব্য হল, 'এ হেন প্রতিক্রিয়াধর্মী নাটকগুলোর সাহায্যেই কিন্তু এদেশে নিয়মিত নাট্যচর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল এবং বলা বাহুল্য, দর্শকের আনুকূল্যও পেয়েছিল। যার ধারাবাহিকতায় আজ মহিলা সমিতি বা গাইড হাউসে 'মিলনায়তন পূর্ণ' ঘোষণা লটকে থাকে। এখন প্রশ্ন কী উপায়ে এ নাট্যকার তাঁর নাটকে দর্শক ধরে রাখেন? বোধ করি, এর একটি প্রধান কারণ হল তাঁর মেলোড্রামা রচনার ক্ষমতা। এ ভদ্রলোক আজ পর্যন্ত যত নাটক লিখেছেন মঞ্চে এবং টেলিভিশনে—সবই এই দোষে দুষ্ট।'

মামুনুর রশীদ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সর্বহারার প্রতিরোধ-চেতনাকে রূপায়িত করতে গিয়ে নাট্যকার মামুনুর রশীদ তাঁর নাটকে শিল্পবোধকে বিসর্জন দিয়েছেন, যা আকাঙ্ক্ষিত ছিল না।'

সেলিম আল দীন সম্পর্কে মন্তব্য, 'দেবী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মধ্যযুগের কবিরা যে আঙ্গিকের সাহায্যে গ্রামের সরল মূর্খদের আট রাত ধরে ঘুম পাড়ানিয়া গান শোনাতেন বিংশ শতকের এই নাট্যকারও মহিলা সমিতির দর্শকদেরকে সেই আঙ্গিকেই কেরামত নামক এই এলিয়েনটেড সত্তার পাঁচালি শুনিয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, যে আর্থ-সামাজিক কাঠামো থেকে এবং তাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে এই আঙ্গিকের উদ্ভব ও ব্যবহার—তাকে কি আমরা আজও সেইভাবে ব্যবহার করব? সেইসব কাঠামো পরিবর্তনের সাথে সাথে কি তার উপরি কাঠামো পরিবর্তিত হয়নি?'

সৈয়দ শামসুল হক-এর 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'তিনি নাকি আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে এর চেয়ে ভালোভাবে উপস্থাপন করার কল্পনা করতে পারেননি। না পারারই কথা। যুদ্ধকালীন উন্মাতাল সময়ে কিংবা যুদ্ধের পাঁচ বছর পরেও লণ্ডনে বসে মুক্তিযুদ্ধের নাটক লিখতে চাইলে তাতো হতেই পারে। আর এ জন্যেই মুক্তিযুদ্ধের প্রধান ঘটনাগুলো, যেমন, '৬৯-এর তীব্র গণআন্দোলন, পাকিস্তানীদের নির্মম নৃশংস বর্বরতা, সর্বাত্মক যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড ত্যাগ, দুঃসাহস ও নির্ভীকতা, এদেশী দালালদের সহায়তায় দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা—এ সবের কোনো একটিরও বাস্তব প্রতিফলন তাঁর এ নাটকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবুও দুর্ভাগা বাঙালিকে তাদেরই মুক্তিযোদ্ধা পিতা, পুত্র, ভাই কিংবা সহচরদের কথা বিস্মৃত হয়ে 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' সেই মুক্তিযুদ্ধের নাটক হিসেবে দেখতে হয়।'

এই মন্তব্যগুলিকে যথার্থ বলে মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায়, এই শ্রেণির মন্তব্যকারীরা কিন্তু পাল্টা কোনো নাট্য উদাহরণ গড়ে তুলতে পারেননি। নাটককে যে পথে নিয়ে গেলে নাট্যদশার দীনতা কাটবে তার কোনো উদাহরণ বা পথ দেখান যায়নি। অর্থাৎ আবদুল্লাহ আল-মামুন, মামুনুর রশীদ, সেলিম আল দীন, সৈয়দ শামসুল হকদের চ্যালেঞ্জ জানাবার মতো কোনো প্রতিভা বা কর্মী কিন্তু আসেনি গত তিরিশ বছরে বাংলাদেশের নাট্যমঞ্চে। ফলে চটজলদি যশোলোভের হাতছানিতে উদ্বাহু দৌড়োনো যুবকেরা এখন নত হয়ে আছেন পূর্বজদের কাছেই। নতুন প্রবাহ না আসায় শিল্পের স্থবিরতা আসবেই। পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধতাকে ঠেকিয়ে রাখা যায়নি বলেই তিরিশ বছরেই হতশ্রী চেহারা নিয়ে ফেলেছে নাট্যচর্চার ক্ষেত্রটি। তাই একের পর এক নাট্যদল ভাঙছে, ভালো প্রযোজনা সীমিত হয়ে গেছে আর চাপান-উতোর চলছে পরস্পরের মধ্যে। তার টাটকা উদাহরণ মেলে 'নটনন্দন' পত্রিকার সূচনা সংখ্যায় মামুনুর রশীদের প্রবন্ধটিতে; সেখানে তিনি লিখেছেন, 'আর নবাগতকে যথার্থই সুশিক্ষিত হতে হবে। যদিও এ ক্ষেত্রে বড়ো অন্তরায় হয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষকরাও। প্রথম ছাত্রকে শিক্ষক তাদের নিজেদের প্রচার করা শিক্ষা দ্বারা নাটক সম্পর্কেই এক ভুল ধারণা দিয়ে বসেছে। ছাত্ররা এতে পুলক অনুভব করছে যে, তারাই শ্রেষ্ঠ। ছাত্রদের উপর এই প্রভাব সুদূরপ্রসারী। দেশের নাট্যকার, নির্দেশককে হেয় প্রতিপন্ন করা এদের উদ্দেশ্য। এসব অযোগ্য লোক দেশের নাট্যচর্চাকে পুঁজি করে অধ্যাপক সেজে বসেছে এবং জাতীয় নাট্যশালার ক্ষতিসাধন করছে। কিছু প্রবন্ধের রচয়িতা হন। প্রয়োগিক নাট্যকলায় বস হয়ে এরা শ্মশ্রুমণ্ডিত হতাশায়।' এই মন্তব্যের বিরোধিতায় এখন শিক্ষকরা একত্রিত হয়ে প্রতিবাদে নামবেন বলে স্থির করেছেন।

প্রকৃত কাজটাকে উপেক্ষা করে কাগুজে লড়াইয়ে নাট্যশিল্পেরই ক্ষতি হচ্ছে। তিরিশের উপান্তে এসে বাংলাদেশের নাট্যচর্চা সেই ক্ষতিসাধনকেই লক্ষ্য বলে মনে করছে না এই আশাটুকুই পোষণ করতে চাই। এপার বাংলার আমরাও পঞ্চাশ পেরিয়ে রক্তাল্পতায় ভুগছি। আসুন আমরা দুপারের নাটুকে মানুষেরা পরস্পরের সহযোগে সচেষ্ট হই নাট্যচর্চার পুনরুজ্জীবনে। এই রক্তাল্পতা যে ক্ষণিকের—এটা প্রমাণ করি ইতিহাসের কাছে। সীমান্তের কোনো বেড়া যেন অন্তরায় না হয়ে ওঠে আমাদের বাংলা নাট্যচর্চায়।

আঞ্চলিকতা, জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা ও বাংলাদেশের নাট্যচর্চা

নৃপেন্দ্র সাহা

একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তো ছিলই এপার বাংলার সঙ্গে ওপার বাংলার। সে সম্পর্ক একই জলবায়ু ভৌগোলিক অখণ্ডতায় স্বদেশবাসীর সম্পর্ক। একই আর্থসামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোয় সাংস্কৃতিক অভিন্নতার সম্পর্ক। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর সময় থেকে একই ভাষা, মাতৃভাষা বাংলার সম্পর্ক। তখন থেকে ক্রম বিকশিত অভিজ্ঞতায় আঞ্চলিকতা জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা বোধে আমরা তা একই ছিলাম।

তারপর কুরাষ্ট্রের মূঢ় শাসননীতির আবর্তে অর্থনৈতিক বঞ্চনা থেকেই ব্যবধান বড়ো হতে হতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে আমরা আলাদা হলাম। আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব মনে রেখেও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে ভারতবর্ষকে টুকরো হতে হল। জন্ম নিল বঙ্গদেশকে দু-টুকরো করে পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিমবঙ্গ। অজস্র রক্তপাত আর উদবাস্তু বিনিময়েও দুই বাংলার আত্মিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক কিন্তু ছিন্ন করতে পারে না কুরাষ্ট্রের এই রাজনৈতিক বিভাজন।

স্বাধীন ভারতবর্ষের বুকে পশ্চিমবঙ্গের নিরন্তর গণ আন্দোলন আমাদেরকে শিক্ষিত করল যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতে, আঞ্চলিকতার সার্বিক বিকাশ ঘটিয়েই জাতীয় স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক বোধের সম্প্রসারণে. পশ্চিমবঙ্গের লড়াই ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের অখণ্ড সত্তার জন্য, জাতীয় সংহতি অক্ষুণ্ণ রেখে প্রতিটি ভাষা ধর্ম জাতি উপজাতির সম্যক বিকাশ ঘটানোর জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিশ্লিষ্ট পূর্ববঙ্গ যে অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য পূর্ব পাকিস্তান হল, সেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবি তার পূরণ হল না পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীভূত-স্বৈরাচারিতার জন্য। ধর্মীয় চেতনার ঐক্য, যা প্রকারান্তরে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও যে একই সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠীকেও শ্রেণি বিভক্ত সমাজের আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোয় রেখে শোষণ করে, পূর্ব পাকিস্তানও তার দৃষ্টান্ত। ফলে পূর্ব পাকিস্তান যে পূর্ববঙ্গ, বাংলা ভাষার ঘনীভূত আবেগের ঐক্য বাংলাদেশ, তারা যে বাঙালি, এই জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ হয়ে একুশে আন্দোলনের অনিবার্যতায় মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে একদিন জন্ম নিল স্বাধীন বাংলাদেশ।

আজকের বাংলাদেশ বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক চেতনার এক মূর্ত বলয়। আওয়ামি লিগের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা তাদের দিয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গি। পরবর্তীতে উপর্যুপরি স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বাংলাদেশকে ইসলামিক রাষ্ট্র বলে ঘোষিত হতে দেখেও আমাদের এ রাজ্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা বলতে পারি ধর্মীয় বাতাবরণ তাদের কিছু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের গ্যারান্টি হলেও বাংলাদেশের সংস্কৃতিবান মানুষের মন ও মননে সাম্প্রদায়িকতার বিষ তিলমাত্র নেই। তার কারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ক্রমবিকশিত সাংস্কৃতিক চেতনা। ধর্মীয় রীতিনীতির বর্মটা যে রাজনৈতিক স্বার্থ ও অর্থনৈতিক শোষণের হাতিয়ার এ অভিজ্ঞতা আমাদের দুই বাংলার। দুই বাংলা যখন এক ছিলাম তখনকার। এক বাংলা যখন দুই হলাম সেই এখনকার।

পৃথক পটভূমিতে পৃথক লড়াই। বাংলাদেশটা, তার অন্তর্গত সংগ্রামী মানুষের নিরন্তর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার পকেট হয়ে থাকল বা পকেট হয়ে গেল ; আর আমরা এতদিন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বন্ধু থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার অগ্রণী শিবির জোট-নিরপেক্ষতার শক্তিশালী নেতৃত্ব দিয়েও আজ সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার পকেট হতে চলেছি। তা বলে কী লড়াই থেমে গেছে! না থামেনি।

আমাদের দুই বাংলার নাটক ও থিয়েটারের জগতের দিকে তাকালে দেখা যাবে লড়াই জারি হ্যায়। রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার, আর্থিক শোষণ, সামাজিক বঞ্চনা ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে।

দুই

স্বাধীনতার সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার সংগ্রাম, সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করার সংগ্রাম, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় ঐক্য রচনার সংগ্রাম—সব কয়টি সংগ্রামের ভরকেন্দ্র দুই বাংলার একই ঐতিহ্য সূত্রে—রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলাম।

এ বাংলার কলকাতা রবীন্দ্রসদন ও জেলাপ্রতি রবীন্দ্র ভবন এবং নজরুল মঞ্চের মতো ও বাংলায় হয়তো এত মঞ্চ নেই, কিন্তু পথেঘাটে ও লোকরুচির সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে রবীন্দ্র নজরুল। আঞ্চলিকতার প্রতি টানকে অক্ষুণ্ণ রেখেও জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা বোধে দুই বাংলা আজ সহমর্মী।

আজ বাংলাদেশের জাতীযতাবোধ ও আমাদের ভারতীয় জাতীয়তাবোধের মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকলেও বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি পশ্চিমবাংলার মানুষের একটা পৃথক সম্ভ্রম বোধ তৈরি হয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র তার গড়ে ওঠা ও বেড়ে ওঠার প্রতি আমাদের আগ্রহ আত্মীয়তার আন্তরিকতায় মোড়া।

তিন

এই সাংস্কৃতিক আত্মীয়তা নিয়েই দুই বাংলার থিয়েটারের কতিপয় মানুষ ১৯৯১-র গোড়াতেই এক আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্বের আহ্বানে বাংলাদেশের ঢাকায় মিলিত হয়েছিলাম।

যে রাষ্ট্রসংঘের নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় আজ থেকে ৪৩ বছর আগে আমরা রাজনৈতিক বিভাজনের স্বীকার হয়েছিলাম, আজ তারই এক অঙ্গ সংগঠন ইউনেস্কোর শাখা আই টি আই বাংলাদেশ সেন্টারের ডাকে আমরা যেন এক হলাম ; অন্তত অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ক্ষেত্রে। থিয়েটারের অভিজ্ঞতা।

রাষ্ট্রীয় বিভাজনের পরেও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রীতির সূত্রে দুই বাংলার নাট্যকর্মীরা প্রায়শ আমরা কাছাকাছি থাকি বা হই। ১৯৫৭-র সরকারি শুভেচ্ছা সফর উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বহুরূপী গিয়েছিল ঢাকার বুলবুল চারুকলা কেন্দ্রের সাহায্যার্থে 'ছেঁড়াতার' ও 'রক্তকরবী' অভিনয় করতে। সে উপলক্ষে ঢাকায় বসে শম্ভু মিত্র বলেছিলেন, 'আমরা নাটক করি পাশ্চাত্যের আদর্শে, পাশ্চাত্যের অনুকরণে মঞ্চ সাজাই, পাশ্চাত্যের অনুকরণে গল্প বানাই বা অভিনয় করি। অথচ পুরো প্রাচ্য মহাদেশে শিল্পপ্রকাশের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি আছে, যেটা মোটেই পাশ্চাত্যেব অনুকরণে নয়। . . . আমরা শুধু বুঝতে চাই যে, আমাদের এই মহাদেশের শিল্পমানসে কোন বিশেষ শিল্পরীতি আছে, যাকে শুদ্ধভাবে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করলে আমাদের গভীর কথাগুলো একান্ত করে প্রকাশ করতে পারবো। কারণ পরের ধার কার ভাষায় ব্যবহারিক জীবনের মোটা কাজ হয়তো চালানো যায়, কিন্তু অন্তরের আবেগের যে বহুবর্ণ বৈচিত্র্য আছে তাকে ফুটিয়ে তোলা যায় না। তাই আমাদের এমন একটা থিয়েটার তৈরি করতে হবে যেটা বিদেশীদের চতুর্থ শ্রেণীর অনুকরণ নয়, একেবারে আমাদের নিজস্ব এবং বিশিষ্ট থিয়েটার। জাপানে সে রকম থিয়েটার আছে। চীনে আছে। আমাদের এই দুটি দেশের ঐতিহ্যও আছে।

'যেমন বিলিতি ছবির এনাটমীর মাঝে বা দৃশ্য সংস্থানের আদর্শে আমরা প্রাচ্যের ছবি বিচার করি না, তেমনি আমাদের নাটকও বিলিতি নাট্যসাহিত্যের মাপ অনুযায়ী বিচার হবে না। বিচার হবে তার রসবস্তুর ওপরে, তার আত্মপ্রকাশের মাপে।

'তাই আমরা অনেক দিনই আশা করছি, যে আমরা পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের নাটক নিয়ে আসবো। কারণ দেশজ সংস্কৃতির মূল এই পূর্ব পাকিস্তানে গভীর ও বহুদিনজাত, এখানকার শিল্পীরা

সেই ঐতিহ্য স্মরণ রেখে নতুন সংস্কৃতির রূপকার। এখানে মাটির গন্ধ জলের গন্ধ পূর্বে যেমন লোকগাথায় প্রকাশ পেয়েছে আজও তেমনি পাচ্ছে এবং আরো ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেতে চাচ্ছে।

'আমরাও তাই আমাদের এই নাট্যবোধকে সেই যাচাই করে জানতে এসেছি যে আমরা ঠিক পথে কতোটা এগিয়েছি।'

এরপরে শ্রীমিত্র যা বলেছেন তা আমাদের উভয়দেশের থিয়েটারেরই অনুসন্ধান, উপলব্ধি ও অর্জনের বিষয়। শ্রীমিত্র বলেছেন, '... এ কাজ আমাদের সকলের, প্রাচ্যের থিয়েটারকে উপলব্ধি করার, তাকে আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে রূপ দিয়ে নতুন করে সৃষ্টি করবার'[১]। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে, ঢাকা তখন পূর্ব পাকিস্তানে। বাংলা ভাষা ও বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের লড়াই শুরু হয়ে গেছে বহুরূপী গিয়ে ঢাকায় নাটক করার অন্তত পাঁচ বছর আগে। চট্টগ্রামের কুমার প্রীতীশ বলের লেখার[২] সাহায্যে বলা যায় 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরেই পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতির অঙ্গনে একটা জোয়ার এসেছিল। অনেক দিনের খরা ও অজন্মার পর কী শহর কী গ্রামাঞ্চল সর্বত্র নাচ, গানের ঢল নামে। তার সাথে এলো নাট্যাভিনয়, যা এতোদিন এখানকার মুসলমান সমাজের কাছে নিষিদ্ধ বলেই গণ্য ছিল।' পূর্ব পাকিস্তানের ধর্মীয় বাতাবরণ কাটিয়ে সেখানকার মানুষজন যখনই আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে নিল তখন থেকেই শুরু হয়েছিল ঐস্লামিক শাসকগোষ্ঠীর দমন পীড়ন। শ্রীবলের লেখার সাহায্যেই বলা যায়, '১৯৫১ সালে চট্টগ্রামে একটা নীরব সাংস্কৃতিক বিপ্লব হয়ে গেল। এ বৎসর চট্টগ্রামের হরিখোলা মাঠে অনুষ্ঠিত হয় দেশের সর্বপ্রথম প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সম্মেলন। আর এ বৎসরে জন্মলাভ করে 'প্রান্তিক নব নাট্য সংঘ'। এ সময় মহিলারাও (চট্টগ্রামে) এগিয়ে এলেন অভিনয় শিল্পে। 'প্রান্তিক নব নাট্য সংঘ' গণসঙ্গীতের পাশাপাশি জীবন ঘনিষ্ঠ নাটকও পরিবেশন করে সচেতন করার দায়িত্ব পালন করে। '৫৪ সালে ৯২ক ধারা জারি হলে রাজনৈতিক কর্মীদের পাশাপাশি নাট্যকর্মীদের ওপরও নির্যাতন শুরু হয়। ১৯৫৪ সালে ঢাকায় কার্জন হলে ব্যাপক আকারে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক সম্মেলনে চট্টগ্রামের 'প্রান্তিক নব নাট্য সংঘ' কলীম শরাফীর পরিচালনায় 'বিভাব' নামে একটি নতুন আঙ্গিকের নাটক পরিবেশন করে। এ ছাড়া লেডি গ্রেগরী রচিত 'রাইজিং অব দি মুন' অবলম্বনে সলিল চৌধুরী অনূদিত 'অরুণোদয়ের পথে' মঞ্চস্থ করে। এখানে রেলওয়ে শিল্পী সংঘ 'দুঃখীর ইমান' নাটকটিও পরিবেশন করে। ১৯৯৫ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে জে এম সেন হল প্রাঙ্গণে মুনীর চৌধুরী রচিত 'কবর' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।'—এই সেই 'কবর' যা বলা যায় পূর্ববঙ্গের সংগ্রামী মানুষের প্রথম নিজস্ব কণ্ঠস্বর।

এই কণ্ঠস্বর জন্ম নেওয়ার নেপথ্যে এ বাংলার ভারতীয় গণনাট্য সংঘ পরিচালিত গণসংস্কৃতির প্রেরণা ছিল প্রান্তিক নব নাট্য সংঘের সংঘটিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রবর্তনায়। সেই গণসঙ্গীত, সেই 'অরুণোদয়ের পথে' সেই 'বিভাব' এবং 'দুঃখীর ইমান'-এর হাত ধরে ও বাংলায় জন্ম নিয়েছিল 'পার্কের কোণ থেকে' 'কবর' প্রভৃতি নাটক।

নিজস্ব অভিজ্ঞতার নাটক। মামুনুর রশীদের 'বাংলাদেশের নাট্যচর্চা'[৩]-র সাক্ষ্য নিলে দেখা যাবে এ বাংলায় শাসকশ্রেণির অত্যাচারে বাংলার প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনকে বারবার ব্যাহত করার চেষ্টার অনুরূপ অভিজ্ঞতা ও বাংলারও। মামুনুর লিখছেন, 'সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভাগের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নাট্যচর্চার ধারাবাহিকতায় একটা প্রবল আলোড়ন দেখা যায়।... পাকিস্তানের শাসনামলে শিল্প সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন আক্রান্ত হয়েছে, তেমনি নাটকের সুস্থ বিকাশ নানাভাবে প্রতিহত করা হয়েছে।' মামুনুর স্পষ্ট ভাষায় লিখছেন 'কখনো ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা, কখনো পুলিশী সেন্সর দিয়ে কখনো আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় নাট্যচর্চাকে নিয়মিত করতে দেয়া হয়নি।'

মামুনুরের মতন এই রকম স্পষ্ট বক্তাশিল্পী বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন বলেই ওপার বাংলার অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে এপার বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক

রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এত গভীর সহমর্মিতা।

৭১-এ যখন বাংলাদেশ জন্মলাভ করল, তখন রামেন্দু মজুমদারের ভাষায় 'স্বাধীনতা যে একটা জাতির সংস্কৃতিতে কি নতুন প্রাণবন্যা সৃষ্টি করতে পারে, তার উজ্জ্বল উদাহরণ বাংলাদেশের নাটক।... রাজনৈতিক অধিকারের সাথে সাথে অর্জিত হল সাংস্কৃতিক স্বাধিকার।'[৪] ও বাংলার এই নবলব্ধ স্বাধিকার অর্জনের পথে এ বাংলার অভিজ্ঞতাও তাঁদের কাজে লেগেছিল। তার স্বীকৃতি শ্রীমজুমদারের লেখাতেই রয়েছে : 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের অনেক নাট্যকর্মীই কলকাতার গ্রুপ থিয়েটার চর্চার সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পান। সত্তরের দশকের কলকাতার কল্লোলিত নাট্যচর্চা তাঁদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।' এ বাংলার এক নাট্যকার নিখিলরঞ্জন দাস ১৯৮৩-তে যখন ও বাংলায় যান তখন নাট্যচর্চার এই পরিকাঠামোর একটা চমৎকার সাদৃশ্য লক্ষ করে যথার্থই লেখেন:

'আলোয় ঝলমল করছে মহিলা সমিতি। ঢাকা শহরে নাট্যপ্রেমীদের মিলনায়তন। ভেতরের বন্দোবস্ত নয়, মেজাজে একে কলকাতার একাদেমি বলা চলে। সামনে এখানে-ওখানে, নানা দলের প্রযোজনার সুদৃশ্য বিজ্ঞাপন, বোর্ড স্ট্যান্ডে সাঁটা, নাটকের পত্রপত্রিকার স্টল, নাটকের খুচরো আলোচনা, কফি-কর্নার। বেশ জমজমাট। দর্শক চরিত্রও প্রায় কলকাতার একাডেমির দর্শকের মতো।'

কিন্তু বাইরের এই সাদৃশ্য রচনার জন্য তো আর একটা স্বাধীন দেশের নাট্যচর্চা শুরু হয়নি ; ভেতরে একটা তাগিদ ছিল সে তাগিদের চরিত্র এ বাংলার নাট্যকার বন্ধুর চোখ এড়ায়নি। তিনি লিখছেন, '১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের পর সবচেয়ে বেশি করে যেখানে প্রাণস্পন্দন অনুভব করা যাচ্ছে—সে হল প্রগতিশীল নাটক। 'স্বাধীনতা বাংলাদেশকে দিয়েছে নাটকের প্রতি অনুগত একগুচ্ছ ঋজু মেরুদণ্ডনির্ভর কর্মী, স্বাধীনতা দিয়েছে নিয়মিত নাটকাভিনয়। স্বাধীনতা দিয়েছে গণমুখী নাটক।'

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কালের এই গণমুখীন নাট্য আন্দোলনের এক চমৎকার অভিজ্ঞতার বর্ণনা মেলে 'থিয়েটার'-এ প্রকাশিত কুমার প্রীতীশ বলের 'স্বাধীনতাপূর্ব চট্টগ্রামে নাট্যচর্চা' নিবন্ধে : 'একাত্তরের ১৫ই মার্চ চট্টগ্রামে লালদীঘি ময়দানের উন্মুক্ত মঞ্চে পরিবেশিত হয় অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমেদ্-এর নাটক 'এবারের সংগ্রাম' কয়েক লক্ষ দর্শকের সামনে। পরদিন থেকে 'এবারের সংগ্রাম' পথনাটক হিসেবে পরিবেশিত হতে লাগলো শহরের বিভিন্ন এলাকায়। এর মধ্যে আরো একটি নাটক 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' রচনা শুরু করেন মমতাজউদ্দীন আহমেদ, নাটকটি ২৪ মার্চ মঞ্চায়ন করা হয় চট্টগ্রামের প্যারেড মাঠে। দর্শক ছিল প্রায় ৮০ হাজার। নাটক চলাকালীন সময়ে তাদের সোবহান নামে একজন খবর নিয়ে এলেন যে, বন্দরে 'সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্র নামাতে বাধা দিচ্ছে জনসাধারণ। তাই পাকিস্তানী সৈন্যরা গুলী চালাচ্ছে। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে দর্শকদের মধ্যে এবং নাটক শেষে প্রায় দশ হাজার দর্শক স্বাধীনতার যুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বতস্ফূর্তঃ আবেগে মিছিল করে ছুটে যায় বন্দরে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশ নেবার জন্য।'

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে জাত নাট্যদলের মুখ্য ঘোষণাই ছিল 'অস্ত্র ছেড়ে মঞ্চে নেমেছি।'

'নূরলদীনের সারাজীবন'-এর মুখ্য প্রয়োগশিল্পী আলি যাকের-এর ভাষায় : 'বাংলাদেশের নাট্যকর্মীরা সূচনায় বলেছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বন্দুক ছেড়ে নাটক ধরেছি। তার মানে এই যুদ্ধ অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ সংস্কৃতির যুদ্ধ। এই যুদ্ধ তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন মেরুদণ্ড সোজা রেখে, অবক্ষয়ী সমাজে প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তে লালিত সংস্কৃতি পরিপন্থী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে।' ১৯৮৩-তে লেখা এই প্রবন্ধের মুখবন্ধের জায়গায় আলি লিখেছেন, '১৯৭৩-এ কেবল নাটক ভালোবাসার উত্তেজনাতেই নাটক শুরু হয়। এরপর সময় যত এগোতে থাকে, সেই ভালবাসা উপযুক্ততার কষ্টিপাথরে যাচাই করার সময় চলে আসে। এবং নাট্যকর্মীদের অনেক বেশি পরিশ্রমী হতে হয়।' আলি এ ক্ষেত্রে কলকাতার এবং জন্য থিয়েটার করার দৃষ্টিভঙ্গির বন্ধুদের মতো তাঁদের তদানীন্তন পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেছেন। আলিকে এ ক্ষেত্রে মনে হতে পারে তিনি বোধ হয় শিল্পসর্বস্ববাদী। যদিচ এ

অভিযোগ যে ও বাংলার বেশ কিছু নাট্যকর্মীরা তোলেননি, তা নয়। এ সমস্যা এ বাংলার নাট্যজগতেও আছে।

বাংলাদেশের থিয়েটারের কর্মীরা যে স্বাধীনতা যোদ্ধা, সামাজিক দায়বদ্ধ শিল্পকর্মী সে কথা খেয়ালে রেখেও আলি যাকের, থিয়েটার কর্মীরা যে থিয়েটারের প্রতি দায়বদ্ধতার তাগিদেই পরিশ্রমী হতে বাধ্য হয়েছে তার প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করে লিখেছেন, 'তাঁদের বুদ্ধিমত্তাকে নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে আরও সজাগ করে তুলতে হয়। একাধিক নাট্যকর্মী বিদেশে বিভিন্ন নাট্য শিক্ষাকেন্দ্রে হাতেকলমে কাজ শিখে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এবং তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সন্নিবেশ ঘটে ঢাকার মঞ্চে কি অভিনয়ে, কি আলোক পরিকল্পনায়। বছর ছয়েক আগে একটি নাটক কেবল একটি প্রতীকী দৃশ্যসজ্জায় সীমাবদ্ধতায় চুটিয়ে অভিনয় হতো। আর আজ বেশির ভাগ নাটকে, নাটকের ফর্ম অথবা কনটেন্টের সাথে সাজুয্য রেখে মঞ্চ তৈরী করা হয়। অভিনয়ের ছক বাঁধা হয় মঞ্চ এবং বিষয়বস্তুর বিশদ পর্যালোচনার পর। যে কোনো একটি নাটকের কোন বিশেষ চরিত্রসৃষ্টিতে অ্যাক্টিং ওয়ার্কশপও করানো হয় অনেক দলে। দলগত অভিনয়, এই সেদিন পর্যন্ত,—একচেটিয়া ভূষণ ছিলো হাতে গোনা যায় এ রকম দুই কি তিনটে দলের। আর আজ অনেক দলই বলিষ্ঠ টিমওয়ার্ক নিয়ে গর্ব করতে পারেন। অনেক নতুন গ্রুপে প্রচণ্ড শক্তিধর তরুণ অভিনেতার সন্নিবেশ ঘটেছে। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে ঢাকা টেলিভিশনের আজকের সবচেয়ে সফল এবং জনপ্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রীর কোন না কোন নাট্যদলের সাথে সংযুক্ত এবং নিয়মিত মঞ্চাভিনয় করে থাকেন।'

স্বাধীনতা অর্জনের এক দশকের মধ্যে বাংলা দেশের থিয়েটারের প্রয়োগগত এই সাফল্য অর্জনই যদি মূল লক্ষ্য হত তাহলে বাংলাদেশের থিয়েটার বলে কি তার কোনো পৃথক নিজস্ব পরিচিতির জগৎ থাকত? ১৯৫৭-য় শ্রীশম্ভু মিত্র ওপার বাংলায় গিয়ে যে কথা বলে এসেছিলেন সেই 'পাশ্চাত্যের অনুসরণে নয়।. . . আমরা শুধু বুঝতে চাই যে, আমাদের এই মহাদেশের শিল্পমানসে কোন বিশেষ শিল্পরীতি আছে, যাকে শুদ্ধভাবে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করলে আমাদের গভীর কথাগুলো একান্ত করে প্রকাশ করতে পারবো।' শিল্পমানসের সেই নিজস্ব শিল্পরীতির জগৎ আবিষ্কার করা এবং শুদ্ধভাবে উপলব্ধি করে নিজস্ব গভীর কথাগুলো একান্ত করে বলতে পারার লক্ষ্যে বাংলাদেশ গত সাত ও আটের দশক নিজস্ব নাট্যজগৎটি নির্মাণ করতে পেরেছেন বলেই আমার মনে হয়। অন্তত এ বাংলার থেকে আলাদা বাংলাদেশের নিজস্ব নাট্যজগৎ। বাংলাদেশের নাট্যজগতের নিজস্ব ভুবনটি তাঁরা আবিষ্কার কবতে পেরেছেন বলেই এ বাংলার চোখে তাঁরা আর অধমর্ণ নন, না এ বাংলার কাছে, না বিশ্বনাট্য জগতের কাছে। তার অর্থ এই নয় তাঁরা কেবলই আঞ্চলিক। বাংলাদেশের থিয়েটার একই সঙ্গে আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক।

বাংলাদেশ তার নিজস্ব আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোয় নিজের সমস্যাকে যেমন জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন, তেমনই বিশ্ব সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও বিশ্লেষণ করছেন বলেই গত দুই দশকে বাংলাদেশ মৌলিক নাট্যরচনায় একটা সম্মানীয় স্থান অর্জন করেছেন। আজ সেখানে মুনীর চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হল, সেলিম আল দীন, মমতাজউদ্দীন আহমেদ, আবদুল্লাহ আল মামুন, মামুনুর রশীদ, সাঈদ আহমেদ, আবদুল্লাহেল মাহমুদ, ডঃ রাজীব হুমায়ুন, মান্নান হীরা, রবিউল আলম, ডঃ এনামুল হক, নাজমুল আহাসান প্রভৃতি সমর্থ নাট্যকারের সমাবেশ লক্ষ করার মতো।

এই সব নাট্যকারেরা যে সব মৌলিক নাট্যরচনা করেছেন তার প্রয়োগেও বাংলাদেশের নির্দেশকবৃন্দ আধুনিক বিশ্বমানের প্রয়োগ দক্ষতা প্রদর্শনে সচেষ্ট রয়েছেন। এঁদের অনেকেই দেশবিদেশের অভিজ্ঞতা সংগ্রহের পাশাপাশি নিজস্ব জলবায়ু মাটিতে লালিত যে লোকবৃত্তের নাট্যপ্রয়োগ রীতি বর্তমান, তার পুনরাবিষ্কার ও সংস্কার করে আধুনিক টোটাল থিয়েটারের ধারণায়

নিজেদের সমৃদ্ধ করছেন। আবদুল্লাহ আল-মামুন, মামুনুর রশীদ, আরিফুল হক, নাসিরউদ্দীন ইউসুফ, আলি যাকের, আতাউর রহমান, আসাদুজ্জানমান নূর, তারিক আনাম খান, গোলাম সারোয়ার, লিয়াকত আলী লাকি, মঃ হামিদ প্রমুখ নির্দেশক আজ বাংলাদেশের প্রথম সারির সমর্থ প্রয়োগশিল্পী। এঁদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ আল মামুন, আরিফুল হকের কাজে বাস্তবতাবাদী অভিনয়রীতির প্রয়োগ দক্ষতা যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনই স্টাইলাইজড রীতিতে কাব্যনাটক প্রয়োগ বা রবীন্দ্রনাটক কিংবা ক্ল্যাসিক প্রয়োগের দক্ষতাও দুর্লক্ষ্য নয়। আলি যাকের স্টাইলাইজড রীতির প্রয়োগে কুশলী প্রয়োগশিল্পী, এর 'নূরলদীনের সারাজীবন' এ বাংলার কাছে কাব্যনাটক প্রয়োগের এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। আরিফুল হকের 'ক্ষতবিক্ষত' প্রয়োগ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবোধের এক মূল্যবান দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। মামুনুর রশীদ এপিক রীতির অভিনয় প্রয়োগে দক্ষতা অর্জন করছেন। বাংলাদেশের তরুণ প্রয়োগশিল্পী আসাদুজ্জামান নূরও এপিক রীতিতে ব্রেশট্ প্রযোজনায় খ্যাত। তরুণ প্রয়োগশিল্পীদের মধ্যে নাসিরউদ্দীন ইউসুফ প্রভূত কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তাঁর একাধিক মহাকাব্যিক নাট্যপ্রয়োগে। জাতীয় অভিনয় বৈশিষ্ট্যের অন্বেষণে এঁর রোমান্টিকতার সঙ্গে সেলিম আল দীনের বর্ণনাধর্মী ব্যালাড রীতির নাট্যরচনা কৌশলের চমৎকার সমন্বয় এ বাংলাকেও উদ্দীপিত করে—'কিত্তনখোলা' 'কেরামত মঙ্গল' এবং সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'হাতহদাই'-এর ত্রিলজি রচনায় এঁরা কীর্তিমান। এর মধ্যে 'হাতহদাই' এক অসাধারণ আধুনিক নাট্য প্রয়োগ—কী বিষয় ও বক্তব্যের প্রগতিশীলতায়, কী প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যের অনুপুঙ্খ বাস্তবতা ও সমগ্রতার রোমান্টিকতায়।

জাতীয় নাট্যবৈশিষ্ট্য উপলব্ধি ও পুনরাবিষ্কার করার যে ভাবনা নাট্যাচার্য শ্রীমিত্রকে একদা উদ্দীপিত করেছিল, যা নিয়ে এ বাংলায় গত দশকে যথেষ্ট তর্ক উঠেছিল, এবং এখনও তার নিষ্পত্তি হয়নি, বরং বলা যায় লোকনাট্য-চর্চার আধিক্য ভারতীয় থিয়েটারে এক বিপদ দেখা দিয়েছে, যার ঢেউ পশ্চিমবাংলাতেও এসে পৌঁছেছে ; সেই জাতীয় নাট্যরীতি খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বোধ হয় কাঙ্ক্ষিত স্থানে সমীপস্থ।

মুনীর চৌধুরীর 'কবর' (১৯৫৫) থেকে আবদুল্লাহ আল-মামুনের 'সুবচন নির্বাসনে' (১৯৭৪) প্রায় দুই দশকের প্রাক্তনী ও অধমর্ণ অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ আজ নিজের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বুকে নিয়ে মৌলিক নাট্যসৃষ্টিতে যে সমৃদ্ধি নির্মাণ করেছেন তাকে জাতির জীবন দর্পণই বলতে হয়।

স্বাধীনতার লড়াই এবং তারপর জাতীয় জীবনের সর্বত্র দুর্নীতি ও স্বৈরাচার যে ভাবে বাংলাদেশের গ্রামনগর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তাকে ক্ষুরধার ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, শ্লেষ ও অনুপুঙ্খ বাস্তবতা, সমাজতান্ত্রিক বাস্তাবতা এবং কাব্যিক ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে নাট্যকার ও প্রয়োগশিল্পীরা যে ভাবে তুলে ধরছেন তাকে শ্রেণিযুদ্ধই বলা যায়। বাংলাদেশের এই মৌলিক নাট্যসৃষ্টির তালিকায় যে নাটকগুলি এ বাংলায় গত দুই দশকের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ মৌলিক নাটকসমূহের পাশে রেখে বিচার করতে হবে নাট্যঐতিহাসিক ও সমালোচকদের, সেগুলি হল আবদুল্লাহ আল মামুনের 'সুবচন নির্বাসনে' (১৯৭৪), 'এখন দুঃসময়' (১৯৭৪), 'সেনাপতি' (১৯৭৯), 'অরক্ষিত মতিঝিল' (১৯৮২), 'এখনও ক্রীতদাস' (১৯৮৩), 'আয়নায় বন্ধুর মুখ' (১৯৮৩), সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' (১৯৭৬), 'নূরলদীনের সারাজীবন' (১৯৮১), 'এখানে এখন' (১৯৮২), 'যুদ্ধ এবং যুদ্ধ' (১৯৮৩) ; মামুনুর রশীদের 'গন্ধর্বনগরী' (১৯৭৭), 'ওরা কদম আলী' (১৯৭৮), 'ওরা আছে বলেই' (১৯৮১), 'ইবলিশ' (১৯৮১/৮৩), 'গিনিপিগ' (১৯৮৫) 'অববাহিকা' (?) ; সেলিম আল দীনের 'মুনতাসীর ফ্যান্টাসি' (১৯৭৬), 'শকুন্তলা' (১৯৭৮), 'কিত্তনখোলা' (১৯৮১), 'কেরামত মঙ্গল' (১৯৮৫), 'হাতহদাই' (১৯৮৯) ; মমতাজউদ্দীন আহমদের 'স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা' শীর্ষক নাট্যত্রয়ী (১৯৭৬), 'ক্ষতবিক্ষত' (১৯৮৬) ; আবদুল্লাহেল মাহমুদের 'নানকার পালা' (১৯৮৭) ; আবদুল মতিন

খানের 'মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব' (১৯৭৮); এস. এম. সোলায়মানের 'এই দেশে এই বেশে' (১৯৯০); ডঃ রাজীব হুমায়ুনের 'নীলপানিয়া' (১৯৯১) প্রভৃতি'।

বাংলাদেশের এই যে নিজস্ব নাট্যভূমণ্ডল যাতে তার নিজের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের রূপায়ণ ঘটেছে, এইসব মৌলিক নাট্যসৃজনের পাশাপাশি বাংলাদেশের আর একটি ধারা হল বিশ্ব নাট্যসাহিত্যের ধ্রুপদী নাটক নির্বাচন ও তার প্রয়োগ পরিচর্যা। এ ক্ষেত্রে এ বাংলার অভিজ্ঞতা ভিন্ন। আমাদের এখানে নিজস্ব দেশ-কাল-পাত্র পরিবেশের সঙ্গে সাজুয্য ঘটিয়ে বিশ্বনাট্য সংগ্রহের বিশিষ্ট কীর্তিগুলোকে প্রায়শই আত্মসাৎ করে নেওয়ার রীতিই প্রবল এবং এ ক্ষেত্রে আমরা কীর্তিমান; তুলনায় মৌলিক নাট্যসৃষ্টির পরিমাণ কম। যদিচ তার গভীরতা অনেক গাঢ় ও প্রভাব বিস্তারী। বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে কথঞ্চিৎ দীন। তার কারণ—তাঁদের অনূদিত বিদেশি নাট্যসৃষ্টির প্রয়োগে তাদের উচ্চারণের আঞ্চলিকতা এ বাংলার শিষ্টজন-মান্য সাধারণ উচ্চারণ রীতির কানে বড়ো পীড়াদায়ক; বিশেষত ক্রিয়াপদে অপিনিহিতির প্রভাব, স ও শ-র প্রায়শ ছ-এর রূপান্তরণ বড়ো বিসদৃশ। দ্বিতীয়ত, প্রয়োগেও নানাবিধ আড়ষ্টতা লক্ষণীয়। তৃতীয় একটি ধারা, ও বাংলার কিছু ছোটো ও মাঝারি নাট্যদলের নাট্য নির্বাচনের মধ্যে লক্ষ করা যায়, সেটি এ বাংলার পটভূমিতে রচিত জনপ্রিয় কিছু পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাটকের প্রয়োগ। প্রতিবেশী নাট্যচর্চার দৃষ্টান্ত হিসেবেই একে বিবেচনা করতে পারলে খুশি হওয়া যেত, কিন্তু যেহেতু কোনো বড়ো দল এ বাংলায় একমাত্র রবীন্দ্রনাট্য ছাড়া অন্য কোনো নাট্যকারের নাটক করেনি, তাই মনে হয় ছোটখাটো দল যখন এ বাংলার নাটক করে, তখন তাঁরা যেন কিছুটা বিজাতীয় প্রসঙ্গের চর্চা করছে বলেই ও বাংলার নাট্য বিশেষজ্ঞদের কদর পায় না।

যেমন আমাদের এ বাংলাতেও সারা বিশ্বের অধুনাতম নাটকও যত দ্রুত এ বাংলায় মঞ্চস্থ হয়ে যায়, কিন্তু ও-বাংলার গত দুই দশকের একটি উল্লেখযোগ্য নাটকও এ বাংলায় কোনো উল্লেখ্য নাট্যদলের প্রযোজনা তালিকাভুক্ত হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ দুই বাংলারই বাংলাভাষায় কেন্দ্রমণি। ও বাংলার রবীন্দ্রনাট্য প্রয়োগে নিজস্ব ভাবনা আছে, বিশ্লেষণ আছে; কিন্তু রবীন্দ্র সংলাপ উচ্চারণের শুদ্ধতা অতীব সতর্কতার মধ্যেও প্রায়শ স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাট্য প্রয়োগে ও বাংলার চেষ্টা আমাদের এ বাংলার মতোই সমান আন্তরিক।

এই আন্তরিকতা নিয়েই ও বাংলা যে কাজটি সরবে ও বিপুল প্রচারসহ করে চলেছে তা হল বাংলাদেশের জাতীয় নাট্যরীতির অনুসন্ধান। শ্রী মিত্র যা রবীন্দ্র নাট্যের সার্থক প্রয়োগের মধ্যে অনুধাবন করেছিলেন, তাঁর সৃষ্ট বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে নিজস্ব অভিনয়ের যে দৈহিক ও বাচনিক ভঙ্গিটি আবিষ্কার করেছিলেন, 'চাঁদবণিকের পালা'-য় যার সম্ভাব্য খসড়াটি নির্মাণ করেছিলেন, সেই জাতীয় নাট্য চরিত্র আবিষ্কারে বাংলাদেশের ঢাকা থিয়েটারের নির্দেশক নাসিরউদ্দিন ইউসুফ ও নাট্যকার সেলিম আল দীন আজ বদ্ধপরিকর :

'আমরা মূলত উনিশ শতকের ইউরোপ প্রভাবিত শহুরে নাটকের যে ধারা বাংলা নাটকে সৃষ্ট হয়েছিল সে সম্পর্কে কম উৎসাহী। আমাদের ঢাকা থিয়েটারও মধ্যযুগের বাংলা নাটকের গঠন স্বরূপটি আবিষ্কার করতে চায়। ...আমরা বাংলা নাটকের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি যে—বাংলা নাটকে বর্ণনাধর্মিতা ও সংলাপ মুখীনতা পরস্পরের পরিপূরক। ...গান দর্শককে চিত্র ও ভাবের দিকে.... পরিবেশ ও অনুভূতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। রবীন্দ্র নাটকেও তাই দেখি গানের উজ্জ্বল ব্যবহার। সে গানে শুধু সঙ্গীত স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে পাই না—সেখানে দেখতে পাই আদি বাংলা নাটকের আঙ্গিক পূজারী আমাদের পিতৃপ্রতিম নাট্য দার্শনিককে। . . . আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি। সেমিটিক মূল্যবোধের বদলে আমরা চাই আধুনিক ও সাবলীল জীবনের নবীন ভাষ্য। দক্ষিণে গর্জায়মান সমুদ্র। কাকে ভয়? ঢাকা থিয়েটার নিশ্চিন্তে পৌঁছে যাবে আদি নাট্য মাতৃকার

উৎসমূলে।"[৭] 'কিত্তনখোলার' ভূমিকায় সেলিম ১৯৮৫-তে যে কথা বলেছেন ১৯৯০-এর 'হাতহদাই'-এ সেই বর্ণনাত্মক গীতল নাট্যভঙ্গিটি আধুনিক টোটাল থিয়েটারের স্থাপত্যধর্মী মঞ্চসজ্জায় বর্ণিল বেশভূষায় নাট্যোক্ত গর্জায়মান সমুদ্রপারের নাবিক জীবনের আলেখ্য রচনায় এক পূর্ণতা পায়।

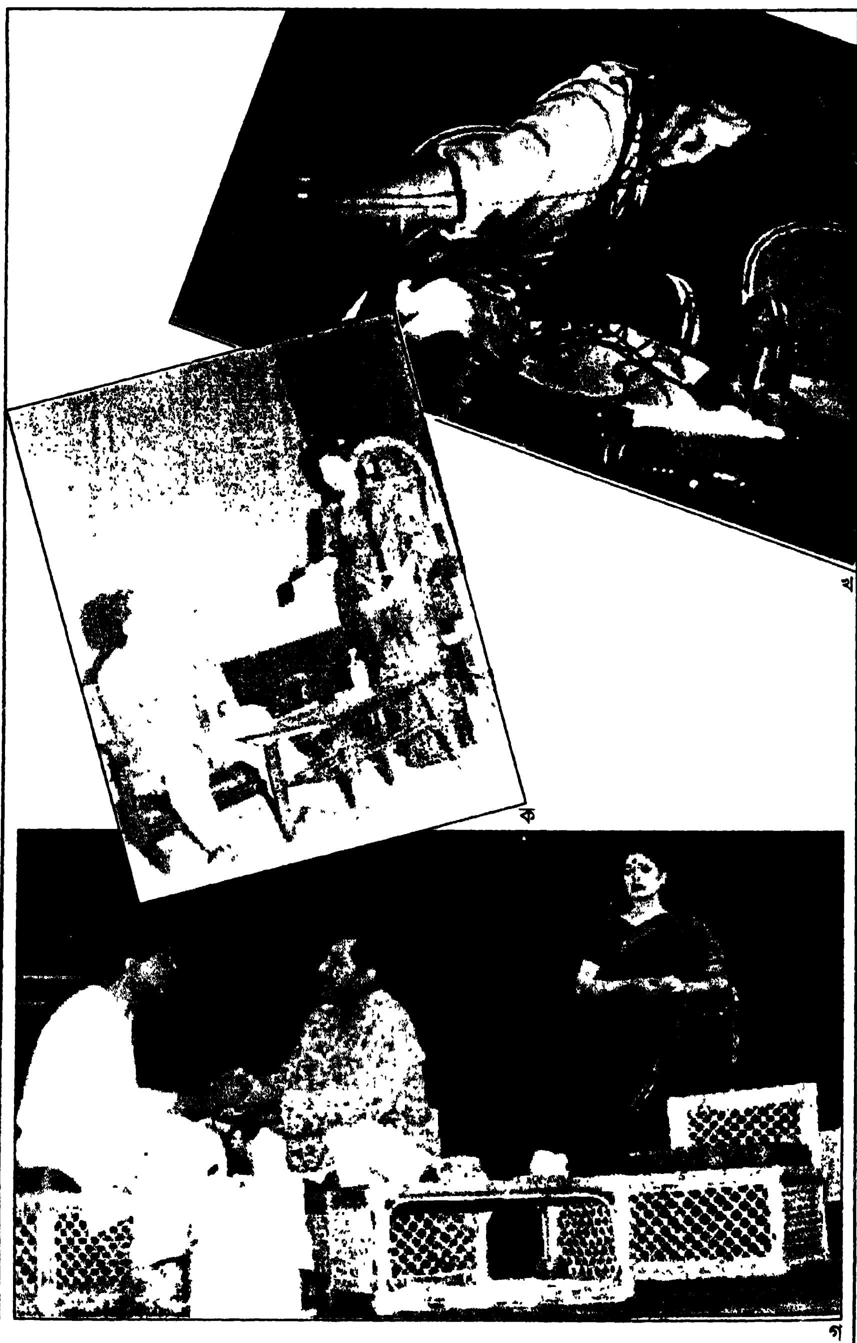
আমরা যাঁরা নাট্য সম্পর্কের আঞ্চলিকতার সন্ধানে ১৯৯১-র জানুয়ারির ঢাকায় উপস্থিত হয়েছিলাম, তাঁরা কেউ এসেছিলাম ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গ থেকে, কেউ থাইল্যান্ড থেকে, কেউ অস্ট্রেলিয়া, কেউ জার্মানি, কেউ বা ইরান থেকে ; তাঁরা সবাই বিস্মিত হয়ে অনুপুঙ্খ বিচারে লক্ষ করেছি, আলোচনা আমরা যাই করি না কেন, যে বাংলাদেশ তার আঞ্চলিক থিয়েটারকে রচনা করতে পেরেছে। নাটকের বক্তব্য, বিষয়বস্তুর মধ্যে শ্রেণি সংগ্রামকে বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন স্বর ও সুরে উচ্চকিত করেও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত থিয়েটার নির্মাণের নিজস্বতায় বাংলাদেশকে যাতে চেনা যায়, এমন মানে তাঁরা পৌঁছে গেছেন তাঁদের নাট্যনির্মাণে।

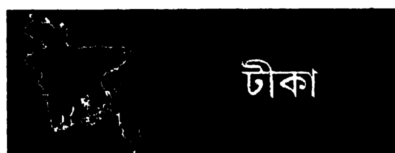
আবদুল কুদ্দুস বয়াতীর গ্রামীণ নাট্য 'পালাগান-এর' ইম্প্রোভাইজেশন আজকের থিয়েটারে যে প্রেরণা দেয়, সেই ইম্প্রোভাইজেশনকে টোটাল থিয়েটারের অঙ্গ হিসেবে মান্য করে—থিয়েটারের 'এখনও ক্রীতদাস' যে শ্রেণিযুদ্ধ রচনা করে কৃষ্ণ-রসিকতার বাস্তবতায়, কিংবা আরণ্যকের কৃষক বিদ্রোহের প্রেরণায় 'নানকার পালা' যখন একালের বাংলাদেশের দিনমজুরের লড়াইয়ে উৎসাহ যোগায় যোগ্য উপমান রচনা করে, অথবা 'হাত হদাই'-র বর্ণিল বর্ণনানাট্যে যখন নোয়াখালির আঞ্চলিকতা সমুদ্র পারের জীবননাট্যে নিজেকে সমর্পিত করে ধর্মীয় সর্ববিধ সংস্কারকে ছুঁড়ে ফেলে সমুদ্রস্নান করে ওঠে, তখন বুঝি আঞ্চলিকতার যথার্থ ও সত্য রূপায়ণ এমন করেই জাতীয় নাট্যের বিশিষ্টতা অর্জন করে। এবং এই জাতীয় নাট্যের মধ্যেই অন্তর্লীন থাকে বিশ্বনাট্য বোধের আন্তর্জাতিকতা। তাই ভাষার ব্যবধান ঘুচে গিয়ে বাংলাদেশের নিজস্ব নাট্যনির্মাণ কত সহজে আপন করে নেয় থাইল্যাণ্ডের ডঃ চুয়া সু পং, অস্ট্রেলিয়ার শ্রীমতী পামেলা পাইন, জার্মান নাট্য সমালোচক উলফ্‌গাঙ্গ রুফ্, ইরানের আবদুল হাই সাম্মাসি-কে। আর ভারতবর্ষ তো প্রতিবেশী রাষ্ট্র ;এখান থেকে যাঁরা গিয়েছিলাম ডঃ বিষ্ণু বসু, অশোক মুখোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও বর্তমান প্রতিবেদক, তাঁরা তো মুগ্ধ হবই।

সূত্র নির্দেশ :

১. সাংবাদিক সম্মেলনে শম্ভু মিত্রের ভাষণ, 'সংবাদ' ১৮ মার্চ ১৯৫৪। সূত্র 'বহুরূপী', স্বপন মজুমদার, পৃঃ ৪১।
২. স্বাধীনতা পূর্ব চট্টগ্রামের নাট্যচর্চা, কুমার প্রীতীশ বল, থিয়েটার, ষোড়শ বর্ষ, ৩-৪র্থ যুগ্ম সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৯১, পৃঃ ৯৮।
৩. বাংলাদেশে নাট্যচর্চা, মামুনির রশীদ, 'থিয়েটারের নাটক' স্মারকগ্রন্থ, থিয়েটার ওয়ার্কশপের দুই দশক পূর্তিতে কলকাতার থিয়েটার-এর আগমন উপলক্ষে প্রকাশিত, ২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬
৪. থিয়েটারের কড়চা, রামেন্দু মজুমদার, 'থিয়েটারের নাটক' স্মারকগ্রন্থ, ঐ।
৫. বাংলাদেশ : বাংলা নাটক, নিখিলরঞ্জন দাস, গ্রুপ থিয়েটার, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অগাস্ট-অক্টোবর ১৯৮৩
৬. বাংলাদেশের নাটক, নাট্যমঞ্চ এগিয়ে চলছে, আলি যাকের, গ্রুপ থিয়েটার, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা অগাস্ট-অক্টোবর ১৯৮৩
৭. এ তালিকা ১৯৯১-এ এই নিবন্ধ রচনার সময়কাল পর্যন্ত। এরপর ১৯৯১ থেকে ২০০১ এর মধ্যবর্তী দশকে আরও একগুচ্ছ মহৎ নাট্যসৃষ্টি করেছেন যার তুলনা এ বাংলাতেও মিলবে না। উপরন্তু তরুণ নাট্যকার লুৎফর রহমান, সাইমন জাকেরিয়া বিপ্লবী আবির্ভাব আমাদের উদ্বেল করে তোলে। সাইমন জাকেরিয়ার 'ন নৈরামণি' চর্যাপদ ভিত্তিক এক অভিনব সৃষ্টি।—লেখক




খ
ক
গ


টীকা



ক



খ

লেখক পরিচিতি

অমলেন্দু বিশ্বাস : ব্রিটিশ ভারতীয় বিমান বাহিনীর চাকরি গ্রহণ করলেও কিছুকাল রেলওয়ে বিভাগে চাকরি করার পর বাবুল অপেরায় অভিনয়ে যোগ দিয়ে নিজের মাধ্যমটি খুঁজে পেয়েছিলেন যাত্রাশিল্পী অমলেন্দু বিশ্বাস। প্রায় পঁচিশ বছর বিভিন্ন যাত্রাদলের অভিনেতা ও নির্দেশক রূপে সুখ্যাতি পেয়েছেন। নায়কের ভূমিকায় তাঁর মধুসূদন, জানোয়ার, লেনিন, অচল পয়সা, ভাওয়াল রাজা সন্ন্যাসী, সিরাজদ্দৌলা, সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রভৃতি পালা আজও অমর হয়ে আছে। চারণিক যাত্রাদলের প্রতিষ্ঠা করেছেন। দেশীয় শিল্পের সঙ্গে বিশ্বের যোগসূত্রের প্রত্যাশায় আই. টি. আই - বাংলাদেশ কেন্দ্রের সদস্য হয়েছেন। জাতীয় সম্মান একুশে পদক তাঁকে মরণোত্তর দেওয়া হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে তাঁর অন্তর্ভুক্ত লেখাটি 'থিয়েটার' পত্রিকা (প্রকাশ কাল : জুন ১৯৮৭) থেকে সংকলিত।

অরুণ সেন : শিল্প-সাহিত্য নিয়ে একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা অরুণ সেন কলকাতার একটি কলেজ থেকে অবসর নিয়ে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে বাংলাদেশের সাহিত্য পড়াচ্ছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে। 'সাহিত্য পত্র' সম্পাদনা ছাড়াও যুক্ত থেকেছেন 'পরিচয়' ও 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় সম্পাদকীয় কাজকর্মে। বাংলাদেশের নাট্যচর্চা দিয়ে সামগ্রিক মূল্যায়ন কেবলমাত্র 'অনুষ্টুপ'-এ প্রকাশিত হলেও সেলিম আল দীন নিয়ে লিখেছেন অসংখ্য 'প্রতিক্ষণ', 'সংবাদ প্রতিদিন' এবং 'দুই বাংলার থিয়েটার'-এ। বর্তমান লেখাটি 'দুই বাংলার থিয়েটার' পত্রিকার ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৯৯৯ থেকে সংকলিত।

আতাউর রহমান : নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আতাউর রহমান। একাধারে অভিনেতা-নির্দেশক এবং নাটক অনুবাদক। প্রাবন্ধিক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি কম না। আই. টি. আই-এর মূলকেন্দ্র প্যারিসের তিনি ড্রামাটিক থিয়েটার কমিটির বোর্ড ডিরেক্টরদের অন্যতম। শুধু তাই নয় সংস্কৃতির মেলবন্ধনেও তাঁর ভূমিকা অসামান্য। সংকলিত রচনাটি তাঁর বিশ্ব থিয়েটার ও বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথের থেকে থিয়েটার সমৃদ্ধির উপকরণ অনুসন্ধান। লেখাটি ইতিপূর্বে 'নটনন্দন' পত্রিকার সূচনা সংখ্যা, ৭ জুলাই ১৯৯৯-এ প্রকাশিত।

অনন্ত হিরা : বাংলাদেশের তরুণ নাট্যকর্মীদের মধ্যে অনন্ত হিরা অন্যতম। নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে আজও তিনি নিজেকে থিয়েটারে যুক্ত রেখেছেন। 'খাট্টা তামাশা', 'হিম্মতীমা', 'দেওয়ান গাজীর কিস্‌সা' প্রভৃতি নাটকে অভিনেতা হিসেবে অল্পপ্রকাশ ঘটলেও নেপথ্যকর্মে তাঁকে সজীব ও প্রাণবন্ত লক্ষ করা গেছে। নব্বই দশক থেকে 'মঞ্চপত্র' নাট্যপত্রিকা প্রকাশিত হলে তিনি তার নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ইতিমধ্যে নাট্যকলা বিষয়ে লেখালেখি শুরু করছেন অল্প-বিস্তর। বর্তমান লেখাটিতে তাঁর অনুভূতির আত্মপ্রকাশ। লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'থিয়েটারওয়ালা' প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৯-এ।

আফসার আহমেদ : জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রিয় অধ্যাপক রূপে আফসার আহমেদের পরিচিতি হলেও তাঁর বড়ো পরিচয় তিনি একজন দক্ষ গবেষক এবং প্রবন্ধকার। গ্রাম থিয়েটার আন্দোলনে সংযুক্ত তৎসহ ঢাকা থিয়েটারের সদস্য মানুষটি গ্রিক ভাষা, সাহিত্য, নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে থিয়েটারের তত্ত্ব এবং তথ্য আবিষ্কারেই ক্ষান্ত থাকেননি আজও তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন, পাঠগ্রহণ এবং পাঠদান করছেন উপরিউক্ত বিষয়ে। সে কারণে বাংলাদেশের বাংলা একাডেমীর আজীবন সদস্য হিসেবে সংযুক্ত থাকা উভয়ত গৌরবের কথা। বর্তমান গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত রচনাটি বাংলাদেশের জাতীয় নাট্যোৎসব '৯১ (১৯৯১)-এর স্মারক গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

আবদুল্লাহ আল-মামুন : থিয়েটার নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম আবদুল্লাহ আল-মামুন নাটককার হিসেবে বাংলা থিয়েটারে সুপরিচিতি। একাধিক উপন্যাসেরও তিনি রচয়িতা। ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ মাস কমিউনিকেশনের ডিরেক্টর জেনারেল মানুষটি ইতিমধ্যে অনেকগুলি টেলিভিশন নাটক রচনা ও পরিচালনা করে সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছেন। টেলিভিশন ধারাবাহিক শুধু নয় চলচ্চিত্র রচনায় ও তাঁর দক্ষতা প্রমাণিত। পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার ভিন্নধারার নির্মাতা হিসেবে। সমাজ-রাজনীতি ভিত্তিক নাটকের রচয়িতাকে যে নাট্যদল পাদপ্রদীপের আলোয় এনেছে তিনি বলেছেন তারই পঁচিশবছরের স্মৃতিকথা। লেখাটি প্রথম থিয়েটার উৎসব স্মারক পুস্তিকা, নভেম্বর ১৯৯৭-এ প্রকাশিত।

আবদুল্লাহ আল হারুন : বাংলাদেশের বুকে শিশু নাটককে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে এবং জন প্রিয় করার উদ্দেশ্যে পিপলস্ থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে ১৯৯৫ সালে প্রথম বারের মতো জাতীয় পর্যায়ে যে শিশু নাট্যোৎসব আয়োজন করা হয় তার জাতীয় কমিটির অন্যতম সমন্বয়কারী আবদুল্লাহ আল হারুন। তিনি মূলত একজন নেপথ্য কর্মী। প্রথম এবং দ্বিতীয় নাট্যোৎসবে সিম্পোজিয়ামে এবং সেমিনারে বাংলাদেশের শিশুনাট্যচর্চার ইতিহাস নিয়ে তিনি মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন। বর্তমান সংকলনে যুক্ত রচনাটি ১৬-২৩ মার্চ ১৯৯৫, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে প্রকাশিত স্মরণিকা থেকে।

আবুল মোমেন : ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রামে আবুল মোমেনের জন্ম। বর্তমানে স্থায়ী নিবাস। পেশা হিসেবে সাংবাদিকতাকে বেছে নিয়েছিলেন। সেই সূত্রে 'ভোরের কাগজ'-এর চট্টগ্রাম দপ্তরের আবাসিক সম্পাদক। লিখেছেন 'সংস্কৃতির সংকট ও সাম্প্রদায়িকতা' (১৯৯৬)-র মতো একাধিক প্রবন্ধ। ইতিহাস, পরিবেশ, জীবনীমূলক বিষয় তাঁর রচনা তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ১৯৭৯ তে 'লেখাপড়া' নামের একটি গ্রন্থ দিয়ে শিশুপাঠ্যের রাজ্যে প্রবেশ, করেছিলেন, ১৯৮৯-তে কিশোর উপন্যাস 'স্পার্টাকাস' লিখে থেমে যাননি। সেই দৌলতে অগ্রণী ব্যাংকের সৌজন্যে শিশু সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন। বর্তমানে শিশুদের জন্য একটি ব্যতিক্রমী স্কুল 'ফুল্কি'-র প্রতিষ্ঠা করেছেন। বর্তমান সংকলনে অন্তর্ভুক্ত তাঁর লেখাটি 'নাট্যপত্র', ১৯৯৫ থেকে সংগৃহীত।

আলী যাকের : নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়ের মঞ্চ নাট্যের নির্দেশক এবং অভিনেতা হিসেবে আলী যাকের সর্বজন পরিচিত। তবে এযাবতকালে বিশ্বের একাধিক নাটককারের রচনার তিনি অনুবাদক। তার মধ্যে আছেন মলিয়ের, আন্তন চেখভ, বের্টোল্ট ব্রেখট, কাল জুকমেয়ার, ইউজিন ইউনেস্কো, জন অসবোর্ন এবং উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। আই. টি. আই-এর বাংলাদেশ সেন্টারের নেতৃস্থানীয় শুধু নন, তিনি 'লন্ডন স্কুল অফ মিউজিক অ্যান্ড ড্রামাটিক আর্টস'-এ নির্দেশকের ভূমিকায়ও আসীন। একাধিক টিভি নাটকের অভিনয়ে তিনি যুক্ত থাকলেও মঞ্চনাট্যের জন্য তিনি বিভিন্ন সংগঠন দ্বারা সংবর্ধিত। বর্তমান সংকলনে তাঁর রচনাটি বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার উৎসব স্মারক গ্রন্থ, ১৯৭৯ থেকে সংগৃহীত।

আশিস গোস্বামী : পেশায় শিক্ষক আশিস গোস্বামীর থিয়েটার মহলে পরিচিতি একজন অনুবাদক, নাটককার এবং প্রবন্ধকার হিসেবে। এই তিনটি কর্মের গড়ে ওঠার জন্য যে সমালোচক মনের প্রয়োজন তা তিনি থিয়েটার অঙ্গনেই প্রমাণ রেখেছেন সমালোচনা বিষয়ে পি-এইচ. ডি পর্যায়ে গবেষণা করে। ইতিমধ্যে ভারত বাংলাদেশে তাঁর গবেষণার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। করেছেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পত্রিকায় ব্রেখট বিষয়ে এবং বাংলাদেশের আরণ্যক নাট্যদল গিয়ে একটি গবেষণা। বর্তমান রচনাটি 'বহুরূপী' পত্রিকায় ৯২ সংখ্যায়, অক্টোবর ১৯৯৯-এ প্রকাশিত।

আশুতোষ দত্ত : জনাব এহিয়ার সহযোগী লেখক আশুতোষ দত্ত ১৯২৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন বগুড়া জেলার চকরতিনাথ গ্রামে। রঙপুর শহরের স্থায়ী বাসিন্দা। পেশায় চিকিৎসক হলেও রঙপুরের নাট্যজগতের একজন বর্ষীয়ান শ্রদ্ধেয় নাট্যকর্মী। নাটক রচনাতেও দক্ষতা দেখিয়েছেন সৈয়দ শামসুল হকের গল্প অবলম্বনে 'নেপেন দারোগার দায়ভার' রচনা করে। 'বাংলা মঞ্চনাটকের দুশো বছরের ইতিকথা' ও 'মহানট ভক্ত গিরিশ' তাঁর অন্য দুখানি গ্রন্থ। বর্তমান সংকলনের লেখাটি 'রঙপুরের ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

আহমেদ আবিদ : বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনের সক্রিয় নাট্যকর্মী আহমেদ আবিদ। গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান-এর অন্তর্ভুক্ত নাট্যদল ঢাকা পদাতিকের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বহুকাল যুক্ত। পেশা হিসেবে সাংবাদিকতাকে গ্রহণ করেছেন। ইতিপূর্বে তাঁর একাধিক লিখন নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে 'বাংলার বাণী' সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত। ওই সংবাদপত্রেই আলোচ্য বিষয়ে লেখকের রচনার সূত্রপাত। পরবর্তী সময় লেখাটিকে পরিমার্জিত, বর্ধিত এবং বলা যায় নবতম রূপে গ্রন্থের উপযোগী করে দিয়েছেন লেখক।

আহমেদ সানি : বাংলাদেশের নবীন নাট্যকর্মীদের একজন আহমেদ সানি। জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাট্যকলা বিষয়ে পড়াশোনা করে বর্তমানে তিনি ওই বিভাগেই শিক্ষকতা করছেন। ঢাকা থিয়েটারেরর উদ্যোগে গ্রাম থিয়েটার যে সূচনা, বর্তমানে সেই আন্দোলনে তিনিও শরিক। বর্তমান লেখাটি তাঁর ভারত বিভাজনের পরবর্তীকালীন পূর্ব পাকিস্তানে নাটকের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গক্রম। রচনাটি বর্তমান গ্রন্থের জন্য আমন্ত্রিত।

ড. ইনামুল হক : পেশা হিসেবে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনাকে বেছে নিলেও অভিনেতা হিসেবে ড. ইনামুল হকের আত্মপ্রকাশ নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়। বর্তমানে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত নির্দেশক এবং প্রতিভাদীপ্ত নাটককার হিসেবে আবিষ্কার করেছেন গুণীজনেরা। নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন বহুকাল, ১৯৯৫ থেকে তাঁর উদ্যোগে নাগরিক নাট্যাঙ্গন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি 'শুধু নাটক' পত্রিকারও সম্পাদনা করে আসছেন। বর্তমান সংকলনে প্রকাশিত তাঁর লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় নাগরিক নাট্যাঙ্গন-এর আয়োজনে 'মৈত্রী নাট্যোৎসব-১' স্মারক পুস্তিকায়। প্রকাশকাল : ১৩-১৬ জুন ১৯৯৮।

কবীর চৌধুরী : বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক রূপে বরণীয় কবীর চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি বিভাগে অবসর নিয়ে বর্তমানে ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরই নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষাদান করে চলেছেন। তাঁর অনূদিত বিশ্বের নানাপ্রান্তের নাটক পড়ে যেমন ঘটে তেমনই বাংলাদেশের নাটকভাণ্ডারে তা হয়ে ওঠে আত্মশ্লাঘা। পাশাপাশি, 'প্রসঙ্গ নাটক' (১৯৮১), 'ইউরোপের দশ নাট্যকার' (১৯৮৫), 'ফরাসি নাটকের কথা' (১৯৯০), 'এ্যাবসার্ড নাটক' (১৯৯৫) তাঁর রচনার গুণে নাট্যশিক্ষার্থীদের গ্রন্থপাঠে উৎসাহিত করে। থিয়েটার নাট্যদলের জন্মকাল থেকে তিনি সংযুক্ত থেকেছেন নেপথ্যের নানাকাজে। বর্তমানে তিনি সভাপতির পদ অলংকৃত করে আছেন। এমন এক মানুষকে একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৩), একুশে পদক (১৯৯১) প্রদান করে সংগঠকেরা নিজেদের সম্মানিত করেছেন। বর্তমান সংকলনে সংযুক্ত তাঁর লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'থিয়েটার' পত্রিকায়। প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ১৯৮৫।

কাজী মহম্মদ এহিয়া : বাংলাদেশের রঙপুর জেলার একান্ত সজ্জন রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে কাজী মহম্মদ এহিয়া যেমন পরিচিত, তেমনি রঙপুরের নাট্যাঙ্গনেও তাঁর পূর্বজ কাজী মহম্মদ ইলিয়াসের নাট্যচর্চার অনুসারী হয়েই রাজনীতিক চরিত্রকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছেন। ১৯২১ সালে কাজী মহম্মদ সৈয়দ ও কামরুন্নেছা বিবির কনিষ্ঠ সন্তানরূপে মহম্মদ এহিয়ার জন্ম। বাল্য কৈশোরে নাট্যচর্চা ও পরবর্তীতে রাজনীতিক বাতাবরণে বড়ো হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শে যাত্রা শুরু করেন। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়সে বি. এন. পি-র রঙপুর অঞ্চলের সভাপতি হয়েছিলেন। পেশায় আইনজীবী। তাঁর সহযোগী লেখক আশুতোষ দত্ত। বর্তমান সংকলনের লেখাটি 'রঙপুরের ইতিহাস'-এর অন্তর্ভুক্ত।

কামালউদ্দিন কবির : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক কামালউদ্দিন কবির জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাট্যকলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে থিয়েটারে নাটকরচনা, অভিনয়, নির্দেশনা এবং মঞ্চ পরিকল্পনার কাজে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। তবে নির্দিষ্ট কোনো দলে নয়, তিনি মূলত ফ্রিলান্সার হিসেবেই কাজ করছেন। থিয়েটার পত্রিকাগুলিতে নিয়মিত লেখা তাঁর অন্য একটা দিক। থিয়েটারের পাশাপাশি সাংবাদিকতায়ও নিজেকে যুক্ত করেছেন। সেইসূত্রে 'ভোরের কাগজ' দৈনিক পত্রিকার সহসম্পাদক পদে যুক্ত। তাঁর লিখিত, বর্তমান সংকলনের লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'থিয়েটারওয়ালা' পত্রিকায় জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৯-এ।

কামাল উদ্দিন নীলু : মঞ্চনাট্যের নির্দেশক হিসেবে জীবনের এক অংশের পরিচয় হলেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পরিচয় ডিঙিয়ে আজ তিনি সেন্টার ফর এশিয়ান থিয়েটার (CAT) নামে একটি এন. জি. ও সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে পরিচিত। ইতিমধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও ইবসেন বিষয়ে গবেষণায় মনোনিবেশ করেছেন। আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে তিনি বিভিন্ন সেমিনারে বক্তৃতা রেখেছেন কিংবা থিয়েটার সংযুক্ত কাজে গেছেন বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে। বর্তমান গ্রন্থে তাঁর একটি গবেষণাধর্মী রচনা সংযুক্ত হয়েছে। লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় বাংলাদেশের বাংলা একাডেমীর ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'উত্তরাধিকার', জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৮-তে।

গোলাম সারোয়ার : লেখক নাট্যরূপান্তরকার, নির্দেশক এবং অভিনেতা হিসেবে আজ সর্বজন সমাদৃত। নাট্যপ্রশিক্ষক থেকে বর্তমানে গ্রুপ থিয়েটারের দুটি দল নাট্যচক্রের 'নাট্যশিক্ষাঙ্গন' এবং থিয়েটারের 'থিয়েটার স্কুল'-এর তিনি শিক্ষক। আই. টি. আই - বাংলাদেশ কেন্দ্রর সক্রিয় সদস্য এই মানুষটি ভারতের ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা-য় স্নাতক পর্বে যে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন, ভারত, পাকিস্তান, নরওয়ে, জর্দান, ইরাক ও যুক্তরাষ্ট্র সফর করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন এবং শিল্পকলা একাডেমীতে মঞ্চ ব্যবস্থাপক হিসেবে যে পেশাগত দক্ষতা অর্জন করেছেন তারই ফলপ্রসূ রচনা বর্তমান গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত লেখাটি। লেখাটি ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত।

জিয়া হায়দার : বিশিষ্ট নাটককার-সংগঠক হিসেবে নাট্যজীবনের শুরু করলেও বর্তমানে তিনি নাট্যবিদ্‌রূপেই বিশেষ পরিচিত। চট্টগ্রামের নাট্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত মানুষটির আরো একটি পরিচয় তিনি অধ্যাপক। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে তিনি নাট্যকলার শিক্ষার্থী তৈরিতে নিমগ্ন ছিলেন। সংকলনে প্রকাশিত তাঁর রচনাটি মুক্তধারা প্রকাশিত নিবন্ধগ্রন্থ 'নাট্য বিষয়ক নিবন্ধ', মে ১৯৮১ থেকে সংকলিত।

নিখিলরঞ্জন দাস : সত্তর দশক থেকে ছোটো নাটক রচনায় অংশ নিয়ে আজ পশ্চিমবাংলার মফস্বল নাট্যচর্চার জগতে বিশিষ্ট নাটককার রূপে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর নাট্যরচনার সূচনাকালেই তিনি গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। তাঁর রচিত নাট্যগ্রন্থ 'পাড়ি ও অন্যান্য নাটক' গ্রুপ থিয়েটার প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান লেখাটি তাঁর বাংলাদেশ ভ্রমণের সূত্রে বাংলাদেশের নাট্যচর্চা নিয়ে এ বাংলায় প্রকাশিত প্রথম উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ। প্রথম প্রকাশিত হয় 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৮৩-তে।

নিখিল সেন : বরিশালের নাট্য আন্দোলনে প্রবীণতম ব্যক্তি নিখিল সেনের অবদান অনস্বীকার্য। পেশায় শিক্ষক মানুষটি থিয়েটার অঙ্গনেও তাই নিজেকে শিক্ষাদানের ভূমিকায় যুক্ত রেখেছেন ; নির্দেশকের ভূমিকায়। পেশা থেকে অবসর নিলেও নেশা থেকে অবসর নেননি। বরিশালের বহুবছরের নাট্য ইতিহাসের সাক্ষী এই মানুষটির লেখাটি তাই অন্যমাত্রা বহন করে। লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় বরিশালের সাংস্কৃতিক সংগঠন সমন্বয় পরিষদের স্মারকগ্রন্থ 'মুক্তিযুদ্ধের পঁচিশ বছর', ১৯৯৬-এ।

নৃপেন্দ্র সাহা : নাট্যআন্দোলনের শরিক প্রত্যেকটি মানুষ যখন অভিনেতা-নির্দেশক কী নাটককার হিসেবে নিজের পরিচিতি খুঁজছেন নৃপেন্দ্র সাহা তখন নেপথ্যে নিয়ে গেছেন নিজেকে। পঞ্চাশের দশকে 'গন্ধর্ব' দিয়ে তাঁর নাট্যসম্পাদনার সূত্রপাত, প্রায় তিন দশক 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। প্রত্যেকটি পত্রিকা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হলেও নেপথ্যে রাজনৈতিক আদর্শে দীপ্ত মানুষটির সচেতন চোখ তা পথ হারাতে দেয়নি। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই তিনি সেই পত্রিকার সম্পাদক। প্রথমে যৌথ বর্তমানে একক। বর্তমানে পথনাটক নিয়ে 'বহিরঙ্গণ'-প্ল্যাটফর্মের জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি আদায়ের উদ্দেশ্যে আন্দোলনে নেমেছেন। বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন ভারত-বাংলাদেশের সংস্কৃতির সেতু বন্ধনের লক্ষ্যে। সংকলনে অন্তর্ভুক্ত তাঁর লেখাটি 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৩ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মে-জুলাই ১৯৯১-এ।

বদরুদ্দীন উমর : জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলা হলেও স্নাতক পর্ব থেকে বদরুদ্দীন উমর বাংলাদেশের ছাত্র এবং লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. পিই সম্মান অর্জন করে অধ্যাপনা ও রাজনীতিকে পেশা হিসেবে নিয়ে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে বসবাস শুরু করেন। ১৯৬৮তে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনার পদ ত্যাগ করেন। বর্তমানে বুদ্ধিজীবী হিসেবে শ্রদ্ধার পদে আসীন। তাঁর রচিত গবেষণাধর্মী গ্রন্থাদির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা (১৯৬৬), পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (১৯৭০), বাঙলা দেশে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সমস্যা (১৯৭৪), ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন (১৯৮৪) প্রভৃতি গ্রন্থাদি দুই বাংলার প্রতিটি মানুষের জন্য শিক্ষণীয়। বাংলাদেশের বাংলা একাডেমী ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে সম্মানিত করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। বর্তমান সংকলনে তাঁর লেখাটি আরণ্যক সংগঠনের নাট্য প্রদর্শন দেখার অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া। আরণ্যকের বিশ বছর পূর্তি স্মারক পুস্তিকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩-তে প্রকাশিত।

বিশ্বজিৎ ঘোষ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ নাটকের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন বহুদিন থেকে। নাটকের মহলের গুণীজনদের বিশেষত থিয়েটার পত্রিকার সম্পাদক রামেন্দু মজুমদারের উৎসাহে ইতিমধ্যে গবেষণামূলক রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৯৬-এ তাঁকে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সাহিত্যপদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। বর্তমান সংকলনে তাঁর রচনায় স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের থিয়েটারের ঐতিহাসিক পটভূমি পরিস্ফুট। লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'থিয়েটার' পত্রিকার বিংশ বর্ষ পূর্তি সংখ্যায় (৩য়-৪র্থ যুগ্ম সংখ্যা), সেপ্টেম্বর ১৯৯৭।

বিশ্ব রায় : রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাট্যকলায় স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হওয়ার অনেক আগে থেকেই শিল্প শিক্ষার্থী। বলা যায় বিদ্যালয় জীবন থেকে। ভারত সরকারের স্কলারশিপ প্রাপ্ত এই তরুণ গবেষক একান্ত নিষ্ঠায় কাজ করে চলেছেন নাটক ও চলচ্চিত্র নিয়ে। 'মৃণাল সেন : চলচ্চিত্রের পটভূমি' তাঁর পি-এইচ. ডি-র গবেষণার বিষয়। নাট্যজগতের প্রবীণতম শিল্পী কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, অশোক মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে যেমন তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ সকল নাট্যকর্মীদের কাছে গ্রহণীয়, তেমনি নতুন গবেষণার মধ্যে মনোজ মিত্র এবং ওপার বাংলার নাট্যসংগঠক ও নাট্যসম্পাদক রামেন্দু মজুমদার এবং নাট্যনির্দেশক নাসিরউদ্দীন ইউসুফকে নিয়ে তাঁর কাজের প্রতি অনেকেই আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন। বর্তমান সংকলনের জন্যই লিখেছেন ঢাকা থিয়েটার বিষয়ে।

মফিদুল হক : প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনা সংস্থা 'সাহিত্য প্রকাশ'-এর কর্ণধার হিসেবে মফিদুল হকের পরিচিতি হলেও তিনি যে একজন সুলেখক আজ তা কারোর অজানা নয়। সম্পাদক হিসেবেও অর্জন করেছেন সম্মান। বিশ্বের নাট্যকর্মীদের একই ভাবনায় ভাবিত করার সংগঠন আই. টি. আই-এর তিনি সক্রিয় সদস্য। প্রকাশনাও তাঁর সম্পাদনার দায়িত্বাধীন। সার্ক বুক ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল-এর সভাপতি হিসাবে এই মুহূর্তে আমরা তাঁকে নিয়ে অহংকার করতেই পারি। বর্তমান সংকলনে তাঁর লেখাটি 'নাট্যপত্র'-এ প্রথম প্রকাশিত। প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ১৯৯৫।

মমতাজউদ্দীন আহমদ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগের খণ্ডকালীন অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ মঞ্চ ও টেলিভিশনে সুদক্ষ অভিনেতা হিসেবে পরিচিত। তবে তার থেকে তাঁর বড়ো পরিচয় নাটককার হিসেবে। 'সাত ঘাটের কানাকড়ি', 'রাক্ষুসী', 'খামাখা খামাখা' প্রভৃতি তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক। বর্তমানে তিনি থিয়েটার (আরামবাগ) নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত আছেন নাটককার এবং নির্দেশকের ভূমিকায়। বর্তমান সংকলনের লেখাটি তিনি প্রথম লেখেন 'শুধু নাটক' পত্রিকায়। প্রকাশকাল : জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৯৮।

মামুনুর রশীদ : বাংলাদেশের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক আবহাওয়া যে মানুষটিকে থিয়েটারে নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে তাঁর নাম মামুনুর রশীদ। ব্যক্তিগত জীবনে একজন প্রকৌশলী হলেও নাটককে জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছেন তিনি। শুধু মঞ্চ নয় টেলিভিশনে তাঁর রচিত নাটক বিপুল সাড়া ফেলেছে। নাটককার-নির্দেশক অভিনেতার পাশাপাশি তিনি একজন বড়ো সংগঠক। আরণ্যক নাট্যদলের প্রতিষ্ঠাতা। আজীবন বামপন্থী রাজনীতিক নাট্যাদর্শ প্রচারে ব্রতী। বর্তমান নিবন্ধটি নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের স্মারক সংখ্যা 'নাট্যপত্র', ডিসেম্বর ১৯৯৫-এ প্রকাশিত।

মুনতাসীর মামুন : ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ঢাকা শহরে মুনতাসীর মামুনের জন্ম এবং বর্তমানে ঢাকা জেলারই মগবাজার অঞ্চলে বাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ইতিহাসে পি-এইচ. ডি সম্মান অর্জন করেছেন। বহুকাল যাবৎ ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। একাধিক গবেষণা গ্রন্থের রচয়িতা, সম্পাদক এবং অনুবাদক। উনিশ শতক এবং বাংলাদেশ কেন্দ্রিক তাঁর গ্রন্থ তালিকার মধ্যে উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র (৬ খণ্ডে), উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ, ১৮৮৫-১৯০৫, বাংলাদেশের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন (যৌথ সম্পাদনা, ১৯৮৬), উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সভাসমিতি (১৯৮০) প্রভৃতি। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বাংলা একাডেমী পুরস্কারে সম্মানিত করে। 'নাট্যপত্র', ডিসেম্বর ১৯৯৫-তে বর্তমান সংকলনে অন্তর্ভুক্ত লেখাটি প্রথম প্রকাশিত।

মোহম্মদ তালেবর আলী : বাংলাদেশের জেলা শহর রাজশাহীর বুকে নাট্য আন্দোলনে মোহাম্মদ তালেবর আলী এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন পূর্ব পাকিস্তান আমল থেকে। তৎকালীন অ্যামেচার নাট্যগোষ্ঠীর সংগঠক হিসেবে তিনি প্রবীণদের স্নেহবৎসল যেমন হয়েছেন সমবয়সীদের তিনি ছিলেন বন্ধুবৎসল। রাজশাহীর বুকে প্রথম বিভিন্ন ক্লাব-সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে, নাট্যসংস্কৃতির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যে সব মানুষ 'রাজশাহী কেন্দ্রীয় নাট্য সমিতি' গঠন করেছিলেন মোহাম্মদ তালেবর আলী তাঁদের অন্যতম। মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশে রাজশাহীর বুকে নেপথ্য কর্মে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। বক্ষ্যমাণ রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'থিয়েটার' পত্রিকার অষ্টাদশ বর্ষে, ৩য়-৪র্থ যুগ্ম সংখ্যায়, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩-এ।

রামেন্দু মজুমদার : জীবনের শুরুতে পেশা হিসেবে অধ্যাপনাকে বেছে নিলেও পরবর্তীকালে বিজ্ঞাপন সংস্থার কর্ণধার হলেও থিয়েটার নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা রামেন্দু মজুমদারের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় তিনি বাংলাদেশের প্রথম নাটকের পত্রিকা 'থিয়েটার'-এর সম্পাদক। বাংলাদেশে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান ও আই টি আই-এর প্রতিষ্ঠাকর্মে তাঁর ভূমিকা অগ্রগণ্য। এই দুটি নাট্য প্রতিষ্ঠানের তিনি যথাক্রমে প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এবং সাধারণ সম্পাদক। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট-এর তিনি নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম। অন্য সব অবদান ভুলে গেলেও থিয়েটার তাঁকে মনে রাখবে তাঁর রচিত এবং সম্পাদিত ১১ খানি গ্রন্থের জন্যে। বক্ষ্যমাণ লেখাদুটি যথাক্রমে 'বাংলাদেশের নাট্যচর্চার তিনদশক' (প্রকাশকাল : মার্চ ১৯৯৯) এবং 'নাট্যপত্র' (ডিসেম্বর ১৯৯৫)-এ প্রকাশিত।

রাহমান চৌধুরী : থিয়েটার অঙ্গনে নবীন নাটককার ও গবেষক হিসেবে পরিচিত। রাহমান চৌধুরী সমাজকর্মীরূপে নিজের পরিচয় দিতে ভালোবাসেন। ইতিহাস ও রাজনীতি তাঁর চর্চার বিষয়। বর্তমানে 'রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মঞ্চনাটক' বিষয়ে তিনি পি-এইচ. ডি গবেষণায় যুক্ত। বর্তমান সংকলনে গ্রন্থিত রচনাটি ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত।

লুৎফর রহমান : জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগে ছাত্রজীবনের মাধ্যমে সূত্রপাত, বর্তমানে নাট্যভুবনই তাঁর চর্চিত বিষয়। কবিতা, ছোটোগল্প, উপন্যাস, ছবি আঁকার পাশাপাশি তাঁকে অবশ্যই বেশি উৎসাহিত করে নাট্যের ভুবন। এরই মধ্যে গারো সম্প্রদায়ের নাট্যের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছেন তিনি। যুক্ত আছেন গ্রাম থিয়েটার আন্দোলনের সঙ্গে। জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের পত্রিকা 'থিয়েটার স্টাডিজ'-এ তিনি যুক্ত। বর্তমান গবেষণমূলক রচনাটি 'থিয়েটার স্টাডিজ'-এর ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুন ১৯৯৯ থেকে।

শওকত ওসমান : বাংলাদেশের প্রবীণতম সাহিত্যিকদের মধ্যে শওকত ওসমান ছিলেন বরিষ্ঠতম কথাশিল্পী ;অনুবাদ ও শিশুসাহিত্য রচনার সমান্তরাল নাটকেও তাঁর আগ্রহ ছিল প্রদীপ্ত। ১৯৭৭ সালে যখন তিনি কলকাতায় প্রবাস জীবন যাপন করতেন, তখন তিনি প্রাতঃভ্রমণকালে পার্কসার্কাস থেকে প্রায়ই 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকা দপ্তরে এসে চায়ের আড্ডায় বসতেন। সেই সময়কার অনুরুদ্ধ রচনাই বর্তমান সংকলনে অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার সগরসিংহ গ্রামে জন্ম, মৃত্যু বাংলাদেশের ঢাকা শহরে। শৈশবে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েও পরে আধুনিক বিদ্যায় পঠন-পাঠন সমাপ্ত করে শিক্ষকতাকেই মূল পেশা হিসেবে বেছে নেন। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের স্থায়ীবাসিন্দা হন। তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা ৬১-এর ওপর। লেখাটি 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকার ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১৯৭৯-৮০-তে প্রথম প্রকাশিত হয়।

শিশির দত্ত : সাংবাদিকতা দিয়ে পেশার সূত্রপাত ঘটলেও বর্তমানে তিনি থিয়েটারের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সর্বক্ষণ জড়িত। প্রতিষ্ঠা করেছেন 'বিটা' নামের একটি এন. জি. ও-সংস্থা চট্টগ্রাম শহরে। তবে পাশাপাশি অরিন্দম নাট্যগোষ্ঠীকে এখনও সজীব রেখেছেন এই সংগঠক, নাট্য নির্দেশক ও নাটককার মানুষটি। বর্তমান লেখাতে লেখকের চট্টগ্রাম শহরের পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিপাত ধরা পড়েছে। লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'নাট্যপত্র', ডিসেম্বর ১৯৯৫-এ।

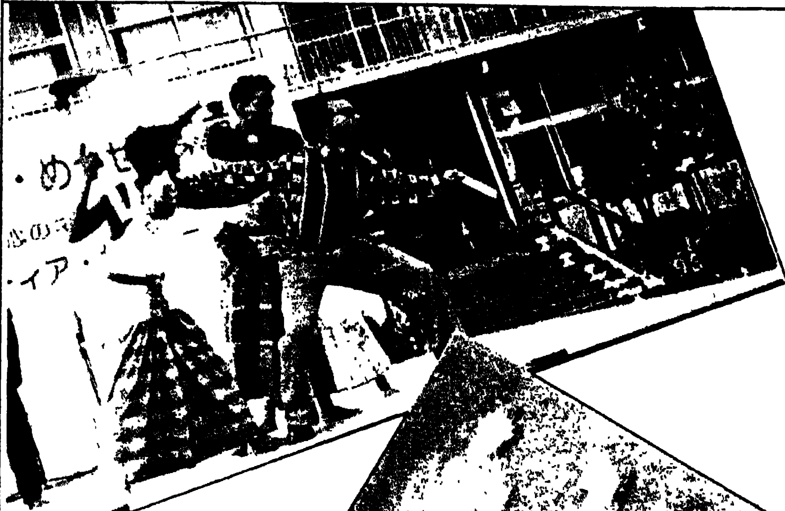
সাজেদুল আউয়াল : ঢাকা থিয়েটারে প্রতিষ্ঠাকালের পরপরই তাঁর নেপথ্যকর্মী হিসেবে যাত্রা শুরু। ক্রমে ক্রমে নাটককার প্রাবন্ধিক এবং গবেষকের জীবনে প্রবেশ। শিল্পের অন্য এক ধারা চলচ্চিত্রেও জড়িত নিয়েছেন নিজেকে। বর্তমানে জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগে 'ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র : সমাজবাস্তবতা ও নির্মাণ ভাবনা' শীর্ষক পি-এইচ. ডি গবেষণায় যুক্ত। বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'নাট্যপত্র', ডিসেম্বর ১৯৯৫ স্মারকগ্রন্থে।

সেলিম আল দীন : ঢাকা থিয়েটার-এর প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ডক্টর সেলিম আল দীনের পরিচিতি দুই বাংলার থিয়েটারে নাটককার হিসেবেই। তবে তাঁর উল্লেখযোগ্য কর্মের মধ্যে জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠা। ওই বিভাগের প্রাক্তন সভাপতি এবং আজও বিভাগীয় পত্রিকা 'থিয়েটার স্টাডিজ'-এর সম্পাদক। ঢাকা থিয়েটারের উদ্যোগে যে 'গ্রাম থিয়েটার' আন্দোলনের সূত্রপাত তিনি সেই আন্দোলন উদ্যোক্তাদের অন্যতম। বর্তমানে প্রধান উপদেষ্টা পদে আসীন। বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নাটক পাঠ্যসূচির অন্তর্গত। নৃগোষ্ঠীর জীবনরচিত তাঁর নাটকের বিষয় হয়ে বহুবার এসেছে। বর্তমানে গ্রন্থে তেমন এক বনপাংশুল নাট্যউপাখ্যান নিয়ে লেখকের কথামুখ আলোচনা। বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে মার্চ ২০০১।

সৈয়দ জামিল আহমেদ : ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা, দিল্লি থেকে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে কিছু অসামান্য মঞ্চস্থাপত্য ও নির্দেশনার কাজ করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও সংগীত বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ। পি-এইচ. ডি-র মাধ্যমে তাঁর গবেষণার শেষ নয় শুরু। তেমন কিছু কাজকর্ম আজও করে চলেছেন। বিশ্ব থিয়েটারের নানা ইতিহাস ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার তিনি সংগ্রাহক। সে কারণে তাঁকে ভ্রমণ করতে হয়েছে বিশ্বের নানা দেশ। বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত গবেষণাটি সম্পন্ন করতে তাঁকে ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাশহর ও প্রত্যন্তগ্রামে যেতে হয়েছে। রচনাটি প্রকাশিত হয় 'নাট্যপত্র', ডিসেম্বর ১৯৯৫ স্মারকগ্রন্থে।

সৈয়দ শামসুল হক : নাটককার হিসেবে তাঁর সর্বাধিক খ্যাতি হলেও তিনি একাধারে কবি ঔপন্যাসিক-গল্পকার-প্রবন্ধকার এমনকী চিত্রশিল্পীও। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মান 'একুশে পদক' তিনি অর্জন করেছেন। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ লেখকের বর্তমান নিবন্ধটি সেই সাক্ষ্যই বহন করে। মুক্তিযুদ্ধের ২০ বছরে, জাতীয় নাট্যোৎসব '৯১ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর যৌথ উদ্যোগে এই উৎসবের আয়োজন (৩০ ডিসেম্বর ১৯৯১-২৭ জানুয়ারি ১৯৯২) বর্তমান লেখাটি ওই উৎসবের স্মরণিকা থেকে সংকলিত।

হায়াৎ মামুদ : বাংলাদেশের অগ্রগণ্য লেখক কিংবা অনুবাদক হিসেবে তাঁর সমধিক খ্যাতি। তবে জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এই মানুষটি রুশ পর্যটক নাট্য অনুরাগী গেরাসিম্ স্তেফানভিচ লিয়েবেদেফ্-এর প্রতি প্রেমই তাঁকে পি-এইচ. ডি গবেষণা প্রলুব্ধ করেছে। বর্তমান নিবন্ধে তাঁরই প্রতিচ্ছায়া। রচনাটি বাংলাদেশের নাট্যকর্মীদের সম্মিলিত নাট্যসংগঠন বাঙলা থিয়েটার-এর স্মারক পুস্তিকা থেকে সংগৃহীত। প্রকাশকাল : ২৭ নভেম্বর ১৯৯৬।



ক



খ



গ

বাংলাদেশ নাট্যদল ঠিকানা

বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান সদস্য

ঢাকা মহানগরী

নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়
৪, নওরতন কলোনি
নিউ বেইলি রোড, ঢাকা- ১০০০।

থিয়েটার (বেইলি রোড)
১৪৪, নিউ বেইলি রোড
ঢাকা - ১০০০।

আরণ্যক নাট্যদল
৪৭, ইন্দিরা রোড, ফার্ম গেইট
ঢাকা।

ঢাকা থিয়েটার
১১/১, খ পুরানা পল্টন লাইন
ঢাকা-১০০০।

থিয়েটার (তোপখানা)
৩৯৯/এ, নিউ ইস্কাটন
ঢাকা-১২১৭।

নাট্যচক্র
প্রযত্নে : টেলিরিয়েল
৫০, পুরানা পল্টন লাইন
৪র্থ তল, ঢাকা - ১০০০।

পদাতিক নাট্য সংসদ
দ্য ডেইলি স্টার
১৯, কাওরান বাজার, ঢাকা।

ঢাকা পদাতিক
টুটুল ব্রাদার্স
২০৫, এলিফ্যান্ট রোড
ইসলাম ম্যানশন (৩য় তল)
ঢাকা।

নান্দনিক নাট্য সম্প্রদায়
সড়ক নং - ৪/এ, বাড়ি নং - ৬০
ধানমন্ডি, ঢাকা।

প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যগোষ্ঠী
প্রতিদ্বন্দ্বী ভবন
১৩৫, শাঁখারিবাজার
ঢাকা-১০০০।

সময় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী
প্রযত্নে : আকতারুজ্জামান
জামান ভিলা, ৫২৭/১৩,
নয়াটোলা, মগবাজার
(২য় তলা), ঢাকা।

মহাকাল নাট্য সম্প্রদায়
৩৭, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ
(২য় তলা), ঢাকা-১০০০।

বৈশাখী নাট্যগোষ্ঠী
৫৮, কাজী আলাউদ্দিন রোড
ঢাকা-১০০০।

সংলাপ গ্রুপ থিয়েটার
কালাশাহ্ হোমিও হল
১-এফ, ৫-১, মিরপুর-১
ঢাকা-১২১৬।

দৃষ্টিপাত নাট্য সম্প্রদায়
৩৪/১-এ, আহম্মদ বাগ
বাসাবো, ঢাকা- ১২১৪।

ঢাকা নাট্যম
বাড়ি নং-১/ই/৩, সড়ক ৭/এ
(নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

সুবচন নাট্য সংসদ
প্রযত্নে : মিজানুর রহমান
কে-১৩, কাজী নজরুল ইসলাম
রোড, মোহাম্মদপুর,
ঢাকা-১২০৭।

রঙ্গনা নাট্যগোষ্ঠী
৪৬/২, নয়া পল্টন, ঢাকা।

লায়ন থিয়েটার
৪৭, আওলাদ হোসেন লেন,
ইসলামপুর, ঢাকা।

কারক নাট্য সম্প্রদায়
ইস্ট এশিয়াটিক এড. লি.
৪, নওরতন কলোনি
নিউ বেইলি রোড, ঢাকা-১০০০।

বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (২য় তল)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

থিয়েটার সেন্টার
৪, গ্রিন রোড, ঢাকা-১২০৫।

পাঠশালা নাট্যচক্র
৫০/১, আব্দুল আজিজ লেন
পিলখানা, ঢাকা-১২১১।

ঢাকা নান্দনিক
২৭, কলাবাগান
উত্তর ধানমন্ডি, ঢাকা।

গণছায়া সাংস্কৃতিক সংগঠন
২৭২, দনিয়া রোড
পূর্ব দোলাইপাড়
পো.- গেন্ডারিয়া, ঢাকা।

অবলোকন
প্রযত্নে : মোস্তফা কামাল সজল
২৪/২, ইস্কাটন গার্ডেন (২য় তলা)
ঢাকা-১০০০।

বাংলাদেশ থিয়েটার
প্রযত্নে : লিপিকা প্রিন্টিং প্রেস
৮৫, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০।

ঢাকা মঞ্চ
প্রযত্নে : জামিউর রহমান লেমন
বি-৮, ডি-৫, শাহজাহানপুর
গভ. অফিসার্স কলোনি,
শাহ্জাহানপুর, ঢাকা।

পরিবর্তন নাট্যগোষ্ঠী
মাস এডভারটাইজার্স
১২/এ, আর কে মিশন রোড
(৩য় তলা), ঢাকা।

দেশ নাটক
প্রযত্নে : মাসুম রেজা
সাবলাইম মিডিয়া, ১১, ধানমন্ডি
(পুরাতন ৩২), ফ্ল্যাট এ ৩,
ঢাকা-১২০৫। ফোন - ১১০১৫৪।

শৈবাল নাট্যচক্র
৯২, সার্কুলার রোড, ঢাকা।

খেয়ালী নাট্যগোষ্ঠী
৩৩, মুরাদপুর
রজব আলী সরদার রোড
পো.- গেন্ডারিয়া, থানা - শামপুর
ঢাকা-১২০৪।

ঢাকা থিয়েটার মঞ্চ
১১৬৩/এ, খিলগাঁও চৌধুরীপাড়া
খিলগাঁও, ঢাকা।

ঢাকা ড্রামা নাট্যদল
প্রযত্নে : ম. আবু হারুন টিটো
২৭/১, পূর্ব নয়াটোলা (৫ম তলা)
বড়ো মগবাজার, ঢাকা।

প্রেক্ষাপট নাট্যালয়
৩৩, এনায়েতগঞ্জ, ঢাকা-১২০৫।

জনপদ নাট্যদল
প্রযত্নে : সেলিম মাহমুদ
১১১, আরামবাগ (৩য় তলা)
ঢাকা-১০০০।

নাট্যকেন্দ্র
১২৮/ক, মগবাজাব
এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা)
ঢাকা।

উত্তরা থিয়েটার
প্রযত্নে : বরকত আলী রাজু
ফায়দাবাদ মধ্যপাড়া
ডাকঘর - ফায়দাবাদ মাদ্রাসা
উত্তরা. ঢাকা-১২৩০।

পদধ্বনি থিয়েটার
প্রযত্নে : মার্ক
১৪৩, শান্তিনগর বাজার, ঢাকা।

নাট্যফৌজ
ইদ্রিস হাউস
৪৪৩, ওয়ারলেস রোড
পীর পাগলার গলি
বড়ো মগবাজার, ঢাকা।

চক্রবাক
প্রযত্নে : শামীম প্রিন্টার্স
৭৮, আরামবাগ, ঢাকা।

ঢাকা লিট্‌ল থিয়েটার
৪৬, নিউ এলিফ্যান্ট রোড
ঢাকা-১২০৫।

কুশীলব নাট্য সম্প্রদায়
প্রযত্নে : প্রদীপকুমার দেব
পিংলারভী
৭৮, পুরানা পল্টন লাইন
ঢাকা-১০০০।

বহুবচন
প্রযত্নে : জনাব তৌফিকুর রহমান
এ সি আই লি.
৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

ঢাকা সুবচন নাট্যদল
বাড়ি ২৯ (৩য় তলা)
সড়ক - ৩০, রূপনগর আ/এ,
মিরপুর, ঢাকা।

থিয়েটার (আরামবাগ)
৫৭, সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোড
ঢাকা-১২১৭।

সমকাল নাট্যচক্র
প্রযত্নে : খন্দকার সাইদুল হক খোকন
৩০৫/১১, উলন রোড
পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা।

উদীচী (নাটক বিভাগ)
১৪/২, তোপখানা সড়ক
(দোতলা), ঢাকা-১০০০।

লোকনাট্য দল (সিদ্ধেশ্বরী)
প্রযত্নে : লিয়াকত আলী লাকী
সড়ক নং - ৭বি, বাসা - ৫৯,
ব্লক - এইচ, বনানী, ঢাকা-১২১৩।

সাত্ত্বিক নাট্য সম্প্রদায়
সেকশন - ৬, ব্লক - এ
এভিনিউ - ৫, বাড়ি - ৫৪
মিরপুর, ঢাকা - ১২১৬।

ঢাকা প্রসেনিয়াম
প্রযত্নে : বাবুল বিশ্বাস
ওয়াটার ফ্লাওয়াব
২৮/এ, কাকরাইল, রুম - ৩
ঢাকা।

দৃশ্যপট
প্রযত্নে : পিকলু বক্সী
১৫, উমেশ দত্ত রোড
বকশি বাজার, ঢাকা।

মহানগরী '৭৭
প্রযত্নে : সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন
ক্যাসেট কর্নার
৩১, কমলাপুর বাজার রোড,
ঢাকা।

ভাস্কর নাট্যদল
সেকশন - ৬, ব্লক - ডি
বাসা - ১, রোড - ১৫
পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

লোকনাট্যদল (টি এস সি)
ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

নাট্যধারা
(স্ক্যানডেকর)
৪, পুরানা পল্টন লাইন,
ঢাকা-১০০০।

মতিঝিল থিয়েটার সার্কেল
টি অ্যান্ড টি কলোনি, মতিঝিল,
ঢাকা-১০০০।

মতিঝিল থিয়েটার সম্প্রদায়
এফ ২/৭, পোস্ট অফিস কলোনি
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

সড়ক
ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (৩য় তলা)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

নাগরিক নাট্যাঙ্গন অনসাম্বল
৩০/সি, আসাদ এভিনিউ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

কণ্ঠশীলন
প্রযত্নে : গোলাম সারোয়ার
৩/সি, জিগাতলা (৪র্থ তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

থিয়েটার আর্ট ইউনিট
৬৬এ, সিদ্ধেশ্বরী রোড,
হাফিজ এস্টেট, ঢাকা।

থিয়েটার আর্ট নাট্যদল
প্রযত্নে : আজিজুস সামাদ
৮৩ লেক সার্কাস, কলাবাগান,
ঢাকা-১২০৫।

প্রাচ্যনাট
২২ দিলু রোড, নিউ ইস্কাটন
ঢাকা-১০০০।

নাট্যজন
সাঈদা ভিলা,
প্লট নং -৮, রোড নং-২,
ব্লক-সি, সেকশন - ২, মিরপুর
ঢাকা-১২১৬।

নটরাজ
ক্যাফেটোরিয়া এক্সটেনশান রুম
টি এস সি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা।

অবয়ব নাট্যদল
২/সি, ৩/৬ মিরপুর,
ঢাকা-১২১৬।

গণনাট্য কেন্দ্র
৭২/গ, কদমতলা, বাসাবো,
ঢাকা-১২১৪।

ঢাকা বিভাগ

নারায়ণগঞ্জ থিয়েটার
প্রযত্নে : আলী আহমেদ চুনকা
পৌর পাঠাগার,
বঙ্গবন্ধু সড়ক, নারায়ণগঞ্জ।

সিরাজউদ্দৌলা নাট্যদল
উইলসন রোড
বন্দর উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ।

রঙ্গম
১৩৫, সোনাবিবি রোড
পো.- বি আই ডি সি ডক ইয়ার্ড-
১৪১৩, সোনাকান্দা,
থানা- বন্দর, জেলা- নারায়ণগঞ্জ।

নাট্যালাপ
প্রযত্নে : বিশ্বনাথ বিশ্বাস
৩৯, সুলতান গিয়াসউদ্দিন রোড
শীতলক্ষ্যা, নারায়ণগঞ্জ।

ঐকিক থিয়েটার
১২, আল্লামা ইকবাল রোড
নারায়ণগঞ্জ।

অনিয়মিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী
আদর্শ লাইব্রেরি,
জগদ্ধাত্রীপাড়া, ছবিঘর রোড,
মুন্সিগঞ্জ।

মুন্সিগঞ্জ থিয়েটার
প্রযত্নে : মাল্টিমিডিয়া
সুপার মার্কেট (নীচতলা)
মুন্সিগঞ্জ-১৫০০।

থিয়েটার সার্কেল
প্রযত্নে : বিন্দু আর্ট পাবলিসিটি
সুপার মার্কেট, মুন্সীগঞ্জ সদর,
মুন্সীগঞ্জ-১৫০০।

জাহাঙ্গীরনগর থিয়েটার
প্রযত্নে : রণদাপ্রসাদ দাস
৩২৮/বি, এম এম হোসেন হল
জাহাঙ্গীবনগব বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা।

শহীদ সমর থিয়েটার
মেলান্দহ রেলস্টেশন
ডাকঘর - জালালপুর,
থানা - মেলান্দহ,
জেলা - জামালপুর।

সুনিয়ম নাট্যচক্র
প্রযত্নে : আমিনুর রহমান ফরিদ
১৯ নীলটুলি, মুজিব সড়ক
ফরিদপুর।

সাংস্কৃতিক চক্র
গোয়াল চামট, ফরিদপুর।

বৈশাখী নাট্যগোষ্ঠী
প্রযত্নে : মুহাম্মদ আলী রুমি
পশ্চিম আলীপুব,
পো.- অম্বিকাপুর,
জেলা- ফরিদপুর।

ফরিদপুর থিয়েটার
প্রযত্নে : কাজী আমিরুল ইসলাম রুমি
অম্বিকা সড়ক
(সানফ্লাওয়ার কিন্ডার গার্ডেনের পিছনে)
ঝিলটুলি, ফরিদপুর-৭৮০০।

বহুরূপী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংস্থা
গোয়ালচামট সড়ক
পো.- শ্রী অঙ্গন, থানা-কোতয়ালি
জেলা - ফরিদপুর-৭৮০০।

রাজবাড়ি থিয়েটার
প্রধান সড়ক, রাজবাড়ি।

চারণ থিয়েটার
রহমত স্টোর
প্রধান সড়ক, রাজবাড়ি।

কল্লোল নাট্যসংস্থা
প্রযত্নে : মো: ইউনুস মিয়া, সভাপতি
শাটির পাড়া
কালীকুমার উচ্চ বিদ্যালয়,
নরসিংদী।

স্বরলিপি থিয়েটার
উপজেলা অডিটরিয়াম ভবন,
উপজেলা রোড, পলাশ,
নরসিংদী।

মুক্তধারা নাট্য সম্প্রদায়
প্রযত্নে : মামুনুর রশীদ রুবেল
রেড ক্রিসেন্ট অফিস
(টাউন হল), পশ্চিম ব্রাহ্মনদী
নরসিংদী-১৬০২।

মুকুল ফৌজ নাট্যগোষ্ঠী
১০, মহারাজা রোড, ময়মনসিংহ।

সাহিত্য সাংস্কৃতিক ফোরাম
১৬, হিন্দু পল্লী, ময়মনসিংহ।

পিলসুজ
প্রযত্নে : এ কে এম আব্দুল কুদ্দুস মিঞা
সহযোগী অধ্যাপক
এনাটমী ও হিস্টোলজি বিভাগ
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

আরক নাট্য সম্প্রদায়
প্রযত্নে : রেজাউল করিম রেজা
টাউন হল চত্বর, ময়মনসিংহ।

ময়মনসিংহ লোককৃষ্টি সংস্থা
আবুল মনসুর সড়ক
(সার্কিট হাউস মাঠ সংলগ্ন)
ময়মনসিংহ-২২০০।

বিদ্রোহী নাট্যগোষ্ঠী
২৫, মাকার জানি লেন, নওমহল
(নন্দী বাড়ি), ময়মনসিংহ।

টাঙ্গাইল থিয়েটার
প্রযত্নে : পাপিয়া সেলিম
পি সে হাউজ, বকুলতলী,
আকুর টাকুর পাড়া, টাঙ্গাইল।

সমতা নাট্যগোষ্ঠী
প্রযত্নে : প্রগতি ড্রাগ হাউস
বাটিকমারী, মুকসুদপুর,
গোপালগঞ্জ।

রাপসু থিয়েটার আর্ট
রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
(শহরস্থ শাখার পুরাতন
ব্যায়ামাগার), ফরিদপুর।

মিতালি নাট্যদল
প্রযত্নে : আহমেদ কামাল খোকন
'খাঁন ভিলা'
পশ্চিম খাবাসপুর, মিয়াপাড়া
সড়ক, (গ্রামীণ ব্যাংকের পাশে)
থানা - কোতয়ালি,
পো.- জেলা - ফরিদপুর।

শহিদ সূফী নাট্যচক্র
শহিদ সূফী সড়ক, ঝিলটুলি,
ফরিদপুর।

অমৃত থিয়েটার
ইসলাম ব্রাদার্স, তমালতলা রোড
জামালপুর-২০০০।

<u>চট্টগ্রাম বিভাগ</u>

অরিন্দম নাট্য সম্প্রদায়
৬০, হাই লেভেল রোড,
লালখান বাজার, চট্টগ্রাম।

থিয়েটার '৭৩
নিবেদন,
৩১৪, বঙ্গবন্ধু সড়ক, চট্টগ্রাম।

নান্দীকার
প্রযত্নে : অলক ঘোষ
১৪/২-এ, টাইগার পাস কলোনি
চট্টগ্রাম।

তির্যক নাট্যগোষ্ঠী
৩৭, এস এস খালেদ রোড
কাজীর দেউড়ী, চট্টগ্রাম।

তির্যক নাট্যদল
৪৯২, লাভ লেইন, চট্টগ্রাম।

গণায়ন নাট্য সম্প্রদায়
৩৬, আয়শা খাতুন লেন
চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম।

অঙ্গন থিয়েটার ইউনিট
১৮, আলকরণ লেইন, চট্টগ্রাম।

রণশিঙ্গা নাট্য সম্প্রদায়
প্রযত্নে : মো. ওবায়দুল্লাহ্
এটলাস শিপিং লাইন্স লি.
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

মুক্তধারা নাট্যগোষ্ঠী
প্রযত্নে : মো. গোলাম মরতুজা
সহকারী সচিব, চট্টগ্রাম বন্দর
কর্তৃপক্ষ, বন্দর, চট্টগ্রাম-১১০০।

চট্টগ্রাম থিয়েটার
৬৮, শিববাড়ি লেন
ফিরিঙ্গি বাজার, চট্টগ্রাম।

কথক নাট্য সম্প্রদায়
প্রযত্ন : রূপাই ক্রিয়েশন
৪৩, মোমিন রোড (২য় তলা)
চট্টগ্রাম-৪০০০।

সমীকরণ থিয়েটার
প্রযত্নে : রায় ওয়াচ সার্ভিস
৩৯৩, সিরাজউদ্দৌলা রোড,
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

কালপুরুষ নাট্য সম্প্রদায়
প্রযত্নে : শান্তনু বিশ্বাস
৫, জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম।

চট্টল থিয়েটার
৬৮/১, রিয়াজউদ্দীন রোড,
চৈতন্য গলি, চট্টগ্রাম।

মঞ্চমুকুট নাট্যসম্প্রদায়
ই/৭৯-বি, রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং
কলোনি, চট্টগ্রাম।

থিয়েটার ওয়ার্কশপ
১২৬, শেখ মুজিব রোড,
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

প্রতিভাস
৩৯, দেওয়ানবাড়ি হিল
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।

কথক থিয়েটার
উত্তম স্টিল কর্পোরেশন
২০০৯, আছাদগঞ্জ, চট্টগ্রাম।

উচ্চারণ নাট্য সম্প্রদায়
প্রযত্নে : শামীম আহমেদ
(সুইড বাংলাদেশ)
আমান উল্লাহ ভবন, জাকির
হোসেন রোড, পাহাড়তলী,
চট্টগ্রাম।

প্রতিনিধি নাট্যসম্প্রদায়
নন্দন-৫, সি ডি এ বা/এ,
মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।

শব্দ নাট্যচর্চা কেন্দ্র
১৩৯/২, কাপাসগোলা রোড,
চকবাজার, চট্টগ্রাম।

নান্দীমুখ
আল-ইসলাম চেম্বার (৫ম তলা)
৯১, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।

জনান্তিক নাট্য সম্প্রদায়
প্রযত্নে : ফরিদ উদ্দিন সিদ্দিকী
স্নেহনীড়, রাণীর দীঘির উত্তর পাড়
কুমিল্লা।

যান্ত্রিক নাট্যগোষ্ঠী
প্রযত্নে : বেঙ্গল স্টোর,
কান্দিরপাড়, কুমিল্লা।

বর্ণচোরা নাট্যগোষ্ঠী
প্রযত্নে : লাকি ডেকোরেশন
কুমিল্লা রোড, চাঁদপুর-৩৬০০।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সাহিত্য একাডেমী
বর্ণমালা, কোর্ট রোড,
ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

সুবচন নাট্যদল
শহিদ জহির রায়হান মিলনায়তন
মিজান সড়ক, ফেনী।

সংলাপ
গোফরান বিল্ডিং (২য় তলা)
ট্রাঙ্ক রোড, ফেনী।

ফেনী থিয়েটার, ফেনী
শহিদ জহির রায়হান মিলনায়তন
মিজান সড়ক, ফেনী।

লক্ষ্মীপুর থিয়েটার
কলেজ স্টেশনারি, কলেজ রোড
লক্ষ্মীপুর।

প্রতিবিম্ব থিয়েটার
প্রযত্নে : শাহ্‌জাহান চৌধুরী
'উত্তরায়ণ', ইউসুফ স্কুল রোড,
১, বজ্রপুর, কুমিল্লা-৩৫০০।

সিলেট বিভাগ

সুরমা থিয়েটার
প্রযত্নে : বিদ্যুৎ কর, কর ভিলা,
দাড়িয়াপাড়া, সিলেট।

কথাকলি
প্রান্তিক মিলনায়তন
হাসপাতাল সড়ক, বক্স নং-১২২
সিলেট।

সন্ধানী নাট্যচক্র
মধুবন কর্নার, ১২ মধুবন মার্কেট
বন্দরবাজার, সিলেট।

লিট্‌ল থিয়েটার
ইসমাইল মঞ্জিল, ধোপা দীঘির
উত্তরপাড়, সিলেট।

বর্ণালী নাট্যসংঘ
প্রযত্নে : আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী,
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক,
জিন্দাবাজার শাখা, সিলেট।

নাট্যায়ন
স্কাউট ক্যাম্পাস, পুরাতন
হাসপাতাল সড়ক,
সিলেট-৩১০০।

নান্দিক নাট্যদল
প্রযত্নে : প্রিয়জ্যোতি দাস
(মদনমোহন কলেজের বিপরীতে)
লামাবাজার, সিলেট।

জীবন সংকেত নাট্যগোষ্ঠী
টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ-৩৩০০।

খোয়াই থিয়েটার
টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ-৩৩০০।

মনু থিয়েটার
পশ্চিম বড়ো হাট,
মৌলভিবাজার-৩২০০।

তারুণ্য নাট্যগোষ্ঠী
হোসেন মার্কেট, বড়োলেখা-
৩২৩৫, মৌলভিবাজার।

চেতনা থিয়েটার
শারদা হল ভবন, চান্নীঘাট,
সিলেট-৩১০০।

রাজশাহী বিভাগ

অনুশীলন নাট্যদল
প্রযত্নে : মলয় ভৌমিক
ব্যবস্থাপনা বিভাগ রাজশাহী
বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার রাজশাহী
প্রযত্নে : শাহ্ আলম শান্তনু
প্রভাষক মার্কেটিং বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

রাজশাহী থিয়েটার
আলুপট্টি, রাজশাহী-৬১০০।

সমকাল নাট্যচক্র
রাকসু সাধারণ কক্ষ, রাজশাহী
বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ড্রামা এসোসিয়েশন
রুডা কার্যালয়, রাকসু ভবন,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
রাজশাহী-৬২০৫।

থিয়েটার চাঁপাই নবাবগঞ্জ
ঝিলিম রোড, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

বগুড়া থিয়েটার
নবাববাড়ি সড়ক, বগুড়া।

করতোয়া নাট্যগোষ্ঠী
বুলবুল মেডিকেল স্টোর,
ঝাউতলা, বগুড়া।

বগুড়া নাট্যদল
প্রযত্নে : শ্যামল ভট্টাচার্য,
আলতাফুননেসা পার্ক রোড,
পো. - জেলা - বগুড়া-৫৮০০।

বগুড়া নাট্যগোষ্ঠী
মোতাররফ আলী লেন,
সাত মাথা, বগুড়া।

সংশপ্তক থিয়েটার
টিটু মিলনায়তন, পার্ক রোড,
বগুড়া।

মেঘদূত
স্কুল লেন, গাইবান্ধা।

পদক্ষেপ
রেলগেইট, গোডাউন রোড,
গাইবান্ধা।

গাইবান্ধা থিয়েটার
শহিদ স্মৃতি সংসদ, (অস্থায়ী
কার্যালয়), ডিবি রোড, গাইবান্ধা।

গোবিন্দগঞ্জ থিয়েটার
সাফিয়া আসাব ফাউন্ডেশন
(৩য় তলা), গোবিন্দগঞ্জ
উপজেলা, গাইবান্ধা।

সারথি থিয়েটার
ডাকঘর-দারিয়াপুর, উপজেলা ও
জেলা - গাইবান্ধা-৫৭০০।

পাবনা থিয়েটার '৭৭
কলেজ রোড (ট্রাফিক মোড়)
পাবনা।

পাবনা ড্রামা সার্কেল
আওরঙ্গজেব রোড. (সিটি
ব্যাংকের সামনে), পাবনা।

তরুণ সম্প্রদায়
প্রযত্নে : আসাদ উদ্দিন পবলু
মমতাজ সিনেমা হল, ইবি রোড,
সিরাজগঞ্জ।

রূপক নাট্যগোষ্ঠী
শেরে বাংলা ফজলুল হক সড়ক,
সিরাজগঞ্জ।

দুর্বার নাট্যগোষ্ঠী
হোসেনপুর, সিরাজগঞ্জ।

অনুস্বর থিয়েটার
প্রযত্নে : বাটারফ্লাই, স্টেশন
রোড, সিরাজগঞ্জ।

নাবিক নাট্যগোষ্ঠী
কালীবাড়ি সড়ক, সিরাজগঞ্জ।

সংগ্রামী নাট্যদল
নিউ ঢাকা রোড, চামড়া পট্টি,
সিরাজগঞ্জ।

প্রসুন থিয়েটার
শান্তিনিকেতন, মোক্তার পাড়া,
সিরাজগঞ্জ।

রূপকার নাট্যগোষ্ঠী
ডাক-উল্লাপাড়া আর, এস,
থানা : উল্লাপাড়া,
জেলা: সিরাজগঞ্জ-৬৭৬১।

সারথি নাট্য সম্প্রদায়
২৫০, জে এন সি রোড,
গুপ্তপাড়া, রঙপুর।

জহির রায়হান থিয়েটার
নিউ মার্কেট (বহুমুখী হাট)
সিরাজগঞ্জ।

রঙপুর পদাতিক
কারুপণ্য, প্রেসক্লাব চত্বর, রঙপুর।

রঙপুর থিয়েটার
টাউনহল ভবন, রঙপুর।

শিখা সংসদ
টাউন হল চত্বর, রঙপুর।

রঙপুর নাট্যচক্র
টাউন হল চত্বর, রঙপুর।

রঙপুর নাট্যকেন্দ্র
প্রযত্নে : রাজ্জাক মুরাদ
টেলিফোন অফিস ভবন, রঙপুর।

বিকল্প নাট্যকেন্দ্র
টাউন হল চত্বর, রঙপুর।

নবরূপী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান
বাহাদুর বাজার, দিনাজপুর।

দিনাজপুর থিয়েটার
প্রযত্নে : মো. আলী মন্টু,
বাহাদুর বাজার (নবরূপীর পিছনে)
দিনাজপুর।

শাপলা নাট্যগোষ্ঠী
সংবাদ বিতরণী, নিউমার্কেট,
ঠাকুরগাঁও।

শান্তিনগর থিয়েটার
স্টেশন রোড, শান্তিনগর,
জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট।

সৈয়দপুর চোখ নাট্যদল
মমতাজ হোমিও হল
শহিদ ডা. জিকরুল হক রোড,
সৈয়দপুর, নীলফামারী।

শ্রীমঙ্গল থিয়েটার
সেন্ট্রাল রোড, পোস্ট. - থানা -
শ্রীমঙ্গল, জেলা - মৌলভীবাজার।

জেলা নাট্যসমিতি
পো.- উপজেলা পঞ্চগড় সদর
জেলা - পঞ্চগড়।

খুলনা বিভাগ

খুলনা থিয়েটার
২ ফরাজীপাড়া রোড, খুলনা।

মঞ্চ সৈনিক
৪৭, আহসান আহমেদ রোড,
খুলনা-৯১০০।

মঞ্চকথা
২৫, স্যার ইকবাল রোড (৪র্থ
তলা), পিকচার প্যালেস মোড়,
খুলনা।

থিয়েটার খুলনা
প্রযত্নে : মো. মোনাব্বর আলী
(খোকন), সেলস্ এক্সিকিউটিভ টি
অ্যান্ড টি এক্সপ্রেস ওয়ার্ল্ড
ওয়াইড, ৬ কে ডি এ এভিনিউ
(২য় তলা), খুলনা।

বিয়নমণি থিয়েটার
আলোক, দৌলতপুর বাসস্ট্যান্ড,
খুলনা-৯২০২।

বাগেরহাট থিয়েটার
জেলখানা রোড,
বাগেরহাট ৯৩০০।

রূপকার নাট্যগোষ্ঠী
প্রযত্নে : মো: হাবিবুর রহমান
নতুন উপশহর এ/৩১৮, যশোর।

নওয়াপাড়া ইন্সটিটিউট
সাংস্কৃতিক বিভাগ, নওয়াপাড়া,
যশোর।

বিবর্তন যশোর
কেশবলাল সড়ক (সংগীতপাড়া)
যশোর-৭৪০০।

নওয়াপাড়া নাট্যগোষ্ঠী
প্রযত্নে : জি এম মেহেদী হাসান
(কাদের), নাহার ওয়াচ এন্ড
ইলেকট্রনিক্স (২য় তলা),
নওয়াপাড়া-৭৪৬০, যশোর।

সংলাপ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী
সাংস্কৃতিক পল্লী ভবন,
জেলা শিল্পকলা একাডেমী চত্বর,
চুয়াডাঙ্গা।

অনন্যা থিয়েটার
প্রযত্নে : জাহিদুল আলম (শিমুল)
নোভা কম্পিউটারস, এম আর
রোড, মাগুরা-৭৬০০।

কুমারখালি থিয়েটার
প্রযত্নে : কিশলয়, পৌর এলাকা,
কুমারখালি, কুষ্টিয়া-৭০১০।

বোধন থিয়েটার
জেলা শিল্পকলা একাডেমী চত্বর
কুষ্টিয়া-৭০০০।

অনন্যা '৭৯ নাট্যদল
৭৮-৮০, এন এস রোড,
বৈদ্যনাথ দত্ত জিমন্যাসিয়াম,
থানাপাড়া, কুষ্টিয়া।

নুপুর কুষ্টিয়া
২৯, কেনী রোড, কোর্টপাড়া,
কুষ্টিয়া।

দর্পণ থিয়েটার
৫৮, নবাব সিরাজউদ্দৌলা সড়ক,
থানাপাড়া, কুষ্টিয়া।

পরিমল নাট্যসমিতি
৭০, নবাব সিরাজউদৌলা সড়ক,
পো.- থানা - জেলা - কুষ্টিয়া।

কুষ্টিয়া থিয়েটার
৩০/১, জোয়াদ্দার সড়ক,
থানাপাড়া, কুষ্টিয়া।

অনির্বাণ সাংস্কৃতিক সংগঠন
কলেজ সড়ক, দর্শনা, পোস্ট. -
দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক সংগঠন
ডাকবাংলো সড়ক, দর্শনা,
পো. - দর্শনা-৭২২১,
জেলা -চুয়াডাঙ্গা।

চুয়াডাঙ্গা থিয়েটার
শহিদ আবুল কাশেম সড়ক
শিল্পকলা একাডেমী ভবন,
রুম - ৮ (৩য় তলা), চুয়াডাঙ্গা।

অরিন্দম সাংস্কৃতিক সংগঠন
শহিদ আবুল কাশেম সড়ক
(জেলা শিল্পকলা একাডেমী ভবন
সংলগ্ন) পো.- জেলা - চুয়াডাঙ্গা।

অঙ্কুর নাট্য একাডেমী
প্রযত্নে: মো. নাজিম উদ্দিন (জুলিয়াস)
আমন্ত্রণ কনফেকশনারি,
এইচ এস এস সড়ক, ঝিনাইদহ।

ঝংকার শিল্পীগোষ্ঠী
জেলখানা রোড, ঝিনাইদহ।

কুমার নাট্যদল
মায়ের আঁচল,
৪২৬, কলেজ রোড,
থানা- ডাকঘর - শৈলকুপা,
জেলা - ঝিনাইদহ।

মিতালী সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ
সিরাজুল ইসলাম সড়ক,
কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ।

বিহঙ্গ নাট্য সম্প্রদায়
শাহিনুর আলম লিটন,
প্রযত্নে : রমজান আলী বিশ্বাস
ছায়াবীথি, কবি সুকান্ত সড়ক
আদর্শপাড়া, ঝিনাইদহ।

দিবালোক
উপজেলা পরিষদ রোড,
পো.- উপজেলা - শৈলকোপা,
জেলা -ঝিনাইদহ।

চিত্রা থিয়েটার
পুরাতন হোস্টেল (দোতলা)
রতনগঞ্জ, নড়াইল।

বিবর্তন নাট্যগোষ্ঠী
প্রযত্নে : রাজু আহমেদ মিজান
হামদহ বাস স্ট্যান্ড,
ঝিনাইদহ-৭৩০০।

বরিশাল বিভাগ

বরিশাল নাটক
কালীবাড়ি রোড,
বরিশাল-৮২০০।

খেয়ালি গ্রুপ থিয়েটার
আসাদ ম্যানশন (২য় তলা)
সদর রোড, বরিশাল-৮২০০।

শব্দাবলী গ্রুপ থিয়েটার
লুকাস বিল্ডিং, সদর রোড,
বরিশাল-৮২০০।

বরিশাল থিয়েটার
আসাদ ম্যানশন, সদর রোড,
বরিশাল-৮২০০।

কীর্তনখোলা থিয়েটার
প্রযত্নে : এস এম জামান
পূবালী ব্যাংক লি., বরিশাল শাখা,
বরিশাল-৮২০০।

প্রজন্ম নাট্যকেন্দ্র
নিউ মেডিক্যাল হল,
৪২, সদর রোড, বরিশাল-৮২০০।

পঞ্চসিঁড়ি গ্রুপ থিয়েটার
দক্ষিণ চকবাজার, পো.- বরিশাল
থানা-কোতয়ালি, বরিশাল-৮২০০।

ব্রজমোহন থিয়েটার
প্রযত্নে : উত্তমকুমার সাহা
রমা স্টোর্স, নতুন বাজার,
বরিশাল-৮২০০।

মেহেন্দীগঞ্জ থিয়েটার
পো - ঘাট পাতারহাট,
থানা - মেহেন্দীগঞ্জ,
জেলা - বরিশাল, পুরাতন কলেজ
রোড, ঝালকাঠি।

প্রতীক নাট্যগোষ্ঠী
প্রযত্নে : মেসার্স মনোরম, পুরাতন
কলেজ রোড, ঝালকাঠি।

মালঞ্চ নাট্যম
পাবলিক ক্লাব ভবন
চরফ্যাশন-৮৩৪০, ভোলা।

পিরোজপুর নাট্যচক্র
প্রযত্নে : খান দেলোয়ার হোসেন
এ কে সুপার মার্কেট, পোস্ট
অফিস রোড, পিরোজপুর।

বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার সংগঠন তালিকা : ২০০২ অনুসারে

ঢাকা থিয়েটার
১১/১খ পুরানা পল্টন লাইন
ঢাকা-১০০০।

লোক থিয়েটার
নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা-১৩৪২।

পল্লী জননী থিয়েটার
প্রযত্নে : হাসেম মিয়া
নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়,
সাভার, ঢাকা-১৩৪২।

সভার থিয়েটার
সাভার প্রেস ক্লাব
পল্লী মার্কেট (দ্বিতীয় তলা)
বাজার বাসস্টান্ড, সাভার
ঢাকা-১৩৪০।

ঘোড়াপীর থিয়েটার
ঘোড়াপীর মাজার,
পো.- মির্জানগর নয়ার হাট,
সাভার, ঢাকা।

সাত্তার স্মৃতি থিয়েটার
গোকুল নগর, পো- সেনওয়ালিয়া
সাভার, ঢাকা।

বংশাই থিয়েটার
নয়ারহাট, সাভার ঢাকা।

গোকুল নগর থিয়েটার
গোকুল নগর, পো.- সেনওয়ালিয়া
সাভার, ঢাকা-১৩৪৪।

উত্তরা থিয়েটার
আশকোনা বাজার, উত্তরা, ঢাকা।

শহিদ টিটু থিয়েটার
ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান বিভাগ
জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা-১৩৪২।

কলমা থিয়েটার
সিকদার কিন্ডারগার্টেন অ্যান্ড
জুনিয়ার হাই স্কুল
পো.-ডেইরি ফার্ম, কলমা, সাভার
ঢাকা-১৩৪১।

কিষাণ থিয়েটার
২৩০, শেরেবাংলা হল, বাংলাদেশ
কৃষি ইনস্টিটিউট, ঢাকা-১২০৭।

নবাবগঞ্জ থিয়েটার
মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, নবাবগঞ্জ,
ঢাকা-১৩২০।

কলাকোপা থিয়েটার
কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

বাগমারা থিয়েটার
বাগমারা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

জামশা থিয়েটার
উত্তর জামশা, গোলাইডাঙ্গা,
মানিকগঞ্জ।

ত্রিমোহন থিয়েটার
প্রযত্নে : খন্দকার শাহ্ আলম
গ্রাম- মাচাইন, ডাক - মালুচি
হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ।

তালুকনগর থিয়েটার
তালুকনগর, দৌলতপুর,
মানিকগঞ্জ।

গায়ত্রী স্মৃতি থিয়েটার
প্রযত্নে : রঞ্জন সাহা
ডাক : ঝিটকা, হরিরামপুব
মানিকগঞ্জ।

অমলেন্দু বিশ্বাস থিয়েটার
প্রযত্নে : জোস্না বিশ্বাস,
জাবরা, তরা, মানিকগঞ্জ।

বেউথা থিয়েটার
বেউথা সড়ক, বেউথা,
মানিকগঞ্জ।

হাকিম আলী গায়েন থিয়েটার
গোলাইডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়
গোলাইডাঙ্গা, সিংগাইর,
মানিকগঞ্জ।

তুরাগ থিয়েটার
কালিয়াকৈর বাজার, কালিয়াকৈর,
গাজীপুর।

শহিদ আব্দুল হক থিয়েটার
গোসাত্রা, কালিযাকৈব, গাজীপুর।

জালশুকা সূর্যতরুণ থিয়েটার
প্রযত্নে : মো. কলিম উদ্দীন
জালশুকা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

বাংলাদেশ ডিজেল প্লান্ট শ্রমিক থিয়েটার
বাংলাদেশ ডিজেল প্লান্ট,
জয়দেবপুব, গাজীপুর।

বন্ধুমহল থিয়েটার
প্রযত্নে : বিশ্বজিৎ মন্ডল,
সি সি বি এস কম্পিউটার,
রাজবাড়ী রোড, জয়দেবপুর,
গাজীপুর-১৭০০।

ইঙ্গিত থিয়েটার
প্রযত্নে : মো. সরিফ সরকার
বি এম টি এফ গেট, গাজীপুর।

সমকাল থিয়েটার
প্রযত্নে: মিজানুর রহমান মজনু
অঙ্গশ্রী অলংকার বিপনি বিতান
জয়দেবপুর বাজার,
গাজীপুর-১৭০০।

অঙ্গনা থিয়েটার
বি আই ডি সি গেইট
গাজীপুর-১৭০০।

টাকশাল থিয়েটার
বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিংটিং প্রেস
শিমুলতলী, গাজীপুর।

গৌরাঙ্গী থিয়েটার
কে গৌরাঙ্গী, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।

জাগরণী থিয়েটার
সাধুটী, জাহিদগঞ্জ, টাঙ্গাইল।

হামিদপুর থিয়েটার
হামিদপুর, কালীহাতি, টাঙ্গাইল।

ঝিনাই থিয়েটার
গালা, বীরসিংহ ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।

নাগরপুর থিয়েটার
নাগরপুর, টাঙ্গাইল।

রামপুর থিয়েটার
বামপুব, টাঙ্গাইল।

মান্দাই গোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতি গবেষণাকেন্দ্র
গ্রাম ও পো - বড়ো চউনা
থানা-সখীপুর, টাঙ্গাইল।

ধূমকেতু থিয়েটার
প্রযত্নে : রং বিচিত্রা
শাপলা মার্কেট, ভুয়াপুর বাজাব
ভুয়াপুর, টাঙ্গাইল।

প্রজন্ম থিয়েটার
ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।

ভুয়াপুর থিয়েটার
প্রযত্নে: এম এ মজিত মিয়া
(মাস্টার), ভুয়াপুর বাজার
পো.- ভুয়াপুর, টাঙ্গাইল।

সখীপুর থিয়েটার
সখীপুর, টাঙ্গাইল

মৌ থিয়েটার
ঘাটাইল, ব্রাহ্মণ শাসন, টাঙ্গাইল।

শহিদ সমর থিয়েটার
মেলান্দহ রেলস্টেশন, জালালপুর
জামালপুর।

দেউলাবাড়ি থিয়েটার
দেইলাবাড়ি, মেলান্দহ, জামালপুর

প্রভাতী থিয়েটার
প্রযত্নে: মো. আহসান হাবীব
মধু মাইক হাউজ, মেলান্দহ
বাজার, মেলান্দহ, জামালপুর।

শহিদ শাহজাহান থিয়েটার
চারাইলদার, গোবিন্দপুর, নাংলা
মেলান্দহ, জামালপুর।

গায়েন থিয়েটার
ঝাউগড়া, মেলান্দহ, জামালপুর।

টুপকার চর থিয়েটার
পো - জালালপুর,
থানা-মেলান্দহ, জামালপুর।

অমৃত থিয়েটার
প্রযত্নে: মুক্তা আহমেদ
ইসলাম ব্রাদার্স (দ্বিতীয় তলা)
তমালতলা, জামালপুর।

নবারুণ থিয়েটার
থুরী কুটের বাজার
মেলান্দহ, জামালপুর।

শহিদ মোস্তফা থিয়েটার
সুরেশচন্দ্র মালাকার অ্যান্ড সন্স
মুন্সীবাজার, শেরপুর-২১০০।

দশ আনী থিয়েটার
প্রযত্নে: সাদেকুর রহমান মুরাদ
ফটিয়ামারী, শেরপুর।

শহিদ মুক্তু থিয়েটার
হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ।

শহিদ শামসুদ্দোহা থিয়েটার
পুমদী, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ।

কুড়িমারা থিয়েটার
কুড়িমারা, কিশোরগঞ্জ।

আমান সরকার থিয়েটার
কাপাসিয়া, গাঙ্গাটিয়া হোসেনপুর,
কিশোবগঞ্জ।

শহিদ হেলাল থিয়েটার
সাহেবের গাঁও (চৌদার)
হারেঙ্গা, হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ।

মধুমতী থিয়েটার
নারায়ন ডহর, হোসেনপুর,
কিশোরগঞ্জ।

মুক্তাগাছা থিয়েটার
কলেজ রোড, মুক্তাগাছা,
ময়মনসিংহ।

শহিদ রুহুল আমান থিয়েটার
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

শীম থিয়েটার
পো: কান্দিপাড়া, গফরগাঁও,
ময়মনসিংহ।

অনির্বাণ থিয়েটার
প্রযত্নে: সবুজ সাবোয়ার
তিতাস হোটেল, ভৈবব রেল
স্টেশন, ভৈবব।

ভৈরব থিয়েটার
ঢাকা বাসস্ট্যান্ড, ভৈরব,
কিশোরগঞ্জ।

ভৈরব লিটল থিয়েটার
প্রযত্নে: মোস্তাফিজ আমিন
উপজেলা সড়ক, কমলাপুর,
ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।

কুলিয়ার চর থিয়েটার
ছয়সুতী, কুলিয়ার চর,
কিশোরগঞ্জ।

ইটনা থিয়েটার
ইটনা, কিশোরগঞ্জ।

মেঘনা লিটল থিয়েটার
প্রযত্নে: রায়হান (সরকারি
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে)
চন্ডিরেড় ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।

নিকলী থিয়েটার
প্রযত্নে : ম হ শোকরানা
নিকলী, কিশোরগঞ্জ-২৩৬০।

কংস থিয়েটার
সুমলকুমার রায়
বারহাট্টা, নেত্রকোণা।

মোহনগঞ্জ থিয়েটার
মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা।

ভাঙ্গা থিয়েটার
প্রযত্নে: মশিউর রহমান বাবু
নুরপুর মিয়া বাড়ি, ভাঙা,
ফরিদপুর।

নগরকান্দা থিয়েটার
নগরকান্দা বাজার, নগরকান্দা,
ফরিদপুর।

বালিয়াকান্দি থিয়েটার
বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ি।

প্রগতি থিয়েটার
প্রযত্নে : নীহার চক্রবর্তী
কালুখালি, রাজবাড়ি।

চারণ থিয়েটার
প্রযত্নে ওয়ালিউল হাসান মঞ্জু
৫/এ ব্লক-এ, সজ্জনকান্দা,
বাজবাড়ি।

দেবের বটতলা থিয়েটার
হান্নান স্টোর, দেবের বটতলা
(পুলিশ লাইন সংলগ্ন), বাজবাড়ি।

শহিদ শুকুর থিয়েটার
প্রযত্নে: ওয়ালিউল হাসান মঞ্জু
৫/এ ব্লক-এ, সজ্জনকান্দা,
রাজবাড়ি।

শহিদ শফিউল্লাহ থিয়েটার
কার্তিকপুর, ভেদরগঞ্জ,
শরিয়তপুর।

কীর্তিনাশা থিয়েটার
প্রযত্নে: অধ্যক্ষ আবুল কালাম
আদজাদ, সুবেশ্বর কলেজ,
নড়িয়া-৮০২০, শরিয়তপুর।

চাক্‌ধ থিয়েটার
চাক্‌ধ, নড়িয়া-৮০২০,
শরিয়তপুর।

আড়িয়াল খাঁ থিয়েটার
বেপারিপাড়া রোড, প্রধান সড়ক,
মাদারীপুর-৭৯০০।

নবগ্রাম থিয়েটার
প্রযত্নে: নীপেন বৈরাগী
নবগ্রাম, শশীকর, মদারীপুর।

ঝিনেদা থিয়েটার
এন এস জুয়েলার্স,
গীতাঞ্জলি সড়ক, ঝিনাইদহ-৭৩০০।

কালীগঞ্জ থিয়েটার
কালীগঞ্জ বাজাব, কালিগঞ্জ,
ঝিনাইদহ।

বাগেরহাট থিয়েটার
জেলখানা সড়ক, বাগেবহাট।

অনির্বাণ থিয়েটার
দৌলতপুর, খুলনা।

খুলনা থিয়েটার
প্রযত্নে : তামান্না মেডিকেল হল
খালিশপুর, খুলনা।

হালসা থিয়েটার
প্রযত্নে: হাবিপুর রহমান
আড়পাড়া, পো.- গোস্বামী দুর্গাপুর
আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

দর্পণ থিয়েটার
প্রযত্নে আহমেদ হোসেন সাদ
আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

গাংনী থিয়েটার
গাংনী, মেহেরপুর

হিসনা থিয়েটার
ভেড়ামাবা, কুষ্টিয়া।

গড়াই থিয়েটার
প্রযত্নে: মাসুদ অরুণ
মেহেবপুব, কুষ্টিয়া।

মিরপুর থিয়েটার
মিরপুর বাসস্ট্যান্ড, মিরপুর,
কুষ্টিয়া।

ইসলামপুর থিয়েটার
প্রযত্নে : ইসলামপুর ক্লাব
ইসলামপুব, ডাক - ফিলিপনগর,
কুষ্টিয়া।

রবীন্দ্র থিয়েটার
প্রযত্নে : রবীন্দ্র পরিষদ, বাখাই,
কুমারখালি, কুষ্টিয়া।

মুকুল থিয়েটার
দামুকদিয়া, মোকাবেমপুর,
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

গোপালনগর মুকুল থিয়েটার
গোলাপনগর, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

কেদালিয়াপাড়া থিয়েটার
কেদালিয়াপাড়া, ভেড়ামাবা,
কুষ্টিয়া।

মুজিবনগর থিয়েটার
প্রযত্নে: মাসুদ অরুণ,
মেহেরপুব কুষ্টিয়া।

বোধন থিয়েটার
শিল্পকলা একাডেমী চত্বর, কুষ্টিয়া।

পরানখালী থিয়েটার
ডাক - জগশ্বব, থানা-ভেড়ামারা,
কুষ্টিয়া।

বাঘা যতীন থিয়েটার
গ্রাম ও পো- কয়া,
থানা-কুমারখালি, কুষ্টিয়া।

প্রতিবিম্ব থিয়েটার
প্রযত্নে: শাহজাহান চৌধুরী
'উত্তরায়ণ' বজ্রপুর
ইউসুফ স্কুল রোড,
কুমিল্লা-৩৫০০।

বিনয় থিয়েটার
প্রযত্নে : নির্মলকুমার সিংহ, বড়োই
গ্রাম- পো - ভোরাজগৎপুর,
লাকসাম, কুমিল্লা।

কলেজ থিয়েটার
প্রযত্নে: বীথি ইলেক্ট্রনিক্স এ্যান্ড
রেকর্ডিং সেন্টার, হাজী মার্কেট,
পো.- আহম্মদনগর, পদুয়ার
বাজার, বিশ্ব রোড, কুমিল্লা।

পথিকৃৎ থিয়েটার
প্রযত্নে: মোরশেদ আলম কাওছার বায়তুল গনি
সরকারী মহিলা কলেজ রোড,
কুমিল্লা-৩৫০০।

বরুড়া থিয়েটার
বরুড়া পৌরসভা, ডাক - বরুড়া
বাজার, বরুড়া, কুমিল্লা।

দুর্জয় থিয়েটার
প্রযত্নে : গাজী আমিনুল ইসলাম,
গ্রাম - কমলপুর, পো.- আনন্দপুর,
কুমিল্লা।

উজ্জ্বলপুর থিয়েটার
আমিন ট্রাভেলস সার্ভিস
মেইন রোড, মাইজদি কোর্ট
নোয়াখালি।

রামগঞ্জ থিয়েটার
এখলাসপুর, মাইজদীকোর্ট,
নোয়াখালি।

শহিদ জয়নাল থিয়েটার
প্রযত্নে: নুরনবী চৌধুরী,
চর জব্বার, নোয়াখালি।

লক্ষ্মীনারায়ণপুর থিয়েটার
প্রতীক প্রচারণী
৪৮, হকার্স মার্কেট,
নোয়াখালি ৩৮০০।

সলিমপুর থিয়েটার
প্রযত্নে : মিসেস রোখসানা
আক্তার
উত্তর সলিমপুর সরকারি প্রাথমিক
বিদ্যালয়, ডাক: জাফরাবাদ,
সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

শিলুয়া থিয়েটার
গোলারহাট, লস্করহাট, ফেনী।

সংলাপ থিয়েটার
গোফরান বিল্ডিং, ট্রাংক রোড,
ফেনী-৩৯০০।

রংধনু থিয়েটার
লেমুয়া, ফেনী।

তুলাবাড়িয়া থিয়েটার
প্রযত্নে: দৌলত ট্রেডিং (শহিদ
মার্কেট), ট্রাংক রোড,
ফেনী-৩৯০০।

খোয়াই থিয়েটার
পুরানা মুন্সেফী আ/এ,
হবিগঞ্জ-৩৩০০।

সুরমা থিয়েটার
প্রযত্নে : বিদ্যুৎ কর, কর ভিলা
দড়িয়াপাড়া, সিলেট।

চেতনা থিয়েটার
প্রযত্নে : এ এস এম সালেহ
পশ্চিম বড়োহাট, মৌলভীবাজার।

মনসামঙ্গল থিয়েটার
প্রযত্নে: সনৎকুমার সেন
শাঁখারীপাড়া, জামনগর,
বাগাতিপাড়া, নাটোর।

বাগাতি পাড়া থিয়েটার
গালিমপুর মোড়, পো.- লক্ষণ হাটি,
বাগাতি পাড়া, নাটোর।

রাজশাহী থিয়েটার
বোয়ালিয়া থানার মোড,
ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

পুঠিয়া থিয়েটার
পুঠিয়া বাজার, পুঠিয়া, রাজশাহী।

পদ্মা বড়াল থিয়েটার
চারঘাট, রাজশাহী।

তিতুমীর থিয়েটার
ভবানীপুর, বসুরামপুর, আত্রাই,
নওগাঁ।

অগ্নি থিয়েটার
আফতাব মেডিকেল সেন্টার
আহসানগঞ্জ স্কুল রোড,
পোস্ট - আহসানগঞ্জ,
থানা - আত্রাই, নওগাঁ।

অমৃত থিয়েটার
প্রযত্নে : অনুপকুমার দত্ত (বাদল)
ভবানীপুর, পোস্ট - রঘুনাথপুর
থানা- আত্রাই, নওগাঁ।

ইঙ্গিত থিয়েটার
প্রযত্নে অ্যাড সুখময় রায় বিপ্লু
জেলা জর্জকোর্ট, নাটোর।

বরেন্দ্র থিয়েটার
গোদাগাড়ি, রাজশাহী।

মহিহার থিয়েটার
প্র: প্রদীপকুমার আগরওয়ালা
পবন ট্রেডার্স, চারঘাট, রাজশাহী।

মোহনপুর বিপ্লবী থিয়েটার
মোহনপুর, রাজশাহী।

নিশ্চিন্তপুর থিয়েটার
সাধারণ পাঠাগার,
ঠাকুরগাঁও-৫১০০।

পূর্নভবা থিয়েটার
পৌর সুপার মার্কেট, গণেশতলা,
দিনাজপুর।

দিনাজপুর থিয়েটার
প্রযত্নে : মো. আলী মন্টু
বাহাদুর বাজার, (নবরূপীর
পিছনে) দিনাজপুর।

কানন থিয়েটার
কাবিলের বাজার, পো.- দারিয়াপুর,
গাইবান্ধা।

অনির্বাণ থিয়েটার
দারিয়াপুর, গাইবান্ধা-৫৭০০।

সংবেদী থিয়েটার
দাড়িয়াপুর, গাইবান্ধা-৫৭০০।

সারথি থিয়েটার
দারিয়াপুব, থানা ও পোস্ট.-
হাট দারিয়াপুর, গাইবান্ধা-৫৭০০।

কঞ্চিপাড়া থিয়েটার
গ্রাম- কঞ্চিপাড়া, পো.- ভবানীগঞ্জ
থানা - ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।

ফ্রেন্ডস থিয়েটার
পো. - হাট দারিয়াপুর, গাইবান্ধা।

দারিয়াপুর থিয়েটার
হাট দাড়িয়াপুর, গাইবান্ধা-৫৭০০।

গাইবান্ধা থিয়েটার
সোহাগ বোর্ডিং, স্টেশন রোড, গাইবান্ধা।

সন্ধানী থিয়েটার
ঠাকুরের দীঘি, ঘোলাহাটী, গাইবান্ধা।

ঘাগোয়া থিয়েটার
ডিজু বকসী
গ্রাম - দ. ঘাগোয়া,
পো.- রূপার বাজার, গাইবান্ধা।

সন্ধানী থিয়েটার
ঠাকুরের দীঘি, ঘোলাহাটী, গাইবান্ধা।

উত্তরণ থিয়েটার
ধানঘরা, সিরাজগঞ্জ।

অনুস্বর থিয়েটার
প্রযত্নে : মতিন আহমেদ ওয়াসিম ভিলা, মাছিমপুর,
সিরাজগঞ্জ - ৬৭০০।

পুরবী থিয়েটার
প্রযত্নে : মুমীদুজ্জামান জাহান
চুনিয়াখালি পাড়া, শাহজাদপুর
সিরাজগঞ্জ।

শাপলা থিয়েটার
হলুদঘর, ধোপাদহ, সাঁথিয়া
পাবনা।

তরঙ্গ থিয়েটার
তালতলা, বেড়া, পাবনা।

পাকশী থিয়েটার
পাকশী বাজার, ঈশ্বরদী, পাবনা।

সোনাতলা থিয়েটার
সোনাতলা, আফতাব নগর,
সাঁথিয়া, পাবনা।

খয়েরসুতি থিয়েটার
খয়েরসূতী, দোগাচ্ছী, পাবনা।

পাবনা থিয়েটার
আব্দুল হামিদ রোড, পাবনা।

যান্ত্রিক থিয়েটার
থানা পাড়া, পাবনা।

সাঁথিয়া থিয়েটার
সাঁথিয়া বাজার, সাঁথিয়া, পাবনা।

সবুজ মেলা থিয়েটার
প্রযত্নে : ডালাস টেইলার্স
চান্দাইকোনা, বগুড়া।

বগুড়া থিয়েটার
নবাববাড়ি সড়ক, বগুড়া।

নাগর থিয়েটার
তালোড়া বাজার, তালোড়া, বগুড়া।

যমুনা থিয়েটার
সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

কাহালু থিয়েটার
থিয়েটার রোড, কাহালু, বগুড়া।

কলেজ থিয়েটার
নবাববাড়ী সড়ক, বগুড়া।

প্রভাতী থিয়েটার
ডাক : লোকনাথ পাড়া, কাহালু
বগুড়া।

সংলাপ থিয়েটার
পুরাতন হাসপাতাল, হাইস্কুল
রোড, সোনাতলা, বগুড়া-৫৮২৬।

ধনুট থিয়েটার
(মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সংলগ্ন)
ধুনট বাজার, ধুনট, বগুড়া।

শান্তিনগর থিয়েটার
শান্তিনগর, জয়পুরহাট।

আক্কেলপুর থিয়েটার
কলেজ বাজার, আক্কেলপুর,
জয়পুরহাট।

শেরপুর থিয়েটার
শেরপুর বাজার, বগুড়া।

আদমদীঘি থিয়েটার
আদমদীঘি, বগুড়া।

মেডিকেল কলেজ থিয়েটার
প্রযত্নে : সরওয়াল কামাল পাশা
রুম নং- ২০৩, ছাত্রাবাস, বগুড়া
মেডিকেল কলেজ। বগুড়া।

ঝালকাঠি থিয়েটার
কিশলয় খেলাঘর আসর,
পূর্ব চাঁদকাঠি, ঝালকাঠি।

স্বরূপ থিয়েটার
ইন্দুর হাট, স্বরূপকাঠি
(নেছারাবাদ) পিরোজপুর।

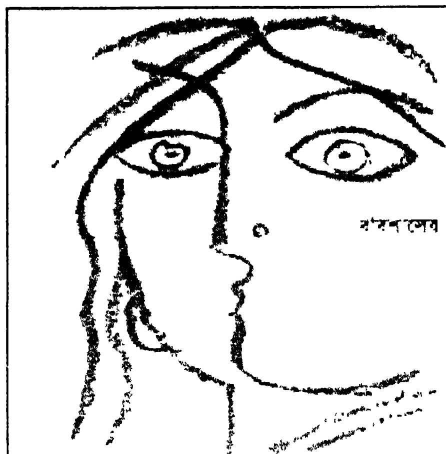
বলাকা থিয়েটার
প্রযত্নে : আ ফ ম রেজাউল করিম অঙ্কন,
সাধনারপুল, পিরোজপুর।

বরিশাল থিয়েটার
আনন্দধারা লাইব্রেরি
৮৬, সদর রোড, বরিশাল।

বাউফল থিয়েটার
শংকরকুমার বণিক,
পো.- বাউফল, পটুয়াখালি।

ভোলা থিয়েটার
সাপ্তাহিক দ্বীপবাণী, বাংলা স্কুল রোড,
ভোলা।

বরগুনা থিয়েটার
প্রযত্নে : মিজানুর রহমান পিনু
মমতাজ মহল, কলেজ রোড,
বরগুনা।



ক



খ

চিত্র পরিচিতি

রঙিনচিত্র পরিচিতি